রবীন্দ্রজীবনী

দ্বিতীয় খণ্ড

১৩০৮-১৩২৫ ॥ ১৯০১-১৯১৮

রবীন্দ্রজীবনী

ও

রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

'রবি-রথের সারথি'
শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ও
'ছায়েবানুগতা পতিম্‌
মেরুমর্কপ্রভা যথা'
শ্রীপ্রতিমা দেবীর
করকমলে

শান্তিনিকেতন
১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৫৫

প্রভাতকুমার

[এই গ্রন্থ যাঁহাদেব উৎসর্গ করিয়াছিলাম তাঁহাদের একজন আজ বিদেহী—
সর্বস্তুতি নিন্দার বাহিরে]

বর্তমান সংস্করণের ভূমিকা

রবীন্দ্রজীবনী দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৪৯ সালের প্রথম দিকে প্রকাশিত হয়। তার পর সে সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া গেলে কয়েক বৎসর ইহা দুষ্প্রাপ্য হয়। এবারও ইহাকে পুনর্মুদ্রণ বলা যায় না। কারণ পূর্বসংস্করণের পত্রসংখ্যা ছিল ৪৯৯ পৃষ্ঠা। এই তৃতীয় সংস্করণের পত্রসংখ্যা হইয়াছে ৫৫০-এর অধিক।

গ্রন্থ লিখিতে লিখিতেই নূতন তথ্যাদি আসিয়া উপস্থিত হয়; তাই পাঠকদের নিকট অনুরোধ— সংশোধন ও সংযোজন অংশ দেখিয়া পূর্বাহ্ণে সংশোধিত পৃষ্ঠা চিহ্নিত করিয়া রাখেন।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে অনেকের নিকট হইতে সহায়তা লাভ করিয়াছি—শ্রীঅজয় হোম, শ্রীকানাই সামন্ত, শ্রীক্ষিতীশ রায়, শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসুশীল রায় ও শ্রীসুবিমল লাহিড়ী।

এই গ্রন্থের নির্দেশিকার খসড়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন আমার কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বপ্রিয় ও বধূমাতা সুনন্দা; নিষ্ঠার সহিত তাঁহারা এ কাজ করিয়াছেন। যাঁহার সতর্কদৃষ্টি আমার সর্বকর্মে নিবদ্ধ, তাঁহার সহায়তা ব্যতীত নির্দেশিকা সুসম্পন্ন হইত না, তাঁহার নাম অনুক্ত। ইতি

ভুবননগর। বোলপুর
২৭ জুলাই ১৯৬১

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

রবীন্দ্রজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। দেশের অবস্থা স্বাভাবিক থাকিলে গ্রন্থখানি হয়তো পূর্বেই পাঠকদের হস্তগত হইত। কিন্তু আজকাল সকল প্রকার স্বাভাবিক কাজকর্ম যেসব কারণে থাকিয়া থাকিয়া অচল-অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেইসব কারণেই মুদ্রণকার্য যারপরনাই বিলম্বিত হইয়া পড়িয়াছে।

ভাবিয়াছিলাম দ্বিতীয় খণ্ডেই রবীন্দ্রজীবনী সম্পূর্ণ হইবে, কিন্তু তাহা সম্ভব হইল না। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা হইতে বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা পর্যন্ত কবিজীবনের আঠারো বৎসরের (বয়স ৪০ হইতে ৫৭) ইতিহাস এইখণ্ডে আলোচিত হইয়াছে। বাহিরের ঘটনার দিক্ হইতে দেখা যায় এই-পর্বের আদিতে বুয়র যুদ্ধ, অন্তে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান। জীবনীর তৃতীয় খণ্ড আরম্ভ হইবে যুদ্ধান্তে ভারতের নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে।

এই খণ্ডে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও তাহার বিকাশের কথা বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহারা যেন ভুলিয়া না যান যে, কবির জীবনের অর্ধভাগ অর্থাৎ চল্লিশ বৎসর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। এই পর্বের আলোচনা করিতে গেলে স্বভাবতই এই বিদ্যায়তনের কথা আসিয়া পড়িবে। সেই আলোচনা প্রসঙ্গে এমন-সব ব্যক্তির কথা আসিয়া পড়িয়াছে, যাঁহাদের নাম বাহিরে অজ্ঞাত এবং এখানেও প্রায় বিস্মৃত। অথচ, এইসব 'সাধারণ' লোকের সামান্য-সামান্য দানের কথা উল্লেখ না করিলে ইতিহাস অপূর্ণ থাকিত। রবীন্দ্রনাথ ভাবস্রষ্টা— যাঁহারা তাঁহার ভাবকে মূর্তি দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই যে নিছক কারুশিল্পী ছিলেন তাহা নহে, তাঁহাদের মধ্যেও ত্যাগী আদর্শবাদীর অভাব ছিল না। সেইজন্য যাঁহারা শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের অধ্যাপন ও পরিচালন -কার্যে কবিকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দানকে নগণ্য বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি নাই। বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁহাদের যোগ ও তাঁহাদের সহিত রবীন্দ্রনাথের যোগ যে কী নিবিড় ছিল, তাহা সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ দীর্ঘকালই পাইয়াছিলাম। সাহিত্য-সৃষ্টির কার্যে সংঘের প্রয়োজন হয় না, সেখানে স্রষ্টা সম্পূর্ণভাবে একা, প্রায়নিঃসঙ্গ ; কিন্তু কর্মসৃষ্টিতে সংঘেরই প্রয়োজন।

আর-একটি বিষয় সম্বন্ধে বোধ হয় কৈফিয়ত দেওয়া প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দীর্ঘ জীবনে দেশের ও দশের বিচিত্র ভাব ও কর্মের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিলেন। সেই বিষয়গুলি বৃহত্তর ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষায় অঙ্কিত না হইলে, অনেক কথাই অস্পষ্ট থাকিয়া যাইবে। সেইজন্য স্বদেশী আন্দোলনের কথা একটু ব্যাপকভাবেই বলিতে হইয়াছে ; চীনের কথা, জাপানের কথাও সেইজন্যই আসিয়া পড়িয়াছে। বাংলাদেশের সাময়িক-সাহিত্যের আলোচনা হইয়াছে ঐ একই কারণে। এই আলোচনার প্রসঙ্গে এমন-সব লোক আসিয়া পড়িয়াছেন, যাঁহারা পরবর্তীযুগে দেশপূজ্য প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারা যেখানে মহৎ সেখানে তাঁহাদের কেহই স্পর্শ করিতে পারিবে না। কিন্তু যেখানে রবীন্দ্রনাথের সহিত কোনো সূত্রে গ্রথিত হইয়াছেন, সেখানে প্রয়োজনমত তাঁহাদের সমালোচনাও করিতে হইয়াছে— না করিলে ঐতিহাসিকের ধর্মে ব্যত্যয় ঘটে।

এই সূত্রেই এখানে স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত যে, এই গ্রন্থের মতামত সম্পূর্ণভাবে লেখকের নিজের। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ এই গ্রন্থের মতামতের জন্য কিছুমাত্র দায়ী নহেন। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তিনি গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমার স্বাধীন মতামত প্রকাশের বিরুদ্ধে কোনোদিন কোনো কথা বলেন নাই। তিনি জানিতেন, নানা লোকে নানা দৃষ্টিকোণ হইতে কবিকে দেখিবে। এই মতামতের মধ্যে ভুলভ্রান্তি থাকিতে পারে ; হয়তো অসম্পূর্ণ তথ্যও সেসব ভুলভ্রান্তির অন্যতম কারণ। তথ্যের দিক হইতে উপকরণ যতই সংগৃহীত

এবং যথাযথভাবে বিন্যস্ত ও আলোচিত হইবে— ততই কবিজীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইবে, সত্যজীবনী উদ্‌ভাসিত হইবে।

এই তথ্য-সংগ্রহ বিষয়ে বহু গুণী জ্ঞানী অনেক দিন হইতে চেষ্টিত। এ বিষয়ে প্রণালীবদ্ধ কাজের প্রথম পথ-প্রদর্শক অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ; তিনিই প্রবাসীতে 'রবীন্দ্র-পরিচয়'-এর সূচনা করেন। গত কয়েক বৎসর বিশ্বভারতী হইতে যে 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' প্রকাশিত হইতেছে, তাহার সংযোজন ও গ্রন্থপরিচয়-অংশ বহু মূল্যবান তথ্যের আকর। অ-নামা সম্পাদকমণ্ডলী অন্তরাল হইতে যে উপকরণরাজি সংগ্রহ করিয়াছেন, জিজ্ঞাসু রবীন্দ্র-গবেষকরা তাহার উপযুক্ত ব্যবহার ও সমাদর একদিন নিশ্চয়ই করিবেন। এই সূত্রে জীবনচরিতকার আর্নেস্ট রীহ্‌স ও টমসনের উল্লেখ না করিলে অকৃতজ্ঞতা হইবে।

এই খণ্ডে পূর্বের ন্যায়ই সাময়িকপত্রে প্রকাশিত কবির অসংখ্য পত্রের সাহায্য পাইয়াছি। আনন্দবাজার-পত্রিকা, কবিতা, দেশ, পূর্ব্বাশা, প্রবাসী, বিশ্বভারতী পত্রিকা, শনিবারের চিঠি প্রভৃতি পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের অনেক চিঠি বাহির হইয়াছে। ইহার বাহিরে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সংগৃহীত 'স্মৃতি' পুস্তক বা তাঁহাকে লিখিত কবির পত্রগুচ্ছ। বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'চিঠিপত্র' গ্রন্থমালা, এবং শ্রীদিলীপকুমার রায়ের 'অনামী'ও উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়া অনেকগুলি পত্রের প্রতিলিপি পাই আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীসুহৃৎকুমারের নিকট হইতে; একান্ত নিষ্ঠার সহিত দীর্ঘকাল তিনি সেগুলি রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। গিরিধির শ্রীসুধাংশুবিকাশ রায় মহাশয়কে লিখিত কয়েকখানি পত্রের প্রতিলিপি পাইয়াছি; তজ্জন্য আমি সুধাংশুবাবুর নিকট কৃতজ্ঞ। বন্ধুপ্রবর শ্রীঅমল হোম রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি ও চিত্রাদির সংগ্রাহকরূপে সুপরিচিত। পরিশিষ্টে সংযোজিত 'স্বদেশী সমাজে'র কর্মপদ্ধতির খসড়া আমি অমল হোম মহাশয়ের নিকট হইতে পাই; কবির তিরোধানের পর তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের যে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন, তাহা নানা তথ্য ও চিত্রে পূর্ণ। এই সংখ্যা হইতে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসজনীকান্ত দাস, ডাঃ শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী এবং অন্যান্য আরো অনেক সংকলয়িতা ও লেখকদের তথ্য ও মতামত হইতে যে সাহায্য লাভ করা হইয়াছে, তাহাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার্য।

এবারেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনেকেরই সহায়তা লাভ করিয়াছি। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন, শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন ও শ্রীসুধীরচন্দ্র কর। বর্ণানুক্রমে শ্রীসুধীরচন্দ্রের নাম সর্বশেষে পড়িয়াছে বটে, সহায়তার গুণানুক্রমে তাঁহারই নাম সর্বাগ্রে দেওয়া উচিত ছিল। বহু চিঠিপত্রের সন্ধান পাইয়াছি শ্রীনির্মলচন্দ্রের নিকট হইতে; সাময়িক পত্রিকায় বহু পত্রগুচ্ছ প্রকাশ করিয়াছেন শ্রীপুলিনবিহারী। বাহির হইতে তথ্যাদি সরবরাহ দ্বারা যাঁহারা সহায়তা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত ও শ্রীলাবণ্যলেখা চক্রবর্তী। বন্ধুত্তম শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় 'রবীন্দ্রভবন' হইতে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। নানাপ্রকার আলাপ-আলোচনার দ্বারা যাঁহাদের নিকট হইতে উপকৃত হইয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন শ্রীঅনিলকুমার চন্দ, শ্রীঅমিয়কুমার সেন, শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, শ্রীউপেন্দ্রকুমার দাস, শ্রীকানাই সামন্ত, শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীক্ষিতীশ রায়, শ্রীনগেন্দ্রনাথ আইচ, শ্রীনন্দলাল বসু, শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী, শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী, শ্রীবিনয়গোপাল রায়, শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য, শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার, শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীহাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত; সকলকেই অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই বিশাল গ্রন্থ রচনার নানা অবস্থায় শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে যে সহায়তা পাইয়াছি, তাহার সাক্ষ্য আমি ছাড়া আর কেহই দিতে পারিবেন না। তাঁহার সেই অকৃত্রিম সৌহার্দ্য চিরদিন স্মরণে থাকিবে। তাঁহার ষষ্ঠিতম জন্মতিথি-উপলক্ষে পরম প্রীতির সহিত এই গ্রন্থখণ্ড তাঁহাকে উৎসর্গ করিলাম। এই গ্রন্থ প্রকাশের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া বিশ্বভারতী গ্রন্থন-অধ্যক্ষ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় আমার অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

গ্রন্থমুদ্রণ কার্যে শান্তিনিকেতন-প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, বাংলা বিভাগের প্রধান কম্পোজিটর শ্রীবলরাম সাহা ও প্রেসম্যান্ শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণকে ধন্যবাদ দিতেছি; ইঁহাদের নিত্য-হাস্যোজ্জ্বল সহায়তা ব্যতীত, আমার ক্ষীণ-অবসরে-লিখিত অপরিচ্ছন্ন পাণ্ডুলিপি হইতে এই দীর্ঘ গ্রন্থ মুদ্রণ করা দুরূহ হইত।

গ্রন্থভবন। শান্তিনিকেতন
১০ মাঘ ১৩৫৫ ॥ ২৩ জানুয়ারি ১৯৪৯

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বিষয়সূচী

পরিশিষ্ট

রবীন্দ্রজীবনী

যে-আমি ঐ ভেসে চলে
কালের ঢেউয়ে আকাশতলে
ওরি পানে দেখছি আমি চেয়ে ;
ধুলার সাথে, জলের সাথে,
ফুলের সাথে, ফলের সাথে,
সবার সাথে চলছে ও-যে ধেয়ে।

ও-যে সদাই বাইরে আছে,
দুঃখে সুখে নিত্য নাচে,
ঢেউ দিয়ে যায় দোলে-যে ঢেউ খেয়ে,
একটু ক্ষয়ে ক্ষতি লাগে,
একটু ঘায়ে ক্ষত জাগে,
ওরি পানে দেখছি আমি চেয়ে।

যে-আমি যায় কেঁদে হেসে
তাল দিতেছে মৃদঙ্গে সে,
অন্য আমি উঠ্‌তেছি গান গেয়ে—
ও-যে সচল ছবির মতো
আমি নীরব কবির মতো,
ওরি পানে দেখছি আমি চেয়ে।

এই-যে আমি ঐ আমি নই,
আপন মাঝে আপনি যে রই,
যাইনে ভেসে মরণধারা বেয়ে—
মুক্ত আমি, তৃপ্ত আমি,
শান্ত আমি, দৃপ্ত আমি
ওরি পানে দেখছি আমি চেয়ে।

পুরাতন ও নূতন শতাব্দী

ঊনবিংশ ও বিংশ শতক বলিয়া আমরা যে কালভেদ করিয়া থাকি তাহার সহিত আমাদের ইতিহাস বা সংস্কৃতির কোনো যোগ নাই, তাহা কেহ বলিয়া দিলেও সহজে বুঝিতে পারি না; আবার বাংলাদেশে প্রচলিত হিজরী বা ফসলি সন অর্থাৎ তথাকথিত বঙ্গাব্দও যে প্রাচীন নহে তাহাও সর্বদা মনে থাকে না। খ্রীস্টীয় য়ুরোপপ্রচলিত অব্দকেই আমরা ব্যবহারিক জীবনে স্বীকার করিয়াছি এবং আকবরপ্রবর্তিত সৌর হিজরী সালকেও বঙ্গাব্দ নাম দিয়া নানা কাজেকর্মে ও পাঁজিপুঁথিতে ব্যবহার করিতেছি। যাহা হউক, উনবিংশ শতকের ইংরেজি শিক্ষার ফলে আমরা য়ুরোপীয় তথা খ্রীস্টীয় যুগান্তরকে নিজেদের ইতিহাসের যুগান্তর বলিয়া মনে করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলাম। তাই উনবিংশ শতকের অন্তে ও বিংশ শতাব্দীর সূচনায় আমরা অন্তরে অন্তরে নূতনের সম্ভাবনায় ভাবিয়াছিলাম প্রাচ্যেও নবযুগের অভ্যুদয় হইতেছে।

সার্ধশতাব্দী কাল বাংলাদেশ ইংরেজি শিক্ষায় অভ্যস্ত হইয়াছে; পুরাতন শতাব্দীর অন্তকালে আসিয়া আজ জাতি দেখিতে চাহিল সে কি পাইয়াছে, কি হারাইয়াছে। জাতীয় জীবনে লাভক্ষতির হিসাব খতাইতে গিয়া সে আজ দেখে, জাতি অন্তরে-বাহিরে দেউলিয়া, বিদেশীর সহিত দীর্ঘকালের সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে একটি প্রাচীন দেশ তাহার সকল সম্পদ হইতে বঞ্চিত, ঐতিহ্য হইতে বিচ্যুত, সংস্কৃতি হইতে ভ্রষ্ট— সে আজ সম্মোহিত, আত্মবিস্মৃত। তাই আজ নানা অভিমানে তাহার অন্তর আচ্ছন্ন, তাহার দৃষ্টি মোহজড়িত, য়ুরোপীয়তার বহির্বাসের সে কাঙাল, প্রতীচ্যের বাণী তাহার কণ্ঠের ভূষণ, তাহার গর্বের বিষয়।

এই বৈদেশিকতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় হিন্দুসমাজ রক্ষণশীলতার শক্তি অর্জন করিয়া আপনার সংস্কৃতি ও সাধনাকে বুঝিতে ও অপরকে বুঝাইতে অগ্রসর হইল। রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শশধর তর্কচূড়ামণি, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি অনেকেই নানা দৃষ্টিকোণ হইতে হিন্দুসমাজের সমস্যা সমাধানে যত্নবান হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সে-চেষ্টা বেশি দূর অগ্রসর হয় নাই, ইংরেজিশিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মুষ্টিমেয়ের চিত্তকে স্পর্শ করিয়াছিল মাত্র: দেশের বিরাট জড় আত্মার মধ্যে তাঁহারা চেতনা সঞ্চারিত করিতে পারেন নাই।

উনবিংশ শতকের শেষভাগ হইতে বাংলাদেশে হিন্দুত্বকে নূতন ভাবে দেখিবার যে প্রচেষ্টা শুরু হয় তাহাই আমাদের আলোচনার বিষয়। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ মনীষিগণ হিন্দুত্বের নূতন সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা-দানে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিবার বিষয়, যাঁহারা এই বর্ণাশ্রমের গৌরবে মাতিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে গোঁড়া হিন্দুসমাজের প্রতিনিধি নহেন। ব্রহ্মবান্ধব ক্যাথলিক খ্রীস্টান, রামেন্দ্রসুন্দর পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক, হীরেন্দ্রনাথ আইনজীবী, নরেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে স্বামী বিবেকানন্দ জাতিতে কায়স্থ হইয়া সন্ন্যাসী, এবং রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম।

হিন্দুত্বের এই নবচেতনার সহিত আর-একটি নবতর চিন্তাস্রোতের ধারা আসিয়া যুক্ত হইয়াছিল। সেটি হইতেছে কাউন্ট ওকাকুরার Asia is One বাণী। ১৯০০ সালের শেষ দিকে জাপান হইতে ওকাকুরা ভারতে আসেন; তাঁহার ইচ্ছা শিকাগোর ধর্মসম্মেলনের ন্যায় একটি ধর্মমহাসভা টোকিওতে আহ্বান করেন। সেখানে স্বামী

বিবেকানন্দকে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে তিনি কলিকাতায় আসিয়া বেলুড়ে কিছু কাল বাস করেন। স্বামীজির শরীর তখন ভাঙিয়া পড়িতেছে। তিনি প্রাচ্যের এই আহ্বান রক্ষা করিতে পারেন নাই। ওকাকুরা বেলুড়ে ভগিনী নিবেদিতার সহিত পরিচিত হন। ১৯০২এ নিবেদিতার কল্যাণে ওকাকুরার সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয় (চিঠিপত্র ৬, পৃ. ৮২)। জাপানে নূতন চিন্তাজাগরণের যুগে এই মনীষী বিরাট এশিয়ার ঐক্যের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। চীনের প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার যেমন প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভারতের প্রতিও তাঁহার প্রেম তেমনি অকৃত্রিম ও গভীর। তাই তিনি প্রাচ্যের বা এশিয়ার মিলনের স্বপ্ন দেখিয়া বলিয়াছিলেন Asia is One। ওকাকুরা যেমন বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার সহিত ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তেমনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত। মোটকথা, সেদিন শিক্ষিত হিন্দুর সমক্ষে ধর্মের সংস্কৃতির ও জাতীয়তার নূতন ভাবজগৎ উদ্‌ভাসিত হইয়াছিল।

সেদিন হিন্দুভারতের মনীষীরা হিন্দুত্বকে আদর্শায়িত বর্ণাশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়াও কিভাবে এই বর্ণাশ্রমহিন্দুত্বের জয় উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহার আলোচনা যথাস্থানে হইবে। বড়ই আশ্চর্য লাগে যে, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ জীবনদর্শন ও চারিত্রনীতির দুই বিপরীত প্রান্তে দাঁড়াইয়া উভয়েই বর্ণাশ্রমের সমর্থন করিতেছেন। বর্ণাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য সেদিন সন্ন্যাসী কবি অধ্যাপক আইনজীবী সাংবাদিক সকলেই মহোৎসাহী। তাঁহারা আধ্যাত্মিক ঐতিহাসিক সমাজনৈতিক প্রভৃতি বিচিত্র কারণ দর্শাইয়া বর্ণাশ্রম ও জাতিভেদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য সুনিপুণভাবে দেখাইতেছেন। তাঁহাদের বিচারে, বর্ণাশ্রম হিন্দুর আদর্শ ও জাতিভেদ উহার বিকৃতি। জাতিভেদ শব্দ হিন্দু শাস্ত্রে বা সংহিতায় নাই, ঐ শব্দ খ্রীস্টান পাদরী ও ব্রাহ্ম সংস্কারকদের সৃষ্টি। অথচ হিন্দুসমাজ যে অসংখ্য ভেদনীতির দ্বারা শতধা ও জীর্ণ, দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু— সে কথা কেহ অস্বীকার করিতেছেন না; আবার সেসব নিরাকৃত করিবার মত বল সঞ্চয় করিতে পারিতেছেন না। জাতিভেদের নিন্দা করিয়া বর্ণাশ্রমের জয়গানে মুখর হইলেন। বলা বাহুল্য, এসব কেবল কথার মারপ্যাঁচ মাত্র। ইংরেজিতে যাহাকে বলে 'সফিস্ট্রী'। বর্ণভেদের সমর্থনে তাঁহাদের আনুষঙ্গিক যুক্তি— য়ুরোপেও উহা তো একভাবে আছে, সেখানে ধনগত ভেদে মানুষ বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত। তথাকথিত স্বাধীনতার জন্মভূমি আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের মধ্যে যে ভেদ আছে, তাহা ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের ভেদ হইতে কম তীব্র ও মারাত্মক নহে। সেইখানেই তাঁহাদের সান্ত্বনা এবং সেই নজিরেই বর্ণভেদ সমর্থিত।

কেশবচন্দ্র সেনের সময় হইতে সমাজসংস্কারের যে আন্দোলন শুরু হয় তাহাতে বর্ণভেদ ও জাতিভেদের সূক্ষ্ম পার্থক্য এই প্রকার পণ্ডিতম্মন্যতার আড়ম্বরে বিশ্লেষিত হয় নাই। মানুষে মানুষে যে দুর্লঙ্ঘ্য ভেদ হিন্দুসমাজের সৃষ্টি, তাহাকে বিলোপ করিবার জন্যই ব্রাহ্ম সংস্কারকদের 'সমষ্টিমুক্তি'র অভিযান। লোকের মন হইতে 'ছোট-আমি'-র ভাব (inferiority complex) দূর করা সংস্কারকদের প্রথম কর্তব্য; আত্মশক্তি জাগ্রত করা তাহার দ্বিতীয় কর্তব্য। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল আত্মশক্তি ও আত্মসম্মান জাগ্রত হইলে অন্য সকল-কিছুই লোকে আপনি আবিষ্কার করিবে। ধর্মসংস্কারকরা দেখিলেন যাহাদের আত্মা অসংখ্য মূঢ় সংস্কারে আচ্ছন্ন, বহু শতাব্দীর তথাকথিত শাস্ত্রের শাসনে যাহাদের চিত্ত আড়ষ্ট, উচ্চবর্ণের পীড়নে ও ধনিকের শোষণে যাহারা বিত্তশূন্য সর্বহারা— তাহাদের কাছে কোন্ আধ্যাত্মিক বাণী পৌঁছিবে? সুতরাং তাঁহারা মানুষের এই জড়তা ও মূঢ়তা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন, ধর্ম-সংস্কারকরা সমাজসংস্কারক হইয়া উঠিলেন; ব্যক্তিগত ধর্মসাধনা হইতে সংঘগত জনসেবার মধ্য দিয়াই জনমুক্তির বাণী প্রচার করা তাঁহাদের কাছে আশু ও অবশ্য কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইল। কিন্তু ধর্মের নামে প্রতিক্রিয়াপন্থী প্রগতিবিমুখ অতীত-স্বপ্নবিলাসী নানা আন্দোলন বাংলাসমাজের কালধর্মানুগত সমষ্টিমুক্তির এই স্বাভাবিক প্রয়াসকে এমনি প্রতিহত করিল যে, হিন্দু বাঙালীর একটি অখণ্ড জাতি হইবার সকল আশা নির্মূল হইয়া গেল।

সমষ্টিমুক্তি আন্দোলনের প্রবর্তক ব্রাহ্মসমাজ। অতঃপর স্বামী বিবেকানন্দ বজ্রনির্ঘোষে 'সমষ্টিমুক্তি'র যে বাণী প্রচার করিলেন, স্থিরবুদ্ধিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে তাহা জনসেবারই বাণী, জনমুক্তির নহে। কারণ আধ্যাত্মিক সামাজিক আর্থিক ও রাজনৈতিক মুক্তি ছাড়া যথার্থ জনমুক্তি হয় না। সন্ন্যাসীরা সেবার জন্য যতটা উদ্‌গ্রীব, সংস্কারের জন্য ততটা নহেন। সেইজন্য সেবাধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী প্রচার করিয়াও তাঁহারা সমাজের কোনোপ্রকার 'কুসংস্কার' দূর করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন না। অদ্বৈতদর্শনে পাপও নাই, সংস্কারের 'সু' 'কু'ও নাই; সুতরাং সংস্কারপ্রয়াস নিরর্থক। এ ছাড়া মানুষ যে বিভিন্ন বর্ণমধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহা তো তাহাদের ব্যক্তিবিশেষের কর্মফলপ্রসূত, সুতরাং প্রাক্তনের সহিত যুক্ত। যাহা পূর্বজন্মার্জিত তাহার সংস্কার সম্ভবে না; অতএব দরিদ্র নরনারায়ণের সেবারই প্রয়োজন— সংস্কারের নহে। সেবার দ্বারা সেবিতের দুঃখমোচন ও সেবকের পুণ্য-অর্জন হয়।

কিন্তু সেবাধর্ম (relief) আমাদের মতে, এক হিসাবে নঞাত্মক বা অভাবাত্মক কর্ম। কারণ যাহাকে সেবা করা হয় তাহার চিত্ত সেবার দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয় না। সাময়িকভাবে সে বস্তুগত সাহায্য লাভ করিয়া সাময়িকভাবেই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পায় মাত্র, সমস্ত বিষয়টা একটা স্থূল বাস্তবজগতেই (physical plane) থাকিয়া যায়।

সংস্কারকর্মে (reform) সেবিতের চিত্তকে স্পর্শ করা যায়, বাহিরের সহিত তুলনা দ্বারা তাহার আত্মোন্নতির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করাও সম্ভব। ইহার প্রেরণা বাহিরের, ইহার ফল বাহ্যত প্রকাশ পায়, এবং সাময়িকভাবে তাহা কার্যকরও হয়। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার ক্ষীণ বাণী মানুষের মনে democracyর চেতনা আনে বটে,.কিন্তু সে বাণী দুর্বল সংস্কারের মূর্তি মাত্র— যথার্থ বিপ্লবের (revolution) রূপ গ্রহণ করিতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথও সমষ্টির মুক্তি চাহিয়াছিলেন, তবে তাহা সেবাপন্থীদের হৃদয়ালুতার পথ বাহিয়া বা সংস্কারকদের শুষ্ক কর্তব্যবোধের পথ ধরিয়া চলে নাই। তিনি মানুষের অন্তরনিহিত পরমশক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তাহার আত্মসম্মানের ও আত্মশক্তির চেতনা-সম্পাদন করিতে চাহিয়াছিলেন। নিজের সেবায়, নিজের সংস্কারে, নিজের শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে— ইহাই হইল কবির বাণী। সেইজন্য কবি সমাজসংস্কার করিতে নামেন নাই, আর্তের ত্রাণের জন্য সমিতি স্থাপন করেন নাই, তিনি সমগ্র মানুষটিকে জাগ্রত করিবার জন্য যে বাণী প্রচার করেন ও কর্মে প্রবৃত্ত হন তাহা হইতেছে পরিপূর্ণ মানবতার ধর্ম— লৌকিক ধর্মমত ও ধর্মজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা নহে। কর্মের দিক হইতে রবীন্দ্রনাথের বাণীকে সংগঠনের reconstructionএর বাণী বলা যাইতে পারে—reformation নহে, re-orientationও নহে। রবীন্দ্রনাথ জীবনশিল্পী বলিয়া মানুষের প্রতি তাঁহার এই দৃষ্টি। বিংশ শতকের প্রারম্ভে রচিত রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য কাব্যের বাণী সমগ্র মানবাত্মার মুক্তির বার্তা, 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির' তাহার মূল মন্ত্র। সমগ্র মানবাত্মাকে জাগাইবার এ বাণী।

সংগঠনের বার্তাই মানুষকে যথার্থভাবে মনুষ্যপদবাচ্য করে। নিপীড়িত বঞ্চিত সর্বহারাদের মধ্যে আর্থিক ও আত্মিক উন্নতির প্রচেষ্টা যুগপৎ দেখা দিলে তাহারা আর বাহিরের সেবার প্রত্যাশী হয় না; আত্মসম্মান জাগ্রত ও আত্মশক্তি উদ্‌বুদ্ধ হইলে মুক্তির জন্য বাহিরের সাহায্য গ্রহণও নিরর্থক হয়। সেবার বাণী মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের দ্বারা প্রচারিত হয়, সংস্কারের মন্ত্র আসে ফরাসী বিপ্লবের পথ বাহিয়া। এই সংস্কারের মনোভাব উনবিংশ শতকের নানা শ্রেণীর ভাবুকের মধ্যে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সংস্কারস্পৃহা হিন্দুসমাজের নানা বর্ণের মধ্যে নানাভাবে দেখা দিলে উচ্চ বর্ণ (privileged castes) তাহাদের যুগযুগান্তব্যাপী একাধিপত্য ধ্বংস হইবার সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল, যেমন আজ মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানের দল (privileged class) সাম্যবাদের আবির্ভাবে ভীত ও ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

তাই দেখি নবহিন্দুত্বের ব্যাখ্যাতারা পরম্পরাগত সমাজসংস্থিতিকে আঘাত করিতে উৎসাহী হইলেন না;

সংস্কারকদের উপর সকলের মনোভাবই সমান বিরুদ্ধ। কি ক্যাথলিক-বৈদান্তিক ব্রহ্মবান্ধব,[১] কি গুরুবাদী-বৈদান্তিক বিবেকানন্দ— কেহই সমাজের পুনর্গঠনবাদীদের উপর কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিতে কার্পণ্য করেন নাই। তদুপরি এই সময়ে হিন্দুসভ্যতা একশ্রেণীর বৈদেশিকদের শ্রদ্ধা পাওয়াতে প্রতিক্রিয়াটা উদগ্র হইয়া উঠিল, ফলে সংস্কারকদের দুর্বল সংস্কারচেষ্টাকে দাম্ভিকতা বলিয়া ভাবিবার সাহস হিন্দুসমাজের মধ্যে জাগিল।[২] প্রেমভক্তি ও বৈদান্তিকতার প্রতীকস্বরূপ রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে তাঁহাদের দলে পাইয়া তাঁহাদের অভ্রান্ততাবোধ বিশেষভাবে বর্ধিত হইল। জনমুক্তির নামে ব্রাহ্মসমাজ যে মূলত সমাজবিপ্লব চাহিয়াছিল, এইভাবে তাহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল।

রবীন্দ্রনাথ উপরিউক্ত দলের মধ্যে নহেন সত্য, কিন্তু তিনি ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারবিরোধী মনোভাবের উত্তরাধিকারী। সমসাময়িক সাহিত্যে ব্রহ্মবান্ধব রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথ যেসব প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন ও নানা বক্তৃতায় ও উপদেশে বিবেকানন্দ যে মত প্রচার করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে কেবল হিন্দুত্বের জয় উচ্চারণ করিবার আত্মাভিমানই প্রবল ছিল না, হিন্দুসমাজকে রাষ্ট্রীয় জীবনের সুষ্ঠু সমগ্রতার মধ্যে দেখিবার প্রেরণাও ছিল প্রচুর। বলা বাহুল্য, হিন্দু জাতীয়তাবোধের উদ্‌বোধক ও প্রচারকদের প্রচেষ্টায় ইংরেজিশিক্ষিত সমাজ আত্মসম্মান ও আত্মশক্তি অর্জনে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সমাজের অসংখ্য মূঢ় মুখে ভাষাদান বা অন্তরে শক্তিদান করিতে পারে নাই। আজ অর্ধশতাব্দী পরে যখন সেই বর্ণাশ্রম-আন্দোলনের ফলাফল সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিতে বসি, তখন হিন্দুসমাজের যে বাস্তব দৃশ্য ফুটিয়া উঠে তাহাতে বর্ণাশ্রম ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোনোই সম্ভাবনা খুঁজিয়া পাই না, তপোবনও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই ভাবুকের দল চাহিয়াছিলেন re-orientation of nationalism with Hindu bias অথবা re-orientation of Hinduism with national bias। জাতীয়তাবোধ ধর্মকে অথবা ধর্ম জাতীয়তাবোধকে আশ্রয় করিলে তাহার পরিণাম কি হইতে পারে তাহা অধুনাতন ভারত-ইতিহাসে সুস্পষ্ট।

আমাদের আলোচ্যপর্বে রবীন্দ্রনাথ নৈবেদ্য ইত্যাদির গ্রন্থের মধ্য দিয়া ভারতের সাধনার বাণী প্রচারে নিরত। স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার নবীন সন্ন্যাসী সম্প্রদায় যে বাণী প্রচার করিতেছিলেন তাহা এই ভারতেরই সাধনার বাণী। 'উদ্বোধন' পত্রিকার ভূমিকায় (১৩০৬) বিবেকানন্দ যে আদর্শের ব্যাখ্যা করিলেন তাহা তেজোদৃপ্ত আশাপ্রদ বীর-বাণী। রামকৃষ্ণ পরমহংসের আধ্যাত্মিকতা ও বিবেকানন্দের স্বাদেশিকতা হিন্দুসমাজের চিত্তকে নূতন আশায় নব প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ করিল। হিন্দুরা স্বধর্মকে পাইল পরমহংসদেবের সাধনার মধ্যে ও স্বদেশকে পাইল বিবেকানন্দের শৌর্যের মধ্যে। ব্রাহ্মসমাজ এতাবৎকাল যাহা-কিছু প্রচার করিয়াছিল তাহা আজ শিক্ষিত হিন্দুর কাছে সম্পূর্ণ ব্যর্থ মনে হইতেছে। এমন-কি সমাজসংস্কারের প্রচেষ্টা তাহাদের কাছে নিষ্প্রয়োজন; কারণ নব্য হিন্দু সাধকদের দ্বারা হিন্দু সমাজে সমস্তই তো স্বীকৃত, সমস্তই তো সমন্বিত, তাঁহারা তো কাহাকেও কিছু বর্জন করিতে বলেন নাই। হিন্দুরা শুনিল যে সনাতনীপথ ত্যাগের প্রয়োজন নাই; তথাকথিত বৈদান্তিকতার সহিত প্রতিমা-প্রতীকাদির পূজা বিরুদ্ধ নহে। আধুনিক যুগের জাতিভেদ নিন্দিত হইল বটে, কিন্তু প্রাচীন বর্ণাশ্রমধর্মের জয়গানে শেষ পর্যন্ত জাতিভেদই টিকিয়া গেল। মুখে বর্ণাশ্রমের জয়গান করিয়া কার্যত সকলেই পরস্পরের বৃত্তি অপহরণের জন্য প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত থাকিল। নিরাকার ঈশ্বর ধ্যানের জন্য মনের যে কঠোর শিক্ষা ও সংযমের প্রয়োজন, নূতন ধর্মশিক্ষায় তাহা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে হইল। ধর্মের ক্ষেত্রে অধিকারীভেদের সূক্ষ্মতত্ত্ব কেবল হিন্দুদের জন্যই বিশেষ প্রয়োজন; অন্য ধর্মে ঈশ্বরলাভের জন্য অধিকারীভেদ ও স্তরভেদের যে ব্যবস্থা নাই তাহা কেবল ঐসব ধর্মের প্রবর্তকদের সূক্ষ্মদৃষ্টির অভাবপরিচায়ক! জাতিভেদ দূর করিতে হইলে সংসারজীবনে যেসব সুখসুবিধা ও অধিকার ত্যাগ করিতে হয় তাহা এই নূতন শিক্ষায় গৃহীর পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। স্বামীজীকর্তৃক ছুঁৎমার্গের কঠোর নিন্দা হওয়া সত্ত্বেও ইহার বিরুদ্ধে

১ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, তিন শত্রু, বঙ্গদর্শন ১৩০৮ শ্রাবণ। ২ কাজী আবদুল ওদুদ, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ, পৃ ৩১।

কোনোদিন কোনো দেশব্যাপী আন্দোলন হয় নাই। উচ্চনীচ বর্ণের ভেদ সমাজজীবনে স্বীকৃত ও অনুসৃত হইয়াই চলিল; জাতিভেদ না-মানা কেবল মঠাশ্রয়ী সন্ন্যাসীর পক্ষে আবশ্যিক। তাঁহাদের মতে তীর্থস্থানে ও উৎসবমণ্ডপে সহভোজনই জাতিভেদসমস্যাকে লঘু করিয়া আনিয়াছে। রক্তের সহিত রক্তের যোগ না হইলে, মস্তকের সহিত পদের অঙ্গুষ্ঠ পর্যন্ত রক্তচলাচল সহজ ও স্বাভাবিক না হইলে একজাতি বা 'নেশন' গঠিত হয় না, বহু জাতির শিথিল সমবায়মাত্র হইতে পারে, federation of castes হইতে পারে, কিন্তু তাহা নেশন বা মহাজাতি গঠনের পরিপন্থী। এ কথা মানিয়া লইবার সাহস দেখা দিল না।

ভারতের ধর্মসাধনায় গুরুবাদ ও অবতারবাদ নূতন নহে; সুতরাং নূতন ধর্মসাধকদের এই দুইটি মতবাদ বুঝিতে সাধারণ লোকের সময় লাগিল না। হিন্দুসমাজের সকল অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠান আচারপদ্ধতি যথাযথভাবে বজায় রাখিয়া নবীন সন্ন্যাসীদল এমন সুনিপুণভাবে সমন্বয় ধর্মমত প্রচার করিলেন যে, প্রাকৃত লোকে মুগ্ধচিত্তে তাহা নব আবিষ্কাররূপে ও হিন্দুভারতের সকল ব্যাধির ও অকল্যাণের প্রতিকার ও প্রতিষেধক জ্ঞানে আশ্চর্য হইয়া গ্রহণ করিল। ব্রাহ্মসমাজ যে নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা -প্রবর্তনার প্রচেষ্টা করিতেছিল, সাধারণ লোকের মধ্যে উহাকে অহিন্দু বলিবার ধৃষ্টতা একদিন দেখা দিল; নব্য হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মদের সংস্কারপ্রয়াসকে পাশ্চাত্য তথা খ্রীষ্টানী সমাজের অনুকরণ মাত্র বলিয়া ঐ প্রগতি-আন্দোলন হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল।[১]

আমাদের আলোচ্যপর্বে রবীন্দ্রনাথও ভারতের ঐক্যমন্ত্র সন্ধানে নিরত; তবে তিনি কবি, তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী ধর্মপ্রচারক সংঘস্রষ্টা বা সম্প্রদায়ের গুরুদের হইতে পৃথক হইবেই। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনে ঈশ্বরের বিশ্বাস অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। তিনি যেখানে ধর্মোপদেষ্টা, সেখানে তাঁহার ঈশ্বরতত্ত্ব ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মবাদীর সহজজ্ঞান হইতে তিনি ভারতের ঐক্যসন্ধানী, 'নৈবেদ্য' তাহারই কাব্যময় প্রকাশ। কয়েক বৎসর চৈতালি, কল্পনা, কথা, কাহিনীর মধ্য দিয়া স্বদেশের যে মূর্তিটি তাঁহার কবিমানসে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা ক্রমশই ধর্মবিশ্বাসের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত হইয়া নৈবেদ্যে রূপ লয়। এই নব ধর্মে দেশ ও দেবতা মিলিত হইয়াছে।

কাব্যের মধ্য দিয়া যে মহৎ বাণী প্রচারিত হইল, লৌকিক ত্যাগাদর্শের সমারোহে কবিজীবনে তাহা প্রকাশ পায় নাই। তাহার প্রধান কারণ রবীন্দ্রনাথ কবি ও জীবনশিল্পী। শিল্পীরূপে সংসারকে পরিপূর্ণভাবে ভোগই ছিল তাঁহার আদর্শ— বৈরাগ্যসাধন নহে, জগৎকে মায়া বলিয়া জীবনকে বঞ্চনা নহে। রবীন্দ্রনাথ গুরুও নহেন, গুরুর শিষ্যও নহেন; তাঁহার আদর্শ ধর্মপ্রচারও নহে, সন্ন্যাসও নহে, বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি বিদগ্ধজনোচিত যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা রক্ষাই হইতেছে এই জীবনশিল্পী কবির আদর্শ। কবি আদর্শের দ্রষ্টা, ভাষায় প্রকাশ তাঁহার ধর্ম: সন্ন্যাসের শুষ্ক আধ্যাত্মিকতা তাঁহার আর্টিস্টচিত্তকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে পারে নাই; জগৎকে নঞাত্মকভাবে দেখিতে তাঁহার রসবিমুগ্ধ মন পীড়িত হইত। কবি সুন্দরের পূজারী; যে-জীবন কাব্যে ও নীতিতে, শক্তিতে ও সৌন্দর্যে, কর্মে ও ধ্যানে, স্বাধীনতায় ও একনিষ্ঠত্বে পরিপূর্ণ— সেই সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনই তাঁহার কাম্য। ইহাই কবির ধর্ম।

১ স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুসমাজের কোনো আচার-অনুষ্ঠান পালন সম্বন্ধে নিষ্ঠার অভাব দেখিলে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন; সন্ন্যাসীরা যাহাতে ঐসমস্ত মানিয়া চলেন, তদ্‌বিষয়ে তিনি উপদেশ দিতেন।

Though the Swami was bold in his attack on the stronghold of modern orthodoxy, he was not usually an advocate of drastic reforms of a destructive nature. He was always in favour of reforms which were constructive through growth from within and in conformity with the *shastras*...The Swami would even have the time-honoured religious institutions and ceremonies strictly observed by the order.—*Life of Swami Vivekananda*. Vol II, p 66

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ সমসাময়িক; উভয়ের জন্ম কলিকাতায়—সিমলা ও জোড়াসাঁকো, শহরের এ-পাড়া ও-পাড়া, এক মাইলের মধ্যে। কিন্তু দুইজনের দুই জগতে বাস। তাই সমসাময়িক হইয়াও তাঁহারা সমান্তরাল রেখায় চলিয়াছিলেন, জীবনে কাহারও সহিত কাহারও ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ হয় নাই। বয়সে রবীন্দ্রনাথ নরেন্দ্রনাথ হইতে বৎসর দেড়েকের বড়। নরেন্দ্রনাথ যখন কলেজে পড়েন, তখন তিনি ব্রাহ্মসমাজের একজন উৎসাহী যুবক সদস্য, সুকণ্ঠের জন্য সকলের প্রিয়। তাঁহার ধর্মপিপাসু মন যে কারণেই হউক ব্রাহ্মসমাজের সাধনপ্রণালীতে তৃপ্ত হয় নাই। তাঁহার বয়স যখন একুশ বৎসর মাত্র, সেই সময়ে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের সংস্পর্শে আসেন ও তাঁহার তিরোভাবের পূর্বে তিনি 'বিবেকানন্দ' নাম গ্রহণ করেন (১৮৮৪)।[১] তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স চব্বিশ বৎসর, 'বালক' পত্রিকা পরিচালনা করিতেছেন, 'কড়ি ও কোমল' লিখিতেছেন, আলসে বিলাসে, ভাব-উচ্ছ্বাসে, সৌন্দর্যচর্চায় দিন যায়।

পরমহংসদেবের মৃত্যুর পর ১৮৮৬ হইতে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘকাল বিবেকানন্দ সন্ন্যাসীবেশে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন। অবশেষে খেতরির মহারাজা ও দক্ষিণভারতের কয়েকজন ভক্তের উৎসাহে ও উদ্‌যোগে তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান করিবার জন্য যাত্রা করেন। ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর (১৩০০ আশ্বিন) মাসে তিনি মহাসভায় যে বক্তৃতা করেন তাহা শিক্ষিত ভারতীয় মাত্রেরই নিকট সুপরিচিত। ইহার পর আমেরিকা ও য়ুরোপ ভ্রমণ করিয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিলেন। এই প্রত্যাবর্তনের পর কলিকাতায় যে বিপুল সংবর্ধনা হয় (২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬) তাহা ইতিপূর্বে কখনো কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। হিন্দুভারত এতদিন পরে যেন পশ্চিমের নিকট তাহার ধর্মবিজয় ঘোষণা করিয়া আসিল। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন।[২]

১৮৯৭ সালের মে মাসে স্বামীজি উত্তরভারত ভ্রমণে বাহির হন ও ১৮৯৮ জানুয়ারিতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। অত:পর মঠস্থাপন সন্ন্যাসী-সংগঠন প্রভৃতি ব্যবস্থায় কয়েক মাস অতিবাহিত করিয়া পুনরায় কাশ্মীর অমরনাথ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শনে যান। এইবার ফিরিয়া আসিয়া বেলুড়-মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর ১৮৯৯ (২০ জুন) সালে পুনরায় আমেরিকা ও য়ুরোপ ভ্রমণে বহির্গত হন। পর বৎসর দেশে ফিরিয়া আসেন (৯ ডিসেম্বর ১৯০০)। এইবার ইংলণ্ড বাসকালে তাঁহার সহিত জগদীশচন্দ্র বসুর পরিচয় হয়; ভগিনী নিবেদিতার সহিত বসুদম্পতির যে ঘনিষ্ঠতা হয় তাহার সূত্রপাত এই সময়ে।

দেশে ফিরিবার পর স্বামীজি মাত্র দেড় বৎসর জীবিত ছিলেন; ১৩০৯ সালের আষাঢ় মাসে (৪ জুলাই ১৯০২) তাঁহার মর্ত্যলীলার অবসান হয়। সেই সময়ে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে, বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় বর্ষ চলিতেছে, চোখের বালি উপন্যাস ধারাবাহিক প্রকাশিত হইতেছে; হিন্দুত্ব সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ লিখিয়া বাংলার নূতন পরিস্থিতিকে নূতনভাবে দেখিবার চেষ্টা করিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ সমসাময়িক হইলেও উভয়েই পরস্পর সম্বন্ধে আশ্চর্যভাবে উদাসীন। একের সমসাময়িক রচনার মধ্যে অন্যের উল্লেখ নাই। অথচ উভয় ভাবুকই প্রাচীনভারতের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব, উভয়েই আধুনিক ভারতের গৌরবমুকুটমণি।

১ বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ সম্বন্ধে একটি জনশ্রুতি আছে; কেশবচন্দ্রের 'নববৃন্দাবন' নাটকে বিবেক ও বৈরাগ্য নামে দুইটি চরিত্র আছে। নরেন্দ্রনাথ ও মনোরথধন দে নামে দুইটি বালককে সুকণ্ঠের জন্য বিবেক ও বৈরাগ্যের পার্ট দেওয়া হয়; নরেন্দ্রনাথ বিবেকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই স্মৃতি হইতে নরেন্দ্রনাথ 'বিবেকানন্দ' নাম লইয়াছিলেন।

২ এই সংবর্ধনা-সভায় উপস্থিতির কথা রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅমল হোমকে বলিয়াছিলেন।

বিবেকানন্দ পশ্চিমের নিকট হিন্দুভারতের আদর্শকে সর্বপ্রথম যথার্থ গুরুর ন্যায় প্রচার করিয়া আসিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে তাঁহার মনীষাবলে যশোলাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি য়ুরোপের কাছে য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত আধ্যাত্মিক মতবাদ ব্যক্ত করিয়াছিলেন; তাঁহার বাগ্মিতায় তাহারা মুগ্ধ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাঁহাকে গুরুর আসন দান করে নাই; তা ছাড়া দেশটাও ইংলণ্ড। তাঁহার প্রতিপত্তি পশ্চিমে স্থায়ী ফল দর্শায় নাই। বিবেকানন্দের ধর্মবিজয় সমসাময়িক ভারতের চিত্তকে এমন আশ্চর্যভাবে মথিত করিয়াছিল, অথচ রবীন্দ্রনাথের সমকালীন রচনায় খুব কমই উল্লেখ পাওয়া যায়। স্বামীজির মৃত্যুর প্রায় ছয় বৎসর পর[১] একটি সভায় কবি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃতির যোগ্য: "অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।"

ইহার বিশ বৎসর পরে কবি এক পত্রে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে লেখেন (৯ এপ্রিল ১৯২৮) "আধুনিক কালে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোনো আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন তোমাদের সকলের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি, দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটি যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েচে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্র ত্যাগে ফলেছে। তাঁর বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েচে, তখনি শক্তি দিয়েচে। সেই শক্তির পথ কেবল একঝোঁকা নয়, তা কোনো দৈহিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্যবসিত নয়, তা মানুষের প্রাণমনকে বিচিত্রভাবে প্রাণবান করেছে। বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যেসব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে আঙুলকে নয়।"[২]

বহু বৎসর পরে ১৯৩৭ সালে রামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উৎসবের সময় কবিকে 'ধর্মমহাসভা'র সভাপতিরূপে ভাষণ দান করিতে দেখি। কিন্তু ইহা তাঁহার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ছিল কি না বলা কঠিন। মোটকথা পরমহংস বা বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক উক্তি খুব কমই পাওয়া যায়।

বিবেকানন্দের রচনার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখ পর্যন্ত পাই না, অথচ বহু সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মতামত বিষয়ে উভয়ের আশ্চর্য ঐক্য দেখা যায়। যে 'আর্যামি'কে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন, বিবেকানন্দ কোনো দিন তাহাকে প্রশ্রয় দেন নাই, কঠোর ভাষায় আর্যামিকে বিদ্রূপ করিয়াছেন[৩]।

অত্যাচারীর হাত হইতে দুর্বলকে রক্ষা করিবার কথা রবীন্দ্রনাথ বহু প্রবন্ধে বলিয়াছেন; বিবেকানন্দের রচনায় সেই বাণী বহুগুণ ওজস্বিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ কেহই হিন্দুজাতির নির্জীবতাকে ও নির্বীর্যতাকে আধ্যাত্মিক সহনশীলতা বলিয়া প্রশংসা করেন নাই। উভয়েই জাতিকে তেজস্বী ও রজোগুণসম্পন্ন হইবার জন্য বারে বারে বলিয়াছেন। স্বাদেশিকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের রচনা পাঠ করিলে তাঁহাদের মতের পার্থক্য অকস্মাৎ আবিষ্কার করা কঠিন; কারণ দেশের উন্নতিকামনা ছিল তাঁহাদের চিন্তার পুরোভাগে। কিন্তু আসল অমিল ছিল ধর্মাদর্শে ও জীবনদর্শনে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্মবিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ তথা ব্রাহ্মসমাজের ধর্মবিশ্বাস হইতে এত পৃথক যে কাহারও পক্ষে

১ পূর্ব ও পশ্চিম, প্রবাসী ১৩১৫, ভাদ্র পৃ. ২৮৮-৯৬। দ্র. সমাজ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২শ পৃ ২৬১। ৩ ভাববার কথা, পৃ ৫০-৫১।

২ রবীন্দ্র-জীবনী, ৪র্থ খণ্ড, সংযোজন. পৃ. ২৭২-৭৩। প্রবাসী ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ২৮৫-৮৬

কাহারও মতের সমর্থন আশা করা যায় না। পূর্বে বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনায় ঔপনিষদ ব্রহ্মবাদ ও বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদ তথা মরমিয়াবাদ আশ্চর্যরূপে সমন্বিত হইয়াছিল। এখানে আর-একটি কথা স্পষ্ট করা উচিত। রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজস্ব; সাধারণ-জ্ঞান-লাভে তিনি যেমন নিজের পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন, ধর্মসাধনা ব্যাপারেও তেমনি তিনি কোনো প্রণালী বা ধারাকে অনুসরণ করেন নাই। বিচিত্র ক্ষেত্রে তাঁহার উগ্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য যেমন প্রকাশ পাইয়াছে, ধর্মসাধনায়ও তেমনি। ব্যক্তিগত অনুভূতি ও যুক্তিযুক্ত সহজজ্ঞানের উপর তিনি জোর দিতেন, গুরু শাস্ত্র প্রভৃতিতে তাঁহার প্রয়োজন ছিল না। এমনকি তিনি কোনো পরম্পরাগত সাধনপ্রণালীও অনুসরণ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ গুরুবরণ করেন নাই বলিয়া, ধর্মদেশনায় তাঁহার অধিকার নাই এ কথা এককালে সমসাময়িক সাহিত্যে আলোচিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও কখনো গুরুর পদ গ্রহণ করেন নাই, এবং কখনো গুরুবরণও করেন নাই; সেইজন্য তাঁহার পক্ষে গুরু বা অবতারবাদ সমর্থী ধর্মমতকে সমর্থন করা অসম্ভব ছিল।

রবীন্দ্রনাথ ধর্মবিষয়ে কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে শেষ পর্যন্ত আবদ্ধ থাকেন নাই এবং কোনোদিন সম্প্রদায় গঠন করিতেও চেষ্টা করেন নাই। কারণ সম্প্রদায় গঠন করিতে হইলে অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট মতবাদের প্রভুত্ব প্রয়োজন। যে-মত প্রচণ্ডভাবে গতিশীল (dynamic), যে-মত আদি অন্ত্যে কড়ায়গণ্ডায়-হরণেপূরণে সমান নহে, যে মত জীবনের অভিজ্ঞতা ও অন্তরের প্রসরণের সহিত প্রশস্ত হইয়া আগাইয়া চলে, সে-মতের দ্বারা সাধারণ মানুষকে দলে টানা যায় না। রবীন্দ্রনাথের সদা-চলমান মনের পরিণতি সাধারণ লোকের কাছে মতের পরিবর্তন বলিয়া প্রতিভাত হইত। পরিবর্তন হয় আকস্মিকভাবে, তাই তাহার মধ্যে ক্রম বা যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না— অবচেতনের স্তরে হয়তো থাকিতে পারে, তবে সাধারণের কাছে তাহা অজ্ঞাত। রবীন্দ্রনাথের জীবনধারায় মতের যে পরিবর্তন বা মনেরযে পরিণতি দেখা যায় তাহা যেন নদীর স্রোতের মত। গঙ্গোত্রী ও সাগরসংগমের মধ্যে নদীবক্ষে যেমন অসংখ্য ধারার মিলন হইয়াছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে অসংখ্য ভাবস্রোত ও সংস্কৃতির ধারা আসিয়া মিলিত হইয়া উহাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে; সাধারণ লোকের কাছে ইহা পরিবর্তন, কিন্তু যথার্থত ইহা অনিবার্য পরিণতি। এই গতিশীল মনের চারিপাশে মানুষের মন দানা বাঁধে না বা সম্প্রদায় গড়ে না।

ইহার উপর, রবীন্দ্রনাথ দলগঠন বা সম্প্রদায়সৃষ্টি করিবার বিরোধী মনোভাবও পোষণ করিতেন। সেইজন্য দেখা যায় কবির উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নিকট অন্য ব্যক্তি নিজ ব্যক্তিত্ব বিসর্জন না দিয়াও থাকিতে পারিয়াছে। সম্পূর্ণ ভিন্ন মত ও বিশ্বাস, এমনকি বিরুদ্ধ মত পোষণ করিয়াও বহুলোক শান্তিনিকেতনে বাস করিয়া গিয়াছেন, যাহা ঐ শ্রেণীর অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে সম্ভবপর হইত না। ইহাই শান্তিনিকেতনের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যই বিশ্বভারতীকে বৈচিত্র্য দান করিয়াছে, উহাকে সুন্দর করিয়াছে। বিচিত্র মতের সংস্পর্শে আসিয়া এখানকার মানুষ কালচার্ড বা সমঝদার হইয়াছে, যদিও বিভিন্ন মতের প্রভাবে এখানকার আদর্শ ও কর্ম ব্যাহত হইয়াছে কি না এ প্রশ্ন তোলা যায়। যাহা হউক, দল গঠনের উদ্দেশ্য কাজ করা। বিবেকানন্দ স্বামী যখন বেলুড়মঠ ও শ্রদ্ধানন্দ স্বামী যখন হরিদ্বারে গুরুকুল আশ্রম স্থাপন করেন, তখন তাঁহারা সুনির্দিষ্ট মতবাদী লোকদিগকে আহ্বান ও সমবিশ্বাসী সাধকদিগকে মঠে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেরকম কোনো মতবাদ পোষণ করিতেন না, এমনকি ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ মতবাদের মধ্যেও শেষ পর্যন্ত তিনি আবদ্ধ থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার আশ্রমে চিরদিনই পাঁচমিশালী লোকের আনাগোনা হইয়াছে এবং সেইজন্য একনিষ্ঠ সংঘ গড়ে নাই।

অপরদিকে যাহারা সম্প্রদায়ের গণ্ডির মধ্যে ধরা দেয়, তাহারা নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসরণ করিয়া কাজ করিতে চাহে। মতবাদের প্রতি একান্ত অনুরাগ, নেতা বা গুরুর প্রতি অচলা ভক্তি, তাহাদের আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের অন্যতম সম্বল। ইহাতে কিন্তু দলের কাজ হয় ভালো। বিবেকানন্দ ও শ্রদ্ধানন্দ সেই সম্প্রদায় গঠনে সমর্থ

হইয়াছিলেন। ইহার উপর স্বদেশ ও স্বধর্মের জন্য বিবেকানন্দের অনির্বাণ প্রেমবহ্নি বাংলাদেশের যুবমনকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিল। ত্যাগের জন্য, কর্মের জন্য একদল মানুষ সর্বদাই উন্মুখ, কেবল আহ্বানের জন্য তাহাদের প্রতীক্ষা। তাহারা নেতৃত্ব করিতে চাহে না, তাহারা নেতাকে অনুসরণ বা গুরুকে অনুকরণ করিয়া সার্থকজীবন হইতে চাহে। সেই নির্ভরশীল, নেতা-অনুগামী কর্মপিপাসুরা গভীর আন্তরিকতা লইয়া এই নবীন সন্ন্যাসীর পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যাহারা 'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য' বলিয়া অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই বিবেকানন্দের বাণীর দ্বারা উদ্দীপ্ত; আবার একদল রবীন্দ্রনাথের দ্বারা উদ্‌বোধিত হইয়া বলিয়াছিল,

এবার চলিনু তবে,
সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ সম্প্রদায় বা দল গঠনে যে সমর্থ হন নাই তাহার কারণ তাঁহার চরিত্রের মধ্যেই ছিল। মানুষকে পরম আত্মীয় করিবার জন্য যে পরিমাণে হৃদয়াবেগ থাকা নিতান্ত প্রয়োজন, কবির মধ্যে তাহা সেই পরিমাণে ছিল না। একটা জায়গা পর্যন্ত তিনি মানুষকে কাছে টানিতে পারিতেন, সেটি সম্পূর্ণ বুদ্ধি ও বিচারের ক্ষেত্রে। তাঁহার সঙ্গে কেহ আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তৃপ্ত হইতে পারিত না। কবির এই কঠোর নৈর্ব্যক্তিক মানবপ্রীতির জন্য তাঁহার অন্তরে কেহ স্থায়ী বাসা বাঁধিতে পারে নাই, যাহাদের কথা সাহিত্যে বারে বারে ব্যক্ত হইয়াছে তাহারা তখন আইডিয়া মাত্র। ইহাতেই ছিল কবির মুক্তি, ইহাই ছিল তাঁহার সাধনা। অন্তরের মধ্যে তিনি কেবল অভিজাত ছিলেন তাহা নহে, তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ। এইরূপ চরিত্রের মানুষ দল বা সম্প্রদায় গঠন করিতে পারেন না, এমনকি তাঁহার পক্ষে সংঘ-সৃষ্টিও কঠিন হয়।

বিংশ শতকের প্রারম্ভে ভারতের তিন জন মনীষী ভারতের তিনটি সাধনাকে তিনটি পীঠস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মহাপুরুষ দয়ানন্দ সরস্বতী অমূর্ত দেবতার পূজার জন্য অহিংস যাগযজ্ঞাদির ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। আর্যসমাজের আদর্শ জীবনে সফল করিবার জন্য স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (লালা মুন্সীরাম) হরিদ্বারে গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। বৈদিক সাধনার মধ্যে ভারতের সকল জ্ঞান সকল দর্শন চরম সার্থকতালাভ করিয়াছিল, সেই স্বর্ণময় যুগের সাধনায় সকলকে প্রবৃত্ত করাই এই নবীন আন্দোলনের মূলগত অভিপ্রায়।

রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদ ও বর্ণাশ্রমকে ভারতীয় চিত্তের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; উপনিষদের সাধনার মধ্যে সর্বসাধনার মিলন হইতে পারে। তজ্জন্য তিনি শান্তিনিকেতনে যে বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, তাহা তপোবন ও ব্রহ্মচর্যাশ্রম। তিনি কবি, তাই কবিসুলভ সরল কল্পনাবলে মহাকবি কালিদাসের ন্যায় তপোবনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। দেশবাসীকে তিনি যে বিদ্যালয়ে আহ্বান করিলেন, তাহা 'বোর্ডিং স্কুল' নহে, তাহা তপোবন, সেখানে ছাত্রেরা মাস্টারের কাছে বিদ্যা শিখিবে না, শিষ্যেরা গুরুর নিকট হইতে জ্ঞান আহরণ করিবে। কালিদাসের তপোবন ও উপনিষদের আরণ্যক আশ্রমের সংমিশ্রণে ব্রহ্মচর্যাশ্রম পরিকল্পিত হইল।

স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকর্মসমন্বিত নিখিল সাধনপ্রণালীকে গ্রহণ করিয়া বেদান্তের উপরই মতবাদের প্রতিষ্ঠা করিলেন। 'যত মত তত পথ' বাক্যটি যদি সত্য হয়, তবে হিন্দুধর্মের সকল কিছুকেই সত্য বলিয়া মানিতে হয়। এই সকল-কিছুকে মানার নাম সিনথিসিস্ বা সমন্বয়। এই ধর্ম-সমন্বয়ের কেন্দ্র হইল বেলুড়মঠ, ইহার কর্মীরা হইলেন সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ভুক্ত।

সংক্ষেপে এই ত্রিবিধ আন্দোলনকে ভারত-ইতিহাসের তিনটি যুগের সাধন-প্রতীক বলা যাইতে পারে। বৈদিক, ঔপনিষদিক ও পৌরাণিক যুগের তিনটি ধারা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ যথাক্রমে প্রচার ও ব্যাখ্যা

করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই বর্ণাশ্রমের সমর্থক, কিন্তু জাতিভেদের বিরোধী। সমাজসংস্কার বিষয়ে আর্যসমাজীরা ছাড়া অপর কেহই উগ্র মত পোষণে সাহসী হন নাই।

এই তিনটি আন্দোলনই হিন্দুধর্মকেন্দ্রিত। ইহারই পাশে চলিতেছিল অনাগারিক ধর্মপালের বৌদ্ধধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন। ধর্মপাল (জ. ১৮৬৪) সিংহলী বৌদ্ধ; তিনি ১৮৯২ সালে কলিকাতায় আসিয়া মহাবোধি সোসাইটি স্থাপন করেন। ১৮৯৩ সালে শিকাগোতে যে ধর্ম-মহাসম্মেলন হয়, তাহাতে এই তরুণ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপস্থিত হইয়াছিলেন। তদবধি তিনি পৃথিবীর নানাস্থানে ও বিশেষভাবে বাংলাদেশে বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন; এই ধারাটিকে নূতন যুগের সন্ধিক্ষণেই দেখা গিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ বহুকাল হইতে সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থের উপাখ্যানাদি অবলম্বনে অনেক কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন; এই নব বৌদ্ধ আন্দোলন এই যুগ-সন্ধিক্ষণের অব্যবহিত পরেই তাঁহার জীবনদর্শন রচনায় বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল, তাহা আমরা কবির জীবনচরিত আলোচনাকালে জানিতে পারিব।

রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত কোনো গণ্ডিবদ্ধ ধর্মমতের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে না পারায় তাঁহার প্রতিষ্ঠানও তাঁহার সহিত সর্বদাই আগাইয়া চলিয়াছিল। জাতিপ্রেমের ক্ষুদ্র পরিবেষ্টনী তাঁহাকে মোহাচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। তিনি ধীরে ধীরে সকল দেশের স্বাদেশিকতা ও সকল ধর্মের সাম্প্রদায়িকতা ত্যাগ করিয়া যে বিশ্বমানবতা প্রচার করিলেন, পরে তাহার নামকরণ হয় 'মানুষের ধর্ম' বা Religion of man।

নৈবেদ্য

ক্ষণিকা প্রকাশিত হইবার (১৩০৭ শ্রাবণ) অনতিকালের মধ্যে 'নৈবেদ্য' রচিত হইতে আরম্ভ হয়। ক্ষণিকার আপাত-লঘু কবিতাগুচ্ছ কবির রসবিদগ্ধ জীবনের অনুভূতিকে একটি সমে আনিয়া উত্তীর্ণ করিয়াছিল। ক্ষণিকা হইতে নৈবেদ্যর ব্যবধানকে আপাতদৃষ্টিতে যতটা আকস্মিক ও সুদূর বলিয়া মনে হয়, সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে সেরূপ হইবে না। ক্ষণিকায় কবি জীবনদেবতার নিকট যৌবনের শেষ অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিলেন, আর এখন জীবননাথের জন্য নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া উপস্থিত। পারিবারিক শিক্ষা ও ধর্মগত সংস্কারের ফলে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ঈশ্বরবিশ্বাস ও ভগবদ্‌ভক্তি অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল; নৈবেদ্য সেই সাধারণ সরল বিশ্বাস-ভক্তি-প্রণোদিত কাব্য। রচনাকালের দিক হইতে বিচার করিলে জানা যায় এই কাব্যখানি চারিমাসের মধ্যে লিখিত (১৩০৭ অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন); সুতরাং চিরকুমার সভা, নষ্টনীড়, চোখের বালির রচনাকালের সমকালীন। নৈবেদ্য পাঠ করিয়া সাধারণ লোকের মনে হইতে পারে, রবীন্দ্রনাথ একটি তুরীয় অবস্থায় উঠিয়া এই 'আধ্যাত্মিক' কবিতাগুলি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু যথার্থত তাহা নহে; সংসারের অসংখ্য কর্তব্যপালনের মধ্যে, প্রতিদিনের সংগ্রাম ও সংশয়, অভাব ও অভিযোগ, বিষয়সম্ভোগ ও বৈষয়িকতার মধ্যে ক্ষুব্ধ বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সংযত ও শান্ত করিয়া ক্ষণে ক্ষণে ব্রহ্মপদে আত্মসমর্পণের যে প্রয়োজন বোধ হয়, তাহাই হইতেছে নৈবেদ্য রচনার প্রেরণা। এই পর্বে তিনি জগদীশচন্দ্রের অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা লইয়া বিব্রত, কলিকাতায় বিসর্জন, গোড়ায় গলদ প্রভৃতি নাটক অভিনয়ের জন্য উদ্‌বিগ্ন, শিলাইদহে বন্ধুবান্ধব অতিথি অভ্যাগত আপ্যায়ন কোলাহলে মত্ত—ইহারই মধ্যে প্রতিদিন একটি একটি পুষ্প চয়ন করিয়া নৈবেদ্যের সাজি পূর্ণ করিতেছেন।

কবি তাঁহার বিলাতপ্রবাসী বন্ধু জগদীশচন্দ্র বসুকে (২০ নভেম্বর ১৯০০) লিখিতেছেন যে, তিনি প্রতিদিন একটি করিয়া নৈবেদ্য রচনা করিতেছেন।[১] একমাস পরে কলিকাতা হইতে স্ত্রীকে শিলাইদহে লিখিতেছেন, "আজ সমস্ত সকাল ধরে লোক সমাগম হয়েছিল— ভেবেছিলুম ৭ই পৌষের লেখাটা [ব্রহ্মমন্ত্র] লিখ্‌ব তা আর লিখ্‌তে দিলে না। সকালে নাবার ঘরে দুটো নৈবেদ্য লিখ্‌তে পেরেছিলুম।" ১৫ই ফাল্গুন শিলাইদহ হইতে প্রিয়নাথ সেনকে লিখিতেছেন, "গোলেমালের মধ্যেও ৯০টি নৈবেদ্য লিখেচি।" তাই মনে হয় ফাল্গুন মাসের মধ্যে নৈবেদ্যের শত কবিতা রচিত হইয়া গিয়াছিল। এই কবিতার একটি গুচ্ছ (১২টি) বঙ্গদর্শন নবপর্যায়ের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় (১৩০৮ বৈশাখ)। ঐ বৎসরের আষাঢ় মাসে কাব্যখানি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়; এই কাব্যগ্রন্থ 'পরমপূজ্যপাদ পিতৃদেবের শ্রীচরণকমলেষু' অর্পিত হইল। গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া যাইবার মাসেক কালের মধ্যে কবি জগদীশচন্দ্রকে লিখিতেছেন, (১৩০৮ শ্রাবণ) "নৈবেদ্যকে আমি আমার অন্যান্য বইয়ের মত দেখি না। লোকে যদি বলে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না বা ভাল হয়

১ 'আমি আজকাল নানা গোলমালের মধ্যে "নৈবেদ্য" বলে এক একটি কবিতা প্রত্যহ আমার কোনো এক অবসরে লিখে ফেলে আমার অন্তর্য্যামীকে নিবেদন করে দিই। আমার জীবনের সমস্ত কৃতকর্ম্মের সমস্ত চিন্তিত সংকল্পের সমস্ত দুঃখসুখের কেন্দ্রস্থলে যিনি ধ্রুব নিশ্চলভাবে বিরাজ করচেন··· তাঁর কাছে নির্জ্জনে গোপনে প্রত্যহ জীবনের একটি একটি দিন সমর্পণ করে দিচ্চি। সে দিনগুলিকে যদি কর্ম্মের দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিতে পারতুম তাহলেই ভাল হত কিন্তু অন্তত তাতে পত্রপুটে ফুলের মত একটি করে গান সাজিয়ে আমার জীবনের নদীর ঘাটে সেই সমুদ্রের উদ্দেশ্যে ভাসিয়ে দিয়েও সুখ আছে।' ৫ অগ্রহায়ণ ১৩০৭। চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ পৃ. ১৬-১৭।

নাই তবে তাহাতে আমার হৃদয় স্পর্শ করে না। নৈবেদ্য যাঁহাকে দিয়াছি তিনি যদি উহাকে সার্থক করেন তবে করিবেন— আমি উহা হইতে লোকস্তুতি বা লোকনিন্দার কোন দাবীই রাখি না।"[১]

রবীন্দ্রনাথ নৈবেদ্য সম্বন্ধে লোকস্তুতিনিন্দা গ্রাহ্য করিবেন না ভাবিতেছেন, তাহার একটি কারণ অনুমান করা যাইতে পারে। এতাবৎকাল কবি যাহা লিখিয়াছেন তাহা কাব্য বা কাহিনী, ভাবুকতা ও অনুভাবের (emotion) স্তর হইতে তাহাদের উদ্ভব। সংক্ষেপত বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের মনে এই সময়ে যে বিচিত্র সমস্যা ও প্রশ্ন উদিত হইতেছে, তাহারই আলোড়ন-মথিত ভাবাবেগ নৈবেদ্যে রূপায়িত। কোনো কোনো সনেটে ঈশ্বরের নাম জুড়িয়া দেওয়া অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক লাগে।

এই কবিতাশতকের বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার স্পষ্ট সরলতায়। এমন স্পষ্ট উচ্চভাবের কথা (idea) রবীন্দ্রনাথ অন্য কোনো কাব্যখণ্ডে ইতিপূর্বে বা অতঃপরে প্রকাশ করেন নাই। ইহার ভাবধারা মনকে অল্পতেই দ্রবিত বা উত্তেজিত করে। ইহার অর্থ বুঝিবার জন্য অধিক প্রয়াস করিতে হয় না। রূপক প্রতীক বিবর্জিত স্পষ্টতায় ইহার আবেদন সহজ ও প্রত্যক্ষ। সেইজন্য ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রই এইসব কবিতার দ্বারা সহজে আকৃষ্ট ও পরিতৃপ্ত হন। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাদিতে এইশ্রেণীর রচনার সমাদর সেইজন্যই অধিক। আবার নৈবেদ্যের কিয়দংশ স্বদেশ ও সংকল্প গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে স্থান পাইয়া জাতীয় জীবনের উদ্‌বোধনে সহায় হইয়াছে।

যাহাই হউক, এই অতিস্পষ্টতার জন্য কবিতাগুলি সহজবোধ্য হইয়াছে সত্য, কিন্তু বিশুদ্ধ কাব্যের আদর্শ সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়াছে কি না তাহা সাহিত্যশাস্ত্রীদের বিচার্য। তবে উত্তম কবিতা বলিতে যাহা বুঝায়, এই কবিতাগুচ্ছের মধ্যে সেই গুণাবলী আছে। তাহার কারণ ইহাতে রবীন্দ্রনাথের মনীষার স্পর্শমণি সংযোগে ধর্ম তাহার সাম্প্রদায়িকতা, স্বাদেশিকতা তাহার জাতিপ্রেমের ক্ষুদ্রতা ত্যাগ করিয়াছে।

কবি স্বয়ং বহুকাল পূর্বে 'কাব্য: স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট'[২] শীর্ষক প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা এখানে স্মরণীয়। বিশেষ ধর্মমূলক কবিতা বা জাতীয় সংগীতাদির আবেদন কখনো সর্বদেশকালোপযোগী হইতে পারে না; যে কাব্যের অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট নহে, যাহার ভাষা সহজ হইলেও সরল নহে, যাহার ব্যাখ্যা অসংখ্য রূপ গ্রহণ করিতে পারে, সেই কাব্যকেই কবিচিত্তের মহত্তম প্রকাশ বলিয়া কেহ কেহ নির্দেশ দিয়া থাকেন। অনেক স্থলে দেখা যায়, আজ যাহা অস্পষ্ট ও রহস্যিক বলিয়া নিন্দিত, কাল তাহা ক্রমশই পাঠকশ্রেণীর বিদ্যা বুদ্ধি মনন ও কল্পনাশক্তির বিকাশের সহিত অর্থপূর্ণ বোধগম্য হইতেছে। সেই কাব্যের অনন্ত সৌন্দর্য পাঠক বা শ্রোতার চিত্তে বিচিত্র বর্ণের ইন্দ্রধনু ও বিবিধ রসের কলকল্লোল সৃষ্টি করে, এমনকি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপরীত প্রতিক্রিয়ার অবসর রাখিয়া যায়; এখন প্রশ্ন, নৈবেদ্য কাব্য কি এই বিচিত্রের আহ্বানে সাড়া দেয়।

কবিতা বা সংগীত যখনই কোনো সংস্কারগত ধর্ম বা পরম্পরাগত নীতিবোধের প্রয়োজন সাধন করিতে চেষ্টা করে, তখনই কাব্যশ্রী কুণ্ঠিতা হন। নৈবেদ্যের অনেকগুলি কবিতা আদি ব্রাহ্মসমাজীয় ধর্মমতবাদের প্রভাবে আচ্ছন্ন। মনের যে নৈর্ব্যক্তিক ও নৈর্দ্বন্দ্ব্য অবস্থা হইলে সৌন্দর্যলক্ষ্মী 'রসাতল' হইতে কবিমানসে আত্মপ্রকাশ করেন, এইশ্রেণীর কবিতার মধ্যে সে-রসের সন্ধান মেলে না। ঐসব কবিতার ভাষা মার্জিত, ভাব মহত্ত্বব্যঞ্জক, রচনা ওজোগুণসম্পন্ন। কিন্তু যথার্থ দুঃখের তাপে বা অনুভূতির বেদনায় উহারা কবিচিত্তে মূর্তি গ্রহণ করে নাই; তজ্জন্য বাস্তবতার ঐকান্তিকতা

১ দ্র. প্রবাসী ১৩৩৩ চৈত্র পৃ. ৭৬৬। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত Twentieth Century নামক এক কাগজে নৈবেদ্যের এক সমালোচনা প্রকাশিত হয়। চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ, পৃ. ৩৬: অগস্ট ১৯০১।

২ ভারতী ও বালক, ১২৯৩ চৈত্র। দ্র. সাহিত্য, পৃ. ১৬৯।

ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রেরণায় কতকগুলি অনুভাব ছন্দোময় ওজস্বিতায় নৈবেদ্যের কবিতা-রূপে মুক্তিলাভ করিয়াছে; জ্ঞান মনীষা ও অনুভাবের ত্রিবেণীসংযোগে এই কবিতারাজির জন্ম।

নৈবেদ্য-শ্রেণীর কবিতা বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে রচিত হয় নাই; ধর্মে নিষ্ঠা, নীতিতে শ্রদ্ধা, দেশের প্রতি প্রেম, একেশ্বরে বিশ্বাস এই কাব্য-মধ্যে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মবোধ হইতে এই কাব্যকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। অথচ ধর্মতত্ত্বের দিক হইতে নূতন কথা ইহাতে নাই, অনেকগুলি কথার আভাস তাঁহার পুরাতন কাব্যের মধ্যে পাই। তবে ইহার নূতনত্ব হইতেছে রচনাভঙ্গির বৈশিষ্ট্যে, ওজস্বিতায়; সে দিক হইতে ইহা অতুলনীয়। এই কবিতাগুচ্ছ একাধারে lyric ও gnomic অন্তর্বিষয়ী ও বহির্বিষয়ী। ইহাদের রচনারীতির সহিত একমাত্র দূরতর তুলনা হইতে পারে ইহুদীঋষিদের সামবাণীর (psalms)।[১]

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী বলিয়াছেন, নৈবেদ্য আইডিয়া-প্রধান কাব্য। তখনই প্রশ্ন উঠে সে আইডিয়া কি। সামান্যভাবে বিচার করিলে বলিতে হয়— ঈশ্বরবিশ্বাস, সর্বভূতে ঈশ্বরের মহিমা সন্দর্শন। কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে এবং সম্পূর্ণ নহে। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরবোধের প্রেরণা হইতেছে ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থোদ্ধৃত উপনিষদ; ইহাতেই তিনি ভারতের আধ্যাত্মিক আদর্শের পরিপূর্ণ রূপটি দেখিয়াছিলেন। দেশের মধ্যে বিরোধমূলক আদর্শের সমন্বয়-সাধনের জন্য সেদিন মনীষীরা নানাভাবে ভারতীয় জীবনের ও ধর্মের সমস্যাগুলিকে দেখিতেছিলেন। ছিন্ন ভিন্ন বিচ্ছিন্ন ভারতের মধ্যে কোথাও যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায় কি না— এই প্রশ্নের উত্তরে নৈবেদ্য রচিত।

ভারতের এই বৈচিত্র্যকে একের মধ্যে সমাহিত করিতে হইলে তাহাকে কোনো বৃহত্তর ঐতিহাসিক পটভূমি, মহত্তর আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আহ্বান করিতে হইবে। কোনো ক্ষুদ্র খণ্ডিত সাধনার ক্ষেত্রে এই বিচিত্র ভারতকে ঐক্য দান করা সম্ভব হইবে না। ভারতের ধর্মসাধনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন উপনিষদের ব্রহ্মবাদ; সেই অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপলব্ধিতে ভারতের সকল বিপরীত, বিরুদ্ধ, বিবদমান সম্প্রদায়ের সমন্বয় হইতে পারে। তাই কবি যাহা নৈবেদ্যে প্রচার করিলেন, তাহা উপনিষদেরই বাণী, ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ।

রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতীয় সাধনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে সরল জীবন-যাপন; উপকরণবহুল আধুনিক সভ্যতার প্রতি কবির তীব্র বিতৃষ্ণা। প্রায়-সমসাময়িক একখানি পত্রে স্ত্রীকে লিখিতেছেন, "আজকাল আমার মনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এই, আমাদের জীবন সহজ এবং সরল হোক, আমাদের চতুর্দিক প্রশান্ত এবং প্রসন্ন হোক, আমাদের অভাব অল্প, উদ্দেশ্য উচ্চ, চেষ্টা নিঃস্বার্থ এবং দেশের কার্য আপনাদের কাজের চেয়ে প্রধান হোক।"

কবির অন্তরের এই আকাঙ্ক্ষা নৈবেদ্যের মধ্যে রূপ লইয়াছে; ভারতের এই আকাঙ্ক্ষিত দীনতার জয়োচ্চারণ করিলেন—

হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়েছে যে ধন
বাহিরে তাহার অতি অল্প আয়োজন,

[১] "In lyric poetry, the poet gives vent to his personal emotions or experiences— his joys or sorrows, his cares or complaints, his aspirations or his despair; or he reproduces in words the impressions which nature or history may have made upon him. The character of lyric poetry, it is evident, may vary widely according to the subject, and according to the circumstances and mood of the poet himself. *Gnomic* poetry consists of observations on human life and society, or generalisations respecting conduct and character. But the line between these two forms cannot always be drawn strictly : lyric poetry, for instance, may assume a parentenic tone, giving rise to an intermediate form which may be called *didactic*; or again, a poem which is, on the whole, didactic may rise in parts into a lyric strain". S. R. Driver, *An Introduction to the Literature of the Old Testament*, 1891, p. 338.

দেখিতে দীনের মতো, অন্তরে বিস্তার
তাহার ঐশ্বর্য যত।

পুনশ্চ—

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুটদণ্ড, সিংহাসনভূমি,···

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস 'বাক্য উদার এই ভারতেরি'। কিন্তু প্রাচীন ভারতের আদর্শ আজ বাস্তব ভারতের নিকট অলীক, অলস কল্পনা মাত্র; তাই কবি ব্যথিত চিত্তে কহিতেছেন,

অন্তরের সে সম্পদ ফেলেছি হারায়ে।···
তাই আজি ব্রাহ্মণের বিরল বসন
সম্মান বহে না আর; নাহি ধ্যানবল,
শুধু জপমাত্র আছে, শুচিত্ব কেবল
চিত্তহীন অর্থহীন অভ্যস্ত আচার;

সন্তোষের অন্তরেতে বীর্য নাহি আর,
কেবল জড়ত্বপুঞ্জ; ···

কিন্তু সে ব্রাহ্মণ আজিকার উপবীত-পরিচিত আচারবিনর্ববিদ্যাহীন ব্রাহ্মণ নহে,[১] সে ব্রাহ্মণ জ্ঞানের প্রতীক, সে ব্রাহ্মণ একটি আইডিয়া মাত্র। রবীন্দ্রনাথ সেই আদর্শ ব্রাহ্মণের জয়গান করিয়াছেন; যথার্থ বিরলবসন ব্রাহ্মণ তাঁহার কাছে চিরদিনই সম্মান লাভ করিয়াছিল।[২]

রবীন্দ্রনাথের ন্যায় এইভাবের ভাবুক ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব। তিনি 'তিনশত্রু' প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন, সমাজ-সংস্কার বিষয়ে বর্ণাশ্রমধর্মই হিন্দুদের ভিত্তিভূমি হইবে। তবে বর্ণাশ্রম বর্তমান কর্মভ্রষ্ট শতবিভাগচূর্ণ সামাজিকতা নহে। এদেশের রাজনীতিতে বিলাতের পার্লামেণ্টি নির্বাচনপ্রথা প্রবর্তন তাঁহার মনঃপূত নহে। "হিন্দুর রাজ্যশাসনপ্রথা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অস্ত্রজীবী কর্তৃপক্ষ এবং বণিক সম্প্রদায়ের উপর রাজার শক্তি বা শাসনবিধি প্রতিষ্ঠিত ছিল না। যাঁহারা জ্ঞানী অথচ অর্থহীন, যাঁহারা অস্ত্রসঞ্চালন করিতেন না, ক্রয়-বিক্রয়ের অপেক্ষা রাখিতেন না, এইরূপ সম্প্রদায়ই রাজনৈতিক-শাসনপ্রণালীর ব্যবস্থা করিতেন।··· জ্ঞান, বুদ্ধি ও বৈরাগ্যের উপর ঐ শাসনবিধাতৃগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিল।"

রবীন্দ্রনাথের মতে, 'প্রাচ্যসভ্যতার কলেবর ধর্ম'। এই ধর্ম ব্যাহত হইয়াছে বলিয়াই সমস্ত সমাজ কলুষিত অন্তঃসারশূন্য হইয়াছে— তাই ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণ নহে, ক্ষত্রিয় আর ত্রাণকর্তা নহে, বৈশ্য নিজের ব্যবসায়ে সন্তুষ্ট নহে— সকলেই রিক্ত কাঠামোটার চারিপাশে ভূতের মত ঘুরিয়া মরিতেছে। আমাদের এই সমাজপ্রধান দেশে ব্রাহ্মণের আবশ্যক আছে।··· "যথার্থ ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের একান্ত প্রয়োজন আছে। তাঁহারা দরিদ্র হইবেন, পণ্ডিত হইবেন, ধর্মনিষ্ঠ হইবেন, সর্বপ্রকার আশ্রমধর্মের আদর্শ ও আশ্রয়স্বরূপ হইবেন ও গুরু হইবেন।"[৩]

১ স্বামীজি বিলাত হইতে লিখিয়াছেন, "অবশ্য আমি সবই খাই। যদি কলকাতার লোকেরা চায় যে, আমি হিন্দু-খাদ্য ছাড়া আর কিছুই না খাই, তবে তাদের বোলো, তারা যেন একটা রাঁধুনি ও তাকে রাখবার উপযুক্ত খরচ পাঠিয়ে দেয়। এক কড়া কানাকড়ি দিয়ে সাহায্য করবার মুরোদ নেই এ দিকে গায়ে পড়ে উপদেশ ঝাড়া।"—শ্রীঅরবিন্দ, পৃ. ১৫১।

২ বঙ্গদর্শন ১৩০৮ শ্রাবণ, পৃ. ১৫৫-৫৬।

৩ ব্রাহ্মণ, বঙ্গদর্শন ১৩০৯ আষাঢ়, পৃ. ১৩৬-৪৯। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪র্থ (ভারতবর্ষ) পৃ. ৩৯৩।

বলা বাহুল্য এ আদর্শ কবিসুলভ কল্পনামাত্র। ভারতীয় সমাজজীবনের গ্লানি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কোনো মুগ্ধতা ছিল না তাই এই প্রশ্নই উঠিতেছে, এ অধঃপতনের কারণ কি। কবি মূলগত কারণের যেন সন্ধান পাইয়া বলিতেছেন—

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়,
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।

অসংখ্য ভয়ের দ্বারা আবৃত মানুষের মন, পঙ্গু তাহারা অন্তরে বাহিরে। কবির বিশ্বাস একেশ্বরের পূজার মধ্যেই ঐক্যের বীজ নিহিত। অসংখ্য দেবদেবীর পূজা-অর্চনায় জাতির জীবনে বল আসিবে না, সাহস আসিবে না, সংহতি আসিবে না। তাই কবি বলিলেন—

তোমারে শতধা করি ক্ষুদ্র করি দিয়া
মাটিতে লুটায় যারা তৃপ্ত-সুপ্ত-হিয়া,
সমস্ত ধরণী আজি অবহেলাভরে
পা রেখেছে তাহাদের মাথার উপরে।

মনুষ্যত্ব তুচ্ছ করি যারা সারাবেলা
তোমারে লইয়া শুধু করে পূজাখেলা
মুগ্ধভাবভোগে, সেই বৃদ্ধ শিশুদল
সমস্ত বিশ্বের আজি খেলার পুত্তল।

পুনরায় বলিতেছেন—

দুর্বল আত্মায়
তোমারে ধরিতে নারে দৃঢ়নিষ্ঠাভরে।
ক্ষীণপ্রাণ তোমারেও ক্ষুদ্রক্ষীণ করে
আপনার মতো— ...
পুঞ্জ পুঞ্জ মিথ্যা আসি গ্রাস করে তারে
চতুর্দিকে ; মিথ্যা মুখে, মিথ্যা ব্যবহারে,
মিথ্যা চিত্তে, মিথ্যা তার মস্তক মাড়ায়ে—।
না পারে তাড়াতে তারে উঠিয়া দাঁড়ায়ে।

ঈশ্বরে মন সমর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু কিভাবে। মূঢ়ভাবে নয়, অন্ধভাবে নয়। 'তব পূজা না আনিলে দণ্ড দিব তারে'— এই বলিয়া যে ধর্মধ্বজী 'দেখায় ভয়, তোমার নিন্দুক সে যে, ভক্ত কভু নয়।' ভক্তির সংজ্ঞা—

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে
ভাবোন্মাদমত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছলফেন ভক্তিমদধারা
নাহি চাহি, নাথ!

কবির ভক্তি, জ্ঞানে সুদৃঢ়, কর্মে সুন্দর। তাঁহার ধর্ম জ্ঞানভক্তিকর্ম সমন্বয়ে সুসম্পূর্ণ। তাই যে ধর্ম মানুষকে সংসারবিরক্ত হইতে শিক্ষা দেয়, তাহাকে তিনি ধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি' কবির ধর্ম নহে। 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়' মুক্তি তিনি খুঁজিতেছেন। 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসনে' তিনি বসিতে পারেন না। কর্মহীন ধর্মের সার্থকতা সম্বন্ধে তিনি সন্দিহান। "মানবসংসারের মধ্যেই প্রতিদিনের ছোটো বড়ো সমস্ত কর্মের মধ্যেই ব্রহ্মের উপাসনা মানুষের পক্ষে একমাত্র সত্য উপাসনা। অন্য উপাসনা আংশিক— কেবল জ্ঞানের উপাসনা কেবল ভাবের উপাসনা— সেই উপাসনাদ্বারা আমরা ক্ষণে ক্ষণে ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারি, কিন্তু ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারি না।"[১]

এই সাধনা কি তাহা কবি স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছেন—

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণতরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে— ...

সেই যুগযুগান্তের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন।

রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বানুভূতি আজ তাঁহার কাছে নূতন আধ্যাত্মিক রূপে প্রকাশিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু কবির আর্টিস্ট সত্তা এই বোধকে তাঁহার বহু কবিতার মধ্য দিয়া ইতিপূর্বে প্রকাশ করিয়াছেন; সেখানে যাহা লিরিকধর্মী কবিতা ছিল, এখানে তাহা আধ্যাত্মিক হইবার চেষ্টা করিয়াছে, যাহা অনুভাবের রাজ্যে ছিল, তাহা অনুভূতির অন্দরে প্রবেশের জন্য দ্বারে হানা দিতেছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে তাহার ধর্মবোধের মূলকথা এই দুই পদে পরিব্যক্ত হইয়াছে—

দেহে আর মনে প্রাণে হয়ে একাকার
এ কী অপরূপ লীলা এ অঙ্গে আমার।[২]

এই বিস্ময় কবির কাব্যে নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

স্বদেশপ্রীতি ও ঈশ্বরে ভক্তি— নৈবেদ্যের কবিতারাজির প্রধান বিষয়বস্তু হইলেও, দেশাতীত মানবের মঙ্গলের জন্য তাঁহার অন্তর সদাই উদ্‌গ্রীব। আজ তাঁহার অন্তরাত্মা খণ্ডিতভাবে জগতকে দেখিতে পারে না; সত্য অখণ্ড বলিয়া বিশ্ববোধও সত্যসাধকের নিকট অখণ্ডভাবেই উদ্‌ভাসিত হয়। সেইজন্য স্বদেশের দুঃখে কবির অন্তরে যে বেদনা জাগে, বিদেশের অপমানেও তাঁহার চিত্ত সেই আঘাতে সাড়া দিয়া উঠে। কবির চিত্তে কিসের এ বেদনা, কবি কেন এই সনেটগুলি লিখিলেন—

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল; হিংসার উৎসবে আজি বাজে

১ ধর্মপ্রচার। ধর্ম, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩শ।

২ সাহিত্য-সমালোচক Griers on ইংরেজ লেখক Meredith সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "Meredith does not pass from the natural to the spiritual *per saltum*, as Huxley [T. H.] did; no, the spiritual was rooted in natural. Earth disowns the ascetic and the sentimentalist, who sever their roots in the natural life, no less than the sensualist who rises no higher; but to those who serve her she lends her strength."—*A Critical Study of English Poetry*, p 46.

অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ঙ্করী।

কেন কবির মনে হইতেছে—"এই শ্মশানের মাঝে শক্তির সাধনা তব আরাধনা নহে…।"

পাঠকদের কাছে এই বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন; কারণ রবীন্দ্রনাথ সেই শ্রেণীর কবি যিনি দেশের ও জগতের সকল আন্দোলন-আলোচনার সংবাদ রাখিতেন এবং অন্যায়ের জন্য তীব্র বেদনা বোধ করিতেন।

এই সময়ে দক্ষিণ-আফ্রিকায় ইংরেজরা বুয়রদের দেশ আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে[1] প্রবৃত্ত; চীনদেশের উপরও য়ুরোপীয় সপ্তরথীদের আক্রমণ ও লাঞ্ছনা চলিতেছে[2]। কবি লিখিয়াছেন, "সম্প্রতি য়ুরোপে এই অন্ধ বিদ্বেষ সভ্যতার শান্তিকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে।… বোয়ারপল্লীতে আগুন লাগিয়াছে, চীনে পাশবতা লজ্জাবরণ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং ধর্মপ্রচারকগণের নিষ্ঠুর উক্তিতে ধর্ম উৎপীড়িত হইয়া উঠিতেছে।"[3] পাশ্চাত্য জাতিসমূহের এই উদ্ধত ব্যবহারের পরিণাম সম্বন্ধে কবি কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন, 'স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে' একদিন হইবে।

একের স্পর্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট বিধান।

স্বার্থ যত পূর্ণ হয় লোভক্ষুধানল
তত তার বেড়ে ওঠে; বিশ্বধরাতল
আপনার খাদ্য বলি না করি বিচার
জঠরে পুরিতে চায়।…

ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে।

পুনশ্চ—

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংঘাত; প্রলয়-মন্থন-ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা সরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।

১ The South African (Boer) War 12 Oct. 18 9, 31 May 1902—২৬ আশ্বিন ১৩০৬, ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯ অর্থাৎ প্রায় আড়াই বৎসর ইংরেজ বুয়রে যুদ্ধ চলে। তু° Jawaharlal Nehru: *Glimpses of World History.*

২ চীন দেশে বিদেশীদের বিতাড়নের জন্য 'বকসার বিদ্রোহ' ১৯০০ সালে আরম্ভ হয়; দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বহু য়ুরোপীয় নিহত হইয়াছিল। বহুস্থান হইতে ইংরেজ জার্মান ও রুশের শ্যেনদৃষ্টি ছিল চীনের প্রতি। চীনাদের 'বিদ্রোহ' দমন হইল। অতঃপর পাশ্চাত্য ১২টি রাষ্ট্রশক্তি ১৯০১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর Boxer Protocol সহি করিয়া প্রকাশ করিলেন। ইহারা চীন সরকারের নিকট হইতে দাবী করিলেন… expressions of regret, punishment of 96 officials, payment over 40 years of 450,000,000 taels with interest (or a total value of gold $838, 820, 707, which became more burdensome as silver depreciated), revision of the tariff to an effective 5%, fortification of an enlarged legation quarter, the razing of all forts and establishment of foreign garrisons along the railway to Shan-hai-Kuan. The indemnity was to be met from maritime customs surplus, native customs and salt monopoly etc.—*Encyclopedia of World History*, p. 883.

৩ সমাজভেদ, বঙ্গদর্শন ১৩০৮ আষাঢ়। স্বদেশ, গদ্যগ্রন্থাবলী ১২। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১১শ খণ্ড।

রবীন্দ্রনাথ patriotism ও nationalismকে বরাবর পৃথক করিয়া দেখিয়াছেন। স্বদেশপ্রীতি ও স্বাদেশিকতার মধ্যে যে ধনাত্মক বল আছে, তাহারই কথা নৈবেদ্যের মধ্যে কবি ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু স্ব-দেশের স্বার্থ যখন অন্যের স্ব-দেশের স্বার্থকে আঘাত করে, তখনই প্রীতি বা প্রেমের অভাবাত্মক দিকটা প্রবল হয়। সেই জাতি-প্রেম বা ন্যাশনালিজমকে কবি কোনো দিন সমর্থন করিতে পারেন নাই।

পশ্চিমের কোণে রক্তরাগরেখা সন্ধ্যার প্রবল দীপ্তি রূপে দেখা দিয়াছে, সে সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—

চিতার আগুন··· করিছে উদ্‌গার
বিস্ফুলিঙ্গ স্বার্থদীপ্ত ক্ষুব্ধ সভ্যতার
মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নিকণা।

কবির আশাবাদী মন বলে পূর্ব-এশিয়ায় অরুণোদয় হইবে; জাপানের জাগরণের মধ্যে সেদিন এশিয়ার সকল পরাভূত পদানত জাতি আপনার মুক্তির আশ্বাস পাইয়াছিল; রবীন্দ্রনাথ আশা করিয়াছিলেন মুক্তির সন্ধানে ভারত একদিন জাগিবে—

তোমার নিখিলপ্লাবী আনন্দ-আলোক
হয়তো লুকায়ে আছে পূর্বসিন্ধুতীরে
বহু ধৈর্যে নম্র স্তব্ধ দুঃখের তিমিরে
সবরিক্ত অশ্রুসিক্ত দৈন্যের দীক্ষায়
দীর্ঘকাল— ব্রাহ্মমুহূর্তের প্রতীক্ষায়।

কাব্যের দিক হইতে নৈবেদ্যের স্থান যাহাই হউক-না কেন, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, মানুষের অবসাদ কালে, দুর্বলতার মুহূর্তে এই কবিতাবলী অন্তরে বল দেয়, শোকের সময় সান্ত্বনা দেয়, ভয়ের সময় অভয়বাণী শোনায়। কবি এই কাব্যগুচ্ছ আরম্ভ করিয়াছিলেন এই বলিয়া—

প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী,
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

ইহার শেষ কবিতায় তাঁহার শেষ নিবেদন হইল এই বলিয়া—

সংসারে মোরে রাখিয়াছ যেই ঘরে
সেই ঘরে রব সকল দুঃখ ভুলিয়া।···
শত বিশ্বাস ভেঙে যদি যায় প্রাণে
এক বিশ্বাসে রহে যেন মন লাগিয়া।

রবীন্দ্রসাহিত্য রবীন্দ্রদর্শন রবীন্দ্রজীবনের মূল কথা এই অহেতুকী ঈশ্বরনির্ভরতা, তাহারই স্পষ্ট পরিচয় নৈবেদ্যের কবিতাগুচ্ছ।

বঙ্গদর্শন নবপর্যায়

১৩০৭ সালের শেষদিকে নৈবেদ্য রচনা শেষ হইয়া গিয়াছে। চিরকুমার সভার শেষ কিস্তি ভারতীর সম্পাদিকার হস্তে সমর্পিত হইয়াছে; নষ্টনীড় উপন্যাস বোধ হয় লেখা শুরু করিয়াছেন; বিনোদিনীর (চোখের বালি) খাতাখানি বাহির করিয়া কয়েকটি পরিচ্ছেদ পুনরায় নূতন করিয়া লিখিয়া ফেলিযাছেন। স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া এখনো শিলাইদহে

আছেন, গৃহ-বিদ্যালয়ে সন্তানেরা পড়াশুনা করে। মোটকথা জীবনের সরু মোটা সব তারগুলি সমভাবে ঝংকৃত হইতেছে। এমন সময়ে কলিকাতা হইতে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও তাঁহার কনিষ্ঠ শৈলেশচন্দ্রের নিকট হইতে "বঙ্গদর্শনের সম্পাদকী লইবার জন্য বন্দুকের দুই চোঙভরা অনুরোধ আমার মস্তকে বর্ষিত হইয়াছে, কিন্তু ধরাশায়ী হই নাই।"— রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদটি বন্ধুবর প্রিয়নাথ সেনকে জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকেই ঐ কর্মভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন।[১]

কয়েকদিন পরে প্রিয়নাথকে লিখিতেছেন যে, তিনি শৈলেশচন্দ্রকে 'বঙ্গদর্শন থেকে বিরত' করিবার জন্য পত্র দিয়াছেন। "এখন দুর্ভিক্ষ এবং মারীর হাত থেকে প্রাণ বাঁচাবার কাল— এখন কে বসে বসে মাথামুণ্ডু রচনা করবে— আর কেই বা বসে বসে মাথামুণ্ডু পড়বে?"[২] তৎসত্ত্বেও পত্রিকার সম্পাদকের ভার গ্রহণ করিতে হইল।

এই ঘটনার ত্রিশ বৎসর পর কবি লিখিয়াছিলেন, "বঙ্গদর্শনের নবপর্যায়··· আমার নাম যোজনা করা হল, তাতে আমার প্রসন্ন মনের সমর্থন ছিল না। কোনো পূর্বতন খ্যাতির উত্তরাধিকার গ্রহণ করা সংকটের অবস্থা, আমার মনে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সংকোচ ছিল। কিন্তু আমার মনে উপরোধ অনুরোধের দ্বন্দ্ব যেখানেই ঘটেছে সেখানে আমি জয়লাভ করতে পারি নি, এবারও তাই হল।"

শ্রীশচন্দ্র বঙ্গদর্শন কেন পুনঃপ্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহার ইতিহাস সংক্ষেপে এখানে বিবৃত করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন এগারো বৎসর, তখন বঙ্কিমচন্দ্র, ১২৭৯ সালে, বঙ্গদর্শন প্রথম প্রকাশ করেন। সে সময়ে দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, জগদীশনাথ রায়, তারাপদ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বঙ্গদর্শনের লেখকশ্রেণীভুক্ত। চারি বৎসর অপূর্ব কৃতিত্বের সহিত বঙ্গদর্শন সম্পাদন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বিদায়গ্রহণ করেন (১২৮২)। কেন বিদায়গ্রহণ করেন সেসব বৃত্তান্ত এখানে অবান্তর। নানা কারণে ১২৮৩ সালে বঙ্গদর্শন বন্ধ ছিল, ১২৮৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যম অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদকত্বে উহা পুনঃপ্রকাশিত হয়; সেই বৎসরেই শ্রাবণ মাসে ভারতীর আবির্ভাব হয়। ১২৮৪ হইতে ১২৮৯ পর্যন্ত চলিয়া বঙ্গদর্শন পুনরায় বন্ধ হইয়া গেল। অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের উপর ১২৯০ সালের কার্তিক মাসে ঐ পত্রিকার ভার অর্পণ করেন; তখন চন্দ্রনাথ বসু ছিলেন সম্পাদন-কার্যের প্রধান সহায়। ১২৯০ সালে চারিটি সংখ্যা মাত্র (কার্তিক-মাঘ) প্রকাশিত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে চন্দ্রনাথ বসুর পশুপতি-সম্বাদ নামে একটি রচনা (অগ্রহায়ণ-পৌষ) বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইলে বঙ্কিম অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং মাঘ সংখ্যার পর পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেন। শ্রীশচন্দ্র ইহার দুই বৎসর পরে সাব-ডেপুটির পদ পাইয়া কলিকাতা ত্যাগ করেন (১৮৮৫ অক্টোবর)।[৩]

আঠারো বৎসর পর শ্রীশচন্দ্র বঙ্গদর্শন পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া নিবেদনে লিখিলেন (১৩০৮ বৈশাখ)— "বঙ্গদর্শন পুনর্জীবিত হওয়ায় আমার চিরন্তন ক্ষোভ দূর হইল। বঙ্গের প্রধান সাময়িক-পত্র যে আমার হস্তে লোপ পাইয়াছিল, ইহাতে আমি বড় লজ্জিত ছিলাম।··· সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গদর্শনের সম্পাদনভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হওয়ায় আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তিনি যে উপকার করিলেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।"

সরকারী কাজ লইয়া শ্রীশচন্দ্রকে কলিকাতার বাহিরে থাকিতে হয়, তাই পত্রিকার কার্যভার পড়িল তাঁহার কনিষ্ঠ শৈলেশচন্দ্রের উপর। ইতিপূর্বে শৈলেশচন্দ্র (মৃত্যু ১৩১১ আষাঢ়) কলিকাতায় পুস্তকপ্রকাশের কার্য শুরু করিয়াছিলেন; মজুমদার এজেন্সী হইতে রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' দুই খণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হয় (১৩০৭)[৪]। এই মজুমদার এজেন্সীর

১ পত্র ১১, চৈত্র ১৩০৭, প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি পৃ ২৯১।

২ রবীন্দ্রনাথের চিঠি ২৩ নং, আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয়া সংখ্যা। ১৩৫২।

৩ দ্র. বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৮ শ্রাবণ-আশ্বিন পৃ ৩৭-৪৪। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬০-১৯০৮) প্রসঙ্গে বঙ্গদর্শনের ইতিহাস পাওয়া যাইবে।

৪ দ্র. রবীন্দ্রজীবনী, ৪র্থ খণ্ড: সংযোজন, পৃ ২৭৩।

(পরে মজুমদার লাইব্রেরি) সহিত প্রায় সাত বৎসর রবীন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ইহার অন্তর্গত 'আলোচনা সভা' বিলাতী সাহিত্যিক ক্লাবের অনুকরণে গড়া হয়; রবীন্দ্রনাথের বহু প্রবন্ধ এখানে পঠিত হয়; তৎকালীন একদল সাহিত্যিকের এইটি ছিল মিলনকেন্দ্র ও মজলিশ।

বঙ্গদর্শনের সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ইহার 'সূচনা'য় বঙ্কিম-যুগের সহিত তৎকালীন বঙ্গসমাজের তুলনা করিয়া বঙ্কিমের প্রতিভার প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। 'আধুনিক সাহিত্যে' তিনি বলিলেন, "আমরা প্রতিভার সেই ব্যক্তিগত প্রভাবের প্রবল স্বাদ উপভোগ করিবার প্রত্যাশা আর করিতে পারিব না। এখন লেখক ও পাঠকের সংখ্যা গণিয়া উঠা কঠিন। এখন রচনা বিচিত্র ও রুচি বিচিত্র।··· এখনকার সম্পাদকের একমাত্র চেষ্টা হইবে, বর্তমান বঙ্গচিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে উপযুক্তভাবে এই পত্রে প্রতিফলিত করা।" আমাদের আলোচ্য পর্বে রাষ্ট্র ও সমাজের বিচিত্র জটিল প্রশ্ন বাংলার মনীষীদের প্রধান ভাবনার ও আলোচনার বিষয় ছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন (১৩০৮ ভাদ্র), "বিংশ শতাব্দীতে যুগধর্ম— রাষ্ট্র ও নেশন এই দুই ঐতিহাসিক পদার্থ অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই পণ্ডিতগণের বিশ্বাস। বঙ্গদর্শন নবজীবন লাভ করিয়াই এই যুগধর্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।" কিন্তু বঙ্গদর্শন রাষ্ট্রসমস্যা আলোচনাকেই একান্ত করিয়া দেখেন নাই। রাজনৈতিকেরা রাষ্ট্রতন্ত্র, শাসন-সংস্কার, কনগ্রেস ও কনফারেন্স লইয়া ব্যস্ত; সমাজসংস্কারকগণ সামাজিক হিতসাধনের জন্য উৎসুক; ইহাদের বাহিরে মুষ্টিমেয় ভাবুকের দল ভারতীয় সংস্কৃতির মূলগত ঐক্যভূমি সন্ধানে নিরত। তাঁহাদের মতে মানবজীবনের সমস্যাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখা যায় না, রাষ্ট্র ও সমাজ অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। সেইজন্যই তাঁহারা পরাধীন ভারতের রাষ্ট্রনীতির সহিত যুক্ত ভারতের সমাজনীতির সম্বন্ধ আবিষ্কারের জন্য মনোযোগী হইয়াছিলেন।

বিবেকানন্দের সহিত রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা না হইলেও তাঁহার শিষ্যা মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল্ (১৮৬৭-১৯১১) বা ভগিনী নিবেদিতার সহিত বিশেষ ভাবেই হইয়াছিল।[১] নিবেদিতা ভারতবর্ষে আসেন ২৮শে জানুয়ারি ১৮৯৮ (১৩০৪)। তাঁহার ন্যায় এমন করিয়া ভারতবর্ষকে ভালোবাসিতে খুব কম লোকই পারিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নানা বিষয়ে মতভেদ সত্ত্বেও ভারতের মুক্তির জন্য একান্ত আত্মনিবেদনের দ্বারা তিনি রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করেন। ভারতে বৈদেশিক শাসনের অবসান ঘটাইবার জন্য তিনি অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব, পি. মিত্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সহিত নানাভাবে সহযোগিতা করেন। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত তাঁহার বাহ্যিক সম্পর্ক থাকে না। অখণ্ড ভারতবর্ষ তাহার এই সেবিকাকে আপনার বলিয়া স্বীকার করে এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নামকরণ করেন— 'লোকমাতা'।[২]

এই মুষ্টিমেয় মনীষীদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ অন্যতম, তাঁহার কথা প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গিতেই যে সকলে ভারতীয় সমস্যাসমূহকে দেখিতেছিলেন তাহা নহে। অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় রাষ্ট্র ও ধর্ম সম্বন্ধে যে মত পোষণ করিতেন তাহার সহিত রবীন্দ্রনাথের দেশবিষয়ক মতামতের মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ব্রহ্মবান্ধব হিন্দু ন্যাশনালিজম ও হিন্দু সমাজকে ভারতীয় সংস্কৃতিরূপে দেখিতে চাহিয়াছিলেন; তাঁহার কাছে হিন্দুত্ব শব্দের দ্বারা হিন্দু ন্যাশনালিটি ও হিন্দু কালচার উভয়ই সূচিত হইত। বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ হইতেছে ব্রহ্মবান্ধবের 'হিন্দুজাতির একনিষ্ঠা'। এই প্রবন্ধের পুরোভাগে তিনি রবীন্দ্রনাথের সদ্য প্রকাশিত নৈবেদ্য হইতে একটি সনেট উদ্ধৃত করেন; সেই সনেটের মধ্যে ভারতের আদর্শ আশা আকাঙ্ক্ষা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে।

১ পরিচয়। দ্র. চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ২০৫।

২ ভগিনী নিবেদিতা, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী।

…যাঁরা সবল স্বাধীন
নির্ভয় সরলপ্রাণ, বন্ধনবিহীন,
সদর্পে ফিরিয়াছেন বীর্যজ্যোতিষ্মান্
লঙ্ঘিয়া অরণ্য নদী পর্বত পাষাণ
তাঁরা এক মহান্ বিপুল সত্যপথে
তোমারে লভিয়াছেন নিখিল জগতে।
কোনোখানে না মানিয়া আত্মার নিষেধ
সবলে সমস্ত বিশ্ব করেছেন ভেদ।

ইহাই হিন্দুর ধর্ম, হিন্দুর সংস্কৃতি, হিন্দুর হিন্দুত্ব; এই আইডিয়াকে ব্রহ্মবান্ধব কিভাবে দেখিয়াছিলেন, তৎবিষয়ে এইখানে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, কারণ এই অংশের সহিত রবীন্দ্রনাথের এতদ্‌বিষয়ক মত সম্পূর্ণ মিলিয়া যায়।—

"হিন্দুর হিন্দুত্ব কোনো ধর্মমতের অপেক্ষা করে না।… হিন্দুর হিন্দুত্ব আহারপান বিচারের উপরেও নির্ভর করে না।… হিন্দুত্বের ভিত্তি, হিন্দুত্বের সার, বর্ণাশ্রমধর্ম এবং তৎপ্রণোদিনী একনিষ্ঠতা।… একনিষ্ঠাচিন্তাপ্রবণতা, বস্তুর বস্তুত্ব দর্শন, কর্তা এবং কার্যের পারমার্থিক অভেদানুভূতি, বহুত্বের মায়িকতা জ্ঞানই হিন্দুর হিন্দুত্ব। বেদে ইহার আরম্ভ এবং বেদান্তে পরিণতি। এই আধ্যাত্মিক দর্শন বর্ণাশ্রম ধর্মে প্রকটিত হইয়াছিল। ভিন্নকে অভিন্ন করা, অনেককে একীভূত করা বর্ণবিভাগের উদ্দেশ্য।… হিন্দুরা যদি হিন্দুত্ব ত্যাগ করে এবং য়ুরোপীয় হয় তাহা হইলে অচিরে মরিয়া যাইবে। কিন্তু যদি হিন্দুত্বের উপর, জাতীয়তার উপর, একনিষ্ঠতার উপর, বর্ণাশ্রমধর্মের উপর দণ্ডায়মান হইয়া য়ুরোপীয় অনুশীলন গ্রহণ করে তাহা হইলেই তাহাদের ইহপরকালে মঙ্গল হইবে। নিজের ঘর ছাড়িও না, অপ্রতিষ্ঠ হইও না।"

ব্রহ্মবান্ধব আরও বলিতেছেন, "অনেকে হিন্দুচিন্তার সহিত হিন্দুধর্মমতসমূহ মিশাইয়া ফেলেন।… চিন্তাপ্রণালী ধর্মমত হইতে পৃথক। হিন্দুস্থানে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত হইয়াছে; ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের আবির্ভাব হইয়াছে… কিন্তু সমাহিত হইয়া দেখিলে সম্যকরূপে বুঝিতে পারা যায় যে একই চিন্তাস্রোত সকল বিভিন্নতার নিম্নদেশে ধারাবাহিক ক্রমে চলিয়া আসিতেছে।" ইহাকে ব্রহ্মবান্ধব 'একনিষ্ঠাচিন্তা' বলিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথও ভারতীয় সংস্কৃতি, যাহাকে ব্রহ্মবান্ধব 'হিন্দুত্ব' বলিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত। কবি এতদিনে জীবনের ও সমাজের সমস্যার (problems) বিশ্লেষণে মন দিলেন এবং সমস্যা সমাধানের পথনির্দেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। নৈবেদ্য হইতে কবির কাব্যধারা নূতনের পথে চলিল। ছোটগল্পের পালা শেষ হইয়াছে; মানবজীবনের বৃহত্তর পটভূমিতে সমস্যা আলোচনার জন্য উপন্যাসের অবতারণা হয় বঙ্গদর্শনের এই নবযুগ হইতে। প্রবন্ধসমূহও নূতন গঠনমূলক বাণী বহন করিয়া আনিল।

ভারতের সমসাময়িক পরিস্থিতির ও সামাজিক সমস্যার আলোচনা করিতে গিয়া আদর্শের সংঘাত বাধিল। এই সময়ে অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় 'সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার' নামে এক প্রবন্ধ লেখেন; রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র সামাজিক ব্যাধির কোনো বিশেষ প্রতিকারে বিশ্বাস করেন না; তিনি 'ব্যাধি ও প্রতিকার'[১] শীর্ষক প্রবন্ধে জাতির জীবনের মধ্যে যেসব ব্যাধি-বীজাণু প্রবেশ করিয়া তাহাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে, তাহার সন্ধান ও নিরাকরণ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

য়ুরোপীয় সভ্যতার ঔজ্জ্বল্য ও উদারতা এককালে ভারতবর্ষকে কিভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল, তথাকার সভ্যতার ঔদার্যের সহিত ভারতবর্ষীয় সংকীর্ণতার তুলনা করিয়া ভারতের শিক্ষিত সমাজ কিরূপে য়ুরোপকে বাহবা দিয়াছিল

১ ব্যাধি ও প্রতিকার, বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ বৈশাখ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২, সমাজ গ্রন্থের পরিশিষ্ট, পৃ ৪৮৯।

লেখক তাহারই প্রথম আলোচনা করেন। তিনি বলিলেন যে, এক সময়ে লোকের মনে হইয়াছিল যে কেবল স্বাধীনতার বুলি আওড়াইয়া তাহারা বীরপুরুষ হইবে এবং পাশ্চাত্যদের নিকট হইতে স্বাধীন শাসনের দাবি করিয়া ও তাহাদিগকে অনুকরণ করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিবে। তজ্জন্য আমাদের যাহা-কিছু ছিল ছাড়িতে প্রস্তুত হইলাম; কিন্তু ভেদ সমানই রহিয়া গেল। ইংরেজ যদি আমাদিগকে একাসনে বসাইত, তাহা হইলে ইংরেজের মহত্ত্বের তুলনায় আমাদের গৌরব আরো কমিয়া যাইত। পৌরুষ দ্বারা যে আসন সে পাইয়াছে, আমরা প্রশ্রয়ের দ্বারা তাহা পাইলে অপমান বাড়িত। রাজনীতিকদের মন্ত্র হইতেছে বিদেশী শাসকদের নিকট হইতে কিছু আদায় করা; কিন্তু পৃথিবীর সমক্ষে ভারতবর্ষেরও একটা উপযোগিতা দেখাইতে হইবে, মুখে আস্ফালন আর শোভা পায় না।

পূর্ব-পশ্চিমের প্রথম মিলনে ভারতবাসী য়ুরোপীয় সভ্যতাকে চরম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু সে মোহ ভাঙিলে সে পশ্চিমের শিক্ষাকে 'ডালে মূলে উপড়াইবার' জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা অনুকরণের এক প্রান্ত হইতে বর্জনের অপর প্রান্তে প্রবলভাবে গিয়া পড়িতেছি। য়ুরোপীয় শিক্ষা ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির পক্ষে বিপরীত শক্তি; সেই বৈপরীত্যে আমাদের অন্তরের নিহিত শক্তিকে জাগাইয়াছে।[১]

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন যে, প্রাচীন ভারতের যে আদর্শ ছিল তাহা ক্ষণভঙ্গুর নহে। "এ কথা যিনি বলেন, ভারতবর্ষীয় আদর্শে লোককে কেবলই তপস্বী করে, কেবলই ব্রাহ্মণ করিয়া তুলে, তিনি ভুল বলেন এবং গর্বচ্ছলে মহান্ আদর্শকে নিন্দা করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ যখন মহান্ ছিল, তখন সে বিচিত্ররূপে বিচিত্রভাবেই মহান্ ছিল। তখন সে বীর্যে, ঐশ্বর্যে, জ্ঞানে এবং ধর্মে মহান্ ছিল, সে কেবলই মালা জপ করিত না।"[২]

বর্তমান ভারত কিভাবে সেই প্রাচীন মহত্ত্বের শিখরে আরোহণ করিতে পারিবে, তাহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন যে, ইংরেজের নকলে আমাদের উন্নতির আশা নাই, "যখন নিজের মতো হইব, স্বাভাবিক হইব, তখন ইংরেজের কাছ হইতে যাহা লইব তাহা নূতন করিয়া ইংরেজকে ফিরাইয়া দিতে পারিব।" ত্রিবেদী মহাশয় লিখিয়াছিলেন, অস্বাভাবিকতাই আমাদের ব্যাধি; ইংরেজি শিক্ষাকে আমাদের স্বভাবের মধ্যে আনিতে পারি নাই। রবীন্দ্রনাথ বলেন, আমরা কেবল ইংরেজি সভ্যতাকে নিজস্ব করিতে পারি নাই তাহা নহে— আমাদের দেশীয় সভ্যতা সম্বন্ধেও আমরা অস্বাভাবিক। আমরা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহ্যিক অংশ লইয়া যে আড়ম্বর করিতেছি, তাহা আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক। মনুর সময়ে যাহা সাময়িক, আমাদের সময়ে তাহা অসাময়িক; মনুর সময়ে যাহা চিরন্তন, আমাদের সময়েও তাহা চিরন্তন।

রবীন্দ্রনাথের এই মতের সহিত ব্রহ্মবান্ধবের পূর্বোদ্ধৃত প্রবন্ধের ভাবের মিল রহিয়াছে; ব্রহ্মবান্ধবও বলিয়াছিলেন, "পাশ্চাত্য বিদ্যা লাভ করিয়া আর্যসন্তানেরা বহুনিষ্ঠ ও বর্ণাশ্রমবিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। যতদিন ঋষিদিগের অভেদ-দৃষ্টি এবং বর্ণধর্ম পুনরাবির্ভূত না হয়, ততদিন ভারতের উত্থান অসম্ভব। অনুকরণে যতদূর উৎকর্ষ হইতে পারে হইবে, কিন্তু অস্থিমজ্জাগত উন্নতি হইবে না।"[৩]

প্রাচ্য আদর্শের আলোচনা করিতে গেলে প্রতীচ্য আদর্শবাদের কথা স্বতঃই উঠিয়া পড়ে; কারণ যে দুইটি বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চলিতেছে তাহাদের একটিকেও অস্বীকার করা যাইবে না। প্রতীচ্য সভ্যতার আদর্শ সম্বন্ধে

১ রাজনারায়ণ বসু বহু বৎসর পূর্বে (১৮৭৩) 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' প্রবন্ধে এইসব ভাব সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন। রাজনারায়ণের প্রভাব একদিকে বিবেকানন্দ প্রমুখ প্রতিক্রিয়া-পন্থী সাধকদের উদ্‌বোধিত করে, অন্যদিকে আদিসমাজীয় ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণা দান করে। বঙ্কিমচন্দ্র রাজনারায়ণের প্রবন্ধের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াও উহা ব্রাহ্মঘেঁসা বলিয়া অন্তর হইতে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। আবার অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই ভাষণের ভূরি ভূরি প্রশংসা করেন।

২ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২শ, পৃ ৪৯৪ ৩ হিন্দুর একনিষ্ঠতা, বঙ্গদর্শন ১৩০৮ বৈশাখ।

আলোচনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ ফরাসী ঐতিহাসিক গিজোর (Guizot)[১] মত পর্যালোচনা করিয়া বলিলেন, য়ুরোপীয় সভ্যতা বিশ্বতন্ত্রের প্রতিবিম্ব— উহা সংকীর্ণরূপে সীমাবদ্ধ, একরত ও অচল নহে। য়ুরোপের রাজ্য খণ্ড খণ্ড; নানা বিষয়ে তাহাদের মিলনের অভাব আছে; কিন্তু এক বিষয়ে তাহাদের সকলের চরিত্র এক; সেটি রাষ্ট্রস্বার্থবুদ্ধি। "সেইখানে তাহারা একাগ্র, তাহারা প্রবল, তাহারা নিষ্ঠুর, সেইখানে আঘাত লাগিলেই সমস্ত দেশ একমূর্তি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হয়।" ভারতবর্ষ রাষ্ট্রপ্রধান নয়, এখানে সমাজ মানুষের জীবনে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বর্ণাশ্রম ধর্মই হিন্দু সমাজের ঐক্যভিত্তি। কিন্তু জাতিধর্মের উপর একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে। সেই মানব-সাধারণের ধর্মকে বর্ণাশ্রম ধর্ম যখন আঘাত করে, তখন শাশ্বত ধর্মও তাহাকে ফিরিয়া আঘাত করে। "বর্ণাশ্রম আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিল, কিন্তু ধর্মকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করিল না।... আজিও ভারতে ব্রাহ্মণপ্রধান বর্ণাশ্রম থাকা সত্ত্বেও শূদ্রের সংস্কারে নিকৃষ্ট অধিকারীর অজ্ঞতায়, ব্রাহ্মণ-সমাজ পর্যন্ত আচ্ছন্ন আবিষ্ট।" এইখানে রবীন্দ্রনাথের অন্তরের কথাটি প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রাচ্য সভ্যতার মধ্যে বর্ণাশ্রমের উচ্চ আদর্শ নিহিত থাকিলেও তাহার ত্রুটি কোথায়, তাহা তিনি যেমন উদ্‌ঘাটন করিলেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের গরল কিভাবে য়ুরোপকে জীর্ণ করিতেছে, তাহাও তেমনি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিলেন, "স্বার্থের প্রকৃতিই বিরোধ। য়ুরোপীয় সভ্যতার সীমায় সীমায় সেই বিরোধ উত্তরোত্তর কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে।" ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্য করেন, তখন য়ুরোপ মহাশান্তি-সুখস্বর্গের স্বপ্ন দেখিতেছে। রবীন্দ্রনাথ ঋষির দৃষ্টিতে রাষ্ট্রনীতিকে দেখিয়াছিলেন; য়ুরোপ ধর্মের সীমাকে অতিক্রম করিতেছে বলিয়া তথায় "বিনাশের ছিদ্র দেখা দিবে এবং সেই পথে শনি প্রবেশ করিবে।" ধর্ম হইতে ধার্মিকতাকে উচ্চতর স্থান দিয়া প্রাচ্য ভারত বিনষ্ট, মনুষ্যত্ব হইতে রাষ্ট্রকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়া পাশ্চাত্য দেশসমূহ ধ্বংসোন্মুখ। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে 'নেশন' ও 'ন্যাশনালিজম' সম্বন্ধে সতর্কবাণী ঘোষণা করিলেন।[২]

রবীন্দ্রনাথ ভারতের সমাজ-জীবনে জাতীয়তাবোধ ও সংঘবুদ্ধি জাগ্রত করিবার পক্ষপাতী বটে, কিন্তু এ দেশে তিনি য়ুরোপীয় 'জাতিপ্রেম' বা ন্যাশনালিজম আমদানির ঘোর বিরোধী। ষোলো বৎসর পরে তিনি রণোন্মত্ত পাশ্চাত্য জগতের সম্মুখে এই কথাই ঘোষণা করেন যে, ন্যাশনালিজম পৃথিবীতে শান্তিসুখ আনিবে না; আরও বিংশ বৎসর পরে 'সভ্যতার সংকট'এ কবি পাশ্চাত্য সভ্যতার চরম দুর্গতির কথা অনাড়ম্বর ভাষায় বিশ্বজন-সমক্ষে প্রচার করিয়াছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে য়ুরোপের এই জাতিপ্রেম-আদর্শকেই ভারতবর্ষ তাহার প্রধান কাম্য বলিয়া মনে করিয়াছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ন্যাশনালিজমের বীভৎস রূপটি প্রকাশ করিয়া দেখাইলেন। "নেশন শব্দ আমাদের ভাষায় নাই, আমাদের দেশে ছিল না। সম্প্রতি য়ুরোপীয় শিক্ষাগুণে ন্যাশনাল মহত্ত্বকে আমরা অত্যধিক আদর দিতে শিখিয়াছি।... য়ুরোপে স্বাধীনতাকে যে স্থান দেয় আমরা মুক্তিকে সেই স্থান দিই। আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া অন্য স্বাধীনতার মাহাত্ম্য আমরা মানি না।"..."প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সভ্যতারও মূলে এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ছিল। সেইজন্য রাষ্ট্রীয় মহত্ত্ব বিলোপের সঙ্গেসঙ্গেই গ্রীক ও রোমক সভ্যতার অধঃপতন হইয়াছে। হিন্দুসভ্যতা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। সেইজন্য

১ গিজো— Guizot, Francois, Pierre Guillaume (1787-1874) ফরাসী ঐতিহাসিক রাজনীতিক। ১৮১২-১৮৩০ প্যারিসের সরবোনের ইতিহাস অধ্যাপক। গীবনের রোমান ইতিহাসের অনুবাদক ও বহু গ্রন্থের লেখক। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ Histoire de la Civilisation en Europe (1828)। ইংরেজিতে অনুবাদ আছে। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন, কারণ "যৌবনে আমরা এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার জন্য উৎসাহিত হই"। রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ কৃত অনুবাদ 'য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয় (১৩৩৩)। দ্র. রবীন্দ্রজীবনী ৪র্থ খণ্ড; সংযোজন পৃ ২১১।

২ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ, বঙ্গদর্শন ১৩০৮ জ্যৈষ্ঠ পৃ ৭৩,৭৪। স্বদেশ, গদ্য-গ্রন্থাবলী ১২শ। ভারতবর্ষ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪র্থ ৪১৬-৪২৪

আমরা স্বাধীন হই বা পরাধীন থাকি, হিন্দুসভ্যতাকে সমাজের ভিতর হইতে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি এ আশা ত্যাগ করিবার নহে।"…"আমাদের হিন্দুসভ্যতার মূলে সমাজ, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি। সামাজিক মহত্ত্বেও মানুষ মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রনীতিক মহত্ত্বেও পারে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি, য়ুরোপীয় ছাঁদে নেশন গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য— তবে আমরা ভুল বুঝিব।"[১]

নেশন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ফরাসী পণ্ডিত রেনাঁ-র (Renan)[২] মত বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিয়া 'হিন্দু' কে, তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিলেন। নেশন শব্দের যথার্থ অর্থ নির্দেশ করা কঠিন; উহা জাতি ধর্ম বর্ণ রাষ্ট্র ভাষা -নিরপেক্ষ একটি মানসিক বা আধ্যাত্মিক ভাব মাত্র। রেনাঁর মতে, "অতীতে সকলে মিলিয়া ত্যাগদুঃখ-স্বীকার এবং পুনর্বার সেইজন্য সকলে মিলিয়া প্রস্তুত থাকিবার ভাব হইতে জনসাধারণকে যে একটি একীভূত নিবিড় অভিব্যক্তি দান করে, তাহাই নেশন।"[৩] সকলে মিলিয়া এক-জীবন বহন করিবার সুস্পষ্ট ইচ্ছার নাম ন্যাশনালিজম।

নেশনের প্রত্যেকে ন্যাশনাল স্বার্থ রক্ষার জন্য নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়া থাকে বলিয়া নেশন সজীব। ভারতীয় ভাষায় ঐ শব্দ নাই, এখানে আছে 'সমাজ'। নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা সম্প্রদায়ের ধর্মমত, নানা প্রকার বিরুদ্ধ আচার বিচার লইয়া হিন্দু 'সমাজ' গঠিত। নেশনের ন্যায় হিন্দুত্বের সংজ্ঞাপ্রকরণ করা কঠিন; য়ুরোপে নেশন সজীব, ভারতে সমাজ জীবন্ত। হিন্দুসমাজ বহু ও বিচিত্র জাতিকে এক হিন্দুত্বের মধ্যে আনয়ন করিয়া সে প্রাণবান্ ছিল। য়ুরোপে অতীতের সহিত বর্তমানের সম্বন্ধ জড়সম্বন্ধ নহে, অতীত ও বর্তমানের মধ্যে নিরন্তর চিত্তের সম্বন্ধ আছে— অখণ্ড কর্মপ্রবাহ সেখানে নিরন্তর চলিতেছে। প্রাচীন ভারত বড় হইয়াছিল বহুকে এক করিয়া। এখন নিয়ম আছে, অন্ধ অভ্যাস আছে, প্রাণ নাই, চেতনা নাই। প্রাচীনের সেই সম্পদের সহিত বর্তমান ভারতের সচেষ্ট যোগ সাধন করিতে পারিলে যথার্থ হিন্দুত্ব রক্ষিত হইবে। নৈবেদ্যর মধ্যে কবি এই ভাবটি ব্যক্ত করেন, ত্রিপুরার মহারাজ ও কুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে যেসব পত্র লেখেন, তাহাতে এই গঠনমূলক হিন্দুত্বের বাণী ছিল। ব্রহ্মবান্ধব হিন্দুত্বের একনিষ্ঠতা বলিতে এই হিন্দু-জাতীয়তার কথা বলিয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথও 'হিন্দুত্ব'[৪] প্রবন্ধে এই ভাবধারা স্পষ্টতর করিয়া বর্ণনা করেন। সমসাময়িক রচনা 'নকলের নাকাল'[৫]এ রবীন্দ্রনাথের তীব্র স্বাদেশিকতা প্রতি ছত্রে প্রকাশ পাইয়াছে।

পত্রিকা সম্পাদনা ও পত্রিকা পরিচালনা এক জিনিস নহে। উপন্যাস লিখিয়া, প্রবন্ধ লিখিয়া সম্পাদকের কর্তব্য হয় বটে; কিন্তু বঙ্গদর্শনের ন্যায় পত্রিকাকে 'স্বাবলম্বী' করা কঠিন। জ্যৈষ্ঠ মাসে কবি দার্জিলিঙে ত্রিপুরার মহারাজের অতিথিরূপে গিয়াছিলেন; সেই সময়ে পত্রিকা পরিচালনার সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা উঠিলে তিনি তাঁহার স্বাভাবিক ঔদার্যবশে পত্রিকাটিকে আশ্রয় দান করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু রাজার মন ও রাজ-অনুচরদের মন ঠিক একই

১ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ, বঙ্গদর্শন ১৩০৮ জ্যৈষ্ঠ পৃ ৭৩,৭৪। স্বদেশ, গদ্য-গ্রন্থাবলী ১২শ। ভারতবর্ষ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪র্থ ৪১৬-৪৩৪

২ রেনাঁ—Renan, Ernest (1823-92) ফরাসী ঐতিহাসিক। বহু গ্রন্থের লেখক; তাঁহার Vie de Jesus (1863) বা যীশুখ্রীষ্টের জীবনী বিখ্যাত গ্রন্থ। বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থের আদর্শে শ্রীকৃষ্ণকে মানবরূপে তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রে বর্ণনা করেন। রেনাঁ নাকি বলিয়াছিলেন I may have lost my faith but not my reason.

রেনাঁর গ্রন্থ Qu'est-ce qu'une Nation (1882) গ্রন্থের কোনো অনুবাদ (What is a nation) হইতে রবীন্দ্রনাথ এই মত সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন।

৩ নেশন কি, বঙ্গদর্শন ১৩০৮ শ্রাবণ, পৃ ১৮৮-১৯২। আত্মশক্তি, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৩য়, পৃ ৫১৮-৫১৯।

৪ হিন্দুত্ব, বঙ্গদর্শন ১৩০৮ শ্রাবণ পৃ ১৭৯-৮৩। ভারতবর্ষীয় সমাজ, আত্মশক্তি। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৩য় পৃ ৫২০।

৫ বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ জ্যৈষ্ঠ। সমাজ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২শ, পৃ ২২৯।

ঔদার্যসূত্রে গ্রথিত নহে; রবীন্দ্রনাথ আগরতলা হইতে তাঁহার বন্ধু মহিমচন্দ্র ঠাকুরের পত্রে উহার আভাস পাইলেন। তদুত্তরে মহিমচন্দ্রকে লিখিলেন, "বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে যদি তোমাদের মনে লেশমাত্র দ্বিধা থাকে··· তোমাদের প্রতিশ্রুতি হইতে আমি তোমাদিগকে প্রসন্নমনে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি দান করিব— আমি মহারাজকে কোনো বিষয়ে সংকটে ফেলিতে চাই না।"[১]··· কয়েক দিন পরে (২৪ শ্রাবণ) মহারাজকে লিখিতেছেন যে তিনি বঙ্গদর্শনের জন্য আর্থিক সহায়তা লইবেন না। "কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার ব্যতীত কোনো মহৎ কার্যের মূল্য থাকে না— আমার যতদূর সাধ্য আছে বঙ্গদর্শন পরিচালনায় তাহার সীমা অতিক্রম করিলেই গৌরব লাভ করিব।" তবে জগদীশচন্দ্রকে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য তিনি মহারাজকে নিঃসংকোচে অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন।

বঙ্গদর্শনের বর্ণাশ্রমধর্ম ও সমাজবিষয়ক রচনা ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের মনীষা যে কত বিপরীত বিষয়কে একই কালে গ্রহণ ও সমন্বয় করিতেছে তাহা সমসাময়িক পত্রিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানবিষয়ক গবেষণা তিনিই সবপ্রথম বঙ্গদর্শনের পাঠকের জন্য সরলভাবে ব্যক্ত করেন।[২] এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া জগদীশচন্দ্র বিলাত হইতে লিখিলেন, "তুমি যে এত সহজে বৈজ্ঞানিক সত্য স্থির রাখিয়া এরূপ সুন্দর করিয়া লিখিতে পার, ইহাতে আমি আশ্চর্য হইয়াছি।"[৩]

বিজ্ঞানের তথ্যবিচারের সঙ্গে প্রায় পাশাপাশি রচনা শব্দ ও ভাষাতত্ত্ব লইয়া। শব্দতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিতে রবীন্দ্রনাথ যে বিশেষ আনন্দ পাইতেন তাহা আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি। আলোচ্য পর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ভাষা লইয়া একদফা আলোচনা শুরু হয়। সাহিত্যপরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে (১১ শ্রাবণ ১৩০৮) বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুগত বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়নের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপিত হয়। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ ভাষা সম্বন্ধে গবেষণার যে নূতন পন্থা নির্দেশ করিলেন, তাহা হইতেছে আধুনিক বাংলা-ব্যাকরণের বুনিয়াদ[৪]। তিনি বলিলেন, "সংস্কৃতের সহিত বাংলার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সহজে বুঝা যায়, কিন্তু কোথায় কোথায় কিরূপ পার্থক্য আছে সেগুলি লক্ষ্য করাই এখন আবশ্যক। তবেই ইহার বর্তমান আকৃতি জানা যাইবে, তবেই ব্যাকরণ-গঠনের চেষ্টা হইতে পারিবে।··· বাংলা ব্যাকরণ সংস্কৃতমূলক হইবে কেন? সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য বাংলায় বেশি বলিয়াই ভাষার গঠনাদিও সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে করিতে হইবে? বাংলা ভাষার প্রকৃতি কাঠামো যে সম্পূর্ণ তফাত ইহা না বুঝিলে চলিবে কেন? তবে সংস্কৃত ব্যাকরণ আলোচনা করা আবশ্যক, নতুবা আমরা ঠিক পথে চলিতে পারিব না।[৫] তবে বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুগামী হইবে না এ কথা অতি স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করিলেন।

এই সময় হইতে রবীন্দ্রনাথকে বাংলা খাঁটি শব্দ সংগ্রহ ও বাংলাভাষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনা কবিতে দেখি। রবীন্দ্রনাথের ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বাংলা ভাষার প্রকৃতিনির্ণয়ে পরিশ্রম দেখিয়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ইঁহাদিগকে বাংলাভাষার পাণিনি বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

১ পূর্বাশা, রবীন্দ্রস্মৃতি সংখ্যা, পৃ ১১০।

২ জড় কি সজীব? বঙ্গদর্শন ১৩০৮ শ্রাবণ। চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ ১১৬। রবীন্দ্রনাথ ইলেকট্রিশ্যান প্রভৃতি পত্রিকা হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধটি লেখেন। রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী (৫) ৩রা জুলাই, ১৯০১। দ্র প্রবাসী ১৩৩৩ মাঘ পৃ ৪৬৩। চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ খণ্ড পত্রসংখ্যা ১৫, পৃ ৩৪। রবীন্দ্রনাথের চিঠি (প্রবাসী ১৩৩৩ ফাল্গুন পৃ ৬৩৩) "তোমার স্পন্দন-রেখার খাতাখানি পাইয়া অনেকটা পরিষ্কার ধারণা হইল। বঙ্গদর্শনে এই-গুলি খোদাইয়া ছাপাইবার ইচ্ছা আছে।" চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ খণ্ড, পত্রসংখ্যা ১৩ পৃ ৩০।

৩ চিঠিপত্র ৬, পৃ ৯৭।

৪ বাংলা ব্যাকরণ, বঙ্গদর্শন ১৩০৮ পৌষ, পৃ ৪৪৫-৫৮। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২শ, পৃ ৫৬৪।

৫ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্যবিবরণ, ১৩০৮। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২শ খণ্ড, পৃ ৬৩২।

বাংলা ভাষা সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুগত হইয়া চলিবে না বলায় সাহিত্যিক ও শাব্দিকদের মধ্যে অচিরেই বাদ-প্রতিবাদ শুরু হইয়া গেল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা শব্দদ্বৈত' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩০৭ ১ম সংখ্যা), 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩০৭, ৪র্থ সংখ্যা) প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৩০৮ আশ্বিন ১২ তারিখে 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহা হইতে তর্কবিতর্ক শুরু হইল। শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী 'নূতন বাংলা ব্যাকরণ' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩০৮ অগ্রহায়ণ) লিখিয়া রবীন্দ্রনাথের যুক্তি ও বিশ্লেষণ খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথ 'বাংলা ব্যাকরণ' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া ২৪ অগ্রহায়ণের সভায় তাহার উত্তর দেন। রবীন্দ্রনাথের মত ছিল ব্যাকরণের সূত্র আবিষ্কারের পূর্বে বাংলা শব্দ ও idomএর উদাহরণ সংগ্রহ করা প্রয়োজন; চলতি ভাষার এই শব্দসম্পদ সংগৃহীত হইলে, নিয়ম আবিষ্কৃত হইবে পরে; কোনো মতকে পূর্বাহ্ণে অবলম্বন করিয়া উদাহরণ সংগ্রহ না করিয়া, সংগৃহীত উদাহরণ বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করিয়া মতে উপনীত হওয়া যথার্থ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কৃৎতদ্ধিতের উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া বাংলা ব্যাকরণের বুনিয়াদ গড়িলেন।[১]

রবীন্দ্রনাথ যাহাই করুন আর যাহাই লিখুন, তাঁহার কবিসত্তা সম্বন্ধে চেতনা কখনো ম্লান হয় নাই। তাঁহার চিন্তাপ্রণালী ও ভাবধারা অত্যন্ত জটিল— নৈবেদ্য কাব্যের সহিত বিনোদিনীর কাহিনী ও বর্ণাশ্রমধর্মের যোগ যে কোথায় তাহা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। এই সময়ে তিনি লেখেন 'কবিজীবনী'[২] 'কবিচরিত' 'কবির বিজ্ঞান'[৩]। প্রথমটি গদ্য প্রবন্ধ ইংরেজ কবি টেনিসনের জীবনীর সমালোচনা, অপর দুটি কবিতা। টেনিসনের পুত্র লর্ড হ্যালাম টেনিসন কবি-পিতার বিস্তৃত জীবনী লেখেন। বইখানি এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে। খুবই আগ্রহের সহিত কবিচরিত্র পাঠে তিনি প্রবৃত্ত হন, কিন্তু যাহা খুঁজিতেছিলেন তাহা পাইলেন না। তিনি সমালোচনাপ্রবন্ধে লিখিলেন, "কবি কোথায়, কাব্যস্রোত কোন্ গুহা হইতে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা তো খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ইহা টেনিসনের জীবনচরিত হইতে পারে, কিন্তু কবির জীবনচরিত নহে। বাস্তবিক পক্ষে, কবির কাব্যে এবং কবির জীবনে যদি কোনো নিগূঢ় যোগ থাকে; তবে সে যোগরহস্য উদ্‌ঘাটন চরিতাখ্যায়কের কর্ম নহে।"

এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া কবির মনে যে প্রশ্ন উঠে, তাহা তিনি প্রকাশ করেন 'কবিচরিত' কবিতায়। সেটি তাঁহার অন্তরের কথা। সে কথা হইতেছে এই—

বাহির হইতে দেখো না অমন করে,
আমায় দেখো না বাহিরে।
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহি রে।

এই কবিতা লিখিবার পরই বোধ হয় কবির মনে প্রশ্ন উঠে, কবিরা তবে কোন্ সত্যকে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যাকুল। কি তাহাদের অনুভূতি, কি-ই বা তাহাদের বাণী। তাহারই উত্তরে যেন বলিলেন 'কবির বিজ্ঞানে'—

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২শ খণ্ড, গ্রন্থপরিচয় পৃ ৬৩১ ও পাদটীকাসমূহ বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

২ কবিজীবনী, বঙ্গদর্শন ১৩০৮ আষাঢ়। দ্র সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৮ম, পৃ ৪৫২-৪৫৫।

৩ বঙ্গদর্শন ১৩০৮ জ্যৈষ্ঠ ১০৫-১০৬। উৎসর্গ নং ২১ (কবিচরিত), ২২ কবির বিজ্ঞান। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০ম খণ্ড ৩৬-৩৮।
Alfred, Lord Tennyson, a Memoir (2 vols) by Lord Hallam Tennyson, 1897.

আছি আমি বিন্দুরূপে, হে অন্তরযামী,
আছি আমি বিশ্বকেন্দ্রস্থলে।...
'আছি' আর 'আছে'
অন্তহীন আদি প্রহেলিকা, কার কাছে
শুধাইব অর্থ এর! তত্ত্ববিদ্‌ তাই
কহিতেছে, 'এ নিখিলে আর কিছু নাই,
শুধু এক আছে।' করে তারা একাকার
অস্তিত্বরহস্যরাশি করি অস্বীকার।
একমাত্র তুমি জান এ ভবসংসারে
যে আদি গোপন তত্ত্ব— আমি কবি তারে
চিরকাল সবিনয়ে স্বীকার করিয়া
অপার বিস্ময়ে চিত্ত রাখিব ভরিয়া।

সংসার

বঙ্গদর্শনের সম্পাদকত্বগ্রহণ করিলেও কবিকে সংসার দেখিতে হয়, মেয়ের বিবাহের কথা ভাবিতে হয়; পারিবারিক খুঁটিনাটি সমস্যার সমাধান তাঁহার অপেক্ষায় থাকে। কুষ্ঠিয়ার কারবারের শেষকৃত্য এখনো বাকি, লোকসানের অঙ্ক এখন বহু সহস্রের কোঠায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। পুরাতনের স্মৃতিকে কবি বিস্মৃতি-সাগরে ডুবাইতে চাহেন। কুষ্টিয়ার পর্বটাকে জীবন হইতে একেবারে মুছিয়া দিতে পারিলে তিনি যেন সুখী হন। অবশেষে করিলেনও তাই। তথাকার এক কর্মচারীকে সমস্ত কারবার দান করিয়া দিয়া তিনি যেন অন্তরে একটি তৃপ্তি বোধ করিলেন। তাঁহার কুষ্টিয়ার কাহিনী তাঁহার কাছে এতই বেদনাদায়ক ছিল যে ব্যক্তিগত পত্রাদির মধ্যে ছাড়া কোথায়ও তিনি কোনো কথা প্রকাশ করেন নাই।

এদিকে ১৩০৮ সালের গোড়ায় কবিকে তাঁহার শিলাইদহের বাস উঠাইয়া চলিয়া আসিতে হইল; মৃণালিনী দেবীর পক্ষে তথাকার অরণ্যবাস ক্রমেই ক্লান্তিকর হইয়া উঠিতেছে, তা ছাড়া জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের কথাবার্তা চলিতেছে। তখন কলিকাতায় প্লেগ দেখা দিয়াছে। রোগভীত লোকে দলে দলে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। রবীন্দ্রনাথ পরিবার বোলপুরে রাখিতে গেলেন; কিন্তু সেখান হইতে 'প্লেগের ভয়ে গৃহিণী যেতে দিচ্চেন না' লিখিলেন প্রিয়নাথকে। "আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে দুজন মেথরের মৃত্যু হয়েছে, এ অবস্থায় কোনো কাজের ওজর দেখিয়ে যে আমি ছুটি পাব এমন আশামাত্র নেই। চেষ্টা করে অবশেষে ক্ষান্ত হয়েছি। পত্রদ্বারা যতদূর হয় সেই উদ্যোগে আছি।" (পত্র। পাণ্ডুলিপি)। কিন্তু অবশেষে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন এবং প্লেগভীত লোকের মনে আশার বাণী প্রচারের ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া 'নানা সাংসারিক সংকটে বিজড়িত হইয়া' কবি 'অত্যন্ত পীড়িত চিত্তে' আছেন—'কোনো রকমে মনের অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিয়া লেখাপড়ায় মন দিতে' চান, কিন্তু সংসার তাঁহাকে ছাড়ে না। 'ইহার উপর শরীরটা কিছু ক্লিষ্ট'; সেইজন্য গ্রীষ্মকালে ত্রিপুরেশ্বর রাধাকিশোর মাণিক্যের সঙ্গে দার্জিলিং গেলেন। 'তাঁহার আতিথ্যে ও প্রকৃতির শুশ্রূষায় শরীর ও মনের স্বাস্থ্য লাভ' করিবেন প্রত্যাশা করিতেছেন। কিন্তু অধিক দিন থাকা সম্ভব হইল না; কারণ ইতিমধ্যে বেলার বিবাহ স্থির হইয়া গেল, দার্জিলিং হইতে জগদীশচন্দ্রকে লিখিতেছেন, "আমি এমনি হতভাগ্য, আমার কোনো বন্ধুই বিবাহে উপস্থিত থাকিবেন না। তুমি বিলাতে, লোকেন তথৈবচ, মহারাজ সে সময় বোধ করি আগরতলায়, নাটোর নীলগিরিতে। আমার গৃহে এই প্রথম বড় কাজ— কিন্তু তোমাদের অভাবে আমার উৎসব নিরানন্দ হইবে।"[১]

এই বিবাহ স্থিরীকৃত হইবার পূর্বে কবির বহু বিনিদ্র রজনী বোধ হয় গত হয়— তার চিত্র পাই প্রিয়নাথকে লিখিত পত্রধারা হইতে; প্রিয়নাথই ছিলেন মধ্যবর্তী। বিবাহের জন্য বহু অর্থ কবিকে দিতে হয়। কিন্তু বিবাহের পূর্বে জামাতাকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। মহর্ষি বিবাহের পূর্বে বরপণ দিবার ঘোর বিরোধী থাকায় সমস্তা

১ রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী। দ্র প্রবাসী ১৩৩৩ ফাল্গুন পৃ ৬৩৩। চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ২৩।

জটিল হইয়াছিল; যাহা হউক, বহু পত্রব্যবহার ও লক্ষ বাক্যক্ষয়ের পর বিবাহ স্থির হয়। মহর্ষি বিবাহের পর জামাতাকে পঞ্চসহস্র মুদ্রা দেন।

আষাঢ়ের গোড়ায়[১] মাধুরীলতার বিবাহ হইল। কন্যার বয়স এখন চৌদ্দ বৎসর। রবীন্দ্রনাথের তিন কন্যার কাহারও বিবাহ বেশি বয়সে হয় নাই। জামাতার নাম শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর চতুর্থ পুত্র। শরৎচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীছাত্র, প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে দর্শন শাস্ত্রে এম.এ.-তে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন; ১৮৯৪ সালে আইন পাস করিয়া মজঃফরপুরে ওকালতি করিতেছিলেন।[২] কন্যার বয়স আন্দাজে জামাতার বয়স বেশিই বলিতে হইবে; কিন্তু পিরালি ও তদুপরি ব্রাহ্মপরিবারের পক্ষে এরূপ উপযুক্ত জামাতা দুর্লভ। জামাতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে বিবাহের অল্পকাল পরেই লিখিতেছেন, "আমার জামাতাটি মনের মতো হইয়াছে। সাধারণ বাঙালি ছেলের মতো নয়। ঋজুস্বভাব, বিনয়ী অথচ দৃঢ়চরিত্র, পড়াশুনা ও বুদ্ধিচর্চায় অসামান্যতা আছে— আর-একটি মহদ্গুণ এই দেখিলাম, বেলাকে তাহার ভালো লাগিয়াছে।"

কন্যার বিবাহের পর রবীন্দ্রনাথ একাই উত্তরবঙ্গে বিরহামপুর গেলেন পুণ্যাহের জন্য। 'পুণ্যাহ অর্থে জমিদারী বৎসরের আরম্ভ দিন'। সেদিন প্রজারা যাহার যেমন ইচ্ছা কিছু কিছু খাজনা লইয়া কাছারিতে উপস্থিত হয়। সে টাকা সেদিন গণনা করিবার নিয়ম নাই। অর্থাৎ খাজনা দেনা-পাওনা যেন কেবলমাত্র স্বেচ্ছাকৃত একটা আনন্দের কাজ— এমনি একটা ভান করা হয়। যাহাই হউক, 'বাজনা বাদ্য উপাসনা ইত্যাদি করে' পুণ্যাহ সম্পন্ন হইল।

পুণ্যাহের উপাসনায় আচার্যের কাজ করিতে গিয়াছিলেন হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন। সেখানে পণ্ডিত মহাশয় হঠাৎ খুব অসুস্থ হইয়া পড়েন; রবীন্দ্রনাথের অক্লান্ত সেবায় তিনি নিরাময় হইয়া উঠিলেন। বিদ্যারত্ন পরে বলিয়াছিলেন, "রবিদাদার অসামান্য গুণপনা সন্দর্শন করিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। তিনি··· যেরূপ সেবাশুশ্রূষা ও চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। অধিক কি, রবিদাদা সেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম না করিলে বৃদ্ধের হাড় কয়খানি পদ্মাতেই রাখিয়া আসিতে হইত।···"[৩] এই পুণ্যাহ সম্বন্ধে পঞ্চভূতের ডায়ারিতে 'সৌন্দর্যের সম্বন্ধ' পরিচ্ছেদটি এই বিষয়ের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গেসঙ্গে এসব অনুষ্ঠান লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কবি শিলাইদহের বাড়িতে একলা আসিলেন। গত কয়েক বৎসর নিজ সংসার বলিতে যাহা বুঝায় তাহা এইখানেই গড়িয়াছিলেন; জোড়াসাঁকোর শরিকী বাড়ির হট্টগোল কোনোদিন তাঁহার ভালো লাগে নাই। এখান হইতে স্ত্রীকে লিখিত একখানি পত্রমধ্যে কবিচিত্তের এমন একটি দিকের সন্ধান পাওয়া যায় যাহা তাঁহার সাহিত্যের অপর কোথাও পাওয়া যায় না। তিনি লিখিতেছেন, "পশুর্দিন বিকালে শিলাইদহে এসে পৌঁছলুম। শূন্য বাড়ি হাঁ হাঁ করছে। মনে করেছিলুম অনেকদিন নানা গোলমালের পর একলা বাড়ি পেয়ে নির্জনে আরাম বোধ করব। কিন্তু যেখানে বরাবর সকলে মিলে থাকা অভ্যাস, এবং একত্রবাসের নানাবিধ চিহ্ন বর্তমান সেখানে একলা প্রবেশ করতে প্রথমটা কিছুতেই মন যায় না। বিশেষতঃ পথশ্রমে শ্রান্ত হয়ে যখন বাড়িতে এলুম তখন বাড়িতে কেউ সেবা করবার, খুশি হবার, আদর করবার লোক পেলুম না, ভারি ফাঁকা বোধ হল।"[৪]

১ রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলার সহিত শরৎচন্দ্রের বিবাহের ঘটকালি করেন প্রিয়নাথ সেন। বিহারীলাল চক্রবর্তীর বংশ প্রিয়নাথ সেন ও তাঁহাদের সমগ্র গোষ্ঠীর পুরোহিত ছিলেন।— আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৫২। রবীন্দ্রনাথের চিঠি, ৮, ১২, ১৯। বিবাহ আষাঢ়ের গোড়ায় হয়। খুব সম্ভব ১ আষাঢ়, দ্র চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ ১৯৩। ২১ জ্যৈষ্ঠ [১৩০৮] জগদীশচন্দ্রকে লিখিতেছেন 'বেলার বিবাহের আর ১০।১১ দিন বাকী আছে।' রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী দ্র প্রবাসী ১৩৩৩ মাঘ, পৃ ৪৬৩। চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ২৯। দ্র বসন্তকুমার গুপ্তকে লিখিত পত্র, শনিবারের চিঠি ১৩৪৮ কার্তিক।

২ ৩ জুলাই ১৯০১ (১৯ আষাঢ়) কবি জগদীশচন্দ্রকে লিখিতেছেন, "এইবার শিলাইদহ হইতে ফিরিয়া গিয়া বেলাকে মজঃফরপুরে তাহার স্বামীগৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতে হইবে।"— প্রবাসী ১৩৩৩ মাঘ পৃ ৪৬৩। চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ৩০।

৩ জন্মভূমি ৯ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা, ১৩০৮ আষাঢ় পৃ ৩৭৪।

৪ চিঠিপত্র ১ম, পৃ ৭১

'পুণ্যাহের গোলমাল চুকে যাওয়ার পর থেকে' কবি লেখায় হাত দিয়াছেন। যে নির্জনতা একটু পূর্বে অসহ্য বোধ হইয়াছিল— সেই 'নির্জনতা··· সম্পূর্ণ আশ্রয় দান করেছে।' এইখানে লেখেন 'মেঘদূত' নামে প্রবন্ধ (বঙ্গদর্শন ১৩০৮ শ্রাবণ) যাহা 'বিচিত্র প্রবন্ধে' (১৩১৪) 'নববর্ষা' নাম দেওয়া হয়। এই প্রবন্ধটি সম্বন্ধে 'চিঠিপত্রে' লিখিতেছেন— "চারিদিকের সবুজ ক্ষেতের উপরে স্নিগ্ধ তিমিরাচ্ছন্ন নবীন বর্ষা ভারি সুন্দর লাগচে।··· প্রবন্ধের উপর আজকের এই নিবিড় বর্ষার দিনের বর্ষণমুখর ঘনান্ধকারটুকু যদি এঁকে রাখতে পারতুম, যদি আমার শিলাইদহের সবুজ ক্ষেতের উপরকার এই শ্যামল আবির্ভাবটিকে পাঠকদের কাছে চিরকালের জিনিস করে রাখতে পারতুম তাহলে কেমন হত!"[১]

শিলাইদহ হইতে ফিরিয়া রবীন্দ্রনাথ কন্যাকে লইয়া মজঃফরপুর জামাতাগৃহে যান। জামাতা শরৎচন্দ্র তথাকার উকিল। মজঃফরপুর হইতে কবি মৃণালিনী দেবীকে লিখিতেছেন, "তোমার মেয়েকে জিজ্ঞাসা কোরো জামাইবাড়ি এসে আমি কি রকম সাজসজ্জায় মনোযোগ করেছি। ঢাকাই ধুতি চাদর ছাড়া আর কথা নেই। এখানকার লোকেরা জানে আমি শরতের শ্বশুর, বঙ্গদর্শনের সম্পাদক, ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষ, জগদ্বিখ্যাত মাননীয় শ্রদ্ধাস্পদ রবি ঠাকুর, আমার বেশভূষা দেখে তাদের চক্ষু স্থির হয়ে গেছে।"[২] কবি জামাতা সম্বন্ধেও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন।

এই মজঃফরপুরে কবিবরের সম্মানার্থ মুখার্জি সেমিনারীতে একটি সভা হয় (১ শ্রাবণ ১৩০৮)। প্রবাসী বাঙালিদের তরফ হইতে তাঁহাকে মানপত্র দান করা হয়; আমাদের মনে হয়, ইহাই কবিজীবনের সর্বপ্রথম মানপত্র।[৩] প্রসঙ্গত বলিতে পারি রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রথম অনুবাদ হিন্দিতেই 'সরস্বতী' নামক এক কাগজে এই সময়ে প্রকাশিত হয়; রচনাটি হইতেছে তাঁহার 'মুক্তির উপায়' গল্প।[৪]

মজঃফরপুর হইতে কবি শান্তিনিকেতনে আসিলেন; কন্যাকে স্বামীগৃহে রাখিয়া আসিয়া মন ভারাক্রান্ত; শান্তিনিকেতন হইতে স্ত্রীকে যে দীর্ঘ পত্রখানি লেখেন তাহা যেন নিজের মনকেই প্রবোধ দেওয়ার জন্য লেখা। পত্রশেষে আছে, "আজ শান্তিনিকেতনে এসে শান্তিসাগরে নিমগ্ন হয়েছি। মাঝে মাঝে এ-রকম আসা যে কত দরকার তা না এলে দূর থেকে কল্পনা করা যায় না।"[৫] কিছুকাল হইতে শান্তিনিকেতনে একটি বোর্ডিং স্কুল খুলিবার কথা কবির মনে জাগিতেছিল। কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া জগদীশচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন, "শান্তিনিকেতনে বাস করিয়া আরাম লাভ করিয়াছি। সেখানে একটা নির্জন অধ্যাপনের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টায় আছি।"[৬] শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

কলিকাতায় ফিরিবার কয়েকদিনের মধ্যে তাঁহার মধ্যমা কন্যা রেণুকার বিবাহ হইল (২৪ শ্রাবণ ১৩০৮)— জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের দেড় মাস পরে। জগদীশচন্দ্রকে লিখিতেছেন, "একটি ডাক্তার বলিল, বিবাহ করিব— আমি বলিলাম, কর। যেদিন কথা তাহার তিন দিন পরেই বিবাহ সমাধা হইয়া গেল। এখন ছেলেটি তাহার অ্যালোপ্যাথি

১ চিঠিপত্র ১ম খণ্ড, পৃ ৭৫-৭৬।

২ চিঠিপত্র ১ম খণ্ড, পৃ ৮৫।

৩ প্রবাসী ১ম বর্ষ ১৩০৮, ভাদ্র পৃ ২০৫। মজঃফরপুর জজকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিতেছেন, "গত ১লা শ্রাবণ [১৩০৮] কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্মানার্থ স্থানীয় মুখার্জি সেমিনারীতে একটি সভা আহূত হয়। সেই সভায় এখানকার প্রবাসী বাঙালিদিগের পক্ষ হইতে কবিবরকে একখানি মানপত্র দেওয়া হয়।" মানপত্রখানি শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যায় (১৩৬৫, পৃ ৯৩-৯৬) প্রকাশিত হইয়াছে।

৪ রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী, জগদীশচন্দ্রকে লিখিত। দ্র প্রবাসী ১৩৩৩ চৈত্র পৃ ৭৬৬। চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ ৩৬-৩৭।

৫ চিঠিপত্র ১ম খণ্ড, পৃ ৯২।

৬ ২৫ জুলাই ১৯০১ [৯ শ্রাবণ ১৩০৮] প্রবাসী ১৩৪৮ আশ্বিন, চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ৩৩।

ডিগ্রির উপর হোমিয়োপ্যাথিক চূড়া চড়াইবার জন্য আমেরিকা রওনা হইতেছে।"[১] বিবাহের দিন রাধাকিশোর মাণিক্যকে লিখিতেছেন, "পাত্রটি মনের মত হওয়ায় দুই-তিন দিনের মধ্যেই বিবাহ স্থির" করিতে হইয়াছিল।[২]

রেণুকা বা রানীর বিবাহের বয়স হয় নাই, তাহার বয়স সাড়ে এগারো মাত্র। জামাতার নাম সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য; বোধ হয় বিদেশে যাইবার অভিপ্রায়ে এই বালিকাকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এত কাল বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে গদ্যে পদ্যে বহু রচনা লিখিয়া অবশেষে স্বয়ং সেই জিনিসটা সমর্থন করিলেন কি করিয়া— বাণী ও জীবনের মধ্যে এ অসংগতি কেন, তাহার সদুত্তর নাই। তবে বিবাহের পরই ফুলশয্যার পূর্বে তিনি জামাতাকে বিদেশে রওনা করিয়া দিলেন— ইহাই কবির সপক্ষে একমাত্র যুক্তি।

রবীন্দ্রনাথের এই কন্যাটি তাঁহার অন্যান্য সন্তান হইতে একটু পৃথক ধরনের ছিল; তাহাকে লইয়া কবিকে ও তাঁহার পত্নীকে অনেক অশান্তি ভোগ করিতে হয়। ঊর্মিলা দেবী 'কবিপ্রিয়া' প্রবন্ধে[৩] লিখিয়াছেন, "রানী এক অদ্ভুত মেয়ে ছিল। কি যে এক সন্ন্যাসিনীর মন নিয়ে এসে জন্মেছিল ঐশ্বর্যের মধ্যে··· শিশুকাল থেকে তার সাজগোজ ভালো লাগত না··· মাছমাংস খাওয়ার স্পৃহামাত্র ছিল না। কিন্তু জেদ ছিল প্রচণ্ড।··· বকুনি শাসন শাস্তি সবেতেই অচল অটল। কবি কিন্তু তাঁর এই মেয়েটিকে খুব ভালোবাসতেন।" রানীর বিবাহের কয়েক দিন পূর্বে কবি তাঁহার স্ত্রীকে লিখিয়াছিলেন, "রানীও যদি বিবাহ করে দূরে যায় তা হলে ওর ভালই হবে। অবশ্য প্রথম বছর-দুই আমাদের কাছে থাকবে— কিন্তু তার পরে বয়স হলেই ওকে সম্পূর্ণ ভাবেই দূরে পাঠানো ওর মঙ্গলের জন্যই দরকার হবে। আমাদের পরিবারের শিক্ষা রুচি অভ্যাস ভাষা ও ভাব অন্য সমস্ত বাঙালি পরিবার থেকে স্বতন্ত্র— সেইজন্যই বিবাহের পর আমাদের মেয়েদের একটু দূরে যাওয়া বিশেষ দরকার। নইলে নূতন অবস্থার প্রত্যেক ছোটখাট খুঁটিনাটি অল্প অল্প পীড়ন ক'রে স্বামীর প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা ও নির্ভরকে শিথিল করে দিতে পারে। রানীর যে রকম প্রকৃতি— বাপের বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেই ও শুধরে যাবে— আমাদের সঙ্গে নিকট যোগ থাকলে ওর পূর্ব association যাবে না।"[৪] 'ঘরজামাই'-প্রথার কুফল সম্বন্ধে কবি অবগত বলিয়াই এ কথা লিখিলেন বটে কিন্তু পরে নিজেই সেই ভুলটি করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দুঃখের বোঝা তাঁহাকে বহন করিতে হয়।

রানীর বিবাহের পর শিলাইদহের গৃহবিদ্যালয় উঠাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। রথীন্দ্রনাথকে লরেন্স নামে যে সাহেব পড়াইতেন তাঁহাকে কবি বিদায় দিবার কথা ভাবিতেছেন। 'শান্তিনিকেতনের বোর্ডিং বিদ্যালয়ে রথীকে'[৫] পড়াইবেন ঠিক করিলেন বটে, কিন্তু নানা কারণে কলিকাতা হইতে বাহিরে যাইতে পারিতেছেন না; তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নীতুর পীড়া অত্যন্ত সংশয়াপন্ন অবস্থায় আসায় তাঁহাকে 'ক্রমাগত রাত্রি জাগরণ' করিতে হইতেছে, দুশ্চিন্তায় শরীর মন ক্লান্ত। নীতীন্দ্র দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র, কবি ও কবিজায়ার খুবই প্রিয়। ভ্রাতুষ্পুত্রদের মধ্যে কবি বলেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথকে বিশেষ স্নেহ করিতেন সত্য, কিন্তু নীতীন্দ্র তাঁহাকে স্নেহাসক্ত করিয়াছিল তাহার সৌন্দর্যবিলাস ও কর্মক্ষমতার জন্য। তাহার বাগানের শখ ছিল প্রচণ্ড। রবীন্দ্রনাথ কি উহাকেই মনে করিয়া 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র অবিনাশ, 'গোরা'র আদিত্য প্রভৃতিকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন?

সংসার ও পরিবারের প্রতি কর্তব্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিষ্ঠা তুলনাহীন; তাঁহার ন্যায় অতি স্নেহশীল পিতা কমই মেলে, তাঁহার ন্যায় ধৈর্যশীল স্বামীও দুর্লভ। তাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গণ্ডিবদ্ধ পরিবারের মধ্যে তাঁহার সকল শক্তি নিঃশেষ করেন নাই, বাহিরের জগতের অসংখ্য বন্ধনে তিনি ধরা

১ রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী, প্রবাসী ১৩৩৩ চৈত্র পৃ ৭৬৫। চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ৩৭।

২ বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৪৯ আশ্বিন, পৃ ১৭০।

৩ বিশ্বভারতী পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ ১৩৫২, পৃ ২৪৭।

৪ চিঠিপত্র ১ম খণ্ড, পৃ ৯০-৯১।

৫ পত্র ১৮ ভাদ্র ১৩০৮। পূর্বাশা, রবীন্দ্রস্মৃতি সংখ্যা, পৃ ১০৮।

দিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিলেই বিবিধ কাজ তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলে। চিরদিনই দেখিয়াছি কাজকে তিনি নিন্দা করেন, কিন্তু কাজ না করিয়াও থাকিতে পারেন না ; অবসরের জন্য মন সর্বদাই চঞ্চল, আবার কাজ না থাকিলে অবসর বোঝা হইয়া উঠে ; রবীন্দ্রনাথের এই paradoxes হইতেছে তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য। বঙ্গদর্শন-সম্পাদন ও তাহার জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা, শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ, বিলাতে জগদীশচন্দ্রের জন্য অর্থ-সাহায্য প্রেরণের ব্যবস্থা প্রভৃতি পাঁচ কাজে মন উদ্‌ভ্রান্ত, ইহারই সঙ্গে লিখিতেছেন বঙ্গদর্শনের জন্য বিচিত্র রচনা—সাহিত্যিক সামাজিক বৈজ্ঞানিক।

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের পরিকল্পনা

পাঠকদের স্মরণ আছে রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন মাত্র দুই বৎসর, সেই সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বোলপুরের নিকট বিশ বিঘা জমি রায়পুরের সিংহদের নিকট হইতে খরিদ করেন (১৮ ফাল্গুন ১২৬৯। ১ মার্চ ১৮৬৩)। কালে সেখানে একখানি অট্টালিকা নির্মিত হয় ; তাহাই 'শান্তিনিকেতন' নামে পরিচিত ছিল। ইহার পঁচিশ বৎসর পর (১২৯৪) দেবেন্দ্রনাথ ট্রাস্ট ডীড করিয়া এই অট্টালিকা-সংলগ্ন জমি উৎসর্গ করেন ; ও নিজ জমিদারির কিয়দংশ শান্তিনিকেতনের ব্যয় নির্বাহের জন্য দেবত্র করিয়া দেন। ট্রাস্ট ডীড অনুসারে তথায় কোনো মূর্তি বা প্রতিমা বা প্রতীক পূজা হইতে পারে না। কোনো ধর্মের নিন্দা, মদ্য মৎস্য মাংস-ভোজন ও জীবহত্যা নিষিদ্ধ ; নিন্দনীয় আমোদ আহ্লাদও হইতে পারে না।[১]

দেবেন্দ্রনাথের আশা ছিল শান্তিনিকেতন নির্জন সাধনকামীদের আশ্রম হইবে। সাধনকামীদের উপাসনার জন্য ১২৯৮ সালে শান্তিনিকেতনের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। সেইসঙ্গে সাতই পৌষের উৎসব ও পরে মেলা প্রবর্তিত হয়। যে কারণেই হউক, শান্তিনিকেতন যে উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা সফল হইল না। আশ্রম-পরিচালনার ভার অর্পিত হইল নলহাটি-নিবাসী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপর— মহর্ষির অন্যতম শ্রদ্ধাশীল ভক্ত হিসাবে এককালে তাঁহার খ্যাতি ছিল। বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার রচিত কয়েকখানি গ্রন্থও উত্তরকালে তাঁহাকে যশস্বী করিয়াছিল। মন্দিরের উপাসনা ও স্বাধ্যায় পাঠাদি করিতেন অচ্যুতানন্দ পাঠক, উত্তরভারতে তাঁহার বাড়ি। মন্দিরে সকাল-সন্ধ্যায় ব্রহ্মসংগীত গাহিতেন দুইজন স্থানীয় বেতনভোগী লোক। ইঁহারাই দৈনন্দিন কার্য চালাইতেন। বৎসরান্তে সাতই পৌষের উৎসবের সময় কলিকাতা হইতে বহু জনসমাগম হইত ; এক দিনের জন্য জনহীন প্রান্তর আনন্দে আবেগে ব্রহ্মনামকীর্তনে মুখর হইয়া উঠিত, একটি সন্ধ্যা দীপসজ্জার আলোকোৎসবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। এইভাবে প্রায় দশ বৎসর কাটিয়া যায়।

মাঝে মাঝে মহর্ষির পুত্র কন্যা জামাতা পৌত্র দৌহিত্রের মধ্যে কেহ কেহ 'শান্তিনিকেতনে'[২] আসিয়া বাস করিয়া যাইতেন ; কলিকাতার কোলাহল হইতে কয়েক দিনের জন্য এই গ্রামের মধ্যে আসাটা স্থানপরিবর্তন হিসাবে ভালোই লাগিত। ইতিমধ্যে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনের একটি 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' স্থাপনের পরিকল্পনা করেন।[৩] বলেন্দ্রনাথের প্রতিভা সর্বতোমুখী ; সাহিত্য-অনুশীলনে তিনি তাঁহার খুল্লতাতের পথাশ্রয়ী ; জীবনে আর্থিক উন্নতির জন্য তিনি প্রপিতামহ দ্বারকানাথের ন্যায় ব্যবসায়বাণিজ্যে মনোযোগ দেন ও কুষ্টিয়ায় ঠাকুর কোম্পানির কারবার খোলেন ; পিতামহের আধ্যাত্মিক সম্পদকে আরও ঐশ্বর্যশালী করিবার উদ্দেশ্যে নিখিল একেশ্বরবাদীদের মধ্যে একটি যোগ সংস্থাপনের পরিকল্পনা করেন। মহর্ষি কাহাকেও কোনো কার্যে বাধা দিতেন না ; তিনি বলেন্দ্রনাথকে তাঁহার

১ বর্তমানে 'শান্তিনিকেতন' অট্টালিকার দ্বিতলে বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনের গ্রন্থাগার ও পাঠাগার ; একতলায় ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব।

২ দ্র রবীন্দ্রজীবনী, ৪র্থ খণ্ড সংযোজন, পৃ ২৭৪।

৩ ১৩০৪ সালে পরিকল্পিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের নিয়মাবলী বলেন্দ্রনাথ কৃত খসড়া। দ্র রবীন্দ্র-জীবনী ৪র্থ খণ্ড, সংযোজন, পৃ ২৭৩।

মহৎপরিকল্পনা কর্মে রূপান্তরিত করিবার জন্য অনুমতি দান করেন। তদুদ্দেশে বলেন্দ্রনাথ পঞ্জাবে গিয়া আর্য-সমাজীদের সহিত পরিচিত হন। কিন্তু তিনি অচিরেই আবিষ্কার করিলেন ধর্ম হইতে সংস্কার মানুষের মধ্যে প্রবল। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন, একেশ্বরবাদ দেশমধ্যে প্রচার করিতে হইলে উহা শিক্ষা দিবার জন্য অনুকূল কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। তদনুসারে তিনি শান্তিনিকেতনের নির্জন প্রান্তরে 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' স্থাপনের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি যে নিয়মাবলীর খসড়া প্রস্তুত করেন, তাহাতে স্পষ্টই লেখা ছিল, 'ব্রাহ্মধর্মানুমোদিত শিক্ষাপ্রণালী' অনুসারে কার্য পরিচালিত হইবে। এমনকি পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে 'পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম' মূল 'ব্রাহ্মধর্ম' ও 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' অবশ্যপাঠ্য হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ের জন্য বলেন্দ্রনাথ যে একতল গৃহ নির্মাণ করেন, সেটি এখন বিশ্বভারতীর বিরাট গ্রন্থাগারের অন্তর্গত সম্মুখের তিনখানি ঘর ও বারান্দা।

বলেন্দ্রনাথের সকল কার্যেই রবীন্দ্রনাথের যোগ ছিল; কিন্তু এই 'ব্রহ্মবিদ্যালয়'-পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের কোনো যোগ ছিল বলিয়া কোনো প্রমাণ পাই না। রবীন্দ্রনাথ সেই সময় হইতে শিলাইদহে নিজ সন্তানদের জন্য গৃহবিদ্যালয় স্থাপনে পরিকল্পনারত। বলেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুতে (ভাদ্র ১৩০৬) তাঁহার আকাঙ্ক্ষা কার্যকরী হয় নাই। দুই বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের পরিকল্পনাকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পরিণত করিলেন, বলেন্দ্রনাথের আরব্ধকার্য রবীন্দ্রনাথ ব্যাপকতর ক্ষেত্রে সফল করিয়া তুলিলেন।

শান্তিনিকেতনের সহিত রবীন্দ্রনাথের আবাল্যের সম্বন্ধ আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিয়াছি। সাম্বৎসরিক উৎসবাদি ছাড়াও তিনি আরও পাঁচজনের ন্যায় শান্তিনিকেতনে আসিয়া মাঝে মাঝে বাস করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এই তীর্থকেই যে তিনি তাঁহার জীবনের কর্মকেন্দ্র ও সাধনপীঠ করিবেন এ চিন্তা মনে আসে নাই। ১৩০৭ সালের দশম সাম্বৎসরিক পৌষ উৎসবে মহর্ষির ইচ্ছানুসারে রবীন্দ্রনাথকে আচার্যের কার্য করিতে হয় ও তদনুসারে তিনি 'ব্রহ্মমন্ত্র' নামে ভাষণ রচনা ও পাঠ করেন। মন্দিরের আচার্যরূপে বেদিগ্রহণ এই দ্বিতীয়। ইহার পূর্বে ৭ পৌষ ১৩০৬ (ডিসেম্বর ১৮৯৯) নবম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষ্যে 'ব্রহ্মোপনিষদ' নামে প্রথম ভাষণ দেন।[১] তখনো 'বোর্ডিং স্কুল' বা আশ্রম স্থাপনের কথা মনে হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সন্তানদের শিক্ষার জন্য শিলাইদহে কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার কথা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি। ১৩০৮ সালের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহের বাস উঠাইয়া কলিকাতায় আসেন। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে মাস-দেড় ব্যবধানের মধ্যে তাঁহার দুই কন্যার বিবাহ হইয়া গেল। মৃণালিনী দেবী শিলাইদহে গিয়া আর থাকিতে রাজি হন নাই বলিয়া মনে হয়। আষাঢ় মাসে রবীন্দ্রনাথ 'পুণ্যাহের জন্য' শিলাইদহে গিয়া স্ত্রীকে যে পত্র দেন তাহার মধ্যে শান্তিনিকেতনে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাসের ইচ্ছার আভাস পাওয়া যায়। পত্রে তিনি লিখিতেছেন, "নির্জনতায় তোমাদের পীড়া দেয়···। কলকাতার জনতা ছেড়ে হঠাৎ এখানকার মতো শূন্যস্থানের মধ্যে এসে পড়ে প্রথম কিছুদিন নিশ্চয়ই তোমাদের ভালো লাগবেনা— এবং তার পরে সয়ে গেলেও ভিতরে ভিতরে একটা রুদ্ধ অধৈর্য থেকে যাবে। কিন্তু কি করি বল, কলকাতার ভিড়ে আমার জীবনটা নিষ্ফল হয়ে থাকে— সেই জন্যে মেজাজ বিগড়ে গিয়ে প্রত্যেক তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আক্ষেপ করতে থাকি— সকলকে মনের সঙ্গে ক্ষমা করে বিরোধ ত্যাগ করে অন্তঃকরণের শান্তি রক্ষা করে চল্‌তে পারিনে। তা ছাড়া সেখানে রথীদের উপযুক্ত শিক্ষা কিছুতেই হয় না— সকলেই কি রকম উড়ু উড়ু করতে থাকে! কাজেই তোমাদের এই নির্বাসনদণ্ড গ্রহণ করতেই হবে। এর পরে যখন সামর্থ্য হবে তখন এর চেয়ে ভালো জায়গা বেছে নিতে হয় তো পারব, কিন্তু কোনোকালেই আমি কলকাতায় নিজের সমস্ত শক্তিকে গোর দিয়ে থাক্‌তে পারব না।"[২]

১ দ্র রবীন্দ্রজীবনী, ৪র্থ খণ্ড, সংযোজন পৃ ২৭৪

২ চিঠিপত্র ১ম খণ্ড, পৃ ৭৪-৭৫ [শিলাইদহ, আষাঢ় ১৩০৮]

রবীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতনে গিয়া বাস করা সম্বন্ধে তাঁহার ইচ্ছা ও আশ্রমে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংকল্প তাঁহার পিতার নিকট বোধ হয় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এই সময়ে নৈবেদ্য কাব্যখণ্ড পুস্তকাকারে প্রকাশিত ও পিতাকে উৎসর্গিত হয়। মহর্ষি বুঝিতে পারিলেন, রবীন্দ্রকে দিয়াই তাঁহার আরব্ধ কার্য সম্পন্ন হইবে; তিনি দিব্যচক্ষে দেখিলেন, "যে-সাধনা গোপনে পর্বতের গুহার মধ্যে নির্ঝরের মতো লুকানো ছিল সে লোকালয়ে নদীর কল্যাণধারার মতো এক্ষণে প্রবাহিত হইয়া চলিল।" মহর্ষির উৎসাহ ও আশীর্বাদ বহন করিয়া রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে বিদ্যালয় স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে 'বোর্ডিং স্কুল' পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহার আর্থিক অবস্থা এই গুরুভার গ্রহণের পক্ষে অনুকূল ছিল না। তখন তিনি জমিদারির মালিক নহেন, আর পাঁচ জনের মত এস্টেট হইতে দুই শত টাকা মাসহারা পাইয়া থাকেন। ইহার উপর কুষ্টিয়ার ব্যবসায় নষ্ট হওয়ায় তাঁহার স্কন্ধে বহু সহস্র টাকার ঋণের বোঝা চাপিয়া গিয়াছিল। তাঁহার স্বল্প মাসহারা হইতেই ঐসব দেনার সুদ গুনিতে হইত। সুতরাং যথেষ্ট ত্যাগ ও দুঃখ স্বীকার করিয়াই তাঁহাকে এই কর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইল। আত্মীয়স্বজনেরা তাঁহার এই অদ্ভুত খেয়ালের কোনো অর্থ খুঁজিয়া পাইলেন না, সকলেই বিরূপ।

মহর্ষির প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে বলেন্দ্রনাথ ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের সংকল্প করেন, রবীন্দ্রনাথ উভয়ের মিলনে গড়িলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম।[১] প্রতিষ্ঠান মাত্রেরই অন্তরে আছে ভাব, বাহিরে আছে রূপ। ভাব হইতে রূপে ও রূপ হইতে ভাবের বাধাহীন চলাচলে প্রতিষ্ঠান প্রাণ পায়। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলেন তাহা ভাবের দিক হইতে আশ্রম ও রূপের দিক হইতে বিদ্যালয়। ভাবের স্পর্শে রূপ তাহার সামান্যতা বিসর্জন দিয়া অপরূপ হয়। বিচিত্র ভাবের আত্মপ্রকাশের ও বিবিধ রূপের বহিঃপ্রকাশের সমন্বয় হইয়াছে শান্তিনিকেতনে।

রবীন্দ্রনাথ আদর্শবাদী ভাবুক কবি হইলেও বিষয়জ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন। সুতরাং ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জন্য দৃঢ়ভিত্তি আদর্শের সন্ধানও করিতেছিলেন যেমন নিষ্ঠাসহকারে, ব্যবহারিক দিক হইতে বিদ্যালয়কে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টাও করিতেছিলেন তেমনি নিরলসভাবে। সুতরাং ভাবপ্রকাশ ও রূপসৃষ্টির এই যুগ্ম প্রচেষ্টাকে পৃথক ভাবেই দেখানো উচিত।

মজঃফরপুর হইতে ফিরিবার পথে শ্রাবণ মাসের (১৩০৮) গোড়ার দিকে শান্তিনিকেতনে কয়েকদিন বাস করিয়া কবি কলিকাতায়[২] আসিয়া বিলাতপ্রবাসী বন্ধু জগদীশচন্দ্রকে লিখিতেছেন (৯ই), শান্তিনিকেতনে "একটা নির্জন অধ্যাপনের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টায় আছি। দুই-একজন ত্যাগ-স্বীকারী অধ্যাপকের সন্ধানে ফিরিতেছি।" বোধ হয় তখনই ব্রহ্মবান্ধব ও রেবাচাঁদের[৩] সহিত কথাবার্তা হইতেছিল। শ্রাবণের শেষ দিকে মহিমচন্দ্র ঠাকুরকে লিখিতেছেন, "আমাদের বোলপুর আশ্রমের সেই বিদ্যালয়টা স্থাপন করিবার আয়োজনেও ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে।" কয়েকদিন পরে পুনরায় লিখিতেছেন, "আমাদের শান্তিনিকেতনের বোর্ডিং বিদ্যালয়ে রথীকে পড়াইব, সেইজন্য লরেন্সকে অত্যন্ত দুঃখের সহিত বিদায় দিতে হইতেছে।... সেখানে বিদ্যালয়টি যাহাতে আদর্শ বিদ্যালয় হইতে পারে এই আমার একমাত্র চেষ্টা।"[৪] প্রায় এই সময়েই জগদীশচন্দ্রকে লিখিতেছেন, "শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীন কালের গুরুগৃহ-বাসের মত সমস্ত নিয়ম। বিলাসিতার নামগন্ধ থাকিবে

১ দ্র রবীন্দ্রজীবনী, ৪র্থ খণ্ড: সংযোজন, পৃ ২৭৫।

২ দ্র রবীন্দ্রজীবনী, ৪র্থ খণ্ড: সংযোজন, পৃ ২৭৫।

৩ রেবাচাঁদ পরে অণিমানন্দ নাম গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় বিখ্যাত Boys' Own Home স্থাপন করেন। তাঁহার মৃত্যু হয় ১৯৩৬ এ।

৪ পূর্বাশা রবীন্দ্রস্মৃতি সংখ্যা, পৃ ১০৮-১০৯।

না— ধনী দরিদ্র সকলকেই কঠিন ব্রহ্মচর্য না শিখিলে আমরা প্রকৃত হিন্দু হইতে পারিব না। অসংযত প্রবৃত্তি এবং বিলাসিতায় আমাদিগকে ভ্রষ্ট করিতেছে— দারিদ্র্যকে সহজে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না বলিয়াই সকল প্রকার দৈন্যে আমাদিগকে পরাভূত করিতেছে।"[১]

১৩০৮ সালের আশ্বিন মাসে কবি সপরিবারে শান্তিনিকেতনে আছেন। বিলাতপ্রবাসী জগদীশচন্দ্রকে লিখিতেছেন, "তুমি এখানে কখনো আস নাই। জায়গাটি বড়ো রমণীয়।... কলিকাতার আবর্তের মধ্যে আমার আর কিছুতেই ফিরিতে ইচ্ছা করে না।... পূর্বেই লিখিয়াছি এখানে একটি বোর্ডিং বিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন করিয়াছি। পৌষ মাস হইতে খোলা হইবে। গুটি দশেক ছেলেকে আমাদের ভারতবর্ষের নির্মল শুচি আদর্শে মানুষ করিবার চেষ্টায় আছি।"[২]

এই পত্রগুলি হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, শান্তিনিকেতন আশ্রমে একটি 'বোর্ডিং বিদ্যালয়' বা শিলাইদহের গৃহবিদ্যালয়ের একটি বৃহত্তর সংস্করণ স্থাপনের সংকল্প তাঁহার মনে উদিত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ধনী ও মানী ব্যক্তির পক্ষে একটি বোর্ডিং বিদ্যালয় এমনকি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনের কোনোই অর্থ হয় না, যদি সেই বিদ্যালয়ের মধ্যে কোনো অসামান্যতা না থাকে। অর্থাৎ বিদ্যালয়-স্থাপনের মূলে কোনো ভাব ও তাহার অন্তরে কোনো আদর্শবাদ দেখিতে না পাইলে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মনীষীর পক্ষে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া কঠিন। তাই 'বোর্ডিং বিদ্যালয়ে'র কথা মনে হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই তাঁহার কবিচিত্ত কল্পনায় বহু-কিছু সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। মনের এই দ্বৈত ইচ্ছা জগদীশচন্দ্রকে লিখিত পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে; তাহার পর যতই দিন যাইতে লাগিল, ব্রহ্মচর্যাশ্রম সম্বন্ধে তাঁহার কবিকল্পনা ততই নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া তাঁহার নিকট পরম মনোরম হইয়া উঠিতে লাগিল।

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের কালটি নৈবেদ্য রচনা ও বঙ্গদর্শন সম্পাদনের সমকালীন; নৈবেদ্যের কবিতার মধ্যে ও বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বর্ণাশ্রমধর্ম হিন্দুত্ব প্রভৃতির যেসব ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন তাহার প্রভাব তাঁহার নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের মধ্যে নানাভাবে দেখা দিয়াছিল। ত্রিপুরার মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেবমাণিক্যকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একখানি সমসাময়িক পত্র এই ভাবটিকে প্রকাশ করিতেছে। —২৪ চৈত্র ১৩০৮। "আমি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মচর্য্যের প্রাচীন আদর্শে আমার ছাত্রদিগকে নির্জ্জনে নিরুদ্বেগে পবিত্র নির্ম্মলভাবে মানুষ করিয়া তুলিতে চাই— তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার বিলাতী বিলাস ও বিলাতের অন্ধমোহ হইতে দূরে রাখিয়া ভারতবর্ষের গ্লানিহীন পবিত্র দারিদ্র্যে দীক্ষিত করিতে চাই। তুমিও বাহিরে না হোক অন্তরে সেই দীক্ষা গ্রহণ কর। মনে দৃঢ়রূপে জান যে, দারিদ্র্যে অপমান নাই, কৌপিনেও লজ্জা নাই, চৌকি টেবিল প্রভৃতি আস্‌বাবের অভাবে লেশমাত্র অসভ্যতা নাই। যাহারা ধনসম্পদ বাণিজ্য ব্যবসায় আস্‌বাব আয়োজনের প্রাচুর্য্য যে সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া প্রচার করে তাহারা বর্ব্বরতাকেই সভ্যতা বলিয়া স্পর্দ্ধা করে। শান্তিতে সন্তোষে মঙ্গলে ক্ষমায় জ্ঞানে ধ্যানেই সভ্যতা; সহিষ্ণু হইয়া, সংযত হইয়া, পবিত্র হইয়া, আপনার মধ্যে আপনি সমাহিত হইয়া বাহিরের সমস্ত কলরব ও আকর্ষণকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত একাগ্র সাধনার দ্বারা পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম দেশের সন্তান হইতে, প্রথমতম সভ্যতার অধিকারী হইতে, পরমতম বন্ধন-মুক্তির আস্বাদ লাভ করিতে প্রস্তুত হও।... বিদেশী ম্লেচ্ছতাকে বরণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় ইহা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়ো। 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহ'।"[৩]

১ রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র। প্রবাসী, ১৩৩৩ চৈত্র, পৃ ৭৬৫। চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ৩৫-৩৬।

২ প্রবাসী, ১৩৪৫ বৈশাখ, পৃ ৩। কার্তিকের গোড়ায় কবি আগরতলায় জগদীশচন্দ্রের জন্যই ত্রিপুরা মহারাজের কাছে যান। জগদীশকে তথা হইতে বিলাতে পত্রযোগে জানান যে মহারাজ দশ হাজার টাকা তাঁহার মারফত পাঠাইতেছেন। প্রবাসী ১৩৪৫ আষাঢ় পৃ ৩২২। চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ৩৮।

৩ প্রবাসী ১৩৪৮ আশ্বিন পৃ ৬৫৫-৬৫৬।

শান্তিনিকেতন হইতে আর একখানি পত্রেও ত্রিপুরার মহারাজ-কুমারকে লিখিতেছেন (৭ বৈশাখ ১৩০৯), "ভারতবর্ষে যথার্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সমাজের অভাব হইয়াছে— দুর্গতিতে আক্রান্ত হইয়া আমরা সকলে মিলিয়াই শূদ্র হইয়া পড়িয়াছি।... আমি ব্রাহ্মণ আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প হৃদয়ে লইয়া যথাসাধ্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি ক্ষত্রিয় আদর্শকে নিজের মধ্যে অনুভব করিয়া সেই আদর্শকে ক্ষত্রিয় সমাজে প্রচার করিবার সংকল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়ো। ব্রাহ্মণের শান্ত সমাহিত সাত্ত্বিক ভাবকে তোমরা বরণ করিলে চলিবে না!... ক্ষাত্রতেজ ক্ষাত্রবীর্য্য না থাকিলে ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা কোথায়?... সমাজে ধর্ম্মের উচ্চতম আদর্শকে সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার ও বিঘ্ন হইতে সুরক্ষিত করিয়া আশ্রয় দিবার জন্যই ক্ষাত্রতেজের মাহাত্ম্য।... আমাদের ক্ষত্রিয়দের তেজ নষ্ট, বুদ্ধি ভ্রষ্ট, চরিত্রবল চূর্ণ হইয়া তাহারা অবনতির পঙ্কের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে এবং সর্ব্বপ্রকার অবমাননায় অসাড় হইয়া কেবল কলুষিত প্রমোদে উন্মত্ত হইয়াছে।... ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এরূপ জীবন কি চরমতম দুর্গতি নহে?" আর একখানি পত্রে— ১৬ শ্রাবণ ১৩০৯— কবি রাজকুমারকে 'ভারতবর্ষীয় পবিত্র ক্ষাত্রধর্ম্মের নির্ম্মল হোমানলে'র কথা লিখিয়া তাঁহাকে হিন্দু বর্ণাশ্রমের কর্তব্যপথে চলিবার জন্য উপদেশ দান করিয়াছিলেন।[১]

রবীন্দ্রনাথের মনে হইল, বর্ণাশ্রমের আদর্শে সমস্ত জীবনকে ধর্মলাভের উপায়স্বরূপ করিয়া তোলা যায়— বাল্যে গুরুগৃহবাস ও ব্রহ্মচর্যপালনের দ্বারা জীবনের সুর বাঁধা, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্মভাবে মিলিয়া বাড়িয়া উঠা,... যৌবনে সংসারে প্রবেশ ও মঙ্গলসাধন, বার্ধক্যে সংসারবন্ধনকে মোচন করিয়া অধ্যাত্মলোকের জন্য প্রস্তুত হওয়া, বনবাস ও শিক্ষাদান।[২]

এই যুগে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের রূপকল্পনায় মগ্ন। বৈদিক ভারতের তপোবনের যে অপরূপ চিত্র বাক্যের ইন্দ্রজালে তিনি আঁকিতেছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ কবিকল্পনা। চিরদিনই ভাববিলাসী সাহিত্যিকরা এই আদর্শলোকের স্বপ্ন দেখিয়াছেন; ইহাকেই বলা হয় utopia।[৩] রবীন্দ্রনাথের তপোবন সেইরূপ একটি অন্তরের সৃষ্টি। হিন্দুভারতের বর্ণাশ্রম আদর্শ কবিকে এমনি মুগ্ধ করিয়াছিল যে, তিনি আজ প্রাচীন ভারতের সমস্তকেই মহান্ ও রমণীয় করিয়া দেখিতেছেন। কালিদাস গুপ্তসাম্রাজ্যের ভারতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যশক্তির দাম্ভিকতা দেখিয়া অন্তরে অন্তরে পীড়াবোধ করিয়া যেরূপ প্রাচীনতর ভারতের মধ্যে আদর্শের সন্ধানে যাত্রা করিয়াছিলেন ও কাব্যের তুলিকায় তপোবনের স্বপ্নলোক সৃষ্টি করেন, রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ মনোলোকে একটি আদর্শ তপোবনের চিত্র দেখিতে আজ তন্ময়। সেই আদর্শ বর্তমান কালোপযোগী করিবার জন্য তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করিয়া সেইখানে' বাস ও শিক্ষাদানের কল্পনা কবির মনে জাগিল। ভারতের এই আধ্যাত্মিক আদর্শে তপোবনের পরিকল্পনায় তিনি বিভোর (বঙ্গদর্শন ১৩০৮ ফাল্গুন)। এই সময়ে তাঁর কোনো বন্ধুকে একখানি পত্রে তপোবনের আদর্শ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:

"মাঝেমাঝে আমি কল্পনা করি, পূর্ব্বকালে ঋষিরা যেমন তপোবনে কুটীর রচনা করিয়া পত্নী বালকবালিকা ও শিষ্যদের লইয়া অধ্যয়ন-অধ্যাপনে নিযুক্ত থাকিতেন, তেমনি আমাদের দেশের জ্ঞানপিপাসু জ্ঞানীরা যদি এই প্রান্তরের মধ্যে তপোবন রচনা করেন, তাঁহারা জীবিকাযুদ্ধ ও নগরের সংক্ষোভ হইতে দূরে থাকিয়া আপন-আপন

১ প্রবাসী ১৩৪৮ কার্তিক, পৃ ১০-১৩।

২ ব্রহ্মবিদ্যালয়— অজিতকুমার চক্রবর্তী কর্তৃক ১৩১৮ সালে শান্তিনিকেতনের বার্ষিক সভায় পঠিত, মুদ্রণ পৌষ ১৩১৮ পরে ১৩৪৮ পৃ ১০-১১। তু. প্রাচীন ভারতের "একঃ", বঙ্গদর্শন ফাল্গুন, ১৩০৮ পৃ ৫২৬-৫৩৩। ধর্ম, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩শ।

৩ The name Utopia is a play upon words, a pun; for Outopia or Atopia means the land of nowhere, whereas Eutopia means a happy land,

বিশেষ জ্ঞানচর্চ্চায় রত থাকেন তবে বঙ্গদেশ কৃতার্থ হয়। অবশ্য, অশনবসনের প্রয়োজনকে খর্ব্ব করিয়া জীবনের ভারকে লঘু করিতে হইবে। উপকরণের দাসত্ব হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া সর্ব্বপ্রকার বেষ্টনহীন নির্ম্মল আসনের উপর তপোনিরত মনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যেমন শাস্ত্রে কাশীকে বলে পৃথিবীর বাহিরে, তেমনি সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এই একটুখানি স্থান থাকিবে, যাহা রাজা ও সমাজের সকলপ্রকার বন্ধনপীড়নের বাহিরে। ইংরাজ রাজা হউক বা রুশ রাজা হউক, এই তপোবনের সমাধি কেহ ভঙ্গ করিতে পারিবে না। এখানে আমরা খণ্ড কালের অতীত ;— আমরা সুদূর ভূতকাল হইতে সুদূর ভবিষ্যৎকাল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া বাস করি ; সনাতন যাজ্ঞবল্ক্য এবং অনাগত যুগান্তর আমাদের সমসাময়িক। ··· আমাদের তপোবনবাসীদের— জন্মমৃত্যুবিবাহের অনুষ্ঠানপরম্পরা, এখানকার নিভৃতশান্তি ও সরল সৌন্দর্য্যের চিরন্তন সমারোহে সম্পন্ন হইতে থাকে। আমাদের বালকেরা হোমধেনু চরাইয়া আসিয়া পড়া লইতে বসে, এবং বালিকারা গোদোহনকার্য্য সারিয়া কুটীরপ্রাঙ্গণে, গৃহকার্য্যে শুচিস্নাত কল্যাণময়ী মাতৃদেবীর সহিত যোগ দেয়।"

"যদি বৈদিককালে তপোবন থাকে, যদি বৌদ্ধযুগে 'নালন্দা' অসম্ভব না হয়, তবে আমাদের কালেই কি··· মঙ্গলময় উচ্চ আদর্শমাত্রই 'মিলেনিয়ামে'র দুরাশা বলিয়া পরিহসিত হইতে থাকিবে ? আমি আমার এই কল্পনাকে নিভৃতে পোষণ করিয়া প্রতিদিন সংকল্প-আকারে পরিণত কয়িয়া তুলিতেছি। ইহাই আমাদের একমাত্র মুক্তি, আমাদের স্বাধীনতা ; ইহাই আমাদের সর্বপ্রকার অবমাননা নিষ্কৃতির একমাত্র উপায়।"[১]

কবির সংকল্প এতক্ষণ কেবলমাত্র কল্পনার বস্তু ছিল। ভারতবর্ষের সেই 'আহ্বানকে কেবল বাণীরূপে নহে, কর্ম-আকারে কোথায়ও বদ্ধ' করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের মন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। কালিদাস তপোবনের চিত্র আঁকিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করিয়া শিক্ষাদানের কথা কখনো কল্পনা করেন নাই। উজ্জয়িনীর কবির সহিত বাংলাদেশের কবির এইখানে একটা বড় রকম পার্থক্য।

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হইলে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীদের যে উপদেশ দেন, তাহাও তাঁহার এই সময়ের সামাজিক ও ধর্মীয় মতের সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি। রবীন্দ্রনাথ মানবকদিগকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করিয়া প্রাচীন ভারতের গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ পরিষ্কারভাবে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, "গুরুকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধা করবে, মনে বাক্যে কাজে তাঁকে লেশমাত্র অবজ্ঞা করবে না। শরীরকে পবিত্র করে রাখবে।" উপসংহারে তিনি বলিলেন, "আজ থেকে তোমাদের ব্রহ্মব্রত। এক ব্রহ্ম তোমাদের অন্তরে বাহিরে সর্বদা সকল স্থানেই আছেন।··· প্রত্যহ অন্তত একবার তাঁকে চিন্তা করবে। তাঁকে চিন্তা করবার মন্ত্র আমাদের বেদে আছে। এই মন্ত্র আমাদের ঋষিরা দ্বিজেরা প্রত্যহ উচ্চারণ ক'রে জগদীশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হতেন। সেই মন্ত্র, হে সৌম্য, তুমিও আমার সঙ্গেসঙ্গে একবার উচ্চারণ কর।" ইহার পর তিনি গায়ত্রী-মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিলেন।[২] পাঠক লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, ধর্মসাধনার জন্য গায়ত্রী-মন্ত্রের উপর কবির শ্রদ্ধা অপরিসীম ; এ বিষয়ে তাঁহাকে রামমোহন রায় ও মহর্ষির আধ্যাত্মিক সাধনার উত্তরাধিকারী বলা যাইতে পারে। মন্ত্রের শক্তি ও সাধনায় তিনি চিরদিন শ্রদ্ধাবান, তিনি বহুবার বলিয়াছিলেন যে জীবনের চরম সংগ্রামের মুহূর্তে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্ত্রগুলির ধ্যান মানবমনকে অসীম বল দান করে। সেই কবিকেই মন্ত্রের নিন্দা ও বিদ্রূপ করিতে দেখিয়া অনেকে আশ্চর্য হইয়া যান ; তিনি যে-মন্ত্রের নিন্দা করিয়াছেন, তাহা হইতেছে অভ্যস্ত শব্দের পুনরুক্তি— যে শব্দের অর্থ লুপ্ত এবং যে মন্ত্রের আবৃত্তিমাত্র পুণ্যার্জনের সোপানরূপে মানুষ ব্যবহার করে— সেই মন্ত্রের তিনি নিন্দা করিয়াছেন ; কিন্তু যে মন্ত্র মানুষ জ্ঞানত ধ্যান করে,

১ সতীশচন্দ্র রায়ের 'গুরুদক্ষিণা' পুস্তকের ভূমিকা, শ্রাবণ ১৩১১ (১৯০৪) দ্রষ্টব্য।

২ দ্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮২৩ শক [১৩০৮] মাঘ, পৃ ১৪৫। দ্র. শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম, পঞ্চাশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত, পৌষ ১৩৫৮, পৃ ১৪।

যে অশ্রুত শব্দ, অনুচ্চারিত বাণী মানুষ স্তব্ধ হইয়া শোনে, সেই মন্ত্রের নিন্দা তো কখনো করেন নাই, বরং তাহা তাঁহার নিকট হইতে সমর্থনই পাইয়াছে। সেইজন্য তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মানবকগণের জন্য গায়ত্রী-মন্ত্রের ব্যাখ্যা দান করেন।

পৌষ-উৎসবের মাসাধিক কালের মধ্যেই কলিকাতায় মাঘোৎসবের উপাসনায় এবার রবীন্দ্রনাথ আচার্যের কার্য করিলেন। মাঘোৎসবে ইহাই তাঁহার প্রথম ভাষণ। এই উপদেশে তিনি প্রাচীন ভারতের সাধনার কথাই বলিয়াছিলেন। বিচিত্র ভারতকে সংঘবদ্ধ করিতে হইলে একটি বৃহৎ আদর্শের মধ্যেই তাহা সম্ভবে। নৈবেদ্যে তিনি যাহা কাব্যময় ভাষায় বলিয়াছিলেন, 'প্রাচীন ভারতের একঃ' প্রবন্ধে[১] তাহাই উপনিষদের পরিপ্রেক্ষণায় বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি বলিলেন, "খণ্ডতার মধ্যে কদর্যতা, সৌন্দর্য একের মধ্যে; খণ্ডতার মধ্যে প্রয়াস, শান্তি একের মধ্যে; খণ্ডতার মধ্যে বিরোধ, মঙ্গল একের মধ্যে; তেমনি খণ্ডতার মধ্যেই মৃত্যু, অমৃত সেই একের মধ্যে।" এই প্রবন্ধের শেষে তিনি ভারতের হইয়া এই প্রার্থনা করিলেন, "পৃথিবীতলে আর-একবার আমাদিগকে তোমার সিংহাসনের দিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে দাও। আমরা কেবল যুদ্ধবিগ্রহ-যন্ত্রতন্ত্র-বাণিজ্যব্যবসায়ের দ্বারা নহে, আমরা সুকঠিন সুনির্মল সন্তোষ-বলিষ্ঠ ব্রহ্মচর্যের দ্বারা মহিমান্বিত হইয়া উঠিতে চাহি।" স্বধর্ম ও স্বদেশ কিভাবে পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত তাহা এই সময়ের রচনা সাক্ষ্য দিতেছে।

নববর্ষের দিনে (১৩০৯) আশ্রমবিদ্যালয়ের প্রথম নববর্ষে রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে যে ভাষণ দান করেন তাহা পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, কবির মন কী পরিমাণ প্রাচীনভারত-ঘেঁষা ও হিন্দুভাবাপন্ন। এই বক্তৃতায় তিনি বলিলেন যে, অধুনা ভারতবাসীদের কাছে কর্মের গৌরব অত্যন্ত বেশি হইয়া উঠিতেছে; য়ুরোপে লাগাম-পরা অবস্থায় মরা একটা গৌরবের কথা। এই কর্মের নেশায় যখন তাহাকে পাইয়া বসে, তখন পৃথিবীতে আর শান্তি থাকে না। শান্তিনিকেতনের "আশ্রমে নির্জন প্রকৃতির মধ্যে স্তব্ধ হইয়া বসিলে অন্তরের মধ্যে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, হওয়াটাই জগতের চরম আদর্শ, করাটা নহে।" তাঁহার মতে ভারতবর্ষ মানুষকে লঙ্ঘন করিয়া কর্মকে বড় করিয়া তোলে নাই। কর্মফলাকাঙ্ক্ষাহীন হইলে তাহার ধার অনেকখানি কমিয়া যায়। হওয়াই আমাদের দেশের চরম লক্ষ্য, করা উপলক্ষ্যমাত্র।

রবীন্দ্রনাথ আজ আর একটি বিষয় অনুভব করিতেছেন; সেটি হইতেছে ভারতবর্ষের একাকিত্ব— হিন্দুর একনিষ্ঠত্বের অপর রূপ। তাঁহার মতে "ভারতবর্ষ আপন বিস্তীর্ণ একাকিত্ব দ্বারা পরিরক্ষিত··· ভারতবর্ষ যুদ্ধবিরোধ না করিয়াও নিজেকে নিজের মধ্যে অতি সহজে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে জানে··· সর্বপ্রকার বিরোধ-বিপ্লবের মধ্যেও একটি দুর্ভেদ্য শান্তি তাহার সঙ্গেসঙ্গে অচলা হইয়া ফিরে, তাই সে ভাঙিয়া পড়ে না, মিশিয়া যায় না, কেহ তাহাকে গ্রাস করিতে পারে না, সে উন্মত্ত ভিড়ের মধ্যেও একাকী বিরাজ করে।"

পূর্ব ও পশ্চিমের প্রকৃতিগত ভেদ কোথায়, তাহাও এই প্রবন্ধে কবি ব্যাখ্যা করিলেন; তাঁহার বক্তব্য ছিল যে, য়ুরোপ ভোগে একাকী, কিন্তু কর্মে দলবদ্ধ। ভারতবর্ষের স্বভাব তাহার বিপরীত, সে ভাগ করিয়া ভোগ করে, কর্ম করে একাকী। য়ুরোপের ধনসম্পদ, আরামসুখ নিজের— কিন্তু তাহার দানধ্যান, স্কুলকলেজ, ধর্মচর্চা, বাণিজ্যব্যবসায়, সমস্ত দল বাঁধিয়া। ভারতবাসীর সুখসম্পত্তি একলার নহে,— তাহার দান ধ্যান অধ্যাপন প্রভৃতি কর্তব্য একলার।

কর্মের বাসনা, জনসংঘের সংঘাত ও জিগীষার উত্তেজনা হইতে মুক্তির সাধনা ভারতবর্ষ করিয়াছে; তিনি বলিলেন, "যে মুক্তি ভারতবর্ষের তপস্যার ধন, তাহা যদি পুনরায় সমাজের মধ্যে আমরা আবাহন করিয়া আনি, অন্তরের মধ্যে আমরা লাভ করি, তবে ভারতবর্ষের নগ্নচরণের ধূলিপাতে পৃথিবীর বড় বড় রাজমুকুট পবিত্র হইবে।"[২]

১ বঙ্গদর্শন ১৩০৮ ফাল্গুন। দ্র ধর্ম, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩শ, পৃ ৩৬৪।

২ নববর্ষ বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে পঠিত, বঙ্গদর্শন ১৩০৯ বৈশাখ। দ্র ভারতবর্ষ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪র্থ, পৃ ৩৬৭।

ইহারই সঙ্গে মিলাইয়া পড়ি, তাঁহার নববর্ষের গান[১] —

যে জীবন ছিল তব তপোবনে
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব।
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব।

প্রাচীন ভারতের হিন্দু আদর্শ কিভাবে আধুনিক জীবনে সফল হইতে পারে, কিভাবে বর্ণাশ্রম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তদ্‌বিষয়ে কবি চিন্তা করিতেছেন। এই সময়ে লিখিত 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধটি এ যুগের মনোভাব -প্রকাশক। লেখক এই প্রবন্ধে ভারতীয় সমাজ-প্রতিষ্ঠানের যে আদর্শ প্রকাশ করিলেন, তাহা পাঠ করিয়া লোকের মনে যুগপৎ দুইটি ভাবের উদয় হইয়াছিল। কেহ কেহ মনে করিলেন, রবীন্দ্রনাথ বুঝি হিন্দুর প্রাচীন বর্ণাশ্রমপ্রথা আধুনিক যুগে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিবার পক্ষপাতী। যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী তাঁহাদের নিকট রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্মণের অর্থ গ্রহণ করা সম্পূর্ণ দেশকাল-বিপরীত বলিয়া মনে হইল। তাঁহারা দেখিলেন, রবীন্দ্রনাথ সমগ্র হিন্দুসমাজকে প্রাচীনের যে-আদর্শে গড়িতে চান, তাহা সমাজের আমূল পরিবর্তন সাপেক্ষ; যেভাবে তথাকথিত বর্ণাশ্রম চলিতেছে তাহার ধ্বংস-সাধনই এই প্রবন্ধের মূলগত ভাব। রবীন্দ্রনাথের মতে ব্রাহ্মণকে নিজের যথার্থ গৌরব লাভ করিবার জন্য যেমন প্রাচীন আদর্শের দিকে যাইতে হইবে, ব্রাহ্মণেতর সমগ্র সমাজকেও তেমনি চলিতে হইবে। "সমস্ত উন্নত সমাজই সমাজস্থ লোকের নিকট প্রাণের দাবি করিয়া থাকে, আপনাকে নিকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া আরামে জড়সুখভোগে যে সমাজ আপনার অধিকাংশ লোককে প্রশ্রয় দিয়া থাকে সে সমাজ মরে··· য়ুরোপ কর্মের উত্তেজনায়, প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সর্বদাই প্রাণ দিতে প্রস্তুত— আমরা যদি ধর্মের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত না হই তবে সে প্রাণ অপমানিত হইতে থাকিলে অভিমান প্রকাশ করা আমাদের শোভা পায় না।"

রবীন্দ্রনাথের মতে হিন্দুসমাজ প্রধানতই দ্বিজ সমাজ— ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হিন্দুসমাজের অন্তর্গত। তিনি বলেন, "যাঁহারা দ্বিজ তাঁহাদিগকে এক সময় কর্ম পরিত্যাগ করিতে হয়। তখন তাঁহারা আর ব্রাহ্মণ নহেন, ক্ষত্রিয় নহেন, বৈশ্য নহেন— তখন তাঁহারা নিত্যকালের মানুষ— তখন কর্ম তাঁহাদের পক্ষে আর ধর্ম নহে, সুতরাং অনায়াসে পরিহার্য।" তাহার কর্মকে একান্ত করিয়া দেখিবার পক্ষপাতী তিনি কখনো নহেন; তাঁহার মতে কর্মকেই "প্রাধান্য দিলে সংসারই চরম হইয়া উঠে; মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না; অমৃত লাভ করিবার লক্ষ্যই ভ্রষ্ট হয়, তাহার অবকাশ থাকে না। এইজন্যই কর্মকে সীমাবদ্ধ করা, কর্মকে ধর্মের সহিত যুক্ত করা— কর্মকে প্রবৃত্তির হাতে, উত্তেজনার হাতে কর্মজনিত বিপুল বেগের হাতে ছাড়িয়া না দেওয়া— এবং এইজন্যই ভারতবর্ষে কর্মভেদ বিশেষ বিশেষ জনশ্রেণীতে নির্দিষ্ট করা। ইহাই আদর্শ।"

'ব্রাহ্মণ'[২] প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বর্ণাশ্রমের যে ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা বর্তমানে কোনো হিন্দুর পক্ষে গ্রহণ করা দুঃসাধ্য। কারণ তাহা যথার্থ প্রাচীন ভারতের মূল আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত; তাহার মধ্যে ত্যাগ আছে, সংযম

১ বঙ্গদর্শন ১৩০৯ জ্যৈষ্ঠ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০ম, পৃ ৮৯।

২ এই প্রবন্ধ লিখিবার প্রত্যক্ষ কারণ হইতেছে এই: বোম্বাই অঞ্চলে কোনো সাহেব তাহার ব্রাহ্মণ কর্মচারীকে পদাঘাত করে, এই লইয়া দেশময় কাগজে-পত্রে একটা আর্তনাদ উঠিয়াছিল যে ব্রাহ্মণকে পদাঘাত করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা ওভারটুন হলে এই উপলক্ষ্যে প্রবন্ধটি পাঠ করেন। দ্র. বঙ্গদর্শন ১৩০৯ আষাঢ়। পৃ ১৩৬-১৪৯। দ্র. ভারতবর্ষ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪র্থ পৃ ৩৮৭।

আছে, নিরাসক্তি, নির্লোভ আছে। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে বহন করার দায় গুরুতর; সে দায় গ্রহণ করিতে লোকে নারাজ, অথচ প্রাচীনের খোলসটুকু পরিয়া তাঁহারা সর্ববিধ সুখ-সুবিধা-অধিকার দাবি করিবেন— আবার পশ্চিমের ভোগবিলাসে নিজেকে অপরিতৃপ্ত রাখিবেন না— ইহা কখনই সম্ভব নহে। যথার্থ ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে বর্তমানের দ্বিজেরা প্রস্তুত নহেন, নিজ নিজ কর্মের মধ্যে পরিতৃপ্ত থাকিতে কেহই রাজী নহেন।

তিনি উপসংহারে বলিলেন, "ব্রাহ্মণকে ভারতবর্ষ নগরকোলাহল ও স্বার্থসংগ্রামের বাহিরে তপোবনে ধ্যানাসনে অধ্যাপকের বেদিতে আহ্বান করিতেছে— ব্রাহ্মণকে তাহার সমস্ত অবমাননা হইতে দূরে আকর্ষণ করিয়া ভারতবর্ষ আপনার অবমাননা দূর করিতে চাহিতেছে··· ভারতবর্ষে যাঁহারা ক্ষাত্রব্রত বৈশ্যব্রত গ্রহণ করিবার অধিকারী আজ তাঁহারা ধর্মের দ্বারা কর্মকে জগতে গৌরবান্বিত করুন—তাঁহারা প্রবৃত্তির অনুরোধে নহে, উত্তেজনার অনুরোধে নহে, ধর্মের অনুরোধেই অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত, ফলকামনায় একান্ত আসক্ত না হইয়া প্রাণ সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হউন।"

এই সময়ে বিলাত হইতে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে *Letters of John Chinaman*[১] নামে একখানি বই পাঠাইয়া দেন। বইখানির গ্রন্থকার ইংরেজ লেখক Lowes Dickinson[২]। গ্রন্থে লেখকের নাম ছিল না এবং বইখানি এমনভাবে লেখা যে লোকে সন্দেহ করিতে পারে নাই, ইহার লেখক ইংরেজ। রবীন্দ্রনাথ এই বইখানির দীর্ঘ সমালোচনা 'বঙ্গদর্শনে' (১৩০৯ আষাঢ়) প্রকাশ করেন[৩]। এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে একটি গভীর ও বৃহৎ ঐক্য বোধ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বেশ একটু আনন্দ লাভ করিলেন। চীনের সঙ্গে ভারতের চিত্তের মিল দেখিয়া একটা যেন বল পাইয়া তিনি লিখিলেন, "ভারতবর্ষের সভ্যতা এশিয়ার সভ্যতার মধ্যে ঐক্য পাইয়াছে ইহাতেও আমাদের বল;··· এশিয়ার সভ্যতার এমন একটি গৌরব আছে, যাহা সত্য বলিয়াই প্রাচীন হইয়াছে, যাহা সত্য বলিয়াই চিরন্তন হইবার অধিকারী, ইহাতেও আমাদের বল।"

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক হইতে ভারতের মধ্যে একটা যে চঞ্চলতা দেখা দেয়, তাহার আলোচনা পূর্বে হইয়াছে; ভারতের স্বাধীন শক্তি— তাহার চিরকালের শক্তি কোন্‌খানে প্রচ্ছন্ন, তাহাই সন্ধান করিয়া সেইখানে আশ্রয় লইবার জন্য মনীষীদের মধ্যে একটা চেষ্টা জাগ্রত হইয়াছিল। বিদেশীর সহিত ভারতের সংঘাত ক্রমশ যতই কঠিন হইয়া উঠিতেছিল, স্বদেশকে ততই বিশেষভাবে জানিবার ও পাইবার জন্য একটা ব্যাকুলতা জাগিতেছিল।

শিক্ষিত ভারত ক্রমশই অনুভব করিতেছিল যে, বস্তুপ্রধান য়ুরোপ আমাদের ইন্দ্রিয়-মনকে অভিভূত করিলেও সেই সভ্যতা পৃথিবীর একমাত্র সভ্যতা নহে, প্রাচ্যের ধর্মপ্রধান মঙ্গলপ্রধান সভ্যতা তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা প্রাচীন ভারতের সহিত বর্তমানকে সংযুক্ত করিয়া দেশকে বড় করিয়া তোলা। য়ুরোপীয় সভ্যতার বন্যা জগৎ প্লাবিত করিয়া ছুটিয়াছে। "তাই আজ সভ্য এশিয়া আপনার পুরাতন বাঁধগুলিকে সন্ধান ও তাহাদিগকে দৃঢ় করিবার জন্য উদ্যত।" তিনি বলিলেন, "প্রাচ্যসভ্যতা আত্মরক্ষা করিবে। যেখানে তাহার বল সেইখানেই তাহাকে দাঁড়াইতে হইবে। তাহার বল ধর্মে, তাহার বল সমাজে।··· সেই প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য এশিয়া উত্তরোত্তর ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছে। এইখানে আমরা একাকী নহি; সমস্ত এশিয়ার সহিত আমাদের যোগ রহিয়াছে।

১ দ্র সাহিত্য, ১৪শ বর্ষ ১৩১০ বৈশাখ। ভারতদাস মিত্র লেখেন যে জানা গিয়াছে 'জন চায়নাম্যানে'র লেখক ইংরেজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

২ Goldsworthy Lowes Dickinson (1862-1932) Fellow and Lecturer at King's College Cambridge; also Lecturer at the London School of Economics. ইনি Rhodes Scholar রূপে দেশভ্রমণ কালে Letters of John Chinaman লিখিয়াছিলেন। ১৯১২ সালে বিলাতে রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ হয়।

৩ দ্র চীনেম্যানের চিঠি, ভারতবর্ষ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪র্থ, পৃ ৪০২।

ইহার পর লেখক চীনাম্যানের মোট বক্তব্যগুলি সংক্ষেপে দিয়াছেন ; সেগুলি পড়িলে প্রাচ্যসমাজের সাধারণ ভিত্তি-সম্বন্ধে আমাদের পরস্পরের যে ঐক্য, তাহা যেন স্পষ্ট বোঝা যায়। চীনদেশ সুখী সন্তুষ্ট ও কর্মনিষ্ঠ হয়তো হইয়াছে, কিন্তু তাহার সামাজিক প্রতিষ্ঠান তাহাকে ক্ষুদ্র করিয়াছে, গণ্ডিবদ্ধ করিয়াছে, তাহাদের জীবনকে আবদ্ধ করিয়াছে। "ভারতবর্ষ সমাজকে সংযত সরল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ হইবার জন্য নহে। সে আপন সংহত শক্তিকে অনন্তের অভিমুখে একাগ্র করিবার জন্যই ইচ্ছাপূর্বক বাহ্যবিষয়ে সংকীর্ণতা আশ্রয় করিয়াছিল।··· কেবলমাত্র পারিবারিক শৃঙ্খলা এবং সামাজিক সুব্যবস্থার দ্বারা কেহ অমর হয় না, তাহাতে আত্মার বিকাশ হয় না ; সমাজ যদি মানুষের সম্পূর্ণ সার্থকতা না দেয়, তবে সেখানে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করিলে হীনতা স্বীকার করা হয়। ভারতবর্ষ অত্যন্ত অসংকোচে বলিয়াছিল আত্মার জন্য পৃথিবীকে ত্যাগ করিবে। "সমাজকে মুখ্য করিলে উপায়কে উদ্দেশ্য করা হয়। ভারতবর্ষ তাহা করিতে চাহে নাই, সেইজন্য তাহার বন্ধন যেমন দৃঢ় তাহার ত্যাগও সেইরূপ সম্পূর্ণ।"

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এই যে ভারতের প্রাচীন আদর্শ হইতে সে বর্তমানে বিচ্যুত ; প্রাচীনদের সত্যসাধনা হইতে সে বঞ্চিত বলিয়া, আমাদের এতদিনকার সমাজ আমাদিগকে বল দিতেছে না।

'জন চীনাম্যানের পত্রাবলী' তাঁহাকে এশিয়ার মূলগত আদর্শ তথা ভারতের ধর্মের আদর্শ কোথায় সার্থক ও কোথায় ব্যর্থ—ইহা পর্যালোচনা করিবার সুযোগ যেমন দান করিয়াছিল, দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইলে তেমনি তিনি বাংলাদেশের ধর্ম-ইতিহাস গভীরভাবে আলোচনা করিবার সুযোগ পাইলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের (১৩০৯) 'আলোচনা-সমিতি'র এক বিশেষ অধিবেশনে তিনি এই বিষয়ে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত-গ্রন্থের আলোচনা করিয়া তিনি বাংলাদেশের শিবপূজা ও শক্তিপূজায় 'মেয়ে-দেবতা'র প্রাধান্য সম্বন্ধে যে তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন তাহা ভবিষ্যতে যাঁহারা বাংলাদেশের ধর্মের ইতিহাস লিখিবেন তাঁহাদের পক্ষে বড় রকমের ইঙ্গিত হইবে।[১] এই শিবশক্তি-পূজা ও মঙ্গলকাব্য লইয়া তিনি পরেও আলোচনা করিয়াছেন (বাতায়নিকের পত্র)।

কিন্তু এই আলোচনার মধ্যেও দেখি তাঁহার দেশের জন্য বেদনা, দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা। বঙ্গভাষা যে 'একদিন অভাবনীয় উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠিবে' এই আশা রবীন্দ্রনাথ পোষণ করিতেন। তিনি লিখিলেন, "আমাদের রচনা বাংলার বর্তমান ভিত্তির মধ্যে এখনো কোনো নূতন গবাক্ষ কাটিয়া কোনো নূতন আলোক আনে নাই, কোনো নূতন আশায় দেশকে প্লাবিত করে নাই, সাহিত্যকে এমন একটি প্রাণশক্তি দেয় নাই, যে শক্তিবলে আমাদের সাহিত্য দেশের ও বিদেশের পক্ষে চিরকালের জন্য প্রাণের, সৌন্দর্যের ও কল্যাণের অক্ষয় ভাণ্ডার হইয়া থাকে। কিন্তু অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতেছি, সেদিন দূরে নাই।" ইহারই এগারো বৎসর পরে পৃথিবী তাঁহাকেই জয়মাল্য দান করিয়া বাংলার, ভারতের, সমগ্র এশিয়ার প্রাণশক্তিকে স্বীকার করিল।

এই প্রবন্ধের উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছিলেন বঙ্গভাষা বা সাহিত্যের সহিত তাহার কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নাই, তাঁহার সেই যুগের মনের মধ্যে সব থেকে বড় করিয়া যে-কথাটা জাগিতেছিল— ব্রাহ্মণের গৌরব ও প্রাচীন ভারতের আদর্শ— সেইটাই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তিনি লিখিতেছেন, "মনে হইতেছে, কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব আসন্ন হইয়াছে, যিনি ভারতবর্ষের সম্মুখে ভারতবর্ষের পথ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবেন— যিনি আমাদের অন্তরের মধ্যে এই কথা ধ্বনিত করিয়া তুলিবেন যে, আমরা ভারতবাসী, আমরা ফিরিঙ্গী নই, আমরা বর্বর নই, আমাদের লজ্জার কোনো কারণ নাই।" তিনি ঘোষণা করিলেন ভারতের কাম্য মুক্তি— "সকল ক্ষুদ্রতা ও

১ বঙ্গদর্শন, ১৩০৯, শ্রাবণ, পৃ ১৬৫-১৭৯ দ্র সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৮ম, পৃ ৪৩২।

স্বার্থচেষ্টার আক্রমণ হইতে সেই রত্নকে (মুক্তিকে) রক্ষা করিবার ভার লইয়াই ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষে গৌরব লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই রত্ন হারাইয়াই ব্রাহ্মণ ও ভারতবর্ষ রসাতলে গেছে।"

ভারতবর্ষের ঐক্যবন্ধনের সমস্যাই রবীন্দ্রনাথের সমস্ত চিত্তকে ভরিয়া রাখিয়াছিল— সেই সমস্যার সমাধানই তখন তাঁহার জীবনে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' তাঁহার এই চিন্তাধারার উৎসমুখের সৃষ্টি, তাঁহার আদর্শের মূর্তি, তাঁহার জীবনের পরীক্ষা। প্রবন্ধগুলিও তাই।

যে-জ্যৈষ্ঠ (১৩০৯) মাসে মজুমদার লাইব্রেরির সংশ্লিষ্ট 'আলোচনা-সমিতি'র বিশেষ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ 'বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্য' সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করেন, সেই মাসের 'আলোচনা-সমিতি'র সাধারণ অধিবেশনে তিনি 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।[১] রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এই যে, য়ুরোপ হইতে ইতিহাসের যে বোঝা আসিয়াছে, তাহাতে 'ভারতবাসী'র ইতিহাস ছাড়া ভারতের ইতিহাস আছে। যে-রাষ্ট্রনৈতিক উত্থানপতনের সহিত লোকের সম্বন্ধ অতি সামান্য, সেই বহিরঙ্গের ইতিহাসের উপর সমস্ত জোরটা পড়িয়াছে। সুতরাং লোকে দেশের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাহীন। ভারতবর্ষের ইতিহাস বিদেশীর লেখা, হয় মুসলমানের নয় ইংরেজের। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস ভারত-ইতিহাসের অতি সামান্য অংশ, পরিশিষ্ট হইবার যোগ্য; অথচ তাহারই উপর বিদেশীদের এবং তাহাদের অনুকরণে দেশীয়দের সকল জোর গিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সে ইতিহাস ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্ন-কাহিনী মাত্র। তিনি এই প্রবন্ধে সর্বপ্রথম বাঙালীর কাছে ভারত-ইতিহাসের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিলেন। জগতে প্রত্যেক জাতি বা দেশের বিশ্ব-ইতিহাসে একটা সার্থকতা ছিল বা আছে। ভারতবর্ষের সার্থকতা কী এবং কোথায় এ কথার স্পষ্ট উত্তর লোকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে তাহারই উত্তরদান করিয়াছেন; তিনি বলিলেন, "ভারতবর্ষের চিরদিনই চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা— বাহিরের যেসকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।"

তিনি এই প্রবন্ধে পূর্ব ও পশ্চিমের আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিলেন, "য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা বিরোধমূলক; ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলনমূলক। ...ভারতবর্ষ বিসদৃশকেও সম্বন্ধবন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে।" যেখানে যথার্থ পার্থক্য আছে সেখানে তাহাকে মানিয়া লইয়া মিলনের পথ আবিষ্কার করাতেই যথার্থ মনীষা প্রকাশ পায়। সেইজন্য ভারতবর্ষ "পরস্পর প্রতিযোগিতার পথেই সমাজের সকল শক্তিকে অহরহ সংগ্রামপরায়ণ করিয়া তুলিয়া ধর্ম কর্ম গৃহ সমস্তকেই আবর্তিত আবিল উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া রাখে নাই। ঐক্যনির্ণয় মিলনসাধন এবং শান্তি ও স্থিতির মধ্যে পরিপূর্ণ পরিণতি ও মুক্তিলাভের অবকাশ, ইহাই ভারতবর্ষের লক্ষ্য ছিল।"

রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতবর্ষ অতীতের সহিত তাহার যোগকে মূঢ়ের ন্যায় স্বীকার করে মাত্র— প্রাচীনের সহিত তাহার জ্ঞান সজীব নহে, সতেজ নহে। তাই বলিলেন, "ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতের সেই চিরন্তন ভাবটি অনুভব করিব তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।"

১ ভারতবর্ষ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪র্থ, পৃ. ৩৭৭।

আশ্রমবিদ্যালয় ও সংসার

রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত 'বোর্ডিং বিদ্যালয়'কে যথার্থ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের রূপ দান করেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। বঙ্গদর্শনের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের সহিত উপাধ্যায়ের পরিচয়ের সূত্রপাত (এপ্রিল-মে ১৯০১)। নৈবেদ্য প্রকাশিত হইলে উপাধ্যায় মহাশয় নরহরি দাস ছদ্মনামে এই কাব্যগ্রন্থের সুদীর্ঘ সমালোচনা তাঁহার Twentieth Century নামে মাসিকপত্রে প্রকাশ করেন (৩১ জুলাই ১৯০১)। এই ইংরেজি পত্রিকা নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের (N. Gupta) সহায়তায় প্রকাশিত হয়। নগেন্দ্রনাথ পরে লাহোরের ট্রিবিউন কাগজের সম্পাদক হইয়া প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনের সায়াহ্নে 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' প্রবন্ধে (আশ্বিন ১৩৪০) উপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতার আভাস স্পষ্টত দিয়াছিলেন। তিনি লিখিতেছেন, "তাঁর সম্পাদিত Twentieth Century পত্রিকায় [নৈবেদ্যের] রচনাগুলির যে প্রশংসা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন সেকালে সে রকম উদার প্রশংসা আমি আর কোথাও পাই নি।··· তিনি অকুণ্ঠিত সম্মান দিয়েছিলেন।" এই পরিচয় ও বঙ্গদর্শনের রচনাদি প্রকাশ উপলক্ষে উপাধ্যায়ের সহিত কবির ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। কবি লিখিতেছেন, "এই পরিচয় উপলক্ষেই তিনি (উপাধ্যায়) জানতে পেরেছিলেন যে, শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবে আমি পিতার সম্মতি পেয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, এই সংকল্পকে কার্যে প্রতিষ্ঠিত করতে বিলম্ব করবার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর কয়েকটি অনুগত শিষ্য ও ছাত্র নিয়ে আশ্রমের কাজে প্রবেশ করলেন।"

উপাধ্যায়ের সহিত জন পাঁচ-ছয় ছাত্র ও রেবাচাঁদ নামে এক তরুণ সিন্ধী শিক্ষক আসিয়াছিলেন। রেবাচাঁদই ছাত্রদের দেখাশুনা করিতেন। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয় সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, কর্মের সকল রজ্জুগুলি গিয়া পড়িল ব্রহ্মবান্ধব ও রেবাচাঁদের হাতে। সুতরাং প্রতিষ্ঠানটিকে উপাধ্যায় তাঁহার আপন আদর্শে গড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন। রেবাচাঁদ ব্যতীত আরও দুইজন শিক্ষক আসিয়াছিলেন শিলাইদহের গৃহবিদ্যালয় হইতে— জগদানন্দ রায় ও শিবধন বিদ্যার্ণব। লরেন্স নামে যে ইংরেজ শিক্ষক শিলাইদহে ছিলেন তাঁহাকে আশ্রমে আনিলেন না। কারণ বোধ হয়, কবি ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহার নব বিদ্যালয়কে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের রূপ দান কালে লরেন্স বিঘ্নস্বরূপ হইতে পারেন।[১]

ব্রহ্মবান্ধবের ব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত 'বোর্ডিং বিদ্যালয়' ব্রহ্মচর্যাশ্রম রূপ গ্রহণ করিল। শিষ্যরা গুরুগৃহে যেন বাস করিতেছে ইহা হইল আদর্শ, রবীন্দ্রনাথ হইলেন 'গুরুদেব': এই নাম উপাধ্যায় কর্তৃক প্রবর্তিত। উপাধ্যায়ের কঠোর ব্যবস্থায় ছাত্রদের জুতা-ছাতা ব্যবহার নিষিদ্ধ, নিরামিষ ভোজন সার্বজনিক; তবে আহার-স্থানে বর্ণভেদ মানাই আবশ্যিক। এই মধ্যযুগীয় ব্যাপার উপাধ্যায়ের তৎকালীন মতবাদের অনুরূপ বলিয়াই এখানে প্রবর্তিত হইয়াছিল।

ব্রহ্মবান্ধবের স্মৃতি আজ বাংলা দেশে ম্লান; কিন্তু বিংশ শতকের প্রারম্ভভাগে বাংলার ধর্মনীতি ও রাজনীতির সহিত ইঁহার সম্বন্ধ কতটা ঘনিষ্ঠ ছিল তাহা সমসাময়িক ইতিহাস-পাঠকদের নিকট অবিদিত নহে। ব্রহ্মবান্ধবের আসল নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬১)। ইনি কলিকাতার হাইকোর্টের খ্রীষ্টভক্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। ভবানীচরণ যৌবনে কেশবচন্দ্র সেনের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নববিধান ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হন; কেশবের মৃত্যুর (১৮৮৪) পর মাত্র তেইশ বৎসর বয়সে তিনি নববিধানী ধর্মমত প্রচার করিতে সিন্ধুদেশে যান। সেখানে খ্রীষ্টীয় পাদরীদের প্রভাবে পড়িয়া খ্রীষ্ট-অনুরক্ত হন ও ১৮৯১-এ খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু খ্রীষ্টান

১ পূর্বাশা রবীন্দ্রস্মৃতি সংখ্যা, পৃ. ১০৮। চিঠিপত্র ষষ্ঠ, পৃ. ১৬১।

ধর্মজীবনেও সংঘাত দেখা দিল এবং অবশেষে ক্যাথলিক খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া 'ব্রহ্মবান্ধব' নাম লইলেন। তদবধি খ্রীষ্ট ও মেরীমাতার মূর্তি পূজা করিতেন; অথচ হিন্দুসন্ন্যাসীর ন্যায় গৈরিকধারী ছিলেন। ১৮৯৮এ তিনি বেদান্ত ও হিন্দুধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই আকর্ষণ কী তীব্র হইয়াছিল তাহা আমরা পূর্বে বঙ্গদর্শন পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি। ইহাকে ঠিক সুস্থ মনোভাবের আকর্ষণ বলিতে পারি না— ইহা প্রতিক্রিয়ামুখী দেশসর্বস্বত্ব ভাব। তাহা না হইলে 'নৈবেদ্য'র প্রশংসা করিবার দুই মাস পূর্বে তিনি লিখিয়াছিলেন We must make প্রায়শ্চিত্ত, We must eat a little of cow-dung— আমাদের কিঞ্চিৎ গোবর খাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।[১]

এই প্রতিক্রিয়াপন্থী, প্রাচীনসর্বস্ব মনোভাব লইয়া তিনি রবীন্দ্রনাথের সহিত ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের জন্য মিলিত হইলেন। রবীন্দ্রনাথেরও মনে তখন প্রাচীনের 'ঘোর' নূতন নূতন ভাবে দেখা দিয়াছে; এবং উভয়ে নবধর্মে দীক্ষিতের উৎসাহাতিশয্য লইয়া প্রাচীন ভারতকে আধুনিক জগতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

সাধারণ বোর্ডিং বিদ্যালয়ে থাকিতে হইলে ছাত্রদের টাকা লাগে; কিন্তু প্রাচীন ভারতের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের গুরুগৃহে সে-সম্বন্ধ থাকিতে পারে কি করিয়া! এ আদর্শ নিশ্চয়ই শ্রদ্ধেয়। কিন্তু কলির ব্রাহ্মণ বা শিক্ষকরা তো আর অপ্রতিগ্রহ জীবন যাপন করিতে পারেন না। উপাধ্যায় সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু অন্যেরা গৃহী ও সন্ন্যাসী; তাঁহাদের বেতন ও ছাত্রদের সমস্ত ব্যয়ভার কে বহন করিবে? এ সকল ব্যয় একা কবিকেই বহন করিতে হইত। বলা বাহুল্য এই পরিস্থিতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শে প্রাতে ও সায়াহ্নে ছাত্রদিগকে গায়ত্রী-মন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া ধ্যানের জন্য প্রদত্ত হইত। উপাসনার সময় কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া শুচি দেহ-মনে একান্তে উপবেশন করিতে হইত। উপাসনান্তে বর্তমান গ্রন্থাগারের মধ্যের ঘরটিতে ছাত্রেরা সমবেত হইয়া বেদমন্ত্র গাহিত; সেই সমবেত-উপাসনা-প্রথা এখন পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। অতঃপর ছাত্রেরা অধ্যাপকগণের পদধূলি লইয়া প্রণাম করিয়া বনছায়াতলে গিয়া পাঠ আরম্ভ করিত।

এইভাবে ১৯০১ সালে পূজাবকাশের পর বিশ্বভারতীর অঙ্কুর-বীজ উপ্ত হইল। পৌষ-উৎসবের দিন ছাত্রদের যথাবিধি দীক্ষা দান করা হইল। এই দীক্ষাদানাদি ব্যাপার, মনে হয়, উপাধ্যায়েরই প্রেরণায় অনুষ্ঠিত হয়। কারণ 'বোর্ডিং বিদ্যালয়ে'র ছাত্রদের লইয়া এসব করিবার প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের স্বপ্নই দেখুন আর বোর্ডিং স্কুল পরিচালনাই করুন— তাঁহার বিচিত্ররূপিণী জীবনদেবতা তাঁহাকে বিবিধ কর্মের মধ্যে ঘুরাইয়া মারিতেছে। তাঁহার সম্পাদকীয় সত্তা যথানিয়মে বঙ্গদর্শনের নিত্য চাহিদা আদায় করিয়া লইতেছে, তাঁহার জমিদারী সত্তা তাঁহাকে উত্তরবঙ্গের জলেস্থলে অর্থের সন্ধানে ফিরাইতেছে, আর তাঁহার ব্যক্তিগত সত্তা সংসারের জাল কাটিয়া বাহির হইবার জন্য বৃথায় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে।

১৩০৮ সালের পৌষ-উৎসবের সময় যথাবিধি অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রথীন্দ্রনাথ বোর্ডিংএ থাকিলেন। মৃণালিনী দেবী ও অন্যান্য সন্তানদের কবি শান্তিনিকেতনে আনিতে পারিলেন না; কারণ তখন একমাত্র অতিথিশালা ছাড়া আর কোনো থাকিবার-মত বাড়ি ছিল না। 'ব্রহ্মবিদ্যালয়ে' ছাত্র-অধ্যাপকরা কোনোমতে থাকিতেন। সুতরাং মৃণালিনী দেবীকে সাময়িকভাবে শিলাইদহেই গিয়া বাস করিতে হইল। পূর্বে কবিকে শিলাইদহ-কলিকাতা যাওয়া-আসা করিতে হইত, এখন বোলপুর যোগ হইল। মৃণালিনী দেবী শিলাইদহে তিনটি শিশু লইয়া প্রায়ই একা পড়েন; তাই স্থির হইল বলেন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী সাহানা দেবীকে

১ Twentieth Century 1901 May, উদ্ধৃতি—শ্রীঅরবিন্দ, পৃ. ২৪৭

(সুসি) এলাহাবাদ হইতে আনিয়া শিলাইদহে মৃণালিনী দেবীর কাছে রাখিয়া আসিবেন। তদনুযায়ী চৈত্রের গোড়ায় [? ৫ই চৈত্র ১৩০৮] কবি এলাহাবাদ যান; সেখানে এডমণ্ডস্টোন রোডে এক হোটেলে থাকেন। এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনবীমা-সংগঠন-কার্য লইয়া উত্তরভারত ঘুরিতেছিলেন, মোগলসরাইয়ে কবির সহিত দেখা। কবি স্ত্রীকে লিখিতেছেন, "ভাগ্যি সুরেন আমার সঙ্গ নিলে নইলে একা একা এই হোটেলে পড়ে পড়ে কটা দিন কাটান আমার পক্ষে ভারি কষ্টকর হত।"[১]

এলাহাবাদে তখন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কায়স্থকলেজের অধ্যক্ষ; এক বৎসর হইল তিনি 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদন করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ রামানন্দবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার গৃহে যান। প্রবাসীর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার জন্য ইতিপূর্বে কবি 'প্রবাসী'[২] কবিতা লিখিয়া পাঠান। এবারও বোধ হয় সম্পাদকের অনুরোধে দুইটি কবিতা লিখিয়া দেন। সে দুইটি 'উৎসর্গে'র শেষ কবিতা— 'সে তো সে দিনের কথা, বাক্যহীন যবে' ও 'নব নব প্রবাসেতে নব নব লোকে'।[৩]

এলাহাবাদ হইতে সাহানা দেবীকে লইয়া কবি কলিকাতা হইয়া শিলাইদহ যান ও তথা হইতে বোলপুর ফিরিয়া যথাসময়ে বর্ষশেষের ও নববর্ষের উপাসনা করেন। বর্ষশেষ ও নববর্ষের ইহাই তাঁহার প্রথম অভিভাষণ।[৪] এই অভিভাষণ সম্বন্ধে আলোচনা পূর্বে হইয়া গিয়াছে।

বোর্ডিংস্কুল তথা ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আভ্যন্তরিক অবস্থা কিরূপ এইবার দেখা যাক। নূতন বিদ্যালয়ে আদর্শের অস্পষ্টতা ও কর্মপ্রণালীর অনির্দিষ্টতার জন্য দৈনন্দিন জীবনে অচিরেই বিরোধ দেখা দিল। কল্পনার মেঘমণ্ডলে যাহাদিগকে অনন্যসাধারণ দেবকল্প মনে হইয়াছিল, আজ বাস্তবের স্পর্শে তাহাদিগকে সামান্য বলিয়া মনে হইল। বলা বাহুল্য আশ্রমের শিক্ষকরা মুনিঋষি ছিলেন না, সকলেই বেতনভোগী কর্মী; তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ আধুনিক কালেরই মত, এবং তাঁহাদের স্বভাবও সাধারণ মানুষের ন্যায়ই। ক্ষমতালাভের জন্য দ্বন্দ্ব, কবির অনুগ্রহ লাভের জন্য পরস্পরের মধ্যে ক্ষুদ্র ঈর্ষা প্রভৃতি অত্যন্ত তুচ্ছ বিষয় কবিকে অচিরেই উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। যাঁহারা আদর্শবাদের মোহে ও তপোবনের স্বপ্নে বিভোর হইয়া শান্তিনিকেতনের 'আশ্রমে'— বোর্ডিং স্কুলে নহে— যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারাও দেখিলেন, 'নৈবেদ্য'-রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ কবি হইলেও মানুষ বটে, তাহার উপর 'বড়োমানুষ' এবং অত্যন্ত 'ভালোমানুষ'। সুতরাং বড়োমানুষ ও ভালোমানুষের দোষ ও গুণ সমভাবেই তাহাতে বিদ্যমান: তাঁহারা দেখিলেন "কাব্য দেখে যেমন ভাব কবি তেমন নয় গো" এ বাক্য তো কবি সত্যদ্রষ্টার ন্যায়ই লিখিয়াছিলেন। অল্পকালের মধ্যে ব্রহ্মবান্ধব আশ্রম-বিদ্যালয়ের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া চলিয়া গেলেন। উপাধ্যায়ের চরিত্রে যেমন একটি ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক বৈশিষ্ট্য ও এক-কর্তৃত্বপূর্ণ তেজস্বিতা ছিল, তেমনি ছিল অস্থিরমতি চঞ্চলতা। তিনি চলিয়া গেলে বিদ্যালয়-পরিচালনা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে এই প্রথম সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল।

১৩০৯ সালের গোড়ার দিকে কবি কখনো কলিকাতায়, কখনো শিলাইদহে, কখনো বোলপুরে— মাঝে একবার পুরীও যান, স্থির হইয়া বসিতে পারিতেছেন না। সমস্যা নানাবিধ।

গ্রীষ্মাবকাশ আরম্ভ হইলে রবীন্দ্রনাথ কয়েক দিনের জন্য শিলাইদহে গেলেন, পরিবর্তন আবশ্যক বোধ করিতেছিলেন। সেখানে গিয়া শরীর কিছু যেন ভালো আছে, অন্তত মন নিরুদ্বেগ থাকাতে কাজ করিতে

১ চিঠিপত্র ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪।

২ প্রবাসী। ১৩০৭ ফাল্গুন ৩ রচনাকাল। প্রবাসী ১ম বর্ষ ১৩০৮ বৈশাখ, পৃ, ২২-২৪। দ্র. উৎসর্গ ১৪ নং, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০ম খণ্ড পৃ. ২৬।

৩ প্রবাসের প্রেম, প্রবাসী ১৩০৯ বৈশাখ, পৃ. ৩৩-৩৪। উৎসর্গ ৪৬ নং, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০ম খণ্ড পৃ. ২৭৪-৭৫।

৪ নববর্ষ, বঙ্গদর্শন ১৩০৯ বৈশাখ। দ্র. ভারতবর্ষ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪র্থ, পৃ. ৩৬৭। বর্ষশেষ দ্র. ধর্ম, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩শ পৃ. ৮৩৪।

পারিতেছিলেন। শীঘ্র ফিরিবেন সংকল্প ছিল কিন্তু কাজ পড়িল।[১] শিলাইদহের নির্জনতায় লেখার কাজ ভালোই চলিয়াছিল, তাহার প্রমাণ সমসাময়িক বঙ্গদর্শন। সেইসব রচনা সম্বন্ধে পৃথক পরিচ্ছেদে আলোচনা হইবে। ফিরিবার সময়ে কবি মৃণালিনী দেবীকে শান্তিনিকেতনে আনিলেন।

গ্রীষ্মাবকাশের পর (১৩০৯ আষাঢ়) মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক যুবক শিক্ষক 'হেডমাস্টার'[২] হইয়া বিদ্যালয়ে আসিলেন; কবি বিশেষভাবে তাঁহার উপর 'রথীর ভার' ন্যস্ত করিলেন— এক বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে প্রবেশিকা (এন্ট্রান্স) পরীক্ষার উপযুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে। এবার আশ্রমে গুরু নহে, বোর্ডিং স্কুলের হেডমাস্টার নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। আশ্রম গঠনাদি ব্যাপারে উপাধ্যায় ও রেবাচাঁদ ছিলেন কবির প্রধান সহায়; তাঁহারা চলিয়া গেলে প্রতিষ্ঠার ছয় মাসের মধ্যে বিদ্যালয়ের যথার্থ কঙ্কালমূর্তি বাহির হইয়া পড়িল, উহাকেই নিরুপায়ভাবে কবি স্বীকার করিয়া লইলেন।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি আশ্রমবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে রবীন্দ্রনাথ ভাবিয়াছিলেন ছাত্রদের অভিভাবকগণের সহিত কোনো প্রকার আর্থিক সম্বন্ধ রাখিবেন না। তিনি বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কথা শুনিয়া দেশের হিন্দু ধনীরা প্রাচীন ভারতের আদর্শমতে আশ্রমকে সাহায্য দান করিবে। এই কয়েক মাসের অভিজ্ঞতায় কবি বুঝিলেন প্রাচীন ভারতের আদর্শের প্রতি দেশবাসীর সে শ্রদ্ধা নাই; সুতরাং গ্রীষ্মাবকাশের পর ছাত্রদের নিকট হইতে মাসিক তেরো টাকা করিয়া বেতন লওয়া স্থির হইল। বাস্তবের সহিত আদর্শবাদের আপোস শুরু হইল।

গ্রীষ্মাবকাশের পর ব্রহ্মবান্ধব শিবধন বিদ্যার্ণব ও রেবাচাঁদ আসিলেন না।[৩] ব্রহ্মবান্ধবের স্থলে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেবাচাঁদের স্থলে সুবোধচন্দ্র মজুমদার ও বিদ্যার্ণবের স্থলে আসিলেন হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃতের শিক্ষক রূপে (১৩০৯ শ্রাবণ)। হরিচরণ ছিলেন ঠাকুরবাড়ির পুরাতন খাজাঞ্চি যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আত্মীয়; বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারায় যদুনাথের সুপারিশে শিলাইদহ জমিদারি কাছারিতে হরিচরণ সামান্য চাকুরীতে ভর্তি হন। হরিচরণের জ্ঞানপিপাসা ও শ্রমশীলতা অচিরেই কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও তিনি যেমন একদিন জগদানন্দ রায়কে তাঁহার জমিদারি সেরেস্তা হইতে উদ্ধার করিয়া সন্তানদের শিক্ষকরূপে নিয়োগ করিয়াছিলেন, এবারও হরিচরণকে সেইভাবেই তথা হইতে উঠাইয়া শান্তিনিকেতনে আনিলেন। ইঁহার উপর জাপানী ছাত্র হোরি সানের[৪] সংস্কৃত পড়াইবার ভার অর্পিত হয়। হোরি সান জাপানের প্রাচীন পুরোহিত-বংশের ছেলে, ভারতবর্ষে আসেন সংস্কৃত শিখিতে; ওকাকুরার মধ্যস্থতায় তিনি আসেন।

শিলাইদহ হইতে গ্রীষ্মাবকাশের পর শান্তিনিকেতনে মৃণালিনী দেবী পুত্রকন্যাদের লইয়া আসিয়া অতিথিশালায় উঠিলেন, তখন আর কোনো বাড়িই ছিল না বাসের উপযোগী। কিন্তু শান্তিনিকেতন অতিথিশালায় স্থায়ীভাবে পরিবার লইয়া থাকা ট্রাস্টনীতি বিরুদ্ধ; সেইজন্য কবি খাস আশ্রম সীমানার বাহিরে কয়েক বিঘা জমি ক্রয় করিয়া 'নূতন বাড়ি' নির্মাণকার্য আরম্ভ করেন। পরে দেহলীও সেই জমির মধ্যে নির্মিত হয়। রথীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের বোর্ডিংএ ছাত্ররূপে অন্যান্য ছেলেদের সহিত সমানভাবে খাওয়া-দাওয়া করিয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথ নিজ পুত্রের জন্য

১ পত্র। ১৩০৯ জ্যৈষ্ঠ ১১ [১৯০২ মে ২৬]। স্মৃতি পৃ. ২২।

২ ১৩০৯ আষাঢ় মাসে অধ্যাপক ছিলেন জগদানন্দ রায়, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কালীপ্রসন্ন লাহিড়ী হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। শ্রাবণ মাসের শেষে আসিলেন হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অল্পকাল পরেই আসিলেন কুঞ্জলাল ঘোষ। শিবধন বিদ্যার্ণব ১৩০৯ গ্রীষ্মের ছুটির পর বিদ্যালয়ের কার্যে আর যোগদান করেন নাই; তাঁহার স্থলে হরিচরণবাবু আসেন সংস্কৃত পড়াইবার জন্য।

৩ শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার পরিচয়, শান্তিনিকেতন পত্র, ৭ম বর্ষ ১৩৩৩ আষাঢ়-শ্রাবণ। পৃ. ১৫৪-৫৮।

৪ রবীন্দ্রনাথের পত্র। জগদীশচন্দ্রকে লিখিত। দ্র. প্রবাসী ১৩৪৫। চিঠিপত্র ষষ্ঠ খণ্ড পৃ. ৪৯।

কোনো প্রকার পৃথক আহারাদির ব্যবস্থা করিতে দেন নাই।[১] তবে মৃণালিনী দেবী বিদ্যালয়ের সকল ছেলের জন্যই প্রতিদিন বৈকালিক আহারের ব্যবস্থা করিতেন। অবশ্য তখন ছাত্র ছিল অল্পই; রন্ধন করিয়া অন্যকে খাওয়াইতে কবিপ্রিয়া বড়ই ভালোবাসিতেন।

সকলেরই আশা—'আরামে দিবস যাবে'। কিন্তু ভবিতব্য অন্যরূপ। মৃণালিনী দেবী আষাঢ় মাসেই অসুস্থ হইয়া পড়িলেন; রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রথম হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শরীর যখন খুবই খারাপ হইয়া পড়িল তখন ভাদ্র মাসে তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হইল।

সে সময়ে পূজার ছুটি অল্পদিন হইত; কারণ শীতকালে তখন ছুটি থাকিত একমাস। কালীপূজার পূর্বেই বিদ্যালয়ের কার্য শুরু হইল; রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় 'রোগতাপ লইয়া অত্যন্ত উন্মনা'। মৃণালিনী দেবীর রোগ উপশমের কোনো চিহ্ন দেখা যাইতেছে না; একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "রেণুকার sore throat চলিতেছে। মীরা কাল জ্বরে পড়িয়াছে। কেবল শমী সম্প্রতি ভাল আছে। সে বোলপুর যাইবার জন্য সর্বদাই কাতরতা প্রকাশ করিতেছে। আমি যে কবে বোলপুরে ফিরিতে পারিব কিছুই বলিতে পারি না।"[২] এই অবস্থায় দিন যাইতেছে।

পূজার ছুটির পর বিদ্যালয় খুলিল; কিন্তু কবি তথায় না থাকাতে এবং বিদ্যালয়-পরিচালনার ভার কোনো ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন লোকের উপর ন্যস্ত না থাকায় কাজকর্ম অত্যন্ত শিথিলভাবে চলিতে লাগিল। শান্তিনিকেতনে আছেন তখন মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। শিক্ষকদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, জগদানন্দ রায়, সুবোধ মজুমদার, হরিচরণ পণ্ডিত মহাশয় অনুপস্থিত। "সমস্ত যেন খেলার মতো বোধ হইতেছে।"[৩] এদিকে কলিকাতায় মৃণালিনী দেবীর শারীরিক্ অবস্থা ক্রমশই মন্দতর হইতেছে দেখিয়া কবি বুঝিতে পারিলেন তাঁহার পক্ষে শান্তিনিকেতনে শীঘ্র ফিরিয়া আসা সম্ভব হইবে না। তজ্জন্য তিনি 'বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে বিস্তারিত করিয়া' লিখিয়া নবনিযুক্ত কর্মী কুঞ্জলাল ঘোষের হস্তে অর্পণ করেন। কুঞ্জলালবাবু সম্বন্ধে মনোরঞ্জনবাবুকে কবি লিখিয়াছিলেন, "আশা করিতেছি তাঁহার নিকট হইতে নানা বিষয়ে সাহায্য পাইবেন। অধ্যাপনা-কার্যেও তিনি আপনাদের সহায় হইতে পারিবেন, আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত তিনি এই কার্যে ব্রতী হইতে উদ্যত হইয়াছেন। ইঁহার সম্বন্ধে যত লোকের নিকট হইতে সন্ধান লইয়াছি সকলেই একবাক্যে ইঁহার প্রশংসা করিয়াছেন।" মনোরঞ্জনবাবু, জগদানন্দবাবু ও কুঞ্জবাবুকে লইয়া একটি 'অধ্যক্ষ-সমিতি' গড়িয়া তাঁহাদের উপর বিদ্যালয়ের কর্তৃত্বভার অর্পিত হইল। এই অধ্যক্ষ-সমিতির প্রথম সভাপতি মনোরঞ্জন-বাবু ও প্রথম কার্যসম্পাদক কুঞ্জলালবাবু। হিসাবপত্র রক্ষা সম্বন্ধে কবি বিস্তৃত নিয়মাবলীও লিখিয়া কুঞ্জলালবাবুকে দিয়াছিলেন।[৪] আমাদের মনে হয়, ইহাই শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের প্রথম constitution বা বিধি। কিন্তু অচিরেই তাঁহাকে লইয়া বিরোধ বাধিল। কুঞ্জবাবু একে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম তাহাতে জাতিতে কায়স্থ; সুতরাং বর্ণাশ্রমবিশ্বাসী ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদের তাঁহাকে লইয়া নানা সমস্যা হইল। সে কথা আমরা পরে আলোচনা করিব।

শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে যাহা ঘটিতেছে তাহা কবির পরোক্ষে; পত্র দিয়া, বিধি দিয়া, অর্থ দিয়া যাহা করা সম্ভব

১ "উঁচুদরের ছাত্রদের জন্য বিদ্যালয় খুলি নাই।... এমন জায়গায় সুখীলোকের ছেলের স্থান নাই।...রথীও এখানকার মোটা রুটি খাইয়া মানুষ হইয়া গিয়াছে।... মেয়ে ইস্কুলে মীরাও সকলের সঙ্গে এক থায় থাকে। নিজের ছেলেমেয়ের সঙ্গে বাহিরের লোকের কোনো পার্থক্য রাখি নাই।" স্মৃতি...পৃ. ৭৮। পত্র ৪ঠা ভাদ্র ১৩১৬।

২ স্মৃতি, পৃ ৯। কলিকাতা। ১৩০৯ কার্তিক ১০ ?, ১৯০২ অক্টোবর ২৭ ?

৩ স্মৃতি, পৃ ১৩। বৃহস্পতিবার। কলিকাতা।। ১৩০৯ কার্তিক ২০। নভেম্বর ৬ ?

৪ স্মৃতি, পৃ ১১। দ্র. রবীন্দ্রজীবনী ৪র্থ, সংযোজন পৃ ২৭৫।

তাহা দূর হইতে করিতেছেন, ইহার বেশি করা সম্ভব নহে। কিন্তু কলিকাতায় তিনি বিচিত্র কর্মী। তাঁহার স্ত্রী ও কন্যার ব্যাধি সে তো তাঁহার ব্যক্তিগত দুঃখ— তাহার সংবাদ বহির্জগত রাখে না; প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাহাকে কিছু বলাও কবির স্বভাববিরুদ্ধ। কলিকাতায় থাকিলেই নানা লোকের নানা চাহিদা তাঁহাকে পূরণ করিতে হয়— নানা প্রতিষ্ঠানের নানা অনুরোধ রক্ষা করিতে হয়— আলোচনা-সমিতিতে প্রবন্ধ পড়িতে হয়— বঙ্গদর্শনের জন্য সময়মত লেখা পাঠাইতে হয়।

কবিপ্রিয়ার মৃত্যু হইল ৭ই অগ্রহায়ণ (১৩০৯)। সংসারের যিনি ছিলেন কর্ত্রী তাঁহার অভাবে সমস্ত কর্ম আসিয়া পড়িল কবির উপর। রবীন্দ্রনাথের বয়স এখন একচল্লিশ বৎসর, মৃত্যুকালে মৃণালিনী দেবীর বয়স ছিল মাত্র উনত্রিশ বৎসর। মাধুরীলতা ও রেণুকার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। মাধুরীলতা প্রায়ই স্বামীগৃহে মজঃফরপুরে থাকিতেন। রেণুকার স্বামী বিবাহের দুইদিন পরেই আমেরিকা চলিয়া গিয়াছিলেন। মৃণালিনী দেবী যখন বুঝিলেন যে তাঁহার সময় ফুরাইয়া আসিতেছে, তখন তিনি জেদ করিয়া জামাতা সত্যেন্দ্রনাথকে আমেরিকা হইতে ফিরাইয়া আনেন এবং রেণুকার ফুলসজ্জা-উৎসব সম্পন্ন করেন। মাতার মৃত্যুর সময় রেণুকার বয়স বারো বৎসর মাত্র। রথীন্দ্রনাথের বয়স চৌদ্দ, মীরার বয়স দশ ও শমীন্দ্রের বয়স আট বৎসর মাত্র।

শান্তিনিকেতনের পরিচালনার জন্য বিধিব্যবস্থা করা সত্ত্বেও অশান্তি দুই মাসের মধ্যেই দেখা দিল। অশান্তি বাধিল কবির অনুমোদিত ব্যাখ্যাত আদর্শীকৃত বর্ণাশ্রমধর্ম লইয়া। আশ্রম-প্রতিষ্ঠার সময় নিয়ম হয় যে ছাত্রেরা অধ্যাপকদের পদধূলি লইয়া প্রণাম করিবে। সমস্যা বাধিল কুঞ্জলাল ঘোষকে লইয়া, তিনি একে কায়স্থ তাহার উপর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম। কায়স্থ অধ্যাপককে প্রণাম করা উচিত কি না, এই লইয়া সমস্যার সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জন-বাবুকে যে পত্রখানি লিখিতেছেন, তাহা স্ত্রীর মৃত্যুর দিন দশ পরে লেখা (১৯ অগ্রহায়ণ। স্মৃতি, পৃ. ১৪-১৫)। "প্রণাম সম্বন্ধে আপনার মনে যে দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা উড়াইয়া দিবার নহে। যাহা হিন্দুসমাজবিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবে না; সংহিতায় যেরূপ উপদেশ আছে ছাত্ররা তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে নমস্কার করিবে এই নিয়ম প্রচলিত করাই বিধেয়।" কিন্তু কবির মনের দ্বিধা যায় না, তাই লিখিলেন যে অব্রাহ্মণকে প্রণামের ব্যবস্থা কি কোথায়ও নাই? তাঁহার মত তখন পর্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজের রক্ষণশীল মতের প্রতিধ্বনি মাত্র— যাহা হিন্দুসমাজবিরোধী তাহাকে 'আশ্রমে' স্থান দেওয়া যাইতে পারে না এই ছিল প্রতিষ্ঠাকালের মত। বিদ্যালয়ে বর্ণাশ্রম ধর্ম মানিবার ও মানাইবার চেষ্টা ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবেই ছিল। ভোজনশালায় পংক্তিবিচার করিয়া স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ভেদ করিয়া সকলে আহারে বসিতেন। বলা বাহুল্য এসবের প্ররোচক ছিলেন ব্রাহ্মণ শিক্ষকগণ। রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদ বা উপদেশ অধিকাংশ শিক্ষকের জীবনে ও আচরণে কোনোদিনই কোনো রেখাপাত করিতে পারে নাই। কেহ তাঁহার সাহিত্য, কেহ তাঁহার কলাচর্চা, কেহ তাঁহার সংগীতকে জীবনে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু খুব কম লোকেই তাঁহার ধর্মসাধনা বা তাঁহার প্রগতিশীল সমাজভাবনাকে জীবনে রূপদান করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের জন্য কবির মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন; তাই স্ত্রীর শ্রাদ্ধাদি শেষ করিয়া অবিলম্বে ছেলেমেয়েদের লইয়া শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন (২২শে অগ্রহায়ণ)। অতঃপর যথাবিধি কাজেকর্মে সাহিত্যসৃষ্টিতে মনোনিবেশ করিলেন। বঙ্গ-দর্শনের জন্য ছোটোগল্প লিখিতে হইল, কারণ কার্তিক মাসে 'চোখের বালি' উপন্যাস শেষ হইয়া গিয়াছে। আর লিখিলেন কতকগুলি কবিতা যেগুলি 'স্মরণ' ও 'উৎসর্গে'র মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। যথা সময়ে সাতই পৌষের উৎসব সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু কোনো লিখিত ভাষণ দেন নাই বলিয়া মনে হয়।

এদিকে রেণুকার ব্যাধি উত্তরোত্তর জটিল হইতেছে। কবি বুঝিলেন তাঁহাকে আশ্রম হইতে দীর্ঘকালের জন্য

অনুপস্থিত থাকিতে হইবে। এইজন্য বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্তৃত্বভার বিশেষরূপে একজনের উপরেই ন্যস্ত করা প্রয়োজন বোধ করিলেন। কার্তিক মাসে যে অধ্যক্ষ-সমিতি গঠন করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা কার্যকর হয় নাই। কুঞ্জলাল-বাবুর ব্রাহ্ম গোঁড়ামি ও অপরদের ব্রাহ্মবিদ্বেষ কোনো কার্যকেই সুষ্ঠুভাবে চালিত হইতে দেয় নাই। শীতকালের ছুটি হইয়াছে। কবি শান্তিনিকেতন হইতে মনোরঞ্জনবাবুকে এক পত্রে লিখিতেছেন (২৯ পৌষ) যে, বিদ্যালয়ের পরিচালনা বিষয়ে "পাকাপাকি নিয়ম না করিলে ক্রমশঃ শৈথিল্যের দিকে যাইব…বিশেষত আমার অনুপস্থিতিকালে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে পারে। আমি শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথকে সকল বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশ দিয়া অধ্যক্ষতার ভার দিয়াছি। তিনি যেরূপ বিধান করিয়া দিবেন তাহাই সকলে সম্পূর্ণভাবে মানিয়া চলিলে শৃঙ্খলা রক্ষা হইবে।"[১] "কঠিন নিয়মের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আপনি আমাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন তাহা আমি সঙ্গত বোধ করি।" সত্যেন্দ্রনাথ হইতেছেন রেণুকার স্বামী, মধ্যম জামাতা; দুই মাস যাইতে না যাইতেই ডিমক্রেসি সম্বন্ধে কবির প্রথম অভিজ্ঞতা ব্যর্থ হইল এবং তাহারই প্রতিক্রিয়ায় কঠিন নিয়ম ও এককর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল।

বিদ্যালয় সম্বন্ধেও যেমন দুশ্চিন্তা, সংসার সম্বন্ধেও তেমনি। অর্থাভাব দারুণ; "ব্যাঙ্কে এখন আমার এক বৎসরের সঙ্গতি নাই, বৎসর-শেষে বোধ হয় অনেক টাকা অনটন পড়িবে। আমি নিজের লেখাপড়ার জন্য একটি নিভৃত ঘর তৈরি করার সংকল্প করিয়াছিলাম তাহাও আপাতত স্থগিত রাখিয়াছি, যদি অর্থের সচ্ছল ঘটে তবে দেখা যাইবে।"

মাঘোৎসবের জন্য কবি ২রা মাঘ কলিকাতায় গেলেন, রেণুকাকে সঙ্গে লইলেন 'ডাক্তারের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করাই উদ্দেশ্য'। উৎসবান্তেই (১২ই মাঘ) বোলপুর ফিরিয়া যান ও প্রায় দেড় মাস কাল একাদিক্রমে তথায় বাস করেন। এই উৎসবে তিনি 'ধর্মের সরল আদর্শ'[২] বিষয়ক যে ভাষণ দান করেন তদ্‌বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা হইয়াছে।

নানা দুঃখ-আঘাতের মধ্যে এই সময়ে কবিকে তাঁহার নূতন কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনে নিযুক্ত দেখি; এই কার্যে কলিকাতার সিটি কলেজের দর্শন-অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেনের সহায়তা লাভ করায় তাঁহার বিশেষ উপকার হয়; কারণ মোহিতচন্দ্র একাধারে দার্শনিক ও সাহিত্যরসিক এবং সর্বোপরি শ্রদ্ধাশীল রবীন্দ্রানুরাগী। কাব্যগ্রন্থ নূতনভাবে শ্রেণীত করিয়া কাব্যখণ্ডগুলির জন্য যে প্রবেশক কবিতা লিখিয়া দেন, তাহা 'উৎসর্গ' কাব্যে সঞ্চিত হইয়াছে, সে বিষয়ে পৃথক পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

আশ্রমের ইতিহাসে একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে তরুণ কবি ও সাহিত্যিক সতীশচন্দ্র রায় শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়া আসিলেন। মাঘোৎসবের পর দেড় মাস কবি এই তরুণ কবিকে অত্যন্ত নিকটে পাইয়াছিলেন; যথাস্থানে তাহার আলোচনা হইবে।

স্মরণ

জীবনের বিচিত্র দুঃখশোক, সমস্যা ও সংগ্রামের মধ্যে কবিজীবনে সাহিত্যসৃষ্টির মূল ধারাস্রোত কখনো অবরুদ্ধ হয় না। পরম দুঃখের দিনেও চরম পরীক্ষার মুহূর্তে কাব্যলক্ষ্মী ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেন— সার্থক হয় শোকের বেদনা,

১ স্মৃতি, পৃ ১৫।

২ বঙ্গদর্শন ১৩০৯ মাঘ। দ্র. ধর্ম, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩শ খণ্ড, পৃ ৩৫৩।

সফল হয় দুঃখের তাপ— কবির জীবনে বারে বারে এইটি দেখিয়াছি এবং পরেও দেখিব। স্ত্রীর মরণনিশ্চয় পীড়ার সময়ে কবির লেখনী স্তব্ধ হয় নাই। যে দুঃখ আসিতেছে তাহার জন্য মন কি পূর্বেই আভাস পাইয়াছিল। শোকের কল্পিত হৃদয়োচ্ছ্বাসকে কি ভাষা দান করিলেন 'মরণ'[১] কবিতায়।

অত চুপি চুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও,
ওগো একি প্রণয়েরি ধরণ।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর শোকাশ্রু কাব্যধারায় উছলিযা উঠিল। যে কাব্যপ্রেরণা ক্ষীণ স্রোতে বহিতেছিল, বিচ্ছেদের বেদনায় ক্ষণকালের জন্য তাহা বন্যার ন্যায় দুকূলপ্লাবী হইল, কিন্তু কর্তব্যের দৃঢ় বন্ধন কোথাও শিথিল হইল না; অত্যন্ত সংযত সংহত ভাবে তাহা বহিয়া গেল। কয়েকটি সনেটের মধ্যে 'স্মরণ' করিলেন কবিপ্রিয়াকে।

স্ত্রীর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ যে আঘাত পাইযাছিলেন, তাহার একমাত্র প্রকাশ এই 'স্মরণ' কবিতাগুচ্ছ। কবির সুবিস্তৃত সাহিত্যে তাঁহার স্ত্রী সম্বন্ধে বিশেষ কোনো উল্লেখ পাই না. কোনো গ্রন্থ তাঁহার নামে স্পষ্টত উৎসর্গ করা হয় নাই; অথচ কবির জীবনে এই নারীর প্রভাব নানাভাবে কার্যকর হইয়াছিল। উর্মিলা দেবী লিখিয়াছেন যে, কবির উপর কবিপ্রিয়ার অখণ্ড প্রতাপ ছিল; এমনকি কবি তাঁহাকে মনে মনে ভয় করিতেন। অথচ ঠাকুরবাড়ির কনিষ্ঠা বধূ বলিয়া নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। মহর্ষির প্রতি তাঁহার অপরিসীম ভক্তি ছিল; তাই তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কখনো কোনো কাজ করিতে তিনি সম্মত হইতেন না। সাংসারিক জীবনে সংগ্রাম অনিবার্য, দুইটি হৃদয় কখনোই এক হয় না। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্ত্রীকে যেসব পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে সংগ্রামের কথাও যেমন আছে, দুইজনের প্রতি দুইজনের অশেষ আকর্ষণের কথা তেমনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। সাংসারিক বিষয়ে মতভেদ অনিবার্য, তাই বলিয়া কবির স্নেহের অভাব এক মুহূর্তের জন্য কোথায়ও প্রকাশ পায় নাই। কবির স্ত্রী হইবার দুঃখ ও সুখ তাঁহাকে চিরদিন বহন করিতে হইয়াছিল। বিদ্যালয় আরম্ভ করিয়া কবি যে ভীষণ দায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আর্থিক অসচ্ছলতার দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছিল তাঁহার স্ত্রীকেই। তাঁহাদের বাড়ির মহিলাদের নিকট শুনিয়াছি, মৃণালিনী দেবীর গায়ে স্বর্ণ-অলংকার ছিল না। সেজন্য তাঁহাকে কেহ কোনো আপসোস করিতে দেখে নাই। সাজসজ্জা করিতেও তিনি ভালোবাসিতেন না।

রবীন্দ্রনাথ পত্নীর বিয়োগে যে কাতরতা অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা এই কবিতাগুচ্ছের বাহিরে আর কোথায়ও প্রকাশ করেন নাই। নিজের দুঃখশোককে অন্যের কাছে প্রকাশ করাকে তিনি শোকের অপমান মনে করিতেন; তাই অতি বেদনার সময়েও তাঁহাকে কর্মে নিরত থাকিতে দেখিয়াছি। উর্মিলা দেবী লিখিয়াছেন, "কবিপ্রিয়া স্বর্গতা হবার অনেকদিন পর কি-একটা কারণে কবির সংসারে একটা ক্ষণিক বিপ্লব ঘটে। তখন একদিন তিনি আমার মেজদিদি-[অমলা দাস]-কে বলেছিলেন, দেখো, অমলা, মানুষ মরে গেলেই যে একেবারে হারিয়ে যায়, জীবিত প্রিয়জনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সে কথা আমি বিশ্বাস করি না। তিনি এতদিন আমাকে ছেড়ে গেছেন, কিন্তু যখনই আমি কোনো-একটা সমস্যায় পড়ি—যেটা একা মীমাংসা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়,—তখনই আমি তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করি। শুধু তাই নয়, তিনি যেন এসে আমার সমস্যার সমাধান করে দেন। এবারেও আমি কঠিন সমস্যায় পড়েছিলাম, কিন্তু এখন আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই।"[২]

১ মরণ, বঙ্গদর্শন ১৩০৯ ভাদ্র। উৎসর্গ ৪৫, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ৭১।

২ বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫২, তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, পৃ ২৪৯।

স্মরণের কবিতাগুলি (২৭টি) পৃথিবীর In Memorium সাহিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকারের উপযুক্ত। কবিতাগুলি ব্যক্তিগত হইলেও তাহার মধ্যে বিচ্ছেদবেদনা এমনভাবে ফুটিয়াছে যে, যে বিরহী সেই কেবল ইহা অনুভব করে তাহা নহে, যে সুখী সেও অকারণে অশ্রু মোছে। রবীন্দ্রনাথের গার্হস্থ্য জীবনে এই প্রথম শোকাঘাত; কিন্তু প্রকাশের মধ্যে কোথায়ও শোকের উচ্ছ্বাস নাই। তিনি লিখিতেছেন—

গেলে যদি একেবারে গেলে রিক্ত হাতে?
এ ঘর হইতে কিছু নিলে না কি সাথে।
বিশ-বৎসরের তব সুখদুঃখ-ভার
ফেলে রেখে দিয়ে গেলে কোলেতে আমার!
প্রতি দিবসের প্রেমে কতদিন ধরে
যে ঘর বাঁধিলে তুমি সুমঙ্গলকরে
পরিপূর্ণ করি তারে স্নেহের সঞ্চয়ে
আজ তুমি চলে গেলে কিছু নাহি লয়ে?

আর-একটি কবিতায় —'প্রার্থনা'

আমার ঘরেতে আর নাই সে যে নাই,
যাই আর ফিরে আসি, খুঁজিয়া না পাই।

'আহ্বান' কবিতায় বলিতেছেন—

ঘরে যবে ছিলে মোরে ডেকেছিলে ঘরে
তোমার করুণাপূর্ণ সুধাকণ্ঠস্বরে।
আজ তুমি বিশ্ব-মাঝে চলে গেলে যবে
বিশ্ব-মাঝে ডাক' মোরে সে করুণ রবে।

'পরিচয়ে' এইভাবে আত্মপ্রকাশ করিলেন—

যতদিন কাছে ছিলে, বলো কী উপায়ে
আপনারে রেখেছিলে এমন লুকায়ে।
ছিলে তুমি আপনার কর্মের পশ্চাতে
অন্তর্যামী বিধাতার চোখের সাক্ষাতে।
প্রতি দণ্ডমুহূর্তের অন্তরাল দিয়া
নিঃশব্দে চলিয়া গেছ নম্র-নত-হিয়া।
আপন সংসারখানি করিয়া প্রকাশ
আপনি ধরিয়াছিলে কী অজ্ঞাতবাস।
আজি যবে চলি গেলে খুলিয়া দুয়ার
পরিপূর্ণ রূপখানি দেখালে তোমার।

'সঞ্চয়ে'—

দেখিলাম খানকয় পুরাতন চিঠি—
স্নেহমুগ্ধ জীবনের চিত্র দু-চারিটি

স্মৃতির খেলেনা ক'টি বহু যত্নভরে
গোপন সঞ্চয় করি রেখেছিলে ঘরে।

স্মরণের প্রত্যেকটি কবিতা হইতে কিয়দংশ করিয়া উদ্ধৃত করিলেও কাব্যখানির সম্পূর্ণ ভাবটি প্রকাশ করা যায় না, সমস্ত কাব্যখানি একবিন্দু অখণ্ড অশ্রুর ন্যায় তীব্র বিষাদে সুসংহত।

'স্মরণ' গ্রন্থে কবি সেই কবিতাগুলি দিয়াছিলেন যেগুলি নিতান্ত ব্যক্তিগত; কিন্তু ইহার বাহিরে যে কয়েকটি আছে, বিশুদ্ধ কবিতা হিসাবে তাহাদের আবেদন অনেক বেশি বলিয়া আমাদের মনে হয়। সেই শ্রেণীর কবিতা হইতেছে— মুক্তপাখির প্রতি[১] দুর্ভাগা[২] পথিক[৩] নারী[৪] ও বিশ্বদোল[৫]।

পাঠকগণকে এই কবিতা-কয়টিকে 'স্মরণ' সনেটগুচ্ছের রসদৃষ্টি হইতে বিচার করিতে বলিতেছি; তাঁহারা দেখিবেন যে এগুলি সম্পূর্ণভাবে ঐ কবিতাগুচ্ছেরই সুরে বাঁধা, কিন্তু বিচিত্র ছন্দের মধ্যে লীলায়িত হইতে পাইয়া নূতন রূপ লইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তির মধ্যে 'স্মরণে'র বেদনা কি আরও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পায় নাই—

হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
আজি কি আসিল প্রলয়রাত্রি ঘোর।
চিরদিবসের আলোক গেল কি মুছিয়া।
চিরদিবসের আশ্বাস গেল ঘুচিয়া?
দেবতার কৃপা আকাশের তলে কোথা কিছু নাহি বাকি?—
তোমাপানে চাই, কাঁদিয়া শুধাই আমরা খাঁচার পাখি। —মুক্তপাখির প্রতি

নৈর্ব্যক্তিক শোকগাথা ইহার চেয়ে সুন্দর আর কি হইতে পারে? 'দুর্ভাগা' কবিতার মধ্যে কী বেদনাই-না প্রকাশ পাইয়াছে—

ঝড়ের মুখে যে ফেলেছ আমায়
সেই ভালো ওগো, সেই ভালো।
সব সুখজালে বজ্র জ্বালালে,
সেই আলো মোর সেই আলো।
সাথি যে আছিল নিলে কাড়ি—
কী ভয় লাগালে— গেল ছাড়ি,
একাকীর পথে চলিব জগতে
সেই ভালো মোর সেই ভালো।

'পথিক' কবিতা কি অমরযাত্রীর উদ্দেশ্যেই রচিত—

পথের চিহ্ন দেখা নাহি যায়
পান্থ, বিদেশী পান্থ।

১ বঙ্গদর্শন ১৩০৯ অগ্রহায়ণ। উৎসর্গ ৩১নং, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ৪৬।
২ বঙ্গদর্শন, ১৩০৯ অগ্রহায়ণ। উৎসর্গ ৪১, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ৬৪।
৩ বঙ্গদর্শন, ১৩০৯ অগ্রহায়ণ। উৎসর্গ ৪২, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ৬৫।
৪ বঙ্গদর্শন। ১৩০৯ পৌষ। উৎসর্গ ৪৩, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ৬৭।
৫ বঙ্গদর্শন, ১৩০৯ পৌষ। উৎসর্গ ৩৮, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ৫৮।

কোন্ প্রান্তরশেষে
কোন্ বহুদূর দেশে
কোথা তোর রাত হবে যে প্রভাত
হায় রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ।

মৃত্যুকে কবি কি চক্ষে দেখিতেছেন, তাহারই রূপটি পাই 'বিশ্বদোলে'—

ডান হাত হতে বাম হাতে লও,
বাম হাত হতে ডানে।
নিজধন তুমি নিজেই হরিয়া
কি যে কর কে বা জানে।
কোথা বসে আছ একেলা—
সব রবিশশী কুড়ায়ে লইয়া
তালে তালে কর এ খেলা।
খুলে দাও ক্ষণতরে,
ঢাকা দাও ক্ষণপরে—
মোরা কেঁদে ভাবি, আমারি কি ধন
কে লইল বুঝি হ'রে!
দেওয়া-নেওয়া তব সকলি সমান
সে কথাটি কে বা জানে।
ডান হাত হতে বাম হাতে লও,
বাম হাত হতে ডানে।

আরও দুই-চারিটি কবিতাও যে এই শোকাভিঘাতে রচিত নহে তাহা বলিতে পারি না, তবে তাহাদের কাল নির্ণয় করা কঠিন বলিয়া অনুমান আশ্রয় করিলাম না।

বঙ্গদর্শনে দেশাত্মবোধ

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি যে কেবলই ধর্ম ও বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে রচনা তাহা নহে। 'নৈবেদ্যে'র মধ্যে ধর্ম ও দেশের সমীকরণের চেষ্টা শুরু হয় সত্য, কিন্তু অচিরে দেশের সমস্যা এমনি কঠোর রূপ ধারণ করিল যে তাহাকে বাস্তবের দৃষ্টিতে দেখা ছাড়া উপায় থাকিল না। রবীন্দ্রনাথ দেশকে কি চক্ষে দেখিতেন তাহার একটি মাত্র উদাহরণ নিম্নে দিতেছি; ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রগণকে দেশ সম্বন্ধে কোন্ আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন (২৭ কার্তিক ১৩০৯) "... ছাত্রগণকে স্বদেশের প্রতি বিশেষরূপে ভক্তি-শ্রদ্ধাবান করিতে চাই।... স্বদেশও দেবতা। স্বদেশকে লঘুচিত্ত অবজ্ঞা উপহাস ঘৃণা— এমন-কি অন্যান্য দেশের তুলনায় ছাত্ররা যাহাতে খর্ব করিতে না শেখে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে চাই।... অতিরিক্ত মাত্রায় স্বদেশাচারের অনুগত হওয়া ভালো, তথাপি মুগ্ধভাবে বিদেশীর অনুকরণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করা কিছু নহে।"

বিংশ শতকের গোড়ায় ইংরেজ তথা পশ্চিমের সকল প্রকার প্রতিষ্ঠান-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত হয়। কি বিবেকানন্দ, কি রবীন্দ্রনাথ সকলেই অতীত ভারতের আদর্শকে রূপায়িত করিবার জন্য চেষ্টান্বিত হইয়াছিলেন।

দেশের সমস্যা বাস্তবমূর্তিতে দেখা দিলে, জীবনে অগ্নিপরীক্ষার মুহূর্ত উপস্থিত হইলে দেশসেবক যেন বিচলিত না হন, এই কথাটি দিয়া কবি দেশসমস্যার উদ্‌বোধন করিলেন 'মা ভৈঃ'[১] প্রবন্ধে। সেদিন রবীন্দ্রনাথের লেখনী হইতে এই বাণী অতর্কিতভাবে নির্গত হইয়াছিল— "তুমি দেশকে যথার্থ ভালোবাস, তাহার চরম পরীক্ষা তুমি দেশের জন্য মরিতে পার কি না।" আমাদের দেশে ক্ষত্রিয় নির্ভয়ে প্রাণ দিয়াছে, আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণ নির্লোভে সর্বস্ব তিলে তিলে ত্যাগ করিয়াছে। "এই দুয়েতেই পৌরুষ।" ভয়কে জয় করিবার জন্যই লেখক সেদিন ওজস্বিতার সহিত বলিয়াছিলেন, "দৈন্যই বল, অজ্ঞতাই বল, মূঢ়তাই বল, মনুষ্যচরিত্রে ভয়ের মতো এত ছোটো আর কিছুই নাই।" দেশবাসীকে 'মা ভৈঃ' বলিয়া কবি স্বয়ং তৎকালীন বড়লাট লর্ড কর্জনের এক দাম্ভিক কর্মের সমলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন— প্রবন্ধটির নাম 'অত্যুক্তি'। এই প্রবন্ধটির পটভূমিটি পরিষ্কার করিয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে ধরিতে চাই, কারণ অর্ধশতকোত্তর ইতিহাসের স্মৃতি ও শ্রুতি উভয়েই ম্লান হইয়া গিয়াছে।

আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি সেটি কর্জনী যুগের আরম্ভ ৬ জানুয়ারি ১৮৯৯ (২৩ পৌষ ১৩০৫)। কর্জন ভারতের বড়লাট তথা রাজপ্রতিনিধিরূপে আসেন। ইনি লর্ড ডালহৌসির ন্যায় প্রচণ্ড সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন। তাঁহার শাসনের পর সিপাহী বিদ্রোহ হয়, কর্জনের শাসনের ফলেও বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তাহা বিপ্লবের রূপ গ্রহণ করিয়া ভারতকে স্বাধীনতা অর্জনের পথে ঠেলিয়া দিল। কর্জন-শাসনের এক বৎসর পর ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হয়।[২] মহারানীর স্মৃতিরক্ষার্থে তাজমহলের অনুকরণে এক বিরাট সৌধ নির্মাণের পরিকল্পনা ও তজ্জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা কর্জনের অন্যতম কীর্তি। তাঁহার পরিকল্পিত সৌধ কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নামে খ্যাত। অতঃপর তিনি নূতন ভারতসম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড-এর অভিষেক উপলক্ষে দিল্লী নগরীতে এক বিরাট দরবারের আয়োজন করিলেন। তখন দিল্লী সামান্য একটি নগর, অতীত স্মৃতি ছাড়া তাহার গৌরবের আর কিছুই ছিল না। সে দরবারে ভারতসম্রাট আসেন নাই, কর্জন তাঁহার প্রতিনিধির পদগৌরবে রাজসম্মান আদায় করিলেন। এই দিল্লী-দরবার উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের 'অত্যুক্তি'[৩] লিখিত হয়।

দিল্লীতে যে দরবারের আয়োজন হইতেছিল তাহাকে রবীন্দ্রনাথ 'পাশ্চাত্য অত্যুক্তি' 'মেকি অত্যুক্তি' বলিয়া অভিহিত করিলেন। কারণ রাজভক্তি প্রদর্শনের যে আয়োজন হইতেছিল তাহা যে অত্যন্ত স্থূল অতিরঞ্জন তাহা লেখক নানাভাবে স্পষ্ট করিয়া ধরিলেন। দেশে তখন দুর্ভিক্ষ, মহামারি চলিতেছে, উৎসবের পক্ষে সম্পূর্ণ অসময়। "ঠিক যে সময়ে ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীয় হৃদয়ের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নপ্রায়, যে সময়ে আমাদের প্রতি ইংরেজের বিতৃষ্ণা ও অবজ্ঞা তাহাদের সামাজিক আচরণে ও ব্যবসায়িক ব্যবহারে প্রতিদিন অনাবশ্যক সুস্পষ্টতার সহিত পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে,…ঠিক সেই সময়টাতেই অধম ভারতবর্ষের রাজভক্তি ইংরেজ নানা প্রকারে বিশ্বজগতের কাছে উদ্ঘোষিত করিবার আয়োজন করিতেছে, আশানুরূপ ফলও পাইয়াছে, শূন্যঘট যথেষ্ট পরিমাণ শব্দ করিতেছে।"…"এদিকে আমাদের প্রতি সিকি-পয়সার বিশ্বাস ইংরেজের মনের মধ্যে নাই ; এত বড় দেশটা সমস্ত নিঃশেষে নিরস্ত্র… অথচ জগতের কাছে সাম্রাজ্যের বলপ্রমাণ উপলক্ষ্যেও আমাদের অটল ভক্তি রটাইবার বেলা আমরা আছি।… আমাদের বিদেশী কর্তারা ঠিক করিয়া বসিয়া আছেন যে, প্রাচ্য হৃদয় আড়ম্বরেই ভোলে, এইজন্যই ত্রিশ কোটি অপদার্থকে অভিভূত করিতে দিল্লীর দরবার

১ মাভৈঃ, বঙ্গদর্শন- ১৩০৯ কার্তিক। দ্র. বিচিত্র প্রবন্ধ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৫, পৃ ৪৪১-৪৪৪।

২ ২১ জানুয়ারি ১৯০১। ৮ মাঘ ১৩০৭।

৩ বঙ্গদর্শন ১৩০৯ কার্তিক। দ্র. ভারতবর্ষ ১৩১২, গদ্যগ্রন্থাবলী ১০, রাজা ও প্রজা (১৩১৪)। ভারতবর্ষ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪, পৃ ৫৪১।

নামক একটা সুবিপুল অত্যুক্তি বহু চিন্তায়-চেষ্টায় ও হিসাবের বহুতর কষাকষি দ্বারা খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন— জানেন না যে, প্রাচ্য হৃদয় দানে দয়াদাক্ষিণ্যে, অবারিত মঙ্গল অনুষ্ঠানেই ভোলে।"…"দয়াহীন, দানহীন দরবার… ঔদার্য হইতে উৎসারিত নহে, তাহা প্রাচুর্য হইতে উদ্বেলিত হয় নাই।"

'অত্যুক্তি' রচনার পঁচিশ বৎসর পর কবি এই বিষয়ে শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনের গ্রন্থের সমালোচনায় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা প্রণিধানযোগ্য।[১] "ইতিমধ্যে কার্জন লাটের হুকুমে দিল্লীর দরবারের উদ্যোগ হল। তখন রাজশাসনের তর্জন স্বীকার করেও আমি তাঁকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলুম। সেই প্রবন্ধ যদি হাল আমলের পাঠকেরা পড়ে দেখেন তবে দেখবেন, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর রাষ্ট্রিক সম্বন্ধের বেদনা ও অপমানটা যে কোথায় আমার সেই লেখায় কতকটা প্রকাশ করেছি। আমি এই বলতে চেয়েছিলুম, দরবার জিনিসটা প্রাচ্য— পাশ্চাত্য কর্তৃপক্ষ যখন সেটা ব্যবহার করেন তখন তার যেটা শূন্যের দিক সেইটিকেই জাহির করেন, যেটা পূর্ণের দিক সেটাকে নয়। প্রাচ্য অনুষ্ঠানের প্রাচ্যতা কিসে? সে হচ্ছে দুই পক্ষের মধ্যে আত্মিক সম্বন্ধ স্বীকার করা। তরবারির জোরে প্রতাপের যে সম্বন্ধ সে হল বিরুদ্ধ সম্বন্ধ, আর প্রভূত দাক্ষিণ্যের দ্বারা যে সম্বন্ধ সেইটেই নিকটের। দরবারে সম্রাট আপন অজস্র ঔদার্য প্রকাশ করার উপলক্ষ্য পেতেন; সেদিন তাঁর দ্বার অবারিত, তাঁর দান অপরিমিত। পাশ্চাত্য নকল দরবারে সেই দিকটাতে কঠিন কৃপণতা, সেখানে জনসাধারণের স্থান সংকীর্ণ, পাহারাওয়ালার অস্ত্রশস্ত্রে রাজপুরুষদের সংশয়বুদ্ধি কণ্টকিত— তার উপরে এই দরবারের ব্যয়বহনের ভার দরবারের অতিথিদেরই 'পরে। কেবলমাত্র নতমস্তকে রাজার প্রতাপকে স্বীকার করবার জন্যেই এই দরবার। উৎসবের সমারোহ-দ্বারা পরস্পরের সম্বন্ধের অন্তর্নিহিত অপমানকেই আড়ম্বর করে বাইরে প্রকাশ করা হয়; এই কৃত্রিম হৃদয়হীন আড়ম্বরে প্রাচ্য হৃদয় অভিভূত হতে পারে এমন কথা চিন্তা করার মধ্যেও অবিমিশ্র ঔদ্ধত্য এবং প্রজার প্রতি অপমান। ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রভুত্ব তার আইনে, তার মন্ত্রগৃহে, তার শাসনতন্ত্রে ব্যাপ্তভাবে আছে, কিন্তু সেইটেকে উৎসবের আকার দিয়ে উৎকট করে তোলার কোনো প্রয়োজন মাত্রই নেই।

"বরঞ্চ এই রকম কৃত্রিম উৎসবে স্পষ্ট করে প্রকাশ করে দেওয়া হয় যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ খুব কঠিন হয়ে আছে, কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের মানবসম্বন্ধ নেই— যান্ত্রিক সম্বন্ধ। এ দেশের সঙ্গে তার লাভের যোগ আছে, ব্যবহারের যোগ আছে, হৃদয়ের যোগ নেই। কর্তব্যের জালে দেশ আবৃত, সেই কর্তব্যের নৈপুণ্য এবং উপকারিতা স্বীকার করলেও আমাদের মানবপ্রকৃতি স্বভাবতই সেই প্রাণহীন শাসনতন্ত্রে পীড়া বোধ করে।"

মিথ্যা প্রচার ও সত্যগোপন যে কেবল যুদ্ধের সময়েই ইংরেজের প্রয়োজন হয় তাহা নহে। রাজনৈতিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা হইলে ইংরেজের ধর্মবুদ্ধি এমনকি বিচারবুদ্ধি পর্যন্ত কি পরিমাণে বিপর্যস্ত হয় তাহা রবীন্দ্রনাথ 'রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি' শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করেন; বিষয়টা ছিল এলাহাবাদ হাইকোর্টের একটি মোকদ্দমা। সোমেশ্বর দাস নামক জনৈক ধনী ব্যাঙ্কার তাঁহার কোনো ইংরেজ ভাড়াটিয়াকে বাড়ি হইতে ফুলগাছের টব লইয়া যাইতে সাহেবের ভৃত্যগণকে বাধা দেন; সেই স্পর্ধায় তাঁহার কারাদণ্ড হয়। বিচারক ছিলেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের অন্যতম জজ বার্কিট সাহেব। এই ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—"বিচারের নিক্তিতে সক্ষম-অক্ষম এবং কালো-সাদায় ওজনে কমবেশি নাই। কিন্তু পোলিটিকাল প্রয়োজন বলিয়া একটা ভারী জিনিস আছে, সেটা যে দিকে ভর করে, সে দিকে নিক্তি হেলে।… আমরা প্রতিদিন নানা দৃষ্টান্তের দ্বারা শিখিতেছি যে, পোলিটিকাল প্রয়োজনের যে বিধান তাহা ন্যায়ের বিধান সত্যের বিধানের সঙ্গে ঠিক মেলে না।… আমরাও

১ "রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত", Sachindranath Sen, Political Philosophy of Rabindranath Tagore গ্রন্থের সমালোচনা। প্রবাসী ১৩৩৬ অগ্রহায়ণ, পৃ ১৭১-১৭৬। গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪, পৃ ৫৬০।

প্রয়োজনকে সকলের উচ্চে স্থান দিতে উদ্যত হইয়াছি। আমরাও বুঝিতেছি, পোলিটিকাল উদ্দেশ্যসাধনে ধর্মবুদ্ধিতে দ্বিধা অনুভব করা অনাবশ্যক।"

রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন যে, পশ্চিমের গুরুর নিকট হইতে এই শিক্ষা ভারতের পক্ষে আদৌ শুভকর হইবে না ; যেখানে ধর্ম প্রয়োজনের আনুগত্য করে সেখানে সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। এলাহাবাদের ইংরেজ ধর্মাধিকরণের বিচারে শঙ্কিত হইয়া লেখক উপরি-উক্ত মন্তব্য করিয়াছিলেন।[1]

কিন্তু দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে বেগে পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছিল তাহাতে অল্পকালের মধ্যে কবিকে এই ন্যায়-অন্যায় ধর্মাধর্ম সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল ; রাজকুটুম্ব[2] ঘুষাঘুষি[3] ও ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত[4] এই প্রবন্ধ ত্রয়ে তিনি এই বিষয়ের অবতারণা করিলেন। ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে বিরোধ ক্রমেই কেন বিদ্বেষে পরিণত হইতেছে এই প্রবন্ধগুলিতে তাহারই বিশ্লেষণ পাওয়া যায়।

পাঠকগণের স্মরণ আছে, রবীন্দ্রনাথ কিভাবে 'ভারতী' ও 'সাধনা'র পৃষ্ঠায় দেশের অধিবাসীকে আত্মনির্ভরশীলতায় ও আত্মকর্তৃত্বে জাগ্রত করিবার জন্য নিরন্তর প্রবন্ধ ও প্রসঙ্গকথা লিখিয়াছিলেন। কবির যৌবনকালে লিখিত 'হাতে কলমে' (ভারতী ১২৯১) প্রবন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা পাঠকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। বিংশ শতকের প্রারম্ভে স্বামী বিবেকানন্দ মেঘমন্দ্রিত স্বরে বাঙালি যুবককে এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, নির্বীর্যতা আধ্যাত্মিকতা নহে। তমোগুণ ও সত্ত্বগুণ দুই আজ পরিহার্য— ভারতে রজোগুণের চর্চার প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথও 'নৈবেদ্য' কাব্যে বলিয়াছিলেন,

অন্যায় যে করে, আর, অন্যায় যে সহে।
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

অত্যাচারকে প্রতিরোধ করিবার আদেশ বাঙালির কাছে এই দুই মহাপুরুষের বাণীর মধ্য দিয়া প্রচারিত হইতেছিল।

এই সময়ে New India নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা বিপিনচন্দ্র পাল সম্পাদন করিতেছিলেন ; বাংলাদেশের রাজনীতি-ক্ষেত্রে উগ্র স্বাদেশিকতার বীজমন্ত্র তিনিই প্রথম বপন করেন। তিনি একাধারে টিলক ও বিবেকানন্দের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, যদিও ধর্মবিশ্বাসে তিনি ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত। বিপিনচন্দ্র পাল New Indiaর এক প্রবন্ধে বলেন যে, যদি আমরা ঘুষির পরিবর্তে ঘুসি ফিরাইতে পারি, তবে রাস্তায় ঘাটে ইংরেজকে অনেক অন্যায় হইতে নিরস্ত রাখিতে পারিতাম। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন যদিও মাঝে মাঝে কোনো কোনো বিবেকহীন ইংরেজ যথেচ্ছভাবে নিরীহ ভারতীয়দের উপর উৎপীড়ন করিত, তবুও তাহা পূর্বের ন্যায় নিছক একতরফা হইত না। 'রাজকুটুম্ব' প্রবন্ধে কবি বলিলেন, "মুষ্টিযোগের মতো চিকিৎসা নাই··· কিন্তু সম্পাদকের উপদেশ সহসা কেহ মানিতে রাজি হইবে না" ; কারণগুলি লেখক তাঁহার প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করিয়া দেখান। বাঙালী যে সর্বদা ঘুষার উত্তর ঘুসির দ্বারা দিতে পারে না তাহার কারণ শিশুকাল হইতে সে সে-ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় না ; পাঁচজনের সহিত সদ্‌ভাবে বাস করিবার শিক্ষার জন্য সে অনেকখানি সহ্য করিতেও শেখে। এই নৈতিক শিক্ষা ছাড়াও অন্য কারণ আছে। বাঙালী যেখানে মারে, সে সেখানে একা। কিন্তু ইংরেজ— সে যেমন ধরণের লোকই হউক— তাহার পিছনে রহিয়াছে রাজশক্তি। তার পর বাঙালীর ছেলের দায় অনেক ; সে একান্নবর্তী পরিবারের অন্তর্গত ; তাহার উপর অনেকের নির্ভর। সেইসকল

১ রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি, বঙ্গদর্শন ১৩০৯ কার্তিক, পৃ ৩৯৭-৯৯। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ. ৫৯৭।

২ রাজকুটুম্ব, বঙ্গদর্শন ১৩১০ বৈশাখ, পৃ ৩-৫। রাজা-প্রজা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ৫৯৯।

৩ ঘুষাঘুষি, বঙ্গদর্শন ১৩১০ ভাদ্র, পৃ ২৪৮-২৫৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ৬০৫।

৪ ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত, বঙ্গদর্শন ১৩১০ আশ্বিন, পৃ ২৫৫-৬০। স্বদেশ, গদ্যগ্রন্থাবলী ১২। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১১, পৃ ৪৮৯-৪৪৯।

সম্বন্ধ তাহাকে ত্যাগপরতা সংযম মঙ্গলনিষ্ঠা প্রভৃতি কর্মে শিক্ষা দিয়াছে। বাঙালীর ছেলেকে কেহ ভীরুতার অপবাদ দিবে ইহা রবীন্দ্রনাথের অসহ্য। 'ঘুযাঘুষি' ও 'ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বহু দৃষ্টান্ত দিয়া পাশ্চাত্য জাতি-সমূহের, বিশেষভাবে ইংরেজের, ধর্মবোধের কথা ব্যাখ্যা করিলেন। দেশীয় লোককে খুন করার অপরাধে মার্টিন নামে কোনো সাহেবের তিন বৎসরের জেল হওয়ায় সাময়িক 'ইলিংশম্যান' পত্রিকা কিরূপ আতঙ্কের আর্তনাদ উঠাইয়াছিলেন, হেন্‌রী স্যাভেজ লণ্ডর সাহেব তিব্বতদেশে গিয়া কিরূপভাবে 'ভীরু'দের শাস্তি দিয়াছিলেন, স্পেন্সার য়ুরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে কী বিবেচনা করেন, বিলাতের 'গ্লোব' ও নিউ ইয়র্কের 'পোস্ট' কাগজ ভারতীয়দের ও নিগ্রোদের সম্বন্ধে কি সংবাদ দিয়াছে ইত্যাদি আলোচনা করিলেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিলেন, "একটা অবস্থা আছে যখন ফলাফল বিচার করা অসংগত এবং অন্যায়। ইংরাজ যখন অন্যায় করিয়া আমাকে অপমান করে, তখন যতটুকু আমার সামর্থ্য আছে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করিয়া জেলে যাওয়া এবং মরাও উচিত। ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, হয়তো ঘুষায় পারিব না এবং হয়তো বিচারশালাতেও দোষী সাব্যস্ত হইব; তথাপি অন্যায় দমন করিবার জন্য প্রত্যেক মানুষের যে স্বর্গীয় অধিকার আছে যথাসময়ে তাহা যদি না খাটাইতে পারি, তবে মনুষ্যত্বের নিকট হেয় এবং ধর্মের নিকট পতিত হইব। নিজের দুঃখ এবং ক্ষতি আমরা গণ্য না করিতে পারি, কিন্তু যাহা অন্যায় তাহা সমস্ত জাতির প্রতি এবং সমস্ত মানুষের প্রতি অন্যায়, এবং বিধাতার ন্যায়দণ্ডের ভার আমাদের প্রত্যেকের উপরেই আছে।··· ন্যায়নীতির সীমার মধ্যে কঠিনভাবে নিজেকে সংবরণ করিয়া দুষ্টশাসনের কর্তব্য আমাদিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ইহার অপর দিকটা দেখাইয়া বলিলেন, "শারীরিক কষ্ট ক্ষতি বা অকৃতকার্যতা ভয়ের বিষয় নহে— ভয়ের বিষয় এই যে, ধর্মকে বিস্মৃত হইয়া প্রবৃত্তির হাতে পাছে আত্মসমর্পণ করি, পরকে দণ্ড দিতে গিয়া পাছে আপনাকে কলুষিত করি, বিচারক হইতে গিয়া পাছে গুণ্ডা হইয়া উঠি।"

বঙ্গদর্শনে সাহিত্য-সমালোচনা

প্রাচীন ভারতের হিন্দুত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ যেমন ভাষণদানে ও প্রবন্ধরচনায় নিরত ও আধুনিক ভারতে রাজনৈতিক আত্মশক্তি প্রবুদ্ধ করিবার জন্যও তাঁহার লেখনী যেমন বিরামহীন তেমনি যুগপৎ চলিতেছে ভারতের সংস্কৃতির আলোচনা, সংস্কৃত সাহিত্যের নিহিত আদর্শবাদ ও সৌন্দর্যতত্ত্ব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সমাজে সাহিত্যবোধের নূতন মান প্রতিষ্ঠিত করিবারও চেষ্টা। এই প্রবন্ধগুলি কিসের অভিঘাতে রচিত হইয়াছিল তাহা আমরা পূর্ব খণ্ডে আলোচনা করিয়াছি। মোট কথা বিচিত্র গদ্য লিখিতেছেন, তাহার ফাঁকে ফাঁকে চলিতেছে কাব্যগ্রন্থ-সম্পাদন, 'উৎসর্গে'র কবিতা ও নৌকাডুবি উপন্যাস রচনা।

বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্যের সেরা দুই গ্রন্থ 'কুমারসম্ভব' ও 'শকুন্তলা'র এক সমালোচনা লিখিয়াছিলেন (১৩০৮ পৌষ)। তৎপূর্বে রচিত 'মেঘদূত' ও 'কাব্যে উপেক্ষিতা'র (১৩০৭) আলোচনার মূলে ছিল সৌন্দর্যতত্ত্ববিচার; কিন্তু 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা'র[১] সমালোচনার মধ্যে লেখকের মানসিক পরিবর্তন বেশ সুস্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে বহুকাল হইতেই বিশুদ্ধ আর্ট হিসাবে দেখিয়া আসিতেছেন— যে-আর্টের কোনো অভিপ্রায় নাই,

১ বঙ্গদর্শন ১৩০৮ পৌষ, পৃ ৪২৩-৪৩৪। প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৫, পৃ ৫১০।

কোনো ফল নাই, অর্থাৎ যাহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ফলকামনাহীন নৈর্ব্যক্তিক সৌন্দর্য সৃষ্টি। কিন্তু সে মতই যে চরম সত্য তাহা এখন স্বীকার করিতে পারিতেছেন না; Æsthetics ছাপাইয়া এখন Ethics সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে। 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা'র আলোচনা অন্তে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিলেন তাহা এই মতের সমর্থন। "উভয় কাব্যেই কবি [কালিদাস] দেখাইয়াছেন, মোহে যাহা অকৃতার্থ মঙ্গলে তাহা পরিসমাপ্ত; দেখাইয়াছেন, ধর্ম যে সৌন্দর্যকে ধারণ করিয়া রাখে তাহাই ধ্রুব এবং প্রেমের শান্তসংযত কল্যাণরূপই শ্রেষ্ঠ রূপ; বন্ধনেই যথার্থ শ্রী এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় সৌন্দর্যের আশু বিকৃতি। ভারতবর্ষের পুরাতন কবি প্রেমকেই প্রেমের চরম গৌরব বলিয়া স্বীকার করেন নাই, মঙ্গলকেই প্রেমের পরম লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে নরনারীর প্রেম সুন্দর নহে, স্থায়ী নহে, "যদি তাহা বন্ধ্যা হয়, যদি তাহা আপনার মধ্যেই সংকীর্ণ হইয়া থাকে, কল্যাণকে জন্মদান না করে এবং সংসারে পুত্রকন্যা, অতিথিপ্রতিবেশীর মধ্যে বিচিত্রসৌভাগ্যরূপে ব্যাপ্ত হইয়া না যায়।" প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি, এই সময়ে বঙ্গদর্শনে চলিতেছে 'চোখের বালি', বিশুদ্ধ আর্টের সৃষ্টি হইতেও কবি নীতিকে শেষপর্যন্ত আঘাত করিতে পারেন নাই। মজ্জাগত শালীনতাবোধ হইতে তিনি তাহা করিতে অপারক।

রবীন্দ্রনাথের এই মত তাঁহার হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন প্রয়াসের সমকালীন; অর্থাৎ ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির মূলে যেমন আছে সমাজের কল্যাণ কামনা, ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্যের মূলে তেমনি রহিয়াছে ধর্মনীতি-প্রতিষ্ঠার সংকল্প। রবীন্দ্রনাথ ধর্মকে ব্যাখ্যা করিতেছেন কল্যাণরূপে, সাহিত্যকে দেখাইতেছেন নীতির দিক হইতে।

কিন্তু বঙ্গদর্শন মারফত হিন্দুত্ব বা হিন্দুর একনিষ্ঠত্বের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করা সাহিত্যিক ও কবি রবীন্দ্রনাথের একমাত্র কাজ নহে। তাই দেখি 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা'র তাত্ত্বিক সমালোচনা করিয়া কবির রসবিদগ্ধ চিত্ত তৃপ্ত হইল না, তিনি 'শকুন্তলা'র একটি দীর্ঘ সমালোচনা লিখিলেন।[১] এই সমালোচনা যথার্থ সাহিত্য-সমালোচনা। তবে এই রচনাটি লিখিবার সময় কবির সম্মুখে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ' অন্তর্গত 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা'[২] প্রবন্ধটি ছিল বলিয়া মনে হয়। বঙ্কিম শকুন্তলার চরিত্রের সহিত মিরন্দার (বা অভিজ্ঞান শকুন্তলার সহিত টেম্পেস্‌টের) যে তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছিলেন তাহারই অসংগতি এই সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ বিস্তৃতভাবে দেখাইলেন। তিনি বলিলেন, "এই দুই কাব্যকে পাশাপাশি রাখিলে উভয়ের ঐক্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই বেশি ফুটিয়া উঠে।" আর বঙ্কিম লিখিয়াছিলেন যে, কালিদাস ও শেকসপীয়র "পরামর্শ করিয়া শকুন্তলা ও মিরন্দা-চরিত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, অথচ একজনে দুইটি চিত্র প্রণীত করিলে যেরূপ হইত, ঠিক সেইরূপ হইয়াছে।"[৩] দুই সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য যে কত গভীর তাহা উভয় প্রবন্ধ পাঠ না করা পর্যন্ত বুঝা যাইবে না, আর রবীন্দ্রনাথের যথার্থ সাহিত্যবিদগ্ধ চিত্তের পরিচয়ও রহিয়া যাইবে অসম্পূর্ণ।

প্রাচীন যুগের কবি নাট্যকারদের রচনা সম্পর্কে সমালোচনা অনেকটা নির্ভয়ে করা যায়, কারণ তাঁহাদের রচনার সহিত তাঁহাদের ব্যক্তিজীবন জড়িত আছে কিনা তাহা সাধারণত সুস্পষ্ট নহে। সুতরাং সমালোচনাটা হয় রচনার, রচয়িতার নহে। আধুনিক যুগে সে ভয়টা আছে। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগের লেখকদের সমালোচনা কখনো করেন নাই, করিয়াছেন রচনার; যে-রচনার মধ্যে প্রশংসার কিছু-না-কিছু আছে তাহারই সমালোচনা করিয়াছেন, যেসব রচনার মধ্যে প্রশংসার কিছু পাইতেন না, কদাচিৎ তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মন্দ্র'

১ বঙ্গদর্শন ১৩০৯ আশ্বিন, পৃ ২৭৫-২৯০। প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৫, পৃ ৫২১।

২ প্রথম প্রকাশ বঙ্গদর্শন ১২৮২ বৈশাখ।

৩ বঙ্কিমচন্দ্র, বিবিধ প্রবন্ধ, পৃ ৮২; শতবার্ষিকী সংস্করণ।

তাঁহার ভালো লাগিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় বঙ্গদর্শনে একটি মনোজ্ঞ সমালোচনা লিখিলেন (১৩০৯ কার্তিক)[১]।

পরের ছিদ্রান্বেষী সমালোচনা রবীন্দ্রনাথ না করিলেও তাঁহার সমালোচকের অভাব কোনোদিনই হয় নাই। কবির সমালোচকগণ রচনার বিচার হইতে রচয়িতার সমালোচনা করিতে বেশি উৎসাহী। কবিকে নিন্দিত ভর্ৎসিত তিরস্কৃত উপহসিত করা ছিল অনেকের অহেতুক আনন্দ। এই সময়ে এই বিরূপ সমালোচক-শ্রেণীর পুরোভাগে ছিলেন 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় সাময়িক পত্রিকাসমূহের এই প্রকার মনোভাবের বিশ্লেষণ করিয়া 'পরনিন্দা'[২] নামে প্রবন্ধটি লিখিলেন। নির্দয় সমালোচনার ব্যথাটা কবি বিদ্রূপের হাস্যরস দিয়া লঘু করিয়াছেন ; দার্শনিকভাবে জীবনটাকে দেখিবার চেষ্টা করিতেছেন ; "সাধারণত মানুষ নিন্দা করিয়া যে সুখ পায় তাহা বিদ্বেষের সুখ নহে। বিদ্বেষ কখনোই সাধারণভাবে সুখকর হইতে পারে না এবং বিদ্বেষ সমস্ত সমাজের স্তরে স্তরে পরিব্যাপ্ত হইলে সে বিষ হজম করা সমাজের অসাধ্য।" কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও কবি জানেন যে লোকে বিদ্বেষমূলক নিন্দাই করে। তাহাদের সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য—"এরূপ নিন্দা যাহার স্বভাবসিদ্ধ সেই দুর্ভাগাকে যেন দয়া করিতে পারি।"

ভারতের সংস্কৃতিকে আজ যেমন বর্ণাশ্রমধর্মের পটভূমিতে দেখিতেছেন ও উহার প্রাচীন সাহিত্যকে নীতি ও রুচির পরিপ্রেক্ষণাতে বিচার করিতেছেন, তেমনি দেশীয় নাট্যকলাকেও কবি আজ সম্পূর্ণ ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিবার জন্য উৎসুক। রবীন্দ্রনাথ আজ ভারতের তথা বাংলার সমস্তকেই জাতীয় আদর্শবাদের দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। সেই অতিদেশীয়তার দৃষ্টিকোণ হইতে দেশীয় রঙ্গমঞ্চকে বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন, নতুবা 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে[৩] বাংলার যাত্রাকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করিতেন না।

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংগীত সমাজের সহিত ১২৯৮ হইতে ১৩০৮ সাল পর্যন্ত বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই যুক্ত ছিলেন ; শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপনের পর হইতে কলিকাতার সহিত তাঁহার বন্ধন শিথিল হইয়া আসে এবং সেই সঙ্গেই সংগীত সমাজের সহিত তাঁহার যোগও হ্রাস পাইতে থাকে। ইহা ছাড়া উক্ত সমাজে নূতন-ধনী সদস্যদের আবির্ভাবে প্রতিষ্ঠানের আদর্শ পরিবর্তিত হইতে লাগিল ; তথাকার নাট্যমঞ্চ কলিকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ের অনুকরণের দিকে চলিল। রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ— আমাদের দেশীয় নাট্যশালায় বিলাতি থিয়েটারের প্রভাব প্রবেশ করিতেছে। কিন্তু কবি বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, বাংলাদেশের নাট্যাভিনয়ের উৎপত্তি কলিকাতায় ইংরেজ সমাজের অভিনীত নাটকের অনুকরণে ; প্রাচীন সংস্কৃত নাটকাভিনয়ের পরম্পরাগত রীতি এ দেশ হইতে বহু শতাব্দী লুপ্ত ছিল, বিলাতি থিয়েটার ছাড়া আর কোনো আদর্শ বাঙালির সম্মুখে অনুকরণের যোগ্য ছিল না। কবির অভিযোগ যে, আধুনিক রঙ্গমঞ্চে দর্শকদের কল্পনাশক্তির প্রতি একটা সাধারণ অবজ্ঞা দেখা দিয়াছে ; নাটকীয় ঘটনা বাক্যের দ্বারা, সুরের দ্বারা প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া, আধুনিকরা সিন্‌ বা চিত্রের সাহায্যে ঘটনা সমাবেশ করিয়া থাকেন। চিত্রের সাহায্যে বাস্তবকে সত্য করিয়া তুলিবার চেষ্টা অত্যন্ত শিশুমনের পরিচায়ক। আধুনিক থিয়েটারের এই প্রচেষ্টা নিন্দনীয়। কবি দেশীয় যাত্রার প্রশংসায় বলিয়াছেন যে, 'যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতা' 'পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন' করে। বিলাতের নকলে যেসব থিয়েটার গঠিত হইয়াছে, 'তাহাতে কবি ও গুণীর প্রতিভার চেয়ে ধনীর মূলধন ঢের বেশি থাকা চাই'। "বাগানকে যে অবিকল বাগান আঁকিয়াই খাড়া করিতে হইবে এবং স্ত্রীচরিত্র অকৃত্রিম স্ত্রীলোককে দিয়াই অভিনয় করাইতে হইবে, এইরূপ অত্যন্ত স্থূল বিলাতি

১ আধুনিক সাহিত্য, গদ্যগ্রন্থাবলী ৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯।

২ পরনিন্দা, বঙ্গদর্শন ১৩০৯ অগ্রহায়ণ। দ্র. বিচিত্র প্রবন্ধ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৫, পৃ ৪৬৯-৪৭২।

৩ রঙ্গমঞ্চ, বঙ্গদর্শন ১৩০৯ পৌষ। দ্র. বিচিত্র প্রবন্ধ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৫, পৃ ৪৫৯-৪৫৩।

বর্বরতা পরিহার করিবার সময় আসিয়াছে।" শেষজীবনে কবির এই মতের সহিত তাঁহার কাজের আংশিক বৈপরীত্য লক্ষিত হয়। কারণ তাঁহার নিজ তত্ত্বাবধানে যেসকল নাটকাদি সর্বসাধারণের জন্য অভিনীত হইত, তাহাতে স্ত্রীচরিত্রে মেয়েরাই নামিত, অধুনা নারীর ভূমিকায় পুরুষকে তিনি কখনো নামান নাই। যদিও শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের গোড়ার দিকে ছেলেরাই মেয়ের ভূমিকা গ্রহণ করিত— এমন-কি অধ্যাপকরাও। অবশ্য তখন যাহা হইত, তাহা নিছক আনন্দের জন্য।

সাহিত্যে ও কলায় যে স্বাভাবিকতা, যে সরলতা, যে অনাড়ম্বরতার সন্ধানে কবিচিত্ত ব্যগ্র, ধর্মক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক সাধনায় তাহারই অনুসন্ধানে রত। কবির মধ্যে যে সাধকটি আছে, সে ধর্মকে সরল আদর্শে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়; জটিলতা যেমন সভ্যতার দ্যোতক নহে, ঈশ্বরকে পাইবার পথও তেমনি জটিল নহে। তিনি বলিলেন, "যে সভ্যতার সমস্ত গতিপদ্ধতি দুরূহ ও বিমিশ্রিত, যাহার কলকারখানা আয়োজন-উপকরণ বহুলবিস্তৃত, তাহা আমাদের দুর্বল অন্তঃকরণকে বিহ্বল করিয়া দেয়। কিন্তু যে দার্শনিক দর্শনকে সহজ করিয়া দেখাইতে পারেন, তিনিই যথার্থ ক্ষমতাশালী, ধীশক্তিমান; যে সভ্যতা আপনার সমস্ত ব্যবস্থাকে সরলতার দ্বারা সুশৃঙ্খল ও সর্বত্র সুগম করিয়া আনিতে পারে, সেই সভ্যতাই যথার্থ উন্নততর। বাইরে দেখিতে যেমনই হউক, জটিলতাই দুর্বলতা, তাহা অকৃতার্থতা— পূর্ণতাই সরলতা। ধর্ম সেই পরিপূর্ণতার, সুতরাং সরলতার, একমাত্র চরমতম আদর্শ।" এই ভাষণের শেষে তিনি প্রার্থনায় বলিলেন, "হে ভারতবর্ষের চিরারাধ্যতম অন্তর্যামী বিধাতৃপুরুষ, তুমি আমাদের ভারতবর্ষকে সফল করো। ভারতবর্ষের সফলতার পথ একান্ত সরল একনিষ্ঠতার পথ। তোমার মধ্যেই তাহার ধর্ম কর্ম, তাহার চিত্ত পরম ঐক্যলাভ করিয়া জগতের সমাজের জীবনের সমস্ত জটিলতার নির্মল সহজ মীমাংসা করিয়াছিল। যাহা স্বার্থের, বিরোধের, সংশয়ের নানা শাখাপ্রশাখার মধ্যে আমাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়, যাহা বিবিধের আকর্ষণে আমাদের প্রবৃত্তিকে নানা অভিমুখে বিক্ষিপ্ত করে, যাহা উপকরণের নানা জঞ্জালের মধ্যে আমাদের চেষ্টাকে নানা আকারে ভ্রাম্যমাণ করিতে থাকে, তাহা ভারতবর্ষের পন্থা নহে। ভারতবর্ষের পথ একের পথ, তাহা বাধাবিবর্জিত তোমারই পথ— আমাদের বৃদ্ধ পিতামহের পদাঙ্কচিহ্নিত সেই প্রাচীন প্রশস্ত পুরাতন সরল রাজপথ যদি পরিত্যাগ না করি, তবে কোনোমতেই আমরা ব্যর্থ হইব না।"[১]

ধর্মের সাধনায় যে সহজ সরল আদর্শকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যাকুল, সাংসারিক জীবনে যে সহজ সরল সৌন্দর্যকে ফুটাইবার জন্য তাঁহার আকাঙ্ক্ষা— বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে তাহাকেই অন্তরতম অনুভূতিরূপে পাইবার জন্য চিত্ত তাঁহার তেমনি উদ্‌গ্রীব। তিনি শান্তিনিকেতন বাসকালে 'বসন্তযাপন' প্রবন্ধে বলিতেছেন, "আমি তো আজ গাছপালার সঙ্গে বহু প্রাচীনকালের আত্মীয়তা স্বীকার করিব। ব্যস্ত হইয়া কাজ করিয়া বেড়ানোই যে জীবনের অদ্বিতীয় সার্থকতা এ কথা আজ আমি কিছুতেই মানিব না।··· আজ তরুলতার সঙ্গে নিতান্ত ঘরের লোকের মতো মিশিতে হইবে— আজ ছায়ায় পড়িয়া সমস্ত দিন কাটিবে, মাটিকে আজ দুই হাত ছড়াইয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবে, বসন্তের হাওয়া যখন বহিবে তখন তাহার আনন্দকে যেন আমার বুকের পাঁজরগুলার মধ্য দিয়া অনায়াসে হু হু করিয়া বহিয়া যাইতে দিই— সেখানে সে যেন এমনতরো কোনো ধ্বনি না জাগাইয়া তোলে, গাছপালারা যে ভাষা না বোঝে। এমনি করিয়া চৈত্রের শেষ পর্যন্ত মাটি বাতাস ও আকাশের মধ্যে জীবনটাকে কাঁচা করিয়া, সবুজ করিয়া, ছড়াইয়া দিব— আলোতে ছায়াতে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিব।"[২]

১ ধর্মের সরল আদর্শ, বঙ্গদর্শন ১৩০৯ মাঘ, পৃ. ৫৩৭। দ্র ধর্ম, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ. ৩৫৩-৩৬৩।

২ বসন্তযাপন, বঙ্গদর্শন ১৩০৯ চৈত্র, পৃ. ৬৩৪। প্রবন্ধটি লিখিত আনুমানিক ১৫।১৬ ফাল্গুন ১৩০৯, শান্তিনিকেতন। দ্র. বিচিত্র প্রবন্ধ প্রথম সংস্করণ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৫, পৃ. ৪৭২-৪৭৬।

বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় পর্বের প্রথম দুই বৎসর রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য রাজনীতি ধর্মনীতি লইয়া ব্যস্ত ছিলেন ; দুইখানি উপন্যাস এযুগে মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়— 'নষ্টনীড়' হয় ভারতীতে ১৩০৮ বৈশাখ হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত, এবং 'চোখের বালি' হয় বঙ্গদর্শনে ১৩০৮ বৈশাখ হইতে ১৩০৯ কার্তিক পর্যন্ত। চোখের বালি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল ১৩০৯ সালের ফাল্গুন কি চৈত্র মাসে ; নষ্টনীড় মুদ্রিত হইল *'রবীন্দ্রগ্রন্থাবলী', হিতবাদীর উপহার সংস্করণে* ১৩১১ সালের গোড়ার দিকে। যাহাই হউক, কি নষ্টনীড় কি চোখের বালি কোনোটিই নৌকাডুবি গোরা প্রভৃতির ন্যায় মাসে মাসে লিখিত হয় নাই ; এগুলি প্রায় সম্পূর্ণভাবে লিখিত হইবার পর মাসিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য কিস্তিতে কিস্তিতে দিতে থাকেন। তৃতীয় বর্ষের (১৩১০) বৈশাখ সংখ্যা হইতে নৌকাডুবি উপন্যাস ধারাবাহিক আরম্ভ হইল। মাঝে পাঁচ মাসের মধ্যে বঙ্গদর্শনে তিনটি ছোটোগল্প প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ গত দেড় বৎসরের মধ্যে তিন-চারটি গল্প ছাড়া তিনি কাহিনীমূলক কোনো রচনায় হাত দেন নাই ; নষ্টনীড় ও চোখের বালি তো ১৩০৮এর গোড়াতেই সম্পূর্ণভাবে লিখিত হইয়াছিল।

চোখের বালি ও নৌকাডুবির মধ্যের সময়ে কবি লেখেন গল্প 'সৎপাত্র' 'মাল্যদান' 'দর্পহরণ' ; 'কর্মফল'ও বোধ হয় এই সঙ্গেই লেখা।[১] এই গল্পগুলির মধ্যে 'সৎপাত্র' গল্পটি (১৩০৯ পৌষ) কেন-যে কবির গল্পগুচ্ছ হইতে বাদ পড়িয়াছিল তাহার কারণ এখন স্পষ্ট ; এ গল্পটি কবি স্বয়ং তাঁহার রচনা বলিয়া দাবি না করায় উহা গল্পগুচ্ছ হইতে বাদ পড়ে। তিনি বলিয়াছিলেন যে গল্পটি তাঁহার জ্যেষ্ঠাকন্যা বেলার রচনা।[২]

সাহিত্যযশপ্রার্থী স্বামিস্ত্রীর মধ্যে প্রতিযোগিতার সরল কাহিনী হইতেছে 'দর্পহরণ' (১৩০৯ ফাল্গুন) গল্পের বিষয়বস্তু। গল্পের নায়ক হরিশচন্দ্র হালদার।[৩] এই নামটি কবির বাল্যস্মৃতি হইতে গৃহীত। 'মাল্যদান' (১৩০৯ চৈত্র) একটি সাধারণ প্রেমকাহিনী। "এক কিশোরী বালিকার অপরিণত মন যে কেমন করিয়া প্রেমের মৃদুস্নিগ্ধ বর্ণচ্ছটায় বিকশিত হইয়াই চিরতিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া গেল তাহাই এই গল্পটিতে অনাড়ম্বরভাবে বিবৃত হইয়াছে।"[৪]

'কর্মফল' গল্পকেও আমরা ইহারই অন্তর্গত করিতে চাই ; কারণ এই গল্প-তথা-নাটকটিও এই যুগের অন্যান্য ছোটোগল্পের ন্যায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে রচিত— অর্থাৎ কবির সাধনা-ভারতী যুগের ছোটোগল্পের মধ্যে যে মুন্সিয়ানা দেখা যায় এগুলিতে তার অত্যন্ত অভাব। এই গল্পগুলিকে আমরা ১৩০৭ সালে লিখিত ও ভারতী এবং প্রদীপে প্রকাশিত গল্প কয়টির সঙ্গে একগুচ্ছে দেখিব। গল্পগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং মনে হয় যেন অনবসরের মধ্যে লিখিত ; গল্প হিসাবে এগুলিকে আরো সজ্জিত করা যাইতে পারিত, কারণ আখ্যানাংশের মধ্যে তাহার অবসর অনেকখানি ছিল।

১ পত্রাবলী। ২৩ শ্রাবণ ১৩১০। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ ফাল্গুন, পৃ. ৫৩১। "আমার কর্মফল গল্পটা কুন্তলীনরা ছাপাচ্ছে কি না জানেন? তারা দেখচি শৈলেশকেও হারিয়ে দেবে।" ইহা প্রকাশিত হয় ১৩১০ সালের পৌষ মাসে।

২ অধ্যাপক সুকুমার সেন এই গল্পটির লেখক রবীন্দ্রনাথ ধরিয়া লইয়া সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন ; তিনি বলিতেছেন, "বাড়ির বাহিরে মৃদুবাক ভালোমানুষ, বাড়ীর ভিতরে নিষ্ঠুরভাষী অত্যাচারী সন্দিগ্ধচিত্ত পল্লীবাসী চাষী গৃহস্থ সাধুচরণের প্রথম দুই পত্নী সন্দেহজনকভাবে অকালে দেহত্যাগ করে। তৃতীয় পত্নী কিশোরী বিমলাও কিভাবে সপত্নীদ্বয়কে অনুসরণ করিয়াছিল তাহাই এই গল্পের বিষয়। বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন শোভনভাবে আবৃত ও সংযত অথচ ব্যঙ্গবিদগ্ধ নিষ্ঠুর বাস্তব কাহিনী আর নাই।…রবীন্দ্রনাথের কোনো গল্প-উপন্যাসে সত্যকার villain বা পাষণ্ড ভূমিকা নাই, কেবল এই গল্প ছাড়া। সাধুচরণ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট একমাত্র পাষণ্ড চরিত্র ; কিন্তু সে স্বাভাবিক এবং লজিক্যাল।… গল্পটির বর্ণনাভঙ্গি দ্রুতগতি এবং crisp বা কাটছাঁটা। এ বিষয়েও গল্পটির বিশেষত্ব স্বীকার্য।" শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ এসম্বন্ধে শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে যে পত্র দেন তাহা বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৫ বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। দ্র. প্রমথনাথ বিশীর রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প-এর শ্রীপুলিনবিহারী সেন-কৃত সংযোজন, পৃ. ৩১।

৩ শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৫-৬।

৪ দ্র. রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড ২য় সং, পৃ ৩৪।

আমাদের মনে হয় সাংসারিক নানা দুর্ঘটনার মধ্যে মন যখন সৃষ্টি বিষয়ে আনন্দ পাইতেছে না, অথচ সম্পাদকের কর্তব্য হিসাবে পাঠকদের চিত্তবিনোদনের জন্য গল্পজাতীয় কিছু দিতেই হইবে এই গল্পগুলি সেই ভাব হইতে লিখিত।

হাজারিবাগে

কবিপ্রিয়ার মৃত্যুর পক্ষকালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পুত্রকন্যাদের লইয়া শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন (২২ অগ্রহায়ণ ১৩০৯)। 'নূতন বাড়ি' তৈয়ারি হইয়াছিল, ছেলেমেয়েরা সেখানে গিয়া উঠিল— সঙ্গে আছেন অভিভাবিকা দূর-সম্পর্কীয়া রাজলক্ষ্মী দেবী।

বিদ্যালয়ে আছেন তখন জগদানন্দ রায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, কুঞ্জবিহারী ঘোষ প্রভৃতি শিক্ষক; মধ্যম জামাতা সত্যেন্দ্রনাথের উপর বিদ্যালয়ের পরিচালনা-ভার। পূজার বন্ধের পর আসিয়াছিলেন সতীশচন্দ্র রায় নামে এক তরুণ শিক্ষক। মনোরঞ্জনবাবু রথীন্দ্রনাথের 'টেস্ট' পরীক্ষা হইয়া যাইবার অল্পকাল পরেই বিদ্যালয় হইতে চলিয়া যান; ১৩০৯-এর শীতের ছুটির পর তিনি আর আসিলেন না। শরীরের অজুহাতে[১] যান বটে, কিন্তু পরে তিনি পত্রদ্বারা যে কারণ দেন তাহা অন্যরূপ। তিনি লেখেন, কবির অন্যায় ও দুর্বলতা তাঁহার কর্ম-পরিত্যাগের প্রত্যক্ষ কারণ। রবীন্দ্রনাথ তাহার উত্তরে লেখেন—"একটি বৃহৎ কাজের ভার লইলেই নিজের দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন হইবার অবকাশ পাওয়া যায়। আমিও আমার স্বভাবের অসম্পূর্ণতা নানারূপেই অনুভব করি।... আপনি লিখিয়াছেন আমারই অন্যায় ও দুর্বলতা আপনার কর্ম-পরিত্যাগের কারণ। কিন্তু আমার চেয়ে আমার কাজকে যদি আপনি বড়ো করিয়া দেখিতেন তবে কোনো সংকটেই আপনি আমাকে ত্যাগ না করিয়া সত্য এবং কল্যাণের জয় প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। আমিও আমার নিজের বা আর কাহারো কোনো ত্রুটি দেখিয়া আমার কর্ম পরিত্যাগ করি নাই।"

এবার শান্তিনিকেতনে কবি প্রায় তিন মাস বাস করিয়াছিলেন। এই পর্বে কবি বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরিক নানাবিধ সংস্কার করেন। সতীশচন্দ্রের ন্যায় ভাবুক আদর্শবাদী যুবককে পাইয়া কবির শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে আলোচনার সুবিধা হইল। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার এক বৎসরের মধ্যে অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ই রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত বোর্ডিং স্কুলকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পরিণত করেন। তিনি চলিয়া গেলে কয়েক মাস নানাপ্রকার অশান্তির মধ্যে দিন অতিবাহিত হয়। এতদিন পরে কবির মনে হইল যেন সতীশচন্দ্রই তাঁহার শিক্ষাদর্শের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিল। ব্রহ্মচর্যের নৈষ্ঠিকতার সহিত সাহিত্যের একটি সরস ধারা যুক্ত হইল সতীশচন্দ্রের সহায়তায়। এই সময় হইতে বিদ্যালয় নূতন আদর্শের সন্ধান পাইল।

সতীশচন্দ্র সম্বন্ধে অজিতকুমার ঠিকই বলিয়াছেন যে, তিনি ছিলেন "আশ্রমের আদর্শের একটি জীবন্ত প্রতিমূর্তি"। কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের নিকট যে তরুণ সাহিত্যিকরা আসিত, তাহাদের মধ্যে ছিল অজিতকুমার চক্রবর্তী ও সতীশচন্দ্র রায়— উভয়েই বি. এ. ক্লাসের ছাত্র, সাহিত্যে উভয়েরই অসামান্য প্রতিভা। বোলপুর বিদ্যালয়ের কথা শুনিয়া সতীশচন্দ্র চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর আগত পরীক্ষা না দিয়া সর্বত্যাগীরূপে বিদ্যালয়ের কর্মের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। সংসারের দায় তাঁহার ছিল, কারণ কিশোরবয়সেই সমাজের তৎকালীন প্রথানুসারে তাঁহাকে বিবাহ করিতে হইয়াছিল। সুতরাং 'ভাবী সাংসারিক উন্নতির সমস্ত আশা ও উপায় এইরূপে বিসর্জন করাতে সতীশ তাহার আত্মীয়-বন্ধুদের কাছ

১ স্মৃতিপত্র, ১৩ ফাল্গুন ১৩০৯ [২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯০৩], পৃ. ২৫

হইতে কিরূপ বাধা পাইয়াছিল', তাহা কল্পনা করা যাইতে পারে। সতীশচন্দ্র ১৩০৯ সালে শীতের ছুটির পর বিদ্যালয়ে যোগদান করেন, বোধ হয় মনোরঞ্জনবাবুর আশ্রমত্যাগের পরেই।

সতীশচন্দ্র শান্তিনিকেতনে আসাতে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও ভাব -জীবনের পক্ষে তিনি যেমন একান্ত সহায় স্বরূপ হইলেন, মোহিতচন্দ্র সেনের সহিত পরিচয় ও বন্ধুত্ব তেমনি তাঁহার জীবনকে এই সময়ে নানাভাবে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিল। কবি তাঁহার 'কাব্যগ্রন্থ' নূতনভাবে সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলে মোহিতচন্দ্র সেনের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা প্রগাঢ় হইতে থাকে।

মোহিতচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র; ১৮৮৯ সালে দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. পাস করিয়া কলিকাতায় অধ্যাপনায় ও জ্ঞানানুশীলনে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি নববিধান ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা লইয়া কলিকাতায় নানা লোকের সহিত আলাপ-আলোচনায় নিরত, সেই সময়ে মোহিতচন্দ্রের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়।[১] পরিচয়ের অল্পকাল পরেই মোহিতচন্দ্র তাঁহার সদ্যপ্রকাশিত *Elements of Moral Philosophy* বা চারিত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থের একখণ্ড কবিকে উপহার পাঠান। এই গ্রন্থখানি পাইয়া কবি তাঁহাকে যে উত্তর দেন, তাহাতে তাঁহার দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে অদ্ভুত মতবাদ ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি লিখিতেছেন, "আমি দার্শনিক বই প্রায় পড়ি নাই— ভয় হয় পাছে যাহাকে সহজ বলিয়া জানি তাহার কঠিন স্বরূপ দেখিয়া আতঙ্ক জন্মে। সমস্ত প্রকৃতি দিয়া যাহাকে অনুভব করা যায় তাহাকে কেবল মাথা দিয়া দেখিতে গেলে অনেকটা অংশ হাঁ হাঁ করে— তাহার সকল স্থানে সমান আলোকপাত হয় না— ধর্ম, ধর্মনীতির মূলে যে বিশ্বব্যাপী স্বয়ম্ভু আনন্দ আছে তাহাকে প্রমাণের মধ্যে কেমন করিয়া আনা যায় এবং তাহাকে বাদ দিয়া ধর্মকে দেখিতে গেলে সহস্র বিরোধের মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে হয়।…ফিলজফির সিস্টেমগুলি দেখিলে আমার ভয় হয়। এই আতঙ্ক আমার প্রকৃতিগত— মূলজ্ঞানকে মাতৃস্তন্যের মত শোষণ করিয়া লইবার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা— তাহাকে চারিদিক হইতে আহরণ করিয়া রন্ধন করিয়া লইতে আমার রুচি হয় না। বোধ হয় এ সম্বন্ধে আমার আবদার অত্যন্ত বেশি বলিয়া আমি 'একেবারে পেতে চাই পরশরতন'।"[২]

রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত হইবার মুহূর্ত হইতে তাঁহার বিদ্যালয়ের প্রতি মোহিতচন্দ্রের অকৃত্রিম আকর্ষণ জন্মে; কিন্তু কবির সহিত পরিচয়ের বহু পূর্ব হইতে তিনি রবীন্দ্রসাহিত্যের একজন রসজ্ঞ। পাণ্ডিত্যের কঠিন বেষ্টনে তাঁহার মন সংকীর্ণ ছিল না, কল্পনাযোগে সর্বত্র তাঁহার সহজ প্রবেশাধিকার তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। মোহিতচন্দ্র সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে, তিনি বাংলাদেশে সর্বপ্রথম রবীন্দ্রসাহিত্য-আলোচনার পথপ্রদর্শক ও কাব্যগ্রন্থের সম্পাদক।[৩] তাহারই চেষ্টায় ব্যাপকভাবে রবীন্দ্রকাব্যের রসগ্রহণের পথ সরল ও প্রশস্ত হয়।

কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা হইলে মোহিতচন্দ্র মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে আসিতে লাগিলেন। 'কতদিন গোধূলির ধূসর আলোকে বোলপুরের শস্যহীন জনশূন্য প্রান্তরের প্রান্তবর্তী রক্তবর্ণ সুদীর্ঘ পথের উপর দিয়া' কবি ও দার্শনিক পদচারণ করিতেন। 'বন্ধুস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "আমার নূতন-স্থাপিত বিদ্যালয়ের সমস্ত দুর্বলতা— বিচ্ছিন্নতা অতিক্রম করিয়া মোহিতচন্দ্র ইহার অনতিগোচর সম্পূর্ণতাকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তখন আমার পক্ষে এমন সহায়তা আর কিছুই হইতে পারিত না।"[৩]

১ মোহিতচন্দ্র তাঁহার *Elements of Moral Philosophy* রবীন্দ্রনাথকে উপহার পাঠাইয়াছেন, কবি তাহা পাইয়া ২৮ পৌষ ১৩০৮ (১২ জানুয়ারি ১৯০২) জবাব দেন। দ্র. পত্রাবলী, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ মাঘ, পৃ. ৪৫০।

২ পত্রাবলী। শান্তিনিকেতন ২৮শে পৌষ ১৩০৮ [১২ জানুয়ারি ১৯০২]। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৮ মাঘ, পৃ ৪৫০।

৩ মোহিতচন্দ্র সেন, বঙ্গদর্শন ১৩১৩ শ্রাবণ। বন্ধুস্মৃতি, বিচিত্র প্রবন্ধ প্রথম সংস্করণ।

কিন্তু মোহিতচন্দ্রের সহায়তা কেবল মানসিক ছিল না, তিনি বিদ্যালয়কে অর্থ দিয়া ও অবশেষে নিজের যথাসাধ্য শক্তি দিয়া উহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন রবীন্দ্রনাথের দুঃসময়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর মধ্যমা কন্যার ব্যাধিও উত্তরোত্তর বৃদ্ধির দিকে চলিয়াছে। ডাক্তাররা স্বাস্থ্যকর জায়গায় বায়ুপরিবর্তনের পরামর্শ দিতেছেন। মাঘোৎসবের কয়েক দিনের মধ্যে কবি আশ্রমে ফিরিয়া আসেন। এই সময়ে মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত দুইখানি পত্রমধ্যে কবির আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের জন্য একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষার ভাব ব্যক্ত হইতে দেখি।[১]

এদিকে বিদ্যালয়ের অর্থদৈন্য তাহার উপর নিজের অর্থকৃচ্ছ্রতা— মন খুবই উদ্‌ভ্রান্ত। এই সময়ে একদিন মোহিতচন্দ্র আসিয়া কবির হস্তে অত্যন্ত গোপনে সহস্র মুদ্রার একখানি নোট দিলেন; সেটি তিনি বিদ্যালয়ের পরীক্ষক হিসাবে পারিশ্রমিক পাইয়াছিলেন। এই দান অত্যন্ত অভাবের সময় কবির হস্তগত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে মোহিতচন্দ্রকে লিখিলেন (২৬ ফাল্গুন ১৩০৯) "ধনীর দানে আমাদের বাহ্য অভাব মোচন হইত মাত্র, কিন্তু আপনার দানে আমাদের বল এবং নিষ্ঠা বাড়িয়া গেছে।···আপনি আমাকে দুঃসময়ে হঠাৎ সচেতন করিয়া অনেক দূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন।"[২] এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সহিত মোহিতচন্দ্রের মাধ্যমে তৎকালীন আর একজন মনস্বী যুবকের পরিচয় ঘটে; তাঁহার নাম বিনয়েন্দ্রনাথ সেন; ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক—*Intellectual Ideal* নামক গ্রন্থের লেখক। কবি এই গ্রন্থখানি সযত্নে পাঠ করিয়া বিনয়েন্দ্রনাথকে লিখিলেন "মাঝে মাঝে দয়া করিয়া আপনারা আমার নিকটে আসিবেন এবং আমার সঙ্গে কথা কহিবেন।" সাংসারিক আধিব্যাধির মধ্যে তাঁহার মন খুঁজিতেছে মনের খোরাক—মোহিতচন্দ্র বিনয়েন্দ্রনাথের ন্যায় মনস্বীদের নিকট হইতে।[৩] কবির স্বপ্ন, ইঁহারা তাঁহার শান্তিনিকেতনের তপোবন রচনা করিবেন। কত লোককে কত ভাবে নূতন বিদ্যালয়ে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ইহারই কয়েকদিন পরে (২৯ ফাল্গুন) রবীন্দ্রনাথ রেণুকাকে লইয়া দীর্ঘকালের জন্য শান্তিনিকেতন ত্যাগ করিলেন, মীরাকে ও শমীকে সঙ্গে লইলেন। রথীন্দ্র এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া মজঃফরপুর বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলে তিনি আশ্রমে থাকিবেন স্থির করিয়া গেলেন—সতীশচন্দ্র তাঁহার পড়াশুনা দেখিবেন। রথীন্দ্রকে কলেজে পড়াইবেন না, বাড়িতে যথাবিধি পড়াইয়া আমেরিকায় পাঠাইবেন এই তাঁহার ইচ্ছা। মীরা শমী এবং অসুস্থ রেণুকাকে লইয়া রবীন্দ্রনাথ হাজারিবাগ রওনা হইলেন, সেখানে কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগানবাড়ি পাওয়া গিয়াছে। শ্যালক নগেন্দ্রনাথ ও এক আত্মীয়া নারী সঙ্গে চলিলেন। তখনকার দিনে হাজারিবাগ যাইতে হইলে গিরিডি হইতে পুস্‌পুস্ যা মানুষে-ঠেলা পালকি গাড়িতে করিয়া যাইতে হইত। পাঠকের স্মরণ আছে আঠারো বৎসর পূর্বে (১২৯২) এই পথে রবীন্দ্রনাথ হাজারিবাগ বেড়াইতে গিয়াছিলেন; এবার মৃত্যুপথের যাত্রী মাতৃহীনা কন্যাকে লইয়া চলিয়াছেন— নিজের শরীরমনও ক্লান্ত, অন্তর-বাহির বহুভাবনায় অবসাদগ্রস্ত।

ফাল্গুনের শেষ দিকে কবি হাজারিবাগ পৌঁছিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়া কয়েক দিনের মধ্যে জ্বরে পড়িলেন।[৪] শরীর ভালো না থাকিলেও সাহিত্যসৃষ্টিতে তেমন বাধা হইতেছে না। ১১ই চৈত্র মোহিতচন্দ্রকে লিখিতেছেন যে,

১ বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ শ্রাবণ পৃ. ৩২-৩৬। পত্রাবলী ২৫শে মাঘ ১৩০৯ ও ৫ ফাল্গুন ১৩০৯। শেষ পত্রে 'জীবনদেবতা'র ব্যাখ্যা।

২ বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৪৯ মাঘ পৃ ৪৫১। পত্রাবলী ২৬ ফাল্গুন ১৩০৯ (১৯০৩ মার্চ ১০)।

৩ পত্রাবলী। বিনয়েন্দ্রনাথ সেনকে লিখিত ১২ ফাল্গুন ১৮০৮। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৮ কার্তিক-পৌষ পৃ ৫৪-৬০।

৪ পত্রাবলী। হাজারিবাগ। [২৪ মার্চ ১৯০৩। ১৩৯৯] ১১ই চৈত্র। ··বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ মাঘ, পৃ ৪৫২। পুনশ্চ—জগদীশচন্দ্র বসুর পত্রাবলী। নং ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮ ১৬ই হইতে ২৫এ মার্চ ১৯০৩ এর মধ্যে লিখিত। প্রবাসী ১৩৩৩ অগ্রহায়ণ, পৃ ১৭৮।

দুইদিনে তিনটি কবিতা লিখিয়াছেন। এই সময়ে কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত রূপক ও প্রকৃতিগাথা খণ্ডের কয়েকটি কবিতা রচিত হয় ; সেগুলি এখন 'উৎসর্গে'র অন্তর্গত।

সংসারে যাহাই ঘটুক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনার বাধা সৃষ্টি করা কঠিন। মনের অসামান্য নির্লিপ্ততা ইহার প্রধান সহায়। হাজারিবাগ বাসকালে যে কবিতাগুলি লেখেন, তাহাদের রূপ ও সুর অনতিকালপূর্বে রচিত 'স্মরণে'র কবিতাগুচ্ছ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। এখানে বেদনা রূপকে রূপ লইয়াছে, প্রকৃতি-বন্দনা সৌন্দর্য-প্রতীকে মূর্তি গ্রহণ করিয়াছে— ব্যক্তিগত বেদনার আভাস অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন। ছোটনাগপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কবিচিত্তকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করিয়াছিল ; তদুপরি পুরাতন পারিপার্শ্বিকের স্মৃতিস্পর্শ হইতে দূরে আসিয়া আজ কবির মনে কাব্যের নূতন কল্পলোকও খুলিয়া গেল। এই কবিতাগুচ্ছের মধ্যে যে মরমিয়ার উপাদান আছে, তাহা তাঁহার পুরাতন মিস্টিসিজম্ হইতে পৃথক, কবিতাগুলি পুনরায় পাঠ করিলেই পাঠকের নিকট স্পষ্টতর হইবে। হাজারিবাগে রচিত কবিতা কয়টি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়।[১]

হাজারিবাগ বাসকালে বঙ্গদর্শনের তৃতীয় বর্ষ শুরু হয়। পাঠকের স্মরণ আছে ১৩০৯ সালের কার্তিক মাসে 'চোখের বালি'র শেষ কিস্তি প্রকাশিত হয়, তার পর পাঁচ মাসে তিনটি ছোটো গল্প লেখেন। এখানে আসিবার কয়েকদিন পরে মোহিতচন্দ্রকে লিখিতেছেন (১১ই চৈত্র) যে, "একটা গল্প না ধরলে পাঠকেরা ইট্‌পাটকেল ছুঁড়তে আরম্ভ করবে।" তাই নূতন উপন্যাস 'নৌকাডুবি' শুরু করিলেন এই সময়ে ; বৈশাখ মাস হইতে ধারাবাহিক তাহা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইতে থাকিল।

হাজারিবাগে রেণুকার স্বাস্থ্যের কোনোই উন্নতি দেখা গেল না। ডাক্তারদের সহিত পরামর্শের জন্য রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিলেন, মীরা ও শমী সঙ্গে ফিরিল। কলিকাতায় মীরাকে রাখিলেন মেজো বৌঠাকুরানী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কাছে, শমীকে রাখিলেন রথীন্দ্রনাথের কাছে শান্তিনিকেতনের বোর্ডিঙে। রথীন্দ্রনাথ মজঃফরপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন ; শান্তিনিকেতনে 'তাহার পড়াশুনার সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়া গেছে'। 'ডিগ্রীর প্রতি লোভ পরিত্যাগ করিয়া' 'রথার যাহাতে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় সেইদিকেই দৃষ্টি রাখা যাইতেছে।'[২] ১৪ই বৈশাখ বিদ্যালয় বন্ধ হইল ; রথীন্দ্রনাথ ও যে কয়টি ছেলে থাকিল, সতীশচন্দ্রের উপর তাহাদের ভার দিয়া রবীন্দ্রনাথ ১৬ই বৈশাখ পুনরায় হাজারিবাগ যাত্রা করিলেন। রেণুকাকে লইয়া আলমোরায় যাওয়াই স্থির ; সমস্ত সংসার ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল।

বৈশাখের শেষদিকে হাজারিবাগ হইতে রবীন্দ্রনাথ রুগ্না কন্যাকে লইয়া আলমোরা রওনা হইলেন। সেই ঠেলাগাড়ি পুস্‌পুসে দীর্ঘ পথ বাহিয়া গিরিধিতে আসিলেন। গাড়ি রিজার্ভের জন্য তিন দিন ডাকবাংলায় থাকিতে হইল। গাড়ি পাওয়া গেল বটে, তবে উহা মেলগাড়িতে জুড়িয়া দিবার ব্যবস্থা না হওয়ায় তাঁহাদের দুঃখের অবধি থাকিল না। কবি আলমোরা হইতে গিরিধির সুধাংশুবিকাশ রায়কে লিখিতেছেন, "যে সময়ে বেরিলি পৌঁছিবার কথা তাহার বারো ঘণ্টা পরে পৌঁছিলাম। সেখানে একদিনও অপেক্ষা না করিয়া সেইদিনই কাঠগোদামে আসিতে

১ হাজারিবাগে রচিত কবিতার তালিকা—

রূপক, 'না জানি কারে দেখিয়াছি, দেখেছি কার মুখ' ১৩০৯ চৈত্র। উৎসর্গ ১১, রবীন্দ্ররচনাবলী ১০।

চৈত্রের গান, 'ওরে আমার কর্মহারা, ওরে আমার সৃষ্টিছাড়া'—বঙ্গদর্শন ১৩১০ বৈশাখ। কাব্যগ্রন্থ, প্রকৃতিগাথা। উৎসর্গ ৩৫, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০

ভোরের পাখি, 'ভোরের পাখি ডাকে কোথায়'—বঙ্গদর্শন ১৩১০ বৈশাখ। কাব্যগ্রন্থ, রূপক। উৎসর্গ ২, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০।

সন্ধ্যা, 'আমার খোলা জানালাতে'— বঙ্গদর্শন ১৩১০ জ্যৈষ্ঠ। কাব্যগ্রন্থ, প্রকৃতিগাথা। উৎসর্গ ৬, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০।

যাত্রিণী, 'মন্ত্রে সে যে পূত'—বঙ্গদর্শন ১৩১০ জ্যৈষ্ঠ। কাব্যগ্রন্থ, সোনার তরী। উৎসর্গ ৪, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০।

২ স্মৃতি, পৃ. ৩৯-৪০। ১৪ই বৈশাখ ১৩১০।

হইল। সেখানে না পাইলাম থাকিবার জায়গা, না পাইলাম আলমোরা যাইবার কুলি—সেই দ্বিপ্রহর রৌদ্রে অনাহারে রেণুকাকে লইয়া একায় চড়িয়া রানীবাগ নামক এক জায়গায় ডাকবাংলায় গিয়া কোনোমতে অপরাহ্নে আহারাদি করা গেল ···কোনো প্রকারে গম্য স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি।"[১]

আলমোরায়

আলমোরায় পৌঁছিয়া মোহিতচন্দ্রকে লিখিলেন (১৫ বৈশাখ ১৩১০), "আলমোরায় পৌঁছিলাম। অতি দুর্গম পথ। অনেক কষ্ট দিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে পথে রেণুকা ভালো ছিল।···জায়গাটি ভালো, বাতাসটি বেশ, বাড়িটি আরামের। চারি দিকে ফল ফুলের বাগান ফলে ফুলে পরিপূর্ণ।"[২]

কয়েকদিন পরে মনোরঞ্জনবাবুকে লিখিতেছেন (১ জ্যৈষ্ঠ), "পথে এত বিভ্রাট আছে তাহা পূর্বে কল্পনা করিলে যাত্রা করিতে সাহসই করিতাম না। কিন্তু তবু আসিয়া ভালোই করিয়াছি।··· স্থানটি রমণীয় সন্দেহ নাই—বাড়িও বেশ ভালো পাওয়া গেছে।"[৩] পনেরো দিন পরে বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লিখিতেছেন (১৬ জ্যৈষ্ঠ), "সংসারের তরণীটি নানাপ্রকার তুফানের উপর ভাসিয়ে দিয়ে চলেছি— কবে একটা বন্দরে টেনে এনে নোঙর ফেলতে পারব জানি নে। ছেলেদের মধ্যে কেউ একদিকে কেউ আর-এক দিকে, আমার বিদ্যালয় এক দিকে এবং আমি আধিব্যাধি নিয়ে অন্য দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে চলেছি। বিচ্ছিন্ন সংসারটাকে এক জায়গায় জমাট করে নিয়ে বসবার জন্যে মন ব্যাকুল হয়েছে।"[৪] কিন্তু কবির যথার্থ উদ্‌বেগের কারণ হইয়াছে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়। পাঠকের স্মরণ আছে, বিদ্যালয়ের পরিচালনার জন্য তিনি প্রথমে মনোরঞ্জনবাবু জগদানন্দবাবু ও সুবোধবাবুকে লইয়া একটি কর্তৃসভা গঠন করিয়া দেন। তাহা অন্তর্বিপ্লবের জন্য কার্যকর হয় নাই। হাজারিবাগ যাইবার পূর্বে তিনি বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্তৃত্ব জামাতা সত্যেন্দ্রনাথের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গত কয়েক মাসের অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝিলেন যে, সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে কর্তৃশক্তি নাই; তিনি ছিলেন আমুদে লোক, খামখেয়ালী স্বভাবের; শাসন করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। সুতরাং রবীন্দ্রনাথকে পুনরায় বিদ্যালয়ের পরিচালনা-বিষয়ে ভাবিতে হইল।

গ্রীষ্মাবকাশে কলিকাতার কলেজ বন্ধ হইলে মোহিতচন্দ্র কবির আমন্ত্রণে আলমোরা আসিলেন, বিদ্যালয় সম্বন্ধে পরামর্শ ও কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে। তথায় পক্ষকাল (৬-২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০) কাটাইয়া গেলেন। এই সাক্ষাতের ফলে 'বিদ্যালয়ের অধ্যাপনবিধি নির্ধারণ ও তত্ত্বাবধানের ভার' মোহিতচন্দ্রের উপর অর্পিত হইল। আরও স্থির হইল যে, জগদীশচন্দ্র বসু, মোহিতচন্দ্র ও ডাঃ দুর্গাদাস গুপ্ত আপাতত এই তিনজন কমিটি বাঁধিয়া বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করিবেন। মোহিতবাবু আলমোরা হইতে সোজা বোলপুর গেলেন ও সেখানে সমস্ত বিধিবদ্ধ করিয়া কলিকাতায় ফিরিলেন। তাঁহার সহিত কথা হইয়াছিল 'মাসে একবার করিয়া আসিয়া বিদ্যালয়ের কার্য পরিদর্শন করিয়া যাইবেন।'[৫] বিদ্যালয়ে তখন পাঁচ জন মাত্র শিক্ষক,[৬] কাজকর্ম খুবই শিথিলভাবে চলিতেছে; এইসব কারণে বিধিব্যবস্থা প্রণয়নের দিকে সতর্ক দৃষ্টি ক্রমেই বাড়িতেছে।

১ পাণ্ডুলিপি পত্র। ২৭ বৈশাখ, ১৩১০। শ্রীসুধাংশুপ্রকাশ রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

২ পত্রাবলী। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ ফাল্গুন, পৃ ৫২২।

৩ স্মৃতি, পৃ. ২০।

৪ পত্র নং ৩৮, আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৫২ শারদীয়া সংখ্যা।

৫ স্মৃতি, পৃ ২৯-৩০ [জ্যৈষ্ঠ ১৩১০ ॥ ১৯০৩ জুন ২]

৬ জগদানন্দ রায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র রায়, কুঞ্জবিহারী ঘোষ (১৩০৯-১৩১০ শ্রাবণ), নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। মোহিতচন্দ্র সেনকে

বিদ্যালয় সম্বন্ধে যাহাই বলুন, যাহাই ভাবুন, প্রবন্ধ-রচনায় যতই যুক্তিতর্কের অবতারণা করুন, কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁহাকে প্ল্যানচেট মিডিয়াম প্রভৃতির আলোচনা করিতে দেখিলে একটু অবাক হইতে হয়। আলমোরা হইতে প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত একখানি পত্রের মধ্যে (১৬ জ্যৈষ্ঠ) তিনি প্ল্যানচেটের কথা বলিতেছেন।[১] তাঁহার শরীর ও মন যখন স্বাভাবিক অবস্থা হইতে নামিয়া পড়িত, তখনই তিনি এইসব তথাকথিক অতিপ্রাকৃত বিষয়ের প্রতি মন দিতেন। কোষ্ঠীর ফলাফল মানিতেন কিনা জানি না, তবে কোষ্ঠী লইয়া নাড়ানাড়ি করিতেন।[২] শিলাইদহ হইতে একবার স্ত্রীকে লিখিয়াছিলেন যে 'রথীর কুষ্ঠী পরীক্ষা করতে দিতে হবে।' বৃদ্ধবয়সে মোহিতচন্দ্র সেনের কন্যা উমা [বুলা] দেবীর মাধ্যমে (মিডিয়াম) যেসব কথার তিনি উত্তর পাইয়াছিলেন, তাহা অতীব আশ্চর্য ও কৌতুকপ্রদ।

সাহিত্যসৃষ্টির দিক হইতে আলমোরা-বাস ব্যর্থ হয় নাই। একখানি পত্রে তিনি লিখিতেছেন (২৪ জ্যৈষ্ঠ), "প্রান্তর আমার মন ভুলাইয়াছে, পর্বতকে আমি এখনো আমার হৃদয় দিতে পারি নাই।" কিন্তু অচিরেই নগাধিরাজ দেবতাত্মা হিমালয় তাঁহার মন হরণ না করিলেও, মনকে অভিভূত করিল। কবির সেই মনোভাব প্রকাশ পায় ছয়টি সনেটে[৩]— বর্তমানে 'উৎসর্গ' কাব্যের ২৪ হইতে ২৯ সংখ্যক কবিতার মধ্যে। মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থে' স্বদেশ খণ্ডে সেগুলি সংযোজিত হয়। অল্প কয়েকদিন পূর্বে হাজারিবাগে রচিত কবিতাগুলি হইতে ইহাদের সুর সম্পূর্ণ পৃথক। ইহাদের রূপ বিষয়ের অনুযায়ী, গম্ভীর ও স্পষ্ট— রচনায় রূপ আছে, রূপক নাই। 'কবিতাগুলি একত্র পঠিতব্য'। এই ছয়টি সনেটে গিরিরাজের বৈজ্ঞানিক উদ্ভব হইতে তাহার ভাবময় মাধুর্য পর্যন্ত এমনই নিপুণভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে যে উহার তুলনা নাই। এই কবিতাগুলিকে নৈবেদ্যের কবিতার পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে।

আলমোরায় মাসখানেক থাকিবার পর, রেণুকাকে একটু ভালো দেখিয়া, কবি কলিকাতায় আসিলেন; দীর্ঘকাল বাংলাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। ছেলেমেয়েরা নানা স্থানে বিচ্ছিন্ন, বিদ্যালয় নানা ঘাতপ্রতিঘাতে বিপর্যস্ত, জমিদারির কাজ তদারকের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, সময়মত তাগিদের অভাবে কাব্যগ্রন্থের মুদ্রণকার্য স্তব্ধ। এইরূপ নানা কাজে, নানা বন্ধনে তিনি বন্দী। তাই শ্যালক নগেন্দ্রনাথের উপর কন্যার ভার দিয়া কলিকাতায় ফিরিলেন। আষাঢ় মাসটা কলিকাতায় বোলপুরে শিলাইদহে ঘুরিতে ঘুরিতে কাটিয়া গেল। কলিকাতায় আসিবার অন্যতম কারণ হইতেছে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহ (১৩১০ আষাঢ় ১৪)। সুরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের বড়ই প্রিয় ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বিবাহে উপস্থিত হওয়াটা কেবল কর্তব্যপালন ছিল না, তাহা

কবি লিখিতেছেন, "আপনি সেখানে একবার গিয়াছেন খবর পাইলে কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। এখন সেখানে কেবল পাঁচটি অধ্যাপক আছেন, তাহাতে কাজ চলা অসম্ভব। আর একজন ভাল অধ্যাপক যতদিন আসিয়া না জুটেন ততদিন কোনো স্বেচ্ছাব্রতীকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারেন।" —বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ ফাল্গুন, পৃ ৫২৪।

১ রবীন্দ্রনাথের চিঠি, ৩৮ নং, আলমোরা [১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০] ৩০ মে ১৯০৩। আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৫২ শারদীয়া সংখ্যা, পৃ ২২।

২ চিঠিপত্র ১ পৃ, ৭২।

৩ হিমালয়, 'হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ, অভ্রভেদী তোমার সংগীত'
ক্ষান্তি, 'ক্ষান্ত করিয়াছ তুমি আপনারে, তাই হেরো আজি'
শিলালিপি, 'আজি হেরিতেছি আমি, হে হিমাদ্রি গভীর নির্জনে'
তপোমূর্তি, 'তুমি আছ হিমাচল ভারতের অনন্তসঞ্চিত'
হরগৌরী, 'হে হিমাদ্রি, দেবতাত্মা, শৈলে শৈলে আজিও তোমার'
সঞ্চিত বাণী, ভারত সমুদ্র তার বাষ্পোচ্ছ্বাস নিশ্বসে গগনে'

বঙ্গদর্শন ১৩১০ শ্রাবণ সংখ্যায় এই কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়। এবং পরে কাব্যগ্রন্থে এবং উৎসর্গ গ্রন্থে সংকলিত। দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০।

অবশ্যপালনীয় অন্তরের তাগিদ। সুরেন্দ্রনাথের বিবাহ হইল মহর্ষির পার্শ্বচর ও ভক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর কন্যা সংজ্ঞা দেবীর সঙ্গে।

এমন সময়ে আলমোরা হইতে টেলিগ্রাম পাইলেন যে, রেণুকার ব্যাধি বৃদ্ধি পাইতেছে; কবিকে তখনি কলিকাতা ছাড়িতে হইল। যাহাই হউক আলমোরায় পৌঁছিয়া দেখেন বিপদের প্রথম ধাক্কা কাটিয়া গিয়াছে; সুতরাং পর্বত হইতে প্রান্তরে নামিয়া আসিবার প্রয়োজন সাময়িকভাবে মুলতুবি থাকিল। তা ছাড়া জামাতা সত্যেন্দ্র আসায় তিনি কিয়ৎপরিমাণে নিশ্চিন্ত হইলেন।[১] ইহার পর প্রায় এক মাস রবীন্দ্রনাথকে 'শিশু'র কবিতা রচনায় ও নানা সাহিত্যিক কাজে নিবিষ্ট থাকিতে দেখি। কিন্তু বিদ্যালয়ের চিন্তা মনের মধ্যে সর্বদাই ফল্গু-প্রবাহের মত চলিতেছে। শ্রাবণ মাসটা পুরা ও ভাদ্রের প্রথম সপ্তাহটা আলমোরায় কাটিয়া গেল। ৭ই ভাদ্র রেণুকাকে লইয়া আলমোরা ত্যাগ করিলেন। কবির ইচ্ছা ছিল যে আরও কিছুকাল তাহাকে লইয়া সেখানে থাকেন, কিন্তু রেণুকা যেন বুঝিতে পারিয়াছিল যে, এই পৃথিবীতে তাহার আয়ুষ্কাল সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে; তাই সে অনাত্মীয় বিদেশে মরিবে না। অত্যন্ত জিদ ধরায় কবিকে পাহাড় হইতে নামিতে হইল। নামিবার সময়ও যথেষ্ট কষ্ট পাইয়াছিলেন। কলিকাতায় পৌঁছিবার কয়েক দিনের মধ্যে রেণুকার মৃত্যু হয় (১৩১০ ভাদ্রের শেষে বা আশ্বিনের প্রথমে)। কবিপ্রিয়ার মৃত্যুর নয় মাসের মধ্যে কন্যার মৃত্যু হইল, ইহাই কবির প্রথম সন্তানশোক।

উপন্যাসের নূতন ধারা

রবীন্দ্রসাহিত্যে ক্ষণিকার ও নৈবেদ্যের পর্বের মধ্যে কালের ব্যবধান দীর্ঘ নহে, কিন্তু দুইটি কবিতাগুচ্ছের মধ্যে সুরের পার্থক্য সুস্পষ্ট। কাব্যকে এতদিন রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের নিবিড়তার মধ্যে দেখিয়াছিলেন, সুন্দরকে সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করিবার জন্যই ব্যাকুলতা ছিল তীব্র। ইংরেজিতে যাহাকে বলে idyllic romanticism বা অবাস্তব অতীতাশ্রয়ী কল্পনাবিলাস, যাহার মুখ্য উপাদান হৃদয়ালুতা— তাহাই ছিল এতাবৎকাল-রচিত লিরিকের প্রধানতম ধর্ম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মনীষার পক্ষে রোমান্টিকতার মধ্যে ভাবব্যাকুল মনকে বরাবরের মত নিমজ্জিত রাখা সম্ভব নহে; এই প্রকাশবেদনা বা দ্বন্দ্ব মূর্তি লইয়াছিল ক্ষণিকার মধ্যে।

সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায় সুন্দরের অতলে যে সত্য আছে তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে মনের গভীরে আত্মস্থ হইতে হয়। ভাবের অতীন্দ্রিয় লোক হইতে অনুভূতির তীব্রতার মধ্যে, কল্পনার স্বর্গ হইতে অভিজ্ঞতার বাস্তবতার মধ্যে প্রয়াণপথে কবিমানসে প্রকাশ পাইল 'নৈবেদ্য'। সৌন্দর্যের সাধনা হইতে সুন্দরের পূজা শুরু হইল। এই সুন্দরের সন্ধানে কবিচিত্তের প্রধান আশ্রয়স্থল উপনিষদ; 'প্রাচীন ভারতের একঃ'কে কবি নানাভাবে নৈবেদ্যের অর্ঘ্য দান করিয়াছেন। কবির ধর্মদেশনা দ্বিতীয় (১৩০৭ পৌষ) বহুকালপূর্বের রচনা; তৎপূর্বে ধর্মবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রবন্ধ লেখেন 'ব্রহ্মোপনিষদ' (১৩০৬ পৌষ)।

কিন্তু সত্য কেবল তো মননের মধ্যে নাই, জীবনের প্রকাশধর্মে তাহারই মূর্তি ফুটিয়া উঠে। সুন্দরকে অনুভব করিতে হয় অন্তর দিয়া— সেখানে যুক্তি নাই, তর্ক নাই, অনুভবের দ্বারাই 'অনুভূতি' পূর্ণ হয়। কিন্তু অসংখ্য আবরণে আচ্ছাদিত সত্যকে লোকসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে যুক্তিই তাহার একমাত্র অবলম্বন। কাব্য সেখানে নিষ্ফল,

১ পত্রাবলী। ৪ শ্রাবণ ১৩১০। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ ফাল্গুন, পৃ ৫২৮।

গদ্য-রচনাই তখন হয় ভাবের প্রধান বাহন। সেইজন্য বোধ হয় এই যুগে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র বিষয়ে বিতর্কমূলক প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার অন্তর-প্রতিভাত সত্যকে বাহিরেও প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সেই গদ্য-রচনার কথা আলোচিত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু সে সত্যকে আরও জীবন্তভাবে বাস্তবভাবে প্রকাশ করা যায় মানুষের মধ্য দিয়া। সত্যকে আবিষ্কারের জন্য অন্তরে চলে বিচার ও বাহিরে চলে সংগ্রাম ; এই বিচার ও সংগ্রাম কেবল আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নহে ; জটিল জীবনপ্রবাহে নরনারী মেলে বিচিত্র সম্বন্ধের মধ্যে, বিবিধ সমস্যার তীরে। তাহারা চলে পাশাপাশি পৃথিবীর রাজপথে ; সমাজে সংসারে গৃহদ্বারে নিত্য তাহাদের মেলামেশা ; আধ্যাত্মিক সংগ্রামই তাহাদের জীবনের একমাত্র সমস্যা নহে। প্রত্যেকটি দেহকেন্দ্র অসংখ্য কামনার লীলাক্ষেত্র, যৌন আকাঙ্ক্ষা তাহাদের অন্যতম। জীবের এই আদিম তৃষ্ণার বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ হইতেছে সাহিত্যের অন্যতম উপাদান। সত্যকে সমগ্রভাবে ও বিচিত্রভাবে দেখিতে গিয়া অসংখ্য বন্ধন মাঝে মানুষের নূতন রূপ ফুটিয়া উঠে। সেই বিচিত্র বন্ধনের বিশ্লেষণ এবং সেইসব বিচিত্র ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া মানুষকে প্রকাশ করিতে গিয়া কবিকে লিখিতে হয় উপন্যাস। এতদিন ছোটগল্পের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ জীবনের ছোটখাটো সমস্যার বর্ণনামাত্র করিয়া আসিয়াছেন, সমাস্যার আলোচনা করেন নাই। ছোটগল্পের মধ্যে রোমান্টিকত্ব ছিল, এমনকি lyricism ছিল প্রচুর, কিন্তু problems for discussion ছিল না ; থাকিতেও পারে না। কারণ, স্বল্পপরিসর গল্পের মধ্যে সমস্যা-আলোচনার স্থান অত্যন্ত সংকীর্ণ। তাই সমস্যামূলক প্রশ্নের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া কবিকে ছোটগল্পের পরিবর্তে স্বভাবতই উপন্যাস-রচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। বিষয়ের গুরুত্বের উপর রচনারীতি বা টেকনিকের নির্ভর। তাই দেখি সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া লিখিত হইল 'নষ্টনীড়' 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি'। বঙ্গদর্শনের নবপর্যায়ে যে উপন্যাসের ধারা শুরু হইল, তাহা প্রবাসীতে 'গোরা'য় গিয়া পূর্ণপরিণতি লাভ করিল। এই শ্রেণীর রচনাকে সাধারণত মনস্তত্ত্বমূলক বলা হয়, কারণ ইহাদের মধ্যে বিশ্লেষণ ও বিতর্কই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, ঘটনার প্রবাহ ক্ষীণ।

এই শ্রেণীর সমস্যা-বিশ্লেষণ-বিতর্ক-মূলক উপন্যাসের প্রথম রচনা 'চোখের বালি' ১৩০৭ সালের গোড়ার দিকে 'বিনোদিনী' নামে কবির 'খাতার মধ্যে খসড়া'-করা অবস্থায় পড়িয়াছিল। বৎসরের শেষদিকে সেটিকে মাজিয়া ঘসিয়া কবি প্রকাশযোগ্য করিয়া তোলেন বটে, কিন্তু পত্রিকায় টুকরা টুকরা করিয়া প্রকাশের ইচ্ছা ছিল না। তার কারণ সম্বন্ধে প্রিয়নাথ সেনকে লিখিতেছেন, "খণ্ড খণ্ড করে এরকম গল্প বেরলে জিনিসটা অসমান হয়ে পড়ে। সব জায়গা তো সমান সরস ও কৌতুকাবহ হতেই পারে না—সুতরাং মাঝে মাঝে বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনে হতাশ হতোদ্যম হতে হবেই। এরকম বই সবটা একসঙ্গে না পড়লে উত্তরোত্তর বিকাশ এবং ঘনায়মান পরিণাম পাঠকের মনে দৃঢ় করে বসে না। এ গল্পে ঘটনাবাহুল্য একেবারেই নেই, সেইজন্যে এটা ক্রমশঃ প্রকাশের যোগ্য নয়—কিন্তু মাসিক পত্রিকার করাল কবল থেকে একে যে বাঁচাতে পারব এমন আশা করিনে।" (প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি, পৃ ২৯০) রচনাটির উপর ভারতী ও বঙ্গদর্শন উভয়েই দৃষ্টি দিয়েছিলেন ; অবশেষে নব পর্যায় বঙ্গদর্শনের নূতন টানে উহাকে সেইখানে দিতে হইল।

ইতিমধ্যে ভারতী হইতে ছোটগল্পের জন্য তাগিদ আসিয়াছিল। চৈত্র মাসের (১৩০৭) শেষাশেষি 'নষ্টনীড়' লেখা শুরু করেন, বোধ হয় 'চোখের বালি' শেষ করার পর। অতঃপর বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিক 'চোখের বালি' (১৩০৮ বৈশাখ-১৩০৯ কার্তিক) এবং ভারতীতে ধারাবাহিক 'নষ্টনীড়' (১৩০৮ বৈশাখ-অগ্রহায়ণ) চলে। রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস 'রাজর্ষি' রচিত হইয়াছিল প্রায় ষোলো বৎসর পূর্বে ; তাহার পর ছোটগল্প রচনার পালা, সেটা হিতবাদী, সাধনা (১২৯৮-১৩০২) ও ভারতী (১৩০৫) যুগের কথা।

'চোখের বালি' উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে যে একটি নূতন ধারা বহন করিয়া আনিয়াছিল তাহা আজ সর্ববাদী-সম্মত। লেখকও স্বয়ং ইহার বৈশিষ্ট্য যে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, তাহা নহে। ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত অপেক্ষা মনের দ্বন্দ্বলীলা নিবিড় হইয়াছে। এতবড় উপন্যাস, চরিত্রসংখ্যা অল্পই— মহেন্দ্র আশা বিহারী বিনোদিনী সমগ্র গ্রন্থখানি জুড়িয়া আছে; রাজলক্ষ্মী অন্নপূর্ণা প্রভৃতি ক্ষীণভাবে সংলগ্ন। এই কয়টি মাত্র চরিত্রের মধ্যেই সংগ্রাম চলিয়াছে অহর্নিশি।

এতদিন বাঙালি পাঠকের নিকট বঙ্কিমচন্দ্রের ও রমেশচন্দ্রের নভেল ছিল উপন্যাসের আদর্শ। প্রাকৃত, অতি-প্রাকৃত, দৈব, ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সৃষ্টি ও বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ, বহু নরনারীর জনতা ও কোলাহল ছিল উপন্যাসের প্রধান সম্বল। রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া 'বৌঠাকুরানীর হাট' ও 'রাজর্ষি' লিখিয়াছিলেন। 'চোখের বালি'তে তিনি বাংলা-উপন্যাস রচনার সেই চিরাচরিত পথ ত্যাগ করিলেন। আধুনিক উপন্যাসের সূত্রপাত হইল এই গ্রন্থ হইতে। তবে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইলের মধ্যে সামাজিক সমস্যা ও নরনারীর যৌনদ্বন্দ্বের পথিকৃৎ। রবীন্দ্রনাথের দ্বারা তাহা আরও সূক্ষ্ম ও জটিল রূপ লইল।

নরনারীর যৌনআকাঙ্ক্ষা-অধ্যুষিত সমস্যা ও সংগ্রামের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ও বিশ্লেষণ এই উপন্যাসের প্রধানতম বিষয়বস্তু। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের মধ্যে মনস্তত্ত্বমূলক নূতন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন বলিয়া এক শ্রেণীর সমালোচকদের দ্বারা নিন্দিত ও অপর শ্রেণীর দ্বারা অভিনন্দিত হইয়াছেন। বাঙালীজীবনে ঘটনাবৈচিত্র্য নাই বলিয়া এই গ্রন্থে 'ঘটনাবাহুল্য একেবারেই নেই'। হিন্দুসমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের যোগাযোগ নিরবচ্ছিন্ন নহে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ ও 'জাতে'র মধ্যে তাহার জীবন কঠোর সামাজিক শাসনে নিয়ন্ত্রিত, নরনারীর অবাধ মিশিবার ক্ষেত্র অত্যন্ত সংকীর্ণ। বিধবা ব্যতীত যুবতী নারী সাধারণ হিন্দুসমাজে বড়-একটা চোখে পড়ে না, কারণ বাল্যবিবাহের ফলে দেশের নারীর মধ্যে যৌবনের স্বাভাবিক সৌন্দর্য সুদুর্লভ। বিধবাবিবাহ না থাকায় যুবতী বিধবাই অসংখ্য। সেইজন্য বঙ্কিমপ্রমুখ লেখকগণ বিবাহ-ইতর প্রেমের পাত্রীরূপে বিধবাকেই ব্যবহার করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'তে বিনোদিনী, বঙ্কিমচন্দ্রের কুন্দনন্দিনী ও রোহিণীর ন্যায় বালবিধবা। নৌকাডুবি ও গোরাতে লেখক ব্রাহ্ম অবিবাহিতা কুমারীর সহিত অব্রাহ্ম যুবকের প্রেমের অবতারণা করিয়া নবতর সামাজিক ও ধর্মীয় সমস্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হন।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে যৌন-বিচার প্রবর্তন করিয়াছেন বলিয়া একশ্রেণীর লোকের নিকট নিন্দাভাগী হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই শ্রেণীর নগ্ন আলোচনা সমাজের স্বাস্থ্যহানিকর। আবার আর-এক দল মনে করেন যে রবীন্দ্রনাথ সাহসের সহিত কোনো মীমাংসা করিতে পারেন নাই, তাঁহার ব্রাহ্মসমাজীয় নীতিবোধ নায়কনায়িকাদের উপর প্রয়োগ করিতে গিয়া তাহা কৃত্রিম হইয়া গিয়াছে। বিহারী ও বিনোদিনীর প্রেমকে কোনো চরম পরিণতিতে উত্তীর্ণ করিতে পারেন নাই বলিয়া অধিকাংশের আক্ষেপ। এই শ্রেণীর সমালোচকদের মতে রবীন্দ্রনাথ দুর্বলভাবে চরিত্র ও ঘটনাগুলিকে বর্ণনা করিয়াছেন, বাস্তবকে সাহসভরে প্রকাশ করিতে পারেন নাই; কিন্তু যাঁহারা রবীন্দ্রসাহিত্য স্থিরভাবে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অন্তর্নিহিত ধর্মবোধ হইতে কখনো তাঁহার শিল্পসৃষ্টিকে লালসার পঙ্কে নিক্ষেপ করিতে পারেন নাই; উপন্যাসের মধ্যে তিনি নায়কনায়িকাদিগকে সেই পঙ্ক-শয্যায় নামাইতে সংকোচ বোধ করিতেন; সেটিকে ভীরুতা অপবাদ দেওয়া যায় না, সেটি মার্জিত চিত্তের সুরুচিমাত্র।

সমাজের প্রাচীন সংস্কার ও হিন্দুপরিবারের বহু চিরাচরিত আত্মীয়-সম্বন্ধের মধ্যে যৌনসমস্যা কিভাবে নরনারীর সহজ ও স্বাভাবিক জীবনে জটিলতা আনয়ন করিতে পারে তাহা 'নষ্টনীড়' রচিত হইবার পূর্বে বাংলাসাহিত্যে অন্য কোনো লেখক দেখাইতে সাহসী হন নাই। সনাতন সংস্কারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিহৃদয়ের বিদ্রোহের প্রথম ঘোষণা

হইল 'চোখের বালি'তে। 'নষ্টনীড়' এই যৌনর প্রথম বিশ্লেষণ। আমরা এতকাল প্রেমকে রোমান্সের বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত ছিলাম। কিন্তু যেসব সামাজিক সম্বন্ধকে বাহিরের জগতে বড় করিয়া দেখিয়াছি, সেইসব পবিত্র সম্বন্ধের মধ্যে রোমান্সের আবির্ভাব হইল 'নষ্টনীড়ে'র বৈশিষ্ট্য। অমল ও চারুলতার সম্বন্ধ দেবর ও ভ্রাতৃজায়ার-সম্বন্ধ; ইহাদের মধ্যে যে কোনো-প্রকার রোমান্স হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে তাহারা আদৌ সজ্ঞান ছিল না। ইহাদের প্রেম অত্যন্ত জটিল মনস্তত্ত্বের মধ্যে গুহাহিত; ইহাদের প্রেম কামনাশূন্য, ইহাদের আকর্ষণ অহেতুকী। চারুলতা ভূপতির প্রতি অবিশ্বাসী নহে, অমলও দাদার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে নাই; অথচ দেবর ও ভ্রাতৃজায়ার মধ্যে গভীর একটি যে সম্বন্ধ সৃষ্ট হইয়াছিল তাহাকে—প্রেমের যে সব প্রচলিত সংজ্ঞা (canvention) আছে, সেরূপ কোনো লৌকিক সংজ্ঞা দ্বারা নামায়িত করা যাইবে না।

'নষ্টনীড়' এখন গল্পগুচ্ছের অন্তর্গত; কিন্তু উহা যখন সর্বপ্রথম পুস্তকাকারে রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীতে (১৩১২) প্রকাশিত হয়, তখন উহাকে উপন্যাসই বলা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের সাধারণ ছোটগল্পের সুরের সঙ্গে নষ্টনীড়ের সুরের মিল কম; ইহার মধ্যে প্রেমের যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে তাহা ইতিপূর্বে তাঁহার আর কোনো গল্পের মধ্যে প্রকাশ পায় নাই। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, 'নষ্টনীড়ে'র মধ্যে যে সমস্যা লেখক উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা কখনো ছোটগল্পের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে বিচারণীয় নহে; কারণ গল্প ছোট হইলেই ছোটগল্প হয় না, এবং কাহিনীকে বৃহৎ করিলেই উপন্যাস হয় না।[১] নষ্টনীড় যথার্থভাবে ক্ষুদ্র উপন্যাস, বৃহৎ ছোটগল্প নহে, ইহা নভেলেট্।

বিংশ শতকের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথের মনে স্বদেশ সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে যেসব প্রশ্ন উঠিতেছিল, তাহার বহুবিধ নিদর্শন 'বঙ্গদর্শনে'র রচনার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু কবির সেইসব প্রবন্ধে নারীর আত্যন্তিক সমস্যাগুলি আদৌ বিশ্লিষ্ট হয় নাই। লেখক নৈর্ব্যক্তিকভাবে 'হিন্দুত্বে'র ও হিন্দুসমাজের প্রশ্নসমূহের আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে নারীর অধিকার, তাহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, পরম্পরাগত নীতিবোধ হইতে আত্মখণ্ডন ও আত্মপীড়ন, তাহার অতৃপ্ত যৌবন-আকাঙ্ক্ষার অস্বাভাবিক পরিণতি প্রভৃতি বিচিত্র সমস্যাপূর্ণ প্রশ্ন যুগপৎ জাগিতেছিল; এই উপন্যাস-গুলির মধ্য দিয়া তিনি তাহাদেরই বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিনোদিনী বা 'চোখের বালি' রচনার প্রায় আড়াই বৎসর পর রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় উপন্যাস 'নৌকাডুবি' বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইতে শুরু হয় (১৩১০ বৈশাখ ১৩১২ আষাঢ়) ও 'গোরা' আরম্ভের (১৩১৪ ভাদ্র) প্রায় দুই বৎসর পূর্বে উহা শেষ হয়। সুতরাং চোখের বালি ও গোরার মাঝামাঝি সময়ে নৌকাডুবির আবির্ভাব হয়; এবং সেই জন্যই বোধ হয় লেখকের অজ্ঞাতে নৌকাডুবিতে চোখের বালির ছায়া এবং কোনো কোনো আখ্যানাংশে গোরার পূর্বাভাস রহিয়াছে।

তিনটি উপন্যাসেই কয়েকটি বিষয়ে আশ্চর্য মিল আছে, যদিও অমিলের দিক হইতেই প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য ফুটিয়াছে। প্রথমেই চোখে পড়ে, প্রত্যেকটি উপন্যাসেই দুইটি করিয়া বন্ধু— মহেন্দ্র-বিহারী, রমেশ-যোগেন, গোরা-বিনয়। নায়ক-নায়িকাদের যৌন-আকাঙ্ক্ষা যেভাবে উপন্যাসত্রয়ে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও তুলনীয়। চোখের বালির মধ্যে লেখকের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল যৌন সম্বন্ধের ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাত -জনিত সমস্যা প্রদর্শন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বাংলা সাহিত্যে নরনারীর অন্তর্বিষয়ী জটিল সমস্যাকে এমন স্পষ্টভাবে কেহ ইতিপূর্বে প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই। বিবাহিত পত্নী থাকিতে বিধবা যুবতীর সহিত প্রেম ও পরিণয় করার মধ্যে অস্বাভাবিকত্ব বা অসম্ভবত্ব কিছুই নাই। মহেন্দ্রের চরিত্র নিন্দনীয় হইলেও তাহার মধ্যে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। বিনোদিনী ও বিহারীর

১ ক্রান্তিকাল, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৬৪-৬৫। সাহিত্য-চিন্তা, অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়, পৃ ১৯৬-২০৪।

মধ্যে সম্বন্ধটুকু সাধারণ পাঠকের নিকট পীড়াদায়ক, লেখক তাহাদের প্রেমকে কোনো সুন্দর পরিণতির মধ্যে পরিসমাপ্ত করিলেন না কেন, এই প্রশ্ন অত্যন্ত স্থূল ঔৎসুক্য মাত্র। বিহারী ও বিনোদিনীর মধ্যে বিচ্ছেদের ব্যবধানটা বড় হইয়াছে বলিয়া উহা মহৎ সৃষ্টি। তাহাদের ব্যর্থ জীবনের জন্য যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে দায়ী, সেই মহেন্দ্র তো আশাকে ফিরিয়া পাইল। কিন্তু হতভাগ্য বিহারীর জন্য লেখক কোনো সান্ত্বনা রাখিলেন না। বিনোদিনীর জন্য যাহা রাখিলেন তাহা 'নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে'। রবীন্দ্রনাথ যথার্থ আর্টিস্ট বলিয়া বিনোদিনীকে কুন্দনন্দিনীর ন্যায় বিধবাবিবাহ দিয়া একটা জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করিলেন না। বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে নিন্দিত করিবার জন্য তিনি বঙ্কিমের ন্যায় গল্পের বিশেষ পরিণাম দেখাইবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন না; এমনকি সুনীতি প্রচারও তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। গল্পকে গল্পের ন্যায়ই শেষ করিলেন, সুসংগত পরিণাম প্রদর্শন আর্টিস্টের পক্ষে অবান্তর। রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্ররচনাবলীর (৩য় খণ্ড) চোখের বালির সূচনায় লিখিতেছেন, "চোখের বালির গল্পকে ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে দারুণ করে তুলেছে মায়ের ঈর্ষা। এই ঈর্ষা মহেন্দ্রের সেই রিপুকে কুৎসিত অবকাশ দিয়েছে যা সহজ অবস্থায় এমন করে দাঁত-নখ বের করত না। যেন পশুশালার দরজা খুলে দেওয়া হল, বেরিয়ে পড়ল হিংস্র ঘটনাগুলো অসংযত হয়ে। সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়; বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।"

'নৌকাডুবি'তে যৌনসম্বন্ধ-আলোচনা আছে সত্য, কিন্তু ঘটনাবাহুল্যের দ্বারা উপন্যাস-অংশ জটিল। কিন্তু ইহাতে সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপার সামান্যভাবে আলোচিত হওয়াতে সমস্যার দিক হইতে উপন্যাসখানি জটিলতর হইয়াছে। নৌকাডুবিতে চোখের বালির তীব্রতা নাই এবং গোরার সমস্যারাজির বিতর্ক নাই, অথচ নায়ক-নায়িকাদের অন্তরে সমস্যার ও বাহিরে সংগ্রামের অন্ত নাই। ঘটনার দ্বারা নৌকাডুবির গল্পাংশ গতিলাভ করিয়াছে, বৈচিত্র্যসৃষ্টি দ্বারা উহা নভেল হইয়াছে। 'চোখের বালি'তে ঘটনার দৈন্য পাঠক মাত্রেরই চোখে পড়িবে; সেখানে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণই প্রধান ও প্রবল; 'গোরা'য় বিতর্কমূলক সমস্যার আলোচনাই মুখ্য।

'নৌকাডুবি'তে লেখক যৌন সম্বন্ধের নূতন সমস্যা দেখাইলেন; এখানে 'নষ্টনীড়ে'র অমল ও চারুলতার আত্মীয়-সম্বন্ধ নাই, মহেন্দ্র ও আশা-বিনোদিনীর স্বাভাবিক ও সম্ভাব্য সম্বন্ধও নাই। এখানে রমেশের সহিত হেমনলিনীর বাগ্‌দত্তার সম্বন্ধ। কিন্তু কমলার সহিত যে-সম্বন্ধ তাহার জটিলতাই হইতেছে উপন্যাসের প্রধান আলোচ্য বিষয়। বাহিরের ঘটনা-পারম্পর্য মানুষের মনে কি বিচিত্র সমস্যা সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা দুর্বলচিত্ত রমেশ, অসহায় কমলা ও হতভাগিনী হেমনলিনীর জীবনেতিহাসে পরিব্যক্ত হইয়াছে। বিনোদিনীর প্রেমের জন্য মহেন্দ্রের অসহিষ্ণু উন্মত্ততার মধ্যে অস্বাভাবিকত্ব কিছুই নাই, পরম্পরাগত নীতির দিক হইতে অসংগত মাত্র। মহেন্দ্র জীবনে সংযম-শিক্ষার অবসর লাভ করে নাই; তজ্জন্য সে দুঃখ পাইল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে দুঃখ পাইল নিরপরাধিনী আশা। বিনোদিনীর চরিত্রের মধ্যে যথেষ্ট জটিলতা আছে; তাহার কামনাবহ্নি সংযত হইবার পূর্ব-পর্যন্ত সে অত্যন্ত প্রতিহিংসা পরায়ণা; বিহারীর শ্রদ্ধা প্রেম ও সংযত জীবনাদর্শ দেখিবার পূর্ব-পর্যন্ত সে ছলাকলা দ্বারা মহেন্দ্রকে আত্মবশে আনিয়াছিল। কিন্তু যে-শিকারকে সহজে মারা যায়, ভালো শিকারী কখনো তাহাকে মারে না— সে মারিতে চায় তাহাকে, যাহাকে সহজে ধরা যায় না। মহেন্দ্র অত্যন্ত সহজে তাহার পদানত হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে সে প্রত্যাখ্যান করিল। কিন্তু বিহারীর নাগাল সে পাইল না বলিয়া তাহারই চরণে সে আত্মসমর্পণ করিল। সংযত আত্মস্থ বিহারীর নিকট তাহাকে পরাভব মানিতে হইল।

নৌকাডুবির নারীদ্বয় সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির; হেমনলিনী সুশিক্ষিতা, রমেশের বাগ্‌দত্তা; তাহার প্রেম সুগভীর, যৌনাকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক, অথচ অত্যন্ত সংযত। কমলা অশিক্ষিতা বালিকাবধূ— স্বামীকে ভক্তি করিতে হয় এ জ্ঞান

তাহার স্বভাবসিদ্ধ। ইহাদের প্রেমের মধ্যে কোনো অশিষ্টতা নাই। রমেশকে লেখক অত্যন্ত সাধারণ প্রকৃতির 'বাঙালি' করিয়া গড়িয়াছেন। কলিকাতায় বাসকালে ব্রাহ্ম-পরিবারের শিক্ষিতা যুবতীর প্রেমে সে পড়িল, কিন্তু পিতার সামান্য তিরস্কারেই ভাঙিয়া পড়িল ও গ্রামে গিয়াই একটি বালিকাকে বিবাহ করিতে দ্বিধা করিল না। রমেশ ঘটনার দাস; ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে সে ভাসিয়া চলিয়াছে, ঘটনা সে সৃষ্টি করিতে পারে না, ঘটনার বিরুদ্ধেও সে দাঁড়াইতে পারে না। রমেশের ব্যক্তিত্ব উদগ্র না হইলেও নীতিজ্ঞানে সে মহেন্দ্র হইতে মহত্তর, যৌনবোধ তাহার অত্যন্ত সংযত— এত সংযত যে অনেকে তাহাকে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে করেন।

সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, রমেশের ন্যায় কমলা ও হেমনলিনীর চারিত্রিক ব্যবহারে অসামান্যতা কিছুই নাই। পরম্পরাগত সংস্কার বা নীতিকে মানিয়াছে বলিয়া তাহারা সৃষ্টির দিক হইতে স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ পরম্পরাগত সমাজসংস্থিতিকে আঘাত করিতে তখনো অগ্রসর হন নাই এবং 'চোখের বালি'তে যেটুকু প্রশ্রয় দিয়াছিলেন, তাহা এইখানে সংযত করিলেন। নৌকাডুবির কোনো চরিত্রের মধ্যে দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা নাই, অথচ অত্যন্ত সহজ মানবীয় প্রেম সকলেরই আছে। তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কাহারও মধ্যে নাই বলিয়া অনেকগুলি চরিত্র নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বিকাশের অবসর পাইয়াছে। উপন্যাসের দিক হইতে আমাদের মতে এটি একটি বিশেষ গুণ।

'চোখের বালি'তে লেখক যে দুই নারী সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে একজন বিধবা অপরজন বিবাহিতা নারী। 'নৌকাডুবি'তে একজন কুমারী ও অপরজন পরস্ত্রী। "বিনোদিনী ও আশা কাহাকেও ত্যাগ না করিয়া দুই চন্দ্রসেবিত গ্রহের মত এইভাবেই সে চিরকাল কাটাইয়া দিতে পারিবে, এই মনে করিয়া তাহার [মহেন্দ্রের] মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল।" রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রেমতত্ত্বে 'দুই নারী' একটি জটিল মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা; তাঁহার বাল্য-রচনার আদিম অবস্থা হইতে বার্ধক্যের পরমপরিণত অবস্থা পর্যন্ত 'দুই নারী'তত্ত্ব কি ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহার সম্যক আলোচনার ক্ষেত্র রহিয়াছে। মহেন্দ্রের 'দুই চন্দ্রসেবিত গ্রহের' অবস্থা হইতে অমিত রায়ের লাবণ্য-কেতকীর সঙ্গ ও আনন্দলাভের ইচ্ছা—এই দুই নারী প্রেমতত্ত্বকেই ব্যাখ্যা করিয়াছে। অমিত রায় বলিয়াছিল, "যে-ভালোবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ; যে-ভালোবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের সবকিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে সংসারে সে দেয় আসঙ্গ; দুটোই আমি চাই।" রমেশের মনেও কমলা ও হেমনলিনী উভয়কে যুগপৎ পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা যে জাগে নাই তাহা নহে। মহেন্দ্রের সংগ্রাম চলিতেছিল বিনোদিনীকে সম্পূর্ণ পাইবার জন্য; সে এত কাছে, অথচ এত দূরে! রমেশের সংগ্রাম কমলাকে নিজ আয়ত্তের মধ্যে পাইয়াও দূরে রাখিবার জন্য। মহেন্দ্র অন্যায়ভাবে বিনোদিনীকে আকাঙ্ক্ষা করিতেছে ও বিনোদিনী তাহা প্রতিরোধ করিতেছে, কমলা রমেশকে স্বামী বলিয়াই জানে এবং সেইজন্য ন্যায়সংগতভাবে তাহাকে পাইবার জন্যই ব্যাকুল। রমেশ কমলাকে পরস্ত্রী বলিয়া জানিয়া দূরে রাখিবার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করিতেছে। স্বভাব-সংযত, সাধারণ নীতিজ্ঞানসম্পন্ন রমেশের সংগ্রামের মধ্যে অসামান্যতা নাই, কারণ অসংযত ও উদ্দাম হইতে সে স্বভাব-অপারক। তাহার অত্যন্ত সাধারণ ধর্মজ্ঞান ও সমাজবুদ্ধি হইতে সে যেমন অতি সহজেই বাগ্‌দত্তা হেমনলিনীকে ভুলিয়া পিতৃ-আদেশে বিবাহ করিয়াছিল, ঠিক তেমনি সহজেই সে সাধারণ ধর্মনীতিবোধ হইতে কমলাকে নিকটে পাইয়াও আপনা হইতে দূরে রাখিল, কোনো অশিষ্ট কল্পনা তাহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। কমলা বালিকা; তাহার হৃদয়ে যে 'স্বামী' প্রতিষ্ঠিত, সে হইতেছে তাহার হিন্দু সংস্কারের স্বামী, ধর্মের স্বামী। হিন্দুবালিকার পক্ষে স্বামীকে ভক্তি করা এত স্বাভাবিক যে, কমলার পক্ষে নলিনাক্ষকে স্বামী বলিয়া পূজা করার মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা নাই।[১] যাঁহারা বাঙালি মধ্যবিত্ত গ্রাম্য

১ দ্র. শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প', পৃ ১১৬।

উচ্চবর্ণের হিন্দুবালিকার মনস্তত্ত্ব জানেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে কমলার চরিত্রের মধ্যে কোথাও কৃত্রিমতা নাই। রবীন্দ্রনাথ নৌকাডুবির সূচনায় লিখিয়াছেন, "প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, স্বামীর সম্বন্ধের নিত্যতা নিয়ে যে-সংস্কার আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েদের মনে আছে তার মূল এত গভীর কিনা যাতে অজ্ঞানজনিত প্রথম ভালোবাসার জালকে ধিক্কারের সঙ্গে সে ছিন্ন করতে পারে। কিন্তু এসব প্রশ্নের সর্বজনীন উত্তর সম্ভব নয়। কোনো একজন বিশেষ মেয়ের মনে সমাজের চিরকালীন সংস্কার দুর্নিবার রূপে এমন প্রবল হওয়া অসম্ভব নয় যাতে অপরিচিত স্বামীর সংবাদ-মাত্রেই সকল বন্ধন ছিঁড়ে তার দিকে ছুটে যেতে পারে।"

রবীন্দ্রনাথ উভয় উপন্যাসে বিশেষ করিয়া চোখের বালিতে যথাযথভাবে ঘটনা সৃষ্টি করিতে না পারিয়া—ভুলক্রমে পরিত্যক্ত পত্র ও পরস্পরকে লিখিত পত্র আশ্রয় করিয়া ঘটনাকে আগাইয়া আগাইয়া দিয়াছেন। উভয় গ্রন্থেই কাশী ও পশ্চিমের শহরের পটভূমি রহিয়াছে। নৌকাডুবির খুড়ামহাশয় এক অদ্ভুত সৃষ্টি। গাজিপুর বাসকালে রবীন্দ্রনাথ এইরূপ একটি করিতকর্মা লোকের সাক্ষাৎলাভ করেন; স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁহার 'গাজিপুরের পত্রে' (ভারতী ১২৯৬ জ্যৈষ্ঠ) এই লোকটি সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সেই মানুষটিকেই রবীন্দ্রনাথ নিজ কল্পনার রঙে নূতন করিয়া গড়িয়াছেন খুড়ামহাশয় রূপে। অক্ষয়ের মুখে কবি যে গানটি দিয়াছিলেন, 'বায়ু বহে পূরবৈঁয়া মোরি সজনি'— সেটি গাজিপুরে সাধারণ লোকের মুখে শোনা গান।

চোখের বালি ও নৌকাডুবির মধ্যে কবির দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সুস্পষ্ট। প্রথম উপন্যাসে কবি সমাজকে যেভাবে নিশ্চিহ্ন করিয়াছিলেন, সামাজিক সংস্কারকে যতখানি আঘাত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, নৌকাডুবিতে ততখানি পিছু হটিয়াছেন। সমাজব্যবস্থাকে অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য খুঁজিয়া-পাতিয়া যেসব অদ্ভুত সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা অনেক সময়ে কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। লেখক সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু সমাধান দিতে পারেন নাই বলিয়া অভিযোগ। তবে সাহিত্যিক বা শিল্পীর কাজ রসসৃষ্টি— তাহা যেমন বাহিরের চিত্রাঙ্কন দ্বারাও হইতে পারে, মনের বিশ্লেষণেও তাহা সম্ভব; তাঁহার কাজ এই পর্যন্ত। সমাজসংস্কারকের ন্যায় সমস্যা পূরণের দায়িত্ব সাহিত্যিকের নহে।

'চোখের বালি'র ছায়া যেমন 'নৌকাডুবি'তে পড়িয়াছে, 'গোরা'র পূর্বাভাসও তেমনি ইহাতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজের পারিবারিক আদর্শ উভয় গ্রন্থের অন্যতম আলোচিত বিষয়। ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষে', তারক গাঙ্গুলি 'স্বর্ণলতা'য়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু 'মডেল ভগিনী' গ্রন্থে ব্রাহ্মসমাজের অভাবাত্মক দিকের অতিরঞ্জিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি ও গোরায় ব্রাহ্মসমাজের সমালোচনা আছে সত্য কিন্তু তিনি অভাবাত্মক দিকটাই কেবল দেখান নাই, সমাজের প্রতি সুবিচারেরও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু আদিব্রাহ্মসমাজীয় দৃষ্টিভঙ্গি হইতে নবীন সমাজদ্বয়কে দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার আলোচনা ইহাদের অনুকূলে যায় নাই। অন্নদাবাবু আদর্শচরিত্র নহেন। পরেশবাবুকে ব্রাহ্মসমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া আসিতে হইয়াছিল, সমাজের লোকের ব্রাহ্ম-অব্রাহ্ম বিষয়ে অতিরিক্ত শুচিপরায়ণতার জন্য। নৌকাডুবির অক্ষয়কে গোরার পানুবাবুর পূর্বাভাস বলা যাইতে পারে। উভয় উপন্যাসে এই যে দুইটি ব্রাহ্মযুবকের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, ইহাদের কাহাকেও আদর্শ ব্রাহ্ম অথবা আদর্শ মানুষ বলা যাইবে না। সাধারণ বা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাব আমাদের আলোচ্য পর্ব পর্যন্ত তেমন অনুকূল ছিল না। গোরার মধ্যে যাহা অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত, নৌকাডুবিতে তাহারই আভাস পাই। হেমনলিনীর বিবাহ ভাঙিয়া যাইবার ঘটনার সহিত ললিতার বিবাহব্যাপার ও ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন তুলনীয়। ছোটখাটো আরো মিল আছে, তাহাদের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এ ছাড়া নৌকাডুবির কয়েকটি চরিত্রকে গোরার মধ্যে নূতন ভাবে দেখিতে পাই, যেমন হেমনলিনী ও সুচরিতা, ক্ষেমংকরী ও হরিভাবিনী। নৌকাডুবির অন্নদাবাবু ও

নলিনাক্ষ মিলিয়া গোরার পরেশবাবু হইয়াছে। আবার নলিনাক্ষের সাধনভজনের সহিত গোরার চরিত্রের মিল পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ চোখের বালি ও নৌকাডুবিতে যেসব সমস্যা উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ প্রেম সম্বন্ধীয় ও সামাজিক। এইখানে সমস্যাসমূহের বিশ্লেষণ আছে মাত্র, কিন্তু সমস্যার যথার্থ আলোচনা নাই। 'গোরা'র মধ্যে যেসব বিষয় আলোচিত হইযাছে, তাহা প্রধানত সামাজিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয়। যৌন আলোচনা গোরায় অত্যন্ত গৌণ। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতে গেলে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সামাজিক রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় সমস্যার সমাধান একদিন হইতে পারে, সুতরাং তাহাদিগকে কখনই শাশ্বত সমস্যা বলা যায় না। কিন্তু নরনারীর প্রেমের সংঘাত ও সমস্যা অনাদিকাল হইতে রহিয়াছে এবং অনন্তকাল থাকিবে। তদুপরি ভাবাবেগ ও যৌন-আকাঙ্ক্ষা (sex and emotion) দেশকালাতীত, অর্থাৎ প্রেমের সমস্যা emotional বলিয়া তাহা দেশকাল-নিরপেক্ষ সমস্যা। চোখের বালি সর্বদেশে সর্বকালে সর্বসমাজে সত্য হইতে পারে, কিন্তু গোরার সমস্যা কেবলমাত্র ভারতে এবং বিশেষভাবে হিন্দু-ভারতেই সম্ভব— অন্য কোথাও সম্ভব নহে। তবে সাহিত্যের বিচার তত্ত্বের গুরুত্ব বা সমস্যার ব্যাপকত্বের উপর নির্ভর করে না।

এই তিনখানি উপন্যাসের মধ্যে কবিজীবনের চিন্তাধারার তিনটি স্তর স্পষ্টভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে ; চোখের বালিতে নরনারীর সম্বন্ধের মধ্যে ধর্ম সমাজ সংসার কোনো কিছুরই প্রশ্ন নাই, সমাজ যেন নিশ্চিহ্ন, এখানে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত জীবন-সমস্যা হরণ-পূরণে আলোচিত হইয়াছে। 'নৌকাডুবি'তে সংস্কারগত ধর্মবোধ ও নীতিজ্ঞানই নরনারীর জটিল সম্বন্ধকে সুন্দরের পথে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, কেহ কেহ বলেন উহা চোখের বালির প্রতিক্রিয়ায় রচিত। 'গোরা'য় ধর্ম সমাজ সংস্কার রাজনীতি দেশসেবার আদর্শ সম্বন্ধে পরম্পরাগত সংস্কার পদে পদে আহত হইয়াছে ; সমস্ত গ্রন্থখানিতে বিচিত্র সমস্যা (problems for discussion) উত্থাপিত ও আলোচিত হইয়াছে— কেবল বিশ্লেষণ নহে— সমস্যা সমাধানেরও চেষ্টা চলিতেছে ; এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং জমিদারিতে বিবিধ প্রকারের সংস্কারের জন্য নানা আয়োজন করিতেছেন। সেসব কথা অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে।

শিশু

কলিকাতা হইতে আলমোরায় ফিরিয়া এবার রবীন্দ্রনাথ 'নানা কারণে শ্রান্ত অবস্থায়' আছেন। কেবল বিদ্যালয়ের জন্য উদ্বেগের তাড়নায় পত্রাদি লেখেন। তা ছাড়া যখনই একটু সুবিধা বোধ করেন, নৌকাডুবিতে হাত দেন। একখানি পত্রে[১] লিখিতেছেন (৪ শ্রাবণ ১৩১০), "অগ্রহায়ণ পর্যন্ত লেখা সারা হয়েছে। আজ যদি সময় পাই পৌষ আরম্ভ করব। চৈত্র পর্যন্ত লিখে রাখলে অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারব। এক-একবার মনে হচ্ছে গল্পটা এবৎসর পেরিয়ে যাবে কিন্তু কোন্ পরিণামে গিয়ে যে শেষ হবে তা আমি এখনো কিছু জানি নে। কলমের হাতেই অন্ধভাবে আত্মসমর্পণ করে চলেছি।"

ইতিপূর্বে তিনি মোহিতচন্দ্রের নিকট হইতে কাব্যগ্রন্থে একটা 'শিশু' খণ্ড জুড়িয়া দিবার প্রস্তাব ও তৎসঙ্গে কবিতার একটি তালিকা পান। রবীন্দ্রনাথ তাহার উত্তরে মোহিতচন্দ্রকে 'শিশু' বিষয়ক আরও কয়েকটি পুরাতন কবিতার নাম পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন যে, ভূমিকায় যেন লিখিয়া দেওয়া হয়— 'শিশু' খণ্ডের কবিতা সবগুলিই যে শিশুদের

১ মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত পত্র, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ ফাল্গুন, পৃ ৫২৬।

সম্বন্ধে তা নয়, কতকগুলি শিশুদের পাঠ্য।[১] শিশুদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রীতি যে কী নিবিড় তাহা কবিকে যাঁহারা অন্তরঙ্গভাবে জানিতেন, তাঁহারা সাক্ষ্য দিবেন। বাড়িতে 'ভাইবোন সমিতি' স্থাপন করিয়া ছোট ছোট ভাইপো ভাইঝি ভাগ্নেয় ভাগ্নেয়ীদের লইয়া যেসব আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করা হইত, তাহাতে তাঁহারই উৎসাহ ছিল বেশি। বাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্য 'বালক'[২] পত্রিকা বাহির হইলে তিনিই হন উহার প্রধান লেখক। শিশুমনের আনন্দ দানের প্রথম মহোৎসব চলে ইহারই পৃষ্ঠায়। কবির বাল্য-কৈশোর-যৌবনের স্নেহের অনেকখানি ছিল তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রী সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবীকে ঘিরিয়া। তাই বালিকা ইন্দিরার উদ্দেশ্যে অনেক কবিতা লিখিত। হাসিরাশি, পরিচয়, বিচ্ছেদ, পাখির পালক, মা-লক্ষ্মী, আশীর্বাদ প্রভৃতি কবিতার মধ্যে এই ব্যক্তিগত স্পর্শটুকু বেশ স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের শিশুপ্রীতির অপর নিদর্শন হইতেছে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়; সেখানে তাহাদের জন্য কবি কী পরিমাণ সময় শক্তি নিয়োগ ও নষ্ট করিয়াছিলেন তাহার কোনো হিসাব কেহ রাখে নাই। তাহাদের লইয়া গল্প গান নাটকাভিনয় করায় কবির অপার আনন্দ ছিল।

যাহা হউক, এইবার 'শিশু'খণ্ড প্রকাশ হইবার কথা উঠিলে কবির মন নাড়া পাইয়া শিশুর মনোরাজ্যে যাত্রা করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। কবি অচিরেই শিশু সম্বন্ধে নূতন কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৫ই শ্রাবণ (১৩১০) মোহিতচন্দ্রকে যে পত্র লিখিতেছেন তাহা হইতে জানিতে পারি যে, গোটা দশেক কবিতা রচিত হইয়া গিয়াছে। তেইশ তারিখের মধ্যে ২২টি[৩] লেখা হয়। ৩১শে শ্রাবণ লিখিতেছেন, "বাস্ আর নয়। পিণ্ডি না দিলে যেমন ভূতের শান্তি হয় না তেমনি শেষের মত একটা কিছু না লিখলে আইডিয়া থামতে চায় না। ঠিক যেন একটা গড়ানে জায়গায় বেগে নাবার মত— একটা তলা না পেলে দাঁড়াবার জো নেই। বিদায় কবিতায় সেই তলা পাওয়া গেল— এখন আমি অন্য বিষয়ে মন দিতে পারব। এখন আমার শিশুটির কাছ থেকে বিদায়। শিশুকে উপলক্ষ্য করে ছলনাপূর্বক শিশুর মার সঙ্গ পেয়েছিলেম কিন্তু এমন বরাবর চলে না, পৃথিবীতে আবার আপিস আছে।"[৪]

এই কারণে 'শিশু'-কবিতাগুচ্ছের প্রতি কবির মনে একটু বিশেষ দরদ ছিল; সেইজন্য সমস্ত কবিতাকে একত্র একটি সম্পূর্ণ সাজি ভরিয়া রসজ্ঞ পাঠকদের কাছে নিবেদন করিবেন ইচ্ছা। বঙ্গদর্শনে একটি কবিতা মুদ্রিত হইতে দেখিয়া তিনি আলমোরা হইতে (২৩শে শ্রাবণ ১৩১০) মোহিতচন্দ্রকে লিখিলেন, "শৈলেশের হাত থেকে এগুলিকে রক্ষা করবেন। সে যদি এগুলিকে বঙ্গদর্শনের পিলোরিতে [pillory] চাপিয়ে দেয় তা হলে শুকিয়ে মারা যাবে— এরা নিতান্ত অন্তঃপুরের খেলাঘরের জিনিস— হাটবাটের জিনিস নয়।" ছয় দিন পূর্বেও সাবধান করিয়া লিখিয়াছিলেন, "এ কবিতাগুলি কোনো মাসিক পত্রে দিয়ে আমি নষ্ট করতে ইচ্ছা করি নে··· বেশ তাজা টাট্‌কা অবস্থায় বইয়েতে বেরবে এই আমার অভিপ্রায়। নইলে মাসিক পত্রের পাঠকদের হাতে হাতে যেখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে অনুকরণকারীদের কলমের মুখে ঠোকর খেয়ে খেয়ে কবিতার জেল্লা সমস্ত চলে যায়।"[৫] হাজারিবাগ ও আলমোরায় রচিত অন্য কবিতাগুলি সমসাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু শিশুর ৩১টি কবিতার মধ্যে মাত্র একটি বঙ্গদর্শনে বাহির হয়।

শ্রাবণ মাসের মধ্যেই শিশুর নূতন কবিতাগুলি রচিত। মনটিকে নানা কাজের উদ্বেগের ফাঁকে ফাঁকে

১ শিশু, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯।

২ বালক, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১২৯২। প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতা, 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'।

৩ পত্রাবলী। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ ফাল্গুন, পৃ ৫২৬, ৫৩১।

৪ পত্রাবলী। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ কার্তিক, পৃ ২২৫।

৫ পত্রাবলী। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ ফাল্গুন, পৃ ৫৩০-৩১।

শিশুলোকে লইয়া যাইতেছেন। একখানি পত্রে আছে, "আমি আজকাল শিশুদের মনের ভিতরে বাসা করে আছি। তেতলার ছাদের উপর আমার নিজের শৈশব মনে পড়ছে।"[১]

খোকার মনের ঠিক মাঝখানটিতে
আমি যদি পারি বাসা নিতে—
তবে আমি একবার
জগতের পানে তার
চেয়ে দেখি বসি সে-নিভৃতে। —খোকার রাজ্য

আর-একখানি পত্রে বলিতেছেন, "যতই লিখছি নিজের ভিতরে যে বালকাণ্ড আছে তার সঙ্গে পরিচয় ততই বেড়ে যাচ্ছে।"[২]

আলমোরায় রচিত শিশুর কবিতাগুলির (৩১) মধ্যে আমরা তিনটি সুস্পষ্ট স্তর পাই— কতকগুলি মাতার কতকগুলি পিতার জবানীতে কহা, অবশিষ্ট (২০টি) খোকার নিজের কথা। আমাদের মতে 'শিশু' কবিতাগুচ্ছে এইগুলিই হইতেছে যথার্থ শিশুদের কবিতা। কারণ, এগুলি একই মানুষের চরিত্র-চিত্রাবলীর মত— সবগুলি জড়াইয়া একটি খোকাকে প্রকাশ করিতেছে।

কবি তাঁহার চল্লিশ বৎসর বয়সে শিশুমনের ও শিশুর সহিত পিতৃমাতৃমনের যে নিগূঢ় সম্বন্ধের চিত্রগুলি আঁকিয়াছেন, তাহার মূল কথাটি হইতেছে মাধুর্য। এই তত্ত্বটি পিতার দৃষ্টিতে দেখিয়া কবি লিখিয়াছিলেন 'কেন মধুর' কবিতাটি। শিশুস্নেহ কেন মধুর, এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া খুবই কঠিন। কবি লিখিতেছেন, "খোকাকে যখন আমরা সমস্ত রঙীন সুন্দর ও মধুর জিনিস দিয়ে খুসি করি ও খুসি হই তখনি বুঝতে পারি আমাদের জন্য জগৎটা কেন এমন রঙীন সুন্দর মধুর হয়েছে। জগতের অস্তিত্বের পক্ষে মাধুর্যটা সম্পূর্ণ অতিরিক্ত— ওর কোনো তাৎপর্য পাওয়া যায় না; কিন্তু আমাদের সবরকম ভালোবাসার উপলক্ষেই সৌন্দর্যের বিকাশ আমাদের কাছে চরম আবশ্যক হয়ে ওঠে। ভালোবাসা না থাকলে সৌন্দর্যের কোনো অর্থই থাকে না— মধুর হওয়া— মধুর করা প্রেমেরই চেষ্টা, স্নেহেরই আবেগ— ওটা শুদ্ধমাত্র সত্যের প্রয়োজনের বাইরে। খাদ্য আমাদের কাছে মধুর না হয়েও ক্ষুধার জবরদস্তিতে খাদ্য হতে পারত— শব্দ আমাদের কাছে সঙ্গীত না হয়েও নিজের গায়ের জোরেই শব্দ হতে পারত— কিন্তু যার এত জোর আছে সে তার সমস্ত জোর লুকিয়ে মধুর হতে চায় কেন? ফুল তার বিপুল প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক শক্তিকে গোপন রেখে এমন কোমল এমন অপরূপ ভাবে ফুল হয়ে উঠ্‌চে কেন? আমরা যখন নিজে ভালোবেসে মধুর হই— মাধুরী দিই— মাধুরী লাভ করি তখনি তার তাৎপর্য বুঝতে পারি।..."[১]

শিশুর কবিতার মধ্যে খোকাই নায়ক, খুকির স্থান নাই— এইরূপ অভিযোগ করেন মোহিতচন্দ্রের স্ত্রী সুশীলা দেবী; কবি তাহার জবাবে মোহিতচন্দ্রকে লেখেন, "আমার এই কবিতাগুলি সবই খোকার নামে— তার একটি প্রধান কারণ এই, যে-ব্যক্তি লিখেছে সে আজ চল্লিশ বছর আগে খোকাই ছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে খুকী ছিল না। তার সেই খোকাজন্মের প্রতি প্রাচীন ইতিহাস থেকে যা কিছু উদ্ধার করতে পেরেছে তাই তার লেখনীর সম্বল— খুকীর চিত্ত তার কাছে সুস্পষ্ট নয়। তা ছাড়া আর-একটি কথা আছে— খোকা এবং খোকার মার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠমধুর সম্বন্ধ সেইটে আমার গৃহস্মৃতির শেষ মাধুরী— তখন খুকী ছিল না— মাতৃ-

১ পত্রাবলী। ১৫ শ্রাবণ ১৩১০। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ ফাল্গুন, পৃ ৫২৯।
২ পত্রাবলী। ২৮ শ্রাবণ ১৩১০। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ কার্তিক, পৃ ২২৪।

শয্যার সিংহাসনে খোকাই [শমীন্দ্র] তখন চক্রবর্তী সম্রাট ছিল, সেইজন্যে লিখতে গেলেই খোকা এবং খোকার মার ভাবটুকুই সূর্যাস্তের পরবর্তী মেঘের মত নানা রঙে রঙিয়ে ওঠে— সেই অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ এবং বর্ণ আকর্ষণ করে আমার অশ্রুবাষ্প এই রকম খেলা খেলবে— তাকে নিবারণ করতে পারি নে।"[১] শিশু কাব্যখণ্ডে কবি শিশুমনের বিচিত্রতার বিভিন্ন স্তরের রূপ সহজ ছন্দে এমনভাবে ফুটাইয়া তুলিযাছেন যে, তাহা ছোটবড় সকলেরই উপভোগ্য। এই শিশুর মনের সহিত খেলা তাঁহার চিরজীবন চলিয়াছিল।

শিশুর কবিতাগুলি কেবল বাংলাসাহিত্যে কেন, জগৎসাহিত্যে অতুল; ঠিক শিশুর অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার চিত্তকে প্রকাশ করিবার এ ধরণের প্রয়াস করিতে বেশি কাহাকেও দেখা যায় না। সেজন্য বিলাতে *Crescent Moon* (শিশু) প্রকাশিত হইলে পাঠকদের মনে *Gitanjali*র অভাবনীয়তা হইতে কম বিস্ময় উৎপাদন করে নাই। আমাদের দেশেও শিশুদের উপযোগী যথার্থ কবিতা ছিল না বলিলেই চলে; যা-কিছু ছিল— তা হইতেছে সাধারণ প্রকৃতির বর্ণনা ও নীতি-উপদেশ। আসলে শিশুমনের কল্পনাশক্তির অশেষ পরিণতি ফুটাইয়া তুলিবার জন্য কেহ কবিতা লেখেন নাই। সে দিক হইতে 'শিশু' বাংলাসাহিত্যে নূতন পথ মোচন করিল।

শিশুর প্রাণময় লীলাখেলা সকলই প্রায় মায়ের সঙ্গে। মায়েরও জন্মজন্মান্তরের সাধনা, তার স্নিগ্ধতা মাধুর্যে মণ্ডিত হইয়া শিশুরই রূপ গ্রহণ করিয়াছে। শিশু মায়েরই গড়া পুতুল— মা শিশুর বিশ্ব। পৃথিবী আকাশ বাতাস সকলের সঙ্গে শিশুর পরিচয় হইতেছে; প্রকৃতির বিচিত্র আহ্বানে তাহার ক্ষুদ্র প্রাণ স্পন্দিত হয়; কিন্তু মাকে বাদ দিয়া কিছুই তার কাছে সত্য নহে; সে বলিতেছে—

মেঘের মধ্যে মাগো যারা থাকে
তারা আমায় ডাকে আমায় ডাকে।
...
আমি বলি, "মা যে আমার ঘরে
বসে আছে চেয়ে আমার তরে,
তারে ছেড়ে থাকব কেমন করে।"
শুনে তারা হেসে যায় যে মা, ভেসে।
তার চেয়ে মা আমি হব মেঘ,
তুমি যেন হবে আমার চাঁদ,
দু-হাত দিয়ে ফেলব তোমায় ঢেকে,
আকাশ হবে আমাদের এই ছাদ। —মাতৃবৎসল

শিশুর সমস্ত অন্তরের সহানুভূতি মায়ের জন্য। তাই মার দুঃখে ব্যথিত হইয়া সে পিতাকে মার্জনা করে না। বাবার চিঠি না পাইলে মায়ের কষ্ট হয় ইহা দেখিয়া সে এমন ব্যবস্থা করিতে চায় যে, মা যাহাতে সহজে চিঠি পান। সে নিজে মোটা অক্ষরে বাবার চিঠি লিখিয়া দিবে ও তার পর—

চিঠি লেখা হলে পরে
বাবার মত বুদ্ধি ক'রে
ভাবছ দেব ঝুলির মধ্যে ফেলে?
কক্‌খনো না, আপনি নিয়ে

১ পত্রাবলী ২৮ ও ২৫ শ্রাবণ ১৩১০। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ কার্তিক, পৃ ২২২-২৩।

যাব তোমায় পড়িয়ে দিয়ে,
ভালো চিঠি দেয় না ওরা পেলে। —ব্যাকুল

বাবা বিদেশে গিয়া মাকে কষ্ট দিতেছেন এইটা সে খানিকটা অনুভব করে, তাই সে মাকে বলে যে, সে বড় হইলে খেয়াঘাটের মাঝি হইবে ; কিন্তু

আবার আমি আসব ফিরে
আঁধার হলে সাঁঝে
তোমার ঘরের মাঝে।
বাবার মতো যাব না মা
বিদেশে কোন্ কাজে। —মাঝি

অকারণে মন খারাপ হইলে শিশুর আশ্রয় মায়ের কোল— তাই তার

ছুটোছুটি লাগল না আর ভালো।
ঘণ্টা বেজে গেল কখন
অনেক হল বেলা,
তোমায় মনে পড়ে গেল
ফেলে এলেম খেলা। —ছুটির দিনে

খোকার মনের সকল কল্পনা মাকে ঘিরিয়া— বীরত্বের কল্পনা, দাক্ষিণ্যের কল্পনা সবই। 'বীরপুরুষ' কবিতা প্রসিদ্ধ। মাকে খোকা অভয় দিয়া বলে, 'আমি আছি ভয় কেন মা করো।' খোকার শেষ পুরস্কার কী—'পাল্কী থেকে নেমে, চুমো খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে।'

ছোট ভাইবোনদের উপর খোকার করুণামিশ্রিত স্নেহটি বেশ ফুটিয়াছে 'বিজ্ঞ' কবিতায়। খোকা দেখে বাবা বই লেখেন, তবে তার সেগুলি বোধগম্য নয়। সে গল্প চায়, রূপকথা চায়, ছড়া চায় ; বাবার বইতে তেমন নাই, তাই তার মতে বাবার বই ভালো নয়। 'সমালোচক'-খোকা মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—

বাবা নাকি বই লেখে সব নিজে!
কিছুই বোঝা যায় না লেখেন কী যে।
সেদিন পড়ে শোনাচ্ছিলেন তোরে,
বুঝেছিলি ?— বল্ মা সত্যি করে।
এমন লেখায় তবে
বল্ দেখি কী হবে।

শিশুর কল্পনা তার বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বিকশিত পূর্ণতর হইতেছে ; যে শিশু চাঁপা হইয়া গাছে দুলিতে চাহিয়াছিল, কুকুরছানা ও টিয়াপাখি হইবার কল্পনা করিয়াছিল, যে বীরপুরুষ হইয়া মাকে ডাকাতের হাত হইতে উদ্ধার করিবার কল্পনা করিয়াছিল— সে ক্রমে পাঠশালায় গিয়া লেখাপড়া শিখিতে শুরু করিয়াছে। তখন সে ছুটির দিনে কাগজের নৌকা বানাইয়া খেলা করিতে আনন্দ পায়। এই কবিতায় কবি যে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা তাঁহারই বাল্যস্মৃতি।— 'জীবনস্মৃতি', বাহিরে যাত্রা। শিশু পাঠশালার গুরুমশায়কে কোনোমতেই প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখিতে পারিতেছে না ; যে গুরুমশায় কেবলই চোখ রাঙাইয়া শিশুর স্বভাবজাত চঞ্চলতা স্ফূর্তিকে দমাইয়া দেন,

তাঁহার উপর শিশুর বিরাগ হইবে নাই বা কেন। তাই সে বাবার মত বড় হইয়া গুরুমশায়কে জব্দ করিবে এই তাহার ইচ্ছা—

গুরু মশায় দাওয়ায় এলে পরে
চৌকি এনে দিতে বলব ঘরে ;
তিনি যদি বলেন, 'সেলেট কোথা।
দেরি হচ্ছে, বসে পড়া করো।'
আমি বলব, 'খোকা তো আর নেই,
হয়েছি যে বাবার মতো বড়ো।'
গুরুমশায় শুনে তখন ক'বে—
'বাবুমশায়, আসি এখন তবে।' —ছোটোবড়ো

বহুকাল পরে 'শিশু ভোলানাথে'র মধ্যে 'পুতুল ভাঙা' ও 'মূর্খ' কবিতাদ্বয়ে পণ্ডিতমশায়দের সম্বন্ধে তাঁহার তীব্র মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছিল। কবি নিজের শৈশবে শিক্ষকদের যে উৎপীড়ন ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার বেদনা কোনোদিনই প্রশমিত হয় নাই। সেই বেদনা এইসব কবিতার মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে।

শিশুকে তাহার স্বাভাবিক স্ফূর্তিতে বাড়িতে দেওয়া, তাহার বিচিত্র হৃদয়বৃত্তির বিকাশের সহায়তা করাই যে শিক্ষার লক্ষ্য, ইহা কবি যেমন সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এমন ভাবে আর কেহ পারিয়াছেন কিনা জানি না। শিক্ষাদাতা কেবল আলগাভাবে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি শিশুর গলাধঃকরণ করাকেই শিশুশিক্ষা মনে করেন ; তাহার নিদর্শন তো আমরা গুরুমশায়ের চিত্রে দেখিতেছি ; মূর্খ হইয়া থাকার স্পৃহাটাই শিশুর বাড়িয়া চলে। শিশুকে শিক্ষিত করিতে হইলে শিশুর মতই মন লইয়া তাহার কাছে যাইতে হয়, তাহার কৌতূহলী কল্পনাপ্রবণ মনের খোরাক যোগাইতে হয়।[১]

শিশুর ৬১টি কবিতার মধ্যে ৩১টি এই সময়ের রচনা। অপরগুলি পুরাতন রচনা, প্রভাতসংগীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, সোনার তরী, চিত্রা, ক্ষণিকা হইতে সংগৃহীত। কড়ি ও কোমল প্রথম সংস্করণের কয়েকটি কবিতা অদলবদল করিয়া ইহাতে পুনর্লিখিত। সাময়িক পত্রিকা হইতেও কয়েকটি সংগ্রহ করা হয়। এ ছাড়া ১৩০২ সালে মাঘ মাসে প্রকাশিত 'নদী' কাব্যটি ইহার অন্তর্গত হয়।

শিশুর পুরাতন কবিতার তালিকা

১ শীত— ভারতী ১২৮৭ মাঘ। ২ ফুলের ইতিহাস— 'রুদ্রচণ্ড' ১২৮৮ (পুনর্লিখিত 'রবিচ্ছায়া' ১২৯২)। ৩ সূর্য ও ফুল (অনুবাদ)— ভারতী ১২৮৮ আষাঢ় (প্রভাতসংগীত ১২৯০)। ৪ সাধ— ভারতী ১২৯০ বৈশাখ (প্রভাতসংগীত)। ৫ অভিমানিনী, ৬ স্নেহময়ী, ৭ ঘুম— ছবি ও গান ১২৯০ ফাল্গুন। ৮ অস্তসখী— ভারতী ১২৯১ অগ্রহায়ণ [শরতের শুকতারা] ৯ বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, ১০ শীতের বিদায় (ফুলের ঘা)— বালক ১২৯২ বৈশাখ। ১১ মা-লক্ষ্মী— বালক ১২৯২ জ্যৈষ্ঠ। ১২ সাত ভাই চম্পা—বালক ১২৯২ আষাঢ় (কড়ি ও কোমল)। ১৩ হাসিরাশি—বালক ১২৯২ শ্রাবণ (কড়ি-কোমল)। ১৪ আকুল আহ্বান— বালক ১২৯২ আশ্বিন-কার্তিক। ১৫ মঙ্গল গীত— বালক ১২৯২। ১৬ উপহার—(জন্মতিথির উপহার)—বালক ১২৯২ চৈত্র। ১৭-১৮ পরিচয় ও বিচ্ছেদ (দ্র কড়ি ও কোমল ১ম সংস্করণ—'চিঠি')। ১৯ আশীর্বাদ— ভারতী ও বালক ১২৯৩ বৈশাখ। ২০ পাখীর পালক—ভারতী ও বালক ১২৯৩ শ্রাবণ। ২১ শিশুর মৃত্যু (অনুবাদ), ২২ বিসর্জন (অনুবাদ)

১ শ্রীসুধাময়ী দেবী, শিশু ও রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন পত্র, ৭ম বর্ষ, ৬-৭ সংখ্যা, ১৩৩৩ আষাঢ় ও শ্রাবণ।

কড়ি ও কোমল। ২৩ বিম্ববতী—সাধনা ১২৯৮ ফাল্গুন (সোনার তরী), ২৪ নদী—১৩০২ মাঘ (বাল্যগ্রন্থাবলী নং২)। ২৫ পূজার সাজ— মুকুল, ৫ম খণ্ড ১৩০২। ২৭ স্নেহস্মৃতি— ভারতী ১৩০২ কার্তিক (চিত্রা)। ২৭ নবীন অতিথি (গান। কাব্যগ্রন্থ ১৩০৩। রচিত ১২৯৩ পৌষ)। ২৮ সুখদুঃখ—(১৩০৭ জ্যৈষ্ঠ ৩১, ক্ষণিকা)। ২৯ কাগজের নৌকা—মুকুল ১১শ খণ্ড ১৩০৮। ৩০ খেলা— বঙ্গদর্শন ১৩১০ ভাদ্র। 'জন্মকথা' হইতে 'বিদায়' ৩১টি কবিতা ১৩১০ শ্রাবণ ৪ - ৩১ এর মধ্যে আলমোরায় রচিত।

কাব্যগ্রন্থ ও উৎসর্গ

১৩০৯ সালের ভাদ্র মাস হইতে ১৩১০এর ভাদ্র মাস পর্যন্ত কালটি রবীন্দ্রনাথের সংসারজীবনের প্রথম অগ্নিপরীক্ষার যুগ। শান্তিনিকেতনে কবিপ্রিয়ার ব্যাধির সূত্রপাত, কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু ; মধ্যমা কন্যার ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ, তাহাকে লইয়া শান্তিনিকেতন হাজারিবাগ আলমোরা ঘোরাঘুরি ও অবশেষে কলিকাতায় আসিয়া তাহার মৃত্যু— এই পর্বের ঘটনা। বিদ্যালয়েরও অসংখ্য সমস্যা, ব্যক্তিগত জীবনেও অর্থকৃচ্ছ্রতা। যাহাই হউক, এইসব হইতেছে কবির ব্যক্তিগত দায় ও দুঃখ। ইহারা কখনো তাঁহার উপর জয়যুক্ত হইতে পারে নাই।

তাঁহার স্বভাবনির্লিপ্ত মন সাংসারিক সুখদুঃখের ঊর্ধ্বে উঠিবার জন্য সদাই প্রয়াসী ; সকল প্রকার সংকটের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে তাঁহার সাহিত্য বাধাহীন প্রবাহে গতিশীল। তদুপরি নিজ কাব্যকেও নূতনভাবে প্রকাশের জন্য সমুৎসুক। স্ত্রীর মৃত্যুর কয়েক দিন পরে তিনি মোহিতচন্দ্র সেনকে এক পত্রে লিখিতেছেন, "গ্রন্থাবলী নূতন আকারে বাহির করিবার জন্য অন্তরের মধ্যে জানি না কেন তাড়া আসিতেছে। তাহা ছাপাখানায় পাঠাইয়াছি।"[১]

পাঠকের স্মরণ আছে রবীন্দ্রনাথের প্রথম 'কাব্য-গ্রন্থাবলী' সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ১৯০৩ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশ করেন। তার পর সাত বৎসরের মধ্যে কণিকা (১৩০৬ অগ্রহায়ণ), কথা (১৩০৬ মাঘ), কাহিনী (১৩০৬ ফাল্গুন), কল্পনা (১৩০৭ বৈশাখ), ক্ষণিকা (১৩০৭ শ্রাবণ), নৈবেদ্য (১৩০৮ আষাঢ়) প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩০৭ সালের গোড়ার দিকে ক্ষণিকার ও বৎসরের শেষ দিকে নৈবেদ্যের কবিতারাজি লিখিত হয়। নৈবেদ্য রচনা হইয়া গেলেও কবিচিত্তে কাব্যের রেশ নিঃশেষিত হইল না, নূতন বর্ষ হইতে নানা ভাবের কবিতা প্রকাশিত হইতে থাকিল। আমাদের আলোচ্য পর্বে রচিত কাব্য 'স্মরণ' (১৩০৯ অগ্রহায়ণ) ও 'শিশু' (১৩১০ শ্রাবণ) নূতন কাব্যগ্রন্থমধ্যে সম্পূর্ণভাবে সন্নিবেশিত হইল। এছাড়া সমসাময়িক বিচিত্রভাবের কবিতাগুলি কাব্যগ্রন্থ-অন্তর্গত হতভাগ্য, মরণ, রূপক এমনকি সোনার তরীর মধ্যে সংযোজিত হইল।

কাব্যগ্রন্থের এই নূতন সংস্করণ সম্পূর্ণ নূতনভাবে সম্পাদিত গ্রন্থ। এই সম্পাদন-কার্যে মোহিতচন্দ্র সেন কবির প্রধান সহায়। কবি তাঁহার কাব্যকে যেভাবে শ্রেণীত করিলেন তাহা ঐতিহাসিক ক্রম নহে। তাঁহার বিরাট কাব্য-সাহিত্যকে ২৮টি কাব্যখণ্ডে বিভক্ত করা হইল ; কয়েক খণ্ডের নাম পর্যন্ত নূতন। কয়েকটির পুরাতন নাম থাকিয়া গেল। যে কবিতাগুলি ছন্দ ও ভাবসৌন্দর্যে মনোহর ও মর্মস্পর্শী সেগুলিকে রক্ষা করিয়া নূতনভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হইল। আদর্শ কবিতার লক্ষণ বিজ্ঞানসম্মত ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য হইলেও মোহিতচন্দ্র সেন কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আজ অর্ধশতাব্দী পরে রবীন্দ্রসাহিত্যামোদীদের উপভোগ্য হইবে। এই ভূমিকাই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্যের প্রথম রসগ্রাহী সমালোচনা। মোহিতচন্দ্র লিখিয়াছেন, "যাহা যথার্থ কবিতা, দিব্য

১ পত্রাবলী, কলিকাতা। ১৯-২০ অগ্রহায়ণ ১৩০৯ বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৩৪৯ শ্রাবণ, পৃ ৩৬।

কল্পনা যাহাকে জন্ম দিয়াছে, অকৃত্রিম ছন্দসৌন্দর্য তাহাকে ভূষিত করে এবং ভাবের গভীরতা তাহাকে অন্তরে পরিপূর্ণ করিয়া থাকে। তাহার আনন্দ কল্যাণকে আহ্বান করে এবং সৌন্দর্যে তাহা জগতে নিত্যসুন্দর অনির্বচনীয় পদার্থসমূহের সমতুল হয়। সাধারণভাবে সংক্ষেপে সঙ্কেতস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, যে কবিতা অনির্বচনীয়তায় সঙ্গীতের যত সদৃশ এবং যে কবিতায় পাঠক মানবজীবনের প্রসারতা যত অধিক অনুভব করেন, তাহা তত শ্রেষ্ঠ।

"যিনি কথার সাহায্যে একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করেন তিনি কবি, কিন্তু উচ্চতর কবি তিনি— যিনি শুধু চিত্রাঙ্কণে পরিতুষ্ট না হইয়া তাঁহার ছন্দের মর্মে মর্মে সঙ্গীতের অপূর্ব-অপরূপ ঝঙ্কারগুলি আনিতে পারেন। যিনি জীবনের একটি সামান্যতম সত্যকে পরিস্ফুট ও সুন্দর করিয়া তুলিতে পারেন তিনি কবি, কিন্তু উচ্চতর কবি তিনি— যাঁহার কবিতায় সমগ্রজীবনের সুগম্ভীর বিজয়-গীতি শ্রুত হয়। যিনি সত্য ও ছন্দের সাহায্যে পাঠকের মনে আনন্দ সৃজন করেন তিনি কবি, কিন্তু উচ্চতর কবি তিনি— যাঁহার নিজের আনন্দ এত স্বাভাবিক ও যথেষ্ট যে পাঠক কণামাত্র আস্বাদন করিয়া বুঝিতে পারেন, আমি আগন্তুক মাত্র, আমার অপেক্ষা কবির নয়ন অশ্রুতে অধিক সমাকীর্ণ, আমার অপেক্ষা কবির হাস্য আনন্দে অধিক উদ্ভাসিত। এইখানেই রবীন্দ্রবাবুর কৃতিত্ব।"

এই সংস্করণে কতকগুলি কবিতা এবং কোনো কোনো কবিতার অংশ বাদ দেওয়া হয়; তাহারই কৈফিয়তে মোহিতবাবু লিখিয়াছেন, "পত্রবাহুল্য কখনও কখনও পুষ্পকে পূর্ণসৌন্দর্যে প্রকাশিত হইতে দেয় না এবং পুষ্পিত স্তবকে সকল পুষ্পই কিছু সমানভাবে প্রস্ফুটিত হয় না।"

কাব্যগ্রন্থের ২৮টি গ্রন্থ বা খণ্ডের মধ্যে ২৬টি খণ্ডের জন্য কবি পৃথক পৃথক প্রবেশক-কবিতা লিখিয়া প্রতি খণ্ডের পুরোভাগে প্রযোজন করিলেন এবং এই পর্বে লিখিত কবিতাগুলি কোনো-না-কোনো শ্রেণীর মধ্যে ভরিয়া দিলেন।[১]

এই শ্রেণীকরণ কার্যে ব্যাপৃত হইয়া কবি তাঁহার কাব্যকে সম্পূর্ণ নূতনভাবে পাইলেন। সেই দৃষ্টি হইতেই প্রবেশক কবিতাগুলি লিখিত। কবি দেখিলেন, যে-ভাবরাজি কৈশোরে ও যৌবনে এক ভাবে মনে উদয় হইয়াছিল, পরবর্তী জীবনে তাহারই অনুভূতির তীব্রতায় ও অভিজ্ঞতার ব্যাপকতায় অন্যভাবে রূপ লইয়াছে। পৃথিবীতে নূতন স্থানও যেমন বেশি নাই, নূতন কথাও তেমনি অফুরন্ত নহে। পুরাতন কথা ও সত্যকে নূতনভাবে প্রকাশের সাফল্যেই সাহিত্যিকের প্রতিভার প্রতিষ্ঠা।

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে প্রভাতসংগীত কাব্যখণ্ডের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, শৈশবে ও কৈশোরে কাব্যপথের জয়যাত্রায় বাহির হইয়াছিলেন সত্য; কিন্তু যৌবনের প্রথম উন্মেষেই হৃদয় আপনার খোরাক দাবি করিতে থাকিলে একদিন বাহিরের জগতের সঙ্গে জীবনের সহজ যোগটি বাধাগ্রস্ত হয়। 'বাহিরের যে সামঞ্জস্যটা ভাঙিয়া গেল, নিজের চিরদিনের যে সহজ অধিকারটি' হারাইয়া ফেলিলেন, সন্ধ্যা-সংগীত তাহারই বেদনাব্যক্ত ক্রন্দন। তার পর যখন রুদ্ধদ্বার একদিন ভাঙিয়া গেল, তখন কবি তাঁহার শিশুকালের বিশ্বকে প্রভাত সংগীতে নূতন করিয়া ফিরিয়া পাইলেন। এমনি করিয়া প্রকৃতির সহিত সহজ মিলন বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলনে জীবনের প্রথম অধ্যায়ের একটি পালা কবিজীবনে শেষ হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "শেষ হইয়া গেল বলিলে মিথ্যা বলা হয়। এই পালাটাই আবার আরও একটু বিচিত্র হইয়া, শুরু হইয়া, আবার আরও একটা দুরূহতর সমস্যার ভিতর দিয়া বৃহত্তর পরিণামে পৌঁছিতে চাহিল। বিশেষ মানুষ জীবনে বিশেষ একটা পালাই সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছে— পর্বে পর্বে তাহার চক্রটা বৃহত্তর পরিধিকে অবলম্বন করিয়া বাড়িতে থাকে— প্রত্যেক পাককে হঠাৎ পৃথক্ বলিয়া ভ্রম হয় কিন্তু খুঁজিয়া দেখিলে দেখা যায়, কেন্দ্রটা একই।"

১ হাজারিবাগ হইতে মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিতেছেন—"ঝরনাতলাটা···রূপকের কোটায় যাবে তো?"—১১ই চৈত্র ১৩০৯। পরদিন লিখিতেছেন, 'চৈত্রের গান' প্রকৃতিগাথার অন্তর্গত করিবার জন্য।

কবি এই তত্ত্বটিকে অত্যন্ত সত্যভাবে অনুভব করিতেন বলিয়া কাব্যগুচ্ছ শ্রেণীকরণের সময়ে সমগ্রকে এই দৃষ্টিতেই দেখিলেন। তাই তিনি কবিতার মধ্যে ঐতিহাসিক পারম্পর্য রক্ষার পূর্বনীতি ত্যাগ করিয়া ভাবের পারম্পর্য ও অভিব্যক্তি এবং স্বাভাবিক পরিণতির দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

কাব্যগ্রন্থের নূতন খণ্ডগুলির যে নূতন নামকরণ হইল, তাহারাও নিরর্থক নহে; যদৃচ্ছভাবে তাহাদের নাম দেওয়া হয় নাই— নামগুলি সুচিন্তিত সুসংবদ্ধ, কবির মনোবিকাশের ছন্দ ধরিয়া পরিকল্পিত। সুতরাং প্রবেশক-কবিতা বা সমশ্রেণী কবিতার মধ্যে সুচিন্তিত ধারাই দৃষ্ট হয়।

কাব্যগ্রন্থের ভাবধারা শ্রেণীত ও নামাঙ্কিত করিবার পূর্বে কবি তাঁহার কাব্যকে সমগ্রভাবে দেখিয়া যে প্রবেশক কবিতা প্রযোজন করেন, সেটি হইতেছে 'চিত্রা'-যুগের একটি গান— 'আমারে কর তোমার বীণা'। কবি কেন এই গানটিকে তাঁহার সমগ্র কাব্যরচনার প্রারম্ভে প্রবেশকরূপে বসাইলেন, তাহার কারণ উৎসর্গের কবিতারাজির আলোচনাতে প্রকাশ পাইবে। কাব্যগ্রন্থের ২৬টি প্রবেশক-কবিতা ও সমসাময়িক আরও ২৪টি কবিতা একত্র করিয়া বহুকাল পরে 'উৎসর্গ' নামে কাব্যখণ্ড (১৩২১) মুদ্রিত হয়। এই কবিতাগুলিই যথার্থভাবে আমাদের আলোচ্যপর্বে রচিতও ১৯১৪ সালে সি. এফ. এণ্ড্রুজকে উৎসর্গিত হইয়াছিল।

তত্ত্বের দিক দিয়া সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের ক্রমপরিণতির ধারা যদি কোনো একখানি কাব্যে সংহতরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, তবে তাহা হইতেছে 'উৎসর্গ'। কিন্তু অনেকেই এই কাব্যের সংহত রূপটি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। অধ্যাপক টম্‌সন রবীন্দ্রনাথের জীবনীতে এই কাব্যসম্বন্ধে বলিলেন, "It has no unity, no connecting thread of thought or emotion. All the poet has ever been induced to say is that it has a lot of the *Jivan Devata* about it." অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় ঐ উক্তিকেই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের কাছে সমগ্র কাব্যটি একটি অখণ্ড সৃষ্টি রূপেই প্রকাশিত হইতেছে, কারণ সেগুলি বিশেষ একটি ভাবধারার অভিব্যক্তি-প্রকাশের জন্য রচিত।

কাব্যগ্রন্থের প্রথম গ্রন্থ হইতেছে 'যাত্রা'[১]— জীবনপথে যাত্রা, কাব্যজগতের মধ্যে যাত্রা। কিন্তু প্রশ্ন উঠে এই যাত্রা কিসের জন্য, কাহার জন্য? এই যাত্রার শেষ কোথায়? এই যাত্রাপথে কাহার আহ্বান কবিচিত্তকে কখনো উতলা, কখনো ম্লান, কখনো মূক, কখনো মুখর করিতেছে? কাহার উদ্দেশ্যে বলিলেন—

কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া,
বাহির হ'নু তিমিররাতে তরণীখানি বাহিয়া!…

ইহাকেই কি সিন্ধুতীরে পাইয়া কবি বলিয়াছিলেন, 'এখানেও তুমি জীবনদেবতা'। কাব্যগ্রন্থের অন্তখণ্ডের নামকরণ করা হয় জীবনদেবতা। কবির সমস্ত গতি প্রণতি স্তুতি— এককথায় কবিজীবনের সমগ্রতা গিয়া শুরু হইয়াছে জীবনদেবতার মধ্যে। এখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে জীবনদেবতা কি ঈশ্বর হইতে পৃথক কোনো সত্তাবোধ, না— জীবনদেবতাই ঈশ্বর? এবং যদি বা তিনি ঈশ্বরই হন— তবে সে ঈশ্বরের গুণাগুণ কি কোনো ধর্মশাস্ত্র সম্মত। অথবা তিনি কবির ঈশ্বর— কবির ভাষায় কবির সংগীতেই প্রকাশ্য। সেই অনির্বচনীয় 'পুরুষং মহান্তং'কে কবির ভাবেই দেখিলে বুঝা যাইবে, কবির ভাষাতে খুঁজিলে তাহাকে পাওয়া যাইবে। আমরা কবির ভাষাতেই জীবন-দেবতার ব্যাখ্যা করি।[২] মোহিতচন্দ্র সেনকে (৫ ফাল্গুন ১৩০৯) লিখিতেছেন—

কাব্যগ্রন্থ (১৩১০) প্রথমভাগ—প্রথমখণ্ড।

১ যাত্রা ১ ··কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া ··উৎসর্গ ২ (হে পথিক, কোন্‌খানে চলেছ কাহার পানে। সাগরসঙ্গম, ভারতী ১৩০৮ বৈশাখ। কাব্যগ্রন্থ ১ম-২১ 'যাত্রা'র ১ম কবিতা। মূল 'উৎসর্গ' কাব্যে নাই, বিশ্বভারতী সংস্করণে সংযোজিত, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ৭৯)

২ মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত পত্র, ৫ ফাল্গুন ১৩০৯। দ্র বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ শ্রাবণ পৃ, ৩৩-৩৫।

"আমার নিগূঢ়তার মধ্যে যে একটি বৃহৎ অতি পুরাতন 'আমি' আছে— যে বিশেষরূপে আমার জীবনের দেবতা— যাহার গভীর গোপন আবির্ভাবের দ্বারাই আমি বিশেষভাবে দেবতাত্মা— যে অতিজগতে বাস করিয়া আমাকে জগতে সঞ্চালন করিতেছে, নানা সুখদুঃখ অনুকূলতা-প্রতিকূলতার ভিতর আমাকে সার্থক করিয়া সার্থকতা লাভ করিবার জন্য যাহার অহরহ চেষ্টা— যে আমার মধ্যে কখনো বিফল কখনো সফল হইয়াও এক মুহূর্ত আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না, যাহার মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের সহিত আমার যোগ— ঈশ্বরের বার্তা, আদেশ ও আনন্দ যে আমার মধ্যে আনয়ন ও সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিতেছে, আমার পাপকে দাহন করিয়া আমার পুণ্যকে উজ্জ্বল করিবার জন্য যাহার অহরহ প্রয়াস, আমাকে গড়িয়া তুলিয়া যে সম্পূর্ণতা লাভ করিবে— যাহার শক্তিতে আমি মঙ্গলের মধ্যে অগ্রসর এবং আমার মঙ্গলভাবেই যাহার বলবৃদ্ধি— যে আমার বাহ্যচেতনার অন্তরালে অন্তঃপুরে অবস্থান করিয়া গৃহিণীর ন্যায় আপন গুপ্ত ভাণ্ডারে ক্রমাগতই গ্রহণ বর্জন করিতেছে তাহার সহিত প্রেমের আনন্দে যুক্ত হইয়া পরস্পরকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিলে তবেই অতিজগতের সহিত জগতের নিত্য প্রেমের সম্বন্ধ আপনার মধ্যেই বুঝিতে পারিব। তখন ঈশ্বর আমাদের নিকট হইতে কোনো অবস্থাতেই ব্যবহিত হইয়া থাকিবেন না। আমাদের প্রত্যেকের জীবনদেবতা বিশ্বদেবতার সহিত আমাদের মিলনসাধনের চেষ্টা করিতেছে— নানা ঘটনা নানা সুখদুঃখসূত্রে সে সেই মিলনপাশ বয়ন করিতেছে— মাঝে মাঝে ছিন্ন হইয়া যায়; আবার সে জোড়া দেয়, মাঝে মাঝে জটা পড়িয়া যায়, আবার সে ধীরে ধীরে মোচন করিতে থাকে— আমার সেই চিরসহিষ্ণু চিরন্তন সহচরটির সহিত এই সূর্যালোকে, এই সমীরণে, এই আকাশের নীলিমা ও ধরাতলের শ্যামলতার মাঝখানে, এই জনতাপূর্ণ বিচিত্র কলরবমুখর মানবসভাপ্রাঙ্গণে এই জীবনেই যেন আমার শুভ-পরিণয় সম্পূর্ণভাবে সমাধা হইয়া যায়। আমি যেন তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে চিনি ও তাহার দক্ষিণ করতলে আমার দক্ষিণ হস্ত সমর্পণ করি— সে আমাকে যেখানে বহন করিয়া লইয়া যাইবে সেখানে নির্ভয়ে আনন্দের সঙ্গে যেন যাই। তাহাকে পদে পদে বাধা দিয়া আমাদের মহাযাত্রাকে যেন ব্যাঘাতদুঃখে নিয়ত পীড়িত না করিয়া তুলি। আমার মধ্যে আমার এই চিরসঙ্গীর ছদ্মলীলাই আমার কবিতায় নানা সুরে নানাভাবে বর্ণিত হইয়াছে— তখন তাহা কিছুই জানিতাম না, এখন তাহা ক্রমে ক্রমে বুঝিতেছি। সেই চিরসঙ্গীই আমার অত্যন্ত অপরিণত বয়সেও বিশ্বপ্রকৃতির সহিত আমার দীর্ঘকালের একান্ত আত্মীয়তার পরিচয় কেমন করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিল এবং চিরসঙ্গীই সমস্ত সুখদুঃখ বিচ্ছেদমিলনের মধ্যে এই পরিণত বয়সে পরমাত্মার সহিত আমার সম্বন্ধ বুঝাইবার নানা প্রকার চেষ্টা করিতেছে। সে আছে, সে আমাকে ভালবাসে, তাহার ভালবাসার দ্বারাই ঈশ্বরের ভালবাসা আমি লাভ করিতেছি। জগতে যেমন পিতাকে মাতাকে বন্ধুকে প্রিয়াকে পাইয়াছি— তাহারা যেমন জগতের দিক হইতে ঈশ্বরের দিকে আমাকে কল্যাণসূত্রে বাঁধিতেছে তেমনি আমার জীবনের দেবতা আমার অতিজগতের সহচর একটি অপূর্ব নিত্য প্রেমের সূত্রে ঈশ্বরের সহিত আমার একটি পরম রহস্যময় আধ্যাত্মিক মিলনের সেতু রচনা করিতেছে। ঠিক বুঝাইলাম কি না জানি না, বলিতে গিয়া ভুল করিলাম কি না জানি না— কিন্তু আমার কাব্যমেঘকে নানা স্থানেই বিচ্ছুরিত করিয়া এই রকমের কি একটা কথা নানা বর্ণের রশ্মিতে আপনাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে— আমি তাহাকে ধরিয়া ফেলিবার চেষ্টায় উদয়াচল হাতড়াইয়া বেড়াইতেছি।"

কাব্যলোকে এই যাত্রা কোনো ঐতিহাসিক কালে আবদ্ধ নহে, নব নব ভাবরাজ্যের উদ্দেশ্যে বারে বারে এই যাত্রা কবির জীবনে শুরু হইয়াছে; পর্বে পর্বে তাহার চক্রটা বৃহত্তর পরিধিতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাই দেখি 'যাত্রা' খণ্ডে বৎসর কাল পূর্বে প্রকাশিত 'সাগরসঙ্গমে'র (ভারতী ১৩০৮ বৈশাখ) পাশাপাশি রহিয়াছে 'পথিক' কবিতা, যাহা আরও বিশ বৎসর পূর্বে ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল (১২৮৭ পৌষ)। পরযুগের কাব্যও যদি এইখানে আমাদের আলোচনার অন্তর্গত করিতাম, তবে এই শ্রেণীর আবেগময় অভিযানের কবিতা আরও উদ্ধৃত করিয়া

দেখাইতে পারিতাম যে একটা পালাই বিচিত্রতর ও দুরূহতর হইয়া ফিরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

জীবনপথে 'যাত্রা'র মুখে কবি 'হৃদয়অরণ্যে'[১] আপনাকে হারাইয়াছেন; সন্ধ্যাসংগীতের বেদনার কাহিনী সেই হারানো হিয়ার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সেই বেদনার সমগ্র রূপটি কবি প্রকাশ করিয়াছেন 'হৃদয়ারণ্য' খণ্ডের প্রবেশক কবিতাটিতে— 'কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে'। সে বলে, 'বেলা যায় বেলা যায় গো ফাগুনের বেলা যায়।'…'কোথা আমি যাই, কারে চাই গো, না জানিয়া দিন যায়।'… 'জীবন আমার কাহার দোষে এমন অর্থহারা!'…'কেন আমি বাঁচি, কেন আছি গো, অর্থ না বুঝা যায়!' এই মনোভাব চিন্তাশীল, ভাবপ্রবণ ব্যক্তির জীবনে বারে বারে আসে। ছয় বৎসর পরে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "বাহিরে যাহার সার্থকতা, বাহিরে আসিবার পূর্বে সে তীব্র বেদনা অনুভব করে।… আমাদের সমস্ত প্রবৃত্তিরই সার্থকতা বাহিরের জগতের সহিত মিলনে— যতক্ষণ পর্যন্ত সেই মিলন সম্পূর্ণ না হয়, আমাদের প্রবৃত্তিগুলি বহির্মুখী হইয়া না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা আমাদের মধ্যে নানাপ্রকার পীড়ার সৃষ্টি করে— নিখিলের মধ্যে তাহারা বাহির হইয়া আসিলেই সকল পীড়ার অবসান হয়।" —রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ৬৪৬। 'চয়নিকা' (১৯০৯) কাব্য সংগ্রহে এই কবিতাটির নাম 'মুমুক্ষু' দেন কবি।

হৃদয়ালুতার দুঃখ হইতে বাহিরে আসিবার ভরসা তিনি সেই দুঃখের সময়েই পাইতেছেন—

ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা।
যে শুভ প্রভাতে সকলের সাথে
মিলিবি, পুরাবি কামনা,
আপন অর্থ সেদিন বুঝিবি—
জনম ব্যর্থ যাবে না।

সকলের সাথে মিলনের জন্যই 'নিষ্ক্রমণ'[২]। মোহিতবাবুর গ্রন্থাবলীতে প্রভাত সংগীতের কবিতাগুলিতে সাধারণভাবে 'নিষ্ক্রমণ' নাম দেওয়া হইয়াছে। কারণ তাহা হৃদয়ারণ্য হইতে বাহিরের বিশ্বে প্রথম আগমনের বার্তা। —জীবনস্মৃতি। নিষ্ক্রমণের প্রবেশ 'আঁধার আসিতে রজনীর দীপ' কবিতায় 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র সুর ধ্বনিতেছে—

আজি মোর ঘরে জানি না কখন
প্রভাত করেছে রবির কিরণ,
মাটির প্রদীপে নাই প্রয়োজন,
ধূলায় হোক সে ধূলি।
নিবাও, রে মন, রজনীর দীপ
সকল দুয়ার খুলি।

হৃদয়ারণ্য হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়া কবি যে 'বিশ্বে'র[৩] মধ্যে আসিয়া পড়িলেন— তাহা অনন্ত অসীম। কবির অনন্তমুখী মন বিশ্বগ্রাহী— সে সুদূরের পিয়াসী, 'প্রাণে মনে আমি যে তাহার পরশ পাবার প্রয়াসী'। কিন্তু সুদূর

কাব্যগ্রন্থ, প্রথম ভাগ—প্রথম খণ্ড।

১ হৃদয়ারণ্য (২)…কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে… সমালোচনী ১৩০৯, পৃ ৩৪৮। অস্ফুট।—উৎসর্গ ৯, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ১৯।

২ নিষ্ক্রমণ (৩)…আঁধার আসিতে রজনীর দীপ…উৎসর্গে নাই। দ্র নৈবেদ্য ১৫, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৮, পৃ ১৯।

৩ বিশ্ব (৪)…আমি চঞ্চল হে…উৎসর্গ ৮ (সুদূর, প্রবাসী ১৩০৯ মাঘ-ফাল্গুন পৃ ৩৩৩), রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ১৭।

বিশ্ব আমাদের কাছে স্পষ্ট নহে, সে থাকে অনেকখানি কল্পনায়, অনেকখানি ভাবরাজ্যে, অনেকখানিই তাহার অদৃশ্য। সেই ভাবরাজ্যে মন চলে স্বপনতরী বাহিয়া বিচিত্রের ঘাটে ঘাটে, জীবনদেবতার সন্ধানে। কবিরই গানের ভাষায় বলি, 'চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো'। বাহিরের চক্ষু-ইন্দ্রিয় সুদূর বিশ্বের রূপের মধ্যে বিচরণ করিবার জন্য উৎসুক; আর অন্তরিন্দ্রিয়ের তৃষ্ণা অরূপকে বাঁধিবার জন্য। 'সোনার তরী'[1] স্বপনের বোঝা লইয়া পাড়ি দেয়, জাল ফেলিয়া যাহা পায় তাহা বর্ণ ও সুর, তাহা রূপে-অরূপে মেশানো স্বপ্ন। 'সোনার তরী' বাহিয়া যে যায় সেই খেয়ার নেয়েকে কি কবি জানেন। তাহার অনেক কাহিনী গাহিয়াছেন তিনি অনেক গানে। তাই—

কত জন মোরে ডাকিয়া কয়েছে,
'যা গাহিছ তার অর্থ রয়েছে
কিছু কি।'
তখন কী কই, নাহি আসে বাণী,
আমি শুধু বলি, 'অর্থ কি জানি'।
তারা হেসে যায়, তুমি হাস বসে
মুচকি।
তোমায় জানি না চিনি না এ কথা বল ত
কেমনে বলি।
খনে খনে তুমি উঁকি মারি চাও,
খনে খনে যাও ছলি।

এই সোনার তরীর 'খেয়ার নেয়ে'র সঙ্গে কবির পরিচয় প্রগাঢ় না হইলেও তাহাকে চেনেন না বলিয়া শপথ করিতে পারিতেছেন না।—'দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে'।

বিশ্ব তো সুদূরে, সোনার তরী তো স্বপনে— আকাশকুসুমের ন্যায় সবই অলীক। সুতরাং হৃদয়ারণ্য হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়া বিশ্বের মাঝারে যাহাকে স্পষ্টরূপে যাওয়া যায় সে হইতেছে 'লোকালয়'[2]— রক্তমাংসে-গড়া মানুষের আলয়; সেই লোকালয় বস্তু-আশ্রয়ী জগৎ, স্থূল বাস্তবতা তাহার উপাদান। সেখানে—

কেহ নাহি চায় থামিতে।
শিরে লয়ে বোঝা চলে যায় সোজা,
না চাহে দখিনে বামেতে।
বকুলের শাখে পাখী গায়,
ফুল ফুটে তব আঙিনায়—
না দেখিতে পায়, না শুনিতে চায়,
কোথা যায় কোন্ গ্রামেতে।

কবি সেই সংসারাশ্রম-আবদ্ধ সহস্রের জন্য বাঁশি লইয়া দুই-একটি দুঃখের বোঝা লঘু করিবার চেষ্টা করিতে চাহেন—

রেখো চিরদিন বিরামবিহীন
তোমার সিংহদুয়ারে।

১ সোনার তরী (৫)···তোমায় চিনি বলে আমি করেছি গরব···উৎসর্গ ৬, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ১৪।
২ লোকালয় (৬)···হে রাজন, তুমি আমারে···(সমালোচনী ১৩০৯, পৃ ৪০৮, বাদক) উৎসর্গ ১৯, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ৩৪-৩৫। হে জনসমুদ্র, আমি ভাবিতেছি (সাগরমন্থন। বঙ্গদর্শন ১৩১০ শ্রাবণ। দ্র. পূরবী প্রথম সংস্করণ, মূল উৎসর্গে নাই)।

যারা কিছু নাহি কহে যায়,
সুখদুখভার বহে যায়,
তারা ক্ষণতরে বিস্ময় ভরে
দাঁড়াবে পথের মাঝারে
তোমার সিংহদুয়ারে।

লোকালয়ে জীবনস্পন্দন অত্যন্ত সত্য। লোকালয়ে মানুষের দেহমনকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে 'নারী'[১]। মানুষ নারীকে পায় জন্মিবার মুহূর্তে মাতৃরূপে; তার পর পায় তাহাকে বিচিত্ররূপিণীরূপে। নারী সম্বন্ধে কবির কল্পনা-পঞ্চক হইতেছে— সুন্দরী নারী, কল্যাণী নারী, আনন্দময়ী নারী, বিষাদিনী নারী ও তাপসিনী নারী। বলা বাহুল্য, নারী-জীবনের সমগ্রের রূপটি ফুটিয়াছে এই প্রবেশক-কবিতাটিতে। কিন্তু ইহাও তো বাস্তবের নারী। অন্তরের আকুল পিপাসা যে অরূপ অবচ্ছিন্ন সৌন্দর্য মূর্তির জন্য, তাহা তো বাস্তবের নারী সার্থক করিতে পারে না। কবির চিত্তে সকল সৌন্দর্যের প্রতীক হইতেছে নারী— সেই উর্বশী, সেই বিজয়িনী, সেই মানসসুন্দরী। কল্পনায়[২] সে অপরূপ করে তাহার মানসপ্রতিমাকে। তখন সে বলে:

মোর কিছু ধন আছে সংসারে,
বাকি সব ধন স্বপনে,
নিভৃত স্বপনে।

তাহার কল্পনার স্বর্গ 'সবার অজানা'। কবির অন্তরে নিভৃতে তাহার নীড়, আকুলিত প্রার্থনায় বলে—

ওগো কোথা মোর আশার অতীত,
ওগো কোথা তুমি পরশচকিত,
কোথা গো স্বপনবিহারী

নারীকে ঘিরিয়া কবি ও শিল্পীর বিচিত্র কল্পনা। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া কবিচিত্তের লীলা কৌতুক যৌবনস্বপ্ন ও প্রেম

'লীলা[৩]' খণ্ডের কবিতাগুলির ভিতর পাঠক একটি বিশেষ মানুষকে উপলব্ধি করেন। "প্রেমের যে সুখ বা দুঃখ তাহার এমন একটি গাম্ভীর্য আছে যে তাহা লইয়া লীলা কৌতুক চলে না। কিন্তু লৌকিক প্রেম অনেক সময় প্রেমের ছায়া মাত্র। কল্পনা করিতে পারি যে, এই অবান্তর ছায়া যথার্থ প্রেমের নিকট তিরস্কারভাজন না হইয়া কৌতুকভাজন হইয়াছে এবং তাহার কৌতুকমিশ্রিত কটাক্ষ দ্বারা লজ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। এই কৌতুকহাস্যেই লীলার কবিতাগুলি দীপ্তিমান। তাহাদের প্রত্যেকটির ভিতর গভীর অর্থ লুক্কায়িত আছে।" 'লীলা' কবিতাগুচ্ছের বেশির ভাগ হইতেছে 'ক্ষণিকা'র কবিতা। রবীন্দ্রনাথ এই লীলা খণ্ড সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি:

"ভালোবাসা আপনাকে প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতায় কেবল সত্যকে নহে অলীককে, সঙ্গতকে নহে অসঙ্গতকে আশ্রয় করিয়া থাকে। স্নেহ আদর করিয়া সুন্দর মুখকে পোড়ারমুখা বলে, মা আদর করিয়া ছেলেকে দুষ্ট বলিয়া মারে, ছলনাপূর্বক ভর্ৎসনা করে। সুন্দরকে সুন্দর বলিয়া যেন আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না, ভালোবাসার ধনকে

কাব্যগ্রন্থ, দ্বিতীয়ভাগ—প্রথম খণ্ড।

১ নারী (৭)…সাঙ্গ হয়েছে রণ…(বঙ্গদর্শন ১৩০৯ পৌষ—নারী) উৎসর্গ ৪৩, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ৬০।

২ কল্পনা (৮)…মোর কিছু ধন আছে সংসারে…উৎসর্গ ৩।

৩ লীলা (৯)…তোমারে পাছে সহজে বুঝি…উৎসর্গ ৪, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ১২।

ভালোবাসি বলিলে যেন ভাষায় কুলাইয়া উঠে না, সেইজন্য সত্যকে সত্য কথার দ্বারা প্রকাশ করা সম্বন্ধে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া ঠিক তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে হয়, তখন বেদনার অশ্রুকে হাস্যচ্ছটায়, গভীর কথাকে কৌতুক পরিহাসে এবং আদরকে কলহে পরিণত করিতে ইচ্ছা করে। প্রেমলীলার এই অঙ্গটি এই গ্রন্থাবলীর 'লীলা' খণ্ডে পাঠকেরা পাইবেন। ইহা ছাড়া লীলার মধ্যে আর-একটি জিনিস আছে— তাহা বিদ্রোহ। প্রতিকূলতার কাছে বেদনা স্পর্ধাপূর্বক আপনাকে বিরূপ মূর্তিতে প্রকাশ করিতেছে।...বিদ্রোহী প্রেম বলে, আমি ক্ষণকালের খেলা মাত্র, আমি চিরস্থায়ী একনিষ্ঠতার ধার ধারি না— একান্ত বেদনাকে স্পর্ধিত অত্যুক্তির মধ্যে গোপন করিয়া রাখিবার এই আড়ম্বর। এইসকল কথার যথার্থ তাৎপর্য গ্রহণ করিতে গেলে অনেক সময়ে ইহাদিগকে উল্টা করিয়া বুঝিতে হয়।" —কাব্যগ্রন্থ ১৩১০। ভূমিকা) 'লীলা' খণ্ডের ভূমিকায় আছে :

তোমারে পাছে সহজে বুঝি
তাই কি এত লীলার ছল,
বাহিরে যবে হাসির ছটা
ভিতরে থাকে আঁখির জল।

আসল কথা প্রেমের চাহিদা বড়ো কঠিন, সবার যাহে তৃপ্তি হয়, তাহার তাতে হয় না। 'রমণীরে কেবা জানে— মন তার কোনখানে'— এ রহস্যের মীমাংসা আজও হয় নাই।

চলমান জীবনকাব্যে প্রেমের লীলা জটিল মনের ভাবের দ্যোতক। লীলার লঘু দিকটি কৌতুকময়[১], বাস্তবকে স্পর্শ করিয়া তাহার চটুল গতি। কবিচিত্তে জীবনদেবতার সেই কৌতুকময়ী আবির্ভাবও হয় ; তখন কবি বলেন :

আজ আসিয়াছ কৌতুক বেশে
মানিকের হার পরি এলো কেশে,
... ...
আজ এই বেশে এসেছ আমায়
ভুলাতে।
... ...
আজি হাসিমাখা নিপুণ শাসনে
তরাস আমি যে পাব মনে মনে
এমন অবোধ নহি গো।

কিন্তু মানুষের মন নারীর রূপ কল্পনায় বা তাহার সহিত লীলা কৌতুকে তৃপ্ত হয় না ; তাহাকে ঘিরিয়া 'যৌবন-স্বপ্ন'[২] জাগে, মন সৌন্দর্যরসে নিমগ্ন হইতে চাহে। অথচ কিসের জন্য, কাহার জন্য মনের এই চঞ্চলতা সে বুঝে না ;

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তুরি মৃগসম।

১ কৌতুক (১০)...আপনারে তুমি করিবে গোপন ..উৎসর্গ ৫, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০. পৃ ১১। কাব্যগ্রন্থ, দ্বিতীয় ভাগ—দ্বিতীয় খণ্ড

২ যৌবন স্বপ্ন (১১)...পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি...উৎসর্গ ৭।

বক্ষে হতে বাহির হইয়া
আপন বাসনা মম
ফিরে মরীচিকা সম।…
নিজের গানেরে বাঁধিয়া ধরিতে
চাহে যেন বাঁশী মম,
উতলা পাগল সম।

কিন্তু সে অচিরে আবিষ্কার করে তাহার এই যৌবনস্বপ্ন স্বপ্নমাত্র, বাসনাকে সে প্রেম মনে করিয়া মরীচিকার পিছনে ছুটিয়াছিল। তখন সে বুঝে 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।' তখন মনে হয় প্রেমেই পরম শান্তি, পরম তৃপ্তি। কিন্তু এ কী! নারীর যে 'প্রেম'কে[১] মনে করা গিয়াছিল জীবনের শেষ কাম্য, তাহারও বিকার হয়।

জনমে মরণে আলোকে আঁধারে
চলেছি হরণে পূরণে
ঘুরিয়া চলেছি ঘুরনে।
কাছে যাই যার দেখিতে দেখিতে
চলে যায় সেই দূরে,
হাতে পাই যারে পলক ফেলিতে
তারে ছুঁয়ে যাই ঘুরে।
কোথাও থাকিতে না পারি ক্ষণেক,
রাখিতে পারি নে কিছু,
মত্ত হৃদয়ে ছুটে চলে যায়
ফেনপুঞ্জের পিছু।

কবি যে-প্রেমকে ধ্রুব সুন্দর বলিয়া আবাহন করিতেছেন, সত্যই কি তা চিরস্থায়ী, একনিষ্ঠ? সন্দেহ জাগে— মনে হয় ইহাও মরীচিকার ন্যায় অলীক— মত্তহৃদয় ফেনপুঞ্জের পিছু বৃথায় ছুটিয়া মরে। এই নিষ্ফল কামনার পর কবির মন তাঁহার নিজ সত্তার মধ্যে ফিরিতে চায়— যথার্থ কবিজীবনের যাহা আদর্শ তাহাকই অন্তরে পাইতে চায়— জীবনদেবতার কাছে 'কবিকথা'[২] প্রকাশ হইয়া পড়ে—

দুয়ারে তোমার ভিড় ক'রে যারা আছে,
ভিক্ষা তাদের চুকাইয়া দাও আগে!
মোর নিবেদন নিভৃতে তোমার কাছে—
সেবক তোমার অধিক কিছু না মাগে।

১ প্রেম (১২)…আকাশ-সিন্ধু মাঝে এক ঠাঁই…উৎসর্গ ১৫ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ৩০। (আমি যারে ভালোবাসি…বঙ্গদর্শন ১৩১০ আষাঢ়। প্রেম-উৎসর্গ ৩৪। সব ঠাঁই মোর ঘর আছে ..প্রবাসী ১ম বর্ষ প্রথম সংখ্যা ১৩০৮ বৈশাখ। রচনা ১৩০৭ উৎসর্গ ১৪। মন্ত্রে সে পূত, যাত্রিনী। বঙ্গদর্শন ১৩১০ জ্যৈষ্ঠ, উৎসর্গ ৪০। যদি ইচ্ছা কর তবে…উৎসর্গ ৩২)। — কাব্যগ্রন্থ, তৃতীয় ভাগ

২ কবিকথা (১৩)…দুয়ারে তোমার ভিড় ক'রে যারা আছে…উৎসর্গ ২০, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ৩৫। (বাহির হইতে দেখো না…বঙ্গদর্শন ১৩০৮ জ্যৈষ্ঠ, কবিচরিত...উৎসর্গ ২১। আছি আমি বিন্দুরূপে...বঙ্গদর্শন ১৩০৮ জ্যৈষ্ঠ। কবির বিজ্ঞান...উৎসর্গ ২২।

ভাঙিয়া এসেছি ভিক্ষা পাত্র,
শুধু বীণাখানি রেখেছি মাত্র,
বসি একধারে পায়ের কিনারে
বাজাই সে বীণা দিবসরাত্র।
...
তুমি নিজ-হাতে বাঁধো এ বীণায়
তোমার একটি স্বর্ণতন্ত্র
...
নগরের হাটে করিব না বেচাকেনা,
লোকালয়ে আমি লাগিব না কোনো কাজে।
পাব না কিছুই, রাখিব না কারো দেনা,
অলস জীবন যাপিব গ্রামের মাঝে।

সত্যই গ্রামের মাঝে কবির অলস জীবনযাপনের পালা শুরু হয়। কবিকথা প্রকাশ পায় কবিতায়, পত্রধারায় (ছিন্নপত্র); আর প্রকৃতিগাথায়[১] রূপ পায় বহির্জগতের শোভা। আজ প্রকৃতির সমস্ত শোভা ও সৌন্দর্য কবির নিকট প্রাণবন্ত; সমস্তের মধ্য দিয়া জীবনদেবতার রূপ মুক্তিলাভ করিতেছে।

তোমার তারায় মোর আশাদীপ
রাখিব জ্বালি।
তোমার কুসুমে আমার বাসনা
দিব গো ঢালি।
তার পর হতে নিশীথে প্রাতে
তব বিচিত্র শোভার সাথে
আমারো হৃদয় জ্বলিবে ফুটিবে,
দুলিবে সুখে—
মোর পরানের ছায়াটি পড়িবে
তোমার মুখে।

কিন্তু ভাগ্যের লিখন অন্যরূপ। গ্রামের মাঝে প্রকৃতির শোভা, আকাশের তারা, কাননের কুসুম— একদিন সমস্ত মলিন হইয়া গেল। তারার মাঝে আশাদীপ জ্বালিয়া রাখিবার সমস্ত স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল।

সাথী যে আছিল নিলে কাড়ি,
কী ভয় লাগালে, গেল ছাড়ি—
একাকীর পথে চলিব জগতে
সেই ভালো মোর সেই ভালো।

১ প্রকৃতিগাথা (১৪)...তোমার বীণায় কত তার আছে...উৎসর্গ ১৮, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ৩৩। শুক্লসন্ধ্যা শূন্য ছিল মন, বঙ্গদর্শন ১৩০৯ আশ্বিন,...উৎসর্গ ২৩। দেখো চেয়ে গিরির শিরে—বঙ্গদর্শন ১৩১০ আষাঢ়, মেঘোদয়ে...উৎসর্গ ৩৩। ওরে আমার কর্মহারা...বঙ্গদর্শন ১৩১০ বৈশাখ। চৈত্রের গান...উৎসর্গ ৩৫। আমার খোলা জানালাতে—বঙ্গদর্শন ১৩১০ জ্যৈষ্ঠ—সন্ধ্যা...উৎসর্গ ৩৬।

এই অবস্থাকে কবি বলিয়াছেন 'হতভাগ্য'[১]। কবিপ্রিয়ার মৃত্যু কবিজীবনের একটা বিশেষ ঘটনা— জীবনের অনেক কিছুর পরিবর্তন শুরু হইল এইখান হইতে। 'রূপক'গুচ্ছের মধ্যে শ্রেণীভুক্ত হইলেও 'মুক্ত পাখির প্রতি' কবিতাটি এই সঙ্গে পঠনীয়। কবিপ্রিয়ার বিরহই এখানে বিশুদ্ধ কবিতার মধ্যে রূপ পাইয়াছে।

কবির মনে জীবন সম্বন্ধে নূতন 'সংকল্প' দেখা দিতেছে; 'অলস জীবন যাপিব গ্রামের মাঝে'— সে স্বপ্ন ছুটিয়া গেল। জীবনকে মধুময়রূপে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; জীবনদেবতা আসিয়াছিলেন— 'হাতে ছিল তব বাঁশি, অধরে অবাক হাসি'। জীবনের আনন্দে, উৎসাহে তাহাকে একদা বলিয়াছেন—

সেদিন আমার যত কাজ ছিল
সব কাজ তুমি ভুলালে।
...
তার পরে হায় জানি নে কখন
ঘুম এল মোর নয়নে।

রুদ্রের বেশে জীবনদেবতা আসিলেন 'ভস্মমলিন তাপসমূর্তি' ধরিয়া। সেই ভীষণ, রিক্ত, মৌনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

হস্তে তোমার লৌহদণ্ড
বাজিছে লৌহবলয়ে।
শূন্য ফিরিয়া যেয়ো না অতিথি,
সব ধন মোর না লয়ে।
এস এস ভাঙা আলয়ে।

শোকাঘাতে অন্তরে আজ 'সংকল্প'[২] আসিয়াছে ত্যাগের জন্য; 'হতভাগ্য' কবিতাগুচ্ছের প্রবেশকে যাহা রূপ লইয়াছে দুঃখের বেদনায়, 'সংকল্প'গুচ্ছে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে রুদ্রের আবাহনে। সেদিন তিনি জীবনদেবতাকে দেখিয়াছিলেন রুদ্রের বেশে—

তুমি যে এসেছ ভস্মমলিন
তাপসমুরতি ধরিয়া
স্তিমিত নয়নতারা
ঝলিছে অনলপারা,
সিক্ত তোমার জটাজুট হতে
সলিল পড়িছে ঝরিয়া।
বাহির হইতে ঝড়ের আঁধার
আনিয়াছ সাথে করিয়া
তাপসমুরতি ধরিয়া।

বিরাট ত্যাগের জন্য মনে সংকল্প হইতেছে। কিন্তু সে ত্যাগ কিসের জন্য, কাহার জন্য?

১ হতভাগ্য (১৫)।...পথের পথিক করেচ আমায়...বঙ্গদর্শন ১৩০৯ অগ্রহায়ণ...পথিক। উৎসর্গ ৪১, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ৬৪-৬৫। (আলো নাই দিন শেষ হল...বঙ্গদর্শন ১৩০৯ অগ্রহায়ণ। পথিক।) কাব্যগ্রন্থ, চতুর্থ ভাগ।

২ সংকল্প (১৬)।...সে দিন কি তুমি এসেছিলে—উৎসর্গ ৩৯, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ৬০-৬২।

হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজ কী বেশে।
দেখিনু তোমারে পূর্বগগনে
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।

কবি একবার ভাবিয়াছিলেন অলস জীবন করিব যাপন গ্রামেতে; কিন্তু আজ গ্রাম ও প্রকৃতি কবির কাছে জড়মূর্তিতে আর নাই, সৌন্দর্যমূর্তির অন্তরালের ভাবরূপে দেশ 'ভারতমাতা'র রূপে তাঁহার মনোলোকে উদয় হইতেছে। কবিচিত্ত ভারতের তপোমূর্তির ধ্যানে মগ্ন হইল। বর্তমানের রুক্ষ বাস্তবতা হইতে মুখ ফিরাইয়া অতীতের তপোবনের স্বপ্ন দেখিতে কল্পনাকুশল কবির চিত্ত নিরাকুল—

শুনিনু তোমার স্তবের মন্ত্র
অতীতের তপোবনেতে—
অমর ঋষির হৃদয় ভেদিয়া
ধ্বনিতেছে ত্রিভুবনেতে।
প্রভাতে হে দেব, তরুণতপনে
দেখা দাও যবে উদয়গগনে
মুখ আপনার ঢাকি আবরণে
হিরণ-কিরণে-গাঁথা—
তখন ভারতে শুনি চারিভিতে
মিলি কাননের বিহঙ্গগীতে,
প্রাচীন নীরব কণ্ঠ হইতে
উঠে গায়ত্রীগাথা।
হৃদয় খুলিয়া দাঁড়ানু বাহিরে
শুনিনু আজিকে নিমেষে,
অতীত হইতে উঠিছে হে দেব,
তব গান মোর স্বদেশে।

'স্বদেশ'[১] কবিতাগুচ্ছ চয়ন করিতে গিয়া নূতন দৃষ্টিতে দেশমাতৃকার রূপ দেখিলেন। আলমোরা বাসকালে হিমালয়ের ধ্যানমূর্তি কবির অন্তরে যে ভাবের সঞ্চার করে তাহারই বাণীমূর্তি হইতেছে 'হিমালয়' আদি ছয়টি সনেট।

কবি যে স্বদেশকে দেখিতেছেন, কাল্পনিকতার মধ্যে তাহার রূপবিকাশ হইয়াছিল। স্বদেশের ন্যায় স্থূল বাস্তবতাকে যতই মোহন করিয়া আদর্শান্বিত করিবার চেষ্টা করুন-না কেন, কবিচিত্ত কখনোই তাহার মধ্যে চরম তৃপ্তি পাইতে পারে না। তাই কবির মনে আদর্শ ও বাস্তবের সমস্যা লইয়া প্রশ্ন জাগে। রূপ ও অরূপ, সীমা ও অসীম, ভাষা ও ভাব,

১ স্বদেশ (১৭)।...হে বিশ্বদেব মোর কাছে তুমি—বঙ্গদর্শন ১৩০৯ পৌষ...উৎসর্গ ১৬, রবীন্দ্র-বচনাবলী ১০, পৃ ৩১-৩২। হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ হিমালয়।...ক্ষান্ত করিয়াছ তুমি আপনারে—ক্ষান্তি। আজি হেরিতেছি আমি...শিলালিপি। তুমি আছ হিমাচল...তপোমূর্তি। হে হিমাদ্রি, দেবতাত্মা...হরগৌরী। ভারতসমুদ্র তার বাষ্পোচ্ছ্বাস...সঞ্চিতবাণী—(বঙ্গদর্শন ১৩১০ শ্রাবণ এই ছয়টিই প্রকাশিত হয়, উৎসর্গ ২৪-২৯।) হে ভারত আজি নবীন বর্ষে...নববর্ষের গান। বঙ্গদর্শন ১৩১০ জ্যৈষ্ঠ। 'নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা' উৎসর্গে নাই। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, সংযোজনী ১২ ও ১৩, পৃ ৮৮-৯১)। কাব্যগ্রন্থ, পঞ্চম ভাগ।

বন্ধন ও মুক্তি— ইহাদের মধ্যে কোথায় সত্য! বিচিত্র ও আপাতবিরুদ্ধ এই জগৎ! 'রূপ নাহি ধরা দেয় বৃথা এ প্রয়াস'—এ কথা কবিরই। কিন্তু সেই রূপকেই প্রকাশের জন্য ভাবের আকূতি, ভাষার বেদনা। রূপের ও ভাবের প্রকাশে ভাষা যখন প্রাণ খুঁজিয়া পায় না, তখন সে রূপকের মধ্যে অবগাহন করে— ভাব ও রূপের উদ্বাহ-বন্ধনে অর্থের সন্ধান মিলে। 'রূপক'[1] কাব্যগুচ্ছের প্রবেশকে কবি লিখিলেন—

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
    গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
    ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
    রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
    সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না-জানি এ কার যুক্তি,
    ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
    মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

এই কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও কাব্যাদর্শ পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়াছে; মনে হয় যেন কোনো কথাটি বাদ যায় নাই। 'রূপক' খণ্ডের কয়েকটি নূতন কবিতা এই যুগের রচনা। সেগুলি যেন স্বদেশের অলীক ভাবব্যঞ্জনার প্রত্যুত্তর, রূঢ় রূপের বিপরীতে রূপকের মধ্যে সুন্দরকে দেখার প্রয়াস, রহস্যের মধ্যে জীবনদেবতাকে পাইবার আবেগ। রূপ বলিতে প্রকৃতির সৌন্দর্যরূপ বুঝায়; সেই 'রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া'—রূপ হইতে ভাবের সৃষ্টির মুখে গড়ে রূপক।

রূপককে স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে হয় 'কাহিনী'র[2] জন্ম। কারণ 'ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ'। যে কথা কবি গাহিয়াছিলেন বাল্মীকির হইয়া 'ভাষা ও ছন্দে', তাহাকেই স্মরণ করাইয়া দেয়— ছন্দই ভাবকে টানিয়া লইবে উর্ধ্বপানে—

কথারে ভাবের স্বর্গে, মানবেরে দেবপীঠস্থানে।
... ...
তেমনি আমার ছন্দ, ভাষারে ঘিরিয়া আলিঙ্গনে
গাবে যুগ যুগান্তরে সরল গম্ভীর কলস্বনে

১ রূপক (১৮)...ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে...উৎসর্গ ১৭, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ৩৩। (আজিকে গহন কালিমা—মুক্তপাখির প্রতি, বঙ্গদর্শন ১৩০৯ অগ্রহায়ণ। উৎসর্গ ৩১। আমাদের এই পল্লীখানি—ঝরনাতলা, বঙ্গদর্শন ১৩০৯ চৈত্র—উৎসর্গ ৪৪। ভোরের পাখি ডাকে কোথায়... ভোরের পাখি, বঙ্গদর্শন ১৩১০ বৈশাখ—উৎসর্গ ১। না জানি কারে দেখিয়াছি—চিঠি—বঙ্গদর্শন ১৩১০ ভাদ্র—উৎসর্গ ১১। আমার মাঝারে যে আছে...উৎসর্গ ১০)।

২ কাহিনী ১৯...কত কী যে আসে...উৎসর্গ, দ্র কাহিনী, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৭, পৃ ৯১। [নিবেদিল রাজভৃত্য...দীনদান (২০ শ্রাবণ ১৩০৭) ভারতী ১৩০৭ আশ্বিন...]।

দিক হতে দিগন্তরে মহামানবের স্তবগান—
ক্ষণস্থায়ী নরজন্মে মহৎ মর্যাদা করি দান।[১]

সেই অঙ্গমাঝে রূপ দিতে গিয়া 'কাহিনী' আসে কবির ছন্দে; প্রবেশক কবিতায় তাই লিখিলেন—

কত সুখ দুখ আসে প্রতিদিন
কত ভুলি, কত হয়ে আসে ক্ষীণ—
তুমি তাই ল'য়ে বিরামবিহীন
রচিছ জীবনকাহিনী

...

গভীর নিভৃতে মোর মাঝখানে,
কী যে আছে কী যে নাই কে বা জানে,
কী জানি রচিলে আমার পরানে
কত-না যুগের কাহিনী—
কত জনমের কত বিস্মৃতি
ওগো স্মৃতি-অবগাহিনী!

স্মৃতি অবগাহন করিয়া আমরা যে অতীতলোকে উত্তীর্ণ হই তাহা অনাদি-কালের মধ্যে স্তব্ধ ইতিহাস। কবি সেই মূক অতীতকে মুখর হইবার জন্য আকুতি জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছেন—

কথা কও, কথা কও—
স্তব্ধ অতীত, হে গোপনচারী,
অচেতন তুমি নও—
কথা কেন নাহি কও![২]

অতীতকে কবি আজ দেখিতেছেন অসীমের মধ্যে। ভাবরাজি অঙ্গ ধরিয়া অনন্তের মধ্যে বিরাজমান— কবির মন কোথা হইতে কোথায় যায়! 'জীবনের পাতায় পাতায় অদৃশ্য লিপি' দিয়া পিতামহদের কাহিনী রচিত হইতেছে কালের মধ্যে। বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে কালের ইতিহাসে; মুহূর্তগুলি স্তব্ধ হইয়া আছে মহাকালের মধ্যে।

কালে যাহা সত্য, স্থানেও তাহা সত্য। কণা আছে বিপুলের মধ্যে; তাই কবি কালের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দেখিলেন ইতিহাসবিশ্রুত কাহিনী ও অশ্রুত লোক-কথাকে এবং স্থানের মধ্যে 'কণিকা'র মধ্যে দেখিলেন অসীমতাকে। ভাব রূপের মাঝারে ছাড়া পাইতে চাহিয়াছিল— কালের মধ্যেও বটে, স্থানের মধ্যেও বটে।[৩]

আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি,
বাসিতে পারি যে ভালো

...

১ ভাষা ও ছন্দ—কাহিনী (১৩০৬), পৃ ৪৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৫, পৃ ৯৩।

২ কথা ২০...কথা কও, কথা কও। উৎসর্গ, দ্র. কথা রবীন্দ্র-রচনাবলী ৭, পৃ ৯।

৩ কণিকা ২১...হায়, গগন নহিলে...উৎসর্গ ১২, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ২৩-২৪। কাব্যগ্রন্থ, ষষ্ঠ ভাগ।

ছোটো হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি,
তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব
হাসির মতন করি।

এই হইল যথার্থ বিপুল ও ক্ষুদ্রের ভেদ, মহৎ ও ক্ষীণের পার্থক্য। বিপুল ও মহৎকে ভরিয়া আছে ক্ষুদ্র বা ক্ষীণ; কণা ছাড়া বিপুল কোথায়? ক্ষুদ্রকে বাদ দিয়া মহৎকে দেখা যায় না। কণা ক্ষুদ্র হইলেও তদপেক্ষা ক্ষুদ্র কণিকা তাহারই মধ্যে নিহিত আছে, বিপুল বিশ্ব বৃহৎ হইলেও বিপুলতর মহাবিশ্বের নিকট ক্ষুদ্র। সুতরাং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আপেক্ষিকত্বের দ্বারা সম্যকভাবে বোধগম্য।

কাল ও স্থানের মধ্যে জীবের সৃষ্টি ও স্থিতি। কাল ও স্থানের অন্তরালেই 'মরণ'[১] বা প্রলয় আছে অপেক্ষা করিয়া। কালের মধ্যে যেমন—

সমুখে যেমন পিছেও তেমন,
মিছে করি মোরা গোল।
চিরকাল একই লীলা গো—
অনন্ত কলরোল।

স্থানের মধ্যেও তেমনি—

ডান হাত হতে বাম হাতে লও,
বাম হাত হতে ডানে।
নিজ ধন তুমি নিজেই হরিয়া
কী যে করো কে বা জানে।

ইহাই মৃত্যুমাধুরী। কবি জীবন ও মরণকে নিরবচ্ছিন্নভাবে দেখিয়া বলিতেছেন—

এই মতো চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া, শুধু আসা।
চির দিনরাত আপনার সাথ
আপনি খেলিছ পাশা।
আছে তো যেমন যা ছিল।
হারায় নি কিছু, ফুরায় নি কিছু—
যে মরিল যে বা বাঁচিল।
বহি' সব সুখদুখ
এ ভুবন হাসিমুখ,
তোমারি খেলার আনন্দে তার
ভরিয়া উঠেছে বুক।
আছে সেই আলো, আছে সেই গান,
আছে সেই ভালোবাসা।

১ মরণ ২২…চিরকাল একই লীলা গো…(বঙ্গদর্শন ১৩০৯ পৌষ) বিশ্বদোল— উৎসর্গ ৩৮, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ৫৮। অত চুপি চুপি কেন …বঙ্গদর্শন ১৩০৮ ভাদ্র, মরণ। উৎসর্গ ৪৫। সে তো সে দিনের কথা নব নব প্রবাসেতে— প্রবাসী ১৩০৯ বৈশাখ, উৎসর্গ ৪৬, ৪৭।

এইমতো চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া, শুধু আসা।

এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টি হইতে জগৎ ও জীবনকে আজ কবি দেখিতেছেন; সেই চিরানন্দময় পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে 'নৈবেদ্য'[১] সাজাইয়া কবি গাহিলেন, "প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর"।

কবির সমস্ত জীবনদর্শনের মূলে এই বিশ্বাসই রহিয়াছে যে, তাঁহার জীবনের ভিতর দিয়া তাঁহার দেবতা লীলা করিতেছেন; ইহাকেই তিনি 'জীবনদেবতা' বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন। গীতাঞ্জলিতে কবি গাহিয়াছেন, "জানি জানি কোন্ আদিকাল হতে ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে"— তেমনি কবিজীবনের 'যাত্রা' হইতে 'জীবনদেবতা'র[২] দিকেই ছিল প্রাণের টান। তাঁহার সমস্ত কাব্যধারা সবে আসিয়া থামিয়াছে এই কবিতাগুচ্ছের ও তাহার প্রবেশকে; সমস্ত কবিতাটির মধ্যে জীবনপথের কাহিনী ও তাহার অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে ছত্রে ছত্রে, স্তবকে স্তবকে।

আজ মনে হয়, সকলেরি মাঝে
তোমারেই ভালোবেসেছি।
জনতা বাহিয়া চিরদিন ধরে
শুধু তুমি আমি এসেছি।

...

কত যুগ এই আকাশে যাপিনু
সে কথা অনেক ভুলেছি।
তারায় তারায় যে আলো কাঁপিছে
সে আলোকে দোঁহে দুলেছি।

...

এই প্রাণে-ভরা মাটির ভিতরে
কত যুগ মোরা জেগেছি,
কত শরতের সোনার আলোকে
কত তৃণে দোঁহে কেঁপেছি।

...

প্রাচীন কালের পড়ি ইতিহাস
সুখের দুখের কাহিনী—
পরিচিতসম বেজে ওঠে সেই
অতীতের যত রাগিণী।

...

প্রাণে তাহা কত মুদিয়া রয়েছে
কত বা উঠিছে মেলিয়া—

১ নৈবেদ্য ২৩...প্রতিদিন তব গাথা। দ্র. নৈবেদ্য ১৯, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৮, পৃ ২২। রোগীর শিয়রে রাত্রে; কাল যবে সন্ধ্যাকালে; নানা গান গেয়ে ফিরি। দ্র. উৎসর্গ সংযোজন ৫ ৬ ও ৭ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ৮৪-৮৫।

২ জীবনদেবতা ২৪...আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে...উৎসর্গ ১৩, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ২৪।

পিতামহদের জীবনে আমরা
দুজনে এসেছি খেলিয়া।
...
হে চির-পুরানো, চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিয়া।
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর,
রবে চিরদিন ধরিয়া।

আমরা যাহা বলিতে চেষ্টা করিলাম, সংক্ষেপে তাহা পুনরায় বলিলে বিষয়টি স্পষ্টতর হইবে। জীবনের যাত্রাপথে হৃদয়ারণ্যের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া কবি অশেষ দুঃখ পান ; তথা হইতে নিষ্ক্রমণের পর বিরাট বিশ্ব তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিল। সুন্দরের আহ্বানে চিত্ত চঞ্চল হয়, মন ভাসে স্বপনের মাঝে সোনার তরীতে। কবি অচিরেই আবিষ্কার করেন এ-সব মরীচিকা আকাশকুসুম। সত্যকার বিশ্ব চোখে পড়ে যখন লোকালয়ে প্রবেশ করেন, মানুষ সেখানে সত্যমূর্তি, নারী সেখানে কল্পনা নহে। নারীর কল্পনায় তাহারই লীলাকৌতুকে যৌবনস্বপ্ন উঠে শিহরিয়া— নারীর প্রেমের জন্য চিত্ত হয় ব্যাকুল। কবি আনন্দচিত্তে সংসারে মগ্ন হইলেন, প্রকৃতির বাস্তব সৌন্দর্যমধ্যে আজ তিনি আত্মস্থ ; কিন্তু অকস্মাৎ সংসারের উপর দেবতার বজ্র পড়িল ; হতভাগ্যের সকল স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। তখন কবির সংকল্প হইল বৃহতের নিকট আত্মসমর্পণ করিবেন, স্বদেশের জন্য কাজ করিবেন ; স্বদেশের প্রাচীন তপোবন তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, দেশের শোভা ও বিশ্বশোভা অন্তরের মধ্যে মিশিয়া গেল। কিন্তু বর্তমানের বাস্তব মূর্তি ও অতীতের আদর্শ রূপ কবিচিত্তের সৌন্দর্যবোধের পরিপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাকে মিটাইতে পারে না ; তাই কবির অন্তরের বেদনা প্রকাশ পাইল 'রূপকে'। কবির আর-একটি সত্তা ভাবকে চায় রূপান্তরিত করিতে। তাই সে কাহিনী ও কথার আশ্রয়ে স্বদেশের স্বরূপটি দেখায়। মানুষকে, তাহার ইতিহাসকে দেখে অনাদিকালের মধ্যে ; তেমনি স্থানকে দেখে অসীমতার মধ্যে ; কণাটুকুও অসীমের অন্তর্গত— অগণিত কণায় অনন্ত গঠিত। স্থান কাল ও পাত্র সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে মরণ ; এই মরণসাগর পারে আছেন পরমাত্মা যাঁহার উদ্দেশে কবি তাঁহার 'নৈবেদ্য' অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছেন। এই সমস্তকে যিনি যুগে যুগে গ্রথিত করিয়াছেন, তাঁহাকে কবি বলিয়াছেন 'জীবনদেবতা'। সকল অবস্থায় কবির মনে এই ভরসা ছিল যে, একটি অদৃশ্য শক্তি তাঁহাকে প্রতিনিয়ত সফলতার মধ্যে লইয়া যাইতেছেন।

মানুষের দিকে তাকাইয়া কবির মনে হয়— ততঃ কিম্। জীবননাট্যের অর্থ কি কিছুই নাই।—

আলোকে আসিয়া এরা লীলা করে যায়,
আঁধারেতে চলে যায় বাহিরে।
ভাবে মনে বৃথা এই আসা আর যাওয়া,
অর্থ কিছুই এর নাহি রে।
কেন আসি, কেন হাসি,
কেন আঁখিজলে ভাসি,
কার কথা বলে যাই,
কার গান গাহি রে—
অর্থ কিছুই তার নাহি রে। —উৎসর্গ ৩৭

কবির উপদেশ যে, যদি ইহার অর্থ বুঝিতে হয় তবে—

…বাহিরেতে আয়,
খেলা ছেড়ে আয় খেলা দেখিতে।

জীবনযাত্রায় সকলেই পথিক। জীবনের রঙ্গভূমি হইতে আপনাকে সরাইয়া না আনিলে, জনতা হইতে বাহির হইয়া না আসিলে, এই বিশ্বনাট্যে বিশ্বকর্মার প্রাণলীলার অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। কবি বহুকাল পরে 'গীতালি'তে গাহিয়াছিলেন, "আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া, বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া"।

এই হাসি-রোদনের মহানাটকের
অর্থ তখন কিছু বুঝিবি।
একের সহিত একে
মিলাইয়া নিবি দেখে,
বুঝে নিবি, বিধাতার সাথ নাহি যুঝিবি—
দেখিবি কেবল, নাহি খুঁজিবি।

কাব্যগ্রন্থের[১] প্রবেশক কবিতাগুলির মধ্যে কবি তাঁহার কাব্যজীবনের অভিব্যক্তি ও অনুভূতি ব্যক্ত করিলেন। সমস্তগুলি কবিতাই জীবনদেবতাকে আহ্বান করিয়া রচিত। কবি তাঁহার জীবনে একটা স্পষ্ট দ্বৈতশক্তি অনুভব করেন, সেই যে শক্তি তাঁহার বাহিরে, অথচ অন্তরকে টানিতেছে, তাহারই উদ্দেশে কবি বলিতেছেন—

ওহে অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াস
আসি অন্তরে মম;

"কাহাকে লইয়া তিনি মিলন-উৎসবে মগ্ন এবং কে তাঁহার মুখের ভাষা কাড়িয়া কথা কহিয়াছেন—'মিলায়ে আপন সুরে'। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেই এই জীবনদেবতার সহিত বিশ্বদেবতার সৌসাদৃশ্য কল্পনা করিবেন। কিন্তু ইহাকে বিশ্বদেব বলিলে কবির আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভোগের যথার্থ তাৎপর্য বুঝা যায় না"।[২]

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "আমাদের অন্তরতম প্রকৃতি সমস্ত সুখদুঃখের ভিতর দিয়া একটি বৃদ্ধি অনুভব করিতে থাকে। আমাদের ক্ষণিক জীবন এবং চিরজীবন দুটো একত্র সংলগ্ন হয়ে আছে; কিন্তু দুটো এক নয়, এ আমি মাঝে মাঝে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারি।"[৩]

এই যুগের কবিতাগুলি তাঁহার জীবনদেবতার সহিত বিচিত্র লীলারহস্যসম্ভোগের প্রকাশ। সমগ্র কাব্যখণ্ড আলোচনা করিতে গিয়া কবি নিজেই আশ্চর্য হইয়া ভাবিতেছেন, এসব কি তাঁহার রচনা, না, আর কেহ অন্তর হইতে

১ কাব্যগ্রন্থের অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি—
স্মরণ ২৫…(৭ই অগ্রহায়ণ ১৩০৯)…প্রবেশক কবিতা নাই। কাব্যগ্রন্থ সপ্তম ভাগ।
শিশু ২৬…জগৎ পারাবারের তীরে…দ্রষ্টব্য শিশু, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯, পৃ ৫। কাব্যগ্রন্থ অষ্টম ভাগ।
গান ২৭…প্রবেশক কবিতা নাই। কাব্যগ্রন্থ নবম ভাগ।
নাট্য ২৮…আলোকে আসিয়া এরা…উৎসর্গ ৩৭, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ৫৭।
ক সতী, নরকবাস, গান্ধারীর আবেদন, কর্ণকুন্তী-সংবাদ, বিদায়-অভিশাপ, চিত্রাঙ্গদা, লক্ষ্মীর পরীক্ষা।
খ নাট্য…প্রকৃতির প্রতিশোধ, বিসর্জন, মালিনী।
গ নাট্য…রাজা ও রানী।

২ কাব্যগ্রন্থ প্রথম ভাগ, ভূমিকা, মোহিতচন্দ্র সেন।

৩ ছিন্নপত্র ১২৩। ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪।

বাঁশি বাজাইয়াছে, তাঁহার মধ্য দিয়া কেবল ধ্বনি ও সুর বাহির হইয়াছে। আর-একখানি পত্রে লিখিয়াছেন— "যে-আমাকে লোকে প্রশংসা করছে, সেই আমিই যে কবিতা লিখে থাকি, এ আমার সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমি জানি যেসমস্ত ভালো কবিতা আমি লিখেছি, সে আমি ইচ্ছা করলেই লিখতে পারি নে— তার একটা লাইন হারিয়ে গেলেও বহু চেষ্টায় সে লাইন গড়তে পারি কি না সন্দেহ"— ১৮৯৫ সেপ্টেম্বর ২৯। কবি এইমাত্র জানেন যে, সময়ে সময়ে আশাতীত সৌভাগ্যের ন্যায় তাঁহার চিত্তে তাঁহার জীবনদেবতার সৌন্দর্য প্লাবিত হয় এবং তিনিই বিচিত্ররূপিণী হইয়া তাঁহাকে 'সুখের ব্যথায়' উদ্‌ভ্রান্ত করেন। তাঁহাকে তিনি 'শতজনমের চিরসফলতা' বলিয়াছেন এবং তাঁহারই সহিত 'অচ্ছেদ্য মিলন' কামনা করিয়াছেন।

আমাদের মনে হয়, কবি যখন এইভাবে নিজেকে জীবনদেবতার বাঁশির ন্যায় কল্পনা করিয়া আপনার কাব্যকে দেখিতেছিলেন, তখনই বা তাহার কিছুকাল পরে লেখেন 'আত্মকথা', যাহা 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে প্রকাশিত হয় (১৩১১ ভাদ্র)। সেই প্রবন্ধটিতে জীবনদেবতা তাঁহার জীবনে কিভাবে সফল হইয়াছে, তাহারই কথা আছে।

সতীশচন্দ্র রায়

মধ্যমা কন্যা রেণুকার মৃত্যুর কয়েক দিনের মধ্যেই কবি ছেলেমেয়েদের লইয়া শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন— বিচ্ছিন্ন সংসার জোড়া দিতে আবার চেষ্টা করিতেছেন। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইতে প্রায় দুই বৎসর গত হইয়াছে; এই সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে দীর্ঘকাল একটানা বাস করিবার অবসর খুব কমই পাইয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতি-কালে কখনো অধ্যাপকদের কমিটির উপর কখনো বা অধ্যাপকদের মধ্যে একজনের উপর, কখনো বা শান্তিনিকেতনের বাহিরের লোকের কমিটির উপর রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আশা করিতেন যে কার্য সহজভাবেই চলিবে; তজ্জন্য বিস্তৃত নিয়মাবলীও প্রণয়ন করিয়া দিতেন। কিন্তু কবির স্বপ্নের সহিত বাস্তবের যোগ কখনো সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। তাঁহার সক্রিয় চলমান মনের অস্পষ্ট আদর্শকে মূর্তি দান করিবার জন্য বারে বারে নূতন কর্মীরা আসিয়াছেন গিয়াছেন। তিনি মনে করিতেন যে, নূতন মানুষের মাঝে হয়তো মহাশক্তি সুপ্ত আছে। তিনি আশা করিতেন কর্মীদের নির্জীবতা বা আদর্শহীনতা তাঁহার ঐকান্তিক সদিচ্ছার বলে ও পত্র মধ্যে লিখিত যুক্তির বলে দূরীভূত হইবে এবং তাঁহার কর্মের মহৎ আদর্শের মধ্যে তাঁহাদের চিত্ত উদ্‌বুদ্ধ হইবে। কিন্তু 'নূতন' পুরাতন হইতে-না-হইতেই দেখিতেন যে তাঁহারাও আর-পাঁচজনের মতই রক্তমাংসে গড়া, ভুলভ্রান্তিতে ভরা সাধারণ মানুষ— আদর্শবোধের ক্ষমতাও তাঁহাদের অসামান্য নহে।

এই ভাঙা-গড়া, আসা-যাওয়া, হওয়া-না-হওয়ার সংগ্রামের মধ্যে কবি নিজে কোনোদিন আদর্শ সম্বন্ধে বিশ্বাস হারান নাই। তিনি একখানি পত্রে লিখিতেছেন (২ আশ্বিন ১৩১০। স্মৃতি) "প্রতিদিনই আমি এই বিস্ময় অনুভব করিতেছি যে, সমস্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়া বিদ্যালয় নবতর প্রাণ ও প্রবলতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে।··· আজ আপনি ইহার অভ্যুদয়জ্যোতি দেখিতে পাইতেছেন না কিন্তু আপনারা নিঃসংশয় হইবেন এমন দিনও আসিবে।··· ইহার ভার যদি ঈশ্বর আমার উপর দিয়া থাকেন তবে সমস্ত বিঘ্ন বিপদের মধ্যে তিনি ইহাকে সফলতা দিবেন— এ ভার যদি অপহরণও করেন তবু আমার কিছুদিনের এই চেষ্টা ব্যর্থ হইবে না।" এই বিশ্বাস-বলেই তিনি সকল প্রতিকূলতার মধ্যে নিজ আদর্শকে ম্লান হইতে দেন নাই।

এবার আশ্বিনের প্রথম দিকেই বিদ্যালয়ে শারদীয় ছুটি হইল, কারণ সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি দুর্গাপূজা। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আসিয়া লিখিতেছেন (২১ আশ্বিন ১৩১০) "আমি বিশ্রাম করিতেছি। বেশি কিছু কাজ নাই— ভিতরের স্টীম বন্ধ করিয়া দিয়াছি— কলম আর চলিতেছে না— এক ঘণ্টা ছেলেদের পড়াই তার পরে পড়ি, চুপচাপ

করিয়া থাকি, গল্পসল্পও করি— একরকম কাটিয়া যায।" তাঁহার ইচ্ছা কার্তিক মাসে "ইস্কুল খুলিলে পর মাসখানেক বিদ্যালয়ের সমস্ত বন্দোবস্ত পাকা করিয়া দিয়া অগ্রহায়ণের প্রারম্ভে একবার পদ্মার হস্তে" আপনার শুশ্রূষার ভার অর্পণ করিবেন।[১]

ছুটির মধ্যে বিদ্যালয় সম্বন্ধে অনেক কিছু জল্পনাকল্পনা চলিতেছে; মোহিতচন্দ্র সেন তখনো বিদ্যালয়ের কার্যে যোগদান করেন নাই; তবে দূর হইতেই কবিকে গত জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে নানা বিষয়ে সাহায্য ও পরামর্শ দিতেছেন। কবিও তাঁহাকে যথাসত্বর আশ্রমে আসিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। "আপনি কবে আসবেন আমি তার জন্যে পথ চেয়ে আছি। আমার চিত্ত ক্ষুধাতুর।…আমি অবলম্বনের জন্য উৎসুক— বন্ধুর মধ্যে ঈশ্বরের বন্ধুত্ব প্রত্যক্ষ অনুভব করতে আমি ব্যাকুল। আমাকে আপনি মঙ্গলের সরল পথে সর্বদা প্রবৃত্ত রাখবেন।"[২] কিন্তু তখনই মোহিতচন্দ্রের পক্ষে বিদ্যালয়ের কাজে যোগদান করা সম্ভব হয় নাই।

অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি কবি 'নিরুদ্দেশ হইয়া বাহির হইয়া' পড়িলেন, ভাবিলেন 'ডাকঘরের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখিবেন না'।[৩] প্রিয়নাথকে লিখিতেছেন[৪] "কিছুদিন অজ্ঞাতবাসের জন্য মনটা উৎসুক আছে— তাই সমস্ত কর্মের হাল কাটিয়া পদ্মায় ভাসিয়া পড়িয়াছি।"

পৌষ উৎসবের দুইদিন পূর্বে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। মহর্ষির ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথ উৎসবে আচার্যের কার্য করেন। দিন পনেরো আশ্রমে থাকিয়া ২১ পৌষ (১৩১০) কলিকাতায় গেলেন[৫] ও সেখান হইতে অনতিকালের মধ্যেই শিলাইদহ চলিলেন, ছেলেমেয়েরা সেখানেই, শীতের ছুটি চলিতেছে। মাঘোৎসবের দুই দিন পূর্বে কবি কলিকাতায় আসিলেন।[৬] উৎসবে 'মনুষ্যত্ব'[৭] সম্বন্ধে ভাষণ দান ও পরদিন সিটি কলেজে 'ধর্মপ্রচার'[৮] শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এদিকে মাঘ মাসের মাঝামাঝি শীতাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিলে রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে ফিরিবেন, এই ছিল কথা। ইতিমধ্যে বোলপুর হইতে সংবাদ পাইলেন যে, সেখানে সতীশচন্দ্র রায়ের বসন্ত বা গুটিকারোগ হইয়াছে। শান্তিনিকেতন যাওয়া মুলতুবি রহিল। অধ্যাপক ও অভিভাবকগণকে পত্র দেওয়া হইল যে, বিদ্যালয় শান্তিনিকেতনে বসিবে না, শিলাইদহে যাইবে। কবিও অচিরে শিলাইদহে ফিরিয়া গেলেন।

শীতকালের ছুটি হইলে সেবার সতীশচন্দ্র দিনেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কয়েকজন আশ্রমবাসী উত্তরভারত-ভ্রমণে গিয়াছিলেন; পথে সতীশের জ্বর হইলে সকলে দিন আষ্টেকের মধ্যে দিল্লী আগ্রা গয়া কাশী ঘুরিয়া বেড়ান; ১৫ জানুয়ারির মধ্যে বোলপুর ফিরিয়া আসেন; এখানে আসিয়া সতীশচন্দ্র 'তাজমহল' শীর্ষক কবিতা লিখিয়াছিলেন, সেটি এক পত্র লিখিয়া কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠাইয়া দেন। বোলপুরে ফিরিয়া আসিবার কয়েক দিনের মধ্যে সতীশের গুটিকারোগ দেখা দিল। দিনেন্দ্রনাথ আশ্রমে থাকিয়া বন্ধুকে শুশ্রূষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলে কলিকাতা হইতে জরুরি টেলিগ্রাম আসিল, তাঁহাকে কলিকাতা ফিরিয়া যাইতে হইল। বিদ্যালয়ের শীতের ছুটিতে ছাত্র অধ্যাপক কেহই নাই; কেবল

১ পত্রাবলী। মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত। ২১ আশ্বিন ১৩১০ (৮ অক্টোবর ১৯০৩)। বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৪৯ শ্রাবণ, পৃ ৩৫।
২ পত্রাবলী। ১৮ কার্তিক ১৩১০। বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৪৯ চৈত্র, পৃ ৫৬৪।
৩ স্মৃতি, পৃ ৪২। শিলাইদহ ২৮ অগ্রহায়ণ ১৩১০।
৪ আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৫২ শারদীয়া সংখ্যা। রবীন্দ্রনাথের চিঠি ৩২ সংখ্যক। কুমারখালি ২১ অগ্রহায়ণ ১৩১০।
৫ পত্রাবলী। ৩ জানুয়ারি, ১৯০৪ [রবিবার ১৯ পৌষ ১৩১০]। বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৪৯ চৈত্র, পৃ ৫৬৫।
৬ স্মৃতি, পৃ ১৯। ৩০ পৌষ ১৩১০। এই পত্রে আছে যে তিনি ৯ই মাঘ কলিকাতায় আসিবেন, রথীন্দ্ররা ১৭।১৮ই মাঘ ফিরিবে।
৭ মনুষ্যত্ব। ১১ই মাঘ ১৩১০ ভাষণ। বঙ্গদর্শন ১৩১০ ফাল্গুন, দ্র. ধর্ম, রবীন্দ্ররচনাবলী ১৩। পৃ ৩৪৮-৩৫২।
৮ ধর্মপ্রচার (১২ মাঘ ১৩১০) বঙ্গদর্শন ১৩১০, ফাল্গুন। দ্র. ধর্ম, রবীন্দ্ররচনাবলী ১৩, পৃ ৩৭৬-৩৮৩।

আছেন রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়[১] নামে একজন পরিদর্শক ও আর আছে কোদো মহাতো নামে ভৃত্য এবং বৃদ্ধ হরিশ মালি। ইহারাই সতীশের সেবা ও শেষকৃত্যাদি করে। মাঘীপূর্ণিমার[২] (১৩১০) দিনে সতীশের মৃত্যু হইল; লাইব্রেরি-অফিসের পশ্চিমের ছোট ঘরে তাঁহার দেহান্ত হয়।

সতীশচন্দ্র ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথকে যেসব কবিতা ও পত্রাদি পাঠাইয়াছিলেন, তাহা সতীশের মৃত্যুর পর কবি বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করেন। তাঁহার এই তরুণ বন্ধুকে কী শ্রদ্ধা ও স্নেহের চোখে দেখিতেন, তাহা তিনি বহুস্থানে বহুভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। সতীশের মৃত্যুর পর কবি যে প্রবন্ধ[৩] লিখিয়া তাঁহার শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন, তাহার মধ্যে এক স্থানে আছে, "এই আশ্রমের এক প্রান্তে বিদ্যালয়ের মৃণ্ময় কুটীরে সতীশ আশ্রয় লইয়াছিল। সম্মুখের শালতরুতলে যে কঙ্করখচিত পথ আছে, সেই পথে কতদিন সূর্যাস্তকালে তাহার সহিত ধর্ম সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে এবং জনশূন্য প্রান্তরের নিবিড় নিস্তব্ধতার ঊর্ধ্বদেশে আকাশের সমস্ত তারা উন্মীলিত হইয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথ এই সতীশচন্দ্রকে কালে ধীরে আদর্শায়িত করিয়া নিজ মনোরাজ্যের কল্পলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছিলেন; সেখানে সে রক্তমাংসের মানুষ নহে, সেখানে সে আইডিয়ারূপে নবকলেবর ধারণ করিয়াছিল। বহু বৎসর পরে 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' সম্বন্ধে আলোচনাকালে এই তরুণ তাপসটির কথা স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "যে-ভাবরাজ্যে তিনি সঞ্চরণ করতেন সেখানে তাঁর জীবন পূর্ণ হত প্রতিক্ষণে প্রকৃতির রসভাণ্ডার থেকে। আত্মভোলা মানুষ, যখন-তখন ঘুরে বেড়াতেন যেখানে-সেখানে। প্রায় তাঁর সঙ্গে থাকত ছেলেরা, চলতে চলতে তাঁর সাহিত্য-সম্ভোগের আস্বাদন পেত তারাও।··· আশ্রমে যারা শিক্ষক হবে তারা মুখ্যত হবে সাধক, আমার এই কল্পনাটি সম্পূর্ণ সত্য করেছিলেন সতীশ।"[৪]

এই তরুণ বন্ধুটির কথা কাব্যের মধ্যেও প্রকাশ পাইয়াছে। 'শাল'[৫] নামে কবিতায় কবি লিখিয়াছেন—

...ওই ধ্বনি স্মরণে জাগায়ে তোলে
কিশোর বন্ধুরে মোর। কতদিন এই পাতা-ঝরা
বীথিকায়, পুষ্পগন্ধে বসন্তের আগমনী-ভরা
সায়াহ্নে দুজনে মোরা ছায়াতে অঙ্কিত চন্দ্রালোকে
ফিরেছি গুঞ্জিত আলাপনে। তার সেই মুগ্ধ চোখে
বিশ্ব দেখা দিয়েছিল নন্দনমন্দার রঙে রাঙা।
যৌবনতুফান-লাগা সেদিনের কত নিদ্রাভাঙা
জ্যোৎস্নামুগ্ধ রজনীর সৌহার্দ্যের সুধারসধারা
তোমার ছায়ার মাঝে দেখা দিল, হয়ে গেল সারা।

এই অসামান্য যুবক সম্বন্ধে তাঁহার বন্ধু ও সহপাঠী অজিতকুমার লিখিয়াছেন যে, সতীশচন্দ্র 'আশ্চর্য বোধশক্তি ও কল্পনাশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সাহিত্যের রসসমুদ্রের মধ্যে তিনি অহোরাত্র ডুবিয়া থাকিতেন···

১ রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়াবাসী। ইনি বহুকাল আশ্রমের সেরেস্তায় কাজ করেন।

২ ১৩১০ মাঘ ১৮ [১৯০৪ ফেব্রুয়ারি ১]। আশ্রমে বহুকাল এই দিনটিকে একটি সাহিত্যসভার অনুষ্ঠান দ্বারা স্মরণ করা হইত।

৩ বঙ্গদর্শন ১৩১০ চৈত্র। বিচিত্র প্রবন্ধ, প্রথম সংস্করণ।

৪ আশ্রমের রূপ ও বিকাশ। বিশ্বভারতী বুলেটিন নং ২৯। ১৩৪৮ আষাঢ়। পুস্তিকাকারে প্রকাশ ১৯৫১।

৫ ৮ ফাল্গুন ১৩৩৪। বনবাণী, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, পৃ ১৩০-১৩২।

ব্রাউনিঙ-এর কবিতা সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তাঁহার আলোচনা পাঠ করিলে সেই আশ্চর্য রসগ্রাহিতার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যের···ভাবরসকে তিনি অপর্যাপ্ত অফুরন্ত উপভোগ করিতেন বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যে।··· সতীশ এমন প্রবল ভোগী ছিলেন, অথচ আত্মত্যাগ তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ ছিল।' তিনি দরিদ্র ছিলেন ও তাঁহার আত্মীয়স্বজন আশা করিয়াছিলেন তিনি বি. এ. পাস করিয়া দরিদ্র পরিজনের দুঃখ দূর করিবেন।[১] অথচ রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জীবনের সমস্ত ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দিয়া শান্তিনিকেতনের কার্যে যোগদান করিলেন ও তথায় আসিয়া আপনাকে নিঃশেষে দান করিলেন।

সতীশচন্দ্রের শিক্ষাদানপদ্ধতি সম্বন্ধে অজিতকুমার লিখিয়াছেন, "তাঁহার অধ্যাপনা তেজে আনন্দে আবেগে এমনি পরিপূর্ণ ছিল যে, তাহা ভাবসৃষ্টিরই মতো বোধ হইত।···পুঁথির শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়মনের সত্য উদ্‌বোধন-কার্য যাহাতে হয় সেই দিকে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল। সতীশের অধ্যাপনায় সেই কাজটি হইত। তিনি বাংলা পড়াইতেন—যেখানেই রচনার মধ্যে কোনো বর্ণনার আভাস আছে সেখানে তাহার স্ফুটনে বালকদিগকে লাগাইতেন, ···ছন্দ শুনাইয়া ছন্দোবোধ এবং ছন্দ-রচনায় তাহাদের উৎসাহিত করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করাইয়া দিতেন। ভাষার মধ্যে প্রত্যেক শব্দের ধাতুগত অর্থ এবং ক্রমে ক্রমে ব্যবহারে তাহার অর্থের বিকাশ কিরূপে সংঘটিত হইয়াছে তাহা জানাইয়া দিতেন। সাহিত্য পড়াইতে গেলে যে তাহার ভিতরের আসল জিনিস রসবোধ কী করিয়া সঞ্চারিত করিতে হয় তাহা ইনি জানিতেন আশ্চর্যরূপে। প্রকৃতিগ্রন্থেও ছাত্রদের অভিনিবিষ্ট করিতে এই প্রকৃতির ভক্তটি ওস্তাদ ছিলেন। তাহাদের কাছে প্রকৃতির একটি রূপও অগোচর থাকিত না; প্রতিদিনের আবহাওয়া— সূর্যোদয় সূর্যাস্ত, চন্দ্রোদয়, গ্রহনক্ষত্রের সংস্থান, মেঘবৃষ্টি, ফুলফলের উন্মীলন, পক্ষিপরিবারের নানা কথা, সমস্তই চোখের সামনে মেলা ছিল।···বর্ষায় তাহারা বাহির হইত, জ্যোৎস্না-রাত্রে কে তাহাদের ঘরের মধ্যে রাখিবে? বৈশাখের ঝড়ে তাহারা ধুলায় গড়াগড়ি যাইত। তিনি তাহাদের উপভোগকে কল্পনাকে হৃদয়কে এমনি করিয়া জাগাইয়াছিলেন। 'গুরুদক্ষিণা' যদি কেহ ভালো করিয়া পড়েন তবে এই কথার পরিচয় তিনি নিশ্চয়ই পাইবেন, কারণ ও বইটি যেন আশ্রমেরই স্বহস্তের রচনা।"[২]

মোহিতচন্দ্র সেন

আশ্রমের মধ্যে বসন্তরোগে সতীশের মৃত্যু হইলে, সেখানে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের আনা সমীচীন নহে বুঝিয়া শীতের ছুটির পর শিলাইদহে বিদ্যালয় স্থানান্তরিত করা স্থির হইল। মাঘ মাসের শেষে ছাত্র ও অধ্যাপকগণ শিলাইদহে সমবেত হইলেন।[৩] তখন অধ্যাপক ছিলেন—জগদানন্দ রায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নগেন্দ্রনারায়ণ রায় ও ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল। নূতনদের মধ্যে আসিলেন মোহিতচন্দ্র সেন ও নগেন্দ্রনাথ আইচ; নগেন্দ্রনাথ হুগলির নর্মাল ত্রৈবার্ষিক উত্তীর্ণ যুবক—কাজেকর্মে অসাধারণ উৎসাহ। শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে ছাত্র অধ্যাপকরা উঠিলেন। কবি আছেন নৌকায় পদ্মার উপর।

১ সতীশচন্দ্র উতঙ্কের উপাখ্যান কেন্দ্র করিয়া 'গুরুদক্ষিণা' নামে বালকদের উপযোগী গল্পের বহি লিখিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর উহা রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাসহ মুদ্রিত হয়। আশ্রমে ঐ বই বহুকাল পাঠ্য ছিল। এই গ্রন্থের উপস্বত্ব সতীশচন্দ্রের বিধবা পত্নী ও এক মূকবধির কন্যার জন্য প্রদত্ত হইত।

২ অজিতকুমার চক্রবর্তী, ব্রহ্মবিদ্যালয়, পৃ ২০-২৪।

৩ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠি। শিলাইদহ। ৭ই ফাল্গুন ১৩১০। পূর্বাশা রবীন্দ্র-স্মৃতি, পৃ ১১২। "সম্প্রতি বোলপুর বিদ্যালয়ের একটি অধ্যাপকের বসন্তরোগে বিদ্যালয়গৃহে মৃত্যু হওয়ায় আমাদের সমস্ত ইস্কুলটি শিলাইদহে আনিয়াছি সে খবর বোধহয় পাইয়াছ। ইহাতে বিস্তর ব্যয় ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে—তাহাই লইয়া এখনো বিব্রত আছি। ১৫ই বৈশাখ [১৩১১] পর্যন্ত বিদ্যালয় এখানে থাকিবে।"

মোহিতচন্দ্র সেন হেডমাস্টার হইয়া আসিলেন।[১]

মোহিতচন্দ্র যখন শিলাইদহে এই বোর্ডিংস্কুলের ভার গ্রহণ করিলেন তখন উহা যথার্থভাবে না-আশ্রম না-স্কুল; তিনিই একে একটি সম্পূর্ণ বিদ্যায়তনের মূর্তি দান করিলেন। তাঁহার চেষ্টায় বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা বাড়িল, পরিচালনাব্যাপারে নিয়মনিষ্ঠা দেখা গেল, পঠনপাঠন বিধিবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলিত হইল। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এতদিনে রূপ লইল। বিদ্যালয়ের কর্মভার গ্রহণ করিয়া মোহিতচন্দ্র ছাত্রদের উন্নতির জন্য রবীন্দ্রনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া নূতন রকম কর্মপদ্ধতি উদ্‌ভাবিত করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্র-পরিচালনা সম্বন্ধে বহুবিধ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, শিলাইদহেও হইল। এই সময়ে ভূপেন্দ্রনাথের প্রেরণায় ছাত্রদের মধ্য হইতে তিনজনকে বিশেষভাবে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করিয়া ছাত্রদের নেতা বা আদর্শ করা হইল। রবীন্দ্রনাথের নিকট সন্তোষচন্দ্রের, মোহিতচন্দ্রের নিকট রথীন্দ্রনাথের ও ভূপেন্দ্রনাথের নিকট সন্তোষ মজুমদারের মধ্যম ভ্রাতা সরোজচন্দ্রের (ভোলা) যথাবিধি দীক্ষা হইল। "ঠিক হইল ইহারা তিনজন আদর্শ জীবন যাপন করিবে এবং বিদ্যালয়ের আদর্শ যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় এজন্য এ তিনজন অন্যান্য ছাত্রদের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে ও তাহাদিগের সহিত মধ্যে মধ্যে সাধু আলোচনা করিবে।"[২] কিন্তু কোনো নিয়ম বেশিদিন চলে নাই। এ নিয়মেরও গতি তদ্রূপই হইল। ছাত্রদের মধ্যে এখানেও পানবসন্ত দেখা দিল ও বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কর্ম প্রতিহত হইল।

কবির ইচ্ছা শিলাইদহে থাকেন; এক পত্রে লিখিতেছেন, "১৫ই বৈশাখ বিদ্যালয়ের ছুটি— ছুটির একমাসও আমি এইখানে কাটাইব মনে করিতেছি।...১৫ই জ্যৈষ্ঠ আবার বোলপুর যাইব।" —স্মৃতি, পৃ ৪৬। বলা বাহুল্য, দুই মাস পূর্বের কবিকল্পনা কার্যকর হইতে পারিল না; ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতে সংবাদ আসিল মহর্ষির অবস্থা সংকটজনক, কবিকে অবিলম্বে তথায় চলিয়া যাইতে হইল।

কলিকাতায় গিয়া 'বিদ্যালয়ের অর্থসংগ্রহের একটা সুযোগ উপস্থিত' হইয়াছে বলিয়া একটি সংবাদ তিনি মোহিতচন্দ্রকে দিতেছেন। অনেকের ধারণা ব্রহ্মচর্যাশ্রম পরিচালনার সময়ে রবীন্দ্রনাথ বাহির হইতে কোনো সাহায্য পান নাই বা কোনো প্রকার সহায়তা প্রার্থনা করেন নাই; সে কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। শান্তিনিকেতনের ট্রাস্টের টাকা বিদ্যালয়ের জন্য বরাবরই আংশিক ব্যয়িত হইত। সে বিষয়ে মহর্ষির অনুমোদন পাইয়াছিলেন নিশ্চয়ই। ত্রিপুরার মহারাজের নিকট হইতে বাৎসরিক সহস্র মুদ্রা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শুরু হইতেই আসিতেছিল। মোহিতচন্দ্র সেনের এককালীন দানের কথা সুবিদিত। কয়েক মাস পূর্বে, আলমোরা হইতে ফিরিয়া আসিবার পর, মোহিতচন্দ্রকে এই অর্থসংগ্রহ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,[৩] "ময়ূরভঞ্জকে [মহারাজা] একবার আক্রমণ করব।" কিন্তু কবির ভয় পাছে রাজসাহায্যের দ্বারা তাঁহার নিজ আদর্শ আচ্ছন্ন হয়। সেইজন্য শেষ পর্যন্ত রাজদ্বারে উপস্থিত হন নাই। তিনি এই পত্রমধ্যে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, "বিদ্যালয়কে কোনোমতেই পরাধীন হতে দিলে কল্যাণ হবে না— তা হলেই সে দুর্বল হয়ে অধ্যাত্মপথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। কঠোর পথে কঠিন প্রয়াসের সঙ্গে না চললে নিদ্রার হাত থেকে আত্মরক্ষা করা শক্ত হয়ে পড়ে। আমি শান্তিনিকেতনের জাল থেকে বিদ্যালয়কে মুক্ত করে রাজ-ইচ্ছা ও রাজৈশ্বর্যের জালে যদি তাকে জড়িত করি তা হলে কি তপ্ত কটাহ হতে জ্বলন্ত চুল্লিতে পড়া হবে না? যদি আপনার কোনো বন্ধু কোনো

১ স্মৃতি, পৃ ৪৬। শিলাইদহ, ১৮ ফাল্গুন ১৩১০। "মোহিতবাবু কাজে যোগ দিয়াছেন।"

২ দেশ ১৩৪৯ শারদীয়া সংখ্যা। ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল লিখিত 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ' দ্রষ্টব্য। ভূপেন্দ্রনাথের মধ্যে এখন হইতে গুরুগিরি করিবার ভাব দেখা দেয়; পরে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করিয়া তিনি সাহেবগঞ্জে ও পুরীতে আশ্রম স্থাপন করিয়া পরিপূর্ণ গুরুপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে "ব্রহ্মচর্য্য' সুপরিচিত ছিল।

৩ পত্রাবলী। ১৮ কার্তিক ১৩১০ (১৯০৩ নভেম্বর ৪)। বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৪৯ চৈত্র পৃ ৫৬৪। ময়ূরভঞ্জের রাজা ছিলেন কেশবচন্দ্র সেনের জামাতা।

সুবিধামত জায়গার সন্ধান জানেন তাহলে খবর নেবেন। নানাদিকে দৃষ্টি না রাখলে কৃতকার্য হওয়া যাবে না।"

মোটকথা বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার অল্পকালের মধ্যেই বাহির হইতে অর্থ সাহায্য লাভের ইচ্ছা ও চেষ্টা দেখা দিয়াছিল।

এবার কলিকাতায় আসিয়া লিখিতেছেন, "বিদ্যালয়ের অর্থসংগ্রহের একটা সুযোগ উপস্থিত হয়েছে— যদি কৃতকার্য হই তবে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারবে!" বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় কবি মনে করিয়াছিলেন যে, ছাত্রদের সহিত অর্থের সম্বন্ধ রাখিবেন না; সে আদর্শ বহু পূর্বেই ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ছাত্রদত্ত বেতনে বিদ্যালয় চলে না, বাহির হইতে অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু কবির আশঙ্কা ধনের স্পর্শে পাছে আদর্শ নষ্ট হয়। তাই মোহিতচন্দ্রকে পূর্বপত্রেই পুনরায় লিখিতেছেন, "কিন্তু লোভ করব না। টাকা বেশি হাতে এলে ভাল হবে কি মন্দ হবে বলা যায় না। অধিক পরিমাণ টাকা গ্রহণ রক্ষণ ও ব্যবহার করতে যেসমস্ত কলকারখানার প্রয়োজন হয় সেগুলোর ভার সম্বরণ করা কঠিন। টাকা জিনিসটা···ছোটলোকের মত ঠেলেঠুলে সকলের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠতে চায় এবং তার খাতিরে তার চেয়ে অনেক বড়ো জিনিসের খাতির রক্ষা করা কঠিন হয়ে ওঠে। ঈশ্বর করুন, টাকার কাছে আমাদের যেন মাথা নীচু না করতে হয়।···ময়ূরভঞ্জের দ্বারে, এই কথা ভেবেই, আমি অগ্রসর হইনি। ভালো কাজেরও বৈষয়িক দিকটা ভয়ংকর—তার মধ্যেও লোভ মোহ ভ্রষ্টতা অহংকার এসে পড়ে···। আমরা দরিদ্র থেকে যা কাজ করতে পারি তাই করব···। এ বিদ্যালয়ে যে পরিমাণে টাকার সংস্রব আছে সেই পরিমাণে আমরা দুর্বল হয়ে আছি। কবে তার জাল থেকে মুক্তি পেতে পারব আমি এই কথাই ভাবি। যাই হোক, আমাদের যদি টানাটানি ঘোচে, যদি দিব্য হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠি, তবে আত্মবিস্মৃতির দিন আসবে বলে আশঙ্কা হয়। আমাদের যা-কিছু দরকার সবই আমাদের পেতেই হবে, কোনো কিছুকেই খর্ব করতে পারবো না—এ যদি হয় তা হলে ঈশ্বরের কার্যে ইস্তফা দিতে হয়।"[১]

মহর্ষির বার্ধক্যজনিত পীড়ার সংকট অবস্থা পার হইয়া গেলেই রবীন্দ্রনাথ চৈত্রের গোড়াতে শিলাইদহে ফিরিয়া গেলেন[২] ও তথায় ঐ মাসের শেষ পর্যন্ত থাকিলেন। বৎসরের শেষাশেষি কলিকাতায় গেলেন, শরীর খারাপ, প্রায়ই জর হয়।[৩] তা ছাড়া বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে পানবসন্ত সংক্রামকভাবে দেখা দেওয়ায় কাজকর্ম অত্যন্ত শিথিল হইয়া আসিয়াছিল।

শিলাইদহের বিদ্যালয় বন্ধ হইলে কবি ছেলেদের লইয়া জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলার নিকট মজঃফরপুর গেলেন।[৪] সেখানে ভালোই লাগিতেছে, দারুণ গরম— আম-লিচুর প্রত্যাশায় আছেন। সেখান হইতে কয়েক দিনের জন্য কোনো আত্মীয়ের বিবাহোপলক্ষ্যে কাশী গিয়াছিলেন।[৫] 'কাশী থেকে ফিরে এসে এ-কয়দিন চুপচাপ করে' মজঃফরপুরে আছেন।

রবীন্দ্রনাথ বহুকাল হইতে অনুভব করিতেছেন যে, নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিলেই কর্তব্য শেষ হয় না, বিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকগণের জন্য উপযুক্ত গ্রন্থাদি রচনারও প্রয়োজন। কর্মসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কাহাকেও উপদেশ দিয়া নিশ্চিন্ত হন না, স্বয়ং সেই কর্মে প্রবৃত্ত হন; তাই স্বয়ং পাঠ্যপুস্তক রচনায় নামিলেন। পাঠকের স্মরণ আছে, ইতিপূর্বে

১ পত্রাবলী। জোড়াসাঁকো: শুক্রবার। ফাল্গুন ১৯০৪। [পত্রখানির তারিখ হইবে ২৮ ফাল্গুন ১৩১০। ১৯০৪ মার্চ ১১]
বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ মাঘ, পৃ ৪৪৯।

২ স্মৃতি, পৃ ৪৭। শিলাইদহ। ৯ই চৈত্র ১৩১০।

৩ স্মৃতি, পৃ ৪৭। শিলাইদহ। ২৯শে চৈত্র ১৩১০।

৪ রবীন্দ্রনাথের চিঠি (৩৩), ১৬ই বৈশাখ ১৩১১। আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৫২ শারদীয়া সংখ্যা, পৃ ২১।

৫ সাহিত্য ১৩১০ চৈত্র, পৃ ৭৬৩।

পুত্রকন্যাদের সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের সাহায্যে দুইখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন (১৮৯৬)। বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার পর হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'সংস্কৃত-প্রবেশ'[১] লিখিবার জন্য উৎসাহ দিয়াছিলেন। ইহার ভূমিকায় কবি লেখেন "আমার গৃহে বালকবালিকাদিগকে যখন সংস্কৃত শিখাইবার সময় উপস্থিত হইল, তখন আর কোনো সুবিধা না দেখিয়া নিজে একটা সংস্কৃতপাঠ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।"[২] এইবার ইংরেজি ভাষা শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে বই লিখিতে স্বয়ং প্রবৃত্ত হইলেন। এই কার্যে তিনি মোহিতচন্দ্র সেনের সহায়তা লাভ করেন। মজঃফরপুর হইতে তিনি 'ইংরাজি সোপানে'র কাপি তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন ও revise করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন।[৩]

'ইংরাজি সোপানে'র ভাষা-শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে বৈশিষ্ট্য ছিল। কুচবিহার রাজকলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এই বই দুইখানি পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথকে যে পত্র দেন তাহাতে আছে, "আমি যতদূর জানি এইরূপ পুস্তক বাংলায় এই প্রথম মুদ্রিত হইল। ইহার প্রণালী অত্যন্ত সুসঙ্গত। Otto, Ollendorf ও Sauer প্রভৃতি ভাষা-শিক্ষাপুস্তক-প্রণেতাগণ এই প্রণালী কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বন করিয়াই কৃতকার্য হইয়াছেন। আপনার উদ্‌ভাবনী শক্তির নিকট বঙ্গদেশ চিরঋণী, এই ইংরাজিশিক্ষা-বিষয়ে আপনি পথপ্রদর্শকের কার্য করিয়াছেন।"[৪] বিদেশী ভাষা শিক্ষাদানের জন্য direct method সম্বন্ধে এ দেশে বহু আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের এই পরীক্ষাই বোধ হয় আদি প্রচেষ্টা।

এদিকে ১৫ই জ্যৈষ্ঠ বিদ্যালয় খুলিয়াছে। কবি বিদ্যালয়ের বাহিরে বাহিরে আছেন সত্য, কিন্তু বিদ্যালয় সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ উপদেশ ও নির্দেশপূর্ণ পত্র মোহিতচন্দ্রকে নিয়ত লিখিতেছেন।[৫] কোনো ছেলের কাছে টাকা পাওনা, তাহার অভিভাবককে পত্র দিতে হইবে— কোন্ ছেলেটিকে বিদায় করিতে হইবে এবং কেন করিতে হইবে, তাহার কারণ জানাইতেছেন। ছেলেদের খোসপাঁচড়া হইলে কি দায় পোহাইতে হয়, তৎসম্বন্ধে পূর্বাহ্ণে সতর্ক করিতেছেন। যাহাই হউক, বৈশাখ মাসের অধিকাংশ সময় মজঃফরপুরে, কাশীতে ও পুনরায় মজঃফরপুরে কাটাইয়া জ্যৈষ্ঠ (১৩১১) মাসের গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন ; ৩রা জ্যৈষ্ঠ মহর্ষির ৮৭তম জন্মদিন। তদুপলক্ষ্যে আত্মীয় ও সুহৃৎমণ্ডলীর নিকট পিতৃদেব সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ সুচিন্তিত নৈর্ব্যক্তিক ভাষণ দান করেন।[৬]

রবীন্দ্রনাথ যখন কলিকাতায় থাকেন, তখন বিচিত্র কর্ম তাঁহাকে অনুসরণ করে এবং তিনি স্বয়ংও বিবিধ কর্মের পশ্চাৎ ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত হন। 'কলকাতার গোলমালে পাক খেয়ে' বেড়াইতেছেন। তবে একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্য 'ভাষার ইঙ্গিত' রচনা করিয়া ১৪ জ্যৈষ্ঠ (১৩১১) তারিখে উহা সভাগৃহে পাঠ করিলেন। যথাস্থানে ইহার আলোচনা করিব।

ইহার উপর 'বঙ্গবিভাগে'র প্রস্তাব লইয়া যে অসন্তোষের মৃদু গুঞ্জন শোনা যাইতেছে, তাহাতেও কবি আছেন ; য়ুনিভার্সিটি বিল্-এর প্রতিবাদ তাঁহাকে লিখিতে হইবে।

১ স্মৃতি, পৃ ৯। ১৩০৯ কার্তিক।

২ তু, চিঠিপত্র ৬, পত্র ৪, পৃ ১০। ..."আমার পদ্ধতি মতে ...এক বৎসরের মধ্যে...সংস্কৃত ভাষায় অধিকার জন্মাবে।"

৩ পত্রাবলী। মজঃফরপুর। ২৮ বৈশাখ ১৩১১। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ চৈত্র, পৃ ৫৬৬। "অনেক জায়গায় যথেষ্ট উদাহরণ দেওয়া হয়নি সেগুলি পূরণ করবেন।"

৪ এই পত্রখানি ইংরাজি সোপান তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকাস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। দ্র, রবীন্দ্ররচনাবলী, অচ-২, পৃ ৩০৭।

৫ পত্রাবলী। মজঃফরপুর। ২৮ বৈশাখ ১৩১১। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ চৈত্র পৃ ৫৬৬। পুনশ্চ ১০ আষাঢ় ১৩১১, ঐ পৃ ৫৬৯।

৬ ভারতী ১৩১১ আষাঢ়, পৃ ২১৭-২৬। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪, পৃ ৫২৪-৩০। মহর্ষি সম্বন্ধে ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম ভাষণ।

গ্রীষ্মাবকাশের পর (১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩১১) বিদ্যালয়ের ছাত্র অধ্যাপকরা প্রায় পাঁচ মাস পরে শান্তিনিকেতনের আশ্রমে পুনরায় সমবেত হইল। শিলাইদহ হইতেই মোহিতচন্দ্র বিদ্যায়তনের সর্বময় কর্তা; বন্ধুর উপর এই কর্মভার অর্পণ করিয়া কবি ভুল করিয়াছিলেন এবং অধ্যাপক মহাশয়ের পক্ষে ব্যবহারিক জীবনে প্রতিগ্রাহী রূপে কবির নিকট কর্ম গ্রহণ করাও ভুল হইয়াছিল। যাহাই হউক, মোহিতচন্দ্রের উপর বিদ্যালয় নূতনভাবে গড়িবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা গিয়া পড়িল।

মোহিতচন্দ্র শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে রাশি-রাশি পুস্তক পাঠ করিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর সুব্যবস্থা করিবার কাজে লাগিয়া গেলেন। তিনি পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া পুঁথির শিক্ষার খুব বিস্তারিত আয়োজনের দিকে তাঁহার স্বভাবত ঝোঁক ছিল। তিনি যে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণ শিক্ষকের দ্বারা কার্যে পরিণত করাও সম্ভব ছিল না। মোহিতচন্দ্র সকল বিষয়েই খুব বড় রকমের আয়োজন করিয়া তুলিতে ভালোবাসিতেন; তাই বিদ্যালয়কে বিদ্যালয়েরই উপযুক্ত করিয়া তুলিবার জন্য উৎসুক হইলেন। বড় ছেলেদের ভর্তি করিয়া স্কুলটি হঠাৎ বড় করিয়া ফেলিলেন। কুড়ি-পঁচিশটি বিদ্যার্থীর স্থানে পঞ্চান্নটি হইয়া গেল। মোহিতবাবুকেই বিদ্যালয়ের কাজের সঙ্গে হিসাবপত্র খাওয়াদাওয়া দেখিতে হইত। দর্শনের অধ্যাপকের পক্ষে এই শ্রেণীর কার্য করা বিড়ম্বনা মাত্র। ইহার উপর সন্ধ্যাবেলায় ছিল ছেলেদের গল্পবলা ও তাহাদের ইন্দ্রিয়বোধচর্চা; বাহির হইতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে পত্র দিয়া ভাবলোকে উদ্‌বোধিত ও কর্মপথে উৎসাহিত করিতেছেন। শান্তিনিকেতনের ঘরবাড়ি তৈয়ারি সম্বন্ধে উপদেশ হইতে, আদর্শ শিক্ষক বা আচার্যের গুণ কি কি হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে নির্দেশ দিতেছেন। বিদ্যালয়ের বালকদের স্বাস্থ্যরক্ষা-সম্বন্ধে দীর্ঘ উপদেশপূর্ণ পত্রে তিনি লিখিতেছেন—

"আমার মনে হচ্ছে ছেলেদের মুখরোচক খাবারের জন্য কিছুমাত্র ভাবতে হয় না যদি তাদের best sauceএর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। খুব কসে পরিশ্রম করিয়ে ক্ষুধার মুখে বেশ সাদাসিধা খাবার দিলে সেটা রুচিকর এবং স্বাস্থ্যকর হবেই। পূর্বে ওরা যখন সকালে বিকালে খুব কসে কোদাল পাড়ত তখন খাবার নিয়ে খুঁৎ খুঁৎ করত না এবং মোটা রুটি ও ডাল আশ্চর্য পরিমাণে খেতে পারত। ওদের শরীর তখন এখনকার চেয়ে ভালো ছিল। আমার তাই মনে হচ্ছে সকালে কোনো এক সময়ে অন্তত দশ মিনিট কাল সব ছেলেকে মাটি খুঁড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে। যাতে সকলে সেটা রীতিমত করে এবং ফাঁকি না দেয় দেখবেন। বিকালে যেসব ছেলে ফুটবল না খেলবে তাদেরও এইরকম ব্যবস্থা করবেন। বৃষ্টি হলেও বাইরে খেলা বা মাটি খোঁড়া বন্ধ রাখবেন না। কারণ পরিশ্রমকালে বা বেড়াতে বেড়াতে বৃষ্টিতে ভিজলে কোনো অসুখ করে না, বরঞ্চ নিয়মিত ব্যায়ামে ব্যাঘাত হলেই অসুখ করে। দুই-একজন ছেলের এক-আধ দিন একটু-আধটু সর্দি হলেই ভয় পেয়ে যাবেন না। বরঞ্চ কড়া রৌদ্রটা খালি মাথায় ভালো নয়, রৌদ্রের সময় সব ছেলে যদি চাদরটা মাথায় পাগড়ি করে বাঁধতে শেখে তা হলে কোনো ভয়ের কারণ নেই, কিন্তু বৃষ্টির সময় বাইরে ব্যায়াম সেরে ঘরে এসে তাড়াতাড়ি গা ভালো করে মুছে শুকনো কাপড় পরলে অসুখের সম্ভাবনা নেই। অবশ্য সতর্ক হতে হবে যাতে খেলে এসে গায়ে জল না বসায়। দু-একটি করে ছেলেকে সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে যাবেন, বৃষ্টি হলে বেশ দ্রুতপদ চালনা করে চলবেন, দুচার দিন এমন করলেই রৌদ্রবৃষ্টি বেশ সয়ে যাবে। ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে বেড়ানোটা নানা কারণে বিশেষ হিতকর।"[১]

মোহিতচন্দ্রের কাজে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া কবি দূরে থাকিতে চান। মোহিতচন্দ্রের নিজ মনোমত বিদ্যালয় গড়িয়া তুলিবার পক্ষে কোনো বাধা যাহাতে সৃষ্ট না হয়, তাহাই তিনি চাহেন। বোধ হয় সেইজন্যই মোহিতচন্দ্রকে একখানি পত্রে লিখিতেছেন, 'আমি নিকটে থাকলে আপনাদের কাজে বিক্ষিপ্ততা হয়'। তাই তিনি দূরে দূরে থাকেন

১ পত্রাবলী। মজঃফরপুর। ১৮ আষাঢ় ১৩১১, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ অগ্রহায়ণ, পৃ ২৯২।

ও দূর হইতে পত্র দেন। কবি শিক্ষকদের নিকট হইতে কত বড় আশা করিতেন তাহা মোহিতচন্দ্রকে লিখিত একখানি সমসাময়িক পত্র হইতে অতি স্পষ্ট বুঝা যায়। তিনি লিখিতেছেন, "ছেলেদের নিয়মিত সাহিত্যচর্চ্চা প্রয়োজন—তার ব্যবস্থা করবেন। প্রত্যেক ছেলের সঙ্গে প্রত্যেক বিষয়েই অর্থাৎ লেখাপড়া, রসচর্চ্চা, অশনবসন, চরিত্রচর্চ্চা, ভক্তি-সাধন প্রভৃতি সব তাতেই আপনি ঘনিষ্ঠ যোগ রাখবেন— আপনি তাদের বিধাতার প্রতিনিধি হবেন। প্রত্যক্ষ আপনার সঙ্গে তাদের সর্ব্বাংশের সম্বন্ধ থাক্‌বে এই আমার ইচ্ছা— বলা সহজ করা কঠিন, তবু এইটেই আমাদের বিদ্যালয়ের একমাত্র আইডিয়াল, হৃদয়ের সাহায্যে ছেলে মানুষ করতে হয় কলের সাহায্যে নয় এইটি আদত কথা— কিয়ৎপরিমাণে কলের দরকার হয়ে পড়েই কিন্তু সে কল আপনি নন্— অন্য শিক্ষকেরা— আপনি যন্ত্রী, আপনি মানুষ।

"এই সমস্ত কথা আনুপূর্ব্বিকচিন্তা করে আপনার সমস্ত কৃত্য সবিস্তারে টুকে নেবেন এবং প্রত্যহ কাজের সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন। শিক্ষকদের যে আদেশ উপদেশ দেবেন সেটা লিখে রাখবেন এবং পালিত হচ্ছে কি না বারম্বার একটি বিশেষ নিয়মে যাচাই করে নেবেন। অর্থাৎ কোন কাজই ক্ষণিক উদ্যমে পর্য্যবসিত না হয় তাকে প্রাত্যহিক কাজে নিয়মিত চালিয়ে নেবার জন্য একটা বিধানের যন্ত্র গড়ে নিতে হবে— এবং সেই যন্ত্রের দ্বারা আর সকলকে চালনা করেও নিজেকে কোনোমতে আচ্ছন্ন করতে দেবেন না— আপনি সারথিরূপে মানুষরূপে উপরে দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন— এবং আমি অকর্ম্মণ্য সুদূরে পড়ে থাক্‌ব, মাঝে মাঝে আপনার আতিথ্য গ্রহণ করব। আমাকে টানবেন না— আপনাদের এই জগন্নাথের রথে আমি কোনো অংশই নই। আমি দূর হতে এর চালনা নিরীক্ষণ করে আপনাদের কাছে সানন্দ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করব।"[১]

গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যালয়ে অধ্যাপকদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আসিলেন না। তাঁহার স্থানে আসিলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী। আমরা পূর্বে অজিতকুমারের কথা সতীশচন্দ্র প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। অজিতকুমার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শ্রীচরণ চক্রবর্তীর পুত্র। শ্রীচরণ অল্পবয়সে মারা যান। তিনি কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক লিখিয়া যান, তাহারই সামান্য আয় হইতে তাঁহার বিধবা পত্নী সুশীলা দেবী তিনটি নাবালক পুত্রকে অতি কষ্টের মধ্যে লালনপালন করেন। অজিতকুমার আঠার বৎসর বয়সে বি. এ. পাস করেন (১৯০৪)। মোহিতচন্দ্রের অনুরোধবশত রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমারকে বিদ্যালয়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অজিতও তাঁহার বন্ধু সতীশচন্দ্রের ন্যায়, পার্থিব সুখ ও আর্থিক উন্নতির আশা ত্যাগ করিয়া শান্তিনিকেতনে যোগদান করিলেন। এই অল্পবয়সে অজিতকুমার সাহিত্য ও সাহিত্যশাস্ত্র প্রচুর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ; তদুপরি রসগ্রহণের শক্তি ছিল অসাধারণ।

অজিতকুমার সামান্য বেতনে বিদ্যালয়ের কাজে যোগদান করিলেন ও অল্পকাল পরে মাতা ও ভাইদুটিকে শান্তি-নিকেতনে আনিয়া কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। মজঃফরপুর হইতে রবীন্দ্রনাথ এই তরুণ শিক্ষকটিকে যে একখানি পত্র দেন, তাহাতে তিনি যে একটি বড় কথার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন তাহা সকল শ্রেণীর সকল লোকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ; সে কথাটি হইতেছে আনুগত্যতত্ত্ব বা loyalty। সদাই প্রশ্ন জাগে আমাদের মধ্যে আনুগত্যবোধ আছে, তাহা কি ব্যক্তিত্বের প্রতি মোহবশত না ব্যক্তির উর্ধ্বে যে আইডিয়া আছে— তাহার জন্য। রবীন্দ্রনাথ সেই সমস্যার যেন উত্তর দিতেছেন, "তোমাদের···দুরূহ কাজে প্রবৃত্ত করিয়েছি।···তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে রস জোগাচ্ছে কিসে? কাজের ভিতরকার আইডিয়াতে, না আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রীতির সম্বন্ধে, না তোমার তরুণ হৃদয়ের স্বাভাবিক আত্মোৎসর্গপরায়ণ শক্তির প্রাচুর্যে?"[২]

১ পত্রাবলী। কলিকাতা ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩১১। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ চৈত্র, পৃ ৫৬৮-৬৯।

২ পত্রাবলী। মজঃফরপুর ১২ আষাঢ় ১৩১৩। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ অগ্রহায়ণ, পৃ ২৭৬।

অনেক সময়ে কাজের ভিতরকার আইডিয়া হইতে যিনি আইডিয়া দেন তাঁহার প্রতি আনুগত্য বা মোহ আমাদের জীবনে বড় হইয়া উঠে ; তাই ব্যক্তির তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে কাজের মধ্যে শিষ্যেরা আর রস পান না। ' ইহারই ফলে একদল হন গুরুবাদী ও অপর দল হন সংঘদ্রোহী। আর ইহাদের বাহিরে যাহারা বিশুদ্ধ আইডিয়ার উপাসক তাহাদের নিকট গুরুবাক্য (word) হইতে গুরুবাণী (spirit) বেশি বড় করিয়া প্রতিভাত হয়। প্রায় সমসাময়িক একখানি পত্রে কবি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা অতি সত্য— "আমার চেয়ে আমার কাজকে যদি আপনি বড় করিয়া দেখিতেন তবে কোন সঙ্কটেই আপনি আমাকে ত্যাগ না করিয়া সত্য এবং কল্যাণের জয় প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন।"—স্মৃতি ২৩।

বিদ্যালয় বন্ধ ছিল ১৫ বৈশাখ হইতে ১৫ জ্যৈষ্ঠ। "কাজবর্গের ঘূর্ণাবর্তের টানে পড়িয়া অল্পদিনের মধ্যে বোলপুর হইতে কলিকাতা, কলিকাতা হইতে বোলপুর ও বোলপুর হইতে মজঃফরপুর ঘুরিয়া" আসিতেছেন।[১] গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ হইলে কবি রথীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথকে রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সাধু সদানন্দ স্বামীর সহিত বদরি-কেদারতীর্থ ভ্রমণে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে তিনি ভগিনী নিবেদিতার পরামর্শমত কার্য করেন।[২] বালকেরা পর্বতে পর্বতে মাসাধিক কাল ভ্রমণ করিয়া আলমোড়া ফিরিয়াছেন সংবাদ পাইয়া কবি তাঁহাদিগকে মজঃফরপুর হইয়া ফিরিবার জন্য টেলিগ্রাম করেন। ১৩ই আষাঢ় তাঁহারা মজঃফরপুরে সমবেত হইলেন।[৩] পরদিন রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথ সেনকে যে পত্রখানি[৪] দিয়াছেন, তাহাতে পিতৃগর্বমাত্র প্রকাশ পায় নাই, সন্তানপালনের তাঁহার যে আদর্শ ছিল, তাহাই সেখানে পরিব্যক্ত হইয়াছে। তিনি লিখিতেছেন, "রথী কেদারনাথতীর্থ ঘুরিয়া কাল এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে ; তুমি বোধহয় জান কেদারনাথ হিমালয়ের একটি দুর্গমতম তীর্থ। সেখানে রথী সন্ন্যাসীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর মত গিয়া সমস্ত কষ্ট সহ্য করিয়া সিদ্ধকাম হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। এখন আর সে কোথাও ভ্রমণ করিতে ভয় করিবে না!"

মজঃফরপুর বাসকালে কবির সাহিত্যসৃষ্টি যথারীতি বাধাহীন। সেসব রচনার কথা আমরা অন্য পরিচ্ছেদে আলোচনা করিব। সংক্ষেপে বলিতে পারি যে 'পাগল'[৫] প্রবন্ধটি এখানে রচিত ; তাছাড়া কয়েকটি গান। 'স্বদেশী সমাজ' ও 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধদ্বয় এখানেই লেখেন বলিয়া আমাদের মনে হয়।

মজঃফরপুর হইতে ফিরিবার অল্পকাল পরেই 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটি ২২ জুলাই (১৯০৪) মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে চৈতন্য লাইব্রেরির উদ্‌যোগে পাঠ করিলেন ; তাহার পর পরিবর্তিত আকারে ৩১ জুলাই কর্জন রঙ্গমঞ্চে পুনরায় উহা পাঠ করেন। কী প্রয়োজনে কিসের অভিঘাতে উহা লিখিত হয়, তাহা আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।

কলিকাতা হইতে অনতিকালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে বোলপুর ফিরিতে হইল ; সেখানে অনেক বিশৃঙ্খলা। মোহিতচন্দ্র সেন অসুস্থ হইয়া কলিকাতায় ; শিক্ষকদের মধ্যে অক্ষয়বাবু অনুপস্থিত, নগেন্দ্রবাবু জ্বরে কাতর, 'ছাত্রেরা শাসনাভাবে উদ্ধত।'[৬] শিক্ষকদের সহায়তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ অক্ষম ; শান্তিনিকেতনের 'কর্ম ও চিন্তাভার সহ্য করিতে না

১ দ্র. প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত পত্র। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৫২ শারদীয় সংখ্যা, রবীন্দ্রনাথের চিঠি (নং ৩৪) ১৪ আষাঢ় ১৩১১।

২ Rathindranath Tagore, *On the Edges of Time* : Orient Longman 1958,

৩ পত্রাবলী। ১০ আষাঢ় ১৩১১। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ চৈত্র, পৃ ৫৭০।

৪ রবীন্দ্রনাথের চিঠি (৩৪ নং) ; আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৫২ শারদীয় সংখ্যা।

৫ বঙ্গদর্শন ১৩১১ শ্রাবণ। বিচিত্র প্রবন্ধ। দ্র. স্মৃতি, পৃ ৪৪, ৯ কার্তিক ১৩১১। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৫, পৃ ৪৪৪-৪৪৯।

৬ পত্রাবলী। ২৬ শ্রাবণ ১৩১১ [১৯০৪ অগস্ট ১০] বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ চৈত্র, পৃ ৫৭১।

পারিয়া' তাড়াতাড়ি গিরিডি চলিয়া গেলেন (১৪ অগস্ট)। রথীন্দ্র মীরা ও শমীকে সঙ্গে লইলেন। বিদ্যালয়ের কাজকর্ম দেখিতে লাগিলেন ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল। গিরিডিতে তখন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ছিলেন ল্যাণ্ড অ্যাক্যুজিশন ডেপুটি ; তাঁহার বাসার নিকটে একটি বাড়ি ভাড়া করা হইয়াছিল। এইখানে কবি ছেলেমেয়েদের লইয়া বৎসরাধিক কাল ছিলেন (১৯০৪-০৫)।

ভাদ্রমাসটা (১৩১১) গিরিডিতে কাটিয়া গেল। সেখানেও কবি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা লইয়া চিন্তাকুল। শান্তি-নিকেতনে workshop করিবেন, ওভারশিয়র একজন পাওয়া গেলে তিনি ছেলেদের ব্যবহারিক গণিত শিখাইবেন ও কারখানা দেখিবেন ; বিদ্যালয়ে ছাত্রদের অসুখবিসুখ লাগিয়া আছে, বোলপুর শহরের ডাক্তার চিকিৎসা করেন, কিন্তু স্থায়ী চিকিৎসকের ব্যবস্থার প্রয়োজন প্রভৃতি কত কথা ভাবিতেছেন। বোলপুর হইতে নিয়মিত সংবাদ পাইতেছেন যে, বিদ্যালয়ে নানা প্রকার অশান্তি, বড় ছেলেদের লইয়া চলা অসম্ভব। মোহিতচন্দ্র সেখানে নাই, অথচ বিদ্যালয়ের ভারও কাহারও উপর স্পষ্টভাবে ন্যস্ত নহে। মোহিতচন্দ্রকে ১৭ই ভাদ্র লিখিলেন, 'আপনি বিদ্যালয়ের কর্ণধারপদে আছেন। সঙ্কট উপস্থিত হইবামাত্র আপনি যদি হাল ছাড়িবার ব্যবস্থা করেন তবে যাহাদিগকে চালনা করিতেছেন তাহারা বল পাইবে কিরূপে? কাজ করিতে বসিয়া আমরাই যে সমস্ত বিঘ্ন হইতে অব্যাহতি পাইব এমন অসম্ভব সৌভাগ্য আশা করি না।'[১]

অজিতকুমারকে সেইদিনই লিখিতেছেন (১৭ ভাদ্র), "বিদ্যালয়কে কতকগুলি জঞ্জাল হইতে মুক্ত করিতে হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। শীঘ্রই সে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইব।"[২] কবির পক্ষে বিদ্যালয়ের অরাজকতা নীরবে সহ্য করা ক্রমশই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে।

এদিকে কলিকাতায় এই সময়ে প্রস্তাবিত বঙ্গচ্ছেদ লইয়া আলোচনা মাত্র শুরু হইয়াছে। কবির বক্তব্য বঙ্গদর্শনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত (সাময়িক প্রসঙ্গ পৃ ৮১-৮৭) হইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতার 'আবর্তের মধ্যে' শীঘ্র 'কোনোমতেই ধরা দিতে' তিনি ইচ্ছুক নহেন।[৩] এমন সময়ে ত্রিপুরার রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর মাণিক্য (লালুকর্তা) ও রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি যতীন্দ্রনাথ বসু গিরিডিতে বেড়াইতে আসিলেন। তাঁহাদের সহিত শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা হইত।[৪]

একদিন কবি হঠাৎ কলিকাতায় চলিয়া গেলেন, বিদ্যালয় সম্বন্ধে একটা সুবন্দোবস্ত করিবেন বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কলিকাতায় পৌঁছিয়াই কবি শান্তিনিকেতন হইতে ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে পত্র লিখিয়া আনাইয়া লইলেন (২১ আশ্বিন ১৩১১)। তথায় পূজাব ছুটি আরম্ভ হইয়াছে। কবি ভূপেন্দ্রনাথকে জানাইলেন যে, নগেন্দ্রনারায়ণ রায়কে তিনি বিদায়পত্র দেওয়া স্থির করিয়াছেন। মোহিতচন্দ্রের স্বাস্থ্য বোলপুরে ভালো থাকিতেছে না ; তাছাড়া অতবেশি বেতন দিয়া তাঁহাকে পোষণ করাও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছিল।[৫] ভূপেন্দ্রনাথের উপর তিনি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাভার অর্পণ করিলেন।

বিদ্যালয়ের অশান্তিকর পরিবেশ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য মন বোধ হয় ব্যাকুল! তাই কি হঠাৎ পরদিন স্থির করিলেন বুদ্ধগয়া যাইবেন? জগদীশচন্দ্র বসু, তাঁহার পত্নী অবলাদেবী, স্বামী সদানন্দ, ব্রহ্মচারী অমূল্য

১ পত্রাবলী। ১৭ ভাদ্র ১৩১১ [২ সেপ্টেম্বর ১৯০৪] বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ চৈত্র, পৃ ৫৭২।

২ গিরিডি। ১৭ ভাদ্র ১৩১১ ; দ্র. প্রবাসী ১৩৩৫ ভাদ্র, পৃ ৬৮২।

৩ পত্রাবলী। গিরিডি। ২৬ ভাদ্র ১৩১১। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ চৈত্র, পৃ ৫৭৩।

৪ *My Rabindranath*. **Calcutta Municipal Gazette. Tagore Number 1941, p26.**

৫ দেশ ১৩৪৯ পৃ ৪২৬।

(আর স্বামী শঙ্করানন্দ) ও ভগিনী নিবেদিতা, যদুনাথ সরকার প্রভৃতি সঙ্গী। গিরিডি হইতে রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্র মধুপুরে আসিয়া মিলিত হইলেন (৮ অক্টোবর ১৯০৪)।[১] তখনো গ্রাণ্ডকর্ড লাইন নির্মিত হয় নাই, তাই কিউল হইয়া গয়া যাইতে হইত। বুদ্ধগয়া হইয়া মোহান্ত মহারাজের অতিথিশালায় এক সপ্তাহ ছিলেন। সেখানে প্রতিদিন তাঁহারা ওয়ারেনের *Buddhism in Translation* এবং কখনো এড্যুইন আর্নল্ডের *Light of Asia* হইতে অংশ পাঠ করিতেন। রবীন্দ্রনাথ গান ও আবৃত্তি করিয়া সকলকে তৃপ্ত করিতেন। এইখানে সেই সময়ে ফুজি নামে এক জাপানী দরিদ্র জেলিয়া বোধিদ্রুমের নিম্নে বসিয়া তপস্যারত ছিল। এই নীরব ভক্তটির কথা রবীন্দ্রনাথ কোনো দিন ভুলেন নাই। বুদ্ধগয়ার এই স্মৃতি তিনি 'বুদ্ধদেব' সম্বন্ধে ভাষণ দান কালে উল্লেখ করেন ১৩৪২ সালের বৈশাখী পূর্ণিমায়।[২] বুদ্ধগয়া ভ্রমণ করিয়া গিরিডি ফিরিলেন। সেখান হইতে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৪ঠা কার্তিকের পত্রে জানাইতেছেন, "ছুটির পর হইতে বোলপুর বিদ্যালয়ের আমূল পরিবর্তন করা যাইতেছে। বড় ছেলেদের একেবারে বিদায় করা গেল। নগেন্দ্রবাবু গেলেন—মোহিতবাবুও থাকিবেন না। কেবলমাত্র কুড়িটি অল্প বয়সের ছাত্র স্কুলে রাখিব তাহার অধিক আর লইব না—এণ্ট্রান্স পরীক্ষার দিকে না তাকাইয়া রীতিমত শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা যাইবে।"—স্মৃতি ৪৩। কিছুকাল পূর্বে অজিতকুমারকে লিখিত পত্রে এই কথাটিই বলিয়াছিলেন, "অভিভাবকদের দিক হইতে আমাদের সমস্ত লক্ষ্য ফিরাইয়া আনিয়া বিদ্যালয়ের অন্তর্গত আদর্শের দিকে আমাদের লক্ষ্য স্থির রাখিতে হইবে।" পূজার সময়টা গিরিডিতে আনন্দে কাটিয়া গেল; তথা হইতে ১৩ই কার্তিক, তিনি কলিকাতায় গেলেন।[৩] বিদ্যালয় খুলিবে ১৫ই কার্তিক [৩১ অক্টোবর ১৯০৪]।

বিদ্যালয় খুলিলে কবি নূতনভাবে উহাকে গড়িবার দিকে মন দিলেন। মোহিতচন্দ্রের শাসনপর্বের অবসান হইয়া গেল। পাঠকের স্মরণ আছে ১৩১০ সালের ফাল্গুন মাস হইতে মোহিতচন্দ্র বিদ্যালয়ের হেডমাস্টার নিয়োজিত হইয়া শিলাইদহ যান। সেখানে দুই কি আড়াই মাসের অধিক কার্য করিবার সুযোগ পান নাই; তাহার পর একমাস গ্রীষ্মাবকাশ। গরমের ছুটির পরে তিনি মাত্র দুই মাস কার্য করেন; শ্রাবণের মাঝামাঝি অসুস্থ হইয়া কলিকাতায় যান। সুতরাং সর্বসাকুল্যে চার অথবা পাঁচ মাসের অধিক তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত ছিলেন না। তবে বিদ্যালয়ের সহিত যোগ ছিন্ন হইলেও রবীন্দ্রনাথের সহিত যোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

আশ্রমের আভ্যন্তরিক ইতিহাসে বরাবর দেখা গিয়াছে যে, যখনই কোনো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ বিদ্যালয়ের কর্মভার গ্রহণ করিয়া আয়তনের স্বাভাবিক প্রবাহকে নিজ ইচ্ছাধীন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, কবির নিকট হইতে তিনি কখনো কোনো প্রকার বাধা পান নাই; বরং অশেষ ধৈর্যের সহিত তাঁহারই ভাবে কবি তাঁহাকে বিদ্যালয় পরিচালনা বিষয়ে নানাভাবে পরীক্ষা করিবার অবসর ও স্বাধীনভাবে নিজ আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিবার সুযোগ দিয়াছেন। বিদ্যালয় পরিচালনার অভিজ্ঞতা ও ব্যবহারিক দক্ষতার অভাবে কবিকে দৈনন্দিন কাজের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করিতেই হইত। কিন্তু যখন এই অতিনির্ভরশীলতার ফলে, কবি দেখিতেন যে, তাঁহাদের দ্বারা আশ্রমের অন্তরের আদর্শ আচ্ছন্ন হইতেছে, অতিব্যবহারিকতা ও অতিবাস্তবতা উদগ্র হইয়া উঠিয়া শান্তিনিকেতনের অখণ্ড কল্যাণকে আঘাত করিতেছে, তখনই তাঁহার জীবনে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া শুরু হইত; এসকল ক্ষেত্রে যুক্তিপ্রমাণ হইতে অন্তর্দৃষ্টি ও অনুভূতি তাঁহাকে সত্য পথে পরিচালনা করিত।

১ রবীন্দ্রনাথের চিঠি নং ১। ১৯ আশ্বিন, ১৩১১।...দেশ ১৩৪৯ শারদীয়া সংখ্যা, পৃ ৪৫১।

২ সার্ যদুনাথ সরকার, Sister Nivedita as I knew her—Hindusthan Standard, Puja Annual 1952. চিঠিপত্র ৬, পৃ ১৬৯-৭০ হইতে সংগৃহীত।

৩ স্মৃতি, পৃ ২৭। পুনশ্চ পত্রাবলী, ৬ কার্তিক ১৩১১। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ চৈত্র, পৃ ৫৭৪, "আমি শীঘ্রই যাব স্থির করিয়াছি।"

যাহাই হউক, কবি তাঁহার মনের এই উত্তেজিত অবস্থায় কল্পনা করিতেন যে, বিদ্যালয় পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করিয়া দৈনন্দিন কাজকর্মের হিসাবপত্র খুঁটিনাটি একাই দেখিবেন। এই মনোভাব হইতে পুরাতনকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিতেন। বিদ্যালয়ের ইতিহাসে এ ঘটনা একাধিকবার হইয়াছে; তবে কবির এই উৎসাহ অধিককাল স্থায়ী হইত না। বিদ্যালয় পরিচালনা ছাড়া মহত্তর কাজের জন্য তাঁহার অন্তরাত্মা উদ্‌গ্রীব হইত। ফলে অচিরেই বিদ্যালয় আপনার পথে আপনি গড়াইয়া চলিত; সাধারণ অধ্যাপকগণ গতানুগতিকের অভ্যস্ত পথে চলিয়া সকল কাজই সহজ করিয়া লইতেন, তখন কোথায় থাকে আদর্শ, আর কোথায় থাকে আদর্শবাদ। কবি কল্পলোকে বিদ্যালয়ের এক মূর্তি দেখেন, বাস্তবে তাহা যখন রূপ লয়, তখন সেটিকে সামান্য 'ইস্কুল' মনে হয়। সাধারণ ইস্কুলের ধরণ-ধারণ পঠন-পাঠন আশ্রমে প্রবর্তিত হইবে ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার মনে হইত, উহা আদর্শভ্রষ্টতার লক্ষণ, তবে স্কুলমাস্টারদের হাতে উহার চেয়ে ভালো কিছু আশা করা যায় না।

মোহিতচন্দ্র সেন চলিয়া গেলেন; রবীন্দ্রনাথ ভাবিলেন কতকগুলি ছাত্র বিদায় ও অযোগ্য অধ্যাপক পরিবর্তন করিলেই বিদ্যালয়ের আমূল সংস্কার হইবে। কতবার ভাবিয়াছেন, অভিভাবকদের দিকে না তাকাইয়া বিদ্যালয়ের অন্তর্নিহিত আদর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন। কিন্তু কোনোদিন তাঁহার বিদ্যালয়কে এন্‌ট্রান্স বা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার নিগড় হইতে মুক্ত করিতে পারেন নাই। এমনকি বিশ্বভারতী স্থাপিত হইলেও তাহাকে একটি স্বাধীন বিদ্যালয়রূপে গড়িবার সাহস ও সংকল্প তাঁহার মধ্যে দেখা যায় নাই। ফলে ইহার একটি অংশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন একটি প্রাইভেট স্কুল ও কলেজের খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। কিন্তু যেখানে সে স্বাধীন বৈশিষ্ট্য ফুটাইবার অবসর পাইয়াছে, সেখানে সে নিখিল ভারতীয় এমনকি আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করিয়াছে— সেখানে অন্য কোনো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহিত উহার যোগ নাই। শান্তিনিকেতনে কলাভবন বিদ্যাভবন চীনাভবন হিন্দিভবন ও সুরুলের শ্রীনিকেতন ও শিল্পভবন সেই বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ দৃঢ়তার পথ বরাবর সমভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার এই মহান প্রতিষ্ঠান বিপুল হইয়াও দুর্বল।

কার্তিক মাসের মাঝামাঝি বিদ্যালয় খুলিলে কবি গিরিডি হইতে কলিকাতায় ও তথা হইতে বোলপুরে দুই একদিনের মধ্যে ফিরিলেন বটে, কিন্তু বেশিদিন থাকিতে পারিলেন না।[১] কারণ, ৭ই অগ্রহায়ণ পিতার অসুখের টেলিগ্রাম পাইয়া কলিকাতায় চলিয়া যাইতে হইল। তথা হইতে পরদিন মোহিতচন্দ্রকে লিখিতেছেন, "বিদ্যালয়ে গিয়ে এবারে খুব আনন্দে ছিলুম। শিক্ষকেরা সকলেই একাগ্র উৎসাহের সঙ্গে কাজ করছেন— ছেলেদের মধ্যে বেশ একটা স্ফূর্তি দেখা দিয়েছে— স্পষ্ট বুঝতে পারলুম এ জিনিসটিকে কলকাতায় উৎপাটিত করে আনা কিছুতেই সম্ভবপর ও শ্রেয়স্কর নয়। এবং এ জিনিসটি যেমন দীন এবং ক্ষুদ্র আছে এই ভাবেই আমি একে রাখতে চাই— এর উপরে অত্যাকাঙ্ক্ষার ভার চাপানো চলবে না।"[২] পত্রখানি পাঠ করিয়া মনে হয় যে মাঝখানে বিদ্যালয়টিকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিবার কথা উঠে।

বিদ্যালয়ের মধ্যে আমূল পরিবর্তন হইয়াছে; পুরাতন শিক্ষকদের মধ্যে মোহিতচন্দ্র আসেন নাই; নগেন্দ্রনারায়ণকে বিদায় দেওয়া হইয়াছে, তাঁহার স্থানে আসেন কানাইলাল গুপ্ত। মোহিতবাবুর সময়ে বয়স্ক ছাত্র লইয়া শাসনব্যবস্থা পরিচালনা বড়ই কঠিন হইয়াছিল। সেই অভিজ্ঞতায় নূতন নিয়ম হইল যে, বারো বৎসরের ঊর্ধ্ববয়স্ক ছাত্র বিদ্যালয়ে

১ স্মৃতি, পৃ ২৭। শুক্রবার [১২ই কার্তিক ১৩১১॥ ১৯০৪ অক্টোবর ২৮] পত্রাবলী। ৬ কার্তিক ১৩১১, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ চৈত্র।

২ পত্রাবলী··· বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ মাঘ, পৃ ৪৪৮। পত্রখানি লেখার তারিখ হইবে বুধবার ৮ অগ্রহায়ণ ১৩১১ (১৯০৪ নভেম্বর ২৩)। এই 'বুধবারে' ভুপেন্দ্রনাথ সান্যালকে লিখিত একখানি পত্র আছে। দ্র. দেশ ১৩৪৯ শারদীয়া সংখ্যা।

লওয়া হইবে না ; ফলে পূজার পর ছাত্রসংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ১২।১৩টি মাত্র। শিক্ষক ছিলেন ৫।৬ জন।[১] এই অবস্থায় বিদ্যালয়কে দেখিয়া কবি উৎফুল্ল হইয়া পূর্বোদ্ধৃত পত্রখানি লেখেন।

বিদ্যালয় পরিচালনার ভার ভূপেন্দ্রনাথের উপর অর্পিত হইয়াছিল ; তাঁহাকে মাসিক ৫০০৲ দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। কথা হইল তাহারই মধ্যে তাঁহাকে সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করিতে হইবে। কিন্তু নিয়ম করিয়া দীর্ঘকাল সেই নিয়ম পালন করা কবির পক্ষে সম্ভব ছিল না। ভূপেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "বিদ্যালয়ের কার্য কিছুদিন ঐ নিয়মেই বেশ চলিতে লাগিল, কিন্তু (রবীন্দ্রনাথের) মাথায় কত নূতন নূতন ভাব আসিতে লাগিল এবং তদনুরূপ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থারও কত পরিবর্তন হইতে লাগিল ; সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ব্যয়ভারও বাড়িতে লাগিল। ইহাতে অসুবিধা ও কষ্ট সর্বাপেক্ষা বেশী তাঁহারই হইত— এক একটা নূতন স্কীম-এ সব উলট পালট হইয়া যাইত।"[২]

কিন্তু কলিকাতায় গিয়া বিদ্যালয় সম্বন্ধে কী চিন্তা ও উদ্‌বেগ বহন করিতেছেন তাহা ভূপেন্দ্রনাথকে লিখিত পত্র হইতে জানিতে পারা যায়। কবিচরিত্রের একটি সম্পূর্ণ নূতন দিকের সন্ধান পাই এই পত্রগুচ্ছ মধ্যে।

অগ্রহায়ণের শেষাশেষি কবি আশ্রমে ফিরিলেন, যথানিয়ম পৌষ-উৎসবে 'উৎসবের দিন' শীর্ষক ভাষণ দান করিলেন।[৩] কিন্তু পুনরায় তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরিতে হইল, মহর্ষির জীবনের আশা ক্রমেই ক্ষীণ হইতেছে। অল্পকয়েক দিনের মধ্যে জোড়াসাঁকোয় নিজের বাড়িতে মহর্ষির মৃত্যু হয় (বৃহস্পতিবার ৬ই মাঘ ১৩১১ ॥ ১৯০৫ জানুয়ারি ১৯)[৪]। তখন তাঁহার বয়স ৮৯ বৎসর। জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের বয়স ৬৫ ও কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের বয়স প্রায় ৪৪ বৎসর। মহর্ষির আদ্যকৃত্য উপলক্ষ্যে প্রার্থনা করিলেন রবীন্দ্রনাথ।[৫]

এইখানে মহর্ষি সম্বন্ধে একটি কথা আমরা উদ্ধৃত করিব যেটি কবিজীবন গঠনের বিশেষ ঘটনা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কবি বলিতেছেন, "আজ এই কথা বলিয়া আমরা সকলের কাছে গৌরব করিতে পারি যে, এতকাল আমাদের পিতা যেমন আমাদিগকে দারিদ্র্য হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন তেমনি ধনের গণ্ডির মধ্যেও আমাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। পৃথিবী আমাদের সম্মুখে মুক্ত ছিল, ধনী দরিদ্র সকলেরই গৃহে আমাদের যাতায়াতের পথ সমান প্রশস্ত ছিল। সমাজে যাঁহাদের অবস্থা আমাদের অপেক্ষা হীন ছিল তাঁহারা সুহৃদ্‌ভাবেই আমাদের পরিবারে অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়াছেন, পারিষদভাবে নহে। ভবিষ্যতে আমরা ভ্রষ্ট হইতে পারি, কিন্তু আমরা ভ্রাতৃগণ দারিদ্র্যের অসম্মানকে এই পরিবারের ধর্ম বলিয়া জানিতে পাই নাই। ধনের সংকীর্ণতা ভেদ করিয়া মনুষ্যসাধারণের অকুণ্ঠিত সংস্রবলাভ যাঁহার প্রসাদে আমাদের ঘটিয়াছে তাঁহাকে আজ আমরা নমস্কার করি।" এই ভাষণে আর-একটি কথা বলিলেন, সেটি হইতেছে পিতার নিকট হইতে প্রচুর স্বাধীনতা প্রাপ্তির কথা ; তাঁহার জীবনে পরিপূর্ণভাবে অগ্রসর হইবার পক্ষে এই স্বাধীনতা যে কতখানি সহায় হইয়াছিল, তাহা তাঁহার ইতিহাস হইতে জানা যায়।

মহর্ষির মৃত্যুর পর ঠাকুরপরিবারের মধ্যে অনেক ভাঙচুর হইল। দেহত্যাগের পূর্বে মহর্ষি পৈতৃক বাটীতে ফিরিয়া আসেন, নহিলে গত বিশ বৎসর জোড়াসাঁকোয় বাস করেন নাই ; শেষজীবনে ছিলেন পার্ক স্ট্রীটের এক বাসায়। তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যেষ্ঠ কন্যা সৌদামিনী। দ্বিজেন্দ্রনাথ বহুকাল বিপত্নীক, সৌদামিনীও

১ জগদানন্দ রায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, অজিতকুমার চক্রবর্তী, নগেন্দ্রনাথ আইচ ও কানাইলাল গুপ্ত।

২ দেশ ১৩৪৯, পৃ ৪২৭।

৩ বঙ্গদর্শন ১৩১১ মাঘ। দ্র. ধর্ম, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৩৯২ ৪০০।

৪ দ্র. কবিকথা, শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, বিশ্বভারতী পত্রিকা কার্তিক-পৌষ ১৩৫০, পৃ. ১৪৭ : "…দোতলায় যে-ঘরে কবি মারা যান ঠিক তার উপরে তিনতলায় ঐ শোবার ঘর ছিল মহর্ষিদেবের, তিনি ঐ ঘরেই মারা যান।" প্রশান্তচন্দ্র অসুস্থতার জন্য শবানুগমন করিতে পারেন নাই, শ্রীঅমল হোম করিয়াছিলেন।

৫ চারিত্রপূজা। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪, পৃ ৫৩০-৫৩৪।

প্রায় বিশ বৎসর বিধবা। ইঁহাদের সন্তানেরা জোড়াসাঁকোয় থাকিতেন। কন্যাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ পিতামহের সহিত পার্ক স্ট্রীটে আসিয়া বাস করেন। এই বাসায় সকলে ৭।৮ বৎসর ছিলেন।

মহর্ষির মৃত্যুর পর দ্বিজেন্দ্রনাথ কলিকাতা ত্যাগ করিলেন; প্রায় এক বৎসর কাল বোলপুরের নিকট রায়পুরে তাঁহার সুহৃৎ রবীন্দ্রসিংহের বাড়িতে থাকেন। শান্তিনিকেতন নিচুবাংলার টালির বাড়ি তৈয়ারি হইলে তিনি সেখানে চলিয়া আসিলেন। দ্বিপেন্দ্রনাথ আসিয়া শান্তিনিকেতন অতিথিশালা অধিকার করিলেন। সেইখানে তিনি প্রায় ষোলো বৎসর বাস করেন।

রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে তাঁহার পুত্রকন্যাদের জন্য একখানি খড়ের বাড়ি (নূতন বাড়ি) নির্মাণ করিয়াছিলেন; তাহারই পাশে নিজে থাকিবার জন্য ক্ষুদ্র এক কামরার একখানি দ্বিতল গৃহ নির্মাণ করাইলেন। ইহা এখন 'দেহলি' নামে পরিচিত। ঘরবাড়ি সম্বন্ধে কবির অনেক অদ্ভুত খেয়াল ছিল 'দেহলি' তাহার প্রমাণ; বাড়িখানি যখন আরম্ভ হয় তিনি স্থির করিয়াছিলেন ঠিক একখানি খাট ও একটি লিখিবার জলচৌকি রাখিবার মতো মাপের ঘর হইবে। সুখের বিষয়, যাঁহাদের উপর গৃহ নির্মাণের ভার ছিল, তাঁহারা কয়েক হাত বড় করিয়া ঘরটিকে তৈরি করেন বলিয়া সে-ঘর বাসোপযোগী হইয়াছিল। ১৯০৫-এর গোড়া হইতেই রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ে বাসা বাঁধিলেন, গিরিডির বাস উঠাইয়া দিলেন; ছেলেমেয়েরা থাকে নূতন বাড়িতে, স্বয়ং থাকেন 'দেহলি'র দোতলার ছোট কুঠরিতে।

মোহিতচন্দ্র সেন চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা যেভাবে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, অপরদিকে সাধারণ ব্যয় পূর্ব হইতে যেভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহাতে অনেকের সন্দেহ হয় যে বিদ্যালয় বুঝিবা উঠিয়া যাইবে। কিন্তু কবি স্বয়ং আশ্রমের মধ্যে আসিয়া বাস করায় অধ্যাপক ও অভিভাবকগণের মনে যথেষ্ট বল সঞ্চার হইল, সকলেই বিশ্বাস ফিরিয়া পাইলেন।

কবি অধ্যাপকগণের প্রত্যেককে অধ্যয়নে অনুশীলন ও রচনাকার্যে উৎসাহ দিলেন; যাঁহার যে-বিষয়ে অনুরাগ তাঁহাকে সেই বিষয়ে পুস্তক আনাইয়া দিয়া, পরামর্শ দিয়া, আলোচনা করিয়া সেই অনুরাগকে পুরাপুরি কাজে লাগাইয়া দিলেন। অধ্যাপকগণকে লইয়া একটি সায়ংসভা গঠিত হইল, তাহাতে নানা বিষয়ে আলোচনা এবং পাঠ হইত। ক্লাসের কাজও রবীন্দ্রনাথ দেখিতে লাগিলেন এবং নিজে পড়াইয়া কিভাবে ভালো পড়ানো যাইতে পারে তাহা দেখাইতেন।

এই সময়ে বিদ্যালয়ের কর্মের মধ্যে একটি বিশেষ পরিবর্তন দেখা গেল! বিদ্যালয় সৃষ্টির সময় স্কুল পরিচালনাভার হেডমাস্টার বা তদ্‌জাতীয় কোনো কর্মচারীর উপর ন্যস্ত হইয়া আসিতেছিল; কিন্তু বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণের পর হইতে রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপকদের কাহাকেও অনুভব করিতে দিলেন না যে, তিনি প্রভু ও অন্যেরা তাঁহার অধীনস্থ। তাঁহার ভাব ছিল এই যে, সকলে মিলিয়া বিদ্যালয়টিকে গড়িয়া তুলিতেছেন— ছাত্র, অধ্যাপক ও তিনি একত্র একাসনে বসিয়া এই কর্মে যেন প্রবৃত্ত। সাধারণ অধ্যাপকগণ "কেবল শাসন করেন, ছাত্র শাসিত হয়; অধ্যাপক উচ্চে, ছাত্র নিচে এ ভাবটিও এ বিদ্যালয়ের ভাব নয়। কারণ বয়সে বয়সে জ্ঞানে অভিজ্ঞতায় অধ্যাপক বড়ো হইলেও সাধনার ক্ষেত্রে সকলেই সমান, সেখানে সকলেই সকলের সহায় ও বন্ধু।"[১]

এদিকে বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করা ক্রমেই কবির পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে; ব্যয় যেখানে বাড়ে, আর আয় বাড়ে না সেখানে ঋণ করা ছাড়া উপায় থাকে না। এ ঋণের পথ খুব সংকীর্ণ, কারণ মাথার উপর কুষ্টিয়ার ব্যবসায়ে লোকসানের মোটা ঋণ ঝুলিতেছে। সুতরাং অন্য উপায় সন্ধান করিতে হইল; মজুমদার লাইব্রেরীতে কিছু

১ ব্রহ্মবিদ্যালয়, পৃ ৩০।

টাকা ঢালিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন, 'কাব্যগ্রন্থ' প্রকাশিত হইলে কিছু টাকা ঘরে আসিবে। শুনিয়াছি সে-আশা পূর্ণ হয় নাই। তাই হিতবাদী-কার্যালয়কে তাঁহার গ্রন্থাবলী বিক্রয় করিয়া কিছু নগদ টাকা লইলেন। রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয় ১৩১১ সালের ভাদ্র মাসে, সুতরাং টাকাটা তাহার আগেই পাইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়।

বিচিত্র গদ্যরচনা ১৯০৪

আলমোড়া হইতে ফিরিবার (১৯০৩ সেপ্টেম্বর) পর বৎসরাধিককাল কাটিয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে কবির লেখনী স্তব্ধ নহে বটে, তবে তেমন চঞ্চলও নহে। বঙ্গদর্শনের জন্য 'নৌকাডুবি' ধারাবাহিক লিখিতে হইয়াছে। এ ছাড়া ছিল প্রসঙ্গকথায় বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা। তবে এই সময়ে রচিত সাহিত্যবিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ বিশেষভাবে আলোচনীয়। এই প্রবন্ধ কয়টি লিখিবার বিশেষ কারণ ছিল বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। আমাদের এই আলোচ্য-পর্বে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ সম্পূর্ণ নূতন ধারায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সাধারণত কবিদের কাব্যগ্রন্থ, রচনাধারার ঐতিহাসিক ক্রম অনুসরণ করিয়া মুদ্রিত হইয়া থাকে। নূতন কাব্যগ্রন্থে সে-পথ পরিত্যক্ত হয়। কবিতাকে রসের দিক হইতে, ভাবপারম্পর্যের দিক হইতে বিচার ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির মধ্যে নূতনত্ব ছিল। ঐতিহাসিক ক্রম হইতে উহা সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া সাহিত্যের কষ্টিপাথরে উহার যাচাইয়ের প্রয়োজন। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ কবি হইয়া উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন— ইহারও কৈফিয়ত আছে। ওই সব তত্ত্বর সমর্থনে তিনি লিখিলেন তিনটি প্রবন্ধ— সাহিত্য সমালোচনা সাহিত্যের সামগ্রী ও সাহিত্যের তাৎপর্য।[১]

'সাহিত্য সমালোচনা' (বঙ্গদর্শন ১৩১০ আশ্বিন) প্রবন্ধে লেখক সাহিত্যের প্রতিপাদ্য কী তাহাই আলোচনা করিয়াছেন। বাস্তবে যেমনটি আছে তেমনটি লিপিবদ্ধ করা সাহিত্যের উদ্দেশ্য নহে। 'সাহিত্যে যাহা দেখায়, তাহা প্রাকৃতিক হইলেও তাহা প্রত্যক্ষ নহে। সুতরাং সাহিত্যে সেই প্রত্যক্ষতার অভাব পূরণ করিতে হয়।'

'এই প্রত্যক্ষতার অভাববশত সাহিত্যে ছন্দোবদ্ধ-ভাসাভঙ্গির নানাপ্রকার কল-বল আশ্রয় করিতে হয়। এইরূপে রচনার বিষয়টি বাহিরে কৃত্রিম হইয়া অন্তরে প্রাকৃত অপেক্ষা অধিকতর সত্য হইয়া উঠে।' মানুষের 'মন প্রকৃতির আর্শি নহে, সাহিত্যও প্রকৃতির আর্শি নহে। মন প্রাকৃতিক জিনিসকে মানসিক করিয়া লয়; সাহিত্য সেই মানসিক জিনিসকে সাহিত্যিক করিয়া তুলে।.. মন যাহা গড়িয়া তোলে, তাহা নিজের আবশ্যকের জন্য, সাহিত্য যাহা গড়িয়া তোলে তাহা সকলের আনন্দের জন্য।.. মন সাধারণত প্রকৃতির মধ্য হইতে সংগ্রহ করে, সাহিত্য মনের মধ্য হইতে সঞ্চয় করে।.. এইরূপে প্রকৃতি হইতে মনে ও মন হইতে সাহিত্যে যাহা প্রতিফলিত হইয়া উঠে তাহা অনুকরণ হইতে বহুদূরবর্তী।.. অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষার, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।'

মানুষ অন্তরের মধ্যে দুইটা অংশের অস্তিত্ব অনুভব করে; একটা অংশ তার নিজত্ব, আর-একটা অংশ তাহার মানবত্ব, বা একটা জায়গায় সে individual ও অপর জায়গায় সে universal। প্রকৃত সাহিত্যকারের অন্তঃকরণে নিজত্ব ও মানবত্বের ব্যবধান স্বল্প। কল্পনার তীব্রতা সেই ব্যবধানকে ঘুচাইয়া দেয়। 'সাহিত্যকারের সেই মানবত্বই সৃজনকর্তা। লেখকের নিজত্বকে সে আপনার করিয়া লয়, ক্ষণিককে সে অমর করিয়া তোলে, খণ্ডকে সে সম্পূর্ণতা দান করে।' সাহিত্যস্রষ্টা যাঁহারা তাঁহাদের 'শ্রেষ্ঠ চেষ্টা কেবল বর্তমান কালের জন্য নহে। চিরকালের মনুষ্য-সমাজই তাঁহাদের লক্ষ্য।'

১ সাহিত্য, গদ্য-গ্রন্থাবলী ৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৮, পৃ ৩৩৯-৩৫৪। সাহিত্য সমালোচনা প্রবন্ধটি সাহিত্য গ্রন্থে "সাহিত্যের বিচারক" নামে মুদ্রিত।

'সাহিত্যের সামগ্রী' (বঙ্গদর্শন ১৩১০ কার্তিক) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ রচনা আরম্ভেই বলিলেন, 'একেবারে খাঁটিভাবে নিজের আনন্দের জন্যই লেখা সাহিত্য নহে।' পাঠকের স্মরণ আছে, কবি পূর্বে এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, লেখার আর কোনো উদ্দেশ্য নাই, নিজের আনন্দ ছাড়া। এখন সে মত পরিবর্তিত ; তাই বলিতেছেন, 'লেখকের রচনার·· প্রধান লক্ষ্য পাঠক সমাজ।' 'রচনা রচয়িতার নিজের জন্য নহে,··সে নানা মনের মধ্যে নিজেকে অনুভূত করিতে চায়।' সেইজন্যেই লেখকেরা লেখেন। 'মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমরতা প্রার্থনা করিতেছে। ·· সাহিত্যে সেই চিরস্থায়িত্বের চেষ্টাই মানুষের প্রিয় চেষ্টা। ·· যাহা জ্ঞানের কথা তাহা প্রচার হইয়া গেলেই তাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়া শেষ হইয়া যায়। ·· কিন্তু হৃদয়ভাবের কথা প্রচারের দ্বারা পুরাতন হয় না। ·· এইজন্য সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নহে, ভাবের বিষয়। ·· জ্ঞানের কথাকে প্রমাণ করিতে হয়, আর ভাবের কথাকে সঞ্চার করিয়া দিতে হয়। ·· তাহাকে কেবল বুঝাইয়া বলিলেই হয় না, তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে হয়।

'ভাব, বিষয়, তত্ত্ব সাধারণ মানুষের। তাহা একজন যদি বাহির না করে তো কালক্রমে আর-একজন বাহির করিবে। কিন্তু রচনা লেখকের সম্পূর্ণ নিজের । তাহা একজনের যেমন হইবে, আর-একজনের তেমন হইবে না। সেইজন্য রচনার মধ্যেই লেখক যথার্থরূপে বাঁচিয়া থাকে ; ভাবের মধ্যে নহে, বিষয়ের মধ্যে নহে। অবশ্য, রচনা বলিতে গেলে ভাবের সহিত ভাবপ্রকাশের উপায় দুই সম্মিলিতভাবে বুঝায় ; কিন্তু বিশেষ করিয়া উপায়টাই লেখকের।' এই কথাটির তাৎপর্য হইতেছে— style is the man— 'অতএব দেখিতেছি, ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতকলা।

'যে-সকল জিনিস অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইবার জন্য প্রতিভাশালী হৃদয়ের কাছে সুর রঙ ইঙ্গিত প্রার্থনা করে, যাহা আমাদের হৃদয়ের দ্বারা সৃষ্ট না হইয়া উঠিলে অন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না, তাহাই সাহিত্যের সামগ্রী।'

'সাহিত্যের তাৎপর্য' (বঙ্গদর্শন ১৩১০ অগ্রহায়ণ) প্রবন্ধে কবি পুনরায় এই সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছেন। হৃদয়ের ভাব উদ্রিক্ত করিবার জন্য সাহিত্যকারকে অলংকার, রূপক, ছন্দ, সংগীত প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। 'দর্শন-বিজ্ঞানের মতো নিরলংকার হইলে তাহার চলে না ! অপরূপকে রূপের দ্বারা ব্যক্ত করিতে গেলে বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তাকে রক্ষা করিতে হয়। ·· ভাষার মধ্যে এই ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য প্রধানত ভাষার মধ্যে দুইটি জিনিস মিশাইয়া থাকে, চিত্র এবং সংগীত, বা ছবি ও গান। কথার দ্বারা যাহা বলা চলে না ছবির দ্বারা তাহা বলিতে হয়। সাহিত্যে এই ছবি আঁকার সীমা নাই। উপমা, তুলনা, রূপকের দ্বারা ভাবগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে চায়।

'এ ছাড়া ছন্দে শব্দে বাক্যবিন্যাসে সাহিত্যকে সংগীতের আশ্রয় তো গ্রহণ করিতেই হয়। যাহা কোনোমতে বলিবার জো নাই, এই সংগীত দিয়াই তাহা বলা চলে। অর্থ বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে যে কথাটা যৎসামান্য এই সংগীতের দ্বারাই তাহা অসামান্য হইয়া উঠে। কথার মধ্যে বেদনা এই সংগীতই সঞ্চার করিয়া দেয়। অতএব চিত্র এবং সংগীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সংগীত ভাবকে গতিদান করে। চিত্র দেহ এবং সংগীত প্রাণ।' কিন্তু লেখক মানুষের হৃদয়ই যে সাহিত্যের একমাত্র সামগ্রী তাহা স্বীকার করেন না, বলেন, 'মানুষের চরিত্রও এমন একটি সৃষ্টি যাহা জড়সৃষ্টির ন্যায় আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আয়ত্তগম্য নহে। ··মানব চরিত্র স্থির নহে, সুসংগত নহে ; তার লীলা এত সূক্ষ্ম, এত অভাবনীয়, এত আকস্মিক যে, তাহাকে পূর্ণ আকারে আমাদের হৃদয়গম্য করা অসাধারণ ক্ষমতার কাজ। ·· সাহিত্যের বিষয় মানবহৃদয় এবং মানবচরিত্র।' কবির মতে 'বহিঃপ্রকৃতি এবং মানবচরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সংগীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে,

ভাষারচিত সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য।'

ভাষার মধ্য দিয়া মানুষ যেমন তাহার ভাবকে অমর করিবার প্রয়াসে সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছে ও সুরের মধ্যে অনুভাবকে রূপ দিয়া সংগীত রচিতেছে, তেমনি স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মধ্য দিয়া সে আর-এক ভাবে তাহার অনুভূতিকে প্রকাশ করিতেছে— এই কথাটি ব্যাখ্যা করিলেন 'মন্দির' বা 'মন্দিরের কথা'[১] প্রবন্ধে। উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের মন্দির সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া কবি বলিলেন যে, উহার পাথরগুলির মধ্যে যেন কথা আছে। ঋষিরা ছন্দে মন্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, এই মন্দিরও পাথরের মন্ত্র ; হৃদয়ের কথা দৃষ্টিগোচর হইয়া আকাশ জুড়িয়া দাঁড়াইয়াছে। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের বাহিরে অসংখ্য ছবি খোদাই করা ; সেসব ছবি দেবমন্দির সম্বন্ধে আমাদের যে সংস্কার আছে, তদনুযায়ী অঙ্কনযোগ্য বলিয়া হঠাৎ মনে হয় না ; তুচ্ছ এবং মহৎ, গোপনীয় এবং ঘোষণীয়, সমস্তই একসঙ্গে আছে। অথচ মন্দিরের ভিতরে চিত্র নাই, আলোক নাই, অনলংকৃত নিভৃত অস্ফুটতার মধ্যে দেবমূর্তি নিস্তব্ধ বিরাজমান। মন্দিরের প্রস্তরের ভাষার মধ্যে রচয়িতা-শিল্পীর অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। সে কথা এই— দেবতা দূরে নাই, তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন। তিনি জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ পাপপুণ্য মিলনবিচ্ছেদের মাঝখানে স্তব্ধভাবে বিরাজমান। এই সংসারই তাঁহার চিরন্তন মন্দির। নির্জনে নহে, যোগে নহে— সজনে, কর্মের মধ্যে তিনি রহিয়াছেন। এই তত্ত্বটিই যেন ভুবনেশ্বরের শিল্পীর অন্তরের কথা।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে শিল্পের সৌন্দর্য দেখাইবার চেষ্টা করিলেন না ; তিনি শিল্পের ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার কাছে রামায়ণ ও মহাভারত যে মানবমনের বিরাট সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হয়, তাহার কারণ উহাদের মধ্যে সমস্ত কিছু ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে ; পাপপুণ্য, ভালোমন্দ, সুখদুঃখ— এক কথায় সমস্ত মনুষ্যত্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে ও অচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া যাহা সৃষ্টি করিয়াছে তাহাকে কোনো বিশেষ পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। তাহারা অতুলনীয়। এই মানবহৃদয় ও মানবচরিত্রের খেলা চলিতেছে কবিরও রচনায়— উপন্যাসের ধারায়। সেখানে এই জগন্নাথের শ্রীক্ষেত্রে বা সৌন্দর্যলোকে— ভুবনেশ্বরের মন্দিরে নরনারীর অন্তহীন কামনার রূপকথা চলিতেছে।

সাহিত্যিক-ঘটনার মধ্যে বলিবার কথা হইতেছে, 'কর্মফল' নামে গল্প এই সময়ে প্রকাশিত হইল (১৩১০ পৌষ)। নিতান্তই ফলের আশায় কবি এই কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ অর্থের জন্য লেখা।[২] সে সময়ে বাংলাদেশের বিখ্যাত সুগন্ধী-বণিক (perfumer) এইচ. বসু এণ্ড সন্স (হেমেন্দ্রমোহন বসু) তাঁহার বিখ্যাত কেশতৈল 'কুন্তলীনে'র নামানুসারে প্রায় প্রতি বৎসর সর্বোৎকৃষ্ট গল্পের জন্য পুরস্কার দিতেন। 'কর্মফল' গল্পটি উপন্যাস বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইলেও উহা গল্প ছাড়া আর কিছুই নহে এবং বর্তমানে উহা 'গল্পগুচ্ছে'রই অন্তর্গত। তবে উহার মধ্যে গল্পাকারে বর্ণিত অংশ সামান্যই, অধিকাংশই কথোপকথন ; সেজন্য সমসাময়িক সমালোচকবর্গ ইহাকে নাটক বলিয়া অভিহিত করেন।[৩] গল্পটির মধ্যে সত্যই নাটকীয় উপাদান ছিল, তাই বহু বৎসর পরে আখ্যানাংশকে আশ্রয় করিয়া কবি 'শোধবোধ' নামে নাটক রচনা করেন (১৩৩৩)। মূল গল্পটির মধ্যে ছোটগল্পের সে জৌলস বা মুন্সিয়ানা নাই,— বেশ বুঝা যায় ফরমাইশি রচনা - অনিচ্ছার বশে লেখা— আনন্দের আবেগে উহার জন্ম নহে।

অর্থের জন্য গল্প লিখিতে হয়, অনুরোধে পড়িয়া বন্ধুকৃত্য করিতে হয়। অনেক সময়ে লিখিতে বসেন ক্ষুব্ধ চিত্তে ; কিন্তু লেখা আরম্ভ করিলে লিখিবার বস্তুতান্ত্রিক কারণের কথা স্মরণ থাকে না ; তখন রচনা লেখে আর্টিস্ট

১ বঙ্গদর্শন ১৩১০ পৌষ। বিচিত্র প্রবন্ধ, মন্দির। ভারতবর্ষ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪, পৃ ৪৫৫।

২ হেমেন্দ্রমোহন বসু...ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সাহায্যার্থে তিনশত টাকা দিয়াছিলেন।" গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন।

৩ প্রবাসী, ৩য় বর্ষ ১৩১০ পৌষ, পৃ ৩৮৭. গ্রন্থসমালোচনা— কর্ম্মফল। ১৮টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের মাঝে মাঝে ৮।৯ লাইন করিয়া লেখা উপন্যাসের মত ; বাকী সমগ্র পুস্তকখানি নাটক। সুতরাং ইহাকে নাটকই বলা উচিত।

অথবা ক্রিটিক রবীন্দ্রনাথ। কিছুকাল হইতে অনুরোধ আসিতেছে বন্ধু দীনেশচন্দ্র সেনের (১৮৬৬-১৯৩৯) নিকট হইতে, তাঁহার 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকার জন্য। দীনেশচন্দ্র রামায়ণের অনেকগুলি চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া বঙ্গদর্শনে (১৩১০) প্রকাশ করিয়াছিলেন; সেইগুলি এখন গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইতেছে; তজ্জন্য একটি ভূমিকার প্রয়োজন। অনুরোধের খাতিরে ভূমিকা লিখিলেন বটে, কিন্তু বিষয়টি কবির প্রিয় বলিয়া রচনাটি খুবই মনোজ্ঞ হইল।[১]

ইতিপূর্বে সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন, এবার বিশেষভাবে ভারতের মহা কাব্যদ্বয় সম্বন্ধে আলোচনার সুযোগ পাইলেন, কবির মতে মিলটনের প্যারাডাইস লস্টের ভাষার গাম্ভীর্য, ছন্দের মাহাত্ম্য, রসের গম্ভীরতা যতই থাক্ না কেন তথাপি তাহা দেশের ধন নহে, তাহা লাইব্রেরির আদরের জিনিস। কিন্তু 'শতাব্দীর পর শতাব্দী যাইতেছে কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের স্রোত ভারতবর্ষে আর লেশমাত্র শুষ্ক হইতেছে না।' 'কোনো কাব্যের মধ্যেই এমন ব্যাপকতা দেখা যায় না।' তাই কবি লিখিতেছেন[২], 'সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যখন তাঁহার এই রামায়ণচরিত্র-সমালোচনার একটি ভূমিকা লিখিয়া দিতে আমাকে অনুরোধ করেন তখন আমার অস্বাস্থ্য ও অনবকাশ সত্ত্বেও তাঁহার কথা আমি অমান্য করিতে পারি নাই। কবিকথাকে ভক্তের ভাষায় আবৃত্তি করিয়া তিনি আপন ভক্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়াছেন। এইরূপ পূজার আবেগ মিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে প্রকৃত সমালোচনা;—এই উপায়েই এক হৃদয়ের ভক্তি আর-এক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়।"

আমাদের সন্দেহ হয় রবীন্দ্রনাথ যাহা এইখানে লিখিয়া ফেলিলেন, তাহা সত্যই তাঁহার মত কি না। কারণ 'আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যা' কখনই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা হইতে পারে না— এ তত্ত্ব সমালোচক রবীন্দ্রনাথের কাছ হইতেই শোনা। তিনিই অন্যত্র বলিয়াছেন,[৩]

'দুঃখের গানে গায়ক যদি সেই অশ্রুপাতের ও সুখের গানে হাস্যধ্বনির সহায়তা গ্রহণ করে, তবে তাহাতে সংগীতের সরস্বতীর অবমাননা করা হয় সন্দেহ নাই।'

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ হইতে শান্তিনিকেতনে পৌষ-উৎসবের জন্য যাইতেছেন; কলিকাতায় যে সামান্য সময় ছিলেন তাহারই মধ্যে প্রবন্ধটি লিখিয়া দীনেশবাবুকে পাঠাইয়া দিলেন (৫ পৌষ ১৩১০।১৯০৩ ডিসেম্বর ২০)।

শান্তিনিকেতনে পৌষ-উৎসবে কবি যে ভাষণ দান করেন তাহার নাম 'দিন ও রাত্রি'[৪] এবং একমাস পরে কলিকাতায় মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে যে উপদেশ দেন তাহার নাম 'মনুষ্যত্ব'[৫]। উভয় ভাষণের মধ্যে দুঃখের দর্শন (Philosophy of Sorrow) প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়া মনে হয়। গত এক বৎসরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ স্ত্রী ও মধ্যমা কন্যার মৃত্যুজনিত যে আঘাত পাইয়াছেন তাহার বেদনা সমস্ত জীবনের অন্তঃস্থল দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সুতরাং এই ভাষণদ্বয়ে দুঃখের দর্শন থাকা খুবই স্বাভাবিক। 'দিন ও রাত্রি'র মধ্যে ঈশ্বরের মাতৃরূপের ব্যাখ্যাই হইতেছে বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া জীবন ও মৃত্যুর অপরূপ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

মাঘোৎসবের 'মনুষ্যত্ব' শীর্ষক ভাষণে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কথা নূতনভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন, মহত্তেরই গৌরব দুঃখ। বিশ্বসংসারের মধ্যে পুষ্পের দুঃখ নাই, পশুপক্ষীর দুঃখসীমা সংকীর্ণ কেবলমাত্র মানুষের দুঃখই বিচিত্র—

১ রামায়ণ ও মহাভারতের প্রতি কবির প্রগাঢ় আকর্ষণ ছিল; সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিয়া তিনি মহাভারতের মূল গল্পাংশ লিখাইয়াছিলেন; মৃণালিনী দেবী রামায়ণের আখ্যানাংশ লিখিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। দ্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ধারাবাহী, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ মাঘ-চৈত্র, পৃ ৩০৪।

২ রামায়ণী কথা। প্রাচীন সাহিত্য। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৫, পৃ ৫০১।

৩ দ্র অন্তর বাহির। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৪ (১৩১৮)। পথের সঞ্চয়, পৃ ৫৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ ৫০৫।

৪ বঙ্গদর্শন ১৩১০ মাঘ। দ্র ধর্ম। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৩৪১।

৫ বঙ্গদর্শন ১৩১০ ফাল্গুন। দ্র ধর্ম। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৩৪৮।

তাহার বেদনার সীমা যে কোথায় তাহা সম্পূর্ণ করিয়া বলা যায় না। এই দুঃখই মানুষকে বৃহৎ করিয়া তোলে। স্বল্পতায়, আরামের মধ্যে আনন্দ নাই। মানুষ সেই আনন্দকে পাইবার জন্য কঠিন দুঃখকে বরণ করে। যাহা আমরা বীর্যের দ্বারা, অশ্রুর দ্বারা না পাই,—যাহা অনায়াসে পাওয়া যায়, তাহাকে পরিপূর্ণভাবে পাইতে পারি না। মনুষ্যত্ব আমাদের পরমদুঃখের ধন, তাহা বীর্যের দ্বারাই লভ্য। মনুষ্যত্বের মধ্য দিয়া মানুষকে যাহা পাইতে হইবে, তাহা নিদ্রিত অবস্থায় পাইবার নহে।

কিন্তু মানুষ তো দুঃখকে বরণ করিয়া লইবে না। মানুষের এই নিরন্তর চেষ্টা, তাহার কর্মপ্রেরণা নিরর্থক হইত, যদি সে এই সমস্তের কোনো একটি সুসংগত পরিণাম না দেখিতে পাইত। সেই পরিণাম হইতেছেন ব্রহ্ম বা যিনি বৃহৎ— তাঁহার মধ্যে সমস্ত সমর্পণ। আমাদের এই কর্ম, কর্তৃত্বের চরম সার্থকতা হইবে তখনই, যখন আমরা আনন্দের সহিত সমস্তই ব্রহ্মকে সমর্পণ করিতে পারিব। নতুবা কর্ম আমাদের পক্ষে নিরর্থক ভার ও কর্তৃত্ব বস্তুত সংসারের দাসত্ব হইয়া উঠিবে। জীবের মধ্যে মানুষই কর্মকে ও দুঃখকে জীবনের সুসংগত পরিপ্রেক্ষণীতে দেখিতে পাইয়াছে —ইহাই মনুষ্যত্ব।

মাঘোৎসবের পর দিন (১২ই মাঘ) আলোচনা সমিতির উদ্যোগে সিটি কলেজে (তখন মির্জাপুর স্ট্রীটে কলেজ ছিল) 'ধর্মপ্রচার'[১] নামে এক বক্তৃতা পাঠ করেন। পূর্বোক্ত প্রবন্ধ দুইটি হইতে ইহার সুর সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত ধর্মসাধনাকে কঠোরভাবে পরীক্ষা করিলেন। রাজনীতির মধ্যে কপটতাকে যেমন তিনি আক্রমণ করিয়াছেন, দেশপ্রেমের মধ্যে কৃত্রিমতাকে ও ভিক্ষুকবৃত্তিকে তিনি যেমন নিন্দা করিয়াছেন,— জীবনের ধর্মসাধনাকে তিনি তেমনি কঠোরভাবেই বিশ্লেষণ করিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতে ধর্মমত বা সমাজ বড় নহে, ধর্মই বড়, মানুষই বড়। তিনি বলেন, অভ্যস্ত বাক্যের তাড়নায় মানুষের বোধশক্তি আড়ষ্ট হইয়া যায়; যে-সকল কথা অত্যন্ত জানা, তাহাকে একটা নিয়ম বাঁধিয়া বারংবার শুনাইতে গেলে, হয় আমাদের মনোযোগ একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে, নয় আমাদের হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠে। বিশেষ ভাষাবিন্যাস, বিশেষ স্থান ও সময় প্রভৃতির বাঁধাবাঁধি মানুষের মনে ধর্মের একটা সম্মোহন সৃষ্টি করে। ইহাই যথেষ্ট নয়; মানুষ ধর্মকে আর পাঁচটা ভোগ্যবস্তুর সহিত মিশাইয়া ভোগ করিতে চায়। স্বার্থ-সংগ্রামে ধর্মকে সহায় করিয়া মানুষ স্বয়ং ভগবানকে নিজের দলভুক্ত মনে করে। "ইহারা ধর্মকে বিশেষ গণ্ডী আঁকিয়া একটা বিশেষ সীমানার মধ্যে বদ্ধ করে।·· এই গণ্ডিরক্ষাকেই তাহারা ধর্মরক্ষা বলিয়া জ্ঞান করে।··ইহার কারণ, ধর্মকে আমরা আংশিক করিয়া, খণ্ডিত করিয়া, সুদূর করিয়া, সম্প্রদায়গত, মন্ত্রগত, বিশেষ-অনুষ্ঠানগত করিয়া রাখি— তাহাকে পূজার বিষয় বলিয়া জানি, ব্যবহারের সামগ্রী মনে করি না।"

কিন্তু ভারতবর্ষের এ আদর্শ সনাতন নহে। আমাদের ধর্ম রিলিজন্‌ নহে, তাহা মনুষ্যত্বের একাংশ নহে। প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের 'ধর্ম' গ্রন্থের মধ্যে আছে বলিয়া আমরা উহা হইতে আরও অংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিলাম; তবে একটা জিনিস এই প্রবন্ধে বিশেষভাবে লক্ষ্যের বিষয়। প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের ধর্ম' ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মানুষকে জগতের কেন্দ্রে বসাইয়া তাহাকে যে গৌরব দান করিয়াছেন তাহার আভাস পাই আমরা এই প্রবন্ধে। ইহার পূর্বেও 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' 'মালিনী' 'চৈতালি' প্রভৃতি নাট্য ও কাব্যের মধ্যে তিনি মানুষকে সমাজের ঊর্ধ্বে, মানবধর্মকে লৌকিক ধর্মের উপরে স্থান দিয়াছিলেন। কিন্তু গদ্যে সুস্পষ্টভাবে এই প্রথম এ-সম্বন্ধে আত্মমত জ্ঞাপন করিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, "ব্রহ্ম মানুষের নিকট একমাত্র মনুষ্যত্বের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা সত্যরূপ, প্রত্যক্ষরূপে বিরাজমান।··উপাসনাদ্বারা আমরা ক্ষণে ক্ষণে ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারি, কিন্তু ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারি না। মানুষই মানুষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ— এবং সেই সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষের মধ্যে ব্রহ্মেরই

১ বঙ্গদর্শন ১৩১০ ফাল্গুন। দ্র ধর্ম। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৩৭৬।

আবির্ভাবকে প্রত্যক্ষতম করিয়া জানা মানবজীবনের চরম চরিতার্থতা।"

আর একটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতের পরিবর্তন লক্ষিত হয়। পাঠকের স্মরণ আছে ১২৯১ সালে তিনি রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে তিনি নিজেকে ব্রাহ্ম বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু ক্রমেই জীবনের গভীর অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বুঝিতেছিলেন যে, এভাবে খণ্ড করিয়া দেখিলে সাধনা ব্যাহত হয়। "আমরা যদি আপনাদিগকে ব্রাহ্ম নামে বিশেষভাবে চিহ্নিত করিয়া হিন্দুসমাজের অপর অংশকে সেই চিহ্নের সাহায্যেই হৃদয়ের স্থান হইতে বঞ্চিত করি, তবে ব্রহ্মের নাম লইয়া ব্রহ্মকেই দূরবর্তী করিয়া রাখি। .. আমি ব্রাহ্মসমাজে— ব্রাহ্মসমাজে নহে, আমাদের সমাজে, হিন্দুসমাজে, সেই ব্রহ্মোপাসনা একান্তমনে প্রার্থনা করি।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কিভাবে উহা সমগ্র হিন্দুসমাজে সম্ভব হইবে তাহার কোনো পথ দর্শাইতে পারেন নাই। তিনি যেভাবে লিখিলেন তাহাতে মনে হয় দোষ সম্পূর্ণ ব্রাহ্মসমাজের— এবং বিশেষভাবে 'সাধারণ' সমাজের। কারণ এই সমাজের মধ্যেই হিন্দু-ব্রাহ্ম প্রশ্নটা লইয়া মাঝে মাঝে উৎকট আলোচনা চলিত; আদি ব্রাহ্মসমাজ চিরদিনই হিন্দুসমাজের সংস্কৃত সমাজ বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করিয়াছেন, যদিও হিন্দুসমাজ কোনো দিনও সেজন্য তাঁহাদিগকে নিজেদের লোক বলিয়া গ্রহণ করে নাই। যাহাই হউক এই প্রবন্ধটির মধ্যে বেশ একটু উষ্মা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার একটা কারণ তাঁহার মন প্রাচীন বর্ণাশ্রমের আদর্শ ভারতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যাকুল; সেই বর্ণাশ্রম আবার নিরাকার ব্রহ্মের পূজায় উৎসর্গীকৃত। তিনি সেই আদর্শের কথাই কল্পনা করিতেছিলেন বলিয়া এমন একান্তভাবে ব্রাহ্মসমাজের অভাবাত্মক দিকটার উপর ঝোঁক গিয়া পড়িল।

তিনি বলিলেন, "ব্রহ্ম-উপলব্ধির প্রকৃত সাধনা বালককালের ব্রহ্মচর্য্যপালনের দ্বারাই আরম্ভ করিতে হইবে।" শান্তিনিকেতনের তপোবনে তিনি যে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন ও সেখানে তিনি যে আদর্শকে সফল করিবেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন— তাহাই এখানে ব্যাখ্যা করিলেন। ব্রহ্মচর্যকাল হইতে "সংযম-নিয়মের দ্বারা সবল নির্মল হইয়া চিত্তকে শান্ত ও প্রসন্ন করিয়া, অন্তঃকরণে ভক্তিশ্রদ্ধা দ্বারা জগতের মধ্যে সজীব সরসভাবে ব্যাপ্ত করিয়া, কল্যাণকর্মের প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান দ্বারা মঙ্গলভাবকে জীবনের মধ্যে সহজ করিয়া তুলিয়া, অহিংসা ও দয়াপ্রেমের দ্বারা সকল চেতন জীবের সহিত যুক্ত হইয়া, ঐশ্বর্য বিলাসকে তুচ্ছ জানিয়া, লোকভয় মৃত্যুভয়কে ঘৃণা করিয়া, ত্যাগনিষ্ঠ আত্মদমনের দ্বারা ধৈর্যবীর্য শিক্ষা করিয়া, তবে আমরা সত্যভাবে সংসারের মধ্যে মানবজীবনকে ব্রহ্ম-উপলব্ধির দ্বারা সার্থক করিতে পারি।"

রবীন্দ্রনাথের মতে ধর্ম বিশেষ কোনো সময়ের, স্থানের মধ্যে আবদ্ধ নহে, বিশেষ কতকগুলি অনুষ্ঠান ও বাক্যের মধ্যে তাহার সত্যতা নাই— ইহা প্রতি মুহূর্তে মানবের জীবনে প্রকাশ পায়। ইহাই ছিল ভারতের আদর্শ, সেই আদর্শ হইতে চ্যুত হইয়া ব্রাহ্মসমাজ ধর্মকে রিলিজন করিতে চান জীবনের সঙ্গী নহে; সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ এমনভাবে এই প্রবন্ধে উক্ত সমাজকে আঘাত করিলেন।[১]

মাঘোৎসবের ভাষণদানের পর তিন মাসের মধ্যে কবিকে সতীশচন্দ্র রায় সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ ছাড়া আর কোনো প্রবন্ধজাতীয় রচনা লিখিতে দেখি না। এই সময়ে কবির শারীরিক অবস্থা ভালো নয় ও বিদ্যালয়ের ঝঞ্ঝাটেও তিনি বিব্রত। জ্যৈষ্ঠ (১৩১১) মাসে দেখা যায় মহর্ষি সম্বন্ধে আলোচনা (৩রা); ও 'ভাষার ইঙ্গিত'[২] সম্বন্ধে দীর্ঘ

১ কবির ধর্ম সম্বন্ধে এই eclectic ভাবনা তাঁহার জীবনে কোনো ক্ষতির কারণ হয়তো হয় নাই; কারণ, তিনি বিচিত্রের দূত বলিয়া যেভাবে ধ্যানেতে ও গানেতে মিশাইয়া ধর্মসাধনা করিতেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার স্বানুভূত আধ্যাত্মিকতা। কিন্তু তাঁহার ভক্ত, স্তাবক এবং পার্শ্ব-চরদের মধ্যে 'ব্রাহ্মধর্ম' অর্থাৎ যাহা রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্মসাধনা বলিয়া তিনি চিরজীবন ব্যাখ্যা ও প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা কচিৎ কাহারও জীবনে রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

২ শব্দতত্ত্ব, ভাষার ইঙ্গিত, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২, পৃ ৩৯৭-৪১০।

প্রবন্ধ (১৪ জ্যৈষ্ঠ) লিখিয়া সেটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে পাঠ করেন। এই প্রবন্ধটি বিশেষভাবে আলোচনীয়; বাংলাভাষার নিজস্ব ব্যাকরণ রচিত হইবার ক্ষেত্র তিনি প্রস্তুত করিয়া দিলেন। সাহিত্যের সবটাই তো রসসৃষ্টি নহে। সাহিত্য সৃষ্টির মূলীয় উপাদান ভাষা ও শব্দ। সাহিত্যিকরা ভাষা মন্থন করিয়া যে ভাবসুধা সৃষ্টি করেন, তাহার পটভূমিতে আছে শব্দসাধনা। শব্দসাধনা সম্পূর্ণ না হইলে ভাবসিদ্ধি হয় না। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতে ভাবচর্চা ও রসতত্ত্বের সহিত শব্দচর্চা ও ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। তিনি ইতিপূর্বে ভাষাতত্ত্ব ধ্বনিতত্ত্ব শব্দতত্ত্ব লইয়া বহু প্রবন্ধ সমালোচনা লিখিয়াছেন; এবারও 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধে তিনি শব্দের মধ্যে কতখানি অব্যক্ত অর্থ ও আভাস প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহাই বহু উদাহরণ দিয়া ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধশেষে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই এই রচনার উদ্দেশ্য ও প্রেরণা; তিনি বলিলেন, "আমার এই চেষ্টায় কাহারও মনে যদি এরূপ ধারণা হয় যে, প্রাকৃত বাংলাভাষার নিজের একটি স্বতন্ত্র আকারপ্রকার আছে এবং এই আকৃতি প্রকৃতির তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া শ্রদ্ধার সহিত অধ্যবসায়ের সহিত বাংলাভাষার ব্যাকরণরচনায় যদি যোগ্য লোকের উৎসাহ বোধ হয়, তাহা হইলে আমার এই বিস্মরণযোগ্য ক্ষণস্থায়ী চেষ্টাসকল সার্থক হইবে।"

সাহিত্য পরিষদে প্রবন্ধপাঠের পর যে আলোচনা হয় তাহাতে সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত যোগদান করেন। রবীন্দ্রনাথ উক্ত আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেন, "বাংলাভাষার আকৃতি কিরূপ হইলে ভালো হয়, সে-সম্বন্ধে আমার মত যে কী, তাহা আমি এ-প্রবন্ধে বলি নাই, বলিতে আসিও নাই। সংস্কৃতভাষার সাহায্য ভিন্ন বাংলাভাষা যে সুসংগতভাবে প্রকাশ করা যায়, তাহা বিশ্বাস করি না। আমার এ-প্রবন্ধ ব্যাকরণমূলক। চলিত কথাগুলির মধ্যে ব্যাকরণের যে-একটি সূত্র বর্তমান আছে, আমি তাহাই টানিয়া বাহির করিয়া আপনাদের দেখাইতেছি।" তিনি আরও বলেন প্রাদেশিক শব্দসংগ্রহ ও তদ্‌বিষয়ক অভিধান প্রণয়ন করা কর্তব্য। মোট কথা এই প্রবন্ধটির মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃত বাংলাভাষার একটি সম্পূর্ণ নূতন দিক খুলিয়া দিলেন।[১]

জ্যৈষ্ঠমাসের শেষাশেষি কবি মজঃফরপুর যান সেকথা পূর্বে বিবৃত করিয়াছি। মজঃফরপুরে 'যথেষ্ট কুঁড়েমি করেও একটু আধটু সময়' পান, তখন লেখেন নৌকাডুবি। বঙ্গদর্শনের জন্য 'পাগল'[২] নামে প্রবন্ধটি এইখানে এই সময়ে রচিত (১৩১১ শ্রাবণ)। প্রবন্ধটি সম্বন্ধে কিছুকাল পরে একখানি পত্রমধ্যে লেখেন—"ক্ষ্যাপার ক্ষ্যাপামি আপনার কাছে সম্প্রতি কিছু অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে— কিন্তু এ কথা মনে রাখিবেন তাঁহার তাণ্ডবলীলার উপদ্রব আপনার চেয়ে অনেক বেশি সহিয়াছে এমন লোক চারিদিকেই আছে।...আমার সুখ দুঃখে কি আসে— জগন্নাথের রথ চলিতেছে এবং ইচ্ছা করি বা না করি আমাকে তাহা টানিতেই হইবে। মুখ ভার করিয়া মনে বিদ্রোহ রাখিয়া টানাই পরাজয়— প্রফুল্ল মুখে চলিতে পারিলেই আমার জিৎ।"[৩]

'পাগলে'র মধ্যে যে বৈরাগ্য ও আধ্যাত্মিক আকূতির আভাস পাই, কয়েকটি গানের মধ্য দিয়া সেই আকুল আন্তরিকতা প্রকাশ পাইয়াছে। গান কয়টি খুবই পরিচিত। ১. সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে। ২. যে কেহ মোরে দিয়েছ সুখ। ৩. তুমি যে আমারে চাও। ৪. কী সুর বাজে আমার প্রাণে, আমি জানি, মনই জানে। এই মনোভাব হইতে তাঁহার বিখ্যাত 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধ বোধ হয় এই সময়েই লিখিত।

১ ভাষার ইঙ্গিত লইয়া যে আন্দোলন হয় তাহা রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২ খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে বিস্তৃতভাবে আছে।

২ রচনাটির গোড়ায় আছে—"পশ্চিমের একটা ছোটো সহর।...এই সহরটির মাথার উপর হইতে বর্ষা হঠাৎ তাহার কালো অবগুণ্ঠন একেবারে অপসারিত করিয়া দিয়াছে। আমার অনেক জরুরি লেখা পড়িয়া আছে—তাহারা পড়িয়া রহিল। জানি তাহা ভবিষ্যতে পরিতাপের কারণ হইবে।...দ্র বিচিত্র প্রবন্ধ ১ম সংস্করণ। জরুরি লেখার একটি বোধ হয় 'আত্মপরিচয়' ও দ্বিতীয়টি 'স্বদেশী সমাজ'।

৩ স্মৃতি, পৃ ৪৪। ০ কার্তিক ১৩১ ।

আমাদের এই আলোচ্য-পর্বে রবীন্দ্রনাথকে এমন দুইটি প্রবন্ধ লিখিতে দেখি, যাহা আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ পৃথক। সেই রচনা দুইটি হইতেছে-'আত্মপরিচয়' ও 'স্বদেশী সমাজ'। প্রথমটি লেখেন 'বঙ্গবাসী' কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে। আর দ্বিতীয়টি লিখিতে হয় দেশের অনুরোধে দেশের প্রতি দেশবাসীর কর্তব্য নির্দেশের জন্য। 'বঙ্গভাষার লেখকে'র জন্য রবীন্দ্রনাথের নিকট তাঁহার জীবনকথা লিখিয়া দিবার অনুরোধ আসে, কিন্তু তিনি লিখিলেন কাব্যজীবনের অনুভূতি ও অভিব্যক্তির কথা। কবির কাছে কাব্যই তাঁহার জীবন, ঘটনা অবান্তর মাত্র। আর দেশের জলাভাব, অন্নাভাব প্রভৃতি জীবন মরণের সমস্যা নিরাকৃত করিবার জন্য যে সভা আহূত হইল, সেখানে তিনি রাজনীতির তপ্তকথা না বলিয়া, বলিলেন কিনা গ্রামোদ্যোগ বা গ্রামসংগঠনের কথা! জীবনের তথ্য লিখিতে গিয়া লিখিলেন তত্ত্বকথা;— আর রাজনীতির তপ্তকথার আলোচনার স্থানে বলিলেন গ্রামের মূল বাস্তব তথ্যের কথা। লোকে যাহা আশা করিয়াছিল ঠিক তাহার বিপরীত কথা বলিলেন। তাই দুইটি প্রবন্ধের জন্যই সাহিত্যিক ও রাজনীতিক—উভয় শ্রেণীর লোকের নিকট হইতেই কবি প্রচুর পরিমাণে লাঞ্ছনা ভোগ করিলেন। কিন্তু কবি যে সত্যদ্রষ্টা তাহা 'কাল' প্রমাণ করিয়াছে।

বঙ্গবিচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলন

বঙ্গবিভাগ উপলক্ষ করিয়া বংলাদেশের মধ্যে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাকে একটা রাজনৈতিক আন্দোলন মাত্র বলিলে বিষয়টাকে অত্যন্ত লঘু করিয়া দেখা হইবে। শিক্ষিত বাঙালির মন কি ভাবে য়ুরোপীয়তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া উঠিতেছিল, তাহার আলোচনা আমরা পূর্বেই করিয়াছি। বিংশ শতাব্দীর আরম্ভে রাজনীতি যে মূর্তিতে দেখা দিল, তাহাকে আন্দোলন না বলিয়া, বলা উচিত বিপ্লব। অতীতের সহিত পরম্পরাগত সম্বন্ধ যখন ছিন্ন হয়, তখনই তাহাকে বিপ্লব বলা যায়। সংঘশক্তির জাগরণ ও আত্মশক্তির উদ্‌বোধন হইতেছে এ যুগের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য।

বিংশ শতকের গোড়ায় বুয়র যুদ্ধে ইংরেজের ইম্‌পিরিয়ালিজমের নগ্নমূর্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে। ইংরেজের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর শিক্ষিত ভারতের যে অন্ধ অনুরাগ উনবিংশ শতকের শেষভাগে ম্লান হইয়া আসে; তাহা বৃটিশ ধনতান্ত্রিকবাদের বর্বর যুদ্ধ ব্যাপারে এইবার একেবারে লোপ পাইল।

পশ্চিমের প্রতি মনের অন্ধ অনুরাগ যেমন এক দিকে হ্রাস পাইতেছে, পূর্ব এশিয়ার নব-জাগ্রত জাপানের প্রতি শিক্ষিতদের চিত্ত তেমনই আকৃষ্ট হইতেছে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি (১৯০২-৩) তখনো জাপান রুশকে পরাজিত করিয়া বিশ্বের বিস্ময় উদ্রেক করে নাই। দুই একজন ভাবুক জাপানী আসিতেছেন, মুষ্টিমেয় বাঙালি মনীষীদের সহিত তাঁহাদের পরিচয় হইতেছে। এই আশাবাদী, আদর্শ-সন্ধানীদের অন্যতম হইতেছেন কাকুজো ওকাকুরা; শিল্পী ও শিল্পশাস্ত্রী বা আর্টক্রিটিক বলিয়াই তাঁহার খ্যাতি। স্বামী বিবেকানন্দকে জাপানে লইবার জন্য তিনি ভারতে আসেন; কিন্তু স্বামীজি তখন ভগ্নস্বাস্থ্য— তাঁহার যাওয়া হইল না। বাংলাদেশে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয় এক দিকে রামকৃষ্ণ আশ্রমের সাধুদের সহিত, ভগিনী নিবেদিতার সহিত ও অপর দিকে ঠাকুরবাড়ির সহিত। তিনিই হোরি সানকে সংস্কৃত শিখিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পাঠাইয়া দেন। ওকাকুরার বিশ্বাস যে, উদ্ধত পাশ্চাত্যজাতির নিকট হইতে শ্রদ্ধা পাইতে হইলে সমগ্র এশিয়াকে সংঘবদ্ধ হইতে হইবে। তাঁহার *Ideals of the East* গ্রন্থের প্রথম বাক্য হইতেছে "Asia is one"। এ গ্রন্থ রুশ-জাপানযুদ্ধের পূর্বে রচিত। বিংশ শতকের সূচনামুখে পাশ্চাত্য প্লাবনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ওকাকুরা বলিলেন "Asia is one"। তিনি শক্তিহীন চীনকে হীনতর প্রতিপন্ন

করিবার জন্য আদৌ উৎসুক ছিলেন না, বরং জাপানের সহিত চীনের চিত্তের যে অচ্ছেদ্য যোগবন্ধন রহিয়াছে তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া জাপানীদের সম্মুখে ধরিলেন। তিনি জাপানের প্রবাদগত শিল্পধারার বৈশিষ্ট্যকে সাইন্সের সহিত যুক্তির সহিত শ্রদ্ধার সহিত ব্যাখ্যা করিলেন; তিনি জানিতেন প্রত্যেক জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মপ্রকাশ হইতেছে শিল্পধারায়। চিত্রাদি শিল্পকলার ভাষা নাই, কিন্তু তাহারা মূক নহে। সাহিত্যের ভাষা দেশভেদে পৃথক, কালভেদেও তাহারা দুর্বোধ্য— বিদ্যার অভাবে সাহিত্য লেখাও যায় না, পড়াও যায় না। কিন্তু চারুশিল্পের মধ্য দিয়া লোকে তাহাদের অন্তরের বাণী প্রকাশ করিতে পারে, কেবলমাত্র পাঁচ আঙুলের লীলায় সেসব কথা বলিতে পারে। শিল্পের বাণী সহজেই সর্বসাধারণের বোধগম্য হয়। সেইজন্য ওকাকুরা যে গ্রন্থখানি লিখিলেন তাহাতে আদর্শ আলোচনা করিতে গিয়া তিনি জাপানের আর্টের অভিব্যক্তির কথাই বলিলেন, কারণ জাপানের যথার্থ ইতিহাস রূপ লইয়াছে শিল্পসৌন্দর্যে, তাহার পাশ্চাত্য অনুকরণপ্রিয়তা তাহাকে মহত্ত্ব দান করিতে পারে নাই। শিল্পের মূক ভাষা সমস্ত প্রাচ্য এশিয়াকে এক করিবে এই ছিল আদর্শবাদী ওকাকুরার স্বপ্ন।

সমসাময়িকদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও ওকাকুরা অখণ্ড এশিয়ার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে ভারতে যে জাতীয়তাবোধ জাগিয়াছিল, তাহা প্রধানত ধর্মমূলক। বিংশ শতকের গোড়ায় ভারতীয় শিল্পকলা জাতীয়তাবোধকে আশ্রয় করিয়া নূতনভাবে দেখা দিল। শিল্পচেতনার জাতীয়তায় এ দেশের শিক্ষিত সমাজকে নূতনভাবে উদ্‌বুদ্ধ করিলেন মহামতি হ্যাভেল। কারুশিল্পের মধ্যে যে সৌন্দর্য আছে, কুটিরশিল্পের মধ্যে যে কৌলীন্য আছে, তাহার প্রতি হ্যাভেলই শিক্ষিতের দৃষ্টি সর্বপ্রথম আকর্ষণ করিলেন। কারুশিল্প হইতে চারুশিল্পে, বয়নশিল্প হইতে সূচীশিল্পে, মৃৎশিল্প হইতে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে তাঁহার দৃষ্টি গেল। তিনি ক্রমে ভারতীয় চিত্র, ভারতীয় স্থাপত্যের সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ভারতীয় শিল্পের প্রতি ভগিনী নিবেদিতার দৃষ্টি গেল বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের ও আধ্যাত্মিক হিন্দুত্বের দিক হইতে; হিন্দুধর্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি-হিন্দুসমাজ সংস্থানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা তাঁহার ভারতীয় শিল্পের প্রতি অনুরাগের জন্য দায়ী। ভারতীয় শিল্প আধ্যাত্মিক, এই বুলির উদ্ভব এই সময় হইতে। বিবেকানন্দ হিন্দুদের মধ্যে সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে যেমন শ্রদ্ধা জাগ্রত করিয়াছিলেন, ভগিনী নিবেদিতা তাহাদের মধ্যে ভারতীয় আর্ট সম্বন্ধে তেমনই শ্রদ্ধার বোধ উদ্রিক্ত করিতে সমর্থ হইলেন। হ্যাভেল ও নিবেদিতা ও অল্প পরেই কুমারস্বামী প্রাচীন ভারতশিল্পের যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দান করেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই ধারা অবলম্বনে চিত্রশিল্পে অভিনবত্ব আনিলেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁহার সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রাচীন ভারতের আদর্শ প্রকাশে রত, অবনীন্দ্রনাথও তেমনি প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্যবোধকে চিত্রে ও রেখায় ফুটাইয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সাংস্কৃতিক ও স্বাদেশিকতার দুইটি রূপ যুগপৎ বাংলাদেশে দেখা দিল রবীন্দ্রনাথের বাণী ও অবনীন্দ্রনাথের বর্ণের মধ্যে। সেইজন্য আমরা বলিয়াছিলাম, বাংলাদেশে যে আন্দোলন বঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষে আত্মপ্রকাশ করিল তাহার কারণগুলি ছিল গভীরে। নানা লোকে নানাভাবে বহুকাল হইতে দেশের বিচিত্র সমস্যা ও তাহার সমাধানের উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। তবে আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি তখনও রাজনীতি ভাবুকতার পর্যায়ে আছে— দেশসেবা স্বপ্নবিলাসমাত্র। দেশের যথার্থ অবস্থা না জানিয়াই হউক, অথবা ভাবালুতার আবেগে বাস্তবকে লঘু করিয়াই হউক, আমরা কর্মের জন্য পরস্পরকে আহ্বান করিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু কী করিতে হইবে তাহা জানিতাম না। তাই উচ্ছ্বাস ও কোলাহল যে পরিমাণ হইয়াছিল প্রগতি সে পরিমাণে হয় নাই। এমন সময়ে কঠিন আঘাতে জাতির চেতনা হইল।

আত্মশক্তিপ্রতিষ্ঠ, ব্যবহারিক রাজনীতিক আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত হয় বাংলাদেশে বঙ্গচ্ছেদ-ব্যপদেশে। বঙ্গচ্ছেদ এই জাতীয় আন্দোলনের কারণ নহে, উহা উপলক্ষমাত্র; আন্দোলনের পটভূমিতে যেসব কারণ ছিল,

তাহার কথা তো আমরা আলোচনা করিলাম।

রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে কখনো কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত যোগযুক্ত হন নাই; কিন্তু দেশের রাজনীতির মূলতত্ত্বের সহিত কখনো সম্বন্ধচ্ছিন্ন হইয়া কবির ন্যায় উদাসীনতার মধ্যে বাসও করেন নাই। দেশের প্রত্যেকটি বিক্ষোভ বা আন্দোলন তাঁহার স্পর্শচেতন দেহমনকে জীবনের শেষ পর্যন্ত নাড়া দিয়াছিল।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বাংলাদেশে বঙ্গভঙ্গ, য়ুনিভার্সিটি বিল, প্রাইমারি-শিক্ষা-সংস্কার প্রভৃতি বিষয় লইয়া আলোচনা শুরু হইয়াছে, ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতালাভের আন্দোলনের সূত্রপাত লইয়া। ১৯০৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর (১৭ অগ্রহায়ণ ১৩১০) তারিখে ক্যালকাটা গেজেটে বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত করিবার সরকারি প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। বঙ্গদেশ বলিতে তখন বুঝাইত বিপুল দেশ— বিহার উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ বা বর্তমানের পূর্বপাকিস্তান। এখন চার জন গবর্নর যতখানি প্রদেশ শাসন করেন, তখন একজন ছোটলাটের উপর ততখানি ভূখণ্ড পরিচালনার ভার ন্যস্ত ছিল। সরকারি পক্ষের যুক্তি যে, এত বড় প্রদেশ একজন ছোটলাটের পক্ষে শাসন করা সুকঠিন। তখন ছোটলাটকে সাহায্য করিবার জন্য মন্ত্রীপরিষদ বা কোনো অধ্যক্ষ-সভাও ছিল না। সুতরাং স্থির হইল আসাম প্রদেশের সহিত রাজশাহী ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ তিনটি যুক্ত করিয়া 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে নূতন প্রদেশ গঠিত হইবে, চিফ কমিশনরের বদলে শাসক হইবেন একজন লেফটেনেন্ট গবর্নর: তাঁহার রাজধানী হইবে ঢাকা, শৈলাবাস শিলং। বঙ্গদেশ বলিতে থাকিবে বর্ধমান বিভাগ ও প্রেসিডেন্সি বিভাগ, বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা; অর্থাৎ বাঙালি বিহারি ও ওড়িয়া পূর্ববৎ একই রাষ্ট্রপ্রশাসন-ব্যবস্থার থাকিল, এবং পূর্ববঙ্গের বাঙালিদের সহিত অসমিয়ারা ও উপজাতিসমূহ একশাসনাধীন থাকিল।

লর্ড কর্জন ভারতের বড়লাট হইয়া আসিবার পর হইতে ভারতীয়দের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ও হিন্দুমুসলমানের সংবদ্ধভাবে কার্য করিবার সংকল্পকে নানাভাবে প্রতিহত করিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। বঙ্গচ্ছেদটা সেই জটিল বৃটিশ ভেদনীতির অন্যতম প্রকাশমাত্র। পূর্ববঙ্গ মুসলমানপ্রধান দেশ; কর্জন স্বয়ং ঢাকায় গিয়া মুসলমানদিগকে স্বপক্ষে টানিবার জন্য বলিলেন যে, পূর্ববঙ্গ নূতন প্রদেশে পরিণত হইলে তথায় মুসলিমদের প্রাধান্য হইবে। ঢাকার নবাব প্রভৃতি ধনিক শ্রেণীর কয়েকজন ইংরেজের এই কথায় মাতিয়া উঠিয়া বঙ্গচ্ছেদকে আনন্দে অনুমোদন করিলেন।

ইংরেজ রাজপুরুষেরা বঙ্গচ্ছেদটাকে নানা দিক হইতে মোলায়েম করিবার চেষ্টা করিলেও উহার মধ্যে ইংরেজের কূটনীতির আভাস আবিষ্কার করিতে বাঙালিকে অধিক প্রয়াস করিতে হয় নাই। গত কয়েক বৎসরের ভিতর হিন্দুদের মধ্যে জাতীয় জীবন উদ্‌বুদ্ধ ও সংঘবদ্ধ করিবার যে প্রয়াস দেখা গিয়াছিল, তাহাকে শমিত করিবার উপায় ইংরেজের জানা ছিল; তাই সে অমোঘ ভেদনীতির বাণটি সুনিপুণভাবে নিক্ষেপ করিল। যাহাই হউক, এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া দেশের মধ্যে অকস্মাৎ ভীষণ চঞ্চলতা দেখা দিল। সার্ধশতাব্দী কাল বাঙালি 'ভীরু' এই আখ্যা পাইয়া সকলের উপেক্ষা ও অবজ্ঞার পাত্র হইয়া আছে; সেই অপবাদ ক্ষালন করিবার জন্য আজ সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই আন্দোলনের মধ্যে একটি অপূর্বত্ব বিদেশীরা লক্ষ্য করিল যে, বাঙালি রাজভক্তির মিথ্যা ভড়ং না করিয়া, মহারানী ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ সালের ঘোষণাপত্রের দোহাই না দিয়া, ইংরেজের মহৎগুণের ও স্বাধীনতাস্পৃহার স্তুতিবাদ না করিয়া, স্পষ্ট কথা সাহসভরে বলিল এবং তজ্জন্য সকল প্রকার নির্যাতন অসম্মানকে দেশসেবার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলিয়া হাস্যমুখে বরণ করিয়া লইল।

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই গবর্নমেণ্টের কাছে আবেদন-নিবেদনের বিরোধী। তিনি দেশবাসীর উদ্দেশে বলিলেন, "যদি সত্যই তোমার এই ধারণা হইয়া থাকে যে, বাঙালি জাতিকে দুর্বল করিবার উদ্দেশ্যেই বাংলাদেশকে খণ্ডিত করা হইতেছে, যদি সত্যই তোমার বিশ্বাস যে, য়ুনিভার্সিটি বিলের দ্বারা ইচ্ছাপূর্বক য়ুনিভার্সিটির প্রতি মৃত্যুবাণ বর্ষণ করা

হইতেছে, তবে সে কথা উল্লেখ করিয়া তুমি কাহার করুণা আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ ?" যে আঘাত করিতে উদ্যত তাহাকে আঘাতের ফল সম্বন্ধে ধর্মোপদেশে কিছু হয় না। তাই রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে কপটতা ত্যাগ করিয়া এই উদ্যত আঘাতের যাহা শিক্ষা তাহাই গ্রহণ করিবার জন্য সকলকে আহ্বান করিলেন। তিনি আগত বঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে দেশবাসীকে বলিলেন, নৈরাশ্যের কোনো কারণ নাই, বঙ্গচ্ছেদের দ্বারা বাঙালিকে দ্বিখণ্ডিত করা যাইবে না। "বিচ্ছেদের চেষ্টাতেই আমাদের ঐক্যানুভূতি দ্বিগুণ করিয়া তুলিবে। পূর্বে জড়ভাবে আমরা একত্র ছিলাম, এখন সচেতনভাবে আমরা এক হইব। বাহিরেব শক্তি যদি প্রতিকূল হয়, তবেই প্রেমের শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া প্রতিকার-চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। সেই চেষ্টাই আমাদের যথার্থ লাভ।"[১]

য়ুনিভার্সিটি বিল[২] যখন কর্জন সাহেব পেশ করিলেন, তখনও দেশের মধ্যে সেই একই কথা উঠিল— ইংরেজ সরকার দেশের উচ্চশিক্ষার প্রসার দেখিয়া আতঙ্কিত হইযা উঠিয়াছেন। ইংরেজি শিক্ষা বহু-সুলভ প্রচারের ফলে পাশ্চাত্য স্বাধীনতার ভাব বাঙালির মধ্যে প্রচার লাভ করিতেছে এবং সেই সঙ্গেই বেকারসমস্যা বাড়িতেছে। লর্ড কর্জনের বিল দেশের উচ্চ শিক্ষাকে রোধ করিতে উদ্যত হইল। নূতন বিল অনুসারে শিক্ষা আশাতীতরূপে ব্যয়সাধ্য হইবে ; সুতরাং দরিদ্র দেশের পক্ষে উচ্চশিক্ষা লাভ করা অসম্ভব।

বিল পাস হইয়া গেল ; দেশসুদ্ধ লোকের প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া জবরদস্ত লাট আইন পাস করিলেন। কিন্তু তাহার পর লোকের নিশ্চেষ্টতা দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া 'বঙ্গদর্শনে' লিখিয়াছিলেন, "আন্দোলন-সভায় আমরা যে পরিমাণে সুর চড়াইয়া কাঁদিয়াছিলাম, রঙ ফলাইযা ভাবী সর্বনাশের ছবি আঁকিয়াছিলাম, আমাদের বর্তমান নিশ্চেষ্টতা কি আমাদের সেই পরিমাণ লজ্জার বিষয় নহে!"[৩]

বিদ্যাকে ভারতবর্ষ চিরদিনই বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছে। ধনীর চণ্ডীমণ্ডপে যে পাঠশালা বসে, গরীবের ছেলেরা বিনা পয়সায় তাহাতে শিক্ষা পায় ; রাজার সভায় যে উৎসব হয়, দরিদ্র প্রজা বিনা আহ্বানে তাহাতে প্রবেশলাভ করে। টোল চতুষ্পাঠীতেও অপ্রতিগ্রহী ব্রাহ্মণরা চিরদিন শিক্ষাদান করিয়া আসিতেছে। সমাজব্যবস্থায় শিক্ষা সুলভ ছিল। সেই সমস্ত দেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ইংরেজি শিক্ষার ফলে ও ইংরেজ শাসনের যন্ত্রপীড়নে বন্ধ হইয়া আসিতেছে। রবীন্দ্রনাথের মতে এদেশে বিদ্যাকে অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য করা কোনো মতেই সংগত নহে।

ইহার কারণও তিনি দেখাইলেন। বিলাতী সভ্যতার সহিত তুলনা করিয়া বলিলেন সেখানে সমস্তই টাকার দ্বারা চালিত ; আমোদ হইতে লড়াই পর্যন্ত সমস্তই টাকার ব্যাপার। ইহাতে টাকা একটা প্রকাণ্ড শক্তি হইয়া উঠিয়াছে এবং টাকার পূজা আর-সমস্ত পূজাকে ছাড়াইয়া চলিয়াছে।

সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় আদর্শের মূলে গেলেন। তিনি বলিলেন, আমাদের দেশে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা সমাজের উপর ছিল— রাজার উপরে, বাহিরের সাহায্যের উপরে ইহার নির্ভর ছিল না— সমাজ ইহাকে রচনা করিযাছে, এবং সমাজকে ইহা রক্ষা করিয়াছে। এখন বিদ্যাশিক্ষা রাজার কাজ পাইবার জন্য ; জ্ঞানের জন্য নহে ; সুতরাং রাজা-রাজপুরুষের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ ইহার সাফল্য নির্ভর করে। সুতরাং ইহার যথেচ্ছা হইতে আত্মসম্মান

১ সাময়িক প্রসঙ্গ, বঙ্গবিভাগ। বঙ্গদর্শন ১৩১১ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৮১-৮৭। পরিশিষ্ট, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০।

২ লেখকের ভারতে জাতীয় আন্দোলন, ১৩৩১। শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, কংগ্রেস। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, মুক্তির সন্ধানে ভারত।

৩ সাময়িক প্রসঙ্গ, য়ুনিভার্সিটি বিল। বঙ্গদর্শন ১৩১১ আষাঢ়, পৃ ১৪৫-১৫০। ইহার একটা কারণ বোধ হয় বিল যেভাবে পাস হইয়াছিল তাহা কার্যক্ষেত্রে আসিয়া অনেকখানি ভোঁতা হইয়া গেল ; কলেজের শিক্ষা ব্যাপকভাবে ও গভীরভাবে সেই হইতে চলিল, অবশ্য সেজন্য দায়ী প্রাতঃস্মরণীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিভা। কিন্তু এই সময় হইতে বিদ্যাশিক্ষা একটা ভীষণ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। ইহা ভারতীয় ইতিহাস ও প্রতিভার বিপরীত

ও দেশীয় সংস্কৃতিকে রক্ষার একমাত্র উপায় 'নিজেদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থাভার নিজেরা গ্রহণ করা'। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাক্ষেত্র সম্বন্ধে জোর করিয়া বলিলেন— আমাদের একমাত্র কর্তব্য, নিজেরা সচেষ্ট হওয়া, 'অবজ্ঞা অনাদর অশ্রদ্ধার হাত হইতে বিদ্যাকে উদ্ধার' করা। বাংলার মনীষীদের মনে বঙ্গে জাতীয় শিক্ষা প্রচারের প্রথম উল্লেখ এইখানে। তিনি শান্তিনিকেতনে যে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান, গবর্নমেণ্টের সহায়তা লাভের কথা সেখানে কেহ কল্পনাও করিতে পারিতেন না। এইখানেই ছিল ইহার বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথ দেশকে ভালোবাসেন ; কিন্তু এই সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে দেশের মধ্যে যে একটা উৎকট স্বাদেশিকতার ভাব আসিতেছে তাহা দেখিয়া তিনি একটু আতঙ্কিত হন ; বাঙালি 'নেশন' বলিয়া সর্বত্রই অভিহিত হইতেছিল এবং সকলের কাম্য হইয়াছিল ন্যাশনালিজমের আদর্শ প্রচার। সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমাদিগকে নেশন বাঁধিতে হইবে— কিন্তু বিলাতের নকলে নহে"। প্যাট্রিয়টিজমের বাংলা প্রতিশব্দ করিলেন 'স্বাদেশিকতা' ; এই স্বাদেশিকতাকে তিনি চরম কাম্য বলিয়া স্বীকার করিলেন না। যে স্বাদেশিকতা স্বদেশের ঊর্ধ্বে আর কিছুই স্বীকার করে না, স্বদেশের লেশমাত্র স্বার্থে যেখানে বাধে না, যেখানে ধর্ম দয়া আপনার দাবি উত্থাপন করিতে পারে না, সে স্বদেশীয়তাকে তিনি শ্রদ্ধা করেন নাই, জাতীয় স্বার্থতন্ত্রই যে মনুষ্যত্বের চরম লাভ এ কথা তিনি মনে করেন না। তিনি বলিলেন জাতীয় স্বার্থের উপরেও ধর্মকে রক্ষা করিতে হইবে, মনুষ্যত্বকে ন্যাশনালত্বের চেয়ে বড় বলিয়া জানিতে হইবে। "মনুষ্যত্বের মঙ্গলকে যদি ন্যাশনালত্ব বিকাইয়া দেয়, তবে ন্যাশনালত্বের মঙ্গলকেও একদিন ব্যক্তিগত স্বার্থ বিকাইতে আরম্ভ করিবে।" রবীন্দ্রনাথ রাজনীতি শিক্ষানীতি সম্বন্ধে যতই তীব্র মন্তব্য প্রচার করুন-না তাঁহার অন্তর নিত্যধর্মবোধের কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত ; তাই দেখি দেশব্যাপী আন্দোলনের মধ্যে তিনি প্যাট্রিয়টিজমকে ধর্মের উপরে স্থান দিতে পারিলেন না।

এই সময়ে সখারাম গণেশ দেউস্কর নামে একজন প্রবাসী মারাঠি বাংলাভাষায় 'দেশের কথা' (প্রথম সংস্করণ ১৯০৪) নামে একখানি বই লেখেন ; বইখানিতে ইংরেজ কিভাবে বাণিজ্যে অবিচার করিয়া দেশীয় বাণিজ্য ধ্বংস করিয়াছে, কিভাবে শঠতা করিয়া রাজ্য জয় করিয়াছে তাহার ইতিহাস নানা তথ্যতালিকা দ্বারা প্রমাণ করা হয় ; গ্রন্থখানি বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়। বাংলাদেশের বালক ও অল্পশিক্ষিত তরুণদের মনকে ইংরেজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার পক্ষে 'দেশের কথা'র স্থান অবশ্যস্বীকার্য। দীনেশচন্দ্র সেন এই গ্রন্থের যে সমালোচনা 'বঙ্গদর্শনে' পাঠান, তাহারই উপর রবীন্দ্রনাথ 'দেশের কথা' নাম দিয়া এক প্রসঙ্গকথা লেখেন[১]।

দেশের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা উচ্ছ্বাসের পথ বাহিয়া যে মূর্তিতে প্রকাশ পাইতে থাকিল, তাহাকে সফল করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর সম্মুখে গঠনমূলক কার্যের পরিকল্পনা পেশ করিলেন।

মজঃফরপুর হইতে কলিকাতায় ফিরিবার অল্প কয়েক দিনের মধ্যে তিনি 'স্বদেশী সমাজ'[২] শীর্ষক বিখ্যাত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন সভাপতি ; সভায় এত ভিড় হয় যে, দরজা ভাঙার উপক্রম হইলে ঘোড়-সওয়ার পুলিস ভিড় সামলায় এবং বিপ্লবী উল্লাস কর দত্ত পুলিস সার্জেণ্টের সঙ্গে মারামারি করেন। প্রবন্ধটি কিছু পরিবর্তন করিয়া পুনরায় মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে পাঠ করেন (১৬ শ্রাবণ)। এই পাঠটি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় (১৩১১ ভাদ্র)।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জনসেবার আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া, ভারত কিভাবে শ্রেয়ের পথকে অবলম্বন করিয়া চলিয়া আসিতেছিল, তাহাই দেখাইলেন। রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম দেশের নেতাদিগকে বলিলেন

১ সাময়িক প্রসঙ্গ, দেশের কথা। বঙ্গদর্শন ১৩১১, শ্রাবণ। পরিশিষ্ট, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১০।

২ মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে চৈতন্য লাইব্রেরির উদ্যোগে আহূত বিশেষ অধিবেশন, ৭ শ্রাবণ ১৩১১ ॥ ১৯০৪ জুলাই ২২। আত্মশক্তি, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৩।

যে, ভারতের মর্মস্থল তাহার গ্রামে; সেই গ্রামের সমস্যা ভারতের সমস্যা; গ্রামে নূতন প্রাণ আনিতে পারিলে ভারতের কল্যাণ।

কথাটা উঠিয়াছিল গ্রামের জলাভাব লইয়া। কাগজে পত্রে, সভাসমিতিতে 'সরকারের এ বিষয়ে দৃষ্টি নাই' বলিয়া নালিশ উঠিতেছিল। কিন্তু এখন যে নালিশটা অসংগত এ কথা লোকে যেন বুঝিয়াও বোঝে না; কারণ পূর্বে রাষ্ট্রের স্বার্থ ও সমাজের স্বার্থ বিরুদ্ধ ছিল না: এখন রাষ্ট্র ও সমাজ পৃথক্। রবীন্দ্রনাথ দেখাইলেন যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের যুদ্ধবিগ্রহ, বিচার, শাসন, রাজা করিতেন; কিন্তু জলদান বিদ্যাদান প্রভৃতি সৎকর্ম সমাজ করিত।

ভারতবাসীরা বর্তমানে ক্রমে ক্রমে তাহাদের সামাজিক কর্তব্যগুলি স্টেটের হাতে তুলিয়া দিতেছে, এমনকি আমাদের সামাজিক প্রথাকেও ইংরেজের আইনের দ্বারাই বাঁধিতে দিতেছে: রবীন্দ্রনাথ বলিলেন ইহার মধ্যেই সমাজের মূল দুর্বলতা রহিয়াছে।

এই দীর্ঘ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছিলেন তাহার চুম্বক করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ প্রত্যেক চিন্তাশীল পাঠকই তাঁহার 'স্বদেশী সমাজ' বিষয়ক প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছেন। তবে রবীন্দ্রনাথ দেশসেবাকে কিভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা সংক্ষেপে আলোচ্য; কারণ তাহা হইতে দেখা যাইবে, বর্তমান পল্লীসংগঠন পল্লীসেবার প্রথম গঠনমূলক কার্যপদ্ধতি রবীন্দ্রনাথই দেশের সমক্ষে প্রকাশ করেন— সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রথম খসড়া।

জনসংঘকে একত্র করিবার জন্য বিলাতি ছাঁচের একটা সভা করিবার তিনি বিরোধী; তাঁহার মতে সভার পরিবর্তে দেশী ধরণের একটা বৃহৎ মেলা করিয়া দেশের লোককে আহ্বান করাই খাঁটি ভারতীয় পদ্ধতি। এই মেলায় ভারতের জনসংঘ একত্র হইয়াছে। সেখানে যাত্রাগান-আমোদ-আহ্লাদে দেশের লোক দূরদূরান্তর হইতে একত্র হইবে। সেখানে দেশী পণ্য ও কৃষিদ্রব্যের প্রদর্শনী হইবে। সেখানে ভালো কথক কীর্তন-গায়ক ও যাত্রার দলকে পুরস্কার দেওয়া হইবে। সেখানে ম্যাজিক লণ্ঠন প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণ লোকদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্বের উপদেশ সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইবে এবং আমাদের যাহা-কিছু বলিবার কথা আছে, যাহা কিছু সুখদুঃখের পরামর্শ আছে, তাহা ভদ্রাভদ্রে একত্রে মিলিয়া সহজ বাংলাভাষায় আলোচনা করা হইবে।

শিক্ষিত সম্প্রদায়কেও তিনি নির্দিষ্ট কর্ম করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। হিন্দুমুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন তাঁহার কর্তব্যতালিকার প্রধান বিষয়; নিষ্ফল পলিটিক্সের সংস্রব না রাখিয়া বিদ্যালয় পথঘাট জলাশয় গোচারণভূমি প্রভৃতি সম্বন্ধে জেলার যেসমস্ত অভাব আছে, তাহার প্রতিকারের পরামর্শ দেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল ইহা করিতে পারিলে 'অতি অল্পকালের মধ্যে স্বদেশকে যথার্থই সচেষ্ট করিয়া' তোলা যাইবে। এই প্রবন্ধে তিনি দৃষ্টান্তদ্বারা দেখাইলেন কিভাবে দেশের লোকের সহিত সম্মেলন দেশীয় ধারাপথ অবলম্বন করিয়া সার্থকতা লাভ করিবে। দেশের ইতিহাস সমাজতত্ত্ব রাজনীতি প্রভৃতি মন্থন করিয়া তিনি দেশের যথার্থ কাজ কোথায় এবং কিভাবে তাহা সম্পন্ন করিলে ভারতবর্ষ আত্মশক্তি লাভ করিবে, আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবে, তাহাই বহুবিস্তারে প্রকাশ করিলেন।

আজকাল আমরা গ্রামসংস্কার বা পল্লীসংগঠনের কথা শুনি, তাহার সূত্রপাত যে এইখানেই, সে কথা অনেকেরই জানা নাই। রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' সম্বন্ধে কর্মপদ্ধতি কিয়ৎপরিমাণে হিন্দুমেলার আদর্শে অনুপ্রেরিত। তাঁহার শৈশবে হিন্দুমেলার যে আদর্শ গুণেন্দ্রনাথ-জ্যোতিরিন্দ্রনাথপ্রমুখ যুবকেরা সেযুগে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহাই রবীন্দ্রনাথ প্রৌঢ়কালে দেশের সমক্ষে প্রকাশ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, নিজ জমিদারিতে পর্যন্ত ইহার পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেশের কাজ সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত খসড়া তালিকা এই সময়ে মুদ্রিত হয়।[১]

১ দ্র. **Calcutta Municipal Gazette. Tagore Memorial Number 1941, p. 38.**

প্রবন্ধপাঠের পর সমালোচনার পালা শুরু। দেশের কাজ বলিতে যে এই ধরণের উচ্ছ্বাসহীন কর্ম বুঝাইতে পারে, এ কথা তখনো রাজনৈতিক নেতারা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং পনেরো বৎসর পরে (১৯২১) যখন নেতাদের কাছে গ্রামের ডাক পৌঁছাইল, তখন অনেকেই জানিতেন না যে এই আদর্শের কথা রবীন্দ্রনাথেরই।

তখনকার দিনে হিতবাদী বঙ্গবাসী ও সঞ্জীবনী ছিল প্রধান সাপ্তাহিক, বাংলা দৈনিক তখন কিছু ছিল না। ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা' ইহার কাছাকাছি সময়ে প্রকাশিত হয়; ইহা বাঙালির মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ইংরেজি কাগজ বেঙ্গলী, সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ; 'অমৃতবাজার পত্রিকা', সম্পাদক মতিলাল ঘোষ। 'বঙ্গবাসী' তখনকার দিনে হিন্দুমতের প্রধান সমর্থক ছিল। এই সাপ্তাহিকে বলাইচাঁদ গোস্বামী হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজে'র কার্যপদ্ধতির কী কী অন্তরায় হইতে পারে, সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ ঐ সাপ্তাহিকেই 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট[১] নামে এক উত্তর প্রকাশ করেন। তাহা বঙ্গদর্শন ১৩১১ আশ্বিন সংখ্যায় পুনঃপ্রকাশিত হয়।

বঙ্গবাসীর উক্ত লেখক এরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের লোক, তিনি ভাষার ছটায় মুগ্ধ করিয়া তলে তলে হিন্দুসমাজকে একাকার করিয়া দিবেন। এরূপ দুরভিসন্ধি রবীন্দ্রনাথের ছিল না, আর প্রবন্ধ লিখিয়া ভারতবর্ষকে একাকার করিবেন এ কথা রসজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ কখনো কল্পনা করেন নাই। হিন্দুসমাজের পৃষ্ঠপোষক 'বঙ্গবাসী'কে রবীন্দ্রনাথ সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "বিলাত পরকে বিনাশ করাই, পরকে দূর করাই আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া জানে; ভারতবর্ষ পরকে আপন করাই, আত্মসার্থকতা বলিয়া জানে।...আজ যদি বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিতে, পরকে আপন করিতে না পারি...তবে বুঝিব পাপের ফলে আমাদের সমাজের লক্ষ্মী আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছেন...।"

অন্য পক্ষ হইতেই রবীন্দ্রনাথের মতের তীব্র সমালোচনা হইল; রাজনীতি ছাড়িয়া গ্রামসংস্কারের প্রস্তাব সেযুগের নেতাদের নিকট উপহাসের ব্যাপার। পৃথ্বীশচন্দ্র রায় সে সময়ের একজন নামকরা রাজনীতিক ও অর্থনীতিক—তিনি বলিলেন, "রবিবাবু যেসমস্ত রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমাদের দেশের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর ও নানা দোষে দুষ্ট মনে করি!"[২]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে ভুল পথ নির্দেশ করিয়াছিলেন কি না, তাহা গত অর্ধশতাব্দীর ইতিহাস প্রমাণ দিতেছে। বহু বৎসর পরে গান্ধীজি দেশবাসীকে সেই কথাই বলিয়াছিলেন, স্বাধীন ভারতও এই গ্রামোদ্যোগ বিষয়ে উদাসীন নহে।

দেশের মনকে স্বাদেশিকতা ও জাতিপ্রেমে উদ্‌বোধিত ও উত্তেজিত করিবার নানা আয়োজন চলিতেছিল। ইহার অন্যতম হইতেছে 'বীরপূজা'। আট বৎসর পূর্বে (১৮৯৫) মহারাষ্ট্র দেশে যে শিবাজী-উৎসব প্রবর্তিত হয় তাহার কথা আমরা পূর্ব খণ্ডে আলোচনা করিয়াছি। কিছুকাল পূর্বে টিলক-প্রবর্তিত শিবাজী-উৎসবের (১৮৯৫) অনুকরণে রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নেয়ী সরলা দেবী ১৩১০ সালের বৈশাখী পূর্ণিমায় (১৯০৩ এপ্রিল) প্রতাপাদিত্য-উৎসব আরম্ভ করেন এবং শ্রাবণ মাসে প্রতাপপুত্র উদয়াদিত্য-উৎসব মহাসমারোহে কলিকাতায় কয়েকটি স্থানে সম্পন্ন করেন।

প্রতাপাদিত্য-উৎসব লইয়া রবীন্দ্রনাথের সহিত সরলা দেবীর মতানৈক্য ঘটে। রবীন্দ্রনাথেরই 'বউঠাকুরানীর হাট'

১ আত্মশক্তি, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৩।

২ পৃথ্বীশচন্দ্র রায়, স্বদেশী সমাজের ব্যাধি ও চিকিৎসা, প্রবাসী তৃতীয় বর্ষ ১৩১১ শ্রাবণ। রবীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ ও তৎসংক্রান্ত সভাদ্বয়ের বিবরণী, ভারতী ১৩১১ ভাদ্র। পৃথ্বীশবাবুর প্রবন্ধের প্রতিবাদে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লেখেন 'আবেদন,—না আত্মচেষ্টা?' ভারতী ১৩১১ আশ্বিন। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া ভারতী ১৩১১ কার্তিক সংখ্যায় পৃথ্বীশবাবু একটি চিঠি লেখেন তাহাতে মূল প্রবন্ধের কিয়দংশ মুদ্রিত হয়।

উপন্যাস হইতে এই দুইজনকে আদর্শায়িত করা হয়; রবীন্দ্রনাথ বলেন, সরলা একজন খুনী লোককে লইয়া মাতামাতি করিতেছে, কারণ প্রতাপাদিত্য তাঁহার খুল্লতাত বসন্তরায়কে হত্যা করেন। সরলা দেবী বলেন, তাঁহারা প্রতাপাদিত্যের বীরত্বকে পূজা করিতেছেন। ভারতচন্দ্রের উক্তি

নাহি মানে পাতশায়, কেহ নাহি আঁটে তায়

ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ।

ইহাই হইল প্রতাপের বীরত্ব কাহিনী।[১] শিবাজী-উৎসব এতদিন মারাঠিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এই সময়ে সখারাম গণেশ দেউস্কর ইহাকে বাংলাদেশে প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। তিনি 'শিবাজীর দীক্ষা' নামে একখানি পুস্তিকা লেখেন, রবীন্দ্রনাথ উহারই ভূমিকাস্বরূপ 'শিবাজী-উৎসব'[২] নামে কবিতা লিখিয়া দেন। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অখণ্ড ভারতের যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা কালে হিন্দুভারতের ধ্যানের বস্তু হইয়া উঠে। বাঙালি মারাঠাশৌর্যকে 'বর্গীর হাঙ্গামা'র সহিত অভিন্ন করিয়া জানিত, রবীন্দ্রনাথ ভারত-ইতিহাসের সেই বিক্ষুব্ধ যুগের ঘটনাপুঞ্জকে ভুলিতে ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে উহাকে দেখিতে বলিলেন—

মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙালি, এককণ্ঠে বল

"জয়তু শিবাজী"

মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙালি, একসঙ্গে চল

মহোৎসবে আজি!

আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম-পূরব

দক্ষিণে ও বামে

একত্রে করুক ভোগ একসাথে একটি গৌরব

এক পুণ্য নামে।[৩]

শিবাজী-উৎসব-আন্দোলন হিন্দু জাতীয়তাবোধ হইতে উদ্‌ভূত; শিবাজী মহারাজ মুগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেন। সুতরাং শিবাজী সম্বন্ধে গৌরববোধ হিন্দুদেরই হওয়া সম্ভব, মুসলমানদের নহে; সুতরাং বিংশ শতাব্দীতে এই শ্রেণীর কোনো বীরকে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার প্রতীক রূপে গ্রহণ করা সম্ভব নহে। রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় এই কবিতাটির দুর্বলতা কোন্‌খানে তাহা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তাঁহার কোনো কাব্যগ্রন্থে উহাকে স্থান দেন নাই। শিবাজী-উৎসব অচিরকালের মধ্যে ভবানীপূজার সহিত যুক্ত হইল (১৯০৬ জুন)। রবীন্দ্রনাথের সহিত তাহার কোনো সংস্রব ছিল না, থাকিতেও পারে না।[৪]

১ শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গলায় স্বদেশী যুগ, পৃ ৩৪১।

২ গিরিধি, ১১ই ভাদ্র ১৩১১। দ্র. দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিত চিঠি: সঞ্চয়িতা ১৩৬৫ সংস্করণ গ্রন্থপরিচয়।
গিরিজাশঙ্কর লিখিতেছেন, "১৯০৪ খৃঃ রবীন্দ্রনাথ টাউনহলে তাঁহার বিখ্যাত 'শিবাজী' কবিতা নিজে পাঠ করিয়াছিলেন।"—শ্রীঅরবিন্দ, পৃ ৪৪৮। লেখক রেফারেন্স দেন নাই।

৩ শিবাজী-উৎসব, বঙ্গদর্শন ১৩১১ আশ্বিন। ভারতী ১৩.১ আশ্বিন। শিবাজীর দীক্ষা, প্রকাশক শ্রীপ্রেমতোষ বসু, ১১৫ আমহার্স্ট স্ট্রিট, কলিকাতা ১৩১১। দ্র. কাব্যগ্রন্থ চতুর্থ ভাগ—স্বদেশ (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩১২)। "শিবাজী-উৎসব" কবিতাটি এই কাব্যে সংযোজিত হয়। পরে উহা বর্জিত হয়। বিশ বৎসর পরে ১৩৩২ সালে 'পূরবী' (প্রথম সংস্করণ) সঞ্চয়িতাংশে মুদ্রিত হয়। পুনরায় দ্বিতীয় সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। দ্র. সঞ্চয়িতা (ষষ্ঠ সংস্করণ)।

৪ শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ, পৃ ২৭৩, ৪৫২।

শিবাজী-উৎসবের জন্য কবিতা লিখিলেন বটে, কিন্তু অন্তরে দ্বিধা থাকিয়া গেল। এই উৎসবের মধ্যে তো মনুষ্যত্বের বৃহত্তর যথার্থ সুর ধ্বনিত হইতেছে না। কারণ 'মানুষ যেদিন আপনার মনুষ্যত্বের শক্তি বিশেষভাবে স্মরণ করে' সেই দিনই উৎসব পরিপূর্ণ হয়। তাই কবি ৭ই পৌষের দিন যে ভাষণ দান করিলেন, তাহা প্রধানত ধর্মবিষয়ক হইলেও উহার মধ্যে সমসাময়িক সমস্যার কথা আপনিই আসিয়া গিয়াছে। দেশের ধনী ও তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায়ের সহিত তথাকথিত নিম্নশ্রেণী বা দরিদ্রলোকের ধনবণ্টন, আনন্দসম্ভোগ প্রভৃতি ব্যাপারে যে ব্যবধান রহিয়াছে, তাহা দেশকে শতধা বিচ্ছিন্ন করিতেছে। স্বদেশী সমাজ লিখিবার পর হইতে কবির মনে এইসব প্রশ্নই বারে বারে উঠিতেছে; তাই 'উৎসবের দিন'[১] ভাষণের মধ্যে এই সমস্যার আলোচনা আসিয়া পড়িয়াছে; তিনি বলিলেন, "আমাদের জীবনের যে-সমস্ত ঘটনাকে উৎসবের ঘটনা করিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটাতেই আমরা বিশ্বমানবের গৌরব অর্পণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। জন্মোৎসব হইতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পর্যন্ত কোনোটাকেই আমরা ব্যক্তিগত ঘটনার ক্ষুদ্রতার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখি নাই। এইসকল উৎসবে আমরা সংকীর্ণতা বিসর্জন দিই— সেদিন আমাদের গৃহের দ্বার একেবারে উন্মুক্ত হইযা যায়, কেবল আত্মীয়স্বজনের জন্য নহে, কেবল বন্ধুবান্ধবের জন্য নহে, রবাহূত-অনাহূতের জন্য।...এখন আমরা আমাদের উৎসবকে প্রতিদিন সংকীর্ণ করিয়া আনিতেছি।... আজ আমাদের দীপালোক উজ্জ্বলতর, খাদ্য প্রচুরতর, আয়োজন বিচিত্রতর হইয়াছে— কিন্তু মঙ্গলময় অন্তর্যামী দেখিতেছেন আমাদের শুষ্কতা আমাদের দীনতা আমাদের নির্লজ্জ কৃপণতা।" কবির দ্বিধা শিবাজী-উৎসরের দ্বারা কি নিখিল ভারতের সমস্যা দূর হইবে?

দেশের সর্বস্তরের মানুষকে যথাযথভাবে দেখিবার ও সর্বশ্রেণীর মধ্যে মনুষ্যত্বের মর্যাদা ও শক্তিবোধ জাগ্রত করিবার যে প্রয়োজন, এই কথাটি কবি নানাভাবে দেশসমক্ষে প্রচার করিতেছেন। বাঙালির রাষ্ট্রিক জীবনে নানাভাবে দুর্দিন ঘনায়মান; তাই কবি স্বদেশীয় সমাজকে বিদেশীয় সংস্পর্শ ও বিজাতীয় অনুকরণপ্রিয়তা হইতে দূরে রাখিয়া সমাজসেবায় নূতন কর্মপথে চলিবার কথা বলিলেন। সমাজের শ্রেণীগত ভেদকে মানিয়া লইযাই তিনি বলিলেন যে, সংঘকল্যাণের জন্য মিলিত কর্মের মধ্যেই মুক্তির সাধনা। আবার সকল কর্মের নিত্যপ্রয়োজনের সম্বন্ধের বাহিরেও মিলনভূমি আছে; সেটি হইতেছে তাহার উৎসবক্ষেত্র। এই উৎসবের দিনে মানুষে মানুষে ভেদ ভুলিয়া মানুষ তাহার মনুষ্যত্বের যথার্থ মূল্য নিরূপণ করিবে— ইহাই ছিল কবির স্বপ্ন বা আশা।

সর্বসাধারণকে লইয়া উৎসবের ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথের অন্তরের কথা, কিন্তু সেই আদর্শ জীবনে বা সংসারে সর্বক্ষেত্রে পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারেন নাই বলিয়া চিরদিনই বেদনা বোধ করিয়াছিলেন।

ভাষাবিচ্ছেদ ও সফলতার সদুপায়

বাঙালির সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও আর্থিক যোগসূত্রকে ছিন্ন করিবার জন্যই ইংরেজের শাসনব্যবস্থায় বঙ্গচ্ছেদের আযোজন; য়ুনিভার্সিটি বিল পাসও সেই উদ্দেশ্যেই। কূটনীতিজ্ঞ ইংরেজের রাজনীতি এইখানে ক্ষান্ত হইল না, সে আরও মারাত্মক প্রস্তাব উত্থাপন করিল; সেটি হইতেছে বঙ্গদেশের ভাষাবিচ্ছেদের প্রস্তাব।

বঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাব ঘোষণার চারি মাস পরে ভারত গবর্নমেণ্ট বাংলার শিক্ষানীতি সংস্কার সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করিলেন (১৯০৪ মার্চ ১১)। দেশীয় ভাষায় যে শিক্ষা চলিতেছে, তাহার যে আমূল সংস্কারের প্রয়োজন সে সম্বন্ধে মতান্তর ছিল না। ঐ সাধু উদ্দেশ্যে সরকার এক কমিটি বসান, সে কমিটিতে ছিলেন চারিজন সাহেব ও ভারতীয় সিবিল

১ উৎসবের দিন, বঙ্গদর্শন ১৩১১ মাঘ। দ্র. ধর্ম। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩।

সার্বিসের অনরেবল্‌ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত (K. G. Gupta)। এই তদন্ত বৈঠকের প্রতিবেদন প্রকাশিত হইলে জেনারেল অ্যাসেমব্লি হলে (স্কটিশচার্চ কলেজ) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে জনসভা হয় (১৩১১ ফাল্গুন ২৭) তাহাতে রবীন্দ্রনাথ 'সফলতার সদুপায়' শীর্ষক প্রবন্ধে উক্ত প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করিলেন।

কমিটির বহু বক্তব্য ছিল, তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি বিষয় লইয়া তাঁহার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেন। বাংলা-দেশের পাঠশালাসমূহের পাঠ্যপুস্তকে স্থানীয় উপভাষা প্রবর্তনের প্রস্তাবই তাঁহার সেই আলোচনার বিশেষ বিষয় হয়। কমিটি বলিয়াছিলেন যে, নিম্ন প্রাইমারি স্কুলে প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকসমূহের অধিকাংশই ন্যূনাধিক সংস্কৃতায়িত (Sanskritized) ভাষায় লেখা, তাহার মধ্যে এমন-সকল পরিভাষা থাকে যাহা পল্লীবাসীরা বুঝিতে পারে না। অতএব তাঁহাদের প্রস্তাব, এইসকল বিদ্যালয়ের উপযুক্ত আদর্শ পাঠ্যগ্রন্থগুলি প্রথমে ইংরেজিতে লিখাইয়া, পরে স্থানীয় প্রচলিত উপভাষায় (dialects) তর্জমা করাইতে হইবে। কমিটির সদ্‌বিবেচনায় বিহারে অন্তত তিনটি উপভাষায় পাঠশালার বই তর্জমা হওয়া প্রয়োজন— যেমন ত্রিহুতি, ভোজপুরী ও মৈথিলি, আর বাংলাদেশে অন্ততপক্ষে চারিটি ভাষায়, যথা উত্তর, পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের ভাষায় পাঠ্যপুস্তকগুলি লেখা উচিত।

রবীন্দ্রনাথ ভারতসরকারের এই অকারণ চাষীপ্রীতি দেখিয়া একটু বিস্মিত হইয়া লিখিলেন যে, চাষীদের জন্য স্থানীয় (local dialect) ভাষায় গ্রন্থ লিখিবার প্রথা অন্য কোনো দেশে নাই, এমনকি বিলাতেও নাই ; ইংলণ্ডের একদিকের ভাষার সহিত অন্যদিকের ভাষার যথেষ্ট অমিল থাকা সত্ত্বেও তথাকার ভাষাকে চারি টুকরা করিবার কথা কেহ কল্পনা করেন নাই। "বোঝা যাইতেছে, কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে আমাদের দেশটাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়াটা একটা matter of great importance হইয়া উঠিয়াছে।...তথাপি ইংলণ্ডের সর্বত্র ইংরেজি ভাষার ঐক্য রক্ষা করা matter of greater importance। কিন্তু সে দেশে চাষীদের উপকার ও ভাষার অখণ্ডতা রক্ষা উভয়ই এক স্বার্থের অন্তর্গত, এ সম্বন্ধে কোনো পক্ষভেদ নাই— সুতরাং সেখানে ভাষাকে চার টুকরা করিয়া চাষীদের কিঞ্চিৎ ক্লেশলাঘব করার কল্পনামাত্রও কোনো পাঁচজন বুদ্ধিমানের একত্র সম্মিলিত মাথার মধ্যে উদয় হইতে পারে না।... জনসাধারণের শিক্ষার উপসর্গ লইয়াই হউক বা যে উপলক্ষেই হউক, দেশের উপভাষার অনৈক্যকে প্রণালীবদ্ধ উপায়ে ক্রমশ পাকা করিয়া তুলিলে তাহাতে যে দেশের সাধারণ মঙ্গলের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়, তাহা নিশ্চয়ই আমাদের পাশ্চাত্য কর্তৃপক্ষেরা, এমন কি, তাঁহাদের বিশ্বস্ত বাঙালী সদস্য, আমাদের চেয়ে বরঞ্চ ভালোই বোঝেন।"

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন যে, এক কালে আসামে বাংলাভাষাই শিক্ষিত সমাজের ভাষা ছিল ; আসামের ভাষা বা উপভাষা সিলেট ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানের উপভাষার ন্যায়ই পৃথক ছিল। আসাম ১৮২৬ হইতে ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত বাংলা প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ছিল ; ১৮৫৪ সালে বাংলাদেশ যখন বড়লাটের খাস শাসনের অধীন হইতে পৃথক লেফটেনেণ্ট গবর্নরের শাসনাধীন আসিল সেই সময় হইতে আসামের উপভাষাকে একটি পৃথক ভাষারূপে সৃষ্টি করিবার ব্যবস্থা গবর্নমেণ্ট প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ঐ বৎসরে আমেরিকান খ্রীষ্টান পাদরীদের চেষ্টায় আসামে বাংলা ভাষা পড়ানো বন্ধ হয়। পাদরীদের জবরদস্তিতে আসামের বহু উপভাষা ধীরে ধীরে পৃথক ভাষায় পরিণত হইয়াছে। উনবিংশ শতকের শেষ দিকে বাংলাদেশে মুসলমানদের মধ্যে একদল লোক বলিতে শুরু করেন যে উর্দু ভাষা বাংলার মুসলমানের জাতীয় ভাষা। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রেও তৃতীয় পক্ষের ভিতরের উস্‌কানি ও উপরের দরদ ছিল একান্ত। উপভাষাকে পৃথক ভাষা পরিগণিত করিয়া হিন্দু-মুসলমানের ভাষার মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করিয়া জাতিকে বহুভাগে ও বহুভাবে খণ্ডিত করিবার অপচেষ্টা বহু প্রাচীন। বিংশ শতকের প্রারম্ভে লর্ড কর্জনের রাজ্যশাসনে ভেদনীতি নানা পথে চলিতেছিল। তাই তিনি বাঙালির জাতীয়তাবোধের প্রথম উন্মেষকে, তাহার রাষ্ট্রনৈতিক সংঘশক্তির কল্পনামাত্রকে বঙ্গচ্ছেদের রূঢ় আঘাত দ্বারা লোপ করিতে উদ্যত হইলেন। তৎসঙ্গেই হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান

বাঙালির সহস্র বৎসরের গড়া বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া উপলব্ধ ঐক্যানুভূতিকে ধ্বংস করিবার জন্য চারিটি উপভাষাকে চারিটি পরিপূর্ণ ভাষার গৌরব দান করিবার জন্য গবর্নমেণ্ট চাষীর দরদী সাজিলেন।[১]

সরকার বাহাদুর চাষীদের হিতৈষণার যে ভান করিলেন, তাহার মধ্যে বুদ্ধিমান লোকে ইংরেজের সেই ভেদনীতিরই অভিসন্ধির আভাস পাইল, যাহা সাম্রাজ্যশাসনের ও পররাষ্ট্র শোষণের মূলগত নীতি ও আদর্শ। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, চাষার ছেলে পাঠশালায় যায় চাষ শিখিতে নয়,—তাহার মনে ভদ্রতার, ভব্যতার একটা ভাব আছে, তাহাই তাহার প্রধান কাম্য। কিন্তু সে যদি জানে যে গ্রাম্য পাঠশালায় গ্রাম্যভাষায় রচিত চাষের বই তাহার পাঠ্য, সামান্য হিসাবাদি আয়ত্ত করাই তাহার শিক্ষার চরম আদর্শ, তাহা হইলে সে কখনই ঘরের কড়ি খরচ করিয়া এ কাজ করিবে না। লেখকের মতে কালে পল্লীর মধ্যে ঐ 'চাষা'র পাঠশালাটা 'চাষা'র পক্ষে একটা লজ্জার বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে। শিক্ষাকে একবার দেশের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইতে দিলে তাহাকে গণ্ডি টানিয়া কমানো শক্ত, একথা সরকারপক্ষীয় লোকেরা বেশ ভালো করিয়া জানেন। শিক্ষার সুযোগে আমাদের দেশের ভদ্রলোকের ঢেউটা যদি চাষার মধ্যে প্রবেশ করে, তবে সে একটা বিষম ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি করা হইবে; অতএব কমিটির সুপারিশ অনুসারে চাষাদের শিক্ষাকে এমন শিক্ষা করা চাই, যাহাতে মোটের উপর তাহারা চাষাই থাকিয়া যায়। গবর্নমেণ্ট সেইজন্য সর্বদাই শঙ্কিত ও সন্দিগ্ধ এবং সেইজন্যই তাহার দান কখনো হৃদয়ের দান হয় না। ইহার প্রতিষেধক কর্মপদ্ধতি হিসাবে কবি বলিলেন, "শিক্ষা যদি নিজের হাতে লই, তবেই নিজের মতলব শিক্ষা দিতে পারিব,—ভিক্ষাও করিব, ফরমায়েসও দিব, এ কখনো হয় না।"[২]

'সফলতার সদুপায়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলন সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিলেন তাহার সত্যতা আজও অম্লান। তিনি বলিলেন, "উপস্থিত সুবিধার খাতিরে নিজের আদর্শকে খর্ব করার প্রতি আমরা আস্থা রাখিব না।···ইংরেজের উপর রাগারাগি করিয়া ক্ষণিক-উত্তেজনা-মূলক উদ্‌যোগে প্রবৃত্ত হওয়া সহজ, কিন্তু সেই সহজ পথ শ্রেয়ের পথ নহে। জবাব দিবার, জব্দ করিবার প্রবৃত্তি আমাদিগকে যথার্থ কর্তব্য হইতে, সফলতা হইতে ভ্রষ্ট করে।" দুঃখের বিষয়, আমাদের রাজনীতিতে অনেক ক্ষেত্রেই সফলতার সদুপায়-নীতি অনুসৃত হয় নাই।

রাজনীতিকে যুক্তিপ্রতিষ্ঠ ও কলুষশূন্য করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ সেদিন দেশবাসীকে বলেন, "সকল ক্ষুদ্রতা হইতে নিজেকে উদ্ধার করিয়া দেশের প্রতি প্রীতির উপরেই দেশের মঙ্গলকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—স্বভাবের দুর্বলতার উপর নহে; পরের প্রতি বিদ্বেষের উপর নহে। এবং পরের প্রতি অন্ধ নির্ভরের উপরেও নহে।·· এই নির্ভর এবং এই বিদ্বেষ দেখিতে যেন পরস্পর বিপরীত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বস্তুত ইহারা একই গাছের দুই ভিন্ন শাখা। ইহার দুটাই আমাদের লজ্জাকর অক্ষমতা ও জড়ত্ব হইতে উদ্ভূত। পরের প্রতি দাবি করাকেই আমাদের সম্বল করিয়াছি বলিয়াই প্রত্যেক দাবির ব্যর্থতায় বিদ্বেষে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছি। এই উত্তেজিত হওয়া মাত্রকেই আমরা স্বদেশহিতৈষিতা বলিয়া গণ্য করি।···দেশহিতৈষিতারও যথার্থ লক্ষণ দেশের হিতকর্ম আগ্রহপূর্বক নিজের হাতে লইবার চেষ্টা। দেশহিতৈষিতাকে পুষ্ট করিয়া তুলিবার একমাত্র উপায় স্বচেষ্টায় দেশের কাজ করিবার উপলক্ষ আমাদিগকে দেওয়া। সেবার দ্বারাতেই প্রেমের চর্চা হইতে থাকে। স্বদেশপ্রেমের পোষণ করিতে হইলে স্বদেশের

১ বর্মাদেশে 'কারেন' নামে একটি জাতি আছে—তাহাদের চারিটি উপভাষা যাহার মধ্যে ভেদ খুবই সামান্য খ্রীষ্টান পাদরীদের চেষ্টায় চারিটি পৃথক ভাষা হইয়া গিয়াছে; পো-কারেন, পোকু-কারেন, স্থয়া-কারেন প্রভৃতির ভাষা ও সাহিত্য পৃথক ভাবে সৃষ্টি হইয়াছিল।

ব্রিটিশ যুগের সরকারী মতে ভারতে ২২২টি ভাষা, তার মধ্যে তিব্বতী-বর্মী ভাষা ১৩৪টি। এমন ভাষার নাম প্রদত্ত হইয়াছে যাহা ১ জন মাত্র ব্যবহার করে। দ্র, R. P. Dutt—*India to-day.*

২ প্রাইমারী শিক্ষা, ভাণ্ডার প্রথম বর্ষ ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ। শিক্ষা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২।

সেবা করিবার একটা সুযোগ ঘটাইয়া তোলাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এমন একটি স্থান করিতে হইবে যেখানে দেশ জিনিসটা যে কী তাহা ভূরিপরিমাণে মুখের কথায় বুঝাইবার বৃথা চেষ্টা করিতে হইবে না—যেখানে সেবাসূত্রে দেশের ছোট বড়ো, দেশের পণ্ডিত মূর্খ সকলের মিলন ঘটিবে।"

দেশের শক্তিকে সংহত করিবার জন্য তিনি স্বদেশীসংসদ স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন ও "একজন অধিনেতার চতুর্দিকে একত্র" হইবার জন্য আহ্বান করিলেন। সেই সংসদের অধিনায়ককে সম্পূর্ণভাবে কর্তৃত্বে বরণ করিতে পারিলে "সেই সংসদ সমস্ত দেশের ঐক্যক্ষেত্র ও সম্পদের ভাণ্ডার হইয়া উঠিতে পারে।" আত্মনির্ভরশীলতা, অহিংসা ও একনেতৃত্ব ব্যতীত দেশের মঙ্গল হইতে পারে না এই কথাই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশীযুগের বাণীর সারমর্ম।

'সফলতার সদুপায়' প্রবন্ধ পাঠের কয়েকদিন পরে (১৭ চৈত্র ১৩১১) তিনি 'ছাত্রগণের প্রতি সম্ভাষণ'[১] দান করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স (প্রবেশিকা) পরীক্ষার জন্য যেসব ছাত্র কলিকাতায় আসিত তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ একটি সভা আহ্বান করেন এবং ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে সভার অধিবেশন হয়। কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নিকট "ছাত্রগণকে পরিষদের কর্মশালায় সহায়স্বরূপে আকর্ষণ করিবার জন্য" অনুরোধ জ্ঞাপন করেন ও বাংলাদেশের নানাস্থানে পরিষদের কেন্দ্র বা শাখা-পরিষদ্ স্থাপনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করেন। সাহিত্য-পরিষদ্ রবীন্দ্রনাথের এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তাঁহাকেই 'ছাত্রগণের প্রতি সম্ভাষণ' দিবার অনুরোধ করেন। এই বক্তৃতায় কবি দেশের বিচিত্র সমস্যার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া ছাত্রগণকে 'পুঁথিগত বিদ্যার অসহ্য জুলুম' হইতে মুক্তিলাভ করিয়া 'নিজের শক্তি প্রয়োগ ও বুদ্ধির কর্তৃত্ব অনুভব' করিবার জন্য উপদেশ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌কে কেন্দ্র করিয়া দেশকে চাক্ষুষ জানিবার জন্য ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করিলেন।

"বাংলাদেশের সাহিত্য ইতিহাস ভাষাতত্ত্ব লোকবিবরণ প্রভৃতি যাহা কিছু আমাদের জ্ঞাতব্য সমস্তই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আলোচনার বিষয়। দেশের এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিবার ঔৎসুক্য আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিল", কিন্তু তাহা হয় নাই বলিয়া "দেশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট।...দেশের যথার্থ বিবরণ আজ পর্যন্ত প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই, সেইজন্য যদিও আমরা স্বদেশে বাস করিতেছি তথাপি স্বদেশ আমাদের জ্ঞানের কাছে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইয়া আছে। বস্তুর সহিত বহির সহিত আমরা মিলাইয়া শিখিবার অবকাশ পাই না" বলিয়া বাস্তবিকতাবর্জিত মন, কল্পনা সবই কৃশ ও বিকৃত হইয়া যায়। দেশহিতৈষণাও সেইজন্য বাস্তববর্জিত, কারণ দেশ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভাষণে বাংলার তথ্যসংগ্রহ করিয়া আনিয়া সাহিত্য-পরিষদে উপহার দিবার জন্য ছাত্রগণকে অনুরোধ করিলেন; দেশবিবরণ, প্রাদেশিক ভাষার বৈশিষ্ট্য, ধর্মসম্প্রদায় ও জাতি উপজাতি সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ, গ্রাম্যছড়া, ছেলেভুলানো ছড়া, প্রচলিত লৌকিক গান প্রভৃতি সংগ্রহ বিষয়ে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন; তিনি আরও বলিলেন যে, এইসব তথ্য সংগ্রহের দ্বারা শুধু জানা নয়, জানিবার শক্তির বিকাশ হয়। শিক্ষাকালে এই শক্তি অর্জন ছাত্রদের পক্ষে পরম লাভ।

'ভাণ্ডার' সম্পাদন

১৩১২ সালের বৈশাখে (১৯০৫ এপ্রিল) 'ভাণ্ডার' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইল। কেদারনাথ দাশগুপ্ত[২] নামে এক যুবক ইহার উদ্যোক্তা— রবীন্দ্রনাথ হইলেন সম্পাদক। এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে

১ বঙ্গদর্শন ১৩১২ বৈশাখ। আত্মশক্তি, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৩।

২ কেদারনাথ দাশগুপ্ত (১৮৭৮—১৯৪২) জন্ম চট্টগ্রাম জেলা; মৃত্যু নিউইয়র্ক। দ্র. রবীন্দ্রজীবনী চতুর্থ খণ্ড সংযোজন পৃ. ২৯৭।

কেদারনাথ লিখিয়াছিলেন, "আমাদের চিন্তনীয় বিষয় সম্বন্ধে দেশের যোগ্য লোকের মত 'ভাণ্ডারে' ক্ষুদ্র আকারে প্রকাশিত হইবে। দেশে মাঝে মাঝে যে-সকল কথা উঠিয়া পড়ে, সে-সম্বন্ধে নানা বিচক্ষণ লোকের সংক্ষিপ্ত মত সংগ্রহ করিয়া 'ভাণ্ডারে' একত্র রক্ষা করা হইবে।"

রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "আমার স্কন্ধে 'ভাণ্ডার' বলিয়া এক কাগজ পড়িয়াছে দেখিয়াছেন তো? আমি যত মনে করি কাজের আবর্ত হইতে বাহির হইয়া পড়িব ততই কাজ আমাকে বেষ্টন করিয়া ধরে। কেন যে কি মনে করিয়া ভাণ্ডার সম্পাদন করিতে রাজি হইয়াছিলাম তাহা বুঝিতে পারি না। ইহাকেই বলে গ্রহ।"[১]

এই নূতন পত্রিকার লেখকশ্রেণীর মধ্যে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, মেট্রোপোলিটন (পরে বিদ্যাসাগর) কলেজের অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (N. N. Ghose), হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, পৃথ্বীশচন্দ্র রায় প্রভৃতি।

প্রাইমারী শিক্ষা, জলকষ্ট, গণসংযোগ প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা ভাণ্ডারে উত্থাপিত হইল। রাজনীতির আলোচনাই মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বঙ্গদেশের যাবতীয় সমস্যাকে রাজনীতির পটভূমিতে সমগ্রভাবে দেখিবার ও বিচার করিবার অবসর পাইলেন। এ কথা আজ সর্ববাদীসম্মত যে, দেশের মধ্যে অসন্তোষের মূলে রহিয়াছে বিদেশীর গুরু এবং মহার্ঘ শাসনভার। সাহিত্যে, সাময়িকপত্রে, সভা-সমিতিতে বিদেশী শাসক ও শোষক শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষ ও বণিক সম্প্রদায়ের প্রতি অশ্রদ্ধ মনোভাব লোকে আর চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজশাসনের স্বরূপটির নূতন নামকরণ করিলেন—'বহুরাজকতা'[২]। কারণ "ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের সিংহাসনে একজন বাদশাহ ছিল, তাহার পরে একটি কোম্পানি বসিয়াছিল,...এখন ইংরেজ-জাত জানে, ভারতবর্ষ তাহাদের সকলেরই। একটা রাজপরিবারমাত্র নহে, সমস্ত ইংরেজজাতটা এই ভারতবর্ষকে লইয়া সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে।...মোট কথা— একটা আস্ত জাত নিজের দেশে বাস করিয়া অন্য দেশকে শাসন করিতেছে, ইতিপূর্বে এমন ঘটনা ইতিহাসে ঘটে নাই।...একটা দেশ যতই রসালো হউক-না, একজন রাজাকেই পালিতে পারে, দেশসুদ্ধ রাজাকে পারে না।"

বিদেশী রাজপুরুষদের কর্ণে হিতকথা শুনাইবার চেষ্টা যে পণ্ডশ্রম তাহাও রবীন্দ্রনাথ জানিতেন; সেইজন্য তিনি রাষ্ট্রনীতির নেতাদের দৃষ্টি জনসমাজের প্রতি নিবদ্ধ করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। তাছাড়া আমাদের দেশের পাবলিক উদ্যোগগুলির সঙ্গে দেশের প্রাকৃত সাধারণের যোগরক্ষার উপায় বা এক কথায় গণসংযোগ কিভাবে করা যাইতে পারে সে-বিষয়ে আলোচনা উত্থাপন করেন।

একদিকে যেমন জনসাধারণের সহিত ভদ্রসমাজের যোগবন্ধনের কথা ভাবিতেছেন, অন্যদিকে দেশীয় নরপতিদের মধ্যে আদর্শবাদ সৃষ্টি করিবার চেষ্টাও করিতেছেন। ত্রিপুরা রাজপরিবারকে নানাভাবে নানা সৎকর্মে ও সাধুসংকল্পে উদ্‌বোধিত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন বহু বৎসর হইতে। ত্রিপুরা সাহিত্য-সম্মেলন প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আগরতলা হইতে তাঁহার আমন্ত্রণ আসিলে, কবির মনের কথা রাজাকে ও রাজ্যের সর্বসাধারণেকে বলিবার সুযোগ পাইলেন।

প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে কবি আগরতলায় গিয়াছিলেন রাজার ব্যক্তিগত অতিথিরূপে, ত্রিপুরাবাসী জনসাধারণের সে অভ্যর্থনা ছিল না। আজ ত্রিপুরা সাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষে তাঁহার আমন্ত্রণ। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল হইতে স্থানিক

১ স্মৃতি, পৃ ৫১। ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১২। ১৯০৫ জুন ২ [বোলপুর]।

২ বহুরাজকতা, ভাণ্ডার প্রথম বর্ষ ১৩১২ আষাঢ়। রাজাপ্রজা, গদ্য-গ্রন্থাবলী ১০। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০।

সাহিত্য-পরিষদ্ স্থাপনের কথা সুপারিশ করিয়া আসিতেছিলেন, এখন পর্যন্ত তাহা কোথাও কার্যে পরিণত হয় নাই; ত্রিপুরাই অগ্রসর হইয়া এই কার্যে নামিল ও রবীন্দ্রনাথকেই উহার আদর্শ পুরোহিত-জ্ঞানে সভা অলংকৃত করিবার জন্য আহ্বান করিল।

কবি আগরতলায় উপস্থিত হইলে মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য ত্রিপুরা সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতিরূপে কবিকে বরণ করিলেন (১৭ আষাঢ় ১৩১২)। সভার উদ্‌বোধনে রবীন্দ্রনাথ 'দেশীয় রাজ্য'[১] নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন। তন্মধ্যে রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে অনেক কথার আলোচনা ছিল। অতঃপর কবি বলিলেন, অধুনা বাংলাদেশে বৃটিশপণ্য বর্জননীতি ও দেশীয় শিল্পের পোষণনীতি যুগপৎ দেখা দিয়াছে; তিনি আশা করেন দেশীয় নরপতিগণও সেদিকে দৃষ্টি দিবেন। দেশীয় রাজারা তাঁহাদের প্রাসাদ বিলাতী আসবাবপত্রের সাজসজ্জায় পূর্ণ করেন, তাঁহাদের উৎসব-অনুষ্ঠানাদিতেও বৈদেশিকতাটা উৎকটভাবেই প্রকাশ পায়; নৃপতিগণ ইহার লজ্জাটা যে অনুভব করেন না, ইহার বেদনাই কবিকে উত্তেজিত করে। বিলাতের আসবাবমোহ ও উপকরণবাহুল্য যে ভারতীয়দের সংসারধর্মের আদর্শ-পরিপন্থী, এই কথাটি সেদিন প্রকাশ করিতে কবি দ্বিধাবোধ করেন নাই। "উপকরণের বিরলতা জীবনযাত্রার সরলতা আমাদের দেশের নিজস্ব— এইখানে আমাদের বল, আমাদের প্রাণ, প্রতিভা।"

আমরা পূর্বে বলিয়াছি এই সময়ে রুশ-জাপান যুদ্ধ চলিতেছে। সু-সীমার যুদ্ধে আদমিরাল টোগো রুশের দুর্ধর্ষ বিরাট বাল্‌টিক নৌ বাহিনী (২৬ মে ১৯০৫) সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় জাপানের প্রতি সমস্ত জগৎ উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাইল। ভারতবর্ষ আজ জাপানের জয়কে প্রাচ্যের জয়, এশিয়ার জয় বলিয়া বিঘোষিত করিল। জাপান সম্বন্ধে তত্ত্ব ও তথ্য জানিবার জন্য সেদিন সকলের কী আগ্রহ। বাঙালির ছেলেরা জাপানে চলিল ব্যবহারিক শিল্প আয়ত্তের আশায়। জাপান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ঔৎসুক্য কিছু কম নহে। ইতিপূর্বে তিনি ওকাকুরার সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হন। শান্তিনিকেতনে জাপানী ছাত্র হোরি সানের বিদ্যানিষ্ঠা দেখিয়াছিলেন। এই নূতন জাতির মনের ভাষাকে বুঝিবার জন্য, বর্তমানে জাপানের সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে কবি প্রবৃত্ত; তাহাদের কবিতার অনুবাদ পড়িতেছেন।

জাপানীরা স্বভাবতই স্বল্পভাষী; তাহাদের চিত্রকলায় বাহুল্য নাই, গৃহসজ্জা 'বস্তুকোলাহলে' পূর্ণ নয়। তাহাদের সমস্ত অত্যন্ত মিত, কবিতাও তদ্রূপ। রবীন্দ্রনাথের এই জাপানী কবিতা এত ভালো লাগিল যে কয়েকটি অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলেন।[২]

১ দেশীয় রাজ্য, বঙ্গদর্শন ১৩১২ শ্রাবণ। স্বদেশ, গদ্য-গ্রন্থাবলী ১২। আত্মশক্তি, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৩।

২ আমরা এই কবিতা তিনটি উদ্ধৃত করিতেছি:

॥ সেদোকা ছন্দ ॥

সাগর তীরে
শোণিত মেঘে হল
নিশীথ অবসান
পুবের পাখী
পুবব মহিমারে
শুনায় জয়গান ॥

॥ চোকো ছন্দ ॥

সাহসী বীর
দেখেছি কত অরি
করেছি জয়।
দেখিনি তোমা সম
এমন বীর—
জয়ের ধ্বজা ধরি
স্তবধ হয়ে রয় ॥

॥ ইমায়ো ছন্দ ॥

গেরুয়া বসন পরি
ধর্মগুরু
শিখাতে গিয়েছিল
তোমার দেশে
আজি সে শিখিবারে
কর্মনীতি
তোমার দ্বারে ধায়
শিষ্য বেশে ॥

—ভাণ্ডার ১৩১২ আষাঢ়। এই আষাঢ় মাসে বঙ্গদর্শনে খেয়ার প্রথম কবিতা 'শেষ খেয়া' বাহির হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০।

কাব্যলক্ষ্মীর এই সামান্য সোনার কাঠির স্পর্শে কবিজীবনে নূতন সুর ধ্বনিয়া উঠিল। দেশের বিচিত্র আন্দোলনের চরম উত্তেজনার মধ্যে কবিচিত্ত ক্ষণে ক্ষণে পরম গভীরের মধ্যে অবগাহনের জন্য আকুলিত হইতেছে। এই বৎসরেই খেয়ার কবিতাগুলি লিখিত (১৩১২ আষাঢ়— ১৩১৩ জ্যৈষ্ঠ)।

আগরতলা হইতে ফিরিবার পর কবির দিন কাটে বোলপুরে, কলিকাতায় ও গিরিডিতে। বোলপুরে থাকিয়া আপনমনে বিদ্যালয়ের কাজ করিতে ইচ্ছা, আবার গিরিডিতে গিয়া বিশ্রামসুখলাভের জন্যও মন পিপাসিত ; কিন্তু কলিকাতার উত্তেজনা বারে বারে টানিয়া আনে সেখানকার আবর্তের মধ্যে। এই দোটানার মধ্যে মন যখন দোলায়িত তখনই লিখিলেন 'শেষ খেয়া'। কর্মের উত্তেজনার মধ্যে আত্মবিসর্জন করা কবির পক্ষে যেমন অসম্ভব, ঘরের মধ্যে বিনাকর্মে শান্তভাবে বসিয়া থাকাও তাঁহার পক্ষে কম পীড়াদায়ক নহে। একদিকে দেশের উচ্ছ্বাস আবেগ টানে কর্মের মধ্যে, অন্যদিকে অন্তরের শান্তম্ বলে আশ্রমের শান্তিনীড়ের মধ্যে থাকিতে। এই বেদনায় তিনি কি 'শেষ খেয়া'য় লিখিয়াছিলেন—

ঘরেও নহে, পারেও নহে, যেজন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলায় কে ডেকে নেয় তারে।

কবিচিত্তের এই দ্বন্দ্ব হইতে যে কয়টি কবিতা শ্রাবণ মাসে লেখেন, তাহা খেয়া কাব্যখণ্ডের প্রথম কবিতাগুচ্ছ ; ইহার সকলগুলি শান্তিনিকেতনে রচিত, শেষ দুইটি কলিকাতায়। এই সময়টি হইতেছে ৭ই অগস্ট বা বয়কট-আন্দোলন ঘোষণার পর্ব।[১]

এদিকে বাহিরের ঘটনা দ্রুত পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। ভারত গবর্নমেণ্ট বঙ্গচ্ছেদ করাই স্থির করিলেন ; বাঙালিও তখন তাহাকে রদ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। ১৯০৫ সালের ৭ই অগস্ট (১৩১২ শ্রাবণ ২২) বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। ঐ দিন বাঙালি বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদকল্পে বয়কট বা বৃটিশপণ্য বর্জন করিবার জন্য শপথ গ্রহণ করিল। শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে লোকে মুদ্রিত প্রতিজ্ঞাপত্রে সহি করিল যে যতদিন না বঙ্গচ্ছেদ রদ হয়, ততদিন বৃটিশপণ্য তাহারা ব্যবহার করিবে না।

এই প্রতিজ্ঞাপত্র ও প্রস্তাব লইয়া জল্পনা কল্পনা বহুদিন হইতে চলিতেছিল। রবীন্দ্রনাথ শুরু হইতেই বয়কট বা বর্জননীতির বিরোধী ; তাঁহার মতে নঙাত্মক সাধনা ধর্মেও ব্যর্থ, রাজনীতিতেও নিষ্ফল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন রাজনীতির একচ্ছত্র নেতা, মুকুটহীন রাজা। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে ও অন্যান্য নেতাদিগকে নঙাত্মক রাজনীতির ত্রুটি ও বিপদ কোনখানে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু উত্তেজনার মুহূর্তে 'কবির' কথা শুনিবার মনোভাব কাহারও থাকে না।

রবীন্দ্রনাথ শ্রাবণের শেষদিকে বোলপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন ; তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ। একটু ভালো বোধ করিলেই তিনি 'অবস্থা ও ব্যবস্থা'[২] প্রবন্ধ লিখিয়া কলিকাতার টাউনহলে পাঠ করিলেন (২৫শে অগস্ট), বয়কট ঘোষণার তিন সপ্তাহের মধ্যে কবি তাঁহার গঠনমূলক ভাবাত্মক পরিকল্পনা দেশবাসীসমক্ষে পেশ করিলেন।[৩]

১ কবিতা কয়টি : শুভক্ষণ, ত্যাগ (১৩ই শ্রাবণ, ১৩১২), প্রভাতে (১৪ই), বালিকা বধূ, খেয়া (১৫ই)। [২২শে শ্রাবণে বয়কট সভা] অনাবশ্যক (২৫এ), অনাহূত (২৬এ)। ইহার পরে দুইটি কলিকাতায় লেখা : আগমন (২৮এ), বাঁশি (২৯এ) [১৯০৫, ২৯ জুলাই— হইতে ১৪ অগস্ট পর্যন্ত]। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০।

২ অবস্থা ও ব্যবস্থা, বঙ্গদর্শন ১৩১২ আশ্বিন। আত্মশক্তি, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৩।

৩ স্মৃতি, পৃ ২৭ (কলিকাতা। ১৩১২, ভাদ্র ১০।১৯০৫ অগস্ট ২৬)।

কবিরূপে দেশাত্মবোধ লইয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ভাবুকতা করা যেমন স্বাভাবিক, মনীষীরূপে দেশের বাস্তব সত্যের ও জটিল সমস্যার আলোচনা করা তাঁহার পক্ষে তেমনি সহজ। রবীন্দ্রনাথ কবি হইলেও বিষয়ভোগী, আদর্শবাদী হইলেও বাস্তব জগত সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ নহেন; দেশের মধ্যে জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লইয়া যেসব সমস্যা দেখা দিয়াছিল, তাহার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন তখন হইতেই উঁকিঝুঁকি দিতেছে। রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ', 'সফলতার সদুপায়' ও 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধে তৎকালীন বাস্তব বাংলার বিবিধ সমস্যা লইয়াই আলোচনা করেন; রাজনীতি ধর্মনীতি সমাজনীতির অসংখ্য সমস্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই তিনি সমস্যাপূরণ মানসে সেদিন টাউনহলে প্রস্তাব করিলেন— "দেশে কর্মশক্তিকে একটি বিশেষ কর্তৃসভার [council of action] মধ্যে বদ্ধ করিতে হইবে। অন্তত একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানকে আমরা এই সভার অধিনায়ক করিব— তাঁহাদের নিকট নিজেকে সম্পূর্ণ অধীন, সম্পূর্ণ নত করিয়া রাখিব; তাহাদিগকে কর দান করিব; তাঁহাদের আদেশ পালন করিব; নির্বিচারে তাঁহাদের শাসন মানিয়া চলিব; তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া দেশকে সম্মানিত করিব।" এই উক্তি যেন কবির উক্তি নহে, এ যেন দ্রষ্টার বাণী।

'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে যে কথা বলিয়াছিলেন সেই কথাই জোর দিয়া পুনরায় বলিলেন। "আমাদের গ্রামের স্বকীয় শাসনকার্য আমাদিগকে নিজের হাতে লইতেই হইবে ···চাষিকে আমরাই রক্ষা করিব, তাহার সন্তানদিগকে আমরাই শিক্ষা দিব, কৃষির উন্নতি আমরাই সাধন করিব, গ্রামের স্বাস্থ্য আমরাই বিধান করিব এবং সর্বনেশে মামলার হাত হইতে আমাদের জমিদার ও প্রজাদিগকে আমরাই বাঁচাইব। এ-সম্বন্ধে রাজার সাহায্য লইবার কল্পনাও যেন আমাদের মাথায় না আসে।"[১]

কর্মের মধ্য দিয়া সাধারণের সঙ্গে যোগযুক্ত হইলেই অন্তরের বন্ধন ক্ষয় হয় না: দেশের চিত্ত যে-বাণীর মধ্য দিয়া উদ্‌গীত হয়, যে-বাণী জাতির সংস্কৃতির বাহনরূপে সাহিত্যের মধ্যে রূপ গ্রহণ করে, সেই জাতীয় সাহিত্যকে রক্ষা করার প্রয়োজনই হইয়াছে আশু কর্তব্য। ইংরেজ এই কয়দিন পূর্বে হিতৈষণার ছলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে চতুর্ধা করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল; তাহাতে ব্যর্থকাম হইয়া বাঙালি জাতির মর্মস্থল লক্ষ্য করিয়া বঙ্গচ্ছেদ ব্যবস্থা দিল। কবি বলিলেন, এই দুঃসময়েই সাহিত্যকে সেবা ও সাহিত্যিকগণকে সংঘবদ্ধ করা নিতান্ত প্রয়োজন, কারণ তাহারাই জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখিবে। তাই তিনি 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধের একস্থানে প্রস্তাব করিলেন যে, জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের সংহতি ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সাহিত্য-সম্মিলনীর অধিবেশন হওয়া বাঞ্ছনীয়। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমরা...বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌কে বাংলার ঐক্যসাধনযজ্ঞে বিশেষভাবে আহ্বান করিতেছি।···এই পরিষদ্‌কে জেলায় জেলায় আপনার শাখাসভা স্থাপন করিতে হইবে, এবং পর্যায়ক্রমে এক-একটি জেলায় গিয়া পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন করিতে হইবে। আমাদের চিন্তার ঐক্য, ভাবের ঐক্য, ভাষার ঐক্য, সাহিত্যের ঐক্য সম্বন্ধে সমস্ত দেশকে সচেতন করিবার, এই ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আপন স্বাধীন কর্তব্য পালন করিবার ভার সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রহণ করিয়াছেন। এখন সময় উপস্থিত হইয়াছে— এখন সমস্ত দেশকে নিজের আনুকূল্যে আহ্বান করিবার জন্য তাঁহাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে।"

বয়কট বা বর্জননীতি সম্বন্ধে লেখক এই প্রবন্ধের একস্থানে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে, "ইংরেজ আমাদের প্রার্থনা-পূরণ করিবে না, অতএব আমরা তাহাদের কাছে যাইব না, এ সুবুদ্ধিটা লজ্জাকর।...পৌরুষবশত, মনুষ্যত্ববশত, নিজের প্রতি নিজের অন্তর্যামী পুরুষের প্রতি সম্মানবশত যদি না হয়, তবে এই ভিক্ষাবৈরাগ্যের প্রতি আমি কোনো ভরসা রাখি না।" রবীন্দ্রনাথের মূল কথা ছিল— রাগ করিয়া স্বদেশী হওয়া নয়, স্বদেশের জন্যই স্বদেশী হওয়া আদর্শ।

১ বঙ্গদর্শন ১৩১২ আশ্বিন।

কিন্তু দেশপ্রেম যখন অহেতুকীভাবে আসে নাই, কারণ উপলক্ষ্য করিয়াই আন্দোলন আসিয়াছে— তখন এই শুভ সুযোগ নষ্ট করা অনুচিত— ইহাই ছিল রাজনীতিক নেতাদের অভিমত।

৭ই অগস্টের বৃটিশপণ্য-বর্জন-সংকল্প অল্প কয়েকদিনের মধ্যে স্বেচ্ছাব্রতীদের দ্বারা নগর হইতে নগরান্তরে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রচারিত হইয়া চলিল। দেশের সর্বত্র ও সর্বশ্রেণীর মধ্যে যে উত্তেজনা ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হইল তাহা অভাবনীয়। এই বিরাট আন্দোলনের মুখে কবি রবীন্দ্রনাথ স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার ভাবুকচিত্ত সাড়া দিয়া উঠিল; তাঁহার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য সংগীতরূপে দান করিলেন।

স্বদেশী সংগীত—বাউল

'অবস্থা ও ব্যবস্থা' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠের অব্যবহিত পরে রবীন্দ্রনাথ গিরিডি ফিরিয়া গেলেন। বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলন লইয়া তখন দেশময় যে উত্তেজনা, তাহার তরঙ্গ কবিকেও উতলা করিয়া তুলিল। শান্তভাবে স্থিরবুদ্ধিতে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে যাহাই বলুন, অন্তরলোক-যে নূতনের সম্ভাবনায় পুলকিত হইয়া উঠিতেছিল তৎবিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই পুলকিত আবেগ-উচ্ছ্বাসে কবিহৃদয় দেশমাতৃকার পূজা-আরতিতে প্রবৃত্ত হইল; তাহারই প্রকাশ হইতেছে স্বদেশী কবিতা ও সংগীত; সেগুলি প্রথমে (১৩১২) 'ভাণ্ডার' পত্রিকার ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায়, 'বঙ্গদর্শনে' আশ্বিন ও অনতি-কালের মধ্যে 'বাউল' নামে পুস্তিকায় প্রকাশিত হইল। রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বেও স্বদেশী সংগীত মাঝে মাঝে প্রয়োজনের তাগিদে লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এবারকার রচনার প্রেরণা যেন অন্তরের মধ্যেই পাইয়াছেন। আকস্মিক বন্যার ন্যায় কয়েক দিনের জন্য কুল ছাপাইয়া গীতধারা উৎসারিত হইল। অধিকাংশই লিখিত হয় গিরিডি বাসকালে।

বহু বৎসর পূর্বে তাঁহার বাল্যকালে 'সঞ্জীবনী সভা'র উত্তেজনায় তিনি যে গান রচনা করিয়াছিলেন তাহার কথা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। সে-গানের মধ্যে এই স্বদেশী যুগের অরুণাভার দীপ্তি ছিল; গানটি সুপরিচিত, 'তোমারই তরে মা সঁপিনু দেহ' (ভারতী ১২৮৪ আশ্বিন)। কিন্তু ইহারও পূর্বে তাঁহার চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় তিনি 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' গানটি লিখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। যাহাই হউক, ইহার পর প্রয়োজন উপস্থিত হইলে কবিকে সময়োপযোগী তথাকথিত 'জাতীয়' বা 'স্বদেশী' সংগীত রচনা করিয়া দিতে হইয়াছে। কলিকাতার প্রথম কন্‌গ্রেস অধিবেশন হয় ১২৯৩ সালে (১৮৮৬); সভার উদ্‌বোধন সংগীত হয় 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'; রবীন্দ্রনাথ গানটি রচনা করিয়া স্বয়ং সভায় গাহিয়াছিলেন। এই গানটির সুর সম্পূর্ণ দেশীয় রামপ্রসাদী। নিখিল ভারত রাষ্ট্রসঙ্ঘের নানাদেশীয় প্রতিনিধিদের নিকট বাংলাদেশের নিজস্ব সুর শোনানোই গায়কের উদ্দেশ্য ছিল কিনা জানি না: কবি বেশ জানিতেন, যে-গান সর্বসাধারণের জন্য রচিত হইবে, তাহার সুর সাধারণের জানা সুর হওয়া প্রয়োজন।

কন্‌গ্রেসের জন্য গান রচনা করিবার কয়েকমাস পরে অধ্যাপক প্রসন্নকুমার রায়ের (Dr. P. K. Roy) অনুরোধে কলিকাতা কলেজের ছাত্রদের মিলন-সভার জন্য দুইটি গান লিখিতে ও সভায় গাহিতে হয়। গান দুইটি— 'আগে চল আগে চল ভাই' ও 'তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ'—ভারতী ১২৯৪ বৈশাখ। এই সময়ের কাছাকাছি আরও দুইটি গান লেখা হয়— 'কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে' এবং 'আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না'। এই শেষোক্ত গান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বহু বৎসর পরে যে লুপ্ত ইতিহাসটি বলিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠকদের জানা দরকার। কবি লিখিতেছেন, "একদিনের ঘটনা মনে পড়চে সে বহুদিন পূর্বের কথা। তখনকার দিনে আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের অঙ্গুলি তোলা ছিল রাজপ্রসাদকণা বর্ষণের প্রত্যাশায়। একদা কোনো জায়গায় তাঁদের কয়েকজনের সান্ধ্য বৈঠক

বসবার কথা ছিল। তাঁদের দূত ছিলেন আমার পরিচিত এক ব্যক্তি। আমার প্রবল অসম্মতি সত্ত্বেও তিনি বার বার করে বলতে লাগলেন আমি না গেলে আসর জমবে না। শেষপর্যন্ত ন্যায্য অসম্মতিকেও বলবৎ রাখবার শক্তি বিধাতা আমাকে দেন নি। যেতে হলো। ঠিক যাবার পূর্বক্ষণেই আমি নিম্নোদ্ধৃত গানটি রচনা করেছিলাম— 'আমায় বোলো না গাহিতে' ইত্যাদি। এই গান গাবার পরে আর আসর জমল না। সভাস্থগণ খুশি হন নি।"[১]

দীর্ঘ ছেদের পর 'কল্পনা'র যুগে কবিকে দুইটি কবিতা লিখিতে দেখি— 'সে আমার জননীরে' ও 'এবার চলিনু তবে'। শেষোক্ত কবিতাটি স্বদেশীযুগে বহু যুবকের ধ্যানের মন্ত্র ছিল; এই কবিতা আবৃত্তি করিয়া অনেকে সর্বত্যাগী হইয়াছিল। ভারতলক্ষ্মীর 'ভুবনমনোমোহিনী' রূপের বর্ণনাকে ঠিক স্বদেশী সংগীত বলা যায় না বটে, তবে দেশমাতৃকার স্তব হিসাবে ইহা সুপরিচিত। এই গীতটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত হইল— "একদিন আমার পরলোকগত বন্ধু হেমচন্দ্র বসুমল্লিক বিপিন পাল মহাশয়কে সঙ্গে করে একটি অনুরোধ নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁদের কথা ছিল এই যে, বিশেষভাবে দুর্গামূর্তির সঙ্গে মাতৃভূমির দেবীরূপ মিশিয়ে দিয়ে তাঁরা শারদীয়া পূজার অনুষ্ঠানকে নূতনভাবে দেশে প্রবর্তিত করতে চান, তার উপযুক্ত ভক্তি ও উদ্দীপনা -মিশ্রিত স্তবের গান রচনা করবার জন্যে আমার প্রতি তাঁদের বিশেষ অনুরোধ। আমি অস্বীকার করে বলেছিলুম, এ-ভক্তি আমার আন্তরিক হতে পারে না, সুতরাং এতে আমার অপরাধের কারণ ঘটবে। বিষয়টা যদি কেবলমাত্র সাহিত্যক্ষেত্রের অধিকারগত হত তা হলে আমার ধর্মবিশ্বাস যাই হোক আমার পক্ষে তাতে সংকোচের কারণ থাকত না; কিন্তু ভক্তির ক্ষেত্রে পূজার ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ গর্হনীয়। আমার বন্ধুরা সন্তুষ্ট হননি। আমি রচনা করেছিলুম 'ভুবনমনোমোহিনী'। এ গান পূজামণ্ডপের যোগ্য নয় সে কথা বলা বাহুল্য। অপর পক্ষে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে এ গান সর্বজনীন ভারতরাষ্ট্রসভায় গাবার উপযুক্ত নয় কেননা এ কবিতাটি একান্তভাবে হিন্দুসংস্কৃতি আশ্রয় করে রচিত। অহিন্দুর এটা সুপরিচিত ভাবে মর্মঙ্গম হবে না।"[১]

এইভাবে সাধারণত প্রয়োজনে ও কচিৎ প্রেরণায় কবি এই সকল তথাকথিত 'জাতীয় সংগীত' ও কবিতা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গভঙ্গের সময় রচিত গানগুলির অধিকাংশই একটি তীব্র আবেগের প্রেরণায় উৎসারিত। এইসব গানের ভিতর দিয়া কবি দেশকে কেবল দেশমাতৃকারূপে বন্দনা করিলেন না, দেশবাসীর অন্তরে ভাবের জোয়ার বহাইলেন ও শক্তির চেতনা উদ্‌বুদ্ধ করিলেন। ভাবের স্রোতে সাহিত্য নূতন রূপ লইল, শক্তির উদ্‌বোধনে জাতি নূতন প্রাণ পাইল।

স্বদেশীযুগের এই গানগুলির অধিকাংশই হইতেছে বাউল সুরে বাঁধা। বাউল সুর বাংলার নিজস্ব সুর— সম্পূর্ণরূপে লোকসংগীতধর্মী। আমরা পূর্বে বলিয়াছি স্বদেশী সংগীত সাধারণের সুরে গেয়; সে সুর হইতেছে বাউল, কীর্তন, রামপ্রসাদী, ভাটিয়ালি, সারিগানের সুর। সর্বসাধারণের কাছে ইহাদের বাণী সহজে পৌঁছায়, গানের সুরও সহজে মর্মকে স্পর্শ করে। এই সময় হইতেই দেশীয় সুরের প্রতি কবির দৃষ্টি নিবিষ্ট হইয়াছিল বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না; ইতিপূর্বে দুই একটি গানে বাউলাদির সুর দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্বদেশী গানের অধিকাংশই হইল দেশী লৌকিক সুরে বাঁধা। তবে 'বাউল' বই-এর সবগানই যে বাউলসুরে বাঁধা তাহা ভাবিবার কারণ নাই।

এই স্বদেশী সংগীতগুলির মধ্যে কয়েকটি হইতেছে বঙ্গমাতার সৌন্দর্যবর্ণনা, যেমন 'আজ বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি', 'সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'। কয়েকটি দেশবন্দনা, যেমন 'ও আমার দেশের মাটি তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা', 'বাংলার মাটি বাংলার জল'; কিন্তু অধিকাংশই হইতেছে তেজোদৃপ্ত সংগীত, যাহা জীবনের নানা সংগ্রামে ব্যবহৃত হইতে পারে। সেসব গানের ঐতিহাসিক পটভূমি নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলেও উহাদের

১ শ্রীপুলিনবিহারী সেনের নিকট লিখিত পত্র। ২০ নবেম্বর ১৯৩৭।

রসধর্ম কখনো নষ্ট হয় না ; কারণ, বিশেষকে ছাপাইয়া উহার ভাবরাজি স্থানকালনির্বিশেষ চিরন্তনতা লাভ করিয়াছে।

এই সময়ে রচিত গানের তালিকাটি সংযোজন করিলাম। নিম্নলিখিত গানগুলি 'ভাণ্ডার' (১৩১২ ভাদ্র-আশ্বিন) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়—

বান। (সারিগানের সুর) এবার তোর মরাগাঙে বান এসেছে

একা। (বাউলের সুর) যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে

মাতৃমূর্তি। (গান) আজ বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি

মাতৃগৃহ। মা কি তুই পরের দ্বারে

প্রয়াস। (বাউলের সুর) তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে

বিলাপী। ছিছি চোখের জলে ভেজাসনে

বাউল। ১. যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক ২. যে তোরে পাগল বলে ৩. ওরে তোরা নেইবা কথা বললি
৪. যদি তোর ভাবনা থাকে ৫. আপনি অবশ হলি তবে ৬. জোনাকি কি সুখে ঐ ডানা দুটি মেলেছ

রাখী-সংগীত। ১. বাংলার মাটি বাংলার জল ২. ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ৩. বিধির বাঁধন কাটবে তুমি

নিম্নলিখিত গানগুলি 'বঙ্গদর্শন' ১৩১২ আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়—

১. সোনার বাংলা। আমার সোনার বাংলা ২. দেশের মাটি। ও আমার দেশের মাটি

নিম্নলিখিত গানগুলি 'বঙ্গদর্শন' ১৩১২ কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়—

১. হবেই হবে। নিশিদিন ভরসা রাখিস ২. দ্বিধা। বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি
৩. অভয়। আমি ভয় করব না

'বাউল'[১] পুস্তিকায় প্রকাশিত গান ব্যতীত 'খেয়া'র মধ্যে দুইটি কবিতা ও গান আছে যাহা এই সময়ের রচনা। 'দান' (২৬ ভাদ্র ১৩১২) কবিতাটির সুরের মধ্যে স্বদেশীয় ভাবের আভাস পাই—

আজকে হতে জগৎ মাঝে ছাড়ব আমি ভয়,
আজ হতে মোর সকল কাজে তোমার হবে জয়—
আমি ছাড়ব সকল ভয়।
মরণকে মোর দোসর করে রেখে গেছ আমার ঘরে,
আমি তারে বরণ ক'রে রাখব পরাণ-ময়।
তোমার তরবারি আমার করবে বাঁধন ক্ষয়।
আমি ছাড়ব সকল ভয়।

'ঘাটে' নামক রচনা—'আমার নাইবা হল পারে যাওয়া' (২৭ ভাদ্র ১৩১২) গান, অন্যান্য বাউল সংগীতের সঙ্গেই রচিত ; খেয়ার মধ্যে এই সময়ে লেখা বাউল সুরের গান আর নাই। সেইজন্য এই দুটি রচনাকে আমরা একই গুচ্ছের মধ্যে ফেলিলাম।

১ আশ্বিনের মাঝামাঝি 'বাউল' নামে স্বদেশী গানের বই ছাপা হইয়া বাহির হইল।
''আপনাকে এক খণ্ড 'আত্মশক্তি' এবং 'বাউল' নামধারী দুটি আমার স্বরচিত গ্রন্থ উপহার পাঠাইতে শৈলেশচন্দ্রকে লিখিয়া দিয়াছিলাম, সে দুইখানি হস্তগত হয় নাই বলিয়া আপনার পত্রের ভাবে অনুমান করিতেছি।''—স্মৃতি, পৃ ৫০। গিরিডি। ২২শে আশ্বিন ১৩১২।

স্বদেশী আন্দোলন ও জাতীয় শিক্ষা

ভারত গবর্নমেণ্টের ইস্তাহার অনুসারে ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর (১৩১২ আশ্বিন ৩০) হইতে বঙ্গচ্ছেদ ঘোষিত হইল। মহামতি গোখলে অনতিকাল পরেই এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বারাণসী কন্‌গ্রেসের সভাপতিরূপে বলিলেন যে, 'বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব প্রকাশিত হইবার পর পাঁচ শতের অধিক সভায় বাঙালি ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিল। লর্ড কর্জনের মতে এই প্রতিবাদের আন্দোলন অসার— জনকতক লোকের কৃত। অথচ মহারাজা সার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন। যদি এইসব লোকের মতও অনায়াসে অবহেলা করা হয়, তবে আমলাতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিবার আশা কোথায় (Good-bye to all hopes of co-operation in any way with the bureaucracy in the interest of the people)।' গবর্নমেণ্ট পূর্ববঙ্গের জমিদারশ্রেণীর মুষ্টিমেয় মুসলমান ব্যতীত আর কাহারও কাছ হইতে বঙ্গচ্ছেদের সমর্থন লাভ করেন নাই।

বাঙালির জনমতের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ হইতে জাতীয় জীবনের নূতন পরিচ্ছেদের সূত্রপাত। ৩০শে আশ্বিন দিনটিকে স্মরণীয় করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় লিখিলেন, "আগামী ৩০শে আশ্বিন [১৩১২] বাংলাদেশ আইনের দ্বারা বিভক্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙালিকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই তাহাই বিশেষরূপে স্মরণ ও প্রচার করিবার জন্য সেই দিনকে আমরা বাঙালির রাখি-বন্ধনের দিন করিয়া পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সূত্র বাঁধিয়া দিব। রাখি-বন্ধনের মন্ত্রটি এই, 'ভাই ভাই এক ঠাঁই'।"

এই দিনে অরন্ধনের প্রস্তাব করেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'র প্রস্তাবও তাঁহার। এই বিশেষ দিনকে স্মরণের জন্য কবি 'বাংলার মাটি বাংলার জল' এই মন্ত্রগানটি রচনা করেন। বাংলার সৌন্দর্য, বাংলার সম্পদ, বাঙালির শক্তি, বাঙালির ভাষা— এক কথায় বঙ্গচিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে সর্বতোভাবে উজ্জ্বল করিয়া দেখিয়া কবি বিধাতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন।

৩০শে আশ্বিন কলিকাতায় যে 'রাখিবন্ধন' উৎসব অনুষ্ঠিত হইল, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ সর্বসাধারণের সহিত মিলিয়া অংশ গ্রহণ করিলেন ; প্রাতে 'বন্দেমাতরম্' সম্প্রদায় পরিচালিত শোভাযাত্রার পুরোভাগে তিনি ছিলেন। গঙ্গাঘাটে তিনি বাংলাদেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া 'বাংলার মাটি'র মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন। আপামর জনের হস্তে 'রাখিবন্ধন' করিয়াছিলেন।[১]

সেদিন অপরাহ্নে কলিকাতার আপার সার্কুলার রোডের উপরিস্থিত ময়দানে মহাজাতি সদনের বা ফেডারেশন হলের প্রতিষ্ঠা হইল। নিখিল ভারতের বিচিত্র জাতিসংঘের মিলনের বা ফেডারেশনের কল্পনা সেদিন বাঙালির ভাবপ্রবণ মনে প্রথম জাগিয়াছিল, যথাবিধি ভিত্তি-প্রস্তর প্রোথিত হইয়াছিল[২] ; এই অনুষ্ঠানের হোতা ছিলেন আনন্দমোহন বসু (১৮৪৭-১৯০৬)। আনন্দমোহন ছিলেন কলিকাতার ব্যারিস্টার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বাংলার জাতীয়তাবাদের অন্যতম অগ্রণী। সেদিন বাঙালি তাঁহাকেই ফেডারেশন হলের ভিত্তিস্থাপন করিবার যোগ্যতম প্রতিনিধিরূপে বরণ করিয়াছিল। শেষ রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় আনন্দমোহন স্বেচ্ছাসেবকগনের স্কন্ধে ভর করিয়া ক্ষীণ কম্পিত হস্তে ফেডারেশন হলের ভিত্তি স্থাপন করিলেন ; তাঁহার ইংরেজি অভিভাষণ পাঠ করিলেন ব্যারিস্টার (পরে জাস্টিস) আশুতোষ চৌধুরী ও বাংলা তর্জমা পাঠ করিলেন রবীন্দ্রনাথ।

১ দ্র. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঘরোয়া।

২ ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর ফেডারেশন হলের ভিত্তি প্রস্তর প্রতিষ্ঠিত হয় সত্য, কিন্তু রাজনৈতিক নানা কারণে তথায় 'হল' কখনো নির্মিত হয় নাই। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হইবার পর এইদিকে বাঙালির দৃষ্টি যায় ও এই গৃহ নির্মিত হয়।

অতঃপর সেই বিপুল জনতা মিছিল করিয়া বাগবাজারের পশুপতিনাথ বসুর[১] বাটীর দিকে চলিল, রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে আছেন ; সহস্রকণ্ঠে কবির নবরচিত সংগীত গীত হইতেছে—

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে . .
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে . .
ততই মোদের আঁখি ফুটবে ॥

এই গান শেষ হইলে জনতা পুনরায় ধরিল—

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান্—
. . . . . .
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এতই অভিমান

চল্লিশ বৎসর পূর্বে ইংরেজ সরকারের প্রস্তাবিত অখণ্ড বাংলার বিভাগকে বাঙালি অস্বীকার করিবার জন্য যে প্রকার বদ্ধপরিকর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল, তাহা সত্যই অভূতপূর্ব। সেদিন ভাবোচ্ছ্বাসের সংগীত বাঙালির জীবনে কী-যে নবচেতনা আনিয়াছিল, তাহা এযুগের তরুণদের কল্পনার অতীত। বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের ভাবালুতার সহিত একমাত্র তুলনা হইতে পারে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের যুগের সহিত। সেদিনও ভাবোচ্ছ্বাসের বন্যায় যে-সাহিত্যের জন্ম হয়, তাহা আজ পূর্ণ বিকশিত হইয়া বাঙালির কণ্ঠে সংগীতপারিজাতরূপে শোভা পাইতেছে। স্বদেশী আন্দোলনের আবেগ-জোয়ারে যে বিরাট সাহিত্য ও সংগীত সৃষ্ট হইল, তাহার প্রভাব আমাদের জীবনে ব্যর্থ হয় নাই। বাঙালির কাছে সেদিন দেশ সত্যই মাতৃরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং রবীন্দ্রনাথ যে সেই মহাযজ্ঞে শক্তি-মন্ত্রোচ্চারণদ্বারা দেশমাতৃকার বন্দনা করিয়াছিলেন, একথা কবির অস্বীকৃতি বা দেশবাসীর বিস্মৃতির দ্বারা অপ্রমাণিত হইবে না। ইহার পরেও বাংলাদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন ব্যাপকতরভাবে ও প্রবলতর বেগে আসিয়াছে-গিয়াছে, কিন্তু এমন করিয়া বাঙালির চিত্তকে ভাবাবেগে চঞ্চল করিতে পারে নাই, নূতন সাহিত্য বা শিল্প সাধনায় তাহাকে এমনভাবে উদ্‌বোধিত করিতে পারে নাই।

সাতই অগস্ট হইতে বয়কট বা বিলাতি শিল্পজাত সামগ্রীর বর্জননীতি স্কুল কলেজের স্বেচ্ছাব্রতীছাত্রদের সাহায্যে দ্রুত প্রসার লাভ করিতে লাগিল। নেতাদের সকল প্রকার কর্মের ছাত্রেরাই ছিল সাধক ; স্বদেশী সভা আহ্বান, স্বদেশী সংগীতের শোভাযাত্রা চালনা, বিলাতি মাল পিকেটিং বা ক্রয়বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ, গ্রামে গ্রামে স্বদেশীবস্ত্র ও মনোহারী সামগ্রী মাথায় করিয়া বিক্রয় প্রভৃতি বিচিত্র কর্মের কর্মী ছিল এই ছাত্রবাহিনী ! এই সকল কর্মে প্রধানত রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সংগীতগুলি ছিল তাহাদের রণসংগীততুল্য।

বঙ্গীয় গবর্নমেণ্ট ছাত্রদের এই ব্যবহারকে দমন করিবার জন্য প্রথমে নিয়ম জারি ও পরে আইন পাশ করিলেন। কার্লাইল সাহেব তখন বঙ্গীয় গবর্নমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারি। বঙ্গচ্ছেদ ঘোষণার এক সপ্তাহের মধ্যে (২২ অক্টোবর ১৯০৫) তিনি এক সার্কুলারের সাহায্যে স্কুল কলেজের অধ্যক্ষগণকে জানাইয়া দিলেন যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের জন্য যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে বাঙালি ছাত্রদের পক্ষে যোগদান করা বা সভাসমিতিতে উপস্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

কার্লাইল সার্কুলার ঘোষিত হইবার দুই দিন পরে ৭ই কার্তিক (২৪শে অক্টোবর) ফিল্ড এন্‌ড একাডেমির ভবনে

১ রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুর (১৮৫৫-১৯০৭) কলিকাতা বাগবাজারের বসু বংশীয় ; জমিদার, ধনাঢ্য, কংগ্রেস ভক্ত। দ্র. হরিহর শেঠ, প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়—কথায় ও চিত্রে।

কলিকাতার নেতৃস্থানীয় ভদ্রলোকদের এক সভা হয়। সভাপতি ছিলেন আবছুল রসুল, কলিকাতা হাইকোর্টের তরুণ ব্যারিস্টার। ব্যারিস্টার জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রভৃতি অনেকেই তাহাতে উপস্থিত ছিলেন, সেখানে কথা উঠিল গবর্নমেণ্ট স্বদেশী আন্দোলন নষ্ট করিবার জন্য ছাত্রগণকে যোগদান করিতে নিষেধ করিতেছে, ইহার প্রতিকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া আমাদের শিক্ষাকে স্বাধীন করা।

সেই দিনই ব্যারিস্টার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের ভ্রাতা মেজর নরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহের সভাপতিত্বে কলেজ অফ ফিজি-শিয়ানস এণ্ড সার্জনস গৃহে যে সভার অধিবেশন হয়, সেখানেও এই প্রস্তাব গৃহীত হইল যে, "গবর্নমেণ্টের বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবর্নমেণ্টের চাকরি দুইই পরিত্যাগ করিতে হইবে" অর্থাৎ নন-কো-অপারেশন। ইংরেজপরিচালিত গবর্নমেণ্টের সহিত সর্ববিষয়ে সংস্রব ত্যাগ করিয়া অসহযোগ নীতি অবলম্বন ব্যতীত বৃটিশ শক্তিকে জব্দ করা যাইবে না, এই সিদ্ধান্ত সকলে গ্রহণ করিলেন। এই দুই সভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন না; তবে তিন দিন পরে (১০ কার্তিক ১৩১২) পটলডাঙা মল্লিকবাড়িতে সহস্রাধিক ছাত্রের যে বিরাট সভা হয় তাহাতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সভাপতি। এই সভার বক্তা ছিলেন এটর্নী ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সঞ্জীবনী-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র, বিপিনচন্দ্র পাল, গিরিডির অভ্রব্যবসায়ী বরিশালবাসী মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ব্যারিস্টার ভুবন-মোহন চট্টোপাধ্যায় ও একুমি প্রেসের মালিক প্রেমতোষ বসু। রবীন্দ্রনাথ সভাপতির অভিভাষণে[১] স্পষ্টভাবেই ছাত্রগণকে জাতীয় শিক্ষালয়ে যোগদান করিবার ইঙ্গিত করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমাদের সমাজ যদি নিজের বিদ্যাদানের ভার নিজে না গ্রহণ করেন, তবে একদিন ঠেকিতেই হইবে। . . গবর্নমেণ্ট এদেশের অনুকূল শিক্ষা কখনো দিতে পারেন না। ইহার কারণ অক্ষমতাও হইতে পারে, অনিচ্ছাও হইতে পারে। অক্ষমতা— কেননা যেখানে হৃদয়ের যোগ না থাকে, সেখানে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া যায় না; অনিচ্ছা— কেননা গবর্নমেণ্ট জানেন যে, তাঁহাদিগের সাহিত্য ও ইতিহাস প্রভৃতি হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া আমাদের চিত্ত যে-ভাবে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা তাঁহাদের স্বার্থের পক্ষে অনুকূল নহে। . . বিদেশী অধ্যাপক অশ্রদ্ধার সঙ্গে শিক্ষা দেন। শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা এমন একটা জিনিস পাই, যাহা আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে অনুকূল নহে।"— শিক্ষার আন্দোলন।

পূজার ষষ্ঠীর দিনে (১৬ কার্তিক) ফিল্‌ড এন্‌ড একাডেমিতে ডন সোসাইটির সদস্য ও ছাত্রগণের যে সভা হয়, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ, মোহিতচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ডন সোসাইটি বিংশ শতকের আরম্ভ ভাগে কলিকাতায় কলেজী যুবকদের মধ্যে দেশসেবার যে একটি সুষ্ঠু আদর্শবাদ সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা আজ বিস্মৃতযুগের কাহিনীমাত্র। এই আন্দোলনের গুরুস্থানীয় ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়[২] চরিত্রগুণে ও মনস্বিতায় তিনি যুবসমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এই সোসাইটির সদস্যগণ জাতীয় শিক্ষাপরিষদ স্থাপিত হইলে তথায় অধ্যাপকরূপে আত্মনিয়োগ করেন; তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, হারানচন্দ্র চাকলাদার, কিশোরীমোহন গুপ্ত, অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ও বিনয়কুমার সরকার। রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে কার্লাইল সার্কুলার সম্বন্ধে বলিলেন, "গবর্নমেণ্ট যদি দুই দিন পরে এই পরওয়ানা প্রত্যাহারও করেন, তবু যেন আমরা ইহার শিক্ষাটি কখনও ভুলিয়া না যাই। আমাদের শিক্ষাকে স্বাধীন করিবার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে।" ইহার তিনদিন পরে (১৯শে) উক্ত সমিতির ছাত্রসদস্যগণের সভায় রবীন্দ্রনাথ জাতীয় শিক্ষার সমস্যা সম্বন্ধে পুনরায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিলেন,

১ গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২।

২ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ডন সোসাইটি সম্বন্ধে দ্র. বিনয় সরকারের বৈঠকে, প্রথম খণ্ড।

"আজ যে-সকল ছাত্র গবর্নমেণ্টের কৃত অপমানে বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহাদের সম্মুখে যে কুসুমাস্তৃত পথ রহিয়াছে, তাহা বলা যায় না। তাঁহাদিগকে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দিগের জন্য পথ প্রস্তুত করিতে হইবে।"

সেদিন বাঙালি তাহার সকলপ্রকার ধর্মকর্মের মধ্যেও বঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষে জাতির কর্তব্য স্মরণ করিতেছিল। ময়মনসিংহের জমিদার মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য, নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনারায়ণ রায়, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির আমন্ত্রণে পশুপতি বসু মহাশয়ের বাগবাজারস্থ ভবনে বিজয়া দশমীর পরদিন 'বিজয়া সম্মিলনী' আহূত হইল (২১ কার্তিক)। বাঙালির হৃদয় তখন বঙ্গচ্ছেদের ক্ষোভে পরিপূর্ণ; দেশের জন্য ভাবাবেগ তখন সকল সহজবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া আকুলভাবে চলিয়াছিল। বিজয়া দশমীর মিলনকে যে সাধারণ সংকীর্ণতার মধ্যে হিন্দুরা দেখিতে অভ্যস্ত ছিল, সে-গণ্ডি ত্যাগ করিয়া আজ বৃহত্তর পটভূমিতে দেশের অখণ্ড প্রাণশক্তিকে একসূত্রে গ্রথিত করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে আহ্বান করিলেন। বক্তৃতার উপসংহারে কবি যাহা বলিয়াছিলেন আমরা সেইটুকু মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম[১]—

"হে বন্ধুগণ, আজ আমাদের বিজয়া-সম্মেলনের দিনে হৃদয়কে একবার আমাদের এই বাংলাদেশের সর্বত্র প্রেরণ করো। উত্তরে হিমাচলের পাদমূল হইতে দক্ষিণে তরঙ্গমুখর সমুদ্রকূল পর্যন্ত, নদীজালজড়িত পূর্বসীমান্ত হইতে শৈলমালাবন্ধুর পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত চিত্তকে প্রসারিত কর। যে চাষি চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, যে রাখাল ধেনুদলকে গোষ্ঠগৃহে এতক্ষণে ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো; শঙ্খমুখরিত দেবালয়ে যে পূজার্থী আগত হইয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নমাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো। আজ সায়াহ্নে গঙ্গার শাখা-প্রশাখা বাহিয়া ব্রহ্মপুত্রের কূল-উপকূল দিয়া একবার বাংলাদেশের পূর্বে পশ্চিমে আপন অন্তরের আলিঙ্গন বিস্তার করিয়া দাও, আজ বাংলাদেশের সমস্ত ছায়াতরুনিবিড় গ্রামগুলির উপরে এতক্ষণে যে শারদ আকাশে একাদশীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্নাধারা অজস্র ঢালিয়া দিয়াছে, সেই নিস্তব্ধ শুচি রুচির সন্ধ্যাকাশে তোমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের 'বন্দেমাতরম্' গীতধ্বনি একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া যাক—একবার করজোড় করিয়া নতশিরে বিশ্বভুবনেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো—

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান্॥

ইতিমধ্যে মফস্বলে স্কুলকলেজের ছাত্রদের উপর উৎসাহী অধ্যক্ষগণের উৎপীড়ন শুরু হইয়াছিল; রাজনৈতিক সভায় যোগদানের অপরাধে রংপুর গবর্নমেণ্ট স্কুলের ছাত্রেরা দণ্ডিত হইল। তথাকার ছাত্ররা শিক্ষাবিভাগের এই জুলুমের প্রতিবাদে বিদ্যালয় ত্যাগ করিল— তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তরুণ অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত ও ব্রজসুন্দর রায়। সেখানে সর্বপ্রথম 'জাতীয় বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হইল (২৩ কার্তিক)। কলিকাতায় নেতারা যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে জল্পনা-কল্পনা করিতেছিলেন, তাহা নিঃসম্বল ছাত্র অধ্যাপকগণের প্রচেষ্টায় মফস্বলেই প্রথম স্থাপিত হইল।

সেই দিনই (২৩ কার্তিক) কলিকাতায় ফিল্‌ড এন্‌ড একাডেমির পাশে পান্তির মাঠে[২] যে বিরাট জনসভা হয় তাহাতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইল। সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক এই সভার সভাপতি ছিলেন,

১ বঙ্গদর্শন ১৩১২ কার্তিক, ভারতবর্ষ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪।

২ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে বিদ্যাসাগর কলেজের হস্টেল হইয়াছে, ঐ স্থানটি 'পান্তির মাঠ' নামে পরিচিত ছিল।

তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একলক্ষ টাকা দান করিবেন।

এই দিনই কলিকাতার অন্য প্রান্তে আর একটি সভায় 'অ্যাণ্টি-সার্কুলার সোসাইটি' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা কলিকাতার যুবসমাজের দ্বারা গৃহীত হইয়াছিল। এই সমিতির নেতা ছিলেন তরুণ ছাত্রনেতা শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু। রাজনীতিতে যোগদান সম্বন্ধে গবর্নমেণ্টের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করিবার এই প্রথম আয়োজন। ইহাকে আইন-অমান্য আন্দোলনের আদি প্রয়াস বলা যাইতে পারে। বাঙালির বিচিত্র ভাবাবেগকে শাসনশিলায় রুদ্ধ করিবার জন্য বঙ্গদেশে কার্লাইল ও রিসলী সাহেবের সার্কুলার আবির্ভূত হইয়াছিল। পূর্ববঙ্গ-আসামের শিক্ষাপরিচালক লায়ন্স সাহেব বাংলা সরকারের সদৃদৃষ্টান্ত অচিরেই অনুসরণ করিয়া স্কুল-ইন্সপেক্টরগণের নিকট পরওয়ানা পাঠাইয়া জানাইয়া দিলেন যে, অতঃপর রাজনৈতিক সভাসমিতিতে যোগদান করা ছাত্রগণের পক্ষে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। উক্ত প্রদেশের ছোটলাট ব্যামফীল্ড ফুলারের নিকট বন্দেমাতরম ধ্বনি পর্যন্ত মহাপাতক। ধীরে ধীরে বৃটিশ রাষ্ট্রনীতির নগ্ন মূর্তি প্রকাশ পাইতে থাকিল।

রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায়; নেতাদের সহিত মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ হয়। ১৬ নভেম্বর ১৯০৫ (৩০শে কার্তিক ১৩১২) Landholder's Association-গৃহে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে কমিটি গঠন ও কর্তব্য নির্ধারণের জন্য যে মন্ত্রণাসভা হয় তাহাতে বাংলাদেশের ধনী মানী জ্ঞানী গুণী লোক অনেকে উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম। জাতীয় শিক্ষাপরিষদের নাম দেওয়া হইল Bengal Council of Education। তারকনাথ পালিত, রাজা প্যারীমোহন মুখুজ্জে, গণেশচন্দ্র চন্দ্র, কালীনাথ মিত্র, সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক হইলেন ট্রাস্টি।

পরদিন ফিল্ড এন্ড একাডেমির মাঠে যে জনসভা হয়, তাহাতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি হন। সুরেন্দ্রনাথ পূর্বদিন শিমুলতলা হইতে কলিকাতায় ফিরিলে ছাত্রসমাজ যে অভ্যর্থনা দান করে তাহা অভূতপূর্ব ব্যাপার। সুরেন্দ্রনাথ বাংলার একছত্র নেতা। তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইত uncrowned king of Bengal। এই সভায় রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে "জাতীয় শিক্ষা সমাজ" প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হইল। ঐ সভায় শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেন, "আমাদের শিক্ষাকে স্বাধীন করিবার আন্দোলন নূতন নহে, বোধ হয় সর্বপ্রথম বঙ্কিমবাবু এ আন্দোলন উত্থাপন করেন। তারপর ১২৯৯ সালে 'সাধনা'তে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবিষয়ে আলোচনা করেন[১]।"—শিক্ষার আন্দোলন পৃ. ২৮।

যাহাই হউক শিক্ষিত সমাজের মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় লইয়া কল্পনা ও পরিকল্পনা চলিতে লাগিল। ২৪শে অগ্রহায়ণ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের গঠনপ্রণালীর (constitution) খসড়া তৈয়ারী করিবার জন্য সদস্যদের যে সভা বসে তাহাতে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন, এই সভায় ডাক্তার নীলরতন সরকার শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।

রাজনৈতিক নেতাদের ও শিক্ষাপরিষদের সদস্যদের ভাবধারা ও কর্মপদ্ধতি যেভাবে চলিতে লাগিল তাহা রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত হইবার বিশেষ কারণ ছিল না। তিনি দেখিলেন যে, উদ্যোক্তাদের মধ্যে জাতীয়শিক্ষা সম্বন্ধে কোনো নূতন পরিকল্পনা দিবার মতো লোক নাই, কলিকাতা বা ঐ শ্রেণীর বিলাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে আর একটি বিদ্যায়তন স্থাপন করিয়া তাহার গায়ে জাতীয় শব্দ লেপন করিয়া দিলেই যে তাহা জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদ হইবে না একথা রবীন্দ্রনাথ ভালো করিয়া বুঝিতেন। রাজনীতি ক্ষেত্রেও বাক্‌সর্বস্বতা ছাড়িয়া নূতন পথ প্রদর্শনের ইচ্ছা চেষ্টা বা শক্তি কাহারো নাই। শিক্ষা বিষয়েও তদ্রূপ। দীর্ঘকাল উত্তেজনার পথ বাহিয়া চলা কবির পক্ষে অসম্ভব। তিনি দিব্য চক্ষে দেখিলেন যে নেতি নেতি দ্বারা সত্যে উপনীত হওয়া যাইবে না। বৃটিশপণ্য বর্জনের জন্য দেশবাসীর

১ শিক্ষার হেরফের, সাধনা ১২৯৯ পৌষ, পৃ ৯৩-১১২। শিক্ষা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২।

মধ্যে যতটা উত্তেজনা দেশীয় শিল্পস্থাপনের জন্য ততটা উৎসাহের অভাবও। বলা বাহুল্য বাংলাদেশের বয়কটের সুযোগ গ্রহণ করিয়া বোম্বাই ও আহমদাবাদের ধনপতিরা অচিরে ধনকুবের হইয়া উঠিলেন, কিন্তু বাঙালি সে সুযোগ গ্রহণে অগ্রসর হইল না। রবীন্দ্রনাথ কবি হইলেও বিষয় ও বস্তু সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, দেশ তাঁহার নিকট কেবলমাত্র উচ্ছ্বাসের বিষয় নহে। তিনি দেশকে ভালো করিয়াই জানেন, তিনি বাংলার মধ্যে বাস করিয়াছেন। তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন, দেশসেবার দ্বারাই দেশহিতৈষণা প্রকাশ পাইবে, আর কোনো পথ বা পদ্ধতি নাই। কিন্তু রাজনৈতিক উত্তেজনার স্রোত সেদিন এমনি খরবেগে চলিতেছিল যে, রবীন্দ্রনাথ কবি বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার কথা কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিল না। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সমাজের ক্রোড়পত্রে দেশের কাজ বলিতে কী বুঝায় তাহার অতি বিস্তারিত কর্মপদ্ধতি দেশবাসীর সম্মুখে ধরিয়াছিলেন। তাঁহার পরিকল্পনায় কোথায়ও অস্পষ্টতা বা জড়তা ছিল না। কিন্তু নেতারা সে-পথে গেলেন না।

কর্মসম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট পন্থা আবিষ্কৃত না হওয়ায় ও গঠনমূলক ভাবাত্মক কর্মে আত্মনিয়োগের পথ না পাইয়া পাবলিকের উচ্ছ্বাসপূর্ণ মতামতের কচকচানিতে দেশ মাতিয়া উঠিল। রাজনীতির স্বভাবকুটিল পথ বহু মতের কণ্টকে দুর্গম হইয়া উঠিল। বহু নেতৃত্বের অরাজকতায়, কাহার আহ্বানে লোকে সাড়া দিবে ভাবিয়া পায় না। গত চারিমাসের মধ্যে— বিশেষভাবে কার্লাইল, রিসলী, লায়ন্স সাহেবের সার্কুলার জারি হইবার পর হইতে রাজনীতির কর্মধারা যেভাবে ও যত বেগে রূপান্তরিত হইতেছিল, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের অন্তর সাড়া দিতে পারিতেছিল না।

এই সময়ে 'শিক্ষার আন্দোলন' নামে একখানি পুস্তিকায় জাতীয় শিক্ষার সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে কতকগুলি প্রবন্ধ সংগৃহীত হয়।[১] রবীন্দ্রনাথ তাহার ভূমিকা[২] লেখেন (২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩১২)। সেই ভূমিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলে কবির চিন্তাধারা কোন্‌পথে চলিতে শুরু হইয়াছিল তাহা আর অস্পষ্ট থাকিবে না। তিনি লিখিতেছেন—

"বঙ্গবিভাগ লইয়া একটা আন্দোলনের ঝড় উঠিল। রাগের মাথায় অনেকে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে পর্যন্ত না পার্টিসন রহিত হইবে সে-পর্যন্ত তাঁহারা বিলাতি দ্রব্য কেনা রহিত করিবেন। সে সময়ে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, পরের উপর রাগ করিয়া নিজের হিত করিবার চেষ্টা স্থায়ী হয় না; আমরা পরাধীনজাতির মজ্জাগত দুর্বলতাবশত মুগ্ধভাবে বিলাতি জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি, যদি মোহপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বদেশীবস্তুর অভিমুখে ফিরিতে পারি তবে স্বদেশ একটা নূতন শক্তি লাভ করিবে।..

"তাহার পরে মফস্বলে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদের প্রতি কর্তৃপক্ষ এক ন্যায়বিগর্হিত সুবুদ্ধিবিবর্জিত সার্কুলার জারি করিলেন। তখন ছাত্রমণ্ডলী হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া পণ করিতে বসিলেন যে, আমরা বর্তমান য়ুনিভার্সিটিকে 'বয়কট' করিব; আমরা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিব না, আমাদের জন্য অন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হউক।.

"আজ যাঁহারা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিতেছেন, আমাদের এখনই আশু একটি বিশ্ববিদ্যালয় চাই, কালই সেখানে পরীক্ষা দিতে যাইব, তাঁহাদিগকে দেশীয় বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার স্থায়ী সহায় বলিয়া মনে করিতে সাহস হয় না। এমন কি, তাঁহারা ইহার বিঘ্নস্বরূপ হইতেও পারেন।..প্রবল ক্ষমতাশালী পক্ষের প্রতি রাগ করিয়া যখন মনে জেদ জন্মে, তখন অতি সত্বর যে অসাধ্য সাধন করিবার ইচ্ছা হয় তাহা ইন্দ্রজালের দ্বারাই সম্ভব।..

১ শিক্ষার আন্দোলন। ১৯০৫ অক্টোবর ১৬ বঙ্গবিভাগ হয়; কার্লাইল ছাত্রগণকে আন্দোলনে যোগদান করিবার বিরুদ্ধে যে সার্কুলার জারি করেন তাহা স্টেটসম্যান কাগজে ২২ অক্টোবর [১৩১২ কার্তিক ৫] প্রকাশিত হইলে বিদ্যালয় বর্জন ও জাতীয় শিক্ষালয় স্থাপনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ হয়; ইহার বিস্তারিত বিবরণসহ (২৫ অগ্রহায়ণ ১৩১২ পর্যন্ত) 'শিক্ষার আন্দোলন' বা 'শিক্ষা' নামে একটি পুস্তিকা 'ভাণ্ডার' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ২৬ অগ্রহায়ণ ১৩১২ শিক্ষার আন্দোলনের ভূমিকা লেখেন। শান্তিনিকেতন হইতে এইটি লিখিত হইয়াছিল।

২ শিক্ষা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২।

"কিন্তু মায়ার ভরসা ছাড়িয়া দিয়া যদি যথার্থ কাজের প্রত্যাশা করা যায়, তবে ধৈর্য ধরিতেই হইবে। ভিত্তি হইতে আরম্ভ করিতে হইবে, ছোটো হইতে বড়ো করিতে হইবে। . . ছোটো আরম্ভের প্রতি ধৈর্য রক্ষা করা যথার্থ প্রীতির লক্ষণ। . . কিন্তু বিপক্ষপক্ষের প্রতি স্পর্ধা করিয়া যখন আমরা কোনো উদ্যোগে প্রবৃত্ত হই তখন আমাদের বিলম্ব সয় না। . . দেশীয় বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগে প্রথম হইতেই আমাদের এই যে আঘাতকর অধৈর্যের লক্ষণ দেখা যাইতেছে, ইহাই আমাদের আশঙ্কার বিষয়।"

ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভার পরই কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গিয়াছিলেন ও উল্লিখিত পুস্তিকার ভূমিকা লেখেন; সেইদিন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে যে পত্র[১] লেখেন · তাহাতে পূর্বোদ্‌ধৃত মতই ব্যক্ত হইয়াছিল। 'যাঁহারা গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে স্পর্ধা-প্রকাশ করাকেই আত্মশক্তি-সাধনা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা বলিয়া মনে করেন' তাঁহাদের সম্বন্ধে কবি লিখিলেন যে, "দেশে যদি বর্তমান কালে এইরূপ লোকেরই সংখ্যা এবং ইঁহাদেরই প্রভাব অধিক থাকে তবে আমাদের মত লোকের কর্তব্য নিভৃতে যথাসাধ্য নিজের কাজে মনোযোগ করা। . . উন্মাদনায় যোগ দিলে কিয়ৎপরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয় এবং তাহার পরিণামে অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে, অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে, আমার এই প্রদীপটিকে জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব।"

কবির বাণী শুনিবার মত ধৈর্য দেশবাসীরও নাই, দেশের নেতাদেরও নাই। নেতারা ভাবিতেছেন ম্যাজিক বা ইন্দ্রজালের দ্বারা দেশোদ্ধার করিবেন, কর্মের দ্বারা নহে।

এই ভাবনাই 'খেয়া'র বিদায়[২] কবিতায় প্রকাশ হইয়া পড়ে—

> বিদায় দেহো, ক্ষম আমায় ভাই
> কাজের পথে আমি তো আর নাই।
> ...
> অনেকদূরে এলেম সাথে সাথে,
> চলেছিলেম সবাই হাতে হাতে।
> এইখানেতে দুটি পথের মোড়ে
> হিয়া আমার উঠল কেমন করে
> জানি নে কোন্ ফুলের গন্ধঘোরে
> সৃষ্টিছাড়া ব্যাকুল বেদনাতে।
> আর তো চলা হয় না সাথে সাথে।

সংগঠন ও সমবায়

কর্মের মধ্যে ধর্মকে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, বাস্তবের মধ্যে আদর্শকে কিভাবে প্রস্ফুটিত করা যায়, জীবনের মধ্যে সুন্দরকে কেমন করিয়া উপলব্ধি করা যায় ইহাই হইতেছে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের আদ্যন্ত জিজ্ঞাসা। কেবলমাত্র আদর্শ প্রচারে রবীন্দ্রনাথের তৃপ্তি নাই। তাঁহার পরিকল্পিত গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি যখন কেহই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার ও দৃঢ়তার সহিত পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন না, তখন তিনি স্বয়ং সেই কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন। কবি

১ শান্তিনিকেতন, ২৬ অগ্রহায়ণ ১৩১২। দ্র. বঙ্গবাণী ১৩৩৩ ফাল্গুন পৃ. ৫। চিঠিপত্র ৬।

২ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০। ১৪ চৈত্র ১৩১২।

যখন দেখিলেন তাঁহার শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে কেহ বিশেষ উৎসাহী নহে, তখন তিনি কলিকাতার উত্তেজনা হইতে সরিয়া গেলেন। পরযুগে অনেকে বলিতেন যে, গবর্নমেণ্টের ধর্ষণনীতি অবলম্বনের পর হইতে কবি রাজনীতির পথ ত্যাগ করেন। সে কথা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের সহিত যথার্থভাবে তিন মাস মাত্র যুক্ত ছিলেন— ১৩১২ সালের আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত। এই কয়েক মাসের অভিজ্ঞতার কথা তিনি 'বিদায়' কবিতায় প্রকাশ করেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস— ঐ কবিতা যখন রচনা করেন (১৪ চৈত্র ১৩১২) তখনো বরিশালের যজ্ঞভঙ্গ হয় নাই, ইংরেজের রুদ্রশাসন দেখা দেয় নাই, বাংলাদেশে রুদ্রপন্থীদের রাজনৈতিক হত্যাদি সংঘটিত হয় নাই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রাজনীতির পথ ত্যাগ করিবার যে অপবাদ দেওয়া হয়, তাহা সমসাময়িক ঘটনার দ্বারা প্রমাণ করা যায় না। তিনি কবি, কবির কাজ করিয়াছিলেন গান লিখিয়া। তিনি মনীষীর কাজ করিয়াছিলেন আদর্শ প্রচার করিয়া। বাঙালি তাঁহার গানগুলিকে কণ্ঠে তুলিয়া লইল। তাঁহার কর্মপদ্ধতিকে গ্রহণ করিল না। তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গিয়া বিদ্যালয়ের উন্নতিতে মন দিলেন ; তাঁহার নিজ জমিদারিতে গঠনমূলক কাজে তাঁহার সাধ্য ও বুদ্ধি মত শক্তি প্রয়োগ করিলেন।

বয়কট তো হইল। কিন্তু দেশী কাপড় কোথায় ; বাংলাদেশে তখনো বাঙালির কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বর্জননীতির দ্বারা জাতির নগ্নতা দূর হইবে না। এ কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সহজ বুদ্ধির বলে বুঝিতেন বলিয়া গঠন-মূলক কর্মে লিপ্ত হইলেন। বাংলাদেশের তাঁতিদের খ্যাতি বহু প্রাচীন। সেই তাঁতশিল্পকে পুনর্জীবিত করিতে হইবে। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় কুষ্ঠিয়াতে বয়নবিদ্যালয় স্থাপিত হইল। এই বয়নবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহায় ছিলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গগনেন্দ্রনাথ এই শিল্পের অভ্যুত্থান চাহিয়াছিলেন আর্টের বা চারুশিল্পের দিক হইতে, আর সুরেন্দ্রনাথ উহাকে দেখিতেছিলেন ইন্‌ডাস্ট্রি বা কারুশিল্পের দিক হইতে, রবীন্দ্রনাথ দেখিতেছিলেন বয়কটের সাফল্যর দিক হইতে। বাংলার বয়নশিল্পের সহিত আর্টের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মহামতি হ্যাভেল সাহেব ও ভগিনী নিবেদিতা। স্বাদেশিকতার গর্বে আমরা যেন এই সত্যটি ভুলিয়া না যাই যে, এই দুইজন বিদেশীই ভারতীয় চারু ও কারু শিল্পের সৌন্দর্যকে বুঝিবার জন্য বাঙালির চোখে প্রথম অঞ্জন বুলাইয়া দেন। বাংলাদেশের ভাবুকরা সেদিন কাপড়ের কলের কথা বা চরকা কাটার কথা ভাবেন নাই ; তাঁহারা জানিতেন বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ জোলা ও তাঁতিকে কাজ দিতে পারিলে বস্ত্রাভাব হয়তো দূর হইতে পারে। তাই সেদিন তাঁতের কাপড় পুনর্জীবিত করিবার জন্য একদল বাস্তববাদী ভাবুকের চিত্ত সেই দিকে ছুটিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশীসমাজে গ্রামের সমস্যা ও তাহার সমাধান সম্বন্ধে যেসব কথা বলিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটি কার্য স্বয়ং গ্রহণ করিলেন ; প্রজাদের মধ্যে মিতব্যয়িতা, সংঘকর্ম ও সঞ্চয়-অভ্যাস শিক্ষা দিবার জন্য জমিদারিতে সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করিলেন, সেই সঞ্চয় ব্যাঙ্ক 'পতিসর কৃষি ব্যাঙ্ক' নামে পরিচিত হয়। এ ছাড়া কৃষক প্রজাদের মধ্যে আত্মসম্মান ও আত্মশক্তি উদ্‌বুদ্ধ করিবার জন্য লোকসভা স্থাপন করা হইল। এইখানে পাঠকদের একটি কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, রবীন্দ্রনাথ যখন প্রজাদের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সমবায় শক্তি জাগরূক করিবার কথা ভাবিতেছিলেন ও সামান্য কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তখন বাংলাদেশে সরকারী কো-অপারেটিভ আন্দোলন আরম্ভ হয় নাই।

বাঙালি জাতির মধ্যে যে মেরুদণ্ডহীন নির্জীবতা লক্ষ্য করিয়া বড় দুঃখেই কবি একদা বলিয়াছিলেন "সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালী করে— মানুষ করো নি", সেই অপবাদ অপনোদন করিবার দিকে তাঁহার মন গেল। সাতকোটি বাঙালিকে হঠাৎ মানুষ করিয়া তোলা, তাঁহার কেন, স্বয়ং ভগবানেরও সাধ্যাতীত ; তাই তিনি

তাঁহার সামান্য শক্তিকে নিজ বিদ্যালয়ের জন্য নিয়োগ করিলেন। আজ তাঁহার মনে হইতেছে যে, ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের মুষ্টিমেয় মানবকের ভবিষ্যৎ উন্নতির ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে শাসন ও সংযম আনিয়া তাহাদিগকে শক্তিমান করিতে পারিলেই তাঁহার কর্মের সফলতা। এই সংকল্প গ্রহণ করিয়া বিদ্যালয়ের শাসন-ব্যবস্থায় অনেক কিছু পরিবর্তন সাধন করিলেন। নূতন সংস্কারের মূল কথা ছিল, শাসন ও সংযম পরস্পরের পরিপূরক। শাসন বিষয়ে যাহাকে নেতা বলিয়া নিজেরা নির্বাচন করিয়া গ্রহণ করিব, তাহার একনায়কত্বে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিব, এইখানে সংযম। অধ্যাপকগণের মধ্যে তিনজন অধিনায়ক হইলেন, ছাত্রগণের মধ্যেও নায়কত্বায় নির্বাচনপ্রণালী প্রবর্তিত হইল। ছাত্রদের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা হইল; অধ্যাপকমণ্ডলীতেও এই নির্বাচনপ্রথা আসিল। মোহিতচন্দ্র সেন চলিয়া যাইবার পর, হেডমাস্টার-প্রথা রদ হয়, সকল কার্য গিয়া পড়ে ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালের উপর; কিন্তু এই নূতন ব্যবস্থায় কর্তৃত্ব পড়িল সমস্ত মণ্ডলীর উপর এবং মণ্ডলী যাঁহাকে নির্বাচন করিবেন, তিনি হইবেন পরিচালক। সেই হইতে আশ্রমে নির্বাচনবিধির প্রবর্তন। জানি না, ইতিপূর্বে অন্য কোনো বিদ্যা-আয়তনে এরূপভাবে ছাত্র-অধ্যাপকগণের হস্তে শ্রদ্ধার সহিত বিশ্বাসের সহিত পরিচালনা ভার ন্যস্ত হইয়াছিল কিনা। আসল কথা, দেশের মধ্যে বঙ্গচ্ছেদ লইয়া যে উত্তেজনা শুরু হইয়াছিল, তাহাকে সংহত করিয়া, কর্মের মধ্যে নিষ্ঠারূপে, জীবনের মধ্যে সংযমরূপে, সমাজের মধ্যে ত্যাগরূপে আত্মপ্রকাশের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। স্বাদেশিকতার উত্তেজনাকে বিদ্যালয়ে ও তাহার চারিপার্শ্বে গঠনমূলক কর্মের মধ্য দিয়া সার্থক করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের ঔৎসুক্য। নিকটস্থ হরিজনপল্লীতে ছাত্র-অধ্যাপকের সাহায্যে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইল; আশ্রম-ভৃত্যদের মধ্যে জ্ঞান শিক্ষা বিতরণ প্রচেষ্টা শুরু হইল।

রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে রাজনীতি চর্চায় ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন বারে বারে, কিন্তু তিনি তাঁহার বিদ্যালয়কে কোনো উত্তেজনার আবর্তে কখনো টানিতে চাহিতেন না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও শান্তিনিকেতন তাহার ধ্যানাসন ত্যাগ করিয়া স্বাদেশিকতার দম্ভে বারে বারে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। কারণ কোনোদিনই বিদ্যালয়ের সকল অধ্যাপকের মধ্যে শান্তিনিকেতনের মূলগত আদর্শের প্রতি— রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদের প্রতি— অকৃত্রিম আনুগত্য ছিল না। তাই রাজনীতির বিক্ষোভ বারে বারে এখানকার আদর্শকে আঘাত করিয়াছে; স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও অনুরূপই ঘটে।

যাহাই হউক, বঙ্গচ্ছেদের আবর্তের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়া রবীন্দ্রনাথের মনে সবচেয়ে বড়ো করিয়া যে কথা জাগিতেছিল সেটি হইতেছে সর্বমানবের মধ্যে মিলন সাধন; তাই দেখি পৌষ উৎসবের (৭ পৌষ ১৩১২) সময় এই কথাটিই তাঁহার ভাষণের মধ্যে আর সকল কথাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। "মিলনের মধ্যেই সত্যের প্রকাশ— মিলনের মধ্যে যে সত্য, তাহা কেবল বিজ্ঞান নহে তাহা আনন্দ, তাহা রসস্বরূপ, তাহা প্রেম তাহা আংশিক নহে, তাহা সমগ্র; কারণ, তাহা কেবল বুদ্ধিকে নহে, তাহা হৃদয়কেও পূর্ণ করে। . .তিনি নীরস সত্য নহেন, তিনি প্রেম। এই প্রেমই উৎসবের দেবতা— মিলনই তাঁহার সজীব সচেতন মন্দির।"[১]

দেশের দারুণ দুর্দিনে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক ভেদের সম্মুখে এই মিলনের কথাটিই কবির কাছে উৎসব-সাফল্যের চরম বাণীরূপে প্রকাশিত হইতেছে। মানুষে মানুষে মিলনের বাধা কোথায় সে প্রশ্ন ইহার পরেই উঠে; আধ্যাত্মিক দিক হইতে যে-মিলনকে সহজ মনে হয়, ব্যবহারিক দিক হইতে তাহা হয় দুর্লঙ্ঘ্য। মানুষের আত্ম-পরিতৃপ্তির অপরিমিত আকাঙ্ক্ষা, ভোগ-আড়ম্বর-স্পৃহা এই ভেদাভেদের প্রধানতম কারণ। রবীন্দ্রনাথ এই কথাটি 'বিলাসের ফাঁস'[২] (ভাণ্ডার ১৩১২ মাঘ) প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিলেন। লেখক নানাভাবে দেখাইলেন যে,

১ উৎসব, বঙ্গদর্শন ১৩১২ মাঘ। ধর্ম, রবীন্দ্র-বচনাবলী ১৩।
২ সমাজ, রবীন্দ্র-বচনাবলী ১২।

মানুষের ভোগস্পৃহা বিলাসিতাবৃদ্ধি কখনো সমগ্রের ধনবৃদ্ধির বা উন্নতির লক্ষণ নহে। পূর্বকালে এদেশে ব্যক্তি-বিশেষের উদ্‌বৃত্ত ধন বারে বারে সামাজিক ক্রিয়াকর্ম ও ধর্মানুষ্ঠানে সর্বসাধারণের মধ্যে বন্টিত হইত। এখন তাহা ব্যক্তিগত ভোগে নিয়োজিত হয়। লেখক লোকসমূহকে জীবনযাত্রা লঘু করিবার উপদেশ দিয়া বলিলেন, "যে-ধন সমস্ত দেশের বিচিত্র অভাবমোচনের জন্য চারিদিকে ব্যাপ্ত হইত, সেই ধন সংকীর্ণ স্থানে আবদ্ধ হইয়া যে ঐশ্বর্যের মায়া সৃজন করিতেছে" তাহা সত্য ঐশ্বর্য নহে। "সমস্ত শরীরকে প্রতারণা করিয়া কেবল মুখেই যদি রক্ত সঞ্চার হয়, তবে তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না। দেশের ধর্মস্থানকে বন্ধুস্থানকে জন্মস্থানকে কৃশ করিয়া, কেবল ভোগস্থানকে স্ফীত করিয়া তুলিলে, বাহির হইতে মনে হয় যেন দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে চলিল। সেইজন্য এই ছদ্মবেশী সর্বনাশই আমাদের পক্ষে অতিশয় ভয়াবহ। মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নহে।" এই উক্তির সত্যতা ও গভীরতা পরম-আধুনিক রাষ্ট্রনীতিকরাও সানন্দে স্বীকার করিবেন।

সকলের সঙ্গে মিলিবার জন্য যে আকৃতি কবির মনের মধ্যে কিছুকাল হইতে দেখা দিতেছে এবং যাহাকে তিনি নানা গদ্য রচনার মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতেছেন, তাহা 'অবারিত'র'[১] মধ্যে রাহস্যিক রূপ পাইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়—

পায়ের শব্দ বাজে তাদের, রজনীদিন বাজে।
ওগো, মিথ্যে তাদের ডেকে বলি, 'তোদের চিনি না যে!'
কাউকে চেনে পরশ আমার, কাউকে চেনে ঘ্রাণ,
কাউকে চেনে বুকের রক্ত, কাউকে চেনে প্রাণ।
ফিরিয়ে দিতে পারি না যে হায় রে—
ডেকে বলি, 'আমার ঘরে যার খুশি সেই আয় রে, তোরা
যার খুশি সেই আয় রে।'

কবিতাটি উৎসবের কয়েক দিন পরে শান্তিনিকেতনে লেখা (১৫ই পৌষ ১৩১২), এই আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা 'লীলা'[২] কবিতার মধ্যে অন্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছে (২০ পৌষ)।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এখন কবিতা লেখার সময় ও সুযোগ খুবই কম— বিদ্যালয়ের কাজ তো আছেই। তা ছাড়া রাজনীতি বা তৎসংক্রান্ত প্রশ্ন লইয়া দেশময় নানা প্রকারের অশান্তি; সেসব সম্বন্ধে নীরব থাকা কবির পক্ষে অসম্ভব। এবার শীতকালে (১৯০৫ ডিসেম্বর) প্রিন্স্‌ অব ওয়েলস আসিলেন ভারত-ভ্রমণে; ইনি ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের পুত্র, পরে পঞ্চম জর্জ হন; ইহার পৌত্রী দ্বিতীয় এলিজাবেথ বর্তমানে ইংলণ্ডেশ্বরী। প্রায় বত্রিশ বৎসর পূর্বে ইহার পিতা এডোয়ার্ড তাঁহার যৌবরাজ্যকালে ভারতে আসিয়াছিলেন, তাহার পর এই। দেশের সাধারণ লোকের মনোভাব রাজভক্তিতে বা রাজভয়ে উচ্ছ্বসিত না সংকুচিত বলা কঠিন। কাশীর কন্‌গ্রেসে প্রথম প্রস্তাব হইল যুবরাজের ভারত আগমন উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন। প্রসঙ্গত বলি, একমাত্র বাংলাদেশের প্রতিনিধি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

যুবরাজের ভারত-আগমন ব্যাপারটাকে লইয়া রবীন্দ্রনাথের মনে যে চিন্তার উদয় হয়, তাহা তিনি 'রাজভক্তি'[৩] শীর্ষক প্রবন্ধে ব্যক্ত করেন (ভাণ্ডার ১৩১২ মাঘ)। ভারতবাসীর সহিত রাজার বা রাজপরিবারের কাহারো কখনো

১ খেয়া, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০।
২ খেয়া, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০।
৩ রাজাপ্রজা, গদ্য-গ্রন্থাবলী ১০। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০।

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয় নাই। ভারতীয়দের অন্তরের মধ্যে তাঁহারা কখনো আসন পাতিবার চেষ্টা করেন নাই; এমন অবচ্ছিন্ন শাসনবিধি পৃথিবীর কোথায়ও এমনভাবে কৃতকার্য হইতে পারে নাই। প্রজার সঙ্গে রাজার বা রাজপুরুষের কোনো প্রকার ব্যক্তিগত বা হৃদয়গত সম্বন্ধ স্থাপন ইংরেজ-রাজনীতির বিরুদ্ধ। সুতরাং দেশবাসীর চিত্তে শুধু আড়ম্বর আতিশয্য ও ভীতির ছাপ রাখিয়া তিনি অতিথির ন্যায় আসিয়া পুরানো হইবার পূর্বেই সগৌরবে দেশ ত্যাগ করিলেন।

রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনাটিকে বিশ্লেষণ করিয়া বলিলেন, রাজার সঙ্গে এই সম্বন্ধ মোটেই সহজ ও সুন্দর নহে। এখানকার রাজাসনে যে রাজপ্রতিনিধি বা বড়লাটরা বসেন, তাঁহাদের মেয়াদ বেশিদিনকার হয় না, অথচ এখানে রাজক্ষমতা যেরূপ অত্যুৎকট, স্বয়ং ভারতসম্রাটেরও সেরূপ নহে। বনিয়াদি রাজাকে রাজকীয় নেশায় টলাইতে পারে না; হঠাৎ-রাজার পক্ষে এই নেশা একেবারে বিষ। এ দেশের ইংরেজ-রাজারা রাজভক্তি দাবি করেন; কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান সে-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গেলে কাছে আসিতে হয়, কেবল জবরদস্তিতে রাজভক্তি আসে না। ইংরেজ কাছেও ঘেঁসিবে না, হৃদয়ও দিবে না, অথচ রাজভক্তি চায়; "শেষকালে সেই ভক্তি সম্বন্ধে যখন সন্দেহ জন্মে তখন গুর্খা লাগাইয়া, বেত চালাইয়া, জেলে দিয়া ভক্তি আদায় করিতে ইচ্ছা হয়।"

যুবরাজের আগমন উপলক্ষে দরবার হইল। এই দরবারে ইংরেজ প্রাচ্যদেশীয় কোনো বদান্যতা বা উদারনীতির প্রশ্রয় দেন নাই। দরবার-দিনে ঐশ্বর্যের দ্বারা প্রজাকে অভিভূত করায় পৌরুষ নাই— ক্ষমায়, দানে তাহাকে সুখী করায় রাজ-ঔদার্য প্রকাশ পায়। "সেইজন্য রাজা তাহার পক্ষে শুদ্ধমাত্র তামাশার রাজা নহে।..সে রাজাকে যথার্থ সত্যরূপে অনুভব করিতেই ইচ্ছা করে।" সেইজন্য কবি লিখিলেন, "রাজপুত্র আসুন, ভারতের রাজতক্তে বসুন, তাহা হইলে স্বভাবতই তাঁহার নিকট ভারতবর্ষই মুখ্য এবং ইংলণ্ড গৌণ হইয়া উঠিবে। তাহাতেই ভারতের মঙ্গল এবং ইংলণ্ডের স্থায়ী লাভ।" রবীন্দ্রনাথ রাজদরবারের এই মিথ্যা-ক্রীড়ার ঊর্ধ্বে উঠিবার জন্য দেশবাসীকে পথ-নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "দেবই হউন আর মানবই হউন, যেখানে কেবল প্রতাপের প্রকাশ, বলের বাহুল্য, সেখানে ভীত হওয়া নত হওয়ার মতো আত্মাবমাননা, অন্তর্যামী ঈশ্বরের অবমাননা, আর নাই।"

যুবরাজের আগমন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন, "রাজপুত্র আসিলেন। রাজ্যের যত পাত্রের পুত্র তাঁহাকে গণ্ডি দিয়া ঘিরিয়া বসিল— তাহার মধ্যে একটু ফাঁক পায় এমন সাধ্য কাহারও রহিল না। এই ফাঁক যতদূর সম্ভব সংকীর্ণ করিবার জন্য কোটালের পুত্র পাহারা দিতে লাগিল— সেজন্য সে শিরোপা পাইল।..রাজ্য ও রাজপুত্রের এই বহুদুর্লভ মিলন যত সুদূর, যত স্বল্প, যত নিরর্থক হওয়া সম্ভব তাহা হইল। সমস্ত দেশ পর্যটন করিয়া দেশকে যত কম জানা, দেশের সঙ্গে যত কম যোগস্থাপন হইতে পারে, তাহা বহু ব্যয়ে বহু নৈপুণ্য ও সমারোহ-সহকারে সমাধা হইল।" ভারতবর্ষের রাজভক্তিকে নাড়া দিবার জন্য রাজপুত্রকে সমস্তদেশের উপর ঘুরাইয়া লওয়া হইল; কিন্তু তাহা কোনো ফলই রাখিয়া গেল না। ভারতবাসীর রাজভক্তি প্রকৃতিগত। তাহা সত্যই ভক্তি, হৃদয়ের সম্বন্ধের উপর উহা প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ যে, ইংরেজের সহিত ভারতীয়দের সে-সম্বন্ধ কোনো দিন স্থাপিত হয় নাই; ইংরেজ প্রজাকে হৃদয় দান করেও নাই, প্রজার হৃদয় হরণ করিতেও চাহে নাই।

যুবরাজ আসিলেন ও চলিয়া গেলেন, তিনি জানিতেও পারিলেন না, বা তাঁহাকে জানিতে দেওয়া হইল না যে, বাংলাদেশের উপর তখন ক্ষুদ্রদের উপদ্রব ও অত্যাচার কিভাবে শুরু হইয়াছে। ইংরেজ রাজপুরুষের কৃতকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করাও ইংরেজ রাজার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহতুল্য! সুতরাং বাঙালির প্রতিবাদ করিবার কণ্ঠটুকু রোধ করিবার জন্য পূর্ববঙ্গ-আসামের ছোটলাট ফুলার সাহেব নানা প্রকারের আয়োজন করিতেছেন। প্যুনিটিভ পুলিস মোতায়ন করিয়া, বিশেষভাবে হিন্দুদের উপর কর স্থাপন তাহার অন্যতম। নিগৃহীতদের বা

লাঞ্ছিতদের প্রতি সম্মান[1] প্রদর্শনের জন্য কলিকাতার গ্রাণ্ড থিয়েটারে ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬ (২ ফাল্গুন ১৩১২) এক সভা হয়; নরেন্দ্রনাথ সেন সভাপতি; অনেকে বক্তৃতা করেন। রবীন্দ্রনাথ সেই দিন সভায় লিখিয়া পাঠান— "বাংলাদেশের বর্তমান স্বদেশী আন্দোলনে কুপিত রাজদণ্ড যাঁহাদিগকে পীড়িত করিয়াছে, তাঁহাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁহাদের বেদনা যখন আজ সমস্ত বাংলাদেশ হৃদয়ের মধ্যে বহন করিয়া লইল তখন এই বেদনা অমৃতে পরিণত হইয়া তাঁহাদিগকে অমর করিয়া তুলিয়াছে। রাজচক্রের যে অপমান তাঁহাদের অভিমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, মাতৃভূমির করুণ করস্পর্শে তাহা বরমাল্যরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের ললাটকে আজ ভূষিত করিয়াছে। যাঁহারা মহাব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন, বিধাতা জগৎসমক্ষে তাঁহাদের অগ্নিপরীক্ষা করাইয়া সেই ব্রতের মহত্ত্বকে উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ করেন। অদ্য কঠিন ব্রতনিষ্ঠ বঙ্গভূমির প্রতিনিধিস্বরূপ যেই কয়জন এই দুঃসহ অগ্নিপরীক্ষার জন্য বিধাতাকর্তৃক বিশেষরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন তাঁহাদের জীবন সার্থক। রাজরোষরক্ত-অগ্নিশিখা তাঁহাদের জীবনের ইতিহাসে লেশমাত্র কালিমাপাত না করিয়া বার বার সুবর্ণ অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে বন্দে মাতরম্।"[2] রবীন্দ্রনাথ দেশসেবাকে কিভাবে দেখিতেন এই লেখাটুকু তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

এই সময়ের রচিত একটি কবিতা 'পূজার লগ্ন' কবির কোনো কাব্যে সংকলিত হয় নাই। অধুনা প্রকাশিত 'গীত-বিতানে' ইহা পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে[3]—

এখন আর দেরি নয়, ধর্ গো তোরা হাতে হাতে ধর্ গো,
আজ আপন পথে ফিরতে হবে, সামনে মিলন স্বর্গ॥
... ...
আজ নিতেও হবে, দিতেও হবে, দেরি কেন করিস তবে
বাঁচতে যদি হয় বেঁচে নে, মরতে হয় তো মর্ গো॥

বরিশাল ও তৎপরে

পাঠকের স্মরণ আছে, কবি অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগে কলিকাতার রাজনীতির উত্তেজনার পথ ত্যাগ করিয়া শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন। অতঃপর চারি মাস কখনো শিলাইদহে, কখনো কলিকাতায় এবং মাঝে মাঝে বোলপুরে কাটে। বিদ্যালয়ের সংস্কার ছাড়া অন্য জরুরি কাজের তাগিদ কম; বঙ্গদর্শন ও ভাণ্ডারের জন্য কিছু কিছু গদ্য প্রবন্ধ ও তাহারই ফাঁকে ফাঁকে লেখেন খেয়ার কবিতা।

এই সময়ে কবি তাঁহার পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্রকে আমেরিকায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত। আজ আমেরিকায় কলেজ প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্যাদি ভারতীয় ছাত্রদের নিকট যত সহজলভ্য, ১৯০৬ সালে সেরূপ ছিল না। আমেরিকার অনেক কিছুই অজ্ঞাত এবং জানিবার মতো সুযোগও ছিল কম, সরকারী সহায়তাও ছিল দুর্লভ। সবই কবিকে নানাভাবে সংগ্রহ করিতে হয়। রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্র ১৯০৪ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করিয়া শান্তি-নিকেতনে পড়াশুনা করেন, সাধারণ কলেজে তাঁহারা যান নাই; আমেরিকায় পাঠাইবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাদিগকে

১ লাঞ্ছিতদের সম্মান (বরিশালকাণ্ডের বিবৃতি সমেত) বহুসংখ্যক স্বদেশী কার্যকারক, নিগৃহীত ও আহতব্যক্তির প্রতিকৃতি সম্বলিত। —শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত। কলিকাতা ১৩১৩।

২ ভাণ্ডার ১৩১২ ফাল্গুন পৃ. ৩৭৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, গ্রন্থপরিচয়।

৩ গীতবিতান, প্রথম খণ্ড, স্বদেশ। বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৭, পৃ. ৬৯। ভাণ্ডার ১৩১২ ফাল্গুন।

বিশেষ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। আলমোড়া হইতে কবি (২৪ মে ১৯০৩) লিখিতেছেন যে বিদ্যালয়ে তখন চারিজন শিক্ষক আছেন এবং আরও তিনজন আসিতেছেন—"এই কয়জন হইলে রথীকে শেখানো ও বিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহ চলিয়া যাইবে। রথীর ছয়মাসের পাঠ্য আমরা (কবি ও মোহিতচন্দ্র সেন) স্থির করিয়া পাঠাইয়াছি।"—স্মৃতি, পৃ. ৪৮। ইংরেজি সংস্কৃত বাংলা ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় রথীন্দ্রকে পড়িতে হয় কবির নির্দেশে। নবাগত অধ্যাপক বিধুশেখর শাস্ত্রীর তত্ত্বাবধানে রথীন্দ্রনাথ অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' বাংলায় অনুবাদ করেন (১৯০৬)।[১]

বঙ্গচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলনের উচ্ছ্বাসে সেদিন যেসব যুবক বিদেশে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শিল্প-বিদ্যা আয়ত্ত করা; অনেকে যান জাপানে। জাপান সম্বন্ধে তখন এদেশে খুবই মোহ; যুবকদের কেহ গেলেন বিস্কুট-করা শিখিতে, কেহ গেলেন সাবান-তৈয়ারি করা শিখিতে। রবীন্দ্রনাথ এতকাল দেশসেবার যে পরিকল্পনা করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাতে গ্রামের উন্নতি ছিল কল্পনার পুরোভাগে। যে দেশের শতকরা নব্বইজন লোক কৃষি-গোপালনাদি কর্মে লিপ্ত, সে দেশের প্রধানতম সমস্যা হইতেছে খাদ্য সমস্যা। সুতরাং বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে কৃষি ও গোপালনচর্চা ব্যতীত দেশের যথার্থ উন্নতি সম্ভব নহে। রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল গ্রামের মধ্যে বাস করিয়া বাংলাদেশের এই আভ্যন্তরিক সমস্যাটিকে স্পষ্ট করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহারই সমাধান মানসে নিজপুত্র ও বন্ধুপুত্রকে এবং অল্পকাল পরে কনিষ্ঠ জামাতাকে এই কৃষিসংক্রান্ত বিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য বিদেশ পাঠাইয়া দেন।[২]

রথীন্দ্রনাথদের আমেরিকা রওনা করিয়া দিবার কয়েক দিনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে পূর্ববঙ্গ যাত্রা করিতে হইল। ইস্টারের ছুটিতে নববর্ষের (১৩১৩) দিনে বরিশালে প্রাদেশিক সম্মিলনী, তাহারই সঙ্গে একটি সাহিত্য সম্মিলনীও বসিবে; রবীন্দ্রনাথ তাহার মনোনীত সভাপতি।

বঙ্গচ্ছেদের পর বাঙালি চিন্তাশীল হিন্দুমুসলমান নেতারা অতি স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারিলেন যে, রাজনৈতিক বিচ্ছেদই জাতির জীবনে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দুর্ঘটনা নহে; তদপেক্ষা মারাত্মক হইতেছে সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদ। অখণ্ড বঙ্গের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সাহিত্যসাধনায় নিখিল বঙ্গের একনিষ্ঠা। বঙ্গদেশের ভৌগোলিক খণ্ডতা যেমন রাজনৈতিক অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য প্রজাহিতৈষণার অজুহাতে ও তথাকথিত শাসনব্যবস্থার সৌকর্যার্থে সৃষ্ট হইল, তেমনি আর একদিন আরও কোনো গূঢ় কারণে ও কোনো গূঢ়তর রাজনৈতিক অভীষ্টলাভের জন্য এই ভেদ লোপ পাইতে পারে; কিন্তু তন্মধ্যেই উভয় প্রদেশের মধ্যে ভাষা সাহিত্য ও ভাবধারায় বিরোধের বীজ এমন সুকৌশলে উপ্ত হইতে পারে, যাহা পুনর্মিলনের পরেও বিষবৃক্ষরূপে অনন্তকাল স্থায়ী হইবে। ইহারই প্রতিরোধ কল্পে প্রাদেশিক সম্মেলনের সহিত এই সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন।

বরিশাল পূর্ববঙ্গ-আসাম অন্তর্গত বাখরগঞ্জ জিলার প্রধান শহর ফুলার[৩] সাহেব পূর্ববঙ্গের ছোটলাট, দোর্দণ্ড প্রতাপে তিনি তথায় 'রাজত্ব' করিতেছেন; সকল প্রকার অনাচার অত্যাচার অপমান চলিতেছে আইন ও শাসনের নামে। বরিশালের ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট এমার্সন সাহেব ফুলার সাহেবের উপযুক্ত প্রতিনিধি। এই গেল শাসক পক্ষের কথা। প্রতিপক্ষে ছিলেন বরিশালের নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত। ইঁহার ন্যায় কর্মীপুরুষ বাংলাদেশের

১ বিশ্বভারতী সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থমালা-২। ১৩৬১ জ্যৈষ্ঠ। বিধুশেখর ভট্টাচার্য তখন নূতন আসিয়াছেন, তাঁহার নিকট বুদ্ধচরিত পড়িয়াছিলেন। —*On the Edges of Time*. p. 63.

২ রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্র জাপানের পথে স্টীমার যোগে আমেরিকা রওনা হইলেন (১৯০৬ এপ্রিল ৩।১৩১২ চৈত্র ২০)। দ্র. *On the Edges of Time*—**Rathindranath Tagore. p 75.**

৩ **J. B. Fuller ICS. Chief Commissioner of Assam 30 July 1903; was Lt. Governor of E. Bengal and Assam from 16 October 1905 to 20 August 1906.**

রাজনীতিক্ষেত্রে ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। ইঁহার নেতৃত্বে বাখরগঞ্জের ন্যায় সুবৃহৎ জিলায় বিলাতি-বর্জন আন্দোলন এমন সফল হইয়াছিল যে, দূরতম গ্রামের মুদির দোকানে এক ছটাক বিলাতি লবণ পাওয়া দুর্লভ হইয়াছিল। এই বর্জননীতির সাফল্য দেখিয়া গবর্নমেন্ট 'মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার হইতেছে', এই বুলি তুলিয়া প্যুনিটিভ পুলিস নানাস্থানে মোতায়ন করিয়াছিলেন। এই গুর্খা সৈন্যদের ব্যয় বহন ও অত্যাচার সহ্য কেবলমাত্র হিন্দুদেরই করিতে হয়। ফুলার সাহেবের এই ব্যবহারের প্রত্যুত্তরেই যেন বরিশালবাসী গুর্খাঅধ্যুষিত বরিশাল শহরে প্রাদেশিক সম্মিলনী আহ্বান করিল। ইহারই সঙ্গে সাহিত্য সম্মিলনী আহূত হইল। রাজনৈতিক সম্মিলনীর ব্যবস্থা করিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত ও সাহিত্য সম্মিলনীর ব্যবস্থা করিলেন লাকুটিয়ার যুবক-জমিদার সাহিত্যিক দেবকুমার রায়চৌধুরী[১]। বরিশালের প্রাদেশিক সম্মিলনীর মনোনীত সভাপতি ছিলেন ব্যারিস্টার আবদুল রসুল (১৮৭২—১৯১৭), সাহিত্য সম্মিলনীর মনোনীত সভাপতি রবীন্দ্রনাথ। সেই সাহিত্য সম্মেলন আহ্বান করার কল্পনা রবীন্দ্রনাথের। 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' শীর্ষক প্রবন্ধে (৯ ভাদ্র ১৩১২) তিনি বলিয়াছিলেন, "আমরা.. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌কে বাংলার ঐক্যসাধনযজ্ঞে বিশেষভাবে আহ্বান করিতেছি।.. এই পরিষদকে জেলায় জেলায় আপনার শাখাসভা স্থাপন করিতে হইবে, এবং পর্যায় ক্রমে এক-একটি জেলায় গিয়া পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন করিতে হইবে। আমাদের চিন্তার ঐক্য, ভাবের ঐক্য, ভাষার ঐক্য, সাহিত্যের ঐক্য সম্বন্ধে সমস্ত দেশকে সচেতন করিবার এই ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আপন স্বাধীন কর্তব্য পালন করিবার ভার সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রহণ করিয়াছেন। এখন সময় উপস্থিত হইয়াছে— এখন সমস্ত দেশকে নিজের আনুকূল্যে আহ্বান করিবার জন্য তাঁহাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে।" এই আদর্শকে কর্মে রূপ দিবার প্রথম চেষ্টা হইল বরিশালে।

বরিশাল যাইবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ কুমিল্লা ও আগরতলায় কয়েকদিন কাটাইয়া গেলেন। ২৫ চৈত্র (১৩১২) আগরতলা হইতে লিখিতেছেন, "ঘুরিয়া মরিতেছি। সম্প্রতি আগরতলায় আটকা পড়ে গেছি। বরিশালে যাইতে হইবে। তাহার পর চাটগাঁয়ে যাইবার কথা, কিন্তু আমার মন বিদ্রোহী হইতেছে। বোলপুরে গিয়া একেবারে নিশ্চেষ্টতার মধ্যে ডুব মারিয়া বসিতে ইচ্ছা করিতেছে। শনি আমাকে ঘুরাইতেছে— রবি তাহার সঙ্গে পারিয়া উঠিল না।" —স্মৃতি, পৃ ৫১।

রবীন্দ্রনাথ যথাসময়ে নৌকাযোগে বরিশাল পৌঁছাইলেন ও নৌকায় রহিয়া গেলেন। এদিকে বরিশাল শহরে পুলিসের তাণ্ডবলীলা শুরু হইল। প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন কিভাবে পণ্ড হইয়া গেল তাহা জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস পাঠকের নিকট অবিদিত নহে। দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথকে ম্যাজিস্ট্রেট এমার্সন অকথ্য অপমান করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, জরিমানা করিয়া সরকারী কাগজপত্রে তাঁহার রাজনৈতিক অপরাধকে লিপিবদ্ধ করিলেন। অ্যান্টিসার্কুলার সোসাইটির স্বেচ্ছাব্রতীগণ পুলিসের রেগুলেশন লাঠির দ্বারা নির্মমভাবে প্রহৃত হইল; ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে সম্মেলন সভা নিষিদ্ধ হইল। নববর্ষের দিনে ইংরেজের আদেশে দেশসেবকদের প্রথম অর্ঘ্য মিলিল স্বদেশীয়দেরই হাতে।

যজ্ঞভঙ্গের পর বরিশালের নেতারা রবীন্দ্রনাথের নিকট কর্তব্য নির্ণয়ার্থ উপস্থিত হইলেন; দীর্ঘকালব্যাপী পরামর্শের পর স্থির হইল যে, বর্তমান অশান্তির অবস্থায় ও এমার্সন সাহেবের অপমানকর শর্তে সাহিত্যসম্মেলনের অধিবেশন হওয়া উচিত নহে। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ বোলপুর ফিরিলেন।

১ দেবকুমার রায়চৌধুরীর পিতা রাখালচন্দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের একজন গুণগ্রাহী ভক্ত ছিলেন। ইঁহার দুই কন্যার সহিত দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ও অরুণেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। সেই সূত্রে দেবকুমার দিনেন্দ্রনাথের মাতুল। দেবকুমার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের এক জীবনচরিত লেখেন, রবীন্দ্রনাথ তাহার ভূমিকা লিখিয়া দেন।

রবীন্দ্রনাথের সভাপতির-পদ গ্রহণের সম্মতি দানের পর হইতে এবং বরিশাল হইতে সভা না-করিয়া ফিরিয়া আসা পর্যন্ত কবির সকল অবস্থার সকল কর্মই একদল সাংবাদিকের আক্রমণের ও সমালোচনার বিষয় হইয়াছিল। 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিক এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক হিংস্রভাবে রবীন্দ্রনাথ ও আয়োজনকারী দেবকুমারকে আক্রমণ করেন। অন্যান্য লেখকদের কথা না ধরিতে পারা যায়, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিরোধিতার মধ্যে যে যৌক্তিকতা ছিল তাহা বোধ হয় একদল সাহিত্যিকদেরই মত। দেবকুমারকে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছিলেন, "রবিবাবুকে সাহিত্যিক সম্মিলনের সভাপতি করায় 'বঙ্গবাসী' অত নারাজ হইয়া চটিয়া উঠিলেন কেন, জানি না। আমি যদিও রবিবাবুর ঐ লালসা-মূলক রচনাবলীর নিতান্ত বিরোধী তবু এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠেই মানি যে, বর্তমান সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি সর্বাপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি এবং তাঁর প্রতিভার সঙ্গে এখন আর কাহারও তুলনাই হইতে পারে না। অবশ্য সে বিষয়েও যে ঘোর মতভেদ আছে তা বলাই বাহুল্য। . . কিন্তু, তবু এই সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতি সম্বন্ধেই যদি আমার মত জিজ্ঞাসা করিয়া থাক তা হইলে বলি— শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চন্দ্রনাথ বসু অথবা নবীনচন্দ্র সেনকে রবিবাবুর আগে সভাপতি করা উচিত। তিনি যত বড় সাহিত্যিকই হউন-না, ইঁহাদের অপেক্ষা তাঁহার বয়স অল্প। সুতরাং ইঁহাদের দাবীকে অগ্রগণ্য না করায় আমার মতে অবিবেচনা ও অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।"[১]

ঔচিত্যের দিক হইতে হয়তো দ্বিজেন্দ্রলালের কথাই ঠিক : কিন্তু যোগ্যতার দিক হইতে তুলনার প্রশ্ন উঠিতে পারে না। বাংলার এই সংকট-মুহূর্তে সাহিত্যসম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ হইতে যোগ্যতর সভাপতি ছিলেন বলিয়া দেশবাসী বিবেচনা করে নাই।

এদিকে বরিশাল হইতে ফিরিবার পর রাজনীতিক নেতাদের কর্মপদ্ধতি লইয়া মতভেদ দেখা দিল; তাঁহারা যে কেবল ইংরেজ সরকারের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া ফিরিয়াছিলেন, তাহা নহে; তাঁহারা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া ফিরিলেন ও দলীয় সংবাদপত্র মারফত পরস্পরের প্রতি বিষোদ্‌গার করিতে লাগিলেন। এমন দুঃখের দিনেও তাঁহারা সংঘবদ্ধ হইতে পারিলেন না। মতান্তর অচিরে মনান্তরে পরিণত হইল এবং অনতিকাল মধ্যে বাংলার রাজনীতিতে দুইটি পৃথক দল গড়িয়া উঠিল; সাময়িক সাহিত্যে তাঁহারা নরমপন্থী ও চরমপন্থী (moderate ও extremist) নামে পরিচিত। সুরেন্দ্রনাথ তথাকথিত নরমপন্থীদের ও বিপিনচন্দ্র তথাকথিত চরমপন্থীদের নেতা। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কোনো দলভুক্ত না হইলেও শেষোক্ত দলের প্রতি তাঁহার অনুরাগ তিনি কখনো গোপন করিতে পারেন নাই, আবার নরমপন্থীদের সংসর্গ সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতেও তিনি অপারগ। কারণ অভিজাতদের অধিকাংশই এই দলভুক্ত।

বরিশাল হইতে ফিরিয়া কবি শান্তিনিকেতনে আসিয়াছেন, 'খেয়া'র কয়েকটি কবিতা এই সময়ে লেখেন (৭-২৭ বৈশাখ ১৩১৩)। আগরতলা হইতে এক পত্রে যে লিখিয়াছিলেন, 'বোলপুরে গিয়া একেবারে নিশ্চেষ্টতার মধ্যে ডুব মারিয়া বসিতে ইচ্ছা করিতেছে,' বোধ হয় এই নিশ্চেষ্টতার মধ্যে ডুবিবার শুভ সংকল্প হইতে এই বৎসর (বৈশাখ ১৩১৩) 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদকপদ ত্যাগ করিলেন। কিন্তু কর্মবিরতি ইচ্ছার অন্তরায় তাঁহারই অন্তরে, তাহার কারণ আমরা পূর্বে বিশ্লেষণ করিয়াছি। 'বঙ্গদর্শন' তিনি ছাড়িলেন বটে, কিন্তু পত্রিকার পরিচালকগণ তাঁহাকে ছাড়িলেন না; সম্পাদক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার লিখিলেন, "রবীন্দ্রবাবু সম্পাদক না থাকিলেও বঙ্গদর্শনের মূল ভরসা তিনিই। তাঁহারই নির্দিষ্ট পথে, প্রধানত তাঁহারই সহায়তায়, বঙ্গদর্শন পরিচালিত হইবে।" রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে তিনি দূরে আছেন, 'নিশ্চেষ্টতার মধ্যে ডুবিবার' ইচ্ছা অন্তরে সুপ্ত; কিন্তু দেশের বৃহত্তর প্রয়োজনের

১ দ্র. দেবকুমার রায়চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনী, পৃ ৫১১-৫১২।

আহ্বানে সাড়া না দিয়াও পারেন না; জীবনের অন্তিমসন্ধ্যা পর্যন্ত দেশের বা দশের আহ্বানকে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি 'নিশ্চেষ্টতা'র মধ্যে কখনো নিমগ্ন থাকিতে পারেন নাই।

বরিশালের ব্যাপারে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই ভাবাইয়া তুলিল। নেতাদের মধ্যে মতভেদ ক্রমেই মতবাদের ভেদ (ideological difference) হইয়া উঠিল। এই সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে নিশ্চেষ্টতার মধ্যে থাকিতে পারিলেন না; তিনি রাজনীতির নূতন পরিস্থিতির সম্যক বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়া 'দেশনায়ক' নামে প্রবন্ধ লিখিলেন। কলিকাতায় গিয়া পশুপতি বসুর সৌধপ্রাঙ্গণে আহূত মহতী সভায় উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন (১৫ বৈশাখ)।[১] দেশের মধ্যে যেসকল আলোচনার ও আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের মতে, তাহার মধ্যে অনেকখানি কলহমাত্র। "কলহ অক্ষমের উত্তেজনা প্রকাশ, তাহা অকর্মণ্যের একপ্রকার আত্মবিনোদন।" 'বয়কট' কথাটা নেতিবাচক— উহার মধ্যে দুর্বলের প্রয়াস নাই, আছে দুর্বলের কলহ। বাঙালি যে নিজের মঙ্গলসাধনের উপলক্ষ্যে নিজের ভালো করিল না, পরের মন্দ হইবে এই ভরসায় সে বয়কট করিতেছে— এই ভাবটাই রবীন্দ্রনাথের আপত্তি।

আর-একটি জিনিস তিনি স্পষ্টভাবে দেখাইলেন, বয়কটের মধ্যে যে স্পর্ধা প্রকাশ পাইতেছে, সেটা কি আমাদের শক্তিজাত, না, ইংরেজের শাসনতন্ত্রের ক্ষমাগুণে! "আমাদের স্পর্ধা যদি যথার্থ আমাদেরই শক্তি হইতে উদ্ভূত হইত, তবে অপর পক্ষের স্বাভাবিক রোষ এবং শাসনের কাঠিন্য আমরা স্বীকার করিয়া লইতাম, তবে উদ্যতমুষ্টি দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ আমরা মিণ্টো-মর্লির দোহাই পাড়িতে ও আদালতে আবদার কাড়িতে ছুটিতাম না।"[২] এই কথা রবীন্দ্রনাথ বহুবার বলিয়াছেন। ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া, ইংরেজের আদালতে শাস্তি পাইয়া, প্রতিকারের জন্য তাহারই কাছে ছুটিয়া যাওয়ার মনোবৃত্তি নিন্দনীয়, ইহা অসহযোগ নহে। নেতৃত্ব লইয়াও দেশের মধ্যে যে মতভেদ দেখা দিয়াছে, সে-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিলেন। তিনি বলিলেন, "ঝগড়া করিতে গেলে হট্টগোল করা সাজে, কিন্তু যুদ্ধ করিতে গেলে সেনাপতি চাই।" সুতরাং কোনো একজনকে আমাদের 'দেশনায়ক' বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সুরেন্দ্রনাথ তখন দেশের একছত্র নেতা; রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "সুরেন্দ্রনাথকে সকলে মিলিয়া প্রকাশ্যভাবে দেশনায়করূপে বরণ করিয়া লইবার জন্য আমি সমস্ত বঙ্গবাসীকে আহ্বান করিতেছি।" সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কবির ধারণা কী মহৎ ও উচ্চ তাহা এই বক্তৃতায় প্রতি ছত্রে প্রকাশ পায়। আর-একবার দেশবাসীকে বলিয়াছিলেন সুভাষচন্দ্রকে দেশনায়করূপে বরণ করিয়া লইবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ যে প্রস্তাব করিলেন, তাহা একচ্ছত্র শাসন বা ডিক্টেটরশীপের সমর্থন; অবশ্য সে যুগে ডিক্টেটর বলিতে যে কী বুঝায় তাহা কেহ জানিত না; তৎসত্ত্বেও উহা ডিমক্রেসির বিরুদ্ধে বলিয়া লোকে আপত্তি করে অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে কলহ করার স্বাধীনতার নামই ডিমক্রেসি।

কলিকাতার রাজনৈতিক উত্তেজনা যে দেশকে কোনো মঙ্গলক্ষেত্রে উপনীত করিতে পারিতেছে না, এ বেদনা রবীন্দ্রনাথকে নিত্য পীড়িত করিতেছে। নেতারা আদর্শ ও পন্থা লইয়া বিবাদে মত্ত, দেশ যে কোন্ দিকে চলিতেছে এবং কোথায় স্পর্শ করিলে জনশক্তি সংহত ও জাগ্রত হয়, সেদিকে নেতাদের দৃষ্টি ক্ষীণ। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার ছাত্রসমাজের (ডন্ সোসাইটি) সম্মুখে এই সময়ে 'স্বদেশী আন্দোলন' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে তিনি দেশের কাজ বলিতে কী বুঝায় তাহার পরিকল্পনা উপস্থিত করেন। কবি বলিলেন, "আমার মনে হয় যে, এইরূপ মত্ত অবস্থায় বেশি কিছু পাইবার আশা করা যাইতে পারে না।...আমিও এই উত্তেজনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে

১ দেশনায়ক, বঙ্গদর্শন ১৩১৩ জ্যৈষ্ঠ। সমূহ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০। গ্রন্থমধ্যে প্রবন্ধটি সংস্কার করিয়া মুদ্রিত হয়। দ্র. মূল অংশ গ্রন্থপরিচয়ে, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ৬৫২-৬৬১।

২ বঙ্গদর্শন ১৩১৩ জ্যৈষ্ঠ পৃ ৫২। গ্রন্থপরিচয় রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ৬৬০।

পারি নাই, এবং তা অস্বীকার করিবার কোনো কারণ দেখি না।"[১] এই সভায় দ্বিতীয় বক্তৃতায় বলিলেন, "এখন আমাদের ছোটো ছোটো জায়গায় organisation তৈরি করা উচিত। কিছুদিন হইতে আমি 'পল্লীসমিতি' স্থাপনের চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু সেটা সফল হয় নাই।...আমাদিগকে এখন পল্লীর patriotism জাগাইয়া তুলিতে হইবে। আমরা যদি প্রতি পল্লীর সকল অভাব মোচনের ভার নিজেরা গ্রহণ করি, তাহা হইলে পল্লীকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতে পারি।...আত্মশক্তি চালনা করিয়া কর্তৃত্বের প্রকৃত অধিকারী হওয়ার জন্য এইরূপ 'পল্লীসমিতি'তে আমাদের এখন হাতেখড়ি করিতে হইবে।"

তিনি লিখিতেছেন, "শিলাইদহ প্রভৃতি নানাস্থানে ঘুরিতে হইয়াছে— তাহার পরে বৈষয়িক এবং বেগার নানা কাজে আমাকে হাঁফ ছাড়িবার সময় দিতেছে না।" এই কর্মপ্রবাহে মাঝে মাঝে 'খেয়া'র কবিতা লিখিতেছেন। কর্মপ্রবাহ যেন জলস্রোতের ন্যায় তটকে স্পর্শ করিয়া যায়, কিন্তু তাহাকে চালাইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই শান্তম্ এক জায়গায় এমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত যে, বাহিরের বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গ তাঁহাকে স্পর্শ করিলেও বিচলিত করিতে পারে না। বিচিত্র কর্মপ্রেরণা ও উত্তেজনার মধ্যে 'খেয়া'র নেয়ে কবিকে ঠিক লইয়া যাইতেছেন।

খেয়া

১৩১৩ সালের আষাঢ় মাসে (১৯০৬ জুলাই) রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' কাব্যখণ্ড প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি তাঁহার বন্ধু জগদীশচন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করা। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে 'কথা' কাব্য (১৩০৬) উৎসর্গ করিয়াছিলেন। 'খেয়া'র উৎসর্গপত্রে কবি তাঁহার এই কবিতাগুচ্ছ সম্বন্ধে বলিলেন, 'এ যে আমার লজ্জাবতী লতা'; জগদীশচন্দ্র এই সময়ে লজ্জাবতী লতা (mimosa) লইয়া উহার স্পর্শচেতনার পরীক্ষায় রত। লজ্জাবতীর স্বাভাবিক স্পর্শকাতর নীরবতার সহিত কবি তাঁহার নিজ জীবনের আধ্যাত্মিক অবচেতনার তুলনা করিয়া বলিলেন, 'আনো তোমার তড়িৎ-পরশ, হরষ দিয়ে দাও।'

খেয়ার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এক বৎসরের কবিতা আছে— ১৩১২ সালের আষাঢ় হইতে ১৩১৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত, বারো মাসের পর্ব ৫৫টি কবিতার সমষ্টিমাত্র। কিন্তু আরও সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, কবিতাগুলিকে কয়েকটি সময়-স্তবকে ভাগ করিয়া লওয়া যায়। বৎসরের গোড়ার দিকেই 'শেষ খেয়া' (বঙ্গদর্শন ১৩১২ আষাঢ়) রচিত। তার পর শ্রাবণ (১৩১২) মাস হইতেই স্তবকে স্তবকে যে কবিতারাজি উৎসারিত হইতে লাগিল, তাহার মধ্যে অনুভূতির নূতন সুর ও আত্মপ্রকাশের নূতন রূপ দেখা দিল।

খেয়ার পর্বটি বাংলাদেশের প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্যোগপর্ব। সে বৎসরটির ঘটনাক্রম আমরা পূর্ব-পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি। সেই উত্তেজনা ও বিক্ষিপ্ততার আবর্তে কবি ক্ষণে ক্ষণে গিয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু নিমজ্জিত হইবার পূর্বেই আপনাকে উহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়াছিলেন ও বাহিরে আসিয়া কোলাহলময় জনকল্লোলকে নৈর্ব্যক্তিক রিক্ততায় অবলোকন করিয়াছেন।

বাহিরে ব্যবহারিক জগতে সাময়িকভাবে রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিচর্চায় ও বঙ্গচ্ছেদ-আন্দোলনে মত্ত, স্বদেশী সংগীত রচনায় ব্যাপৃত, স্বদেশের মানস-মাতৃমূর্তি গড়িয়া অর্ঘ্যনিবেদনে তন্ময়। কিন্তু বাহিরের ঘটনাভিঘাতে মন যতখানি চঞ্চল, ততখানিই উহা গভীরতর আনন্দের জন্য আগ্রহান্বিত। স্বাদেশিকতার স্পষ্ট বস্তুতন্ত্রতায় মন অত্যন্ত উদ্‌ভ্রান্ত বলিয়াই তাহার প্রতিক্রিয়ায় সৌন্দর্য ও সুভাব মন্থনীভূত অমৃতের ন্যায় অবচেতন চিত্তের মধ্য ক্ষরিত হইল। তাহাই 'খেয়া'র কবিতাগুচ্ছ।

১ ভাণ্ডার, ২য় বর্ষ, ১৩১৩ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ১১৪।

এই কাব্যখণ্ডে রবীন্দ্রনাথের অন্তর-জীবনের যে ভাবময় প্রকাশ হইয়াছে, তাহার সহিত তাঁহার পুরাতন গানের ও কবিতার বিশেষ পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। আধ্যাত্মিক কবিতা ও গানের ইহা এক নবতর প্রকাশভঙ্গি। নৈবেদ্য ও তৎপূর্বে-রচিত কবিতার সুরের মধ্যে পার্থক্য যেমন স্পষ্ট, নৈবেদ্যের চারি বৎসর পরে রচিত খেয়ার সহিত তৎপূর্বেকার সকল শ্রেণীর কবিতার সুর ও রূপের পার্থক্য ততখানি বলিলে কাব্যখানিকে লঘু করা হয়। ইহাদের পার্থক্য আসমান-জমিনের দূরত্ব। খেয়ার চারি-পাঁচ বৎসর পরে গীতাঞ্জলির আবির্ভাব; সুতরাং নৈবেদ্য ও গীতাঞ্জলির মাঝে পড়িতেছে 'খেয়া'। নৈবেদ্য ও নৈবেদ্যের পূর্বে রচিত ধর্মসংগীত যদিও খুব জনপ্রিয়, তথাপি গীতাঞ্জলির গানের সহিত তাহাদের তুলনা হয় না, কারণ ইহাদের পার্থক্য যথাযথভাবে গুণগত ও রূপগত।

ক্ষণিকার মধ্যে কবি সুন্দরকে যে ভাবে যে ভাষায় ও যে ছন্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বাংলা কাব্যসাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। ক্ষণিকার প্রকাশভঙ্গিতে ছিল আপাতলঘুতা, ছন্দে ছিল চটুলতা। নৈবেদ্যের কবিতা প্রধানতই সনেট, তাহার ভাষা কঠিন, ভাব গম্ভীর ও রীতি সংহত। খেয়ার মধ্যে আমরা পাই একাধারে ভাষার সরলতা, ছন্দের সাবলীলতা ও ভাবের রাহস্যিকতা। গীতাঞ্জলির গানে ও কবিতায় স্পষ্টভাবেই ঈশ্বর প্রিয়তম রূপে আহূত হইয়াছেন। ঈশ্বর হইতে আমরা যে বি-ভক্ত এই বিরহের বেদনাই গীতাঞ্জলির প্রধানতম সুর। গীতাঞ্জলির রূপকের মাঝে অজানার রহস্য বা হেঁয়ালি নাই— পাঠক শ্রোতা ও ভক্তদের নিকট উহা সহজবোধ্য। কিন্তু 'খেয়া' গীতাঞ্জলির ন্যায় কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক গীতকাব্য নহে। খেয়ায় কবির অন্তরতম অনুভূতি রূপকে চিত্রে ছন্দে অকল্পিত সৌন্দর্যে বিশুদ্ধ কবিতা রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতার অন্তরালে, গভীর আধ্যাত্মিক জীবন-বস্তুর যে অদৃশ্য প্রবাহ নিত্য চলিয়াছে, তাহারই কাব্যময় প্রকাশ হইতেছে এই কবিতাগুলি। প্রচ্ছন্ন আধ্যাত্মিক আকুতি রূপকের অন্তরালে অতুলনীয় লিরিসিজমের মধ্যে রূপ লইয়াছে। বিশুদ্ধ কাব্যের দিক হইতে সেইজন্য ইহাকে ইতিপূর্বেকার সকলশ্রেণীর লিরিক হইতে শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে ইচ্ছা করে। তা ছাড়া যে কবিতা আপন ভাষা-মাধুর্যে ও ছন্দবৈভবে আপনি পরিপূর্ণ, যে কবিতা ভাবপ্রকাশের জন্য সুরের প্রতীক্ষা করে না, যাহা গীতধর্মী নহে কেবলমাত্র ছন্দধর্মী— তাহাকে কাব্যহিসাবে উচ্চস্থান দিতেই হইবে। খেয়ার অনেকগুলি কবিতার মধ্যে একটি ভাব বেশ স্পষ্ট। সেটি হইতেছে, আমার যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ তাহা আমি ব্রহ্মকে সমর্পণ করিলাম। এই সমর্পণের পর মনে কোনো খেদ নাই, অভিমান নাই। 'সোনার তরী'র মধ্যেও এই কথাটি আছে, অন্যভাবে। সেখানে মহাকাল আমার সর্বস্ব লইয়া যায় বটে, কিন্তু আমাকে ফেলিয়া যায় বিস্মৃতি ও অবহেলার মধ্যে। সেখানে সোনার তরীর নেয়ে আমার সোনার ধান লইয়া যায় খেয়াপারে, কিন্তু আমাকে লয় না। আর 'খেয়া'র নেয়ে মানুষকে অসহায়ভাবে ফেলিয়া যায় না। কবির দিক হইতেও ব্যর্থতার জন্য ক্ষোভ নাই; তিনি বলেন 'আমার নাইবা হল পারে যাওয়া'। কারণ কবির কাছে পার-অপার দুই-ই রূপ-অরূপের ন্যায় সত্য, অচ্ছেদ্যবন্ধনে তাহাদের মিলন সম্পূর্ণ। পারাপার পরিপূর্ণ, অখণ্ড ও অশেষ।

খেয়ার কবিতাগুলিকে আমরা মোটামুটিভাবে দুইটি বর্গে ভাগ করিতে পারি। ১৩১২ সালের শ্রাবণ মাসের এক কিস্তি ও চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের (১৩১৩) দ্বিতীয় কিস্তি। ইহার মাঝে আছে স্বদেশী সংগীত রচনার অবসানে পদ্মাতীরে রচিত কয়েকটি কবিতা ও গান। স্বদেশীযুগের উত্তেজনার পর প্রথম দিককার কবিতাগুলি রচিত হয় ১৩ই হইতে ২৯শে শ্রাবণের মধ্যে। অধিকাংশ বোলপুরে লেখা, দুইটি কলিকাতায়। প্রায় এক মাস পরে গিরিডিতে লেখেন তিনটি। এই শেষোক্ত পর্বটা হইতেছে স্বদেশী সংগীতের সমকালীন 'বাউল' গান[১]।

খেয়া পর্বের প্রথম তিন দিনে পাঁচটি কবিতা শুভক্ষণ, ত্যাগ, প্রভাতে, বালিকা বধূ ও খেয়া (১৩ই-১৫ই শ্রাবণ

১ ভাণ্ডার ১৩১২ ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক।

১৩১২) লিখিত। আধ্যাত্মিক দিক হইতে কবিতাসমূহের যে অর্থ করা যায় তাহা ছাড়াও অন্য অর্থ গ্রহণ করিতে বাধা নাই। মহৎ কর্মের আহ্বান যখন আসে, সেই শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয় আমাদের মন; কর্মের মধ্যে আমরা আত্মত্যাগ করি, কিন্তু কেহ কি জানিতে চায় কী ত্যাগ আমি করিলাম। যে কর্মকে যথার্থভাবে দেখিতে পায়, সে ফলের আকাঙ্ক্ষা করে না, সে জানে মহৎ আহ্বানের সম্মুখে 'বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া'—ত্যাগ, ১৩ই—কী মতে সে রহিবে।

কে জানিত দেশের মধ্যে যে ভাববন্যা আসিয়াছে তাহা এমনভাবে অকস্মাৎ সকলের হৃদয়কে ভরিয়া তুলিবে? "এক রজনীর বরষণে শুধু কেমন করে আমার ঘরের সরোবর আজি উঠেছে ভরে।" —প্রভাতে, ১৪ই। অকস্মাৎ চিত্তশতদল ফুটিয়া উঠিল কেমন করিয়া, এই প্রশ্নই মনে উদয় হয়। শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় এত ক্রন্দন, এত জাগরণ! আজ দুঃখ-যামিনীর বুকচেরা ধনকে পাওয়া গেল। দেশের নবজাগরণ হইতে ইহাকে ব্যাখ্যা করা যায়।

আমাদের ক্ষুদ্র সত্তা বা জীবাত্মা মূঢ় বালিকা বধূর ন্যায়— পরম বরেণ্য পুরুষং মহান্তং বা পরমাত্মার যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে অক্ষম। ব্রহ্মই যে তাহার একমাত্র গতি, এ কথা সে ভাবিতেও ভয় পায়; কিন্তু দুঃখের দিনে সে তাঁহারই শরণ লয়। তিনি অপেক্ষা করিয়া থাকেন এবং পরানবধূকে নিজগৃহে অভ্যর্থনার সকল আয়োজনই করিয়া রাখেন —বালিকা বধূ, ১৫ই। এই কবিতাটির মধ্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধটি অত্যন্ত সহজভাবে বিবৃত হইয়াছে। তিনি জীবনকে স্বাধীনতা দিয়াছেন বলিয়া প্রতীক্ষা করেন— সে তাঁহার মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিবেই তিনি জানেন। যে দেবতা আমাদিগকে তাঁহার অন্তঃপুরের মধ্যে আহ্বান করেন, তিনিই আবার আমাদিগকে খেয়ার নেয়ে হইয়া পরপারে লইয়া যান। তাঁহার সহিত দৃষ্টি বিনিময় হইলেই মনে হয়, আমাকেও যাইতে হইবে, অর্থাৎ তাঁহার করুণা না হইলে আমার অন্তর জাগে না, তাঁহার দিকে যাইবার শক্তিও পাই না—খেয়া, ১৫ই শ্রাবণ।

আইডিয়া বা আদর্শের আহ্বানে মানুষ যখন অতি সন্তর্পণে অন্তরের আলোটুকুকে বাঁচাইয়া ধীরে ধীরে চলে, পৃথিবী তাহাকে আহ্বান করে বারে বারে সংসারের নিত্য কাজের মাঝে। কিন্তু সে চলে তাহার লক্ষ্য অভিমুখে; যেখানে অসংখ্য ক্ষুদ্র দীপ দীপালির উৎসব-প্রাঙ্গণকে আলোকিত করিতেছে, সেও সেখানে উপস্থিত হয় অন্তরের ক্ষুদ্র দীপালোকটুকু লইয়া। সমষ্টিগত শক্তি বা সৌন্দর্যের মধ্যে সে অন্যতমভাবে থাকিতে চায়; নিজের বৈশিষ্ট্যকে সে পৃথক করিয়া সকলের পুরোভাগে স্থাপন করিতে চায় না। সমষ্টি ব্যতীত শক্তির গৌরব কোথায়? তাই সে অপ্রয়োজনের প্রয়োজনে নিজেকে উৎসর্গ করে, কেহ তাহাকে পৃথকভাবে বা পৃথক করিয়া দেখে না বলিয়া তাহার অভিমান বা দুঃখ নাই। সে প্রয়োজনের তাগিদ পূরণ করিতে চাহে নাই, সে অনাবশ্যক থাকিতে চাহে।—অনাবশ্যক, ২৫ শ্রাবণ ১৩১২।

কিন্তু এমনও লোক আছে যাহারা জগৎকে দেখে 'আধেক-খোলা বাতায়ন' হইতে। দূর হইতেই সংসারকে দেখিতে চায় আড়াল আবডাল হইতে, জগতের বাস্তবতার সহিত মুখোমুখি হইতে ভয় পায়। তাহারা কিছুতেই আপনার অহংগণ্ডিকে লঙ্ঘন করিতে পারে না। তবে রুদ্র যদি অশান্তির বেশে প্রলয় সৃষ্টি করেন, তখন তো তাহাদের সকল আলস্য, সকল লজ্জা ভুলিয়া গৃহত্যাগ করিতে হয় গৃহের কোণে থাকা চলে না, জগৎসমক্ষে আসিতে হয়।—অনাহত, ২৬ শ্রাবণ ১৩১২।

আইডিয়া বা ভাবের বন্যা যখন আসে তখন অশান্তির মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াই সে আসে। আইডিয়াই মানুষকে পাগল করিয়া দেয়। তাই সে আইডিয়ার আক্রমণভয়ে মনের উপর মূঢ়তার অন্ধকার চাপাইয়া শান্তিতে থাকিতে চায়; সে মনে করে মূঢ়তার প্রাচীর ভেদ করিয়া ভাবগঙ্গার জোয়ার বহিতে পারিবে না। কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া অন্তরের দুয়ারে আঘাত পড়ে, মেঘগর্জনের মত ক্ষণে ক্ষণে তাহার আগমনবার্তা নিশীথরাতে স্বপ্নের মধ্যে

শোনা যায়; তবুও কেহ বিশ্বাস করিতে চায় না যে, আইডিয়া বা ভাববন্যা আসিয়াছে, পাছে আমাদের আরামে ব্যাঘাত ঘটে'। কিন্তু সত্যকে কেহ বাধা দিতে পারে না, অন্ধকারের দ্বার ভাঙে, আইডিয়ারই জয় হয়। —আগমন, ২৮ শ্রাবণ ১৩১২। দেশের মধ্যে আন্দোলন আসিয়াছে, এ-যেন তাহারই কথা কবির মনে রূপকের রূপে ভরিয়া উঠিল।

'দান' (২৬ ভাদ্র ১৩১২) কবিতাটি গিরিডিতে লেখা; তখন দেশব্যাপী বর্জন-আন্দোলন চলিতেছে। লোকে দেশের জন্য সামান্য আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল মাত্র বয়কট; কিন্তু বিধাতা তাহার হস্তে সংগ্রামের অস্ত্র দিলেন—'এ তো মালা নয় গো, এ যে তোমার তরবারি' সেই হইতে তাহার অন্তরে বাহিরে শক্তির অভ্যুদয়। তখন সে বলে···

আজকে হতে জগৎমাঝে ছাড়ব আমি ভয়

··· ···

তোমার তরবারি আমার করবে বাঁধন ক্ষয়।

রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটির ভাবব্যাখ্যা করিয়াছেন 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে, আমরা ইহাকে অন্য আলোকে দেখিয়াছি, কারণ এই সময়ে স্বদেশী সংগীতগুলি রচিত হইতেছে। তাহাদের ভাবের সহিত ইহার ভাবের মিল আছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তবে অন্যভাবে ব্যাখ্যারও কোনো বাধা নাই।

ভাদ্র মাস হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত খেয়ার কবিতা নাই; এ পর্বটি হইতেছে স্বদেশী আন্দোলন বা বঙ্গভঙ্গের যুগ। সকলেই উত্তেজনায় মত্ত ও কল্পনায় মগ্ন। রবীন্দ্রনাথও স্বদেশী সংগীত লিখিতেছেন। সুতরাং খেয়ার ভাবধারা সাময়িকভাবে ছিন্ন হইয়াছে।

পৌষ উৎসবের (১৩১২ পৌষ ৭) জন্য কবি শান্তিনিকেতনে আসিয়াছেন। এবার উৎসবের ভাষণ ছিল 'উৎসবের দিন'। সকলের সঙ্গে যোগেই উৎসবের সম্পূর্ণতা ও সার্থকতা এই কথাটাই মনের মধ্যে বড় হইয়া উঠিয়াছে। শান্তিনিকেতন বাসকালে দুই-তিনটি কবিতা লেখেন— তার মধ্যে 'অবারিত' কবিতায় কবিচিত্তের এই নিখিলের সহিত যোগের কথাটিই অন্যভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কারণ সেই সময়ে সংযোগ ছিল রাজনীতির মূল কথা, রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল পূর্বে 'স্বদেশী সমাজ' প্রভৃতি প্রবন্ধে উহার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। কবি রবীন্দ্রনাথ সেই ভাবটিকে রূপকের ভাষায় প্রকাশ করিলেন 'অবারিত'এর মধ্যে (১৫ই পৌষ ১৩১২)। আধ্যাত্মিক ভাবেও যে ইহার ব্যাখ্যা হইতে পারে, সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

মাসাধিক কাল পরে শিলাইদহে পদ্মার 'পরে সম্পূর্ণ পৃথক সুর কবিতার মধ্যে ধ্বনিত হইল— মিলন, বিচ্ছেদ, বিকাশ, সীমা, ভার, টিকা (২৩-২৬ মাঘ)। ইহাদের মধ্যে সংগীতও দেখা দিয়াছে। 'আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি' (বিকাশ), 'একমনে তোর একতারাতে' (সীমা), 'তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার (ভার)— গান কয়টি রবীন্দ্র-সংগীতরসপায়ীদের নিকট সুপরিচিত।

কিন্তু চৈত্রের শুরু হইতে যে কবিতাগুলি লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাদের মধ্যে ভাবরাজি নূতন অভিঘাতে স্পন্দিত। রাজনীতির উত্তেজনা কবিকে ক্লান্ত করিতেছে। উত্তেজনার মুহূর্তে সকলে'আপন মনে ব্যস্ত হয়ে' চলেছিলেন ধেয়ে। কিন্তু কবি যে সে দলের সহিত চলিতে অপারগ, তাহা অচিরেই বুঝিলেন। "আমার দলের সবাই আমার পানে চেয়ে গেল হেসে; চলে গেল উচ্চ শিরে, চাইলে না কেউ পিছু ফিরে।" কবি তাঁহার অন্তরের বাণীর প্রতীক্ষায় আছেন; সকলেই জীবনে সার্থকতা চায়—"সন্ধ্যা হবার আগে যদি পার হতে না পারি নদী, ভেবেছিলাম তাহা হলেই সকল ব্যর্থ হবে।" কিন্তু স্বীয় জীবনে চেষ্টা না থাকিলেও ভগবৎ কৃপা আপনি আসে— "যখন আমি থেমে গেলাম, তুমি আপনি এলে কবে।" —নিরুদ্যম, ৬ই চৈত্র ১৩১২। ফলের আশা না করিয়া নিরুদ্যম অবস্থায় যখন আমরা বসিয়া

থাকি, তখনই দেবতার আবির্ভাব হয়। আবার যখন ফলের আশা করিয়া ভিক্ষায় বাহির হই, তখন যিনি পরম ভিখারী মহাদেব, যিনি সমস্ত মানবের শ্রেষ্ঠ-ভিক্ষা যাচ্ঞা করেন, তিনি আমারই দ্বারে আসেন তাঁহার বলির জন্য। তখন যদি আমি ব্রহ্মপদে সমস্ত সমর্পণ করি, আমার ক্ষুদ্র আমিত্বের গণ্ডি পার হইতে পারি, তবেই মুক্তির স্বাদ পাই। আমার দিকে সকল সঞ্চয়ই ভারস্বরূপ, আর তাঁহার দিকে দানেই আমার মুক্তি, এই তত্ত্ব কবি বহুস্থানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; "দিলেম যা রাজ-ভিখারিবে স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে।" কৃপণতা জীবনে ব্যর্থ অনুশোচনা আনে, কিন্তু তাঁহারই ধন তাঁহাকে দান করিয়া প্রেমধনে ধনী হওয়াই যে জীবনের চরম সার্থকতা, এ কথা সাধকেরা জানেন। —কৃপণ, ৮ই চৈত্র ১৩১২।

শুধু বৈরাগ্যের মূর্তি ঈশ্বরের নহে, ঐশ্বর্যমূর্তিও তাঁহার। তিনি ষড়ৈশ্বর্যশালী। তাই রাজার মত রথে চড়িয়া চলেন যখন তিনি, তখনও তিনি আমাদের ত্যাগ দাবি করেন। আবার সবার অলক্ষ্যে ভিখারীর মত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াও তিনি আসেন আমাদের কুয়ার ধারে— আমাদের অন্তরের ধারে। আমরাই কেবল ভগবানকে চাহি, তাহা নহে, তিনিও আমাদের চাহিতেছেন। —কুয়ার ধারে, ৯ই চৈত্র ১৩১২। তাঁহার সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ, সে-যে রসের — এই ভাবটি রবীন্দ্রনাথের নানা কবিতায় ও গানে বারে বারে প্রকাশ পাইয়াছে। এমনকি কয়েক বৎসর পরে শান্তিনিকেতনের উপদেশের মধ্যেও কয়েক জায়গায় ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। সাধকের আকিঞ্চন যে, ভগবান আমাদের অচেতন মনকে যখন স্পর্শ করিবেন, তখন যেন তিনিই আসেন, আর কেহ যেন তাঁহার নাম করিয়া না ডাকে, অর্থাৎ কোনো মধ্যবর্তী তাঁহার ও আমার মিলনক্ষণের মধ্যে না থাকে। "তোরা আমায় জাগাস নে কেউ, জাগাবে সেই মোরে।" —জাগরণ, ১০ই চৈত্র ১৩১২। এই কবিতাটির সহিত তুলনীয় "তুমি আপনি জাগাও"।

ভগবানই কেবল আমাকে জাগাইতে পারেন। আমার অন্তরাত্মার মধ্যে জাগরণ আনা তাঁহারই পক্ষে সম্ভব। তাঁহার দয়া না হইলে, যে যতই চেষ্টা করুক, যে যতই কথা বলুক, আমার চিত্তকমল ফুটিতে পারে না। "তোরা কেউ পারবি নে গো, পারবি নে ফুল ফোটাতে। যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে।" এ তত্ত্বটি পূর্বোক্ত কবিতাটির সহিত খাপ খাইয়া যায় বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। —ফুল ফোটানো, ১১ই চৈত্র। 'ফুল ফোটানো' কবিতাটিকে সমসাময়িক ঘটনা দিয়াও অর্থ করা যায়। দেশের যাঁহারা তথাকথিত নেতা, তাঁহারা দেশের চিত্তকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার মর্মস্থান স্পর্শ করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু কবির বিশ্বাস যে, নায়কের হস্তে সেই চেতনকাঠি আছে। "সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে"।

জীবনের সবটাই ফুল ফোটানো নয়, সার্থকতা নয়। জীবনকে সার্থকও করেন যিনি, পরাভূতও করেন তিনি, হারের দলে তিনিই বসাইয়া দেন। কিন্তু দ্বিধা থাকিয়া যায়—

তবু এই হারা তো শেষ হারা নয়,
আবার খেলা আছে পরে।
জিতল যে সে জিতল কি না
কে বলবে তা সত্য করে।

বিষয়টাকে বাস্তবভাবে লইলেও কোনো ক্ষতি নাই, আর আধ্যাত্মিক দিক হইতে বিচার করিলেও শাস্তি নাই। —হার, ১২ই চৈত্র।

এমন সময়ে বরিশাল হইতে তাঁহার আহ্বান আসিল— তথাকার সাহিত্য সম্মেলনে পৌরোহিত্য করিতে হইবে। কবির মন সকল প্রকার রাজনৈতিক উত্তেজনা হইতে দূরে থাকিবার জন্য উৎকণ্ঠিত, কিন্তু কর্তব্যবোধে কোনো কিছু হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন না। কবি কি রাজনীতি হইতে মুক্তি চাহিতেছেন? তাই কি তিনি

কলিকাতা যাইবার পূর্বদিনে লিখিলেন—

বিদায় দেহো ক্ষম আমায় ভাই
কাজের পথে আমি তো আর নাই।
... ...
তোমরা আজি ছুটেছ যার পাছে
সে-সব মিছে হয়েছে মোর কাছে—
রত্ন খোঁজা, রাজ্য ভাঙা গড়া,
মতের লাগি দেশ-বিদেশে লড়া,
... ...
পারিনে আর চলতে সবার পাছে।

—বিদায়, ১৪ই চৈত্র ১৩১২, বোলপুর

রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার আবর্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেই মনে করেন শান্তিনিকেতনে ছেলেদের লইয়া আনন্দে দিন কাটাইবেন। তাই যেন বলিতেছেন—

তোমরা তবে বিদায় দেহো মোরে,
অকাজ আমি নিয়েছি সাধ করে।

'পথের শেষে' (১৪ই চৈত্র) কবিতাটির মধ্যেও ক্লান্তির কথা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—

অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ,
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।

খেয়ার কবিতগুচ্ছে এখানে একটি ছেদ পড়িল। বরিশাল হইতে ফিরিবার পর রচিত কবিতাগুলি সত্যই মিস্টিক গুণধর্মী হইয়াছে। বোলপুরে ফিরিয়া লেখেন— 'সমুদ্রে' (৭ই বৈশাখ ১৩১৩), 'দিনশেষে' (৮ই বৈশাখ), 'সমাপ্তি' (১০ই বৈশাখ)। সমুদ্রে ও সমাপ্তি কবিতাদ্বয়কে পরস্পরের পরিপূরক বলিতে পারি প্রথমটিতে যাত্রার কোনো উদ্দেশ্য নাই, "কোথায় আমার যেতে হবে সে কথা কি কিছুই জানি।" তাই নিরুদ্দেশে যাত্রার শেষে সমুদ্রে আসিয়া বলেন—

দুলুক তরী ঢেউয়ের 'পরে ওরে আমার জাগ্রত প্রাণ
গাও রে আজি নিশাথ-রাতে অকুল-পাড়ির আনন্দগান।
... ...
লও রে বুকে দু হাত মেলি অন্তবিহীন অজানাকে।

উচ্ছ্বাসে উল্লাসে অকারণপুলকে মন বাহিরিয়া পড়ে অনির্দিষ্টের মধ্যে, অন্তবিহীন অজানার মধ্যে ; কিন্তু 'সমাপ্তি'তে ঠিক তাহার বিপরীত সুরটুকু ধ্বনিয়াছে। কারণ অজানা ও ঢেউয়ের 'পরে মন কখনো শান্ত হইতে পারে না, অর্থাৎ অন্তহীন গতির কোনো উদ্দেশ্য নাই, সে চায় শান্তি— আত্মশক্তি নহে, আত্মসমর্পণ তাই সে বলে—

এখন ঘরে আয় রে ফিরে মাঝি,
আঙিনাতে আসনখানি মেলো।
... ...
শ্রান্ত ওরে রেখে দে জাল-বোনা,

গুটিয়ে ফেলো সকল মন্দ ভালো।
ফিরিয়ে আনো ছড়িয়ে-পড়া মন—
সফল হোক রে সকল সমাপন।

কেবলমাত্র সমুদ্রযাত্রার মধ্যেই কোনো সত্য নাই, কারণ উদ্দেশ্যহীন গতি অর্থশূন্য। তাই সন্ধ্যার সময় সে ঘরে ফিরিতেছে, ছড়িয়ে-পড়া মনটিকে গুটাইতে চাহে।

এমন সময় কলিকাতায় যাইতে হইল। বরিশালে যজ্ঞভঙ্গের পর নেতাদের মধ্যে মতান্তর পরিণত হইয়াছে মনান্তরে। কবি কলিকাতায় গিয়া 'দেশনায়ক' প্রবন্ধ পাঠ করিলেন (১৫ বৈশাখ ১৩১৩)। চারি দিকের রাজনৈতিক অশান্তির মধ্যে কবি অন্তর-আলোকে যাহা সত্যরূপে পাইলেন, তাহাই অকুণ্ঠিত চিত্তে দেশবাসীর নিকট ব্যক্ত করিলেন। খেয়ার নেয়ে তাহার জীবনতরীকে ঠিকই বাহিয়া চলিয়াছে, তিনি আবার নিজের কাব্যলোককে খুঁজিয়া পাইয়াছেন। 'প্রতীক্ষা' (১৭ বৈশাখ ১৩১৩, কলিকাতা) কবিতাটির মধ্যে যে আকুলতা আছে, তাহা আমাদের চিত্তকে বিশেষভাবে আঘাত করে—

আমি এখন সময় করেছি—
তোমার এবার সময় কখন হবে।

এই প্রতীক্ষার ভাবটি 'প্রচ্ছন্ন' (২ আষাঢ় ১৩১৩, শান্তিনিকেতন) কবিতার মধ্যেও স্পষ্ট। এই প্রতীক্ষাপরায়ণতা রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি বিশিষ্টতা। খেয়ার কবিতাগুলি একটি সমে আসিয়া অবশেষে পৌঁছিয়াছে। 'সব-পেয়েছি'র দেশ হইতেছে কবির স্বর্গ— পরিপূর্ণতার আদর্শ; আত্মতৃপ্ত মন হইতেছে সেই 'সব-পেয়েছি'র স্বর্গ। সমস্ত খোঁজের অবসান হইয়াছে— প্রতীক্ষার প্রয়োজন নাই, সবারই মন আনন্দপূর্ণ—"যে চলে সেই গান গেয়ে যায় সব-পেয়েছি'র দেশে।"

'শেষ খেয়া'য় কবি পৌঁছিয়াছেন তাঁহার চরম আরাধ্য পরিপূর্ণতার জগতে— 'সব-পেয়েছি'র দেশে।

জাতীয় শিক্ষা

বঙ্গচ্ছেদের ফলে বাঙালি জাতির প্রাণে যে বিচিত্র সাড়া পড়ে, তাহার অন্যতম ফল হইতেছে শিক্ষা-সংস্কারের আন্দোলন বা জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা। এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কারণ যে রাজনৈতিক, তাহা তো আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি। স্কুলকলেজের ছাত্রদিগকে রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে দূরে রাখিবার জন্য বাংলা গবর্নমেণ্ট যে-সব 'সার্কুলার' জারি করেন— তাহারই প্রতিবাদে অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির জন্ম, স্কুলকলেজের ছাত্রেরা ইহার সদস্য। বাংলাদেশে যথার্থ ছাত্র-আন্দোলনের সূত্রপাত এখান হইতেই। এই ছাত্রেরা এই সময়ে সংঘবদ্ধভাবে বাংলাদেশের সকলপ্রকার রাজনৈতিক কাজকর্মের পুরোভাগে আসিয়া পড়িল। নেতাদের উৎসাহবাণীতে মুগ্ধ সহস্র সহস্র তরুণহৃদয় ভবিষ্যতের সকল আশা জলাঞ্জলি দিয়া বিদ্যাশিক্ষা বর্জন করিল; অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুলব্ধ উপাধির মোহ ত্যাগ করিয়া অজানার পথে বাহির হইয়া পড়িল। বহু ছাত্র স্বল্প কারণে কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত হইল; রাজনৈতিক সভা বা শোভাযাত্রায় যোগদান অথবা বিলাতী কাপড়ের 'পিকেটিং' করার অপরাধে, সাধারণ অপরাধীর ন্যায় অনেকে বেত্রদণ্ডিত হইল। এইসকল শাসনকর্মে অত্যুৎসাহী বাঙালি হেডমাস্টারের অভাব হয় নাই।

এদিকে নেতাদের কর্মপ্রবাহ চালাইবার জন্য প্রয়োজন বাংলার এই-সব 'ডানপিটে ছেলে', যাহারা হাস্যমুখে "সার্থক

জনম আমার জন্মেছি এই দেশে" গাহিয়া মরণকে বরণ করিবে। সুতরাং ইহাদিগকে সংঘবদ্ধ করা, ইহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা রাজনৈতিক কারণে প্রয়োজন হইয়া পড়িল।

নেতাদের রাজনৈতিক প্রয়োজন ব্যতীত, যে-সব পরোক্ষ কারণ বাংলার শিক্ষিতসমাজের মনকে চিন্তাকুল করিয়া তুলিয়াছিল, সেগুলিও কম গুরুতর নহে। একদল লোক সরকারী বিদ্যালয়ের পুঁথিগত বিদ্যার ব্যর্থতায় বিরক্ত হইয়া ছেলেদের জন্য কারুবিদ্যালয় স্থাপনের কথা ভাবিতেছিলেন; তাঁহারা চাহেন দেশের শিল্পোন্নতি। এই উদ্দেশ্যে ব্যারিস্টার তারকনাথ পালিত কলিকাতায় 'বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনস্টিটিউট' স্থাপন করেন (১৯০৬ জুন)। সার্কুলার রোডের উপর যেখানে আজ সায়ান্স কলেজের প্রাসাদোপম অট্টালিকা হইয়াছে— সেইখানে টেক্‌নিক্যাল স্কুল প্রথম খোলা হয়।

দেশের আর-এক দল ছিলেন যাঁহারা বিদেশী প্রদত্ত ধর্মহীন শিক্ষার উপর বীতশ্রদ্ধ; তাঁহারা হিন্দুভারতের কৌলিক শিক্ষা ও আচারধর্ম রক্ষার পক্ষপাতী। ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির বা রাজনীতির সহিত ধর্মের নিগূঢ় সম্বন্ধে তাঁহারা বিশ্বাসী। ইঁহারা জাতীয় শিক্ষার মধ্য দিয়া হিন্দুজাতীয়তা প্রতিষ্ঠার দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বহু জ্ঞানী ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। এতদ্‌ব্যতীত আর একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ছিল— ডন্ সোসাইটি। এই দলের সকলেই প্রায় কলেজী শিক্ষার শেষ ধাপে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ইঁহারাই ভারতের ও বিশেষভাবে হিন্দুভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা করিয়া জাতির মধ্যে আত্মবিশ্বাস আত্মশ্রদ্ধা সর্বপ্রথম জাগ্রত করিতে চাহিতেছিলেন। এই তরুণ মনীষীদের প্রধান কাম্য ছিল সর্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ শিক্ষালয় স্থাপন। আসল কথা, সকল শ্রেণীর চিন্তাশীল লোকেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহারিকতা-বিহীন ধর্মহীন বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞানশিক্ষার নিষ্ফলতা তীব্রভাবে অনুভব করিতেছিলেন, সকলেই পরিবর্তনের জন্য উদ্‌গ্রীব।

১৩১২ সালের মাঝামাঝি হইতে জাতীয় শিক্ষালয় স্থাপন সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হয়। সকলের মুখে এক কথা— 'জাতীয়' শিক্ষালয়ের প্রয়োজন। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা বলিতে কী বুঝায়, সে-সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কোনো সুস্পষ্ট পরিকল্পনা কেহ দিতে পারেন নাই। প্রত্যেকবার স্বাধীনতা আন্দোলনের স্রোতের মুখে এই শ্রেণীর বিদ্যালয় 'জাতীয়' নাম লইয়া, বর্ষার পর আগাছার ন্যায় যেখানে সেখানে গজাইয়াছে— তার পর রাজনৈতিক খরতাপে শুকাইয়া গিয়াছে— অথবা নিজের ভিতরে রসের অভাবে আপনা হইতে মরিয়াছে। কিন্তু 'জাতীয়' শিক্ষা বলিতে কী বুঝায়। কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় বা আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকি যাদবপুরের কলেজ অব্ ইন্‌জিনীয়ারিং অ্যাণ্ড টেক্‌নলজিকে যদি 'জাতীয়' শিক্ষায়তন বলিতে হয়, তবে প্রশ্ন আরও জটিল হয় এবং জাতীয় বিদ্যালয়ের অর্থ কিছুমাত্র পরিষ্কার হয় না। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, 'জাতীয়' শিক্ষালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি রাজনৈতিক আন্দোলনের পশ্চাতে পশ্চাতে ধূমকেতুর পুচ্ছের ন্যায় উদয় হইয়াছে; সুতরাং জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলন যে রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপূর্তি ও প্রত্যক্ষ ফল সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।[১]

বঙ্গচ্ছেদের প্রায় চারি বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ বোলপুর-শান্তিনিকেতনে যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন তাহার বৈশিষ্ট্য জাতীয় শিক্ষাপরিষদের কর্তৃপক্ষের অবিদিত ছিল না; তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের উপর স্কুলবিভাগের গঠনপত্রিকা রচনার ভার অর্পণ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষাসমস্যা' নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধে তাঁহার মত লিপিবদ্ধ করিয়া ওভারটুন হলে পাঠ করেন (২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩)। এই প্রবন্ধের প্রথমেই জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অন্তর্নিহিত ভাবটি কী হওয়া উচিত,

১ শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক রচনা; শিক্ষাসমস্যা (বঙ্গদর্শন ১৩১৩ আষাঢ়), শিক্ষা-সংস্কার (ভাণ্ডার ১৩১৩ আষাঢ়), আবরণ (বঙ্গদর্শন ১৩১৩ ভাদ্র), জাতীয় বিদ্যালয় (বঙ্গদর্শন ১৩১৩ ভাদ্র) [১৯০৬]। দ্র. শিক্ষা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২। ততঃ কিম্—(বঙ্গদর্শন ১৩১৩ অগ্রহায়ণ) দ্র. ধর্ম, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩।

তৎসম্বন্ধে আলোচনা আছে। আধুনিক শিক্ষাসম্বন্ধে লেখকের প্রধান অভিযোগ যে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের সমাজের বা দেশের প্রয়োজনে পরিকল্পিত হয় নাই, আপনা হইতে স্বাভাবিকভাবে অভিব্যক্তও হয় নাই। য়ুরোপের বিদ্যায়তন য়ুরোপীয় সমাজের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠান, তাহা স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত ও কালধর্ম অনুসারে পরিণত; আমাদের সেরূপ নহে। সেখানে লোকে যে বিদ্যালাভ করে তাহা য়ুরোপের সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, সেখানকার সংস্কৃতি হইতে বিভিন্ন নহে। সেখানে বিদ্যা সমাজের মাটি হইতে রস টানিতেছে এবং সমাজকেই ফলদান করিতেছে। কিন্তু আমরা বাহ্য নকলের দ্বারা সে জিনিস পাইতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছি, সেইজন্য স্কুল আমাদের কাছে একটা শিক্ষার কল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মানুষের কাছ হইতে মানুষ যাহা পায় কলের কাছ হইতে তাহা পাইতে পারে না। পূর্বে এদেশে শিষ্যেরা গুরুর কাছ হইতে বিদ্যা পাইত, শিক্ষকের কাছে পাইত না।

য়ুরোপকে নকল করাও যেমন আজ ব্যর্থ হইয়াছে, প্রাচীনকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলেও সেও একটা নকল হইবে মাত্র। অতএব বর্তমানের দিকে তাকাইয়া বিদ্যাদানের এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে ঘর ও বিদ্যালয়ের বিচ্ছেদটা প্রথমেই দূর হয়— অর্থাৎ কয়েক ঘণ্টা বিশেষ একটি গৃহের মধ্যে বাসের দ্বারা বিদ্যাশিক্ষাটা সমাধান হয়— এই ধারণাটা সমাজ হইতে দূর করিতে হইবে। তাই বলিয়া বোর্ডিং স্কুল বানাইলেও সে সমস্যা দূর হইবে না।

রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব যে, পূর্বকালের ন্যায় তপোবনে পুনরায় বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে; বিদ্যার্থীরা গুরুগৃহে বাস করিবে। এই স্থান শহর হইতে দূরে নির্জনে হইবে। প্রকৃতির মধ্যে বাস ছাত্রজীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা জীবন সংযত ও কর্মকুশল হয়। নীতি-উপদেশ দ্বারা জীবন গড়ে না, চর্যার দ্বারা চরিত্র গড়ে। সেইজন্য বনের প্রয়োজন আছে এবং গুরুগৃহও চাই। এইখানে কবি তাঁহার শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শ ব্যাখ্যা করেন। বালকদিগকে ঘর হইতে দূরে পাঠানোর বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি আছে সত্য, কিন্তু সাধারণত আমরা বালকদের শিক্ষার জন্য নিকটের বিদ্যালয়ে যথানিয়ম পাঠানো এবং ঘরে 'প্রাইভেট টিউটর' রাখা ছাড়া তাহাদের মনের সকল বৃত্তির বিকাশের জন্য আর কী করি! ধনীর ছেলে এবং দরিদ্রের ছেলে কোনো প্রভেদ লইয়া আসে না। জন্মের পরমুহূর্ত হইতে মানুষ সেই প্রভেদ নিজের হাতে তৈরি করিয়া তুলিতে থাকে। ধনীর সন্তান তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকা সত্ত্বেও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া থাকে, কারণ কোনো কাজ সে স্বহস্তে করিতে অভ্যস্ত নহে। সুখ যে মনে— আয়োজনে ও আড়ম্বরে নহে— এ শিক্ষা তাহার হয় না। রবীন্দ্রনাথের মতে এই-সব ধনীগৃহ হইতে বালকদের দূরেই শিক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ ছাড়া যে-সব গৃহস্থ সাহেবি-ভাবে সন্তানদের পালন করিতেছেন তাহারা স্বদেশে অযোগ্য ও বিদেশে অগ্রাহ্য হইয়া অত্যন্ত কৃত্রিম জীবন যাপন করেন।

কবির মতে সেইজন্য "ছেলেদিগকে শিক্ষাকালে এমন জায়গায় রাখা কর্তব্য যেখানে তাহারা স্বভাবের নিয়মে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মচর্য পালনপূর্বক গুরুর সহবাসে জ্ঞানলাভ করিয়া মানুষ হইয়া উঠিতে পারে।" আজ দেশের সম্মুখে শিক্ষাসমস্যা নানাভাবে দেখা দিয়াছে; রাজনৈতিক সমস্যাও কম নহে! কিন্তু এমনি আমাদের মনোবৃত্তি হইয়াছে যে, "অধিকার লাভ করিতে গেলেই আমরা পরের কাছে হাত পাতি এবং গড়িয়া তুলিতে গেলেই আমরা নকল করিতে বসিয়া যাই— নিজের শক্তি এবং নিজের মনের দিকে দেশের প্রকৃতি ও দেশের যথার্থ প্রয়োজনের দিকে তাকাই না, তাকাইতে সাহসই হয় না। যে-শিক্ষার ফলে আমাদের এই দশা হইতেছে, সেই শিক্ষাকেই নূতন একটা নাম দিয়া (বিদ্যালয়) স্থাপন করিলেই যে তাহা নূতন ফল প্রসব করিতে থাকিবে এরূপ আশা করিয়া আর-একটা নৈরাশ্যের মুখে অগ্রসর হইতে প্রবৃত্তি হয় না।" অর্থের দ্বারা, কমিটির নিয়মাবলীর দ্বারা, পাঠ্যপুস্তকের তালিকা প্রণয়নের দ্বারা বিদ্যাশ্রম গড়িবে না। "যেখানে অধ্যাপকগণ জ্ঞানের চর্চায় স্বয়ং প্রবৃত্ত সেইখানেই ছাত্রগণ বিদ্যাকে

প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় ; বাহিরে বিশ্বপ্রকৃতির আবির্ভাব যেখানে বাধাহীন, অন্তরে সেইখানেই মন সম্পূর্ণ বিকশিত ; ব্রহ্মচর্যের সাধনায় চরিত্র যেখানে সুস্থ এবং আত্মবশ, ধর্মশিক্ষা সেইখানেই সরল ও স্বাভাবিক।"

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে জাতীয় শিক্ষার যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমেরই আদর্শ ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যাত হয়।

যে মাসের বঙ্গদর্শনে 'শিক্ষা-সমস্যা' বাহির হইল, সেই মাসেই ভাণ্ডারে 'শিক্ষা-সংস্কার' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় (১৩১৩ আষাঢ়)। আয়রল্যাণ্ডের জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যকে ইংরেজ কিভাবে ধ্বংস করিয়াছিল এই প্রবন্ধটি তাহারই ইতিহাস আলোচনা। আয়রল্যাণ্ড জয় করিয়া ইংরেজ আইরিশদিগকে ইংরেজ বানাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। ভারতবর্ষেও ইংরেজের শিক্ষানীতি আয়রল্যাণ্ডের শিক্ষা-ইতিহাস হইতে খুব পৃথক নহে। উভয় জাতিরই সমান সমস্যা। আইরিশদের গেইলিক ভাষা ত্যাগ করিতে হয়, আমাদেরও নিজ ভাষা স্কুলে কলেজে ছাড়িতে হয় [৪০ বৎসর পূর্বের কথা]। পরের ভাষায় গ্রহণ করাও শক্ত, প্রকাশ করাও কঠিন। অথচ তাহাই করিতে হয়। তবে আসল কথা, শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রভুপক্ষের অন্যান্য অবান্তর উদ্দেশ্য ভিতরে ভিতরে থাকে। তাহাতেই শিক্ষা বিষয়টা বিকৃত হইয়া যায়। শিক্ষাকে তাঁহারা শাসন-বিভাগের আপিসভুক্ত করিয়াছেন।

ইহার উপর 'ডিসিপ্লিন' বলিয়া একটি শব্দ শিক্ষাশাস্ত্রে ঢুকিয়াছে। ইহার নামে অধুনা সরকার যাহা করিতেছেন তাহা আদৌ শিক্ষা-মনস্তত্ত্বের দ্বারা অনুমোদিত নহে। "নিজে চিন্তা করিবে নিজে সন্ধান করিবে, নিজে কাজ করিবে, এমনতরো মানুষ তৈরি করিবার প্রণালী এক, আর পরের হুকুম মানিয়া চলিবে, পরের মতের প্রতিবাদ করিবে না, ও পরের কাজের জোগানদার হইয়া থাকিবে মাত্র, এমন মানুষ তৈরির বিধান অন্যরূপ।" সরকারী বিদ্যাদানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইহাই বোধ হয় শেষ কথা। প্রবন্ধশেষে লেখক টলস্টয়ের কোনো রচনা হইতে রুশের শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উক্ত মনীষীর মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। রুশে স্বেচ্ছাতন্ত্র সম্ভব হইয়াছে, রুশীয়দের মূঢ়তার জন্য ; তাহাদিগকে শিক্ষিত করাই হইতেছে রুশের ৎজারতন্ত্রের স্বার্থ পরিপন্থী।

রবীন্দ্রনাথ এইসব প্রবন্ধে জাতীয় শিক্ষার যে চিত্র আঁকিলেন ও আদর্শের যে ব্যাখ্যা দিলেন, তাহা যে কতখানি ভারতীয় বিচিত্র সংস্কৃতির শিক্ষাদর্শকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে সে-বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। রবীন্দ্রনাথ যাহাকে জাতীয় শিক্ষার আদর্শ বলিয়া প্রচার করিলেন, তাহা যথার্থত হিন্দুদের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শ, তাঁহার শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আদর্শ। বলা বাহুল্য, তখন পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের আদর্শে হিন্দু ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মের লোকের স্থান নির্দিষ্ট হয় নাই ; এমনকি হরিজনদেরও স্থান পাওয়া কঠিন ছিল ; সুতরাং রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শকে সর্বদেশ সর্বজাতি গ্রহণ করিতে পারে নাই বলিয়া উহাকেও 'জাতীয়' বলা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষা-সমস্যা' প্রভৃতি প্রবন্ধে জাতীয় শিক্ষার যে আদর্শ ব্যাখ্যা করিলেন, তাহার ত্রুটি তখনই লোকে আবিষ্কার করিয়া সমালোচনা করে। চট্টগ্রামের কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত সমীচান মন্তব্য জ্ঞানে আমরা উদ্ধৃত করিলাম। তিনি লিখিতেছেন, "আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়-গুলিতে শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রবাবুর প্রস্তাবানুযায়ী শিক্ষাদানপ্রণালী পরিবর্তন করিলে তেমন সার্বজনীন সাম্যভাব সর্বথা রক্ষিত হইতে পারিবে কি না, তদ্বিষয়ে সংশয় আছে। আশা ছিল, তাঁহার প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমান বালক-বৃন্দের শিক্ষার একটা সুন্দর সামঞ্জস্য দেখিতে পাইব। দুঃখের বিষয়, আমাদের সে-আশা তেমনভাবে পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার অভীপ্সিত ব্যবস্থা কেবলমাত্র হিন্দুসন্তানগণেরই সর্বাংশে উপযোগী ও কল্যাণকর হইলেও হইতে পারে।"—ভাণ্ডার ১৩১৩ জ্যৈষ্ঠ।

এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনাটুকুর মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে রবীন্দ্রনাথ সে যুগে তাহা স্বীকার করেন নাই তাহা

তাঁহার তৎকালীন রচনা সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রগতিপরায়ণ মন বিদ্যালয়কে এই খর্বতার মধ্যে আবদ্ধ রাখে নাই ; ব্রহ্মচর্যাশ্রম তাহার হিন্দু-আবরণ ভাঙিয়া একদিন নিখিল ভারতীয় হইয়া বিশ্বভারতীতে আসিয়া সম্পূর্ণ হইল।

এদিকে জাতীয় শিক্ষা[1] প্রতিষ্ঠার সকল আয়োজন হইল। ১৯০৬এর ১৫ই আগস্ট পরিষদের স্কুল[2] বসিল। ১৪ই আগস্ট ১৯০৬ (১৩১৩ শ্রাবণ ২৯) কলিকাতার টাউনহলে পরিসদ প্রতিষ্ঠার উদ্‌বোধন-সভায় ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ সভাপতি হন ; বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই বিরাট সভায় অনেকেই কিছু-না-কিছু বলেন ; রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভাষণ লিখিয়া পাঠ করেন।[3] এই প্রবন্ধে জাতীয় শিক্ষা বা পরিসদ্ সম্বন্ধে কোনো সমালোচনা নাই ; যে প্রতিষ্ঠানকে জাতি মাথা পাতিয়া বরণ করিয়া লইতেছে, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে আশীর্বাণী দ্বারা অভিনন্দিত করিলেন। কিন্তু কবির মনে এখনো প্রাচীন তপোবনের ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ গুরু মুক্তকাম ছাত্রগণকে যে মন্ত্রে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহারই কথা জাগিতেছে। ছাত্রগণকে সেই আদর্শে উদ্‌বোধিত করিবার সকলপ্রকার প্রয়াস এই ভাষণের মধ্যে আছে।

শিক্ষার আদর্শমাত্র আলোচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথের মন তৃপ্ত হইতে পারে না ; শিক্ষার ব্যবহারিকতা ও বাস্তবতা সম্বন্ধে তিনি আদৌ স্বপ্নবিহারী নহেন। শিক্ষাবিধির অপপ্রয়োগে ছাত্রের যে কী ক্ষতি হয় সে সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা আছে। সেই কথা তিনি 'আবরণ'[4] প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমাদের দেহকে যেমন বৃথা আবরণে অকারণে আচ্ছাদিত করাটা সমাজের পক্ষে সভ্যতার প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তেমনই বালকদের মনের উপর অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান ও সংবাদ পুঞ্জীভূত করিয়া তাহাকে সভ্য বলিয়া অভিহিত করার চেষ্টায় ফল আরও মারাত্মক হইয়াছে।" রবীন্দ্রনাথের কাছে নূতন শিক্ষা-আন্দোলনের দিনে এই কথাটিই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, বই পড়াটাই যে শিক্ষা, ছেলেদের মনে এই কুসংস্কার যেন জন্মিতে দেওয়া না হয়। বইয়ের দৌরাত্ম্য অত্যন্ত বেশি হইয়াছে। পুরাকালে গুরু মুখেমুখেই শিষ্যকে শিক্ষা দিতেন, এবং ছাত্র তাহা খাতায় নহে, মনের মধ্যেই লিখিয়া লইত। এমনি করিয়া এক দীপশিখা হইতে আর-এক দীপশিখা জ্বলিত। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের একটি বড়ো কথা হইতেছে এই মনের আবরণ ঘুচানোর সাধনা।

সাময়িক রাজনীতি ও শিক্ষাসম্বন্ধীয় আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ অল্পবিস্তর যুক্ত থাকিলেও তাঁহার অন্তরাত্মা এই-সব উত্তেজনাকেই জীবনের চরম সার্থকতা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। কাব্যজীবনে তিনি যেমন বিশেষ কোনো ভাবাবর্তে দীর্ঘকাল আবিষ্ট থাকিতে পারেন না, রাজনৈতিক মোহগর্তেও তাঁহার পক্ষে থাকা তেমনি অসম্ভব। মন ভিতরে ভিতরে এই উত্তেজনা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ব্যাকুল। তাহারই প্রকাশ হইল 'ততঃ

১ ১৯০৬ মার্চ মাসে জাতীয় শিক্ষা পরিষদে গবর্নমেন্টের ১৮৬০ অব্দের ২১ আইন মতে রেজিস্টারী হয়।

২ ১৯০৬ জুন হইতে ১৯০৭ জুন পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বিদ্যালয় বসে ১৯১।১ বহুবাজার স্ট্রীটের ভাড়াবাড়িতে। ১৯০৬ জুন-১৯১২ জুন বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, ৯২ আপার সার্কুলার রোডে ছিল। ১৯০৭ জুলাই-১৯১০ মে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ বসে ১৬৬ বহুবাজার স্ট্রীটে (বর্তমানে বসুমতী অফিস)। ১৯১০ মে-১৯১২ মে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট একত্র ৯২ আপার সার্কুলার রোডের বাড়িতে বসে। ১৯১২ জুন-১৯২৪ মে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, পঞ্চবটী ভিলা, মুরারীপুকুর রোড, মানিকতলা (খালের ওপারে)। ১৯২৪ জুন হইতে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট যাদবপুরে আসে। ১৯২৫ মে মাসে নূতন নাম—College of Engineering and Technology বা সংক্ষেপে Jadavpur College, ১৯৫৬, ১৫ আগস্ট যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত। [শিক্ষা পরিষদ্ প্রতিষ্ঠার ৫০ বৎসর পরে বিশ্ববিদ্যালয় হইল]।

৩ জাতীয় বিদ্যালয়, বঙ্গদর্শন ১৩১৩ ভাদ্র। দ্র. শিক্ষা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২, পৃ ৩১৩-৩২২।

৪ আবরণ, বঙ্গদর্শন ১৩১৩ ভাদ্র। দ্র. শিক্ষা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২, পৃ ৩২২-৩৩৪।

কিম্'[১] প্রবন্ধ—ওভারটুন হলে আহুত আলোচনা-সমিতির বিশেষ অধিবেশনে পঠিত। মানবের সমগ্র জীবনকে একটি সুষ্ঠু সম্পূর্ণতার মধ্যে দেখিতে গিয়া যে আলোচনা উত্থাপন করিলেন তাহার গূঢ় অর্থ হইতেছে আশ্রমধর্ম পালন। অর্থাৎ মানুষের জীবনধারণের একমাত্র উদ্দেশ্য কখনই কর্ম নহে, বা কর্ম হইতে বিরতি নহে। কর্মের দ্বারা কর্মের বন্ধন ছিন্ন করিয়া কর্মবিরতিই হইতেছে জীবনের কাম্য। তদুদ্দেশ্যে প্রাচীন ভারতীয় মনীষীগণ যে পথ নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেছে পরিপূর্ণতার আদর্শ। বাল্যে ব্রহ্মচর্যপালন, যৌবনে সংসার-ধর্ম, প্রৌঢ়ে সংসার-কর্মে নিবৃত্তি বা বানপ্রস্থ এবং বার্ধক্যে পরিপূর্ণ সন্ন্যাস বা প্রব্রজ্যা গ্রহণ।

এই আদর্শ রবীন্দ্রনাথের মতে কেবলমাত্র ভারতীয়দের বা হিন্দুদের জন্য নহে; "ইহাই একমাত্র সত্য আদর্শ, সুতরাং ইহাই সকল মানুষেরই পক্ষে মঙ্গলের হেতু। প্রথম বয়সে শ্রদ্ধার দ্বারা সংযমের দ্বারা ব্রহ্মচর্যের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া দ্বিতীয় বয়সে সংসার-আশ্রমে মঙ্গলকর্মে আত্মাকে পরিপুষ্ট করিতে হইবে; তৃতীয় বয়সে উদারতর ক্ষেত্রে একে একে সমস্ত বন্ধন শিথিল করিয়া অবশেষে আনন্দের সহিত মৃত্যুকে মোক্ষের নামান্তররূপে গ্রহণ করিলে—মানুষের জীবনকে এমন করিয়া চালাইলেই তবে তাহার আদ্যন্তসংগত পূর্ণতাৎপর্য পাওয়া যায়।" প্রবন্ধশেষে কবি বলিলেন, "মানুষের আত্মাকে জয়ী হইতে হইবে, মানুষের আত্মাকে মুক্ত হইতে হইবে, তবেই মানুষের এতকালের সমস্ত চেষ্টা সার্থক হইবে— নহিলে ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্।"

চারি দিকের আন্দোলন উত্তেজনা দেখিয়া কবির মনে আজ এই প্রশ্নই জাগিতেছে, তার পরে কি। মনের এই উদ্‌বিগ্ন অবস্থায় দিন কাটিতেছে। তাই দেখি ৭ই পৌষের (১৩১৩) উৎসবে তিনি যে ভাষণ দান করিলেন, তাহার নাম 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্'। চারি দিকের বিক্ষোভের মধ্যে নিজেরা শান্ত হইলেই সেই শান্তস্বরূপের আবির্ভাব আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইবে। এই উপদেশ যথার্থভাবে অন্যের জন্য নহে নিজের জন্যই উহা যেন নিজেকে বলিলেন।[২]

জাতীয় শিক্ষাপরিষদে বক্তৃতা

রাজনীতি কবির ধর্ম নহে। রবীন্দ্রনাথ রাজনীতির সেই ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে চাহিয়াছিলেন যেখানে উহা মনুষ্যত্ব হইতে বিচ্যুত নহে, মানবধর্ম হইতে খণ্ডিত নহে; যেখানে রাজনীতি ধর্মকে অতিক্রম করে না— সেই রাজনীতির সহিত কবির অন্তরের যোগের সম্ভাবনা। স্বল্পকালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মনের উপর দিয়া দেশের রাজনীতি শিক্ষানীতির অসংখ্য প্রশ্ন ভাসিয়া চলিয়া গেল; সমস্তের শেষে কবি ফিরিয়া আসিলেন আপনার ধর্মে অর্থাৎ সাহিত্যের মধ্যে। জাতীয় শিক্ষাপরিষদের পরিচালনা বা আভ্যন্তরিক কর্মের সহিত তাঁহার যোগস্থাপন হয় নাই। কিন্তু তিনি নানাভাবে ঐ প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা দান করেন। পরিষদ স্থাপিত হইলে তিনি ছাত্রদের জন্য সাহিত্য সম্বন্ধে চারিটি বক্তৃতা দেন, সেগুলি 'সাহিত্য' গ্রন্থমধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্‌ব্যতীত প্রায় তিন বৎসর তিনি শিক্ষাপরিষদের বাংলাভাষার পরিচালক ও পরীক্ষার প্রশ্নকর্তা ছিলেন (১৯০৬-০৭-০৮)।

জাতীয় শিক্ষাপরিষদের কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্য বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে তিনি 'সৌন্দর্যবোধ' 'বিশ্বসাহিত্য'[৩] 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' এবং 'সাহিত্যসৃষ্টি' শীর্ষক চারিটি বক্তৃতা করেন।

১ ততঃ কিম্, বঙ্গদর্শন ১৩১৩ অগ্রহায়ণ। দ্র. ধর্ম, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৪২০-৪৪১।

২ শান্তং শিবমদ্বৈতম্, বঙ্গদর্শন ১৩১৩ পৌষ। দ্র. ধর্ম, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৪১০-৪১৬।

৩ বিশ্বসাহিত্য Comparative Literature-এর অনুবাদ। জাতীয় পরিষদ হইতে Comparative Literature-এর উপর বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। এই শব্দটি ইংরাজিতে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন ম্যাথ্যু আর্নল্ড (১৮৪৮)। সাহিত্যজগতে গ্যেটেই প্রথম বিশ্বসাহিত্য বা welt literatur শব্দ প্রয়োগ করেন; ইহাকে বলা হয় romantic cosmopolitanism বা ভাবালু বিশ্বমানবতা।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক এবং সুন্দরের পূজারী বলিয়া প্রথম বক্তৃতা দেন সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধে Aesthetics বিষয়ে। সৌন্দর্যবোধের গোড়ার কথা কবির মতে সংযম বা ব্রহ্মচর্য কথাটায় সাধারণের একটু খটকা লাগে, কারণ কবি ও শিল্পীদের জীবনে সংযম জিনিসটা প্রায়ই দেখা যায় না ; সুতরাং রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে লোকের সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু কবি এই প্রবন্ধে এই সন্দেহের নিরাকরণ করিয়া বলিলেন যে, "কলাবান্ গুণীরা যেখানে বস্তুত গুণী, সেখানে তাঁহারা তপস্বী ; সেখানে যথেচ্ছাচার চলিতে পারে না ; সেখানে চিত্তের সাধনা ও সংযম আছেই।"[১] কবি ও শিল্পীদের সম্বন্ধে আমরা যাহাকে বাস্তব বলি, তাহার বেশির ভাগই আমাদের অপ্রত্যক্ষ। আসল সত্যটা অপ্রত্যক্ষের মধ্যে ডুবিয়া আছে। যথার্থ সৌন্দর্যবোধ উদ্‌বোধনের জন্য ব্রহ্মচর্যের সাধনা বা সংযম আবশ্যক এবং তদভাবে সৌন্দর্যসৃষ্টি হইতে পারে না।

প্রবৃত্তি-প্রলয়োৎসবকে আনন্দ বলা যায় না ; উত্তেজিত প্রবৃত্তি অস্বাভাবিক দীপ্তিলাভ করিলেও তাহার কুশ্রীতা বুঝিতে বিলম্ব হয় না ; উত্তেজনাকে আনন্দ ও বিকৃতিকে সৌন্দর্য বলিয়া সাধারণ লোকেও স্বীকার করে না ; সৌন্দর্যবোধকে পূর্ণভাবে লাভ করিতে হইলে চিত্তের শান্তি চাই।

এই প্রবন্ধে লেখক পরিপূর্ণ সৌন্দর্যবোধকে মঙ্গলবোধ হইতে অভিন্ন করিয়াছেন। চোখের দিক হইতে যাহা সুন্দর, তাহা পরিপূর্ণ সুসংগতির ছন্দে রূপায়িত ; মনের দিক হইতে তাহাই মঙ্গল। মঙ্গল মাত্রেরই সমস্ত জগতের সঙ্গে একটা গভীরতর সামঞ্জস্য আছে, সকল মানুষের মনের সঙ্গে তাহার নিগূঢ় মিল আছে। সৌন্দর্যমূর্তিই মঙ্গলের পূর্ণমূর্তি এবং মঙ্গলমূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণস্বরূপ।

সৌন্দর্য ও মঙ্গলের সম্মিলন যে আবিষ্কার করিতে পারে, তাহার কাছে ভোগবিলাস ও সৌন্দর্য একার্থক হইতে পারে না। কিন্তু মঙ্গলের কথা ভুলিলে ভালোমন্দের তর্ক উঠে, Aesthetics হইতে Ethics আসে। লেখক এই প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়াছেন কিন্তু উত্তর দেন নাই ; তবে দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া গিয়া সমস্তই সুন্দর হয় এই তাঁহার বিশ্বাস ; সত্যের যথার্থ উপলব্ধিমাত্রই আনন্দ, তাহাই চরম সৌন্দর্য। মানবের সাহিত্য, সংগীত, ললিতকথা জানিয়া বা না-জানিয়া সত্যের ও সৌন্দর্যের দিকে চলিতেছে। সত্যকে যখন শুধু আমরা চোখে দেখি, বুদ্ধিতে পাই— তখন না, কিন্তু যখন তাহাকে হৃদয় দিয়া পাই তখনি তাহাকে সাহিত্যে প্রকাশ করিতে পারি। শুধু সাহিত্যে নহে, মানব তাহার অন্তরের আনন্দকে সুরে ও রূপে, সংগীতে ও চিত্রে বা স্থাপত্যে মূর্তি দিয়াছে।

লেখক সৌন্দর্যবোধকে মানুষের একটি অখণ্ড পরিপূর্ণ বোধরূপে দেখিয়াছেন ; সুন্দর মঙ্গল ও সত্য সংশ্লিষ্ট হইয়া

বিশ্বসাহিত্য [Comparative Literature] ভাষণ প্রদত্ত— ১৩১৩ মাঘ ১৩ রবিবার (1907, Jan. 27)

তৎকালীন ইংরাজি 'বেঙ্গলী' কাগজে যাহা রিপোর্ট বাহির হইয়াছিল তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

Bengal National College

On *Sunday* last Babu Robindra Nath Tagore delivered the introductory lecture to a series of lectures to be delivered under the title Comparative Literature. Sir Gurudas Banerjee, Babus Ramendra Sundar Trivedi, Lalit Kumar Banerjee, Mohinimohan Chatterjee, Hirendra Nath Dutta, Pandit Sibashan Vidyarnoba, Dr. P. K. Ray, Pandit Tara Kumar Koviratna, Babu Byomkesh Mustafi, Professor N. C. Paw, Babus Sailesh Ch. Mazumdar, Deb Prasad Sarvadhikary and Binay Kumar Bhattacharjee were present.

The lecturer began by referring to the ancient Brahmacharya of India, laying down austerity and strict discipline which in the end proved sweet. Beauty was something above human nature— and the real beauty is in the practice of Brahmacharya. A man amassing rich and money must possess an extraordinary amount of discipline. Individual freedom harmonised with the love for society was the desideratum of the present age. The poet sang that Truth is Beauty and Beauty Truth, and the goddess of learning to the Hindus was both Truth and Beauty The *Upanishads* described this. *The Bengalee, January 30, 1907.*

১ সৌন্দর্যবোধ, বঙ্গদর্শন ১৩১৩ পৌষ, দ্র. সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৮, পৃ ৩৫৫–৩৭২। ইহা জাতীয় শিক্ষাপরিষদের প্রথম বক্তৃতা।

সৌন্দর্যবোধ [aesthetics] ও তাহা হইতে সাহিত্য ও কলার সৃষ্টি হয়।

এখন মানুষ বুদ্ধির যোগে, প্রয়োজনের তাড়নায় ও আনন্দের আবেগে জগতের বিচিত্র সত্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়। বুদ্ধির যোগে সত্যকে পাই, প্রয়োজনের যোগে পাব মঙ্গলকে ; আর আনন্দের যোগে বা সৌন্দর্যের যোগে সমস্ত পার্থক্য ঘুচিয়া আমরা অপরকে আপনার করিয়া জানি এবং আপনাকে পরের করিয়া বোধ করি। দেশে এবং কালে যে-মানুষ যতবেশি মানুষের মধ্যে আপনার আত্মাকে মিশাইয়া নিজেকে উপলব্ধি ও প্রকাশ করিতে পারিয়াছে, সে ততই মহৎ মানুষ। সমস্তের সঙ্গে এই মিলন মানুষের বুদ্ধিপ্রসূত। ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিলে বিজ্ঞান ও দর্শন আর কিছুই নহে, বিষয়ের মধ্যে বুদ্ধির দ্বারা নিজেকেই উপলব্ধি। ইহাকে বলে বুঝিতে পারা। এই দেখাতেই বুদ্ধির আনন্দ। কিন্তু ইহাই চরম নহে ; অন্তরের মধ্যে মনুষ্যত্বের মিলনকে পাইবার জন্যই তাহার আকাঙ্ক্ষা। স্বার্থ, আত্মাভিমানের বাধা ভাঙিয়া যখন মানুষের ধর্ম সমুজ্জ্বল হইয়া পূর্ণসুন্দররূপে সবলে নিজেকে প্রকাশ করে সেখানেই তাহার পরম আনন্দ, সেখানেই বোধের উপলব্ধি অর্থাৎ বুদ্ধির বিষয় বোধের সামগ্রী হয়, বাহিরের জিনিস অন্তরের হয়। মানুষ আপনাকে দুইটি ধারায় প্রকাশ করিতেছে, তাহা কর্মে ও তাহার সাহিত্যে। ইতিহাসে ও সাহিত্যে এই দুয়ের মধ্য দিয়াই মানুষকে পুরাপুরি জানিতে পারা যায়। এই দুইটি ধারা পাশাপাশি চলিতেছে ; মানুষ তাহার গৃহ সমাজ রাষ্ট্র প্রভৃতি বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া আপনার কর্মপ্রেরণার আনন্দকে প্রকাশ করিতেছে। কর্মক্ষেত্রে প্রকাশ করাটাই তাহার আসল লক্ষ্য নহে, ওটা কেবল গৌণফল।

সাহিত্যে ও কলায় মানুষের আত্মপ্রকাশ বাধাহীন। স্বার্থ সেখানে অতিদূরে। "দুঃখ সেখানে আমাদের হৃদয়ের উপর চোখের জলের বাষ্প সৃজন করে কিন্তু আমাদের সংসারের উপর হস্তক্ষেপ করে না ; ভয় আমাদের হৃদয়কে দোল দিতে থাকে, কিন্তু আমাদের শরীরকে আঘাত করে না ; সুখ আমাদের হৃদয়ে পুলকস্পর্শ সঞ্চার করে, কিন্তু আমাদের লোভকে নাড়া দিয়া অত্যন্ত জাগাইয়া তোলে না।"[১] মানুষের যাহা প্রাচুর্য, যাহা ঐশ্বর্য, যাহা তাহার সমস্ত প্রয়োজনকে ছাপাইয়া ওঠে, তাহাই সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশ পায়। সাহিত্যে বিশ্বমানব আপনাকে প্রকাশ করিতেছে।

একদল সাহিত্যিক তাহাদের রচনার মধ্য দিয়া সৌন্দর্য প্রকাশ করিতে গিয়া নিখিল সত্য হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে চান। য়ুরোপে সৌন্দর্যচর্চা সৌন্দর্যপূজা বলিয়া একটা সাম্প্রদায়িক ধুয়া আছে। তাহাদের সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন, "সৌন্দর্যের টান মানুষের মনকে যদি সংসার হইতে এমনই করিয়া ছিনিয়া লয়, মানুষের বাসনাকে তাহার চারি দিকের সহিত যদি কোনোমতেই খাপ খাইতে না দেয়, যাহা প্রচলিত তাহাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রচার করে, যাহা হিতকর তাহাকে গ্রাম্য বলিয়া পরিহাস করিতে থাকে, তবে সৌন্দর্যে ধিক্ থাক্।... সৌন্দর্য জাত মানিয়া চলে না— সে সকলের সঙ্গেই মিশিয়া আছে।"[২]

সৌন্দর্যবোধের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যসৃষ্টি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। সৌন্দর্যবোধ যতই বিকাশ পায় ততই স্বাতন্ত্র্য নহে সুসংগতি, আঘাত নহে আকর্ষণ, আধিপত্য নহে সামঞ্জস্য আমাদিগকে আনন্দ দান করে। মানুষ আপনার আনন্দপ্রকাশের দ্বারা সাহিত্যে কেবল আপনারই নিত্যরূপ, শ্রেষ্ঠরূপ প্রকাশ করিতেছে। এখন সাহিত্যে আমাদিগকে দুই রকম করিয়া আনন্দ দেয়। এক, সে সত্যকে জ্ঞানরূপে দেখায় ; আর-এক, উহা ভাবরূপে প্রকাশ পায়। যিনি হিমালয়কে ভাষার মধ্য দিয়া আমাদের গোচর করিতে পারেন, তিনি কবি। সাহিত্য আমাদের নূতন একটি ইন্দ্রিয়ের মত হইয়া জগৎকে আমাদের কাছে নূতন করিয়া দেখায়। বিশ্বজগৎকে ভাষা দিয়া মানুষের ভিতর দিয়া চালাইয়া লইলে সে আমাদের অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়ে।

১ বিশ্বসাহিত্য, বঙ্গদর্শন ১৩১৩ মাঘ। দ্র. সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৮, পৃ ৩৭২-৩৮৭।

২ সৌন্দর্য ও সাহিত্য, বঙ্গদর্শন ১৩১৪ বৈশাখ। দ্র. সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৮, পৃ ৩৮৭-৩৯৯।

লোকের মনে বিচিত্র ভাব ও ভাবনা অহোরাত্র কী কোলাহলই না করিতেছে, কত বকুনিই সৃষ্টি করিতেছে। "সেই সকল বকুনি কথায়-বার্তায় গল্প-গুজবে, চিঠিপত্রে, মূর্তিতে-চিত্রে, গদ্যে-পদ্যে, কাজে-কর্মে, কত বিচিত্র সাজে, কত বিবিধ আকারে, কত সুসংগত এবং অসংগত আয়োজনে মানুষের সংসারে ভিড় করিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া চলিতেছে, তাহা মনের চক্ষে দেখিলে স্তব্ধ হইতে হয়।"[১] এই অজস্র বাক্যজাল শ্রোতা ও বক্তার যোগেই তৈরি হইয়া উঠে। সাহিত্য কেবল লেখকের নহে— যাহাদের জন্য লিখিত, তাহাদেরও পরিচয় বহন করে। রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, মেঘনাদবধকাব্য প্রভৃতির মধ্য দিয়া সাহিত্যিকের ও সমসাময়িক শ্রোতার ভাবধারা কিভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহারই বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিয়াছেন 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধে।

জাতীয় পরিষদে প্রদত্ত এই চারিটি প্রবন্ধ বারবার ও বহুবার পাঠ না করিলে ইহার সম্যক মর্মার্থ স্পষ্ট হয় না; বহু ভাবনা— যুক্তি, উপমা ও তুলনার দ্বারা প্রবন্ধগুলি এমন জটিলভাবে গ্রথিত যে, কঠোর মনন ব্যতীত উহার জট শিথিল করা সহজসাধ্য নহে।

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতে মৃত্যুকালের দুই মাস পূর্ব পর্যন্ত সাহিত্য সম্বন্ধে যেসব প্রবন্ধ পত্র লিখিয়াছিলেন সেগুলিকে কেন্দ্র করিয়া ক্রিটিক রবীন্দ্রনাথের একটি সুষ্ঠু আলোচনার বিশাল ক্ষেত্র রহিয়াছে। কবির দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে কতখানি প্রাচ্য, কতখানি পাশ্চাত্য— কতখানি তাহার নিজস্ব তাহার সম্যক বিশ্লেষণ হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। ক্রিটিক রবীন্দ্রনাথের দুইটি রূপ— একটি বিশুদ্ধ সাহিত্যের তত্ত্ববিচারকের, অপর একটি বিশেষ গ্রন্থের রস-বিচারকের। কত গ্রন্থের তিনি আলোচনা ও সমালোচনা করিয়াছেন, কত লেখককে পত্রের দ্বারা বিচার ও উৎসাহ দান করিয়াছেন— তাহার বিস্তারিত আলোচনা হইলে সাহিত্য-রসিক বা ক্রিটিক রবীন্দ্রনাথের সমগ্র মূর্তিটি প্রকাশ পাইবে।[২]

১৯০৬ সালে কলিকাতায় জাতীয় রাষ্ট্রসভা বা কন্‌গ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে একটি শিল্পপ্রদর্শনী ও তাহার সহিত একটি সাহিত্য-সম্মিলনও বসিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি। রবীন্দ্রনাথ এই সভায় আহূত হইয়া 'সাহিত্য-সম্মিলন'[৩] সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন। কবি বলিলেন, "গত বৎসর চৈত্রমাসে বরিশাল সাহিত্যসম্মিলনসভা আহ্বান করিয়াছিল। . বরিশালের যজ্ঞকর্তারা আমাকে সম্মানের পদে আহ্বান করিয়াছিলেন। . . আমি যে প্রথম সাহিত্যসভার সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলাম, সে সম্মান আমার পক্ষে আনন্দের সহিত শিরোধার্য" এই সাহিত্য-সম্মিলনকে বরিশাল-সভার অনুবৃত্তি বলা যাইতে পারে। সাহিত্যসম্মিলনের নামে বরিশালে বাংলার নানা দিক হইতে প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিক আসিয়া জুটিয়াছিল। বরিশালের সভা কি ভাবে ভঙ্গ হয় তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। একথা আজ অতি স্পষ্ট যে বাংলাদেশের মধ্যে এই বঙ্গচ্ছেদের জন্য, বাঙালির মধ্যে নানাভাবে মিলিত হইবার একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। দেখিতে দেখিতে বাংলায় কত যে সমিতি, সম্প্রদায় দানা বাঁধিতেছে তাহার ঠিকানা নাই। বাংলার এই বিরাট আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিকদের স্থান খুব উচ্চে ধরিলেন। তিনি বলিলেন, "বাঙালিকে আমরা যে বাঙালি বলিয়া অনুভব করিতেছি, তাহা মানচিত্রে কোনো কৃত্রিম রেখার জন্য নহে।" তাঁহার মতে ইহার মূলসূত্রটি বাংলাভাষা— দেশের এক প্রান্তের বেদনা, দেশের অপর সীমান্ত পর্যন্ত যে লোকে অনুভব করিতেছে— তাহার মূলে রহিয়াছে বাংলার সাহিত্য। সাহিত্য মানুষের যথার্থ মিলনের সেতু।" তিনি সেদিন বিজয়গবে বলিয়াছিলেন, "মনে রাখিতে হইবে, এই মিলনোৎসবের 'বন্দেমাতরম' মহামন্ত্রটি বঙ্গসাহিত্যেরই দান।"

১ সাহিত্যসৃষ্টি, বঙ্গদর্শন ১৩১৪ আষাঢ়। দ্র. সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৮, পৃ ৪০০-৪১৪।

২ দ্র. প্রবাসজীবন চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শন (১৩৬৩)।

৩ সাহিত্যসম্মিলন, বঙ্গদর্শন ১৩১৩ ফাল্গুন। দ্র. সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৮, পৃ ৪৯৩-৫০৬।

বহুবার তিনি যে কথা বলিয়াছিলেন, তিনি তাহাই বলিলেন— 'দেশকে জানো'?। দেশের ইতিহাস, কিম্বদন্তী লোক-ব্যবহার, আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি বিদেশী-লিখিত গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নাই। তিনি বলিলেন, দেশকে ভালোবাসিতে হইলে দেশকে জানিতে হইবে। এইবারকার সাহিত্যসম্মিলনে রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে সেইদিকে মনোযোগ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যামোদী কিন্তু সাহিত্যবিলাসী নহেন; তাঁহার সাহিত্যসাধনা কঠোর পরিশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি নিজে পরিশ্রম-কাতর নহেন, সেইজন্য দেশবাসীর নিকট হইতে কঠিন শ্রমসাধ্য 'স্বদেশী বিবরণ সংগ্রহ' দাবি করিলেন।

সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনারা রবীন্দ্রবাবুকে তাঁহার বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করুন যিনি আমাদের সাহিত্য-গগনের উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর চেয়ে উজ্জ্বলতর নক্ষত্র আর নাই। গদ্যে পদ্যে তাঁর অসীম প্রতিভা। শুধু সাহিত্য ক্ষেত্রে নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তিনি আমাদের একজন প্রধান অধিনায়ক, ইহা তিনি স্বীকার করুন আর নাই করুন। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার উদ্যম অপরিসীম।"[২]

উপরে আমরা যে সাহিত্যসম্মেলনের কথা বলিলাম তাহাকে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন বলিয়া ধরা হয় না।[৩] রবীন্দ্রনাথ ইতঃপূর্বে প্রস্তাব করেন যে বাংলাদেশের স্থানে স্থানে সাহিত্য-পরিষদের শাখা স্থাপন ও বৎসরে বৎসরে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় পরিষদের মিলনোৎসব সম্পন্ন করা বাঞ্ছনীয়। বহরমপুরে যেমন বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল (১৮৯৫) তেমনি এই বৎসর সাহিত্য-সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন স্থির হইল। বরিশালের ব্যর্থ চেষ্টার পর মৈয়মনসিংহ, রঙপুর প্রভৃতি স্থানে সভা হইবার কথা হয়; শেষ পর্যন্ত কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় এই সভা আহ্বান করেন বহরমপুরে। রবীন্দ্রনাথ সভাপতিরূপে অভিভাষণ লেখেন, এমন সময়ে সাহিত্য-সম্মেলনের প্রধান উদ্যোগী ও পৃষ্ঠপোষক সাহিত্যানুরাগী মহারাজার জ্যেষ্ঠপুত্রের অকাল মৃত্যুতে এই সম্মেলন স্থগিত হইল। স্থগিত সভা পর বৎসর বহরমপুরেই হইল।[৪]

সংসার ও স্বদেশ

১৩১৩ সালের শেষদিকে (১৯০৭) হইতে রবীন্দ্রনাথের বেশির ভাগ সময় কাটিতেছে শান্তিনিকেতনে। এবার কবির মন গিয়াছে গদ্য গ্রন্থ সম্পাদনে; ইতিপূর্বে কাব্যগ্রন্থ (১৩১০) সম্পাদিত হইয়াছে। এতদিনে কবির গদ্য রচনার সংগ্রহ ও সম্পাদন-কার্য শুরু হইল। ১৩১৩ সালের শেষদিকে কবি তাঁহার বিচিত্র প্রবন্ধ সম্পাদনে ব্যস্ত; গদ্য-গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড ১৩১৪ সালের আরম্ভে প্রকাশিত হইল; মজুমদার লাইব্রেরি প্রকাশক। এই গ্রন্থমধ্যে লিখিত ছিল "গদ্য গ্রন্থাবলীর উপস্বত্ব বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে উৎসর্গ" করিলেন।[৫] এই 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থমধ্যে খুচরা প্রবন্ধ ব্যতীত পঞ্চভূত, য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী, ও ছিন্নপত্রের কতক অংশ সন্নিবেশিত হয়; বর্তমান সংস্করণে এগুলি বর্জিত হইয়াছে।

১ সাহিত্য-পরিষদ, বঙ্গদর্শন ১৩১৩ চৈত্র। দ্র. সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৮, পৃ ৫০৭-৫১৮।

২ ভাণ্ডার ২য় বর্ষ, ১৩১৩ মাঘ পৃ ৩৬৫।

৩ ঊনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন, ১৩৩৬ ভবানীপুর, পৃ ৫৭।

৪ সাহিত্য-পরিষদ ও বঙ্গদর্শন, ১৩১৩ ফাল্গুন। সাহিত্য-পরিষদ ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্যের জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত পরিষৎ-পরিচয় গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। গ্রন্থপরিচয় রবীন্দ্র-রচনাবলী ৮, পৃ ৫৩৩-৫৪১।

৫ ১৯০৭ হইতে ১৯২২ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থবিক্রয়ের উপস্বত্ব ব্রহ্মচর্যাশ্রম পাইয়াছিল। ১৯২২ সাল পর্যন্ত সমস্ত গ্রন্থ অতঃপর বিশ্বভারতীতে প্রদত্ত হয়। ১৯২২ হইতে ১৯৪১ সালের মধ্যে প্রকাশিত গ্রন্থের স্বত্বাধিকারী হন রথীন্দ্রনাথ।

এই সময়ে আর একখানি গ্রন্থ সম্পাদন করেন 'চারিত্রপূজা'।[১] ইহার প্রথম প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত (১৩০৮ চৈত্র) 'বারোয়ারি মঙ্গল-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। ঐ প্রবন্ধটি পরে 'ভারতবর্ষে'র অন্তর্গত করা হয় (১৩১২)। রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে কবি (১২৯১ সালে) যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তেইশ বৎসর পূর্বে, সেটির বহু অংশ বর্জন করিয়া এই গ্রন্থভুক্ত করিলেন। এ ছাড়া বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ (১৩০২ ও ১৩০৫) ও মহর্ষি সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ ও একটি প্রার্থনা এই গ্রন্থে ছাপানো হয়।

গান ও কবিতা কম; ১৩২৩ সালের প্রথমভাগে খেয়ার কাব্যধারা শেষ হয়, তারপর কাব্যশ্রী বহুকাল নীরব। নূতন বৎসরে গ্রন্থসম্পাদন ছাড়া বিদ্যালয়ের কাজে মন দিতে চেষ্টা করিতেছেন; একখানি পত্রে (১৩১৪ বৈশাখ ৪) লিখিতেছেন, "আমি বিদ্যালয়ের কাজে ক্রমশ বেশি করিয়া জড়িত হইতেছি। অনেক ছাত্র বাড়িয়াছে দায় বাড়িতেছে। তাড়াতাড়ি অনেকগুলি ঘরদুয়ার ফাঁদিতে হইতেছে। ল্যাবরেটোরি ঘরের[২] উপরে একটি দোতলা হইয়াছে— তাহাতেও কুলাইতেছে না। এখনো নানা কাজের জন্য আরো কতকগুলি ঘর নির্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অর্থব্যয়ের আশঙ্কা করিবার অবকাশ পাওয়া গেল না— চারি দিকেই মিস্ত্রি লাগাইয়া দেওয়া গেছে। আর কিছুদিন পরে এখানে আসিলে চিনিতেই পারিবেন না। ইতিমধ্যে আমার ছাত্রদের নীড়ে পানবসন্ত আসিয়া ঢুকিয়াছে— দেখিতে দেখিতে পাঁচ ছয়টি পড়িয়াছে— আরো অনেকগুলি পড়িবে বলিয়া মরিয়া হইয়া বসিয়া আছি। আমার বৃহৎ সংসারটির এই সমস্ত সমস্যা। এখনি অদূরে একটি ছেলে colic বেদনা লইয়া কাঁদিতেছে— আপনাকে মনস্থির করিয়া পত্র লেখা আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছে— ওদিকে ডাকের সময় হইয়া আসিয়াছে।"

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ থাকেন দেহলিতে, জ্যেষ্ঠা কন্যা মজঃফরপুরে স্বামীগৃহে, রথীন্দ্রনাথ আমেরিকায়; শমীন্দ্র ও মীরা থাকেন 'নূতন বাড়ি'তে। বিদ্যালয়ে উভয়েই পড়াশুনা করেন।

এই সময়ে মীরার বিবাহের ব্যবস্থা হইল। নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি নামে সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের একটি যুবক বিলাত যাইবার অভিপ্রায়ে রবীন্দ্রনাথের সমীপে উপস্থিত হন। কবি এই প্রিয়দর্শন তেজস্বী যুবককে দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হন এবং তাঁহাকেই কনিষ্ঠা কন্যা দানের সংকল্প করেন। বিবাহের পর আমেরিকা যাইবার প্রতিশ্রুতি পাইলে নগেন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি মতে বিবাহে সম্মত হন। বিবাহ শান্তিনিকেতন মন্দিরে সম্পন্ন হইল (১৩১৪ জ্যৈষ্ঠ ২৩)। তখন গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ, বিবাহে তেমন জাঁকজমক হয় নাই।

কন্যার বিবাহের পর কবি জামাতা ও কন্যাকে লইয়া বরিশাল গেলেন; নগেন্দ্রের পিতা বামনদাস গাঙ্গুলি স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সুপরিচিত ব্যক্তি। বরিশালে গিয়া রবীন্দ্রনাথ তথাকার সাহিত্যিকদের সহিত মিলিত হইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা স্থাপন করিবার জন্য তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিলেন। ফিরিবার সময় চট্টগ্রাম গিয়া অনুরূপ চেষ্টায় ব্রতী হন।[৩]

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথকে আমেরিকায় পাঠাইয়া দিলেন। এক বৎসর পূর্বে রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্র ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি ও গোপালনতত্ত্ব শিক্ষার জন্য গিয়াছিলেন, কবির ইচ্ছা জামাতাও ঐ সকল বিদ্যা আয়ত্ত করেন ও দেশে ফিরিয়া রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে একসঙ্গে গ্রাম-সেবা ও সংস্কারে যোগদান করেন।[৪]

১ চারিত্রপূজা (১৯০৭ মে)। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪, পৃ ৪৭৭-৫৪১।

২ স্মৃতি, পৃ ৬০। পত্র ৪ বৈশাখ ১৩১৪। বর্তমান লাইব্রেরির মধ্যের ঘরটি ছিল ল্যাবরেটারি। সামনের তিনখানি ঘর ও বারান্দার উপরে নির্মিত হয় (১৯০৭) দোতালায় খড়ের ঘর। পনেরো বৎসর ছাত্রাবাস ছিল। ১৯২২ সালে সেই ঘর ভাঙা হয় ও তাহার স্থানে পাকা দোতালা হয়— এখন লাইব্রেরির অংশ।

৩ পত্র। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখিত, ১১ আষাঢ়। বঙ্গবাণী ৬ষ্ঠ ভাগ ১৩৩৩ চৈত্র, পৃ ১২০।

৪ স্মৃতি পৃ ৬১। পত্র ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪।

আমরা এই পরিচ্ছেদের আরম্ভ ভাগে বলিয়াছি যে, এই সময়ে কবি গল্প-গ্রন্থাবলী সম্পাদন করিতেছেন। মূল রচনা কম। কিন্তু বিবাহাদির 'উদ্বেগ ও ব্যস্ততার মধ্যেও প্রবাসীর জন্য একটা ছোটো গল্প' লিখিতে হইল; গল্পটি হইতেছে 'মাস্টারমশায়।'[১] কোনো সময়ে প্রবাসীর সম্পাদক রামানন্দবাবু কবিকে তিন শত টাকা দিয়া একটি গল্প লিখিবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি কোনো সর্ত দেন নাই, কবির সুবিধামত লিখিয়া দিবার জন্য বলিয়াছিলেন। কিন্তু কবি এই অর্থকে ঋণের ন্যায় মনে করিয়া প্রথম ছোট গল্প ও পরে গোরা উপন্যাস লিখিয়া দিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ করেন।

বহুকাল পরে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পে হাত দিলেন। বঙ্গদর্শনে ১৩০৯ সালের শেষভাগে দুইটি সামান্য গল্প লেখেন; কিন্তু যথার্থ ছোটগল্পের পালা শেষ হয় ভারতীতে ১৯০৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে। শেষ উপন্যাস নৌকাডুবি শেষ হইয়াছিল ১৩১২ সালের আষাঢ় মাসে। প্রায় দুই বৎসর পর কবি গল্প-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। 'মাস্টারমশায়'[২] গল্পটি যেন বিরাট উপন্যাস রাজ্যের প্রবেশোদ্‌বোধন। কারণ এই গল্পের পরেই 'গোরা' আরম্ভ হইল ভাদ্র মাসে।

ছোটগল্পই লিখুন, আর সুবৃহৎ উপন্যাসেরই খসড়া করুন, দেশের রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখে তিনি নীরব ও উদাসীন থাকিতে পারিতেছেন না। আমাদের আলোচ্য পর্বে বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা নানা কারণে অত্যন্ত জটিল রূপ ধারণ করিয়াছে। স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেতাদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থার অভাবে আন্দোলনের গতিবেগ আজ অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত। পূর্ববঙ্গে স্থানে স্থানে স্বদেশী আন্দোলন ও বয়কটকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দুমুসলমানে দাঙ্গা হইতে লাগিল। মুসলমানদের অভিযোগ যে, হিন্দুরা তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ করিতেছে; সস্তা সূক্ষ্ম বিলাতী বস্ত্র এবং সাদা বিলাতী লবণ ও চিনি ক্রয় করিতে তাহারা বাধা পাইতেছে ও তৎপরিবর্তে মোটা দেশী কাপড় ও মেটে দেশী করকচ ও ময়লা শর্করা কিনিতে হিন্দুদের দ্বারা বাধ্য হইতেছে। ইহাই দাঙ্গার প্রত্যক্ষ কারণ বলিয়া সরকারী মহল হইতে প্রচারিত হইল। কিন্তু দেশীয় কাগজে লোকে লিখিয়াছিল যে দাঙ্গা সহজে হয় নাই, অন্য অনেক অদৃশ্য কারণ পশ্চাতে ছিল। মফঃস্বলের নানা স্থানে হিন্দু-মুসলমানের বহু যুগের প্রতিবেশীর স্বাভাবিক সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া জটিল পরিস্থিতির উদ্‌ভব হইতেছিল। আসল কথা, এই সময়ে নিখিল মুসলীম-জগতে আত্মচেতনার যে ভাব দেখা দিতেছিল বাংলাদেশের সমস্যা তাহারই প্রতিক্রিয়ামাত্র। বাংলাদেশের অশিক্ষিত মুসলমানরা যেরূপ মূঢ়ভাবে এতকাল বাস করিয়া আসিতেছিল, তাহা যে অনেকাংশেই ইসলামের বিরোধী— তাহা না জানিত নিরক্ষর মুসলমানরা না বুঝিত প্রতিবেশী হিন্দুরা। ইসলামের নবচেতনার স্পন্দন-তরঙ্গ বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ধ্বনিত হইল।[৩]

এ ছাড়া এই সময়ে মর্লি-মিন্টো শাসন-সংস্কারের কথাবার্তা শুরু হয়; মর্লি ছিলেন ভারতসচিব, মিন্টো তৎকালীন বড়লাট। এই সংস্কারের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল— সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতি সুবিচারের অজুহাতে, মুসলীমদের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় বিশেষ কয়েকটি আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন। অর্থাৎ রাজনীতির মধ্যে ধর্মভেদে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি প্রেরণের প্রথম আয়োজন হইল। যে-ভেদনীতি এতাবৎকাল বে-সরকারীভাবে ইংরেজ

১ মাস্টারমশায়, প্রবাসী ১৩১৪ আষাঢ়, শ্রাবণ। গল্পগুচ্ছ ৫, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৩১৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২, পৃ ৩২৪-৩৫৩।

২ মাস্টারমশায় গল্পটির ইতিকথা কবি বলেন অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্তকে (৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৮); একবার দার্জিলিঙ বাসকালে কোচবিহারের মহারাণী কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতি দেবী তাঁহাদের উড্‌ল্যানড্‌স বাড়িতে গল্প বলিবার জন্য কবিকে অনুরোধ করেন; তখন তিনি মাস্টারমশায় গল্পের ভুতুড়ে ভূমিকা অংশটা বলেন। আর একদিন বলেন 'মণিহারা' গল্পটা। দ্র. প্রমথনাথ বিশীর রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প-এর পুলিনবিহারী সেন -কৃত তথ্যপঞ্জী, পৃ. ৬৫-৬৭। এখানে অন্য রেফারেন্স আছে। মানসী ও মর্ম্মবাণী ১৩২৩ ফাল্গুন, পৃ ১৬-১৭। সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৩য় খণ্ড, পৃ ৩০৭।

৩ ১৯০৬ সালে মুসলীম লীগ গঠিত হয়। মুসলমানদের মধ্যে এই নবজাগরণের ইতিহাস কাজি আবদুল ওদুদ সাহেব 'হিন্দুমুসলমানের বিরোধ' নামক গ্রন্থে (বিশ্বভারতী) অতি বিচক্ষণতার সহিত বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

রাজকর্মচারিগণ পদাধিকারবলে কখনো গোপনে কখনো প্রকাশ্যে প্রয়োগ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহার বিষবীজ সরকারীভাবে কূটনীতিবলে রাজনীতির মধ্যে বপন করিয়া দেওয়া হইল। গত অর্ধশতাব্দী ধরিয়া সাম্প্রদায়িকতার আলবালে সরকারী পরোক্ষ সুনিপুণ জলসেচনের ফলে বিষবীজ এখন সম্পূর্ণ বিষবৃক্ষরূপে ভারতময় গজাইয়াছে এবং তাহার ফল প্রত্যেক ভারতবাসী হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে আজ ভোগ করিতেছে।

আমাদের আলোচ্য পর্ব হইতে ইসলাম-শোধন উপলক্ষে উত্তরভারত হইতে উলেমাগণ পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের মুসলমান-প্রধান অঞ্চলসমূহে যে বাণী প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা হিন্দুমুসলমানের ঐক্য ও মিলনের বাণী নহে। কিন্তু একথা সত্য যে, সেই সময় হইতে ইসলাম সম্বন্ধে যেসব মূঢ় সংস্কার ও ধর্মপালন সম্বন্ধে যেসব শৈথিল্য মুসলমানদের মধ্যে ছিল তাহা দূর হইতে লাগিল। নামাজপড়া, রোজারাখা, জুম্মাবারে মসজিদে যাওয়া, ঈদের দিনে ঈদ্গায় জমায়েত হওয়া, হজ করা, বক্‌রঈদের সময়ে গো-কোরবানী করা প্রভৃতি নানা বিষয় শরিয়াৎ-অনুযায়ী পালনের দিকে দৃষ্টি গেল। যুবক মুসলমানরা তুর্কী ফেজ মাথায় দিল; দরিদ্র মুসলমানরা ধুতির বদলে লুঙ্গি ও শিক্ষিত ও অবস্থাপন্নরা পায়জামা আচকান, শেরবানী প্রভৃতি পোশাক ধরিল; তাহারা যে স্থানীয় অধিবাসী হইতে পৃথক তাহা সকল বিষয়ে স্পষ্ট করিয়া প্রমাণ করিবার জন্য যেন ব্যস্ত। মোট কথা: সর্বত্র মুসলমানদের মধ্যে একটা উদ্ধত আত্মচেতনা দেখা দিল। পূর্বে হিন্দু জমিদার ও তাহার নায়েব গোমস্তাদের, হিন্দু মহাজন ও তাহার কর্মচারীদের যেসব অবজ্ঞাকর ব্যবহার মুসলমানরা নির্জীবভাবে সহ্য করিত, সে সম্বন্ধে তীব্র আত্মসম্মানবোধ জাগিল। কোরান ও শরিয়াত সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশত তাহারা হিন্দুদের যেসব কুসংস্কারকে মূঢ়ভাবে এতাবৎকাল মানিয়া আসিতেছিল, এখন তাহারা সেসব পরিত্যাগ করিল এবং নিজধর্মে ও সংস্কৃতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য সচেষ্ট হইল। বর্ণহিন্দুরা এতকাল অজ্ঞ ও দরিদ্র মুসলমানদের ও হিন্দুদের মধ্যে 'ছোটলোক'দের দাবাইয়া রাখিয়াছিলেন— তাঁহাদের কাছে মুসলমানের পক্ষে নিজধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা গোঁড়ামি ও 'ছোটলোক'দের আত্মোন্নতির ইচ্ছাকে স্পর্ধা বলিয়া প্রতিভাত হইল; তাঁহারা আপশোশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, পূর্বকালে হিন্দুমুসলমানে কী সম্প্রীতিই ছিল— আজ তাহা নষ্ট হইল মুসলমানদেরই দোষে, তাহাদের গোঁড়ামির জন্য— ও সর্বোপরি তৃতীয় পক্ষের উসকানিতে। মুসলমানরা যে আপনা হইতে স্বধর্মে নিষ্ঠাবান হইতে পারে ও নিজস্বার্থ বুঝিতে পারে, এটুকু শ্রদ্ধাও ধনিক বর্ণহিন্দুরা মুসলমানদের সম্বন্ধে পোষণ করিতেন না। বর্ণহিন্দুদের অত্যাচার ও অবিচারের ফলেও যে প্রতিক্রিয়া হইতে পারে এবং তাহা যে ধর্মসংগত প্রতিক্রিয়া, সে বোধটুকু ইহাদের ছিল না। 'অস্পৃশ্য' হিন্দু ও 'ম্লেচ্ছ' মুসলমানকে কোনোদিন আপনার করিবার কোনো চেষ্টা হিন্দুরা করেন নাই, কোনোদিন নিজেদের আচার-ব্যবহারকে যুগধর্মানুযায়ী সংস্কৃত ও আধুনিক কালোপযোগী সচল করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই— সকল দোষ অপর পক্ষের উপর বা বাহিরের উপর চাপাইয়া নিজেরা নিশ্চিন্ত থাকিলেন। বর্ণহিন্দুরা ভাবিতেও পারিলেন না যে, তাঁহারা যাহাকে স্পর্শ করিতেছেন না, তাহারা তাঁহাদিগকে একদিন জোর করিয়াও স্পর্শ করিতে পারে।

দেশের এইসব গুরুতর সমস্যা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নীরব থাকিতে পারিলেন না। নেতাদের কর্মপদ্ধতির সহিত কিছুতেই মনের সঙ্গে সাড়া দিতে পারিতেছেন না। মুক্তি বলিতে তিনি বুঝেন মানুষের সকল প্রকার বন্ধন মুক্তি— যে-মুক্তি কেবল রাষ্ট্রনীতিতে সীমাবদ্ধ নহে, যে-মুক্তি ধর্মে সমাজে সমভাবে সকল মানবকে স্বীকার করে তিনি সেই অন্তরের মুক্তিকামী। তিনি 'ব্যাধি ও প্রতিকার' শীর্ষক প্রবন্ধে বলিলেন, বাহিরের শত্রুকে বাক্যের দ্বারা উদব্যস্ত

১ ব্যাধি ও প্রতিকার, প্রবাসী ১৩১৪ শ্রাবণ, পৃ. ২৩৫-৪১। দ্র. সমূহ, পরিশিষ্ট রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ. ৬২৩-৬৩৫। বৈশাখ ১৩০৮ সালে ঐ নামে বঙ্গদর্শনে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় (দ্র. সমাজ, পরিশিষ্ট রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২, পৃ. ৪৮৯)। দেবকুমার রায় চৌধুরী ১৩১৪ জ্যৈষ্ঠ মাসে সমসাময়িক রাজনীতির আলোচনা করিয়া 'ব্যাধি ও প্রতিকার' নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই বইখানি শ্রাবণ মাসের শেষাশেষি কবির হস্তগত হয়। তিনি একখানি পত্রে (২১ শ্রাবণ ১৩১৪) বলেন যে, তিনি সেইদিনই বইখানি পাঠ করিয়া অতীব তৃপ্ত হইয়াছিলেন। প্রবাসী ১৩১৪ আশ্বিন, পৃ ৩৪২।

করিবার চেষ্টা না করিয়া, অন্তরের মধ্যে যে যে বাধার দ্বারা মানুষকে কাছে টানিতে পারিতেছে না— সেই বাধাকে দূর করিবার চেষ্টা করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আজ হিন্দু মুসলমানকে সম্প্রীতির চোখে দেখিতে পারিতেছে না, মুসলমানও হিন্দুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে ভয় পাইতেছে— এই যে পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস ইহাই আজ আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধানতম বিপদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এতদিন নেতারা মনে করিয়াছিলেন যে এই সংগ্রাম ও সাধনার যত কিছু বাধা সমস্তই বাহিরের শৃঙ্খলটা, কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে "নিজেরাই নিজেদের দলনের উপায়, অগ্রসর হইবার প্রতিবন্ধক।"

রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন, স্বদেশকে উদ্ধার করিতে হইবে কাহার হাত হইতে? উত্তরে বলিলেন, "নিজেদের পাপ হইতে।" এ কথা যে কত সত্য তাহা চল্লিশ বৎসর পরে দেশহিতৈষীরা প্রতিদিন মর্মে মর্মে বুঝিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন যে, আত্মকলহ, অন্তরের পাপ দূর না হইলে ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। তাই তিনি বাংলার যুবকগণকে বলিলেন, বাহিরের সমস্ত উত্তেজনা চঞ্চলতা ভুলিয়া গিয়া, সকল আশা ভরসা বিসর্জন দিয়া নিভৃত গ্রামের মধ্যে যাও। "একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া যাহাকে কেহ কোনোদিন ডাকিয়া কথা কহে নাই, তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আশা দাও, তাহার সেবা করো; তাহাকে জানিতে দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে, সে জগৎসংসারের অবজ্ঞার অধিকারী নহে। অজ্ঞান তাহাকে নিজের ছায়ার কাছেও ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে সেই সকল ভয়ের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার বক্ষপট প্রশস্ত করিয়া দাও। তাহাকে অন্যায় হইতে, অনশন হইতে অন্ধসংস্কার হইতে রক্ষা করো। নূতন বা পুরাতন কোনো দলই তোমার নাম না জানুক, যাহাদের হিতের জন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছ প্রতিদিন তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস ঠেলিয়া এক-পা এক-পা করিয়া সফলতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকো।"

আসল কথা রবীন্দ্রনাথের কাছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য বিশেষ কোনো পথ নাই; মানুষের মনকে মুক্ত করিলে সে সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা পায়। দেশের লোক রবীন্দ্রনাথের সহিত একমত হইতে পারিলেন না। কারণ উত্তেজনা হইতে মুখ ফিরাইয়া সংহতভাবে কাজকরাকে 'কাজ' বলিয়া মনে করিবার মত মনোভাব দেশে তখন আসে নাই। এমনকি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মত লোকও ইহার প্রতিবাদ[১] করিলেন; এই প্রবন্ধে ত্রিবেদী মহাশয়ের যেখানটিতে লাগিয়াছিল, সেটা হইতেছে রবীন্দ্রনাথের সমাজ সম্বন্ধে বিপ্লবী মত প্রচার। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে হিন্দুদের গোঁড়ামিকে খুবই আক্রমণ করেন এবং বলেন যে, হৃদয়ের যেখানে পরিবর্তন হয় নাই সেখানে কেবল একটা রাজনৈতিক অভীষ্টসিদ্ধির জন্য অকস্মাৎ 'জনসাধারণে'র কাছে অগ্রসর হইলে তাহারা সন্দিগ্ধ হইবেই; কারণ এতকাল যে-সম্বন্ধ ছিল তাহার মধ্যে এই প্রীতির লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। মুসলমানদিগকেও আমরা সেইরূপ সামাজিক অস্পৃশ্যতার মধ্যে রাখিয়াছি। ত্রিবেদী মহাশয় হিন্দুধর্ম ও সমাজের এই বৈশিষ্ট্যকে নিষ্ঠার সহিত বিশ্বাস করিতেন; তাঁহার মতে ব্যক্তির আহার-বিহারাদি ব্যাপারে প্রত্যেকে নিজ নিজ সমাজগত প্রথার দ্বারা চালিত হইলে কাহাকেও দোষী করা অন্যায়। সুতরাং এই ভেদবুদ্ধি অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধাজনিত নহে, ইহা আচারমাত্র। রাজনৈতিক ব্যাপারে এইসব প্রশ্ন উত্থাপিত করিলে সমাধানের আশা কমই।

ত্রিবেদী মহাশয় লিখিলেন, "দু-বৎসর ধরিয়া মাতামাতির পর কতকটা স্নায়বিক অবসাদে কতকটা ইংরেজের ভ্রূকুটিদর্শনে আমরা এখন ঠাণ্ডা হইয়া পড়িতেছি। রবিবাবুও সময় বুঝিয়া আমাদিগকে বলিতেছেন, মাতামাতিতে বিশেষ কিছু হইবে না, এখন কাজ করো।

"আজ যিনি আমাদিগকে আস্ফালনে ক্ষান্ত হইবার জন্য উপদেশ দিতেছেন, বাংলার ইতিহাসে এই নূতন অধ্যায়ের

১ প্রবাসী ১৩১৪ আশ্বিন।

আরম্ভে আমি তাঁহারই কৃতিত্ব দেখিতে পাইতেছি। ইংরেজের নিকট 'আবেদন নিবেদন' করিয়া তাহার প্রসাদ গ্রহণ করিলে কিছুই স্থায়ী লাভ হইবে না, ইংরেজের মুখাপেক্ষা না করিয়া আপনার বলে ও আপনার চেষ্টায় যেটুকু পাওয়া যায়, তাহাই স্থায়ী লাভ, বঙ্গবিভাগের কিছুদিন পূর্ব হইতে তাঁহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত উচ্চ ও অত্যন্ত তীব্র হইয়া মুহুর্মুহু ঐ কথা আমাদের কানে প্রবেশ করাইতেছিল। . .

"স্বদেশীর আগুন যখন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তখন রবীন্দ্রনাথের লেখনী তাহাতে বাতাস দিতে ত্রুটি করে নাই। বেশ মনে আছে, ৩০শে আশ্বিনের পূর্ব হইতে হপ্তায় হপ্তায় তাঁহার এক-একটা নূতন গান বা কবিতা বাহির হইত, আর আমাদের স্নায়ুতন্ত্র কাঁপিয়া আর নাচিয়া উঠিত। নিস্ফল ও অনাবশ্যক আন্দোলনে তিনি কখনোই উপদেশ দেন নাই ; কিন্তু সে-সময়টায় যে উত্তেজনা ও উন্মাদনা ঘটিয়াছিল, তাহার জন্য রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব নিতান্ত অল্প ছিল না।

"উত্তেজনার বশে আমরা দুই বৎসর ধরিয়া ইংরেজের অনুগ্রহ লইব না, ইংরেজের শাসনযন্ত্র অচল করিয়া দিব বলিয়া লাফালাফি করিয়া আসিতেছি ; এবং ইংরেজরাজা যখন সেই লাফালাফিতে ধৈর্যভ্রষ্ট লইয়া লগুড় তুলিয়া আমাদের গলা চাপিয়া ধরিয়াছেন, তখন আমাদের সেই অস্বাভাবিক আস্ফালনের নিষ্ফলতা দর্শনে ব্যথিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন— ও-পথে চলিলে হইবে না— মাতামাতি-লাফালাফির কর্ম নহে, নীরবে ধীরভাবে কাজ করিতে হইবে। . . রবিবাবু কেবল 'কাজ করো' 'কাজ করো' বলিয়া উপদেশ দিয়া চীৎকারের মাত্রাই বাড়াইতেছেন না বরং কোন্ পথে কাজ করা যাইতে পারে, তাহার দুই-একটা নমুনাও নিজের হাতে লইয়া দেখাইতেছেন।"[১]

রবীন্দ্রনাথ দেশের কাজের যে ফর্দ দিয়াছিলেন, তাহার বাধা কোথায় তাহাও এই প্রবন্ধে ত্রিবেদী মহাশয় দেখাইতে চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন, সরকার যেখানে প্রবল পক্ষ ও বিরোধী, সেখানে দেশের 'কাজটা' যেদিন খুশি বন্ধ হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ 'ব্যাধি ও প্রতিকারে'র এক জায়গায় বলিয়াছিলেন রাজার হাতে দেশের কাজ দেওয়াটা ঠিক হয় নাই। কর্মভার স্বহস্তে গ্রহণ করা ইহাই স্বদেশী আন্দোলনের মজ্জাগত শিক্ষা। ত্রিবেদী মহাশয় দেখাইলেন যে, ইংরেজ ভারতবাসীর মতের অপেক্ষা না করিয়া "আমাদের হিতচিকীর্ষাপ্রণোদিত হইয়া আমাদের হাত হইতে সকল কাজই ক্রমশ স্বহস্তে গ্রহণ করিতেছেন।"

কলিকাতার মধ্যে উত্তেজনার অন্ত নাই, নরমপন্থী বা মডারেট ও চরমপন্থী বা একস্ট্রিমিস্ট বা বামপন্থীদের মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শবাদ লইয়া মতভেদ ক্রমেই স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বেঙ্গলি' দৈনিক, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সম্পাদিত 'হিতবাদী' সাপ্তাহিক ছিল মডারেটদের মুখপত্র। অপর দিকে মতিলাল ঘোষ সম্পাদিত 'অমৃতবাজার পত্রিকা', কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত 'সঞ্জীবনী' ছিল তথাকথিত বামপন্থীদের প্রচারপত্র। কিন্তু উগ্রতর মতবাদ প্রচারের পক্ষে এইসব কাগজ যথেষ্ট না হওয়ায় বরিশালবাসী ও তদধুনা গিরিডি-প্রবাসী অশ্রমালিক মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা 'নবশক্তি' নামে সাপ্তাহিক প্রকাশ করিলেন (১৯০৭)। শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্রের 'সুপ্রভাত' মাসিক এই নূতন যুগের রুদ্রবাণী লইয়া প্রকাশিত হইল। এই মাসিকের জন্য 'শিখের বলিদান' নামে যে প্রবন্ধধারায় তিনি শিখদের বীরত্ব কাহিনী প্রকাশ করেন তাহা সেযুগের প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত যুবকই পাঠ করিয়াছিলেন। উহার ফলে গ্রন্থখানি সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। এই 'সুপ্রভাত' পত্রিকার জন্য কবি সুপ্রভাত নামে একটি কবিতা রচনা করেন।[২]

কিন্তু সকল শ্রেণীর উগ্রতাকে ম্লান করিয়া যথার্থ বিপ্লববাদ প্রচার করিবার জন্য বাহির হইল 'যুগান্তর' সাপ্তাহিক ও 'সন্ধ্যা' দৈনিক। উপাধ্যায় ছিলেন উভয় পত্রিকারই সহিত যুক্ত। 'যুগান্তর' লিখিত হইত শিক্ষিত যুবকদের জন্য

১ প্রবাসী ১৩১৪ আশ্বিন। দ্র গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ৬৬৪-৬৫।

২ ৮ বৈশাখ ১৩১৪, শান্তিনিকেতন, পূরবী ১ম সংস্করণ, পৃ ২৫১-৫৪। পরে এই কবিতাটি পূরবী হইতে বর্জিত হইয়া 'সঞ্চয়িতা'য় স্থান পাইয়াছে।

আর 'সন্ধ্যা' লিখিত হইত অল্পশিক্ষিত সাধারণের জন্য। উপাধ্যায়ের ইচ্ছা ছিল তিনি একখানি ইংরেজি দৈনিকও প্রকাশ করেন; কিন্তু অর্থাভাবে তাহা সম্ভব হয় নাই। ইতিমধ্যে কালীঘাটের বিখ্যাত হালদার-পরিবারের হরিদাস হালদার[1] 'বন্দেমাতরম্' নাম দিয়া একখানি ইংরেজি সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য অগ্রসর হইলেন; সংবাদপত্রখানি সন্ধ্যা মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইবার ব্যবস্থা হইল (১৯০৬ অগস্ট ১)। অতঃপর অক্টোবর মাসে বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে লইয়া সম্পাদক-সংঘ গঠিত হয়। বিপিনচন্দ্র সম্পাদক-প্রধান। নবগঠিত জাতীয় দলের মুখপত্ররূপে India for Indians মন্ত্র লইয়া 'বন্দেমাতরম্' দৈনিক কাগজে পরিণত হইয়া বাহির হইল। এইসব পত্রিকাদির মারফত যুবকদের মধ্যে যে বিপ্লবাত্মক চিন্তা দেশময় প্রসার লাভ করিয়াছিল তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই। India for Indians হইতেছে মহাত্মাজীর Quit India মন্ত্রের অগ্রবাণী।

অরবিন্দকে আজ সকলে পণ্ডিচেরির সাধক 'শ্রীঅরবিন্দ' রূপেই দেখিতেছেন; কিন্তু চল্লিশ বৎসর পূর্বে তিনি ছিলেন বিপ্লববাদের হোতা। বাংলাদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হইলে তিনি বরোদা রাজকলেজের কাজ ছাড়িয়া সামান্য বেতনে নবপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষাপরিষদের কলেজবিভাগে ইংরেজির অধ্যাপক পদ গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় আসেন। অতঃপর ১৯০৭ মার্চ মাসে (১৩১৩ ফাল্গুন) 'বন্দেমাতরম্' ইংরেজি দৈনিকের ভার গ্রহণ করিয়া অচিরকালের মধ্যে শিক্ষাপরিষদের সহিত সম্বন্ধছিন্ন হইলেন; তদনন্তর তিনি দার্শনিক বিপ্লববাদ প্রচারে আত্মনিয়োগ করিলেন।

অল্পকালের মধ্যে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার কোনো প্রবন্ধকে রাজদ্রোহাত্মক ঘোষণা করিয়া বঙ্গীয় গবর্মেন্ট অরবিন্দকে উহার রচয়িতা প্রমাণের জন্য পত্রিকার বিরুদ্ধে এক মামলা খাড়া করিলেন।[2] বিপিনচন্দ্র পাল পত্রিকার সম্পাদকরূপে সাক্ষ্য দিবার জন্য আহূত হন। আদালতে অরবিন্দের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার সাক্ষ্য দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় বিপিনচন্দ্রকে 'আদালতের অপমান' করা অপরাধে ছয়মাস কারাবরণ করিতে হইল।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে; 'বন্দেমাতরম্'-এর মামলার গতি প্রতিদিন লক্ষ্য করিতেছেন। অরবিন্দের প্রতি সমগ্র দেশের দৃষ্টি নিবদ্ধ, অথচ মোকদ্দমা বিচারাধীন বলিয়া কেহ কোনো প্রকার মন্তব্য বা মতামত প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। দেশের সেই উৎকণ্ঠিত আবেগ রবীন্দ্রনাথের বাণীমধ্যে প্রকাশ পাইল। রবীন্দ্রনাথ 'নমস্কার' কবিতায় (৭ ভাদ্র ১৩১৪) অরবিন্দের প্রতি তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধা ও দেশের আশাকে ব্যক্ত করিলেন।[3]

অরবিন্দের উদ্দেশে কবিতাটি লিখিবার দুই দিন পরে আমেরিকায় রথীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন, "Statesman কাগজের চাঁদা ফুরলেই আর পাঠাব না। এখন থেকে 'বন্দেমাতরম্' কাগজ পাঠাতে থাকুব। ওটা খুব ভাল

১ "কালীঘাটের হরিদাস হালদারকে জান? লোকটি লিখতে পারে সন্দেহ নেই। আমাকে তাঁর রচিত 'গোবর গণেশের গবেষণা' বলে একখানা বই পাঠিয়েচেন— আমার তো পড়ে ভাল লাগ্‌ল। মনে হল অনেকটা সবুজপত্রের কায়দায় লেখা—অর্থাৎ খুব হালকা এবং উজ্জ্বল— লোকটার সাহসও আছে। তোমরা এঁকে যদি পাকড়া কর তো মন্দ হয় না।" প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পত্র [১৩ এপ্রিল ১৯১৫] চিঠিপত্র ৫, পত্র, ৩৯ পৃ ১৯৫।

২ ১৯০৭, ১৬ আগষ্ট অরবিন্দ গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে জানিতে পারিয়া পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন ও জামিনে মুক্তি পান। ইতিপূর্বে ২ আগষ্ট তিনি জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অধ্যক্ষ পদে ইস্তফা দিয়া পত্র দিয়াছিলেন। ২১ আগষ্ট তিনি বিদ্যালয় হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ২৪ আগষ্ট শান্তিনিকেতন হইতে অরবিন্দের উদ্দেশ্যে কবিতা লেখেন। ২৩ সেপ্টেম্বরে মামলার রায় প্রকাশিত হইল, অরবিন্দ মুক্তি পাইয়াছেন।

৩ নমস্কার। 'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার'। [শান্তিনিকেতন ২৪ অগস্ট ১৯০৭] বঙ্গদর্শন ১৩১৪ আশ্বিন। কবিতাটি কবির কোনো কাব্যখণ্ডে সংগৃহীত হয় নাই। বহুকাল পরে ১৩৩২ সালে পূরবীতে সঞ্চয় অংশে সংযোজিত হয়। পূরবীর দ্বিতীয় সংস্করণে পুনরায় পরিত্যক্ত হয়। তবে সঞ্চয়িতার মধ্যে উহা আছে। দ্র. গিরিজাশঙ্কর, অরবিন্দ, পৃ ৬০৬।

কাগজ হয়েচে। কিন্তু অরবিন্দকে যদি জেলে দেয় তাহলে ও কাগজের কি দশা হবে জানিনে। বোধ হয় জেল থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে না। আমাদের দেশে জেল খাটাই মনুষ্যত্বের পরিচয়স্বরূপ হয়ে উঠ্‌চে। জেলখানার ভয় না ঘোচাতে পারলে আমাদের কাপুরুষতা দূর হবে না। দু চারজন করে জেলে যেতে যেতে ওটা অভ্যাস হয়ে যাবে।...আমাদের ভদ্রসমাজের তেমনি একটা নিত্যনৈমিত্তিক অনিবার্য আধিব্যাধির মধ্যে গণ্য হয়ে উঠবে।"[১]

এই সময়ে 'বন্দেমাতরম'-এর বিরুদ্ধে যেমন রাজদ্রোহের মামলা চলিতেছিল; তেমনি চলিতেছিল 'সন্ধ্যা'র বিরুদ্ধে, সেখানে আসামী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ১৯০২ সালে ব্রহ্মবিদ্যালয় ছাড়িবার পর উপাধ্যায়ের জীবনের ও মতের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে; শেষ দিকে কবির সহিত তাঁহার দেখাসাক্ষাৎ কমই হইত। বিচারাধীন অবস্থায় উপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়।

দেশের মধ্যে নানা প্রকারের অশান্তি চলিতেছে। রবীন্দ্রনাথ এইসবের সহিত এখন আর তেমনভাবে যুক্ত নহেন। বেশির ভাগ সময়ই শান্তিনিকেতনে কাটিতেছে, বিদ্যালয়ের কাজ দেখেন, "গোরা" লেখেন। 'খেয়া' প্রকাশের পর দীর্ঘকাল কবির কাব্য-লিখনী প্রায় স্তব্ধ। নূতন বৎসরের (১৩১৪) প্রারম্ভ হইতেই কাব্যলক্ষ্মীর সাক্ষাৎ ক্ষণে ক্ষণে হইতেছে বটে, তবে তাহা বিষাদে আঁধার। কবির স্বাস্থ্য এই সময়ে খুবই খারাপ, অর্শে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। কতকগুলি গানের মধ্যে দুঃখকে মাথা পাতিয়া লইবার বা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য আকূতি অত্যন্ত স্পষ্ট। অহেতুকী দুঃখের আবাহনে তাঁহার আনন্দময় অধ্যাত্মবাদ ম্লান। আবার মনে হয়, জীবনে দুঃখকে বহন করিবার জন্য এ যেন শক্তির আবাহন। আসন্ন দুঃখকে কবি যেন পূর্বাহ্ণেই অনুভব করিতেছেন। তাই কি তিনি 'দুর্দিন'[২] কবিতায় লিখিলেন—

তবে এসো, হে মোর সুদুঃসহ,
ছিন্ন করে জীবন লহ,
বাজিয়ে তোলো ঝঞ্ঝাঝড়ের ঝঞ্ঝনা,
আমায় দুঃখ হতে কোরো না বঞ্চনা।
আমার বুকের পাঁজর টুটে
উঠুক পূজার পদ্ম ফুটে,
...
ওরে আয় রে ব্যথা সকল-বাধা-ভঞ্জনা।

ভাবুক-রবীন্দ্রনাথ দেশের সমস্যা লইয়া রাজনীতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন, সাহিত্যিক-রবীন্দ্রনাথ পত্রিকার জন্য মাসে মাসে উপন্যাসের কিস্তি পাঠান ও শিক্ষক-রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের কাজকর্ম লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকেন। কিন্তু সংসারী রবীন্দ্রনাথকে অন্তরবাহিরের সকল চাহিদা মিটাইয়া পরিবারের ছোট বড় সব কাজই দেখিতে হয়। কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথের আমেরিকা রওনা হইবার অল্পকাল মধ্যে মীরা অসুস্থ হইয়া পড়িলে কবি তাহাকে লইয়া অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন। মধ্যমা কন্যা রেণুকার বিবাহের পরই কালব্যাধির লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। আজ কবির মন নিশ্চয়ই কোনো দূরাগত অমঙ্গলের আশঙ্কায় আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে মীরার চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় যাইতে হইল।

এমন সময়ে শিলাইদহের জমিদারী অঞ্চল হইতে "ডেপুটি বাহাদুরের ভ্রূকুটির অন্তরালে একটুখানি বৈষয়িক

১ চিঠিপত্র ২, পৃ ৫। শান্তিনিকেতন। ৯ই ভাদ্র ১৩১৪।
২ দুর্দিন, বঙ্গদর্শন, ১৩১৪ শ্রাবণ। দ্র. পূরবী, ১ম সংস্করণ।

মেঘগর্জ্জন শোনা গেল।" ডেপুটির ক্ষোভ শান্ত করিবার জন্য জমিদার-রবীন্দ্রনাথকে যথাস্থানে যাইতে হইল। জমিদারীর বৈষয়িক কাজকর্ম সমাধান হইয়া গেলেই কলিকাতায় ফিরিবেন এই ছিল কবির মনের কথা, কিন্তু সংসার হইতে দূরে প্রকৃতির শুশ্রূষা লাভ করামাত্র কবি-রবীন্দ্রনাথের মনের সকল আশঙ্কাই যেন দূর হইয়া গেল। তিনি লিখিতেছেন, "ইতিমধ্যে পদ্মা আমার মনোহরণ করে বস্‌ল এখন পড়ে পড়ে জলকল্লোল শুনচি। কর্ম্মের উপলক্ষ্যে আগমন বটে কিন্তু অত্যন্ত অকর্ম্মণ্যভাবে দিনক্ষেপ করচি।"[১]

ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ের ছুটি হইয়া গেল; কবি শিলাইদহ হইতে শান্তিনিকেতন না গিয়া কলিকাতায় রহিয়া গেলেন; মীরা তখনো সুস্থ হইয়া উঠে নাই। এমন সময়ে বহরমপুর 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে'র সভাপতিত্ব করিবার জন্য কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর নিকট হইতে আহ্বান আসিল। মীরার পীড়ার জন্য খুব উদ্বিগ্নমনা ছিলেন বলিয়া প্রথমে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু পরে সম্মতি দান করিয়া পত্র দেন। —২৪ আশ্বিন ১৩১৪ [২]।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের ব্যবস্থা হয় বরিশালে ১৩১৩ সালের নববর্ষে; কবিই ছিলেন মনোনীত সভাপতি। সে-সভা কেন বসিতে পারে নাই, তাহার আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ঐ বৎসরের শেষভাগে সভা আহূত হয় বহরমপুরে; সেখানেও রবীন্দ্রনাথের সভাপতি হইবার কথা ছিল। ঐ সভা বন্ধ হয় নিমন্ত্রণকর্তা মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের এক পুত্রের অকালমৃত্যুর জন্য। এইবার পূজাবকাশে কালীপূজার সময়ে ঐ মুলতুবী সভার অধিবেশন হইল (১৭-১৮ কার্তিক ১৩১৪)। কবি বহরমপুরে ১৬ই পৌঁছিলেন ও ১৯শে কলিকাতায় ফিরিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে লিখিতেছেন (২০শে), "বহরমপুরে চারিদিন কাটিয়ে কাল ফিরেছি। কদিনের অনিয়মে ও অর্শের প্রচুর রক্তপাতে আজ বড় ক্লান্ত ও দুর্বল আছি।"[৩]

পূজার ছুটি হইলে এবার কবির কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ তাঁহার বন্ধু শ্রীশচন্দ্রের পুত্র (ভোলা) সরোজচন্দ্রের সহিত মুঙ্গেরে তাহার মামার বাড়িতে গিয়াছিল। সেইখানে শমীন্দ্রের কলেরা হয়; কবি টেলিগ্রাফ পাইয়া কলিকাতা হইতে মুঙ্গেরে চলিয়া গেলেন, বোলপুর হইতে ভূপেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইলেন। মুঙ্গেরে ৭ই অগ্রহায়ণ শমীন্দ্রের মৃত্যু হইল।[৪]

ঠিক পাঁচ বৎসর পূর্বে ঐদিনে কলিকাতায় শমীন্দ্রের মায়ের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় শমীর বয়স ছিল ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র। শমীন্দ্র পিতার বড়ই প্রিয় ছিলেন, আকৃতিতে পিতার অনুরূপ। এই শোক কবির দারুণভাবে লাগিয়াছিল, কিন্তু শোকের প্রকাশ কোথাও নাই। তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের একটি বড় বাঁক ফিরিল। ইহার পর হইতে কবির নিরুদ্ধ শোক আধ্যাত্মিক সান্ত্বনারূপে নবকলেবরে অল্পকাল মধ্যে সাহিত্যে মুক্তি লাভ করিল।

কয়েকদিন পরে বিলাতপ্রবাসী বন্ধু জগদীশচন্দ্রের পত্নী অবলা দেবীকে কবি যে পত্র লেখেন তাহাতে তাঁহার এই শোকাঘাত জীবনে কিভাবে সার্থক হইয়াছে, তাহার অস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন,[৫] "আপনারা চলে যাওয়ার পরে অল্প দিনের মধ্যে খুব একটা বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে এসেছি। এই বিপ্লবটাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে

১ স্মৃতি, পৃ ৬৪। ২৮ ভাদ্র ১৩১৪।

২ সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র, পৃ ১৬০-১৬৪।

৩ পত্র, ২০ কার্তিক ১৩১৪। দেশ, শারদীয় সংখ্যা ১৩৪৯, পত্র সংখ্যা ১৭।

৪ স্মৃতি পৃ ৬৭। পত্র ১৯ অগ্রহায়ণ ১৩১৪ [১৯০৭ ডিসেম্বর ৫] "যে সংবাদ শুনিয়াছেন তাহা মিথ্যা নহে। ভোলা মুঙ্গেরে তাহার মামার বাড়ীতে গিয়াছিল, শমীও আগ্রহ করিয়া সেখানে বেড়াইতে গেল—তাহার পরে আর ফিরিল না।" মুঙ্গেরের বিস্তৃত বিবরণীর জন্য দ্রষ্টব্য শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যালের রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ। দেশ, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৪৯ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রস্মৃতি, দেশ ১৩৪৯ শ্রাবণ ২৩।

৫ রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী, শ্রীযুক্তা অবলা বসুকে লিখিত, প্রবাসী ১৩৪৫ শ্রাবণ, পৃ ৪৬৬। চিঠিপত্র ৩, পত্র সংখ্যা ৬। এপ্রিল ১৯০৮, পৃ ৯০।

দেখতে গেলে এটা যত বড় উৎকট আকার ধারণ করে, জীবনের সমগ্রের সঙ্গে মিলে মিশে এটা তত প্রচণ্ড নয়। যে-ব্যাপারটা কল্পনায় নিতান্তই দারুণ এবং অসঙ্গত বোধ হয় সেটাও ঘটনায় এমনভাবে আপনার স্থান গ্রহণ করে যেন তার মধ্যে অপ্রত্যাশিত কিছুই নেই। সেই জন্যে সমস্ত আঘাত কাটিয়ে, জীবনযাত্রা যেমন চল্‌ছিল তেমনই চলছে; হয়ত একটা পরিবর্ত্তন ঘটেছে— কিন্তু সে পরিবর্ত্তন উপর থেকে দেখা যায় না— সে পরিবর্ত্তন নিজের চোখেও হয়ত সম্পূর্ণভাবে লক্ষ্যগোচর হতে পারে না।"

মুঙ্গের হইতে কলিকাতায় ফিরিবার পথে শান্তিনিকেতনে একদিন থাকিয়াই চলিয়া গেলেন। ১৭ অগ্রহায়ণ ভূপেন্দ্রনাথকে পত্র দ্বারা আশ্রমের যথাযথ কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া ২০শে শিলাইদহে চলিয়া গেলেন। সঙ্গে মীরা ও বেলা; রথীন্দ্রনাথ তো আমেরিকায়।

এবার শিলাইদহে কবি দীর্ঘকাল থাকিলেন— প্রায় পাঁচ মাস। শান্তিনিকেতনে পৌষ-উৎসবে আসিলেন না, মাঘোৎসবের দুই দিন পূর্বে কলিকাতায় আসিলেন, উৎসবান্তেই শিলাইদহে ফিরিয়া গেলেন। বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ভার ভূপেন্দ্রনাথের উপর, তাঁহাকে নিয়মিত পত্র দেন। বিদ্যালয় সম্বন্ধে তাঁহার কী উদ্‌বেগ তাহা পত্রগুলি পাঠ করিলে বুঝা যাইবে। এইবারে শিলাইদহে বাসকালে কবির লেখনী তেমন চঞ্চল নহে; তবে 'গোরা' নিয়মিত লিখিতেছেন। যে কবিতা ও গীতধারা বৎসরের প্রারম্ভ ভাগে দেখা গিয়াছিল, তাহার বেগ অত্যন্ত ক্ষীণ। শিলাইদহে আসিয়া কয়েকটি গান লেখেন। গান কয়টি— 'অন্তর মম বিকশিত কর' (২৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৪), 'প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে' এবং বোধ হয় 'তুমি নব নব রূপে'[১] কবির অন্তর দুঃখের দাহে যে স্বর্ণ-ঔজ্জ্বল্য লাভ করিতেছিল, তাহার প্রথম প্রকাশ হইল মাঘোৎসবের ভাষণে। উহার নাম 'দুঃখ'[২]— শিলাইদহে বসিয়া লেখা। এই ভাষণের মধ্যে কবি অন্তরের দুঃখকে যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ঈশ্বরনির্ভরতার জলন্ত নিদর্শন। "জগতের ইতিহাসে মানুষের পরমপূজ্যগণ দুঃখেরই অবতার, আরামে লালিত লক্ষ্মীর ক্রীতদাস নহে।" এই ভাষণের অন্তর্গত প্রার্থনায় তাঁহার সন্ত দুঃখের সান্ত্বনা চাহিয়াছেন। "হে রাজা, তুমি আমাদের দুঃখের রাজা; হঠাৎ যখন অর্ধরাত্রে তোমার রথচক্রের বজ্রগর্জনে মেদিনী বলির পশুর হৃৎপিণ্ডের মতো কাঁপিয়া উঠে তখন জীবনে তোমার সেই প্রচণ্ড আবির্ভাবের মহাক্ষণে যেন তোমার জয়ধ্বনি করিতে পারি; হে দুঃখের ধন, তোমাকে চাহি না এমন কথা সেদিন যেন ভয়ে না বলি; সেদিন যেন দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া তোমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে না হয়— যেন সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া সিংহদ্বার খুলিয়া দিয়া তোমার উদ্দীপ্ত ললাটের দিকে দুই চক্ষু তুলিয়া বলিতে পারি, হে দারুণ, তুমিই আমার প্রিয়।"

সুরাট কন্‌গ্রেস ও পাবনা কন্‌ফারেন্স

অন্তরে নিজের জন্য শান্তি কামনা ও বাহিরে সর্বজীবের জন্য কল্যাণ-কর্মের আয়োজন ইহাই হইতেছে এইপর্বে রবীন্দ্রনাথের প্রধানতম আকিঞ্চন। দেশের মঙ্গলকল্পে তিনি নেতাদের সম্মুখে যে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা কবিকল্পনা বলিয়া স্পর্শ করেন নাই। 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের পরিশিষ্টরূপে গ্রামোন্নতি পরিকল্পনার যে একটা ছক কাটা হইয়াছিল, তিনি জানিতেন তাহা যদি তিনি কর্মজীবনের ব্যবহারিকতায় মূর্তি দান না করিতে পারেন, তবে তো তাঁহার সকল আদর্শই অলস কল্পনা বলিয়াই উপহসিত হইবে। তাই তিনি স্বয়ং পল্লীসংস্কার-কর্মে ব্রতী হইলেন। তিনি সমসাময়িক একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "আমি সম্প্রতি পল্লীসমাজ নিয়ে পড়েছি। আমাদের জমিদারীর মধ্যে পল্লীগঠনকার্যের দৃষ্টান্ত দেখাব বলে স্থির করেছি। কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি। কয়েকজন পূর্ববঙ্গের

১ গীতাঞ্জলি নং ৫, ৬, ৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১১।

২ দুঃখ, বঙ্গদর্শন ১৩১৪ ফাল্গুন। দ্র. ধর্ম, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৪০০-৪১০।

ছেলে আমার কাছে ধরা দিয়েছে। তারা পল্লীর মধ্যে থেকে সেখানকার লোকদের সঙ্গে বাস করে তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য বিচার প্রভৃতি সকল কাজের ব্যবস্থা তাদের নিজেদের দিয়ে করাবার চেষ্টা করচে। তাদের দিয়ে রাস্তাঘাট বাঁধানো, পুকুর খোঁড়ানো, ড্রেন কাটানো, জঙ্গল সাফ করানো, প্রভৃতি সমস্ত কাজের উদ্যোগ হচ্চে। আমাদের পল্লীর ভিতরে সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করে এমন সুগভীর নিরুদ্যম যে, সে দেখলে স্বরাজ স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি কথাকে পরিহাস বলে মনে হয়— ও-সকল কথা মুখে উচ্চারণ করতে লজ্জা বোধ হয়।··· আমি সভাস্থলের আহ্বানে আর সাড়া দিচ্ছি নে— কিন্তু সেই জন্যেই দেশের যেটা সকলের চেয়ে প্রয়োজন সেটা সাধনের জন্যে আমার যেটুকু সাধ্য তা প্রয়োগ করতেই হবে।"[১]

শিলাইদহ হইতে কবি অজিতকুমার চক্রবর্তীকে শান্তিনিকেতনের এক পত্রে লিখিতেছেন, "আমি গ্রামে গ্রামে যথার্থভাবে স্বরাজস্থাপন করতে চাই— সমস্ত দেশে যা হওয়া উচিত ঠিক তারই ছোটো প্রতিকৃতি।"[২] কিন্তু গ্রাম-সংস্কার কর্মে ব্রতী হইবার পূর্বে তিনি কর্মীদের সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করাইতেছেন 'কেবলমাত্র অবস্থাটা জানবার' জন্য। অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ হইলে প্ল্যান করিতে হইবে একথা বলে কবির বিজ্ঞানী-বিশ্লেষণী মন। কয়েক দিন পরে আর একখানি পত্রে আমেরিকা-প্রবাসী কনিষ্ঠ জামাতাকে লিখিতেছেন, "দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকদের উন্নতি বিধান করাই এখন যথার্থ আমাদের কাজ।"[৩] এই পল্লীস্বরাজ পরিকল্পনা আজ গ্রামপঞ্চায়েতের নবকলেবর ধারণ করিতেছে। কবি লিখিয়াছিলেন যে মডারেটরা কলিকাতার ৯নং ওয়ার্ডে এমনকি গ্রামের মধ্যে গিয়া কাজে লাগিবার কথা ভাবিতেছেন। "কিন্তু চরমপন্থীরা কেবল চরমের কথাই ভাববেন, উপস্থিত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁরা একেবারেই নিশ্চেষ্ট। এ পর্য্যন্ত এঁদের দ্বারা একটি অতি ক্ষুদ্র কাজও হয় নি।···এঁরা কেবলই কথা নিয়ে কলহ করবেন কাজেই আমার মত জরাজীর্ণকেও কাজের ক্ষেত্রে নাবতে হয়েছে।"[৪]

কবি শিলাইদহে যখন পল্লীসমাজ সম্বন্ধে তথ্য জানার চেষ্টায় রত, এমন সময়ে সংবাদ-পত্রে দেখিলেন সুরাটের কন্‌গ্রেস (১৯০৭ ডিসেম্বর) দক্ষযজ্ঞে পরিণত হইয়াছে অর্থাৎ নরমপন্থী ও চরমপন্থীরা সকল ভদ্র পন্থা ছাড়িয়া দাঙ্গা করিয়াছেন— কন্‌গ্রেস অধিবেশন পণ্ড হইয়া গিয়াছে। সংক্ষেপে ইতিহাসটি বলা প্রয়োজন।

১৯০৭ সালে ৯ই মে (১৩১৪ বৈশাখ ২৬) পঞ্জাবের লালা লাজপত রায় ও সর্দার অজিত সিংহ[৫] গবর্নমেণ্টের দ্বারা বিনা বিচারে আবদ্ধ হন। লালাজীকে ছয় মাস পরে মুক্তিদান করিলে কন্‌গ্রেসের একদল লোক তাঁহাকে সুরাট কন্‌গ্রেস অধিবেশনের সভাপতি করিতে মনস্থ করিলেন। ইংরেজ সরকার কর্তৃক অপমানিত নেতাকে সম্মান প্রদর্শনের দ্বারা সরকারী কার্যের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর হইবে ইহাই ছিল প্রস্তাবকারীদের অন্তরের কথা। মডারেট বা নরমপন্থীদের তখন প্রবল প্রতাপ ; তাঁহাদের মনোনীত ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ সভাপতি হইবেন স্থির হইল। রাসবিহারী কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত আইনজীবী, মনীষী ও ধনী। সুরাটে কন্‌গ্রেস অধিবেশনের দিন নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে প্রথমে তর্কবিতর্ক দিয়া বিচার শুরু হইল, ও মারপিট, এবং জুতাছোড়াছুড়িতে বিবাদের অবসান হইল। চরমপন্থী বা বামপন্থীদের মধ্যে ছিলেন টিলক, খাপার্দে, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি নেতারা ; অপর দলে বা মডারেটদের মধ্যে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ, ফিরোজ শাহ মেঠা, রাসবিহারী ঘোষ, গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে প্রভৃতি। হট্টগোলে কন্‌গ্রেস ভাঙিয়া গেল। ১৯০৬ সালে কলিকাতার কন্‌গ্রেসে অশীতিপর বৃদ্ধ আজীবন দেশসেবী দাদাভাই নৌরজিকে (১৮২৫-১৯১৭) সভাপতি

১ রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী, অবলা দেবীকে লিখিত, কলিকাতা [১৩১৪ চৈত্র] দ্র. প্রবাসী ১৩৪৫ শ্রাবণ, পৃ ৪৬৭। চিঠিপত্র ৬, পৃ ৯০-৯১।

২ পত্র। শিলাইদহ ২৯ পৌষ ১৩১৪। দ্র. প্রবাসী ১৩৩৫ ভাদ্র, পৃ ৬৮৫।

৩ পত্র, ১৩১৬ মাঘ ২০। দেশ ১৩৬২ কার্তিক, পৃ. ৯১।

৪ চিঠিপত্র ৬, পৃ. ৯১।

৫ চল্লিশ বৎসর পর য়ুরোপ হইতে ফিরিয়া ১৯৪৭এ মারা যান।

না করিবার জন্য চরমপন্থীরা উপদ্রবের সূচনা করেন ; কিন্তু সেখানে সেবার সুবিধা করিতে পারেন নাই, এবার সুরাটে সেটি নিষ্পন্ন করিলেন। কন্‌গ্রেসের মডারেট নেতারা দেশের এই দারুণ গৃহবিচ্ছেদের সময় আশ্চর্য দক্ষতার সহিত প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষা করিলেন। তাঁহারা অনতিকাল পরেই সমবেত হইয়া নূতন কনস্টিটিউশন প্রণয়ন করিলেন।

রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। শিলাইদহ হইতে বিলাত-প্রবাসী বন্ধু জগদীশচন্দ্রকে এক পত্রে লিখিতেছেন (২৩ পৌষ ১৩১৪)— "এবারকার কন্‌গ্রেসের যজ্ঞভঙ্গের কথা তো শুনিয়াছই— তাহার পর হইতে দুই পক্ষ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতে দিনরাত নিযুক্ত রহিয়াছে। অর্থাৎ বিচ্ছেদের কাটা ঘায়ের উপর দুই দলে মিলিয়াই নুনের ছিটা লাগাইতে ব্যস্ত হইয়াছে। কেহ ভুলিবে না, কেহ ক্ষমা করিবে না— আত্মীয়কে পর করিয়া তুলিবার যতগুলি উপায় আছে তাহা অবলম্বন করিবে। কিছু দিন হইতে গবর্নমেণ্টের হাড়ে বাতাস লাগিয়াছে — এখন আর সিডিশনের সময় নাই— যেটুকু উত্তাপ এত দিন আমাদের মধ্যে জমিয়াছিল তাহা নিজেদের ঘরে আগুন দিতেই নিযুক্ত হইয়াছে। বহুদিন ধরিয়া 'বন্দেমাতরম্‌' কাগজে স্বাধীনতার অভয়মন্ত্রণাপূর্ণ কোনো উদার কথা আর পড়িতে পাই না, এখন কেবলি অন্য পক্ষের সঙ্গে তাহার কলহ চলিতেছে। এখন দেশে দুই পক্ষ হইতে তিন পক্ষ দাঁড়াইযাছে— চরমপন্থী মধ্যমপন্থী এবং মুসলমান ; চতুর্থ পক্ষটি গবর্নমেণ্টের প্রাসাদ-বাতায়নে দাঁড়াইয়া মুচকি হাসিতেছে। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানেই বয়। আমাদিগকে নষ্ট করিবার জন্য আর কারো প্রয়োজন হইবে না— মর্লিরও নয় কিচেনারেরও নয়— আমরা নিজেরাই পারিব। আমরা 'বন্দেমাতরম্‌' ধ্বনি করিতে করিতে পরস্পরকে ভূমিসাৎ করিতে পারিব।"[১]

কিন্তু বন্ধুকে পত্র লিখিয়া তিনি শান্ত হইলেন না ; তিনি সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া শান্তভাবে দুইপক্ষকে বিচার করিয়া প্রবাসীতে (১৩১৪ মাঘ) 'যজ্ঞভঙ্গ'[২] নামে প্রবন্ধ লিখিলেন ; "এবারকার কন্‌গ্রেসের যাঁহারা অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহারা অপ্রিয় বা বিরুদ্ধ সত্যকে স্বীকার করিবেন না বলিয়া ঘর হইতে পণ করিয়া আসিয়াছিলেন।... আবার চরমপন্থীরাও এমনভাবে কোমর বাঁধিয়া কন্‌গ্রেসের রণক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিলেন যেন, যে মধ্যমপন্থীরা এতদিন ধরিয়া কন্‌গ্রেসকে চালনা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা এমন একটা বাধা যাহাকে ঠেলিয়া অভিভূত করিয়া চলিয়া যাইবেন, ইহাতে যাহা হয় তা হোক। এবং এটা এখনই করিতে হইবে— এইবারেই জয়ধ্বজা উড়াইয়া না গেলেই নয়। দেশের মধ্যে এবং কন্‌গ্রেসের সভায় মধ্যমপন্থীর স্থানটা যে কি তাহা সম্পূর্ণভাবে এবং ধীরতার সহিত স্বীকার না করিবার জন্য মনের মধ্যে যেন প্রচণ্ড আগ্রহ। ...

"মধ্যমপন্থী ও চরমপন্থী এই উভয় দলই কন্‌গ্রেস অধিকার করাকেই যদি দেশের কাজ করা বলিয়া একান্তভাবে না মনে করিতেন, যদি দেশের সত্যকার কর্মক্ষেত্রে ইঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকিতেন— দেশের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্নের অভাব মোচন করিবার জন্য যদি ইঁহারা নিজের শক্তিকে নানা পথে অহরহ একাগ্রমনে নিয়োজিত করিয়া রাখিতেন, দেশের সত্যকার সাধনা ও সত্যকার সিদ্ধি কাহাকে বলে তাহার স্বাদ যদি পাইতেন এবং দেশের জনসাধারণের সঙ্গে কায়মনোবাক্যে যোগ দিয়া দেশের প্রাণকে দেশের শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতেন, তাহা হইলে কন্‌গ্রেস-সভার মঞ্চ জিতিয়া লইবার চেষ্টায় এমন উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন না।"

অর্ধশতাব্দী পূর্বের এই সমস্যা আজও আমাদের ভাবিত করিতেছে।

১ রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী (জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত)। শিলাইদহ, ২৩শে পৌষ ১৩১৪ (৮ই জানুয়ারি ১৯০৮)। দ্র. প্রবাসী ১৩৪৫ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ১৭৫ ; চিঠিপত্র ৬, পত্রসংখ্যা ২৪, পৃ ৫৫-৫৬।

২ যজ্ঞভঙ্গ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পরিশিষ্ট, পৃ. ৬৩৫-৬৩৯ [প্রিয়নাথ গুহ 'যজ্ঞভঙ্গ' নামে গ্রন্থে বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির ইতিহাস বিবৃত করেন ; ১৩১৪]

কংগ্রেসের কার্য কি ভাবে সত্য ও সফল হইতে পারে তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন ; গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে গিয়া দেশের লোককে সত্য মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে পারিলেই কংগ্রেসের যথার্থ কার্য হইবে, এই কথা তিনি আবার বলিলেন ; সভা নহে— শোভাযাত্রা নহে, ব্যক্তিগতভাবে লোকের সঙ্গে মিলিত হইতে হইবে [mass contact]।

সুরাট কংগ্রেস ভাঙিয়া গেলে মধ্যমপন্থীরা সমবেত হইয়া এক কন্‌ভেনশন করিয়া দলগত মত খাড়া করিয়াছিলেন, চরমপন্থীরা কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। ইহার পর নয় বৎসর চরমপন্থীদের কেহই কংগ্রেসে যোগদান করেন নাই। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌতে যে কংগ্রেস হয়, তাহাতেই পুনরায় সর্ব সম্প্রদায়, সর্ব মতের লোক সমবেত হন। তখন হইতে কংগ্রেস পুরাতনপন্থীদের হস্তচ্যুত হয়।

কংগ্রেসের বাঙালি প্রতিনিধি ও নেতারা সুরাট হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন— সকলেই উত্তেজিত। উভয়দলের মধ্যে মতভেদ মতান্তরের স্তর পার হইয়া মনান্তর ও নগ্ন বিদ্বেষে পৌঁছাইয়াছে। ইহার পরের মাসেই পাবনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন। উভয়দলের মধ্যে অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচন লইয়া তুমুল কলহ উপস্থিত হইল। সংবাদপত্রের গবেষণা ও পত্রপ্রেরকদের বিতর্ক জনসংঘকে কোনো সৎপন্থা নির্দেশ না করিয়া বিষয়টাকে জটিল করিয়া তুলিল।

প্রাদেশিক সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এখানে বিবৃত করা অবান্তর হইবে না, কারণ বর্তমানে উহা অন্য নামে পরিচিত। জাতীয় মহাসমিতিতে সমগ্র ভারতবর্ষের অধিবাসীর স্বার্থ আলোচনা হয় সুতরাং বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিগণের স্বার্থসম্বন্ধীয় কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্ন অনালোচিত থাকিয়া যায় ; ইহা লক্ষ্য করিয়া বঙ্গদেশের অগ্রণীগণ কেবল বাঙালিদিগের এমন-একটি রাজনৈতিক সম্মিলন করিবার বন্দোবস্ত করেন যাহাতে প্রধানত বঙ্গদেশের রাজনৈতিক প্রশ্নসমূহের বিশেষভাবে আলোচনা হইবে। এই সম্মিলনই 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি' নামে অভিহিত হয়। ১৮৮৮ অব্দে কলিকাতায় প্রাদেশিক সমিতির প্রথম অধিবেশন হয় ও তদবধি প্রায় প্রতিবৎসরই এই সমিতির অধিবেশন হইয়া আসিতেছে ; বর্তমানে উহা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস (B. P. C.) নামে সুপরিচিত। ১৮৮৮ হইতে ১৮৯৪ পর্যন্ত সাত বৎসর কাল কলিকাতায় ভারত সভাগৃহে (Indian Association) প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। আনন্দমোহন বসু, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন, বৈকুণ্ঠনাথ সেন প্রভৃতি কলিকাতার অধিবেশনে সভাপতির কার্য করিয়াছিলেন।

১৮৯৪ অব্দের জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনের পর যখন বঙ্গদেশের প্রতিনিধিগণ মাদ্রাজ হইতে জলপথে কলিকাতা আসিতেছিলেন, তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন পর্যায়ক্রমে বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় করিবার প্রস্তাব উপস্থিত হয়। বহরমপুরের উকিল বৈকুণ্ঠনাথ সেন এই প্রস্তাব করেন ও নিজ শহরে এই সভা আহ্বান করেন। ১৮৯৫ হইতে এপর্যন্ত প্রাদেশিক সমিতি বিভিন্ন জেলায় হইতেছে।[১]

শিলাইদহে কবি আছেন, হঠাৎ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যোগেশচন্দ্র ব্যারিস্টার, আশুতোষ চৌধুরীর ভ্রাতা ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাতা ; রবীন্দ্রনাথের সহিত বহুকালের পরিচয় ; স্বদেশী যুগের বোধন-কালে ইণ্ডিয়ান স্টোরস স্থাপনের সময় কাজের ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠতা হয়। যোগেশচন্দ্র স্বদেশী আন্দোলনে আপ্রাণ যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া পাবনাবাসীদের তরফ হইতে কবিকে প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি পদ গ্রহণ

১ ১৮৯৫ বহরমপুর (আনন্দমোহন বসু)। ১৮৯৬ কৃষ্ণনগর (গুরুপ্রসাদ সেন)। ১৮৯৭ নাটোর (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)। ১৮৯৮ ঢাকা (কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)। ১৮৯৯ বর্ধমান (অম্বিকাচরণ মজুমদার)। ১৯০০ ভাগলপুর (রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব)। ১৯০১ মেদিনীপুর (নগেন্দ্রনাথ ঘোষ)। ১৯০২ কটক (হয় নাই)। ১৯০৩ বহরমপুর (জগদিন্দ্রনাথ রায়)। ১৯০৪ বর্ধমান (আশুতোষ চৌধুরী)। ১৯০৫ ময়মনসিংহ (ভূপেন্দ্রনাথ বসু)। ১৯০৬ বরিশাল (আবদুল রসুল)। ১৯০৭ বহরমপুর (দীপনারায়ণ সিংহ)। ১৯০৮ পাবনা (রবীন্দ্রনাথ)।

করিতে অনুরোধ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ দেশের জটিল পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝিয়া সভাপতিত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। এই ঘটনা সম্বন্ধে কবি লিখিতেছেন, "আমি পদ্মার তীরে নিভৃতে আশ্রয় লইয়াছিলাম— আমার ভাগ্যদেবতা সেই সন্ধান পাইয়া এখানেও তাঁহার এই শিকারটির প্রতি লক্ষ্য স্থাপন করিয়াছেন। আমাকে পাবনার শান্তিপ্রিয় লোক কন্‌ফারেন্সের সভাপতি করিয়াছেন। প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলাম কিন্তু আপনি ত জানেন কোনদিন কোনো আপত্তি করিয়া জয়ী হইতে পারি নাই।··· সভাপতি হইয়া শান্তিরক্ষা করিতে পারিব কিনা সন্দেহ। দেশে শান্তি যখন নাই তখন তাহাকে রক্ষা করিবে কে? কলহ করিবে স্থির করিয়াই লোকে এখন হইতে অস্ত্রে শান দিতেছে। যদি অক্ষত দেহে ফিরিয়া আসি খবর পাইবেন।"[১] ইহার কয়েকদিন পরে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখিতেছেন, "কন্‌ফারেন্স আমাকে সভাপতি পদে আহ্বান করার সংবাদ পাইবামাত্র নানা পক্ষ হইতে গালি সংযুক্ত এত বেনামী পত্র পাইয়াছি যে, আমি কোন্ দলের লোক তাহা স্থির করা আমার পক্ষে কঠিন হইয়াছিল।"[২] এইসব পত্রের মধ্যে এমন ইঙ্গিতও ছিল যে, তিনি সভাপতি হইলে সুরাটের দক্ষযজ্ঞ পাবনায় পুনরাবৃত্ত হইতে পারে। কাপুরুষদের বেনামী পত্রের এইসব শাসানিতে কবির জিদ বাড়িয়া যায়, তিনি অভিভাষণে অনেক কথাই বেশ স্পষ্ট করিয়া লিখিলেন। পাবনার সভা হয় ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮ (২৮ মাঘ ১৩১৪)।

'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেশসম্বন্ধে যে গঠনমূলক পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই পাবনার অভিভাষণে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে বিচার করিয়া আরও স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিলেন। রাজনীতির অত্যুক্তি ও অতিবাদ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্য এ আহ্বান। দেশসেবার অর্থ রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় গ্রামোন্নতি, গ্রামের মধ্যে সমবায়নীতি প্রবর্তন, সংঘবদ্ধভাবে বিবিধ কার্য করা, বৈজ্ঞানিক মিত-শ্রমিকযন্ত্রের [labour saving] প্রচলনের দ্বারা গ্রামবাসীদের অকারণ পরিশ্রমের লাঘব করা, বিচিত্র কুটিরশিল্প প্রবর্তন প্রভৃতি বহু পন্থা নির্দেশ করিয়া বলিলেন যে, এইসকল কর্মের উদ্দেশ্য হইতেছে শক্তি লাভ, এবং শক্তি বিনা কখনো কোনো জাতি কিছু করিতে পারে না। এই প্রবন্ধে[৩] এবং 'শক্তি' নামে অপর একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন ১৩১৪ মাঘ) তিনি মানবের নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করিবার কথাই বলিলেন। দুর্বলকে কেহ ক্ষমা করে না, কৃপাও করে না। সুতরাং শক্তি অর্জন করিতে হইলে সংঘবদ্ধ হইতে হইবে। তিনি বারবার করিয়া বৃথা বাক্য দ্বারা সময় ও শক্তিকে নষ্ট করিতে নিষেধ করিলেন। ভারতের প্রাণশক্তি গ্রামের মধ্যে লুপ্ত, সুতরাং সেই গ্রামকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য সকল দলকে জাগ্রত হইতে হইবে।

সাহিত্যিক দিক হইতে পাবনার প্রাদেশিক সম্মিলনের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, সভাপতির অভিভাষণ বাংলা ভাষায় রচিত ও বাংলা ভাষায় পঠিত হইল; ইতিপূর্বে ইংরেজি ছিল রেওয়াজ এবং রবীন্দ্রনাথ বরাবর তীব্রভাষায় এই রেওয়াজের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া আসিয়াছিলেন।

এই সময়ে রাজনৈতিক মতামতের জন্য কবি যেমন নিন্দিত, ভর্ৎসিত— কাব্যে অনির্বচনীয়তা অস্পষ্টতা প্রভৃতি বিবিধ দোষের জন্যও সাহিত্যিকদের দ্বারা তেমনি তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইতেছেন। এই লাঞ্ছনাকারীদের পুরোভাগে ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়; তাঁহার এবং তাঁহার দলের বহু খ্যাত ও অখ্যাতনামা লেখকদের বিচিত্র আক্রমণের তিনি এই সময়ে একটি মাত্র উত্তর লিখিয়া দেন (রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য, বঙ্গদর্শন ১৩১৪ মাঘ)। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব, এক্ষণে পাবনা কন্‌ফারেন্সে রবীন্দ্রনাথের সভাপতির অভিভাষণের প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইল, তাহাই দেখা যাক।

১ স্মৃতি. পৃ ৬৮। শিলাইদহ, ২৪ মাঘ ১৩১৪। ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮।

২ পত্র, ১২ ফাল্গুন ১৩১৪। বঙ্গবাণী ৬ষ্ঠ বর্ষ ১৩৩৩ চৈত্র। পৃ ১২৩।

৩ সভাপতির অভিভাষণ (পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী)। বঙ্গদর্শন ১৩১৪ ফাল্গুন॥ সমূহ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ৪৯৬-৫২২।

রুদ্রপন্থা ও গ্রামসেবা

পাবনা কনফারেন্সে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ নেতা ও জনতা কাহারো মনোমত হয় নাই। রাজনৈতিক বিরোধ মিটিল না। মধ্যমপন্থী ও চরমপন্থী যখন মতামতের সূক্ষ্মবিচার লইয়া কংগ্রেসমণ্ডপে ও পত্রিকার বীথিতে বীথিতে মাতামাতি করিতেছেন, তখন একদল যুবক উভয়দলের বাগ্‌বিতণ্ডাকে তুচ্ছ করিয়া মরণপন্থী হইয়া উঠিতেছিল, সে খবর কেহ রাখিতেন না। বন্দেমাতরম্, যুগান্তর প্রভৃতি পত্রিকার উদ্দীপক রচনাবলী দেশের মধ্যে যে একটা বৈপ্লবিক আবহাওয়া সৃষ্টি করিতেছিল, তাহা অনেকেই সন্দেহ করিতেছিলেন, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া কেহই কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।

হঠাৎ মজঃফরপুরে ব্যারিস্টার কেনেডীর স্ত্রী ও কন্যা বোমার আঘাতে নিহত হইলেন (৩০ এপ্রিল ১৯০৮ ॥ ১৭ বৈশাখ ১৩১৫)। হত্যাকারী দুইজন যুবক— ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র চাকী। কিংসফোর্ড নামে কলিকাতার জনৈক ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করিতে গিয়া ভুলক্রমে দুইটি নিরপরাধ প্রাণ নষ্ট হইল। এই সংবাদ দেশেবিদেশে বিশেষ একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিল।[১] এই ঘটনার একমাসের মধ্যে কলিকাতার অন্তঃপাতী মানিকতলার এক পোড়ো বাগানে একটি বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হইল ও সেইসঙ্গে বহু যুবকও ধরা পড়িল। ইহার কয়েকমাস পূর্বে 'বর্তমান রণনীতি' নামে একখানি বই প্রকাশিত হয়, উহার লেখক মানিকতলার মামলার অন্যতম আসামী। এইসকল তথ্য আবিষ্কৃত হইলে দেশের লোক স্তম্ভিত হইয়া গেল। সকলে অবাক হইয়া ভাবিল যে বাঙালি এত দিন ভীরু অপবাদে নিত্য দেশেবিদেশে লাঞ্ছিত উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছিল, সে আজ কী কাণ্ড করিয়া বসিল! আলিপুরের জেলে আবদ্ধ যুবকদের উদ্দেশ্যে গবর্নমেণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া পত্রিকার সম্পাদক কেহই তাহাদিগকে নিন্দা করিতে ও দেশবাসীকে হিতোপদেশ শুনাইতে ত্রুটি করিলেন না; কিন্তু এত বৎসর ইংরেজের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে বাস করিয়া শিক্ষিত যুবমন কেন এইরূপ রুদ্রপথ বাছিয়া লইল, সে-প্রশ্নের উত্তর কেহ দিলেন না। লোক-মান্য টিলক যাহা সত্য বুঝিলেন স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিলেন, ফলে তাঁহার ছয় বৎসর কারাগার হইল। সমস্ত দেশ মূক, স্তব্ধ। যাঁহারা সত্য ভাব গোপন করিয়া বাহিরে সাধুতার ভান করিলেন, তাঁহাদিগকে সরকার চিনিতেন— কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে আইনের বেড়াজালে আনিতে পারিলেন না। মোট কথা, বাংলাদেশে কেন, সমগ্র ভারতে এই বোমার ব্যাপারে লোকে কী ভাবিবে, কী বলিবে, কী বলিলে ভালো হয় বা কী বলিলে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে অর্থাৎ দেশের লোক বাহবা করে ও সরকার ক্রুদ্ধ না হন— এই চিন্তায় মগ্ন, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়া চৈতন্য লাইব্রেরীতে 'পথ ও পাথেয়' নামে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।[২] সভাপতিত্ব করেন অ্যাটর্নী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

এই প্রবন্ধের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ ভারতের ইতিহাসের মধ্য হইতে ভারতের যে একীকরণের বাণী মহাপুরুষদের মধ্য দিয়া যুগে যুগে প্রকাশিত হইয়া আসিয়াছে— তাহাকেই ভারতে শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু বর্তমান ইতিহাসের সম্মুখে যে জটিলতা আসিয়াছে তাহাকেও তিনি অগ্রাহ্য করিলেন না। বাংলার এই বৈপ্লবিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, "বস্তুত বহুদিন হইতে বাঙালিজাতি ভীরু অপবাদের দুঃসহ ভার বহন করিয়া নতশির

১ অরবিন্দ Bandemataram-এ ২৯ এপ্রিল ১৯০৮ লিখিয়াছিলেন, "The fair hope of an orderly evolution of self-government, which the first energy of the new movement had fostered, is gone for ever. Revolution bare and grim, is preparing her battlefield moving down the centres of order which were evolving a new cosmos and building up the material of a gigantic downfall and a mighty new creation. We could have wished it otherwise. But God's will be done!"— দ্র. শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গলায় স্বদেশী যুগ, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, পৃ ৭৩১।

২ পথ ও পাথেয়। ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫ [২৫মে ১৯০৮] বঙ্গদর্শন ১৩১৫ জ্যৈষ্ঠ। দ্র. রাজা ও প্রজা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ৪৪৫-৪৬৭।

হইয়াছে বলিয়াই বর্তমান ঘটনা সম্বন্ধে ন্যায় অন্যায় ইষ্ট অনিষ্ট বিচার অতিক্রম করিয়াও অপমান-মোচনের উপলক্ষে বাঙালির মনে একটা আনন্দ না জন্মিয়া থাকিতে পারে নাই।"

কিন্তু তাই বলিয়া তিনি দেশবাসীকে এই আত্মঘাতী পথে চলিতে উৎসাহিত করিলেন না; তিনি বলিলেন, "গবর্মেণ্টের শাসননীতি যে পন্থাই অবলম্বন করুক এবং ভারতবর্ষীয় ইংরেজের ব্যক্তিগত ব্যবহার আমাদের চিত্তকে যেমনই মথিত করিতে থাক্, আমাদের পক্ষে আত্মবিস্মৃত হইয়া আত্মহত্যা করা তাহার প্রতিকার নহে।" গুপ্তহত্যা অধর্ম এ কথা সকলেই জানেন। কিন্তু ধর্মনীতি ও ধর্মবোধ রাজ্যশাসনের কোনো ছিদ্র দিয়া শাসকের মনে আসিতে পারে না, এই শিক্ষা য়ুরোপের। "য়ুরোপের এই অবিশ্বাসী রাষ্ট্রনীতি আজ পৃথিবীর সর্বত্রই ধর্মবুদ্ধিকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে।" সুতরাং দেশের মধ্যে এই ধর্মবুদ্ধি ও কর্মবুদ্ধির যে অভাব একদল তরুণের মধ্যে দেখা দিয়াছে, তাহার জন্য দেশের আন্দোলনকারীদিগকে "দায়ী করা ইংরেজের বলদর্পে-অন্ধ গায়ের জোরের মূঢ়তামাত্র।" দেশের লোককে তিনি বলিলেন যে দেশের মুক্তির নিতান্ত প্রয়োজন, কিন্তু প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুতর হইলেও প্রশস্ত পথ দিয়াই তাহা মিটাইতে হইবে— কোনো সংকীর্ণ বা স্বল্প পথ দিয়া পাওয়া যাইবে না।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন ভারত যুগে যুগে নানা সংস্কৃতির ধারা বহন করিয়া চলিয়াছে— এবং বিধাতার বিশেষ ইচ্ছা ইহার মধ্য দিয়া পূর্ণ হইতেছে; যে ভারতবর্ষ মানবের বিচিত্র ও মহৎ শক্তিপুঞ্জ দ্বারা ধীরে ধীরে এই বিরাট মূর্তি ধারণ করিয়াছে, তাহার অভিপ্রায়কে ক্ষুদ্র কর্মের দ্বারা ধ্বংস করিলে চলিবে না; জ্ঞানে সুগভীর শান্তি ও ধৈর্য এবং ইচ্ছাশক্তির অপরাজিত বেগ যেন ভারতের এই সুসংগত সামঞ্জস্য নষ্ট না করে।

বাহির হইতে নিরন্তর অবজ্ঞা ও অপমান পাইয়া বাঙালির মন এমনই বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল যে সে যেন মরিয়া হইয়া প্রমাণ করিতে চাহিল যে সে সবই করিতে পারে এমন-কি হত্যা করিতেও পিছপা নহে। "এইপ্রকার দুশ্চেষ্টা অনিবার্য ব্যর্থতার মধ্যে লইয়া যাইবেই" অথচ যুগে যুগে তরুণেরা "নিশ্চিত পরাভবের বহ্নিশিখায় অন্ধভাবে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছে।" তাই বলিয়া তিনি এ পন্থাকে মঙ্গলের পথ বলিতে পারিলেন না। কারণ মানুষ "মঙ্গলকে সৃষ্টি করে তপস্যা দ্বারা।... ক্রোধের আবেগ তপস্যাকে বিশ্বাসই করে না।" সে ভুলিয়া যায় উত্তেজনা শক্তি নহে। উত্তেজনার কোনো স্থান নাই এ কথা রবীন্দ্রনাথ বলিতে পারিলেন না; তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল "অসাড় শক্তিকে সচেষ্ট সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য এই উত্তেজনার প্রয়োজন ছিল।" কিন্তু জাগিয়া সে কাজ খুঁজিয়াছে। "অধৈর্য বা অজ্ঞানবশত স্বাভাবিক পন্থাকে অবিশ্বাস করিয়া অসামান্য কিছু-একটাকে" ধরিতে গিয়া তাহার ধর্মবুদ্ধি নষ্ট হয়। "ন্যায়ধর্মের ধ্রুব কেন্দ্রকে একবার ছাড়িলেই বুদ্ধির নষ্টতা ঘটে, কর্মের স্থিরতা থাকে না, তখন বিশ্বব্যাপী ধর্মব্যবস্থার সঙ্গে আবার আমাদের ভ্রষ্ট জীবনের সামঞ্জস্য ঘটাইবার জন্য প্রচণ্ড সংঘাত অনিবার্য হইয়া উঠে।"

রবীন্দ্রনাথ বহুকাল হইতে যে কথা বলিতেছিলেন, তাহাই আরও স্পষ্ট করিয়া এই দিনকার বক্তৃতায় বলিলেন, "ইংরেজশাসন নামক বাহিরের বন্ধনটাকে স্বীকার করিয়া অথচ তাহার 'পরে জড়ভাবে নির্ভর না করিয়া সেবার দ্বারা, প্রীতির দ্বারা সমস্ত কৃত্রিম ব্যবধান নিরস্ত করার দ্বারা বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে নাড়ির বন্ধনে এক করিয়া লইতে হইবে। একত্রসংগঠনমূলক সহস্রবিধ সৃজনের কাজে ভৌগোলিক ভূখণ্ডকে স্বদেশরূপে স্বহস্তে গড়িতে হইবে ও বিযুক্ত জনসমূহকে স্বজাতিরূপে স্বচেষ্টায় রচনা করিয়া লইতে হইবে।"

ভারতের সাধনার যে মূর্তি তিনি দেখিতেছিলেন তাহা তিনি এই 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে তাঁহার অনিন্দনীয় ভাষায় ব্যক্ত করিলেন। ভারতবর্ষ মিলনের ভূমি, যুগে যুগে সে বিরুদ্ধকে এক করিয়াছে, এই ভাবটির আভাস এই প্রবন্ধে প্রথম অবতারণা করিলেন আর অহিংসার বাণীও ঘোষণা করিলেন।

এই প্রবন্ধ পাঠের পর কাগজপত্রে যথেষ্ট সমালোচনা চলিতে লাগিল, রবীন্দ্রনাথ বুঝিলেন বিষয়টাকে আরও

পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইবে। সেইজন্য পুনরায় লেখনী ধরিলেন ও 'সমস্যা' নামে প্রবন্ধটি লিখিলেন।

এই প্রবন্ধেও তিনি পূর্বের ন্যায় বলিলেন ভারতবর্ষে বহুকে কিভাবে একত্র করা যায়। দেশের বিচিত্র সমস্যা— বিশেষভাবে হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা উত্তরোত্তর তীব্র আকার ধারণ করিতেছিল। কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে যে মিলন হয়, তাহাকে তিনি শ্রদ্ধা করেন না— মিলন যথার্থ ধর্মের উপর হওয়া চাই। তাই বলিলেন ভারতবাসীকে মানুষের যাহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম, সেই শ্রেষ্ঠ সম্পদ লাভের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, এই ধর্ম হইতে সে যে-পরিমাণে বঞ্চিত হইবে সেই পরিমাণে সে শুষ্ক হইয়া উঠিবে, সে আচার-ধর্মী হইবে, মনুষ্য-ধর্মী হইবে না। সেইজন্য তিনি বলিলেন, অন্তর বাহিরে সমস্ত অধীনতার বন্ধন ছেদন করিয়া নির্ভয়ে নিঃসংকোচে বিশ্বসমাজের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে। "ভারতবর্ষে যে-কেহ আছে, যে-কেহ আসিয়াছে, সকলকে লইয়াই আমরা সম্পূর্ণ হইব— ভারতবর্ষে বিশ্বমানবের একটি প্রকাণ্ড সমস্যার মীমাংসা হইবে। সে সমস্যা এই যে, পৃথিবীতে মানুষ বর্ণে ভাষায় স্বভাবে আচরণে ধর্মে বিচিত্র— নরদেবতা এই বিচিত্রকে লইয়াই বিরাট— সেই বিচিত্রকে আমরা এই ভারতবর্ষের মন্দিরে একাঙ্গ করিয়া দেখিব।"[১]

'সদুপায়'[২] নামক আর একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুমুসলমান-বিরোধের কারণগুলি দেখাইতে চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন মুসলমানেরা হিন্দুর সহিত যোগদান করিতেছে না বলিয়া বাংলায় নানাস্থানে নেতারা মুসলমানদের প্রতি ক্ষুব্ধ। নেতারা বয়কট কৃতকার্য করিয়া ইংরেজকে তাক লাগাইবার জন্য ব্যস্ত— তাহাতে যে সাধারণ লোকের সঙ্গে বিরোধের সম্ভাবনা সেদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। "লোকের সম্মতিকে জয় করিয়া লইবার বিলম্ব আমরা সহিতে পারিলাম না, ইংরেজকে হাতে-হাতে তাহার কর্মফল দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।...

"ইংরেজের উপরে রাগ করিয়াই আমরা দেশের লোকের কাছে ছুটিয়াছিলাম, দেশের লোকের প্রতি ভালবাসা-বশতই যে গিয়াছিলাম তাহা নহে।... আমরা দেশের শিক্ষিত লোকেরা জন্মভূমিকে লক্ষ্য করিয়া 'মা' শব্দটা ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছি।" এই শব্দের হৃদয়াবেগ সাধারণ লোকের কাছে নিরর্থক। সুতরাং তাহারা যখন এই ধ্বনিতে সাড়া দেয় না, তখন নেতাদের বা কর্মীদের সন্দেহ হয় সেটা তাহাদের ইচ্ছাকৃত ভান বা শত্রুপক্ষ তাহাদিগকে মাতৃবিদ্রোহে উত্তেজিত করিতেছে। অবশেষে তাহাদিগের হিতটা জোর করিয়া করিবার জন্য প্রবৃত্তি হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "আমরা স্বাধীনতা চাই কিন্তু স্বাধীনতাকে আমরা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধা রাখিবার মতো ধৈর্য আমাদের নাই; আমরা ভয় দেখাইয়া তাহার বুদ্ধিকে দ্রুতবেগে পদানত করিবার জন্য চেষ্টা করি।" উপকার করিবার এই ভীষণ নেশায় আজ সর্বদেশের নেতারা উন্মত্তবৎ; কিন্তু যাহাদের জন্য এত আয়োজন, তাহারা যে মূক জড়জীবে পরিণত হইতেছে সেদিকে দৃষ্টি দিবার অবসর কাহারও নাই— কার্যসিদ্ধিই একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া উপায় সম্বন্ধে তাঁহারা বিবেকহীন।

এই সময়ে 'স্বদেশী'র নামে মফঃস্বলের বাজারে ভীতিপ্রদর্শনপূর্বক বিলাতী মাল আমদানি বন্ধ করিবার চেষ্টা হইতেছিল। "যাহারা কখনো বিপদে আপদে সুখে দুঃখে আমাদিগকে স্নেহ করে নাই, আমাদিগকে যাহারা সামাজিক ব্যবহারে পশুর অপেক্ষা অধিক ঘৃণা করে, তাহারা আজ কাপড়-পরানো বা অন্য যে-কোনো উপলক্ষ্যে আমাদের প্রতি জবরদস্তি প্রকাশ করিবে ইহা আমরা সহ্য করিব না, দেশের নিম্নশ্রেণীর মুসলমান এবং নমশূদ্রের মধ্যে এই অসহিষ্ণুতা জাগিয়া উঠিয়াছে।"

তাই রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "বিলাতী দ্রব্য ব্যবহারই দেশের চরম অহিত নহে, গৃহবিচ্ছেদের মতো এত বড়ো

১ সমস্যা, প্রবাসী, ১৩১৫ আষাঢ়, পৃ ১৫৩-১৬৩। রাজা প্রজা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ৪৬৮-৮৪।

২ সদুপায়, প্রবাসী, ১৩১৫ শ্রাবণ, পৃ ২২-১২২৬। সমূহ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ৫২২-৩১।

অহিত আর কিছুই নাই।... সবলে গলা টিপিয়া ধরিয়া মিলনকে মিলন বলে না; ভয় দেখাইয়া, এমনকি কাগজে কুৎসিত গালি দিয়া মতের অনৈক্য নিরস্ত করাকেও জাতীয় ঐক্য-সাধন বলে না। এ-সকল প্রণালী দাসত্বের প্রণালী।"

রবীন্দ্রনাথের এই সময়ে উক্ত আর-একটি কথা আজ প্রতিদিন জীবনে স্মরণ রাখার মত। নিম্নে সেই অংশটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি; "একটি কথা কখনো ভুলিলে চলিবে না যে, অন্যায়ের দ্বারা, অবৈধ উপায়ের দ্বারা কার্যোদ্ধারের নীতি অবলম্বন করিলে কাজ আমরা অল্পই পাই, অথচ তাহাতে করিয়া সমস্ত দেশের বিচারবুদ্ধি বিকৃত হইয়া যায়।...দেশহিতের নাম করিয়া যদি মিথ্যাকেও পবিত্র করিয়া লই এবং অন্যায়কেও ন্যায়ের আসনে বসাই তবে কাহাকে কোন্‌খানে ঠেকাইব।...দেশহিতৈষীর ভয়ংকর হস্ত হইতে দেশকে রক্ষা করাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে দুঃখকর সমস্যা হইয়া পড়িবে।...ধর্মহীন ব্যাপারে প্রণালীর ঐক্য থাকে না, প্রয়োজনের গুরুলঘুতা-বিচার চলিয়া যায়, উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সুসংগতি স্থান পায় না, একটা উদ্‌ভ্রান্ত দুঃসাহসিকতাই লোকের কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়া তুলে।" রবীন্দ্রনাথের এই ভবিষ্যদ্‌বাণী কিভাবে ফলিয়াছে তাহা জাতীয় ইতিহাসের পাঠকের কাছে অবিদিত নহে। এই প্রবন্ধের উপসংহারে বলিলেন, "ধর্মের পথ দুর্গম।...এই পথেই আমাদের সমস্ত পৌরুষের প্রয়োজন, ইহার পাথেয় সংগ্রহ করিতেই আমাদের সর্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে;... ইহার সফলতা অন্যকে পরাস্ত করিয়া নহে, নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়া।"

বিপ্লবপন্থীদের পথকে কবি চিরদিন নিন্দার্হ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সেই সময়ে একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "ইহা নিশ্চয়ই মনে রাখিবে, নিজের বা পরিবারের বা দেশের কাজে ধর্মকে লঙ্ঘন করিলে ঈশ্বর ক্ষমা করেন না। যদি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও পাপকে আশ্রয় করি তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে।... দেশের যে দুর্গতি-দুঃখ আমরা আজ পর্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছি তাহার গভীর কারণ আমাদের জাতির অভ্যন্তরে নিহিত হইয়া রহিয়াছে— গুপ্ত চক্রান্তের দ্বারা নরনারী হত্যা করিয়া আমরা সে কারণ দূর করিতে পারিব না, আমাদের পাপের বোঝা কেবলই বাড়িয়াই চলিবে। এই ব্যাপারে যে সকল অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ও বিচলিতবুদ্ধি যুবক দণ্ডনীয় হইয়াছে তাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারে না— কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই দণ্ড আমাদের সকলের দণ্ড— ঈশ্বর আমাদিগকে এই বেদনা দিলেন— কারণ, বেদনা ব্যতীত পাপ দূর হইতেই পারে না।"[১]

দেশসেবার অর্থ যে পল্লীসমাজের সেবা এই কথা কবি দেশবাসীকে বরাবর বলিয়া আসিতেছিলেন; উহা অরণ্যে রোদন জানিয়া তিনি স্বয়ং সামান্যভাবে নিজ জমিদারীতে উহার পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন— সেকথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি।[২] গ্রীষ্মের ছুটির পর কবি শিলাইদহ হইতে বোলপুর ফিরিয়া একখানি পত্রে তাঁহার গ্রামোদ্যোগ সম্বন্ধে পরীক্ষার কথা মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিতেছেন, "আমি দীর্ঘকাল নির্বাসনে ছিলুম— অর্থাৎ মেয়েদের নিয়ে বোলপুরের বাইরেই কাটাতে হয়েছে। আবার সম্প্রতি ফিরে এসেচি। কিন্তু এখন আমার কাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। আমাদের জমিদারীর মধ্যে একটা কাজ পত্তন করে এসেছি। বিরাহিমপুর পরগণাকে পাঁচটা মণ্ডলে ভাগ করে প্রত্যেক মণ্ডলে একজন অধ্যক্ষ বসিয়ে এসেছি।[৩] এই অধ্যক্ষেরা সেখানে পল্লীসমাজ স্থাপনে নিযুক্ত। যাতে

১ জোড়াসাঁকো, ২৩শে বৈশাখ ১৩১৫। শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত পত্র। চিঠিপত্র ৭। দ্র, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ৬৬২।

২ কবি তাঁহাদের দূর আত্মীয় করুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁহার জমিদারিতেও পল্লীসমাজ স্থাপনের জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র দেন। —দীপালী, রবীন্দ্র-জন্মতিথি সংখ্যা ১৩৪৮, পৃ ২০-২১।

৩ কালীমোহন ঘোষ, ভূপেশচন্দ্র রায়, অনঙ্গমোহন চক্রবর্তী, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত (ব্রাহ্মসমাজ), অক্ষয়চন্দ্র সেন— এই পাঁচজন যুবক মণ্ডল-অধ্যক্ষ হন। কিন্তু তাঁহারা এই পল্লীসংগঠন কার্য বেশিদিন করিতে পারেন নাই, তাহার অন্যতম প্রধান কারণ পুলিসের সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত।

গ্রামের লোকে নিজেদের হিতসাধনে সচেষ্ট হয়ে ওঠে— পথ ঘাট সংস্কার করে, জলকষ্ট দূর করে, শালিসের বিচারে বিবাদনিষ্পত্তি করে, বিদ্যালয় স্থাপন করে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্মগোলা বসায় ইত্যাদি সর্বপ্রকারে গ্রাম্য সমাজের হিতে নিজের চেষ্টা নিয়োগ করতে উৎসাহিত হয় তারই ব্যবস্থা করা গিয়েছে। আমার প্রজাদের মধ্যে যারা মুসলমান তাদের মধ্যে বেশ কাজ অগ্রসর হচ্চে— হিন্দুপল্লীতে বাধার অন্ত নেই। হিন্দুধর্ম হিন্দুসমাজের মূলেই এমন-একটা গভীর ব্যাঘাত রয়েছে যাতে করে সমবেত লোকহিতের চেষ্টা অন্তর থেকে বাধা পেতে থাকে। এই সমস্ত প্রত্যক্ষ দেখে হিন্দুসমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে idealize করে কোনো আত্মঘাতী শ্রুতিমধুর মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে আর আমার ইচ্ছাই হয় না।"[১]

কবি প্রায় তিনমাস উত্তরবঙ্গে যান নাই। শ্রাবণের গোড়াতেই পুনরায় সেখানে গেলেন। বর্ষায় পতিসরে গিয়া পল্লীসমাজের উন্নতিকল্পে গ্রাম-অধ্যক্ষগণকে প্রজাদের কৃষিসংক্রান্ত ব্যাপারে কী করিতে হইবে তদ্‌বিষয়ে উপদেশপূর্ণ পত্র লিখিতেছেন। "প্রজাদের বাস্তবাড়ি ক্ষেতের আইল প্রভৃতি স্থানে আনারস, কলা, খেজুর প্রভৃতি ফলের গাছ লাগাইবার জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করিও। আনারসের পাতা হইতে খুব মজবুত সুতা বাহির হয়, ফলও বিক্রয়যোগ্য। শিমুল-আঙ্গুর গাছ বেড়া প্রভৃতির কাজে লাগাইয়া তাহার মূল হইতে কিরূপে খাদ্য বাহির করা যাইতে পারে তাহাও প্রজাদিগকে শিখানো আবশ্যক। আলুর চাষ প্রচলিত করিতে পারিলে বিশেষ লাভের হইবে।... কাছারিতে যে আমেরিকান ভুট্টার বীজ আছে তাহা পুনর্বার লাগাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।...কৃষি বিজ্ঞানের উপদেশমত চেষ্টা করিবে।" (১৭ শ্রাবণ ১৩১৫)।

শ্রাবণের শেষ দিকে কবি জমিদারি হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন। সেখানে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ছাত্রসমাজের তরফ হইতে সমাজমন্দিরে একটি বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ আসিয়াছে। গত এক বৎসরের মধ্যে পাঠক অবশ্য লক্ষ করিয়াছেন যে, 'ব্যাধি ও প্রতিকার' হইতে যে প্রবন্ধরাজির সূত্রপাত[২] তাহা কেবলমাত্র গবর্মেণ্টের একতরফা সমালোচনা নহে। কারণ তিনি জানিতেন দেশের অধীনতা ও দুর্গতির জন্য কেবলমাত্র বৈদেশিক গবর্মেণ্টকে দায়ী করা ও গালিপাড়ার কোনো সার্থকতা নাই; অধীনতার মূল কোথায় তাহারই কারণ অনুসন্ধান করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। পাশ্চাত্ত্যের যন্ত্রমূলক নাগরিক সভ্যতার (civilization) প্রগতি ও প্রাচ্যের কুটির শিল্পাশ্রয়ী গ্রাম্য সংস্কৃতির (culture) সহিষ্ণুতা— আজ উভয়েই জীবনস্বাচ্ছন্দ্যের বাধাস্বরূপ হইয়াছে। ভারতের ইতিহাসে ইংরেজ বর্তমানে একটি অচ্ছেদ্য অংশরূপে অধিষ্ঠিত। আমাদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় তাহার স্থিতি বা অস্থিতি

১ ৩০ আষাঢ় ১৩১৫, স্মৃতি পৃ ৭০-৭১।

২ ১৩১৪-১৫ সালে চৌদ্দ মাসে রবীন্দ্রনাথ নয়টি প্রবন্ধে দেশের রাজনীতি ও সমাজনীতির আলোচনা করেন—

ক ব্যাধি ও প্রতিকার: প্রবাসী ১৩১৪ শ্রাবণ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পরিশিষ্ট পৃ. ৬২৩-৩৫।

খ যজ্ঞভঙ্গ: প্রবাসী ১৩১৪ মাঘ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পরিশিষ্ট পৃ ৬৩৫-৩৯।

গ পাবনা কনফারেন্স অভিভাষণ (পঠিত ১৩১৪ মাঘ, ২৮): বঙ্গদর্শন ১৩১৪ ফাল্গুন। সমূহ, (গদ্য-গ্রন্থাবলী ১১), রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০; পৃ ৪৯৬-৫২২।

ঘ পথ ও পাথেয় (পঠিত ১৩১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২): বঙ্গদর্শন ১৩১৫ জ্যৈষ্ঠ। রাজাপ্রজা (গদ্যগ্রন্থাবলী ১০) রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ৪৪৫-৪৬৭।

ঙ সমস্যা: বঙ্গদর্শন ১৩১৫ আষাঢ়। রাজাপ্রজা (গদ্য-গ্রন্থাবলী ১০) রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ. ৪৬৮-৪৮৪।

চ সদুপায়: বঙ্গদর্শন ১৩১৫ শ্রাবণ। ভারতী ১৩১৫ আষাঢ়। রাজাপ্রজা। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০ পৃ ৫২২-৫৩১।

ছ পূর্ব ও পশ্চিম, প্রবাসী ১৩১৫ ভাদ্র। সমাজ (গদ্য-গ্রন্থাবলী ১২) রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২ পৃ ২৬১-২৭৩।

জ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (সংক্ষিপ্ত): বঙ্গদর্শন ১৩১৫ ভাদ্র। 'পূর্ব ও পশ্চিম', রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২। পৃ ২৬১-২৭৩, প্রবন্ধটির সংক্ষিপ্ত পাঠ। দ্র. গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২, পৃ ৬১১-৬১৩।

ঝ দেশহিত: বঙ্গদর্শন ১৩১৫ আশ্বিন। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০; পরিশিষ্ট, পৃ ৬৩৯-৪২।

নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না— এই বলিয়া কবি আজ এই সমস্যাটিকে নূতনভাবে দেখিবার চেষ্টা করিতেছেন। ছাত্রসমাজের সম্মুখে প্রদত্ত ভাষণ এই 'পূর্ব ও পশ্চিমে'র সমস্যাবিষয়ক আলোচনা। এই প্রবন্ধের বক্তব্য পূর্বোক্ত সকল রচনা হইতে নূতন সুরে বাঁধা। কবি প্রশ্ন করিলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস কাহাদের ইতিহাস? তাঁহার উত্তর, ভারতের ইতিহাস কাহারও স্বতন্ত্র ইতিহাস নহে। যে আর্যগণ একদিন ভারতবর্ষকে তাঁহাদের বুদ্ধি ও শক্তি-প্রভাবে জয় করিয়াছিলেন, যে আর্যগণ অনার্যগণের সহিত মিশিয়া তাহাদিগকে সমাজান্তর্গত করিয়াছিলেন, যে মুসলমান হিন্দুর আত্মঘাতী গৃহবিবাদের অবকাশে এদেশে বংশপরম্পরাক্রমে জন্ম মৃত্যু দ্বারা এ দেশের মাটিকে আপনার করিয়া লইল— ভারতের ইতিহাস একলার ইহাদের কাহারও নহে! অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বা সেক্যুলার স্টেট পরিকল্পনার আভাষ পাইলাম এই ভাষণে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন না যে, কোনো-এক বিশিষ্ট জাতি ভারতের সর্বময় কর্তা হইয়া বসিবে। আমাদের সংকীর্ণ গণ্ডিটুকুকে ভাঙিতেই হইবে। তিনি বলিলেন, "আজ যে পশ্চিম হইতে ইংরেজ আসিয়া ভারতেতিহাসের একটা প্রধান অংশ জুড়িয়া বসিয়াছে ইহা কি সম্পূর্ণ আকস্মিক, অপ্রয়োজনীয়। ইংরেজের নিকট কি আজ আমাদের শিখিবার কিছুই নাই। তিন সহস্র বৎসর পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষগণ যাহা আমাদের দিয়া গিয়াছেন, বিশ্বমানব-ভাণ্ডারে তাহার অপেক্ষা নূতন জ্ঞান কি আর কিছুই থাকিতে পারে না। নিখিলমানবের সঙ্গে জ্ঞান প্রেম কর্মের নানা আদানপ্রদানে আমাদের অনেক প্রয়োজন আছে; ইংরেজ বিধাতৃপ্রণোদিত হইয়া তাহারই উদ্যম আমাদের মধ্যে জাগাইতে আসিয়াছে— সফল না হওয়া পর্যন্ত সে নিশ্চিন্ত হইবে না। সে সফলতা পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনে, বিরোধে নহে।...পশ্চিমের সহিত প্রাচ্যকে মিলিতেই হইবে। পশ্চিমকে আপনার শক্তিতে আপনার করিয়া লইতেই হইবে।...শক্তির নিকটেই যথার্থ মর্যাদা প্রকাশ পায়; অতএব সকল দিকেই আমাদিগকে শক্তিশালী হইতে হইবে। আমাদিগের সকল দাবিই আমাদিগকে জয় করিয়া লইতে হইবে— হীনতার দ্বারা নহে, কিন্তু মহত্বের দ্বারা, মনুষ্যত্বের দ্বারা।... তীব্র উক্তির দ্বারা নহে, দুঃসাহসিক কার্যের দ্বারা নহে, কিন্তু ত্যাগের দ্বারা আমাদিগকে শ্রেয়ঃকে বরণ করিয়া লইতে হইবে।"[১]

এই ত্যাগ কী তাহা তিনি পূর্বের প্রবন্ধগুলিতে বিশদভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন; সংক্ষেপে বলিতে গেলে আত্মসমাহিত হইয়া গ্রামের মধ্যে নিজেকে লুপ্ত করিয়া দেওয়া; কারণ ভারতের প্রাণ গ্রামে।

স্বদেশীযুগের দৃপ্ত রবীন্দ্রনাথের জীবনে আজ কী পরিবর্তন। রবীন্দ্রনাথ জীবনের কোনো অবস্থাকেই চরম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই, চিরদিনই ক্ষুদ্র পরিবেষ্টনী হইতে বৃহত্তর পরিবেষ্টনীর মধ্যে যাইবার জন্য তাঁহার মনের আকুতি। তাই আজ ক্ষুদ্র জাতীয়তার গণ্ডি ও স্বদেশের প্রতি মোহ হইতে মুক্তির জন্য মন এমন ব্যাকুল। এমনকি নিজ ধর্মবেষ্টনী হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া মানবের বিশুদ্ধতম ধর্মের মধ্যে আত্মসমর্পণের জন্য অন্তরের মধ্যে আহ্বান অনুভব করিতেছেন। 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধ তাহারই অগ্রদূত। সাহিত্যের মধ্যেও আমরা নূতন সুর এখন হইতে শুনিব। তবে তাহা যে ক্ষণে ক্ষণে স্থানিক, সাময়িক সমস্যাদির দ্বারা আচ্ছন্ন হয় নাই তাহা ভাবিবার কোনো কারণ নাই। রবীন্দ্রনাথ কবি ও সাহিত্যিক হইলেও মানুষ এবং এমন নিবিড়ভাবে মানুষ, তাই তিনি কোনো দিন পৃথিবীর সুখদুঃখ আনন্দ আবেগের উচ্ছাস হইতে আপনাকে দূরে রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার জীবনে বিচিত্রের মধ্যেই বিশিষ্টের অনুভূতি হইয়াছে চিরদিন, নানাভাবে।

১ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, বঙ্গদর্শন ১৩১৫ ভাদ্র। 'পূর্ব' ও পশ্চিমে'র সংক্ষিপ্ত পাঠ। গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২, পৃ ৬১০-৬১৩।

প্রায়শ্চিত্ত নাটক

বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনকে জাতীয় জীবনে ভাবাত্মক বিপ্লববাদে রূপান্তরিত করিবার জন্য দেশের সাহিত্যিকগণের বিচিত্র দান যে কতখানি দায়ী, তাহার সম্যক্ বিচার ও বিশ্লেষণ আজ পর্যন্ত হয় নাই। বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের শুরু হইতে প্রবন্ধ ও পুস্তিকা, গান ও কবিতা, কথকতা ও যাত্রাপালা, কীর্তন ও বক্তৃতা কিভাবে দেশের রাজনৈতিক চেতনাকে ভাবুকতায় মুখর করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার বিস্তারিত আলোচনা হইলে সাহিত্যসেবীদের অপরিমেয় দানের যথার্থ মূল্য নিরূপিত হইত। এ বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণার ক্ষেত্র এখনো উন্মুক্ত আছে।

সাধারণের মনকে জাতিপ্রেমের উগ্র উচ্ছ্বাসে উদ্‌বুদ্ধ করিবার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হইতেছে নাটক ও অভিনয়; বহু দেশের বন্ধনমুক্তির ইতিহাসেই এই ঘটনাটি চোখে পড়ে। আমাদের দেশে হিন্দুমেলার যুগে ঐতিহাসিক নাটক রচনা ও অভিনয়ের দিকে স্বাদেশিকদের দৃষ্টি যায় এই কারণেই।

অভিনয়োপযোগী ঐতিহাসিক নাটক রচনার প্রথম পথমোচন করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁহার প্রদর্শিত পথে অনেক সাহিত্যিক ঐ শ্রেণীর নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন, কেহবা বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস অবলম্বনে নাটক লেখেন। রবীন্দ্রনাথের 'বউঠাকুরানীর হাট' (১২৮৯ পৌষ) অবলম্বনে কেদারনাথ চৌধুরী 'রাজা বসন্ত রায়' নামক নাটক লিখিয়া রঙ্গমঞ্চে কয়েকবারই অভিনয় করান।

স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভকাল হইতে বহু ঐতিহাসিক ও স্বদেশপ্রেম সম্বলিত নাটক লিখিত হইয়া আসিতেছে। কিছুকাল হইতে বাঙালি-হৃদয় আদর্শ বাঙালি বীরের সন্ধানে ফিরিতেছে, বাংলায় বীরপূজার তরঙ্গ আসে 'শিবাজী-উৎসব' হইতে। একদিন রবীন্দ্রনাথই 'জয়তু শিবাজী' বলিয়া মহারাষ্ট্র-বীরের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিলেন, বাংলার ভাবপ্রবণ যুবমন সেই থেকেই বীরপূজায় উদ্রিক্ত হয়। তদবধি বাংলাদেশে স্বদেশপ্রেমের নামে কত লেখক ইতিহাস-অশ্রুত স্থানিক অথবা সাম্প্রদায়িক বীরের মুখে মহত্ত্বের বাণী ও দম্ভ বসাইয়া, তাহাদিগকে 'জাতীয়' বীরের সম্মান দিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্য তাঁহাদের অন্যতম; পরে এই মর্যাদা আরও অনেকে পান যেমন সীতারাম রায় কেদার রায়, সিরাজউদ্দৌলা, মীরকাসিম প্রভৃতি। এতকাল পরে রবীন্দ্রনাথ 'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া 'প্রায়শ্চিত্ত' নামে নাটক লিখিলেন (১৩১৫) যদিও উহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় ১৩১৬ সালের বৈশাখ মাসে।[১] 'প্রায়শ্চিত্ত' পঞ্চমাঙ্ক নাটক, 'পরিত্রাণ' তাহার সংস্কৃত চতুরঙ্ক রূপ।

কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের আদর্শ ও রূপ গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এমনই জটিল আকার ধারণ করিয়াছে যে, আজ চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই দেশের সমক্ষে নূতন আদর্শ স্থাপনের জন্য উদ্‌গ্রীব। জাতিপ্রেমের বহ্নিতে হিংসা-ইন্ধন ও উত্তেজনার ফুৎকার দেশকে যে ব্যর্থ হত্যাকাণ্ডের মধ্যে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে তাহা দেখিয়া ভাবুক সমাজ হতবাক্। রবীন্দ্রনাথ দিব্যচক্ষে দেখিলেন সংগ্রামে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে প্রেমের প্রয়োজন, সাত্ত্বিক ধর্মই ভাবী বীরের ধর্ম, হিংসায় উন্মত্তদের নীতির স্থান হইবে না। সেই অহিংসানীতির মানদণ্ডে যশোহরেশ্বর প্রতাপাদিত্য অতি তুচ্ছ— গৃহহীন সর্বত্যাগী ধনঞ্জয় বৈরাগী মহৎ। ভারত স্বাধীনতালাভের জন্য ব্রিটিশ প্রতাপের বিরুদ্ধে যে সংগ্রামে রত হইয়াছে— এই নাটকখানিকে তাহারও রূপক বলিতে পারা যায়।

'প্রায়শ্চিত্ত' পঞ্চমাঙ্ক নাটক, 'পরিত্রাণ' তাহার সংস্কৃত চতুরঙ্ক রূপ। এই নাটকে, অধ্যাপক সুকুমার সেনের মতে, "প্রতাপাদিত্যের ভূমিকা রক্তমাংসের মানুষের মত হইয়াছে। তাহার রাজোচিত মহিমাও খর্ব হয় নাই।" তবে তিনি

১ প্রায়শ্চিত্ত, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯। ইহা পরে পুনর্লিখিত হইয়া 'পরিত্রাণ' (১৩৩৬) নামে প্রকাশিত হয়।

রাজা, রাজধর্ম সম্বন্ধে মিথ্যা অভিমান পোষণ করিতেন ; ফলে নিজের সর্বনাশ নিজে ডাকিয়া আনিলেন। অলীক রাজমর্যাদাকে ধর্ম ও সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজ অহংকারকে অক্ষুণ্ণ রাখিতেই তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত ও নিঃশেষিত হয়। তাঁহার অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাবিদ্রোহের নেতা, মুক্তির প্রতীক ধনঞ্জয় বৈরাগী। বউঠাকুরানীর হাটে এই বৈরাগীর চরিত্র নাই, এটি কবির নূতন সৃষ্টি। অধ্যাপক সুকুমার সেন বলেন, প্রায়শ্চিত্ত নাটকে বাস্তব বা মানবভূমিক নাটকের সমাপ্তি ও আদর্শ বা রাহস্যিক নাটকের সূত্রপাত। এই আদর্শের দ্বারে দাঁড়াইয়া ধনঞ্জয় বৈরাগী। চতুর্থ অঙ্কের শেষে প্রতাপ যখন বলেন, "বৈরাগী, আমার এক-একবার মনে হয় তোমার ওই রাস্তাই ভাল— আমার এই রাজ্যটা কিছু না", তাহার উত্তরে বৈরাগী বলে, "মহারাজ, রাজ্যটাও তো রাস্তা। চলতে পারলেই হল। ওটাকে যে পথ বলে জানে সেই তো পথিক ; আমরা কোথায় লাগি ?" এই উক্তিতে নাটকের symbolic বা রূপক রূপটি প্রথম খুলিয়া গেল। বৈরাগীর এই উত্তরের মধ্যে উপনিষদের রাজর্ষিদের জীবনাদর্শ ফুটিয়াছে ; চিরন্তন ভারতের কথা এই সংসারটা পথ, রাজ্যটা পথ— গমনের স্থান— গম্যস্থান নহে। নাটকের শেষে উদয়াদিত্য, বিভা, ধনঞ্জয় সকলেই পথে নামিয়া পড়িল। ধনঞ্জয় হইতেই রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী নাটকসমূহের ঠাকুরদা, গুরু, দাদাঠাকুর প্রভৃতি অপরূপ চরিত্রের উদ্ভব !

'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে কবি রাজা ও প্রজা বা রাষ্ট্র ও ব্যক্তির সম্বন্ধ বিষয়ে অনেক মূল্যবান মত প্রকাশ করিয়াছেন। রাজা তৃতীয় অঙ্কে বৈরাগীর কাছে মাধবপুর পরগণার দুই বছরের খাজনা দাবি করিয়া বলিলেন, 'দেবে কিনা বল।' ধনঞ্জয় নির্ভীকভাবে উত্তর করিল "না মহারাজ দিব না।…যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।…আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ অন্ন যে তাঁর, এ আমি তোমাকে দিই কী ব'লে!" প্রতাপ প্রশ্ন করেন, "তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে!" ধনঞ্জয় অম্লানবদনে উত্তর করে, "হাঁ মহারাজ, আমিই তো বারণ করেছি।" ইহাই যথার্থ বিপ্লব—বিদ্রোহ নহে ; কারণ প্রজারা মূল প্রশ্নে পৌঁছিয়াছে, রাজ্যটা কেবলই রাজার নয়! ধনঞ্জয় যশোহর যাত্রার পূর্বে মাধবপুরের প্রজাদের বলেন সব রাজত্বটাই কি রাজার ? অর্ধেক রাজত্ব প্রজার। তাই তিনি রাজার সহিত বুঝাপড়া করিবার জন্য রাজধানীতে চলিয়াছেন। রাজা পাছে বৈরাগীকে অপমান করেন এই ভয়ে প্রজার দল হাতিয়ার লইয়া তাঁহার সঙ্গে যাইবে। বৈরাগী তাহাদিগকে নিরস্ত্রই রাজদ্বারে যাইতে বলিলেন— সম্পূর্ণ অহিংসনীতিসূচক সত্যাগ্রহ। মোটকথা অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে প্রজার বিদ্রোহ করিবার জন্মগত অধিকারকেই কবি অনুমোদন করিলেন। এই নাটকে no-rent campaign, non-violence সমর্থিত।

প্রায়শ্চিত্ত নাটক লিখিবার অল্পকাল মধ্যে 'শারদোৎসব' নাটিকা রচিত হয়। শারদোৎসবের রাজা বিজয়াদিত্য হইতেছেন প্রায়শ্চিত্তের প্রতাপাদিত্যের antithesis বা বিপরীত-ধর্মা ; প্রতাপ নিজ অহংকারকে সংযত করিতে না পারায় প্রজাপীড়ক, বিজয়াদিত্য নিজ অহংকারকে বিসর্জন দিবার জন্য সন্ন্যাসী। প্রতাপাদিত্যের কথা 'ওই রাস্তাই ভাল— আমার রাজ্যটা কিছু না' এই হতাশোক্তির যথোচিত উত্তর দিয়াছেন বিজয়াদিত্য। তিনি বলিয়াছেন, 'রাজা হোতে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই।' প্রায়শ্চিত্তে যে কথাটা প্রাসঙ্গিক, শারদোৎসবে তাহাই হইতেছে প্রসঙ্গ।

প্রায়শ্চিত্ত নাটকে রবীন্দ্রনাথ কেন অহিংসনীতি প্রচার করিলেন, তাহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না ; পাঠকের স্মরণ আছে, ১৩১৫ সালের বৈশাখে মজঃফরপুরে রাজনীতির জন্য প্রথম হত্যাকাণ্ড সাধিত হইয়াছিল ; এবং তাহার অল্পকাল পরেই কলিকাতার মানিকতলায় বোমার কারখানা ও বিপ্লবের ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। ইহার পরেও কয়েকটি রাজনৈতিক হত্যা ঘটে।

/ বাংলাদেশে যখন একদল যুবক এইভাবে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা লইয়া আত্মাহুতি দিতে প্রবৃত্ত, প্রায় সেই সময়েই দক্ষিণ

আফ্রিকায় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নামে জনৈক গুজরাটি যুবক ব্যারিস্টার প্রবাসী ভারতীয়দের উপর স্থানীয় গবর্মেণ্টের জুলুমনীতি প্রতিরোধকল্পে সত্যাগ্রহ বা passive resistance আন্দোলন প্রচার করিতেছিলেন। এই নীতির উদ্‌ভাবক মহামতি টলস্টয়, প্রথম প্রয়োগকর্তা গান্ধীজি। টলস্টয় জীবনের বহু অভিজ্ঞতার পর বুঝিয়াছিলেন যে, অন্যায়ের প্রতিকার অন্যায়ের দ্বারা সম্ভবে না। তিনি যীশুখৃস্টের বাণীকে অন্তরে গ্রহণ করিয়া অহিংসনীতির কথা হিংস্র য়ুরোপের নিকট বৃথায়ই প্রচার করিয়া যান, জীবনে উহার প্রয়োগের কোনো অবসর তাঁহার হয় নাই। টলস্টয় যাহা নীতিরূপে প্রচার করেন, গান্ধীজি তাহা জীবনে বাস্তবরূপে গ্রহণ করেন (১৯০৬)। রবীন্দ্রনাথ সেই ভাবনাকে সাহিত্যরূপ দিলেন— ধনঞ্জয় বৈরাগী তাঁহার অহিংসনীতির প্রতীক। কবি বহুদিন হইতে বলিতেছিলেন যে ভারতের যিনি নায়ক হইবেন, তিনি হইবেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, ফকির। সেই আদর্শান্বিত নেতার মূর্তি হইতেছেন ধনঞ্জয় বৈরাগী। আর আধুনিক যুগে মহাত্মা গান্ধী সেই নীতিকে কেবল বাক্যে নহে, জীবনে বরণ করিয়া লইয়াছেন।

প্রায়শ্চিত্ত নাটকটি সমসাময়িক রাজনীতির ও দেশের জনমতের বিরুদ্ধে যেন রচিত। দেশ তখন কবির আরেকদিনের কথাই মনে মনে আবৃত্তি করিতেছিল, "অত্যাচারের বক্ষে পড়ি, হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি।" কিন্তু কবির কাছে আজ তাহারা শুনিতেছে "মারেন মরি বলো ভাই ধন্য হরি।" একথা শুনিবার জন্য তাহারা প্রস্তুত নয়। এখন তাহারা চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত চায়। তাছাড়া যে প্রতাপাদিত্যকে স্বদেশী যুগের পূর্ব হইতেই বাঙালি জাতি বাংলার শেষ গৌরব বলিয়া আদর্শায়িত করিয়া আসিতেছে, তাহার এ কী মূর্তি রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত করিলেন! লোকে কবির এই নাটকখানি গ্রহণ করিল না ; উহার অভিনয় কোনো পাবলিক রঙ্গমঞ্চে কখনো হইল না এবং ১৩১৬ সালে প্রথম মুদ্রণের পর দ্বিতীয় মুদ্রণ হয় বহু বৎসর পরে।

প্রায় তেরো বৎসর পরে কবি প্রায়শ্চিত্ত ভাঙিয়া 'মুক্তধারা' নাটক লেখেন (১৯২৫): প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে সাংকেতিক নাটকের সামান্য আভাস মুক্তধারায় তাহা আর একটু symbolic রূপ লইয়াছে ; উভয় নাটকে কতকগুলি সাধারণ চরিত্র আছে— তবে মুক্তধারার প্রতাপাদিত্য হইয়াছে রণজিৎ, উদয়াদিত্য অভিজিৎ, বসন্তরায় বিশ্বজিৎ ; ধনঞ্জয় উভয় নাটকে আছে।

বউঠাকুরানীর হাট বা মুক্তধারা নাম দুইটির অর্থ স্পষ্ট, কিন্তু কবি এই নাটকের নাম 'প্রায়শ্চিত্ত' কেন দিলেন, তাহা লইয়া নানা প্রকার গবেষণার অবসর দিয়া গিয়াছেন।[১] পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন উদয়াদিত্য, স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল বিভা! প্রতাপের নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত তো হইল না— সে কি তাহার অন্তর্দাহী অনুতাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল— সে কথা অনুক্ত, ইতিহাসে আছে কিনা জানি না।

প্রায়শ্চিত্ত নাটকে ২৩টি গান আছে ; অধিকাংশ গানই পূর্বের রচনা, নাটকের মধ্যে যোজিত হয় ; তবে কয়েকটি যে নাটক লিখিবার সময়েই রচিত তাহা গানের ভাব ও ভাষা হইতেই বুঝা যায়। গীতাঞ্জলি গানের অব্যবহিত পূর্বে শান্তিনিকেতনের উপদেশমালা প্রদানের পর্বে এই নাটকটি লিখিত ; সেইজন্য কয়েকটি গানের মধ্যে ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণের যে একটি গভীর আকুতি শোনা যায়, তাহার পটভূমি পাই উপদেশমালায়। প্রায়শ্চিত্তের যে গানগুলিকে গীতাঞ্জলির অগ্রদূত বলিতে চাহি তাহার তালিকা আমরা এইখানে দিলাম ; এই গানগুলি 'গান' গ্রন্থে (১৩১৫) ছিল :

১. আরো আরো প্রভু আরো আরো
২. আমরা বসব তোমার সনে
৩. আমাকে যে বাঁধবে ধরে
৪. কে বলেছে তোমায় বঁধু
৫. বলো ভাই ধন্য হরি (বাঁচান বাঁচি মারেন মরি)
৬. নয়ন মেলে দেখি আমায় বাঁধন বেঁধেছে
৭. আমারে, পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়

১ অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, পৃ. ২৭১-৭২

৮. রইল বলে রাখলে কারে
৯. ওরে আগুন আমার ভাই
১০. ওরে শিকল তোমায় কোলে করে
১১. সকল ভয়ের ভয় যে তারে।

ইহার অন্য গানগুলি—

১. বঁধুয়া, অসময়ে কেন হে প্রকাশ
২. ওর মানের এ বাঁধ টুটবে নাকি টুটবে না
৩. আজ তোমারে দেখতে এলেম
৪. মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
৫. সারা বরষ দেখিনে মা
৬. হাসিরে কি লুকাবি লাজে
৭. না বলে যেয়ো না চলে মিনতি করি
৮. ও যে মানে না মানা
৯. ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না
১০. গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ
১১. আমি ফিরব নারে, ফিরব না

এই গানগুলি 'গান' খণ্ডে আছে, প্রায়শ্চিত্তে আছে,— 'গানে' নাই সেরূপ গান একটি মাত্র 'মলিন মুখে ফুটুক, হাসি।'

প্রায়শ্চিত্ত নাটক আমাদের মতে ১৩১৫ সালের গোড়ার দিকে কোনো সময়ে লেখা ; কারণ ১৩১৫ সালের আশ্বিন মাসে যে 'গান' খণ্ড ছাপাখানায় ছিল তাহাতে প্রায়শ্চিত্তের একটি বাদে সকল গানই আছে। কবির গানের শেষ সংগ্রহ হয় ১৩১০ সালে মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের অষ্টম খণ্ডে। প্রায় এক শত নূতন গান যোজনা করিয়া নূতন 'গান' প্রকাশিত হয় পাঁচ বৎসরের পরে। এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার সিটিবুক সোসাইটি হইতে (১৯০৮ সেপ্টেম্বর)। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় ১৩১৬ সালের বৈশাখ মাসে (১৯০৯ এপ্রিল), 'হিতবাদী' উহা প্রকাশ করে।[১] ইহাই স্বরলিপি সংযোজিত প্রথম গ্রন্থ।

ঋতু-উৎসব— শারদোৎসব

১৩১৫ সাল। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে এখন প্রায় শতাধিক ছাত্র। ইহাদের শিক্ষা কিভাবে খেলা ও কাজের মধ্য দিযে আনন্দমূর্তি গ্রহণ করিতে পারে, ইহাই হইতেছে রবীন্দ্রনাথের প্রধান শিক্ষা-জিজ্ঞাসা। খেলা ও কাজ কথাটি বলামাত্র শিক্ষাব্রতীদের মনে হইতে পারে কবি বুঝি য়ুরোপের playway মতবাদ চর্চা করিতেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষাবিজ্ঞানের playway বা education through play এবং রবীন্দ্রনাথের খেলা ও কাজ সম্পূর্ণ পৃথক জগতের বিষয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে জীবন ছন্দোময় লীলারূপের প্রকাশ— জগতকে আনন্দের মধ্য দিয়া সহজভাবে ও স্বাভাবিক রূপে গ্রহণ ও দান করাই কবিধর্ম। এই আনন্দের ভিতরেই শিক্ষার গতি ও পরিণতি ; স্বাধীনতা ও সংযমের মধ্য দিয়া তাহার প্রকাশ ও পূর্ণতা। রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শনের মূলতত্ত্ব হইতেছে স্বাধীনতা ও আনন্দের মধ্য দিয়া শিশুমনের সুকুমার বৃত্তিগুলির উন্মোচন— বিদ্যায়তন সেই অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্র মাত্র। কবির মতে স্বাধীনতা নিয়মহীনতা নহে, সংযমও নিরানন্দময় নীতি পালন নহে ; আনন্দহীন সংযম ও বিচারবিহীন আচার পালন নঙাত্মক গুণমাত্র, তাহার দ্বারা বৃহৎ সৃষ্টি সম্ভবে না।

এই কারণে আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নাট্য ও ক্রীড়ার স্থান এত ব্যাপক। এই উভয় ক্ষেত্রে ব্যষ্টি বা ব্যক্তিকে সমষ্টির সহিত একযোগে, সংহত আবেগে কার্য করিতে হয়। স্বাধীনতার আনন্দময় রূপটি এইভাবেই প্রকাশ

১ গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপনের তারিখ "৩১শে বৈশাখ সন ১৩১৬ সাল"। কবি ২৬শে বৈশাখ কালকায় ছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে পত্র, বঙ্গবাণী ১৩৩৪ বৈশাখ।

পায়। খেলা ও কাজ কঠোর নিয়ম সংযমের মধ্যে সফল ও সুন্দর হয় বলিয়া আনন্দ কখনো উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছ্বাসে পরিণত হইতে পারে না। কিছুকাল পূর্বে জাতীয় শিক্ষাপরিষদে 'সৌন্দর্যবোধ'[১] বিষয়ে কবি যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সৌন্দর্যসাধনার সহিত ব্রহ্মচর্য বা সংযম অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ সম্ভোগ সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জীবনশিল্পে শাসনের সহিত স্বাধীনতা, সংযমের সহিত সৌন্দর্য সাধনা, জ্ঞানের সহিত সেবা অখণ্ডভাবেই গ্রথিত, এবং সংগতভাবেই অনুস্যূত হইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের এই খেলা ও কাজ মতবাদ কতখানি আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান -সম্মত তাহার বিচার ও বিশ্লেষণ করিবার প্রশস্ত ক্ষেত্র শিক্ষাব্রতীদের সম্মুখে এখনো উন্মুক্ত আছে।

যাহাই হউক, শান্তিনিকেতনের বিদ্যায়তনে গীতনাট্যাদি কোনোদিন নিন্দিত হয় নাই। বরং বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই এগুলি শিক্ষার স্বাভাবিক অঙ্গরূপেই স্বীকৃত হইয়াছিল। রথীন্দ্রনাথেরা ছাত্রাবস্থায় 'বিসর্জন' নাটক অভিনয় করেন, নিজেরাই নারীভূমিকায় নামেন।[২] এ ছাড়া 'বালক' পত্রিকা হইতে হেঁয়ালিনাট্য লইয়া মাঝে মাঝে অভিনয় হইত। 'হাস্যকৌতুক' তখন পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় নাই। তখন নাট্যঘর বা সংগীত-ভবনের স্টেজ ছিল না; লাইব্রেরী ঘরের পিছনে 'চাকরদের ঘর' নামে চালাঘরে অভিনয় হয়। তখন সেটা খাবার ঘররূপে ব্যবহৃত হইত।

কিন্তু যাহাকে ঋতু-উৎসব বলে তাহার প্রবর্তক হইতেছেন, রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ। ১৩১৩ সালের শ্রীপঞ্চমীর দিন (১৯০৭ ফ্রেব্রুয়ারি ১৭) তাহার উদ্যোগে এই ঋতুউৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শমীন্দ্রনাথ এবং আরও দুইজন ছাত্র বসন্ত সাজে, একজন সাজে বর্ষা; আর তিনজন হয় শরৎ। 'বসন্তে অনেক ফুল হয় বলিয়া যাহারা বসন্ত সাজিয়াছিল তাহারা ফুলের মুকুট মাথায় দিয়া, হাতে ফুলের সাজি লইয়া স্টেজে আসে।' "রীতিমত stage করে, সাজ করে হয়েছিল।" উৎসবটি হয় 'হল' [আদি কুটির] ঘরে। ছাত্ররা সংস্কৃত, ইংরেজি, বাংলা কাব্য হইতে ঋতুস্তব আবৃত্তি করে। শমীন্দ্রনাথ 'একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণে প্রাণেশ হে' গানটি করেন। শান্তিনিকেতনে ঋতু-উৎসবের ইহাই প্রথম অর্ঘ্য।[৩] এই ঋতুউৎসবের নয় মাস পরে শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় এবং তাহার আট মাস পরে শান্তিনিকেতনে পুনরায় ঋতুউৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৩১৫ সালের গ্রীষ্মাবকাশের পর তরুণ শাস্ত্রী ক্ষিতিমোহন সেন আশ্রমে অধ্যাপকরূপে আসিলেন। শমীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত ঋতুউৎসবের কথা বোধ হয় কবির মনে জাগিয়াছিল, তাই তিনি ক্ষিতিমোহনের উপর বর্ষা-উৎসব নূতন করিয়া করিবার ভার অর্পণ করিলেন।

এইখানে শ্রীক্ষিতিমোহন সেনের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ইনি কাশীতে মানুষ, বাল্য ও যৌবন সেখানে কাটে; সংস্কৃত কলেজ (কুইনস কলেজ) হইতে এম. এ. পাস করিয়া (১৯০২ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়) চম্পা রাজ্যে শিক্ষা বিভাগে চাকুরী পান। রবীন্দ্রনাথ ইঁহার সম্বন্ধে প্রথম জানিতে পারেন কালীমোহন ঘোষের নিকট হইতে, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিধুশেখর ভট্টাচার্য ইঁহার বাল্যবন্ধু, তাঁহাদের মারফত কবির সহিত ইঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে ইনি দেশের কাজ করিবার জন্য পূর্ববঙ্গে ঘুরিতেছিলেন, সেই সূত্রে কালীমোহন ঘোষের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয়। এই মানুষটিকে দেখামাত্র কবি বুঝিলেন যে, ইনি আশ্রমের আদর্শ

১ সৌন্দর্যবোধ, বঙ্গদর্শন ১৩১৩ পৌষ। সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৮, পৃ. ৩৫৫-৩৭২।

২ সন্তোষচন্দ্র মজুমদার— গোবিন্দমাণিক্য। রথীন্দ্রনাথ— জয়সিংহ। ব্রহ্মবিহারী সরকার— গুণবতী, দিনেন্দ্রনাথ— রঘুপতি। নয়ন চট্টোপাধ্যায়— নক্ষত্রমাণিক্য ভূমিকা গ্রহণ করেন।

৩ তথ্যগুলি তৎকালীন ছাত্র নরেন্দ্রনাথ খাঁর নিকটে পাই। শমীন্দ্রনাথের পত্রাংশ (শ্রীঅচ্যুত সরকারকে লিখিত) হইতে কতকগুলি তথ্য শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাকে দিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়, সরস্বতী পূজার দিন উৎসব হয়, ১৩১৩ ফাল্গুন ৫। (১৯০৭ ফ্রেব্রুয়ারি ১৭)

সেবক হইবেন। ক্ষিতিমোহনের তখন কুইনস কলেজে অধ্যাপনার একটি কাজ পাইবার কথা হইতেছিল, কবির আহ্বানে তিনি সে-কার্যে যোগদান না করিয়া আশ্রমে আসিলেন (১৯০৭)। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২৭।২৮ বৎসর। আসিয়াই আশ্রমের সকল কাজে কবির সহায় হইলেন। তারপর গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে শান্তিনিকেতনে তাঁহার স্থান সুনির্দিষ্ট ও সর্বজনবিদিত হইয়াছে। ১৩১৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে বিদ্যালয় খুলিলে তিনি কার্যে যোগদান করিয়াছিলেন ও সেই বৎসরই বর্ষাকালে কবির ইচ্ছানুসারে বর্ষা-উৎসব নিষ্পন্ন করেন। ক্ষিতিমোহন ও বিধুশেখর বেদাদি গ্রন্থ হইতে বর্ষার উপযোগী শ্লোক ও স্তোত্র সংগ্রহ করিয়া ছাত্রদের দ্বারা আবৃত্তির ব্যবস্থা করিলেন। উৎসবক্ষেত্রে পর্জন্য দেবতার বেদী বৈদিক রীতিতে রচিত হইয়াছিল।[১]

এই বর্ষা-উৎসবের ঘটনাটি সামান্য হইলেও বিশেষভাবে আলোচ্য। বালক শমীন্দ্রনাথ তাঁহার সহজ রসবোধ হইতে ঋতু-উৎসবের আয়োজন করিয়াছিল তাহার মধ্যে কোনো বিশেষ সংস্কৃতির বিশেষ রূপটি প্রকাশের কোনো অভিপ্রায় ছিল না, বিশুদ্ধ আনন্দের প্রকাশই ছিল একমাত্র অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য। এইবারকার বর্ষা-উৎসবের সময় হইতে আশ্রমের উৎসবাদির মধ্যে বৈদিক মন্ত্রাদি প্রচলনের সূত্রপাত হইল। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যে ধর্ম স্বীকৃত হইত, তাহা আদি ব্রাহ্মসমাজীয় 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ -আশ্রিত। উক্ত সমাজের উপনয়ন বিবাহাদি ক্রিয়া যজ্ঞহীন বৈদিক মতেই নিষ্পন্ন হইত। এইবার শান্তিনিকেতনের উৎসবাদির ক্ষেত্রে সেই বৈদিকতা নূতন রূপে প্রবেশ করিল—তার প্রবেশ হইল আর্টরূপে।

রবীন্দ্রনাথের প্রগতিপরায়ণ মন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রাচীনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের প্রতি 'শাস্ত্রে'র মোহ কবির কোনো কালেই ছিল না। কিন্তু সাংস্কৃতিক পারম্পর্যহেতু তাহাদিগের প্রতি অশ্রদ্ধাও কখনো দেখান নাই। তবে বৈদিকাদি অনুষ্ঠানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও আকর্ষণটা এই সময় হইতে ক্রমেই যেন বেশি করিয়া দেখা দিতে থাকে। কালে যখন শান্তিনিকেতন সর্বমানব ও সর্বধর্মের তীর্থস্থান বলিয়া ঘোষিত হইল, তখনও তথাকার বিচিত্র জীবনধারা ও যুক্তিআশ্রয়ী আধুনিকতার সহিত প্রাচীন বৈদিকতার প্রবলতার মধ্যে যে কোনো অসংগতি থাকিতে পারে, তাহা কবি বা বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ কখনো স্বীকার করেন নাই। আমাদের মতে বিশ্বভারতী এখন যেভাবে বিশ্বমানবের মিলনকেন্দ্র হইয়াছে, তাহাতে সাধারণের উৎসবক্ষেত্রে এই অতি-বৈদিকতা সমর্থন করা যায় না।

তবে রবীন্দ্রনাথের মনকে এইসব প্রাচীনতা ও মধ্যযুগীয়তা যে স্পর্শ করিত তাহার প্রেরণা ছিল আর্টের, যেমন বাল্যকালে বৈষ্ণব-পদ-সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন কাব্যরত্ন পাইবার আশায়, বৈষ্ণবধর্মতত্ত্ব আলোচনার জন্য নহে। সাহিত্যের দিক হইতে বৈদিকমন্ত্রের গম্ভীর ছন্দোময় ভাষা তাহার উদার স্বচ্ছভাবরাজি তাঁহার যেমন আকর্ষণের বিষয় ছিল— আর্টের দিক হইতে উৎসবের সজ্জাবিধিও তাঁহার শিল্পমানসকে তেমনই উদ্‌বোধিত করিয়াছিল। উৎসবের সজ্জাবিধি শিল্পীরত্ন নন্দলাল বসুর সহায়তায় কালে অপরূপ সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়া উঠে; এইসব সৌন্দর্য-পরিকল্পনায় তন্ত্রোল্লিখিত নানাপ্রকার মণ্ডল, চক্র, আসন, মুদ্রা ও ব্রতাদির আলিপনা গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের ধর্মের রহস্য ও রূপক সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়া বিশুদ্ধ আর্ট বা সৌন্দর্যের প্রতীকরূপে নব কলেবরে দেখা দিয়াছে। যাহা ছিল ধর্মের অঙ্গ, তাহা হইল আর্টের বিষয়। কালে ধর্ম ও আর্ট একাঙ্গ হইয়া গেল, কারণ তাহাই হইতেছে কবিমানসের পরিপূর্ণতা।

বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে আধুনিক জগতের সকল প্রকার ভাবধারা অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায়— এ কথা বলিলে মানবের বিবর্তনবাদকেই অস্বীকার করা হয়। সেখানে উপলখণ্ডের মধ্যে শীর্ণ উৎসের সন্ধান পাইতে পারি কিন্তু

১ দ্র বিশ্বভারতী পত্রিকা [হিন্দি] ২০০৩ বি, অ (১৩৫১) পৃ ৫২৩-২৪।

তাহাকে জীবন-জিজ্ঞাসার পরম রসসাগর বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব না। রবীন্দ্রনাথের মানসচন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধির মধ্যে আর্টসর্বস্বতা বারে বারে ফিরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে ; সেই 'আর্টসর্বস্ব' মনোভাব হইতে অনেক কিছুই জীবনে গ্রহণ ও বর্জন করিয়াছিলেন। এই গ্রহণ-বর্জন কবির ব্যক্তিগত জীবনকে দোলায়িত করিলেও, এই সব আন্দোলনের ঊর্ধ্বে উঠিবার মতো গভীর মনন নিদিধ্যাসনশক্তি তাঁহার ছিল— যাহা সাধারণ আর্টবিলাসী ভক্তদের মধ্যে আশা করা যায় না। সেইজন্য দেখা যায় এই আর্টবিলাস তাঁহার বিদ্যায়তনকে নানাভাবে রূপান্তরিত করিয়া চলিয়াছে এবং তাঁহার নামে সর্বত্র অনুষ্ঠিত উৎসবাদি আর্টবিলাসীদের শ্রীক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে।

শান্তিনিকেতনে বৈদিক মতে অনুষ্ঠিত বর্ষা-উৎসবের সময় কবি ছিলেন শিলাইদহে গ্রামসংস্কার লইয়া ব্যস্ত। উৎসবের সংবাদ পাইয়া কবির মনে শরৎ-কালের উপযোগী উৎসব করিবার কথা উদিত হইল ; তিনি শারদোৎসবের জন্য বর্ষার মধ্যেই শরতের গান[১] রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

শিলাইদহ হইতে ফিরিয়া কবি কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত ছাত্রসমাজের উদ্যোগে আহূত সভায় 'পূর্ব ও পশ্চিম'[২] নামে যে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, তাহার কথা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। এই ভাষণ দানের অব্যবহিত পরে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া কবি শারোদৎসবের জন্য রচিত গানগুলিকে কেন্দ্র করিয়া যে নাটিকা লিখিলেন, তাহা 'শারদোৎসব' নামেই পরিচিত (৭ ভাদ্র ১৩১৫)।[৩]

শারদোৎসব রচনার পর কবি প্রায় প্রত্যেক ঋতুর উপযোগী নাটক ও গান রচিয়াছেন— শারোদৎসব এই ঋতুচক্র পূজার প্রথম অর্ঘ্য। বসন্তোৎসবে হইয়াছে 'রাজা' ও 'ফাল্গুনী,' বর্ষা নামিয়াছে 'অচলায়তনে'—ষড়ঋতুর সমাবেশ হইয়াছে 'নটরাজের' নৃত্যগীতমুখরিত ছন্দের হিল্লোলে। কবি বলিয়াছেন, "শারদোৎসব থেকে আরম্ভ করে ফাল্গুনী পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি, যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়োটা ওই একই। রাজা বেরিয়েছেন সকলের সঙ্গে মিলে শারদোৎসব করবার জন্যে। তিনি খুঁজছেন তাঁর সাথি। পথে দেখলেন ছেলেরা শরৎপ্রকৃতির আনন্দে যোগ দেবার জন্যে উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু···উপনন্দ···প্রভুর ঋণ শোধ করবার জন্যে নিভৃতে বসে একমনে কাজ করছিল। রাজা বললেন, তার সত্যকার সাথি মিলেছে, কেননা··· ওই ছেলেটি দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণশোধ করছে : সেই দুঃখেরই রূপ মধুরতম। বিশ্বই যে এই দুঃখ-তপস্যায় রত ; অসীমের যে দান সে নিজের মধ্যে পেয়েছে অশ্রান্ত প্রয়াসের বেদনা দিয়ে সেই দানের সে শোধ করেছে।[৪]

ইহার এগারো বৎসর পর কবি এই নাটকখানি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি : "শারদোৎসবের ছুটির মাঝখানে বসিয়া উপনন্দ তার প্রভুর ঋণ শোধ করিতেছে ; রাজসন্ন্যাসী এই প্রেমঋণ-পরিশোধের, এই অক্লান্ত আত্মোৎসর্গের সৌন্দর্যটি দেখিতে পাইলেন। তাঁর তখনি মনে হইল, শারদোৎসবের মূল অর্থটি এই ঋণশোধের সৌন্দর্য। শরতে এই-যে নদী ভরিয়া উঠিল কূলে কূলে, এই-যে খেত ভরিয়া উঠিল শস্যের

১ আমাদের মনে হয় নিম্নোল্লিখিত গান কয়টি শিলাইদহে ১৩১৫ শ্রাবণ মাসে রচিত। ১ আজ ধানের ক্ষেতে (গীতাঞ্জলি ৮) ২ আনন্দেরি সাগর থেকে (ঐ ৯) ৩ তোমার সোনার থালার (ঐ ১০)

২ পূর্ব ও পশ্চিম, প্রবাসী ১৩১৫ ভাদ্র। ইহার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'বঙ্গদর্শন' ১৩১৫ ভাদ্র সংখ্যায় 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' নামে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২।

৩ নিম্নলিখিত গানগুলি এ সময়ে রচিত—। আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ (৩ ভাদ্র) ২। লেগেছে অমল ধবল পালে (৩ ভাদ্র) ৩। আমার নয়ন ভুলানো এলে (৭ ভাদ্র ১৩১৫)।

৪ আমার ধর্ম, সবুজপত্র ১৩২৪ আশ্বিন-কার্তিক। দ্র, আত্মপরিচয় পৃ. ৬৬। গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৭, পৃ. ৫৪৬

ভারে, ইহার মধ্যে একটি ভাব আছে, সে এই. প্রকৃতি আপনার ভিতরে যে অমৃতশক্তি পাইয়াছে সেটাকে বাহিরে নানা রূপে নানা রসে শোধ করিয়া দিতেছে। সেই শোধ করাটাই প্রকাশ। প্রকাশ যেখানে সম্পূর্ণ হয় সেইখানেই ভিতরের ঋণ বাহিরে ভালো করিয়া শোধ করা হয়; সেই শোধের মধ্যেই সৌন্দর্য···উপনন্দ তাহার প্রভুর নিকট হইতে প্রেম পাইয়াছিল, ত্যাগস্বীকারের দ্বারা প্রতিদানের পথ বাহিয়া সে যতই সেই প্রেমদানের সমান ক্ষেত্রে উঠিতেছে ততই সে মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করিতেছে। দুঃখই তাহাকে এই আনন্দের অধিকারী করে। ঋণের সহিত ঋণশোধের বৈষম্যই বন্ধন এবং তাহাই কুশ্রীতা।"[১]

নাটক লিখিয়া কবি কোনোদিনই তৃপ্ত হন নাই; নাটকের রূপটি অভিনয়ের মধ্য দিয়া না দেখিতে পারিলে তাঁহার আর্টিস্ট হৃদয় খুশি হয় না। তাই শারদোৎসবের অভিনয় হইল ছাত্র ও অধ্যাপকদের মিলিত চেষ্টায়।[২]

এই অভিনয় উপলক্ষ্যে কবি একটি নান্দী রচনা করেন, তাহার একটি কবিতা ও আরেকটি গান। নান্দীর কবিতাটি[৩] নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

শরতে হেমন্তে শীতে বসন্তে নিদাঘে বরষায়
অনন্ত সৌন্দর্যধারে যাঁহার আনন্দ বহি যায়
সেই অপরূপ, সেই অরূপ, রূপের নিকেতন
নব নব ঋতুরসে ভ'রে দিন সবাকার মন।
প্রফুল্ল শেফালি কুঞ্জ যাঁর পায়ে ঢালিছে অঞ্জলি,
কাশের মঞ্জরীরাশি যাঁর পানে উঠিছে চঞ্চলি—
স্বর্ণদীপ্তি আশ্বিনের স্নিগ্ধ হাস্যে সেই রসময়
নির্মল শারদরূপে কেড়ে নিন সবার হৃদয়।

নান্দীর গানটি হইতেছে—'তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে'। গানটি পরে গীতাঞ্জলির মধ্যে সন্নিবেশিত হয় (৭নং)। নান্দীর কবিতাটি গ্রন্থমুদ্রণের সময় বাদ দিয়া দেন। কারণ অতি পরিষ্কার। কবিতা হিসাবে যে উহা অচল, তাহা রসগ্রাহী কবি বুঝিতে পারিয়া 'খেয়া'র বিকাশ নামে কবিতাটির (২৪ মাঘ ১৩১২ শিলাইদহে লিখিত) সামান্য অংশ বাদ দিয়া গ্রন্থের ভূমিকারূপে প্রযোজন করিলেন; গানটির প্রথম পংক্তি 'আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি'।

শারদোৎসব নাটিকা লিখিবার সময় কবির মনে ছিল আশ্রমের ছেলেদের উপযোগী নাটক রচনা; কিন্তু রচনার মধ্যে কোথাও ছেলেমানুষি নাই—বিরাট আদর্শবাদ ও গভীর সৌন্দর্যতত্ত্ব গ্রন্থ মধ্যে ফল্গুর ন্যায় প্রবাহিত। তাহার তটভূমি সংগীতে, কলহাস্যে বিদ্রূপে মুখরিত। ইহার মধ্যে যে স্বচ্ছ ও সহজগতি স্পষ্ট-রূপকতা ও অলংকার-বিবর্জিত সরলতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা কবির এই শ্রেণী আর কোনো নাটিকার মধ্যে পাই না। সন্ন্যাসীই যে মহারাজা বিজয়াদিত্য এই সংবাদটুকু নাট্যের শেষ পর্যন্ত প্রচ্ছন্ন রাখিয়া রচনাকে যথার্থ নাট্যীয় রূপ দিয়াছেন। এই নাটকের অপরূপ সৃষ্টি ঠাকুরদা— সর্বসহা সর্বমানবের দরদী বন্ধু; তিনি শিশুর খেলার সাথি, তরুণের বন্ধু, বৃদ্ধের বয়স্য।

১ শান্তিনিকেতন পত্র ১ম বর্ষ ১৩২৬, পৃ. ২৮-২৯। গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৭, পৃ. ৫৪১-৫৪৬।

২ প্রথম অভিনয়ের প্রধান অংশ— সন্ন্যাসী-বিজয়াদিত্য ক্ষিতিমোহন সেন। ঠাকুরদা অজিতকুমার চক্রবর্তী। লক্ষ্মীশ্বর দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপনন্দ নরেন্দ্রনাথ খাঁ (ছাত্র)। রবীন্দ্রনাথ প্রম্‌টারের কাজ করেন। এই সময় বিধুশেখর ভট্টাচার্য প্রবাসীতে (১৩১৫ কার্তিক) বৈদিক শারদোৎসব নামে একটি প্রবন্ধ লিখেন।

৩ ভারতী ১৩১৫ কার্তিক, দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ৭, পৃ ৫৫০।

রবীন্দ্রসাহিত্যে নানাভাবে, নানা নামে এই একটি চরিত্র দেখা দিয়াছে— প্রায়শ্চিত্তে ইঁহাকেই ধনঞ্জয় বৈরাগীর মূর্তিতে পাই, তাহারও পূর্বে বিল্বনকে দেখিয়াছি রাজর্ষির মধ্যে, ডাকঘরে ইনিই ঠাকুরদা।

কিছুকাল হইতে রবীন্দ্রনাথ দেশসেবা ও গ্রামসংস্কারের যেসব কথা ভাবিতেছিলেন, তাহার মধ্যে প্রধান কথাটিই ছিল উচ্চনীচে, ছোটোয়-বড়োয় ভেদ ঘুচানো। দেশের মধ্যে মিলনের বাধা কোথায়, এবং কেমন করিয়া সে বাধা দূর হইতে পারে ইহাই হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথের প্রধান সমাজ-জিজ্ঞাসা। সমসাময়িক একখানি পত্রে মনের কথাটি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন "বোলপুর বিদ্যালয়ে ভদ্রলোকের ছেলেদের কিছু পরিমাণে অভদ্র এবং অভদ্রলোকের ছেলেদের কিছু পরিমাণ ভদ্র করে উভয় শ্রেণীর বিচ্ছেদ দূর করবার চেষ্টা করচি।"[১] শারদোৎসবের রাজা বিজয়াদিত্য 'রাজতক্ত ছেড়ে সন্ন্যাসী সেজে সকল লোকের মাঝখানে নেবে' এসেছিলেন।

আজ ধনী ও অভিজাতের সম্মুখে এই সমস্যাই তীব্রভাবে দেখা দিয়াছে, 'শ্রেণীবিচ্ছেদ' এখন আর কল্পনার বিষয় নহে ; তবে সে-সমস্যা সমাধানের উপায় সংগ্রাম নহে, তাহার উপায় রাজার সন্ন্যাসগ্রহণ, দারিদ্র্যবরণ। শারদোৎসবের রাজা বলিয়াছিলেন, 'রাজা হতে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই'। সর্বসাধারণের সঙ্গে মিলিত হইবার বাণীই ছিল সেদিনকার আকাশে বাতাসে স্বদেশী আন্দোলনের উচ্ছ্বাসে। রাজা সন্ন্যাসীবেশে সর্বসাধারণের সঙ্গে মিলিতেছেন ; জ্ঞানবৃদ্ধ, বালকদের সঙ্গে ক্রীড়ায় মত্ত ; সকলেই প্রকৃতির ও প্রাকৃতজনের মধ্যে আপনাকে পাইবার জন্য বাহির হইয়াছেন।[২]

শারদোৎসবের রচনাকালে 'গোরা' উপন্যাস লেখা চলিতেছে ; দেশকে জানিবার জন্য গোরার যে আকাঙ্ক্ষা তাহা এখানে স্মরণীয় ; সে-ও বাহির হইয়াছিল দেশকে দেখিতে, মানুষকে চিনিতে। মোটকথা, শারদোৎসবকে ঋতু-উৎসবের প্রথম অর্ঘ্য ও symbolic নাট্যের প্রথম প্রয়াসরূপে দেখিয়াও, কবির মনের উপর সমসাময়িক বাস্তব ঘটনা-পুঞ্জের প্রভাব অস্বীকার করিবার কোনো কারণ নাই ; অনেক ভাবনা, অনেক ঘটনা অবচেতন মনের তলায় চাপা থাকে ; রচনার সময়ে কখন-যে তাহারা লেখনীকে আশ্রয় করে তাহা কেহ জানিতেও পারে না।

শারদোৎসব নাটকের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ 'মুকুট' নামে একখানি ক্ষুদ্র নাটিকা লেখেন। ১২৯২ সালে 'বালক'পত্রিকায় 'মুকুট' গল্পটি প্রকাশিত হয়। উহারই আখ্যান লইয়া নাটক লিখিলেন ; এই নাটকও শারদোৎসবের ন্যায় স্ত্রীচরিত্র শূন্য বলিয়া বিদ্যালয়ের বালকদের দ্বারা সহজে অভিনেয়। ইহাতে গান বা কোনো symbolism নাই, নাটক-রচনার সনাতন পথ ধরিয়া লিখিত— তবে ইহার কলেবর অত্যন্ত ক্ষুদ্র।

মুকুট গল্প ও নাটকের মধ্যে পটভূমিকা ও কাহিনীর বিন্যাসে কোনো পার্থক্য নাই, শুধু শেষ দৃশ্যের প্রয়োজনীয় পরিবর্তনটুকু ছাড়া। গল্প যেখানে শুধুই ট্রাজেডি, নাটকটি সেখানে নাটকীয় কারণেই মিলনান্তক। এই পরিবর্তনে দুই কাহিনীর অন্যতম নায়ক রাজধরের চরিত্রেও কিছুটা সংস্কার ও রূপান্তর আনিয়া দিয়াছে।[৩]

১ ৩০ আষাঢ় ১৩১৫। স্মৃতি পৃ ৭১।

২ দ্র ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৫২১, ২৪ ভাদ্র ১৩২৯। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৭, পৃ. ৫৪৭ শারদোৎসব "হচ্ছে ছুটির নাটক। ওর সময়ও ছুটির, ওর বিষয়ও ছুটির। রাজা ছুটি নিয়েছে রাজত্ব থেকে, ছেলেরা ছুটি নিয়েছে পাঠশালা থেকে। তাদের আর-কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই, কেবল একমাত্র হচ্ছে—'বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকাল বেলা।' ওর মধ্যে একলা উপানন্দ কাজ করছে, কিন্তু সেও তার ঋণ থেকে ছুটি পাবার কাজ।"

৩ দ্র, অরবিন্দ পোদ্দার : রবীন্দ্রনাথের কিশোর-সাহিত্য —ক্রান্তিকাল, ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ১৩৬৪-৬৫ পৃ. ১৬৯-১৭১। এই প্রবন্ধে বিষদ আলোচনা আছে।

বিচিত্র ঘটনা

শারদোৎসব অভিনয়ের পর বিদ্যালয় পূজাবকাশের জন্য বন্ধ হইয়া গেলে, কবি 'শিশুশূন্য শান্তিনিকেতনে একলা বসিয়া গোরা লিখিবার উদ্যোগে' আছেন। আর 'অর্শের বেদনা মাঝে মাঝে সঙ্গ রাখিবার চেষ্টা করিতেছে'।"[১]

আশ্বিনের শেষাশেষি কবি শিলাইদহ গেলেন; শান্তিনিকেতনের 'সন্ন্যাস-আশ্রম' ত্যাগ করিয়া শিলাইদহে 'রাজতক্তে' চলিলেন।[২] সঙ্গে দুই কন্যা বেলা ও মীরা আর লাবণ্যলেখা নামে একটি বিধবা বালিকা—বেলার বয়সী। এই বালিকা কবিকে পিতার ন্যায় গুরুর ন্যায় দেখিতেন, কিছুকাল হইতে কবির পরিবারের মধ্যে আছেন।[৩]

শিলাইদহে বাসকালে কবির দিন কাটে পল্লীউন্নয়নের পরিকল্পনায় ও পরিচালনায়; অবসর সময়ে মেয়েদের লইয়া পড়াশুনা করেন; অন্যসময়ে গোরা লেখেন। এইখানে সংবাদ পাইলেন তাঁহার মধ্যম জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কয়েকদিনের জ্বরে ভুগিয়া মারা গিয়াছেন। মধ্যমা রেণুকার মৃত্যুর পর (১৩১০ আশ্বিন) সত্যেন্দ্রনাথ বিবাহ করেন নাই; মাস তিন পূর্বে কবিই উদ্যোগী হইয়া পাথুরিয়াঘাটার সতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কন্যা ছায়ার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন (১৩১৫ আষাঢ় ৪)। সত্যেন্দ্রনাথ পূজাবকাশের অব্যবহিত পূর্বে শারদোৎসব নাটক অভিনয়ের সময় আশ্রমে আসিয়াছিলেন। তারপর পূজার ছুটির সময় তিনি ও দিনেন্দ্রনাথ পশ্চিম-ভারত ভ্রমণে বাহির হন: লাহোর পৌঁছিলে উভয়েই জ্বরাক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন ও তিন-চারি দিনের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু ঘটে। এই আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ কবির হৃদয়কে বিশেষভাবে স্পর্শ করে। বিধবা ছায়ার কথা তাঁহার মনে হইতেছে, কারণ তিনিই উদ্যোগ করিয়া বিবাহ দেন। ইহার কিছুকাল পূর্বে গগনেন্দ্রনাথের ভগ্নী বিনয়িনীর বালিকা কন্যা প্রতিমা অকালে বিধবা হইয়াছে; লাবণ্যলেখাও বাল্যবিধবা। কবির মনে বিধবাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন উঠে। একদিন মেয়েদের সঙ্গে এইসব কথার আলোচনা প্রসঙ্গে কবি উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠেন, "আমি রথীর বিবাহ হয় অসবর্ণে দিব, নয় বিধবার সহিত দিব।" কবি রথীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁহার কথাটি কার্যে পরিণত করেন।

এমন সময়ে আরেকটি দুঃসংবাদ আসিল; দুম্‌কায় তাঁহার বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে মারা গিয়াছেন (২৩ কার্তিক ১৩১৫)। শ্রীশচন্দ্রের সহিত কবির ঘনিষ্ঠতা সন্ধ্যাসংগীতের যুগ হইতে; তারপর গিরিধিতে তিনি যখন ল্যাণ্ড এ্যাক্যুজিশন অফিসার, তখন কবি প্রায়ই সেখানে যাইতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সন্তোষচন্দ্র রথীন্দ্রের সতীর্থ, এখনো আমেরিকায় সহাধ্যায়ী। মধ্যমপুত্র সরোজ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র—কবির কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রের বন্ধু। শ্রীশচন্দ্রের পরিবার বৃহৎ, অনেকগুলি কন্যা তখনো অনূঢ়া। পিতার অকালমৃত্যুতে সন্তোষচন্দ্রকে যে কী কঠিন সংগ্রামের মধ্যে পড়িতে হইবে তাহা নিশ্চয়ই কবিকে ভাবিত করিয়াছিল।

পূজাবকাশের পর কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়াছেন। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিতেছেন, বিদ্যালয়ের "নূতন সেশন আরম্ভ হয়েছে। তাই নিয়ে আমাকে বিশেষ ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। আমাকেও ক্লাশ নিতে হচ্চে, তাতে ক্লাশের সুবিধা হচ্চে কিনা বলা কঠিন, কিন্তু আমার সমস্ত অবসর মারা যাচ্চে।"[৪] এবার ছুটির পর

১ ১৩১৫ আশ্বিন, ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে লিখিত পত্র, নং ১১। দেশ ১৩৪৯ শারদীয়া সংখ্যা।

২ দেশ ১৩৪৯ পূজা সংখ্যা, পত্র নং ১২।

৩ লাবণ্যলেখার জ্যেষ্ঠ সহোদর বিভুচরণ গুহঠাকুরতা ঢাকার উকিল ছিলেন। অন্য ভ্রাতা স্বামী পরমানন্দ আমেরিকায় বেদান্ত সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মিশনের সহিত যুক্ত। লাবণ্যর সহিত পরে অজিতকুমার চক্রবর্তীর বিবাহ হয়।

৪ পত্র ১৩১৫ অগ্রহায়ণ। স্মৃতি, পৃ ৭৫।

'একটি বালিকা বিদ্যালয়ের ছোট্ট চারা আপনিই গজিয়ে' উঠে। কবি লিখিতেছেন, "অনেক দিন থেকে মনে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ভঁয়ে এগইনি— ঠাকুর যখন আপনিই ঘরে এসেছেন পূজা না করে ত আর নিষ্কৃতি নেই।"[১]

অতি সামান্য ও স্বাভাবিকভাবে বালিকা বিদ্যালয়টির পত্তন হয়। সহ-শিক্ষা (co-education) তখন এদেশের কোনো বাঙালি স্কুলে প্রবর্তিত হয় নাই—কবির মনেও সেসব জটিল প্রশ্ন সেদিন উঠিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার নিজ কন্যা মীরা ও বেলার পড়ার ব্যবস্থা মাঝে মাঝে করিয়াছিলেন বটে, তবে তাহাকে বিদ্যালয়ের অন্তর্গত শিক্ষা বলিতে পারা যায় না।

মেয়েদের মধ্যে লাবণ্যলেখা আছেন। মোহিতচন্দ্র সেনের বিধবা পত্নী সুশীলা সেন দুইটি বালিকা কন্যা লইয়া আসিলেন; অরুণেন্দ্রনাথের কন্যা সাগরিকা ছিল। বাহিরের আরও পাঁচটি কন্যা আসেন[২]। এইভাবে ভাবী শ্রীসদন পত্তন হইল; কবি ভাবিতেছেন এই বিদ্যালয় 'হুহু করে বেড়ে ওঠবার মতলব' করছে। কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যেই নানা অসুবিধার জন্য মেয়ে বোর্ডিং উঠাইয়া দিতে হয়। ১৯০৮ অক্টোবর হইতে ১৯১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিদ্যালয়টি চলে।

বিদ্যালয় লইয়া কবি যখন 'বিশেষ ব্যস্ত' এমন সময়ে একটি অতর্কিত উপদ্রব আসিয়া তাঁহার সমস্ত চিন্তা ও কর্মসূত্রকে ছিন্ন করিয়া দিল। খুলনার ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট হইতে তাঁহার নামে এক সাক্ষীর সমন আসিল। খুলনা সেনহাটি জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক হীরালাল সেন 'হুঙ্কার' নামে এক কবিতার বই লিখিয়া রবীন্দ্রনাথের নামে তাঁহার অজ্ঞাতেই উৎসর্গ করেন। ইতিমধ্যে কাব্যখানি রাজদ্রোহের বেড়াজালে পড়ে এবং রবীন্দ্রনাথের নাম জড়িত থাকায় তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত খুলনার আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় গিয়া দাঁড়াইতে হইল। 'হুঙ্কারে'র জন্য হীরালাল সেনের ছয় মাসের জেল হইল।[৩]

এই সময়ে বাংলাদেশের রাজনীতির উপর ভারত সরকারের শ্যেনদৃষ্টি পড়িল। বঙ্গচ্ছেদকে কেন্দ্র করিয়া তিন বৎসর পূর্বে বৃটিশ পণ্য বয়কটের যে আন্দোলন শুরু হয়, তাহা ক্রমে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের আন্দোলনে রূপায়িত হইয়াছে—যাহা ছিল বাংলার স্থানীয় রাজনীতি তাহা হইয়াছে এখন ভারতীয় রাজনীতি— বাঙালিই তাহার পথপ্রদর্শক, বাঙালিই তখন ভারত-রাজনীতির নেতা। বাঙালির এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করিবার জন্য ভারত গবর্মেণ্ট কোম্পানির শাসন যুগের ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন আইন প্রয়োগ করিয়া বাংলার বিশিষ্ট কয়েকজন কর্মীকে অন্তরায়িত করিলেন।[৪]

১ পত্র ১৩১৫ চৈত্র ৩১। স্মৃতি, পৃ ৭৬।

২ ১৩১৫ সালের পূজাবকাশের পর (১৯০৮ অক্টোবর) ঢাকার প্রসন্নকুমার সেনের দুই কন্যা হিরণবালা ও ইন্দুলেখা আসেন। পৌষ উৎসবের পর আসেন হেমলতা (টুলু) মধুসূদন সেনের কন্যা। মধুসূদন বাবু ক্ষিতিমোহন সেনের শ্বশুর; ইনি শান্তিনিকেতনে তাঁহার অন্যান্য ছেলেদেব পড়িতে পাঠান। গয়ার তারকচন্দ্র রায় ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীশচন্দ্রের দুই কন্যা আসেন—প্রতিভা ও সুধা। তারকচন্দ্র রায়ের চারিপুত্রই শান্তিনিকেতনের ছাত্র। আর ছিলেন অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা সাগরিকা। প্রথম অজিতকুমারের জননী সুশীলাদেবী ছাত্রীদের দেখা-শুনা কবিতেন; পবে মোহিতচন্দ্র সেনের বিধবা পত্নী সুশীলাদেবীর উপর উহার দায়িত্ব অর্পিত হয়। ১৩১৭ সালের গ্রীষ্মাবকাশের পূর্বে তিনি ঐ কার্য হইতে মুক্তিলাভ কবেন ও ছুটির পর এই গ্রন্থলেখকের জননী গিরিবালাদেবী বালিকাদের ভার গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বেই নানা কারণে মেয়ে বোর্ডিং পরিচালনা সংকটময় হইয়া উঠিয়াছিল, এবং পূজাবকাশের পর উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় (১৯১০)।

৩ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখিত পত্র, ৯ অগ্রহায়ণ ১৩১৫। দ্র বঙ্গবাণী, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩৩৩, পৃ ২২৮। হীরালাল সেন যে জাতীয় শিক্ষালয়ে কাজ করিতেন তাহা উঠিয়া গেলে কবি তাঁহাকে (১৯১০ জুলাই। ১৩১৭ আষাঢ়) শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতার কায দেন। কিন্তু বঙ্গীয় সরকারের কোপদৃষ্টি থাকায় শেষ পর্যন্ত কবি তাঁহাকে আশ্রমে রাখিতে পারিলেন না। ১৯১১-র শেষভাগে তাঁহাকে নিজ জমিদারিতে কবি কাজ দেন। সেখানে কার্যে নিযুক্ত অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

৪ সঞ্জীবনী সাপ্তাহিকের সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র, বরিশালের নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত, বরিশালের ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঢাকা অনুশীলন সমিতির নেতা পুলিনচন্দ্র দাস, নবশক্তি কাগজের সম্পাদক গিরিধির অভ্রব্যবসায়ী মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, সাংবাদিক ও বক্তা শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, ছাত্রনেতা শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, ঢাকার ভূপেশচন্দ্র নাগ. কলিকাতার বিখ্যাত দানবীর সুবোধচন্দ্র মল্লিক (১৯০৮ অক্টোবর ১৩। ১৩১৫ কার্তিক ২৭) অন্তরায়িত হন।

বাংলাদেশের বুকের উপর দিয়া এত বড়ো একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিয়া গেল অথচ এই ব্যাপার লইয়া রবীন্দ্রনাথের কোনো পাবলিক উক্তি কোথাও পাই না, এমনকি চিঠিপত্রের মধ্যেও কোনো উল্লেখ এখনো পর্যন্ত চোখে পড়ে নাই। কবির এই তুষ্ণীভাব ও নীরবতা দেখিয়া আমাদের বড়ই আশ্চর্য বোধ হয়। অথচ ইহা অপেক্ষা কত সামান্য, এমন কি তুচ্ছ ঘটনা লইয়া তিনি প্রবন্ধ, প্রসঙ্গকথা লিখিয়াছেন! পরযুগে বাংলাদেশ অন্তরীণে ও কারাবাসে অভ্যস্ত হইয়া যায়, কিন্তু ১৯০৮ সালের লোকে এই ঘটনার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। এই বিপদের মুহূর্তে পূর্বের ন্যায় কবির বাণী শুনিতে পাই না কেন। অথচ অন্তরায়িতদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার পরিচিত—কয়েকজনকে ঘনিষ্ঠভাবেই জানিতেন—যেমন সুবোধচন্দ্র মল্লিক। ইঁহার সহিত সংগীত-সমাজে বহু দিন একত্র অভিনয় করিয়াছেন, বাড়িতে আসা-যাওয়া ছিল আত্মীয়ের মতো। অথচ এই তুষ্ণীভাব কেন, তাহার কোনো সদুত্তর পাই না। একমাত্র উত্তর রবীন্দ্রনাথ কবি—তাঁহার স্পর্শচেতন মন কোন্‌টিতে সাড়া দিবে কোন্‌টিতে দিবে না তাহা বিশ্লেষণ করা জীবনকারের এক্তিয়ারের বাহিরে।

গত এক বৎসরের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনেকগুলি মৃত্যুদুঃখের আঘাত পাইয়াছেন—বিশেষভাবে পূজাবকাশের মধ্যে যে মৃত্যুসংবাদগুলি পান, তাহার একটির জন্যও মন প্রস্তুত ছিল না। কবির নিজ শরীরও অর্শের রক্তপাতে অত্যন্ত ক্লিষ্ট। মনের ও শরীরের এই সহায়হীন অবস্থায় অন্তরাত্মা গভীরের মধ্যে প্রবেশের জন্য ব্যাকুল। এখন কবি থাকেন শান্তিনিকেতন গৃহের দ্বিতলে, তাঁহার 'দেহলি' মেয়ে-বোর্ডিং এ পরিণত হইয়াছে।

কবি একাই থাকেন শান্তিনিকেতনের দ্বিতলে; প্রতিদিন প্রাতে অন্ধকার থাকিতে উঠিয়া মন্দিরের পূর্ব তোরণ তলে উপাসনায় বসেন ও ধ্যানে মগ্ন হন। ক্রমে দুইএকজন অধ্যাপক ও ছাত্র আসিয়া জোটেন। তাঁহাদের অনুরোধে কবি তাঁহার ধ্যানলব্ধবাণী অল্পে অল্পে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রত্যুষান্ধকারে যে কথাগুলি বলিতেন, ক্রমে তাহা ঘরে ফিরিয়া লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৭ই অগ্রহায়ণ (১৩১৫) হইতে ১৩১৬ সনের ৭ই বৈশাখ পর্যন্ত উপদেশগুলি প্রায় ধারাবাহিকভাবে চলে। ইহাই 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালা, ১ম খণ্ড হইতে ৮ম খণ্ডের অন্তর্গত, এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করিব।

এই দীর্ঘ পর্বের মধ্যে কবি দুইবার মাত্র কলিকাতায় যান; একবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নূতন গৃহ উন্মোচন উৎসব উপলক্ষ্যে, দ্বিতীয়বার মাঘোৎসবের জন্য। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নূতন গৃহ হইল আপার সার্কুলার রোডের উপর—এতদিন ছিল ভাড়া বাড়িতে। এই উৎসব উপলক্ষ্যে (২১ অগ্রহায়ণ ১৩ ৫) বঙ্গদেশের বহুস্থান হইতে বহু সাহিত্যিক আসেন। দ্বিতল কক্ষের সভায় সভাপতি হন সারদাচরণ মিত্র। লোকাধিক্য হেতু একতল গৃহে যে সভা হয়, তাহার সভাপতি হইলেন রবীন্দ্রনাথ।[১] রবীন্দ্রনাথ তখন পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি।

এই উৎসবক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সহিত রজনীকান্ত সেনের[২] পরিচয় হয়। রজনীকান্ত রাজসাহীর উকিল, কিন্তু এপর্যন্ত কবির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হয় নাই। পরিষদের উৎসবক্ষেত্রে রজনীকান্ত তাঁহার রচিত 'সৃষ্টির সূক্ষ্মতা' শীর্ষক দুইটি গান গাহেন। এই গান কবির খুবই ভালো লাগে; তিনি কান্তকবির সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহাকে জোড়াসাঁকোর বাটিতে আহ্বান করিয়া লইয়া যান এবং ঐ গান দুইটি পুনরায় শোনেন[৩] বঙ্গভঙ্গের পর লোকে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীতকে জয় সংগীতরূপে ব্যবহার করিত; আর একটি গান ছাত্রদের কণ্ঠে

১ রবীন্দ্রনাথের ভাষণ, 'পরিষৎপরিচয়' (,১৩৫৬) পৃ ২৮-২৯। দ্র. গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৮, পৃ ৫৩৬-৫৩৯।

২ কান্তকবি রজনীকান্ত সেন, জন্ম ১৮৬৫ জুলাই ২৬ (১২ই শ্রাবণ ১২৭২) মৃত্যু ১৯১০ সেপ্টেম্বর ১৩ (২৮ ভাদ্র ১৩১৭)

৩ দ্র. ভারতী ১৩২৯ পৃ. ৪৬৩। বহু বৎসর পূর্বে ১৯০১ সালের বড়দিনের ছুটির সময়ে অক্ষয়কুমার মৈত্র ও রজনীকান্ত সেন দুইজনে রাজসাহী হইতে কলিকাতায় আসেন ৫ সেখান হইতে বোলপুর যান।

শোভাযাত্রার সময়ে প্রায়ই শোনা যাইত—"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, মাথায় তুলে নেরে ভাই। দীনদুখিনী মা-যে তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই।" এই সুপরিচিত গানের রচয়িতা রজনীকান্তের সহিত পরিচিত হইয়া কবি অতীব আনন্দিত হইলেন। এই সাক্ষাতের কয়েক মাস পরেই রজনীকান্ত দুরারোগ্য কণ্ঠ-ক্যান্সারে আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘ আটমাস কাল কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজে থাকেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে রবীন্দ্রনাথকে তিনি দেখিতে চান; কবি হাসপাতালে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করেন (২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭)। পরে তাঁহাকে একখানি পত্রও লেখেন (১৬ আষাঢ়)। রজনীকান্তের কণ্ঠ বহু দিন নীরব তাই পত্রদ্বারা শেষ ভাব বিনিময় হয়। ইহার কিছুকাল পরেই কান্তকবি 'তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া' অমরধামে চলিয়া যান (২৮ ভাদ্র ১৩১৭)।[১]

রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ

ধর্মজ্ঞান ভাষাজ্ঞানের ন্যায় মানুষ শিশুকাল হইতে কখন ও কীভাবে যে আয়ত্ত করে, তাহার ইতিহাস বলা কঠিন; রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য যাঁহারা গভীরতাবে অধ্যয়ন ও তাঁহার সংগীত শুদ্ধভাবে শ্রবণ করিবার অবকাশ পাইয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, ঈশ্বরবিশ্বাস কবির আশৈশবের সংস্কার। তবে তিনি ঈশ্বরকে যেভাবে কল্পনা করিতেন, তাহা-যে কেবল লৌকিক হিন্দুধর্ম হইকে পৃথক্ তাহা নহে তাহা ব্রাহ্মধর্মানুমোদিত ব্রহ্মজ্ঞান হইতেও অন্যরূপ, তাঁহার ধর্ম তাঁহার নিজেরই।

রবীন্দ্রনাথ যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেখান হইতে তাঁহার জন্মের পূর্বেই হিন্দুসমাজের শৃঙ্খল খসিয়া গিয়াছিল। এই প্রায়-সংস্কারশূন্য পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। প্রাচীন সমাজের সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করিবার জন্য তাঁহার অগ্রজের ন্যায় তাঁহাকে কোনোই সংগ্রাম করিতে হয় নাই। কিন্তু কেবলমাত্র সংস্কারহীনতা তো নেতিধর্মী, তাহার দ্বারা জীবনের ভাবসম্পদ গড়ে না। বাল্যকাল হইতে মহর্ষির পরিবারে বালকদের পক্ষে 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ আবৃত্তি করা আবশ্যিক ছিল। এই ধর্মবোধকে রবীন্দ্রনাথ কোনো কোনো স্থলে উপনিষদের ধর্ম বলিয়াছেন—প্রয়োগটি ঠিক হইয়াছে কি না সে বিচারের স্থান আমাদের নাই।

যৌবনে ধর্মের প্রতি রবীন্দ্রনাথের খুব আকর্ষণ না থাকিলেও কর্তব্যবোধে কোনোদিন ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আনুগত্যের অভাব তাঁহার হয় নাই। রবীন্দ্রজীবনীর পাঠকগণ অবগত আছেন যে, বিলাত হইতে দেশে ফিরিবার অব্যবহিত পরে, এমনকি 'বাল্মীকিপ্রতিভা' রচনারও পূর্বে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি ব্রহ্মসংগীত লেখেন। তাহার পর প্রায় বিশ বৎসর, অর্থাৎ কবির চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত, প্রায় প্রতি বৎসরেই ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজনে নানা উৎসবের সময়ে 'ব্রহ্মসংগীত' লিখিয়াছিলেন। অন্যের অনুভূতিকে নিজ অনুভূতির মধ্যে জাগাইয়া ভাষাদান করা হইতেছে দরদী-কবির কাজ— আর নিজের অনুভূতিকে প্রকাশ করা হইতেছে সাধক-কবির কাজ। ব্রাহ্মসমাজের ধর্মভাবকে ভাষা ও সুর দান করিয়া তিনি ব্রহ্মসংগীত লেখেন। উহাদিগকে আমরা 'রচিত' গান বলিব, ভক্তহৃদয়ের বেদনাসঞ্জাত ভাব-সংগীত বলিতে পারিব না। রবীন্দ্রনাথের যথার্থ আধ্যাত্মিক সংগীতের পালা শুরু হয় গীতাঞ্জলির পর্বে, তবে এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে প্রত্যেক ভাবুক হৃদয়ে 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চিরদিন কেন পাই না' বলিবার মত অনুভূতি হয়; সেদিক হইতে বিচার করিলে কল্পনার মধ্যে এই শ্রেণীর গানের -সন্ধান পাওয়া যায়। 'খেয়া'র মধ্যেও সেই আকূতি রাহস্যিক রূপকতায় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে সমষ্টির যোগচেষ্টা হইতেছে নৈবেদ্যের কবিতাগুচ্ছের নির্গলিত বাণী। এই

১ দ্র নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত 'কান্তকবি রজনীকান্ত' পৃ ৯৩-৯৪। পৃ ২৩৫।

পর্বটি কবির ব্রাহ্মধর্ম ব্যাখ্যানের পর্বের সমকালীন। এই সময়ে কবি সর্বপ্রথম ধর্মসম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন। ইতিপূর্বে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সমর্থনে বহু রচনা লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু সেগুলি ধর্মোপদেশ বা sermon-শ্রেণীর রচনা নহে। পাঠকের স্মরণ আছে, রবীন্দ্রনাথের বিবাহের অল্পকালের মধ্যেই মহর্ষি তাঁহাকে জমিদারির বিষয়কর্মের মধ্যে বাঁধিতে চেষ্টা করেন, তেমনি আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক করিয়া দিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবায়ও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল কবি এই কার্য কেবলমাত্র কর্তব্যহিসাবে পালন করিয়াছিলেন, তদধিক উৎসাহ কখনো দেখান নাই। সেই উৎসাহ হ্রাস পাইতে পাইতে এমনই হইল যে শেষকালে তাঁহারই জীবদ্দশায় আদিব্রাহ্মসমাজের নিত্যকাজ বন্ধ হইল। এখন উক্ত সমাজের অস্তিত্ব পর্যন্ত লুপ্তপ্রায়, ব্রহ্মমন্দির ভগ্নদশা প্রাপ্ত।

নৈবেদ্য রচনার পর্বে মহর্ষির আদেশে কবিকে শান্তিনিকেতনের দশম সাম্বৎসরিক (১৩০৭) উৎসবের ভাষণ 'ব্রহ্মমন্ত্র' লিখিতে হয়; ইহাই তাঁহার ধর্মবিষয়ক দ্বিতীয় দেশনা। ইহার পূর্ব বৎসরে ১৩০৬ সালের শান্তিনিকেতনের নবম বার্ষিক উৎসবের জন্য কবি 'ব্রহ্মোপনিষদ্' নামে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। এই পুস্তিকাটি পরে 'উপনিষদ ব্রহ্ম' নামে পুস্তিকাভুক্ত হয়। উহা মাঘোৎসবে পঠিত হয়। এই দুইটি রচনাকে কবি তাঁহার 'ধর্ম' নামক গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করেন নাই।

'ধর্ম' গ্রন্থ (১৯০৯) কবির সাত বৎসরের ধর্মোপদেশের[১] সংগ্রহ— সবগুলিই শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের

১ ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে রচনাগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

ব্রহ্মোপনিষদ—শান্তিনিকেতন মন্দিরে পঠিত, ৭ পৌষ ১৩০৬।

ব্রহ্মমন্ত্র—শান্তিনিকেতন মন্দিরে পঠিত, ৭ পৌষ ১৩০৭।

উপনিষদ ব্রহ্ম—কলিকাতা মাঘোৎসবে পঠিত, ১১ মাঘ ১৩০৭।

[ব্রহ্মচারীদের প্রতি উপদেশ]—৮ পৌষ ১৩০৮। দ্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮২৩ শক [১৩০৮] মাঘ, পৃ ১৪৫।

এগুলি 'ধর্ম' গ্রন্থে নাই। রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ ২য় খণ্ডে আছে।

'ধর্ম গ্রন্থে (রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩) আছে—

প্রাচীন ভারতে এক : কলিকতা ১৩০৮ মাঘোৎসবে পঠিত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৩০৮ ফাল্গুন।

বর্ষশেষ—শান্তিনিকেতন মন্দির, চৈত্র সংক্রান্তি ১৩০৮ (ধর্ম)

নববর্ষ—শান্তিনিকেতন মন্দির, ১ বৈশাখ ১৩০৯ (ধর্ম)

ধর্মের সরল আদর্শ—কলিকাতা মাঘোৎসব ১৩০৯ [৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৯ কবিজায়ার মৃত্যু হইয়াছে] (ধর্ম)

দিন ও রাত্রি—শান্তিনিকেতন মন্দির—৭ পৌষ ১৩১০ [আশ্বিন ১৩১০ মধ্যমা কন্যা রেণুকার মৃত্যু হইয়াছে] (ধর্ম)

মনুষ্যত্ব—কলিকাতা মাঘোৎসব—মাঘ ১৩১০ (ধর্ম)

ধর্মপ্রচার—কলিকাতা সিটি কলেজ হল, ১২ মাঘ ১৩১০ (ধর্ম)

মহর্ষি জন্মোৎসব—কলিকাতা জোড়াসাঁকো—৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১১ (চারিত্রপূজা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪)

প্রার্থনা—প্রকাশিত ১৩১১ আষাঢ় (ধর্ম)

উৎসবের দিন—মাঘ ১৩১১ (ধর্ম)

মহর্ষির আদ্যকৃত্য উপলক্ষে প্রার্থনা—১৬ মাঘ ১৩১১ (চারিত্রপূজা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪)

উৎসব—শান্তিনিকেতন মন্দির, ৭ পৌষ ১৩১২ (ধর্ম)

ততঃ কিম্ (বক্তৃতা)—কলিকাতা কার্তিক ১৩১৩ (ধর্ম)

শান্তম্ শিবমদ্বৈতম—শান্তিনিকেতন মন্দির ৭ পৌষ ১৩১৩ (ধর্ম)

মহাপুরুষ (মহর্ষির শ্রাদ্ধসভায় পঠিত) ৬ মাঘ ১৩১৩ (চারিত্রপূজা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪)

আনন্দরূপ—কলিকাতা মাঘোৎসব—মাঘ ১৩১৩। স্বাতন্ত্র্যের পরিণাম ১৩১৩ (ধর্ম)

দুঃখ—কলিকাতা মাঘোৎসব—মাঘ ১৩১৪ (শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু ৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৪) (ধর্ম)

এক বৎসর পরে ১৩১৫, ১৭ অগ্রহায়ণ হইতে শান্তিনিকেতন উপদেশমালা।

পর রচিত। প্রায় রচনাই পৌষ-উৎসব মাঘোৎসব বর্ষশেষ নববর্ষ প্রভৃতি বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য লিখিত-- সাধারণের কাছে সাধারণ ধর্মতত্ত্বের কথা নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা। ইহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত অনুভূতিমূলক আত্মতত্ত্বের সন্ধানচেষ্টা ব্যর্থ হইবে। 'দুঃখ' নামক ভাষণে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়।

ব্রহ্মমন্ত্র, ঔপনিষদ ব্রহ্ম ও ধর্মগ্রন্থের অধিকাংশ ভাষণকে আমরা theological বা ধর্মতত্ত্বের আলোচনামূলক রচনা বলিয়া নির্দেশ করিব। কারণ ব্রাহ্মধর্মের তত্ত্বব্যাখ্যানই ছিল রচনার উদ্দেশ্য। মহর্ষির 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' নামক যে অপরূপ গ্রন্থ বাংলা ভাষায় আছে, তাহা যদি কেহ শান্তচিত্তে পাঠ করেন তো তিনি অবশ্যই লক্ষ্য করিবেন যে মহর্ষির আধ্যাত্মিক অনুভূতি স্বকীয় হইলেও, তাহা ভারতীয় ধর্মচেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত। তেমনি রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-বিষয়ক ভাষণগুলিও পাঠ করিলে আমাদের মনে হয় এ যেন মহর্ষির ব্যাখ্যানই কবির দৃষ্টি ও অনুভূতির অরুণ আলোকে উদ্‌ভাসিত। 'শান্তিনিকেতনে'র উপদেশমালাকে কেবলমাত্র ঐ শ্রেণীর তত্ত্বমূলক ভাষণ বলিলে ভুল বিচার হইবে; এগুলি সুদৃঢ় জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত; ধ্যান দ্বারা উপলব্ধ, আত্মানুভূত রসের দ্বারা স্নিগ্ধোজ্জ্বল, বহুব্যাপক অনুশীলনের উপর প্রতিষ্ঠিত। উহার মধ্যে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ, দর্শনশাস্ত্রের যুক্তিবাদ, জীবনশিল্পীর কর্মবাদ, বৈষ্ণবের ভক্তিবাদ পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলিত হইয়া একটি অখণ্ড পরিপূর্ণতার নির্দেশ দিতেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন জগতের বিচিত্র ব্যবহারিকতাকে বা প্রকৃতির বিচিত্র স্বরূপকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করিয়া অনির্বচনীয় অতীন্দ্রিয় অবচ্ছিন্ন শূন্যতা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করে নাই।

শান্তিনিকেতনের উপদেশমালা কবিজীবনের একটি বিশেষ পর্বের সাধনা-উপলব্ধ বাণীর সঞ্চয়, কয়েকটি মাসের নিবিড় চিন্তা ও ধ্যানের এবং অনুভূতির বাঙ্ময় প্রকাশ। কবিজীবনের এক-একটি ভাবের উৎস এক-এক সময়ে নিবিড়ভাবে দেখা দিয়াছে— কবিতা নাট্য গীত গল্প প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ পর্ব। কতকগুলি কবিতা অথবা গান এবং কয়েকখানি নাট্যও এক-এক সময়ে এক-একটি ভাবময় রূপচক্র সৃষ্টি করিয়াছে; এমনকি তাঁহার পত্রধারাও এক-একটি ভাবধারার বাহন হইয়াছে। শান্তিনিকেতনের উপদেশমালাও সেইরূপ একটি বিশেষ পর্বের ধ্যান ও মননলব্ধ বাণীর প্রকাশ।

১৩০৯ হইতে ১৩১৪ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবন কর্মের বিচিত্র উত্তেজনা, এবং সাহিত্যের বিচিত্র রসসৃষ্টির মধ্যে কাটিলেও নিদারুণ শোকাঘাতে বারেবারেই তাহা খণ্ডিত নিষ্পেষিত হইয়াছে। কবিপ্রিয়া ও মধ্যমাকন্যার মৃত্যুর জন্য কবি বহুকাল হইতে অন্তরকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কারণ উভয়েই দীর্ঘকাল রোগভোগান্তে দেহমুক্ত হন। কিন্তু কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথের অকালমৃত্যু (৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৪) কবির মনকে সত্যই রূঢ়ভাবে আঘাত করিয়াছিল। শমীন্দ্রের মৃত্যুর পর মাঘোৎসবে 'দুঃখ' নামে যে ভাষণটি দেন, তাহার মধ্যে কবির গভীর অন্তর্বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে।

শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ও বন্ধু শ্রীশচন্দ্রের অকালমৃত্যু ঘটে। ১৩১৫ সালের পূজাবকাশের পর কবি আশ্রমে ফিরিয়াছেন। গত বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে শমীন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে, তারও কয়েক বৎসর পূর্বে ঐ একই দিনে শমীন্দ্র-জননী স্বর্গতা হন। তাই এই সময়ে কবির মনে শোকাঘাতজনিত নানা অধ্যাত্ম সমস্যা মনে জাগিতেছে। মনের এই অবস্থায় শান্তিনিকেতনের মন্দিরতোরণে প্রত্যুষান্ধকারে কবি ধ্যানে বসিতেন।

শান্তিনিকেতনের উপদেশমালা ১৭ খণ্ডে সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম আট[১] খণ্ড যথার্থভাবে আমাদের

১ শান্তিনিকেতন, ১ম ভাগ ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৫—২রা পৌষ। ২য় ভাগ ৩ পৌষ ১৩১৫—১২ পৌষ। ৩য় ভাগ ১৩ পৌষ ১৩১৫—২৪ পৌষ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩। ৪র্থ ভাগ ২৫ পৌষ ১৩১৫—৬ মাঘ। ৫ম ভাগ ৯ মাঘ ১৩১৫—৯ ফাল্গুন। ৬ষ্ঠ ভাগ ১০ ফাল্গুন ১৩১৫—২০ ফাল্গুন। ৭ম ভাগ ৩ চৈত্র ১৩১৫—১৪ চৈত্র। ৮ম ভাগ ১৫ চৈত্র ১৩১৫—৭ বৈশাখ ১৩১৬। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪।

আলোচনার অন্তর্গত; ১৭ অগ্রহায়ণ (১৩১৫) হইতে ৭ বৈশাখের (১৩১৬) মধ্যে সেগুলি কথিত ও লিখিত। পরবর্তী খণ্ডগুলির অধিকাংশ হইতেছে বুধবার দিন মন্দিরের উপদেশ বা বিশেষ দিনের ভাষণ অথবা উৎসরের বক্তৃতা। এই প্রথম আট খণ্ডের ভাষণগুলি নিত্যপূজার নৈবেদ্যস্বরূপ। সেইজন্য এই উপদেশমালা হইতে 'ধর্মে'র রচনাগুলির ভাবধারা সুস্পষ্টভাবেই পৃথক। 'ধর্মে'র উপদেশের মধ্যে 'ব্রাহ্মধর্ম' ও 'নৈবেদ্য'র প্রভাব যে রহিয়াছে তাহা অত্যন্তই স্পষ্ট। অধিকাংশই নৈবেদ্যের কবিতার ন্যায় নৈর্ব্যক্তিক স্পষ্ট ও ওজস্বী। আর শান্তিনিকেতনের ভাষণগুলির মধ্যে গীতাঞ্জলির ভাবধারা সুপ্ত। সেগুলি আমাদের বুদ্ধির সহিত বোধিকেও উদ্‌বুদ্ধ করে।

নৈবেদ্যের নৈর্বক্তিক জ্ঞানমার্গী কাব্যরচনা ও শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন প্রায়-সমকালীন ঘটনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিমানস নৈবেদ্য শ্রেণীর কবিতা লিখিয়া চিরতৃপ্ত রহিতে পারে না; একটি ঘটনায় কবির মনে যে রেখা টানিয়া দেয় তাহারই অভিঘাতে নূতন কবিতার জন্ম হইল—'খেয়ার নেয়ে'[১] দেখা দিলেন ছন্দের আড়ালে। শুনিয়াছি মহর্ষির কোনো ভক্ত আশ্রমবিদ্যালয় দেখিয়া গিয়া মহর্ষিকে বলেন যে শান্তিনিকেতনের উৎসব-আয়োজনে সকলকেই দেখিয়াছি কেবল দেখি নাই দুল্‌হা-(বর)কে। উৎসবের মধ্যে যিনি পরম বরেণ্য সেই উৎসবরাজেরই দর্শন মেলে নাই। 'খেয়া'র দুল্‌হা-অদর্শনের বেদনা মূর্তি লইয়াছে নূতন ছন্দে, নূতন ভাষায়, নূতন রূপকে।

ইহার পর কবিজীবনে যে পরিবর্তন আসিল তাহা গভীর শোকাঘাতে উজ্জ্বল— একটি পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য মনের আকুলতা সেই অবস্থায় বাণীময় রূপ লইল 'শান্তিনিকেতনে'র উপদেশমালায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবি ও সংগীতকার, তিনি কখনো ধর্ম ও দর্শন আলোচনায় আপনাকে নিঃশেষ করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন না; যাহাকে বুদ্ধির দ্বারা বুঝা যায়, ধ্যানের দ্বারা মনশ্চকে দেখা যায়, তাহাকে রসের মধ্যে পাইয়া সুরের ভিতর দিয়া প্রকাশ হইতেছে কবির স্বধর্ম। সেটি হইতেছে গীতাঞ্জলির পর্ব।

নৈবেদ্যের দেবতা দূরে থাকিয়া পূজার্ঘ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, 'খেয়ার নেয়ে' আলোছায়ার রহস্যলোকে অস্পষ্টভাবে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিয়াছেন, আর গীতাঞ্জলির দেবতা ভক্তের সম্মুখে আসীন। শান্তিনিকেতনের ধ্যানলব্ধ সাধনার মধ্যে গীতাঞ্জলির রসানুভূতির প্রতিষ্ঠা। কবির এই রসের ধর্ম গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য ও গীতালিতে সুরে সুরে গভীর হইতে গভীরে গিয়া পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। গীতালির শেষ কবিতাটি পাঠ করিলে এই কথাটি স্পষ্ট হইবে।[২]

রবীন্দ্রনাথের এই আধ্যাত্মিক আকূতি যে কেবল গীতধারায় নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহা নহে; তাঁহার সাহিত্য-হৃদয় প্রকাশের বিচিত্র পথে চলিয়া আপনাকে সার্থক করিয়াছে; শারদোৎসব অচলায়তন রাজা ডাকঘর নাটকচতুষ্টয় এই পর্বেরই রচনা। এইসব নাটকের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক সংগ্রামের চিত্র কবি ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই অবচেতন মনের সংগ্রাম। এইসব symbolic বা symbolistic নাটিকাগুলিকে 'খেয়া'র রাহস্যিক কবিতার সমসূত্রে বিচার্য।

শান্তিনিকেতনের উপদেশমালার পর্ব হইতে কবির জীবনে ধর্মসম্বন্ধে প্রশ্ন নানাভাবে দেখা দিযাছে। ধর্মের একত্ব ও সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে কবির যে জ্ঞান এতাবৎকাল উপনিষদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তাহা এখন তাহার সংকীর্ণতা ত্যাগ করিয়া বিচিত্র ধর্ম ও মতের উদার ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছে, ঈশ্বর যে সম্প্রদায়ের বাহিরে তাহা স্পষ্টতর হইতেছে। শান্তিনিকেতনের মন্দিরে কবি খৃষ্ট ও চৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে স্বয়ং ভাষণ দান করিলেন এবং অনতিকালের মধ্যে ভগবান বুদ্ধ ও হজরত মহম্মদের স্মরণদিন পালন-রীতি প্রচলিত হইল। এছাড়া কবির ধর্ম সম্বন্ধে যে জ্ঞান এতকাল উপনিষদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তাহা বিস্তার লাভ করিল মধ্যযুগীয় সন্তদের জীবনের মধ্যে। এই সন্তদের

১ খেয়া, ১৫ শ্রাবণ ১৩১২, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ১৮৬-৮৭।

২ দ্র. এই তীর্থ-দেবতার ধরণীর মন্দির প্রাঙ্গণে, গীতালি, নং ১০৮। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১১, পৃ ২৯৪।

বাণীর মধ্যে কবি তাঁহার অন্তরের বাণীর সায় পাইলেন। তিনি বুঝিলেন যে তিনি ভারতের ধর্মসাধনার ধারা বহন করিয়া আসিতেছেন, তিনি নিঃসঙ্গ নহেন। এই মধ্যযুগীয় সন্তদের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটাইলেন অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন।

শান্তিনিকেতন উপদেশমালা

শান্তিনিকেতন সতেরো খণ্ড উপদেশমালা রবীন্দ্রনাথের ধর্মমত ও আধ্যাত্মিক জীবনের অভিজ্ঞতার লিখিত সঞ্চয়ন। এই কয়েক খণ্ড গ্রন্থ শান্তভাবে অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করিলে আমরা কবির একটি সুসংগত ধর্মতত্ত্বে উপনীত হইতে পারি—ইহাই আমাদের বিশ্বাস। এই ধর্মতত্ত্ব 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের উপর প্রধানত প্রতিষ্ঠিত হইলেও, তাহার সহিত সনাতনী ব্রাহ্মধর্মের সবাঙ্গীণ মিল নাই। উপনিষদ-কেন্দ্রীত ধর্মবিশ্বাসকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করিয়া রবীন্দ্রনাথ ধর্মের সংজ্ঞাকে বৃহত্তর পটভূমিমধ্যে ব্যাখ্যা করিলেন।

মানুষের মনে ধর্মজিজ্ঞাসা না জাগিলে, ঈশ্বর সম্বন্ধে আকুতিও সে অনুভব করে না। সেইজন্য মীমাংসার প্রথম সূত্র হইতেছে 'অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা' এবং ব্রহ্মসূত্রের 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'; সবের মূলে রহিয়াছে এই জিজ্ঞাসা—এই আকুতি, অন্তরের তাগিদ। শান্তিনিকেতন উপদেশমালার প্রথম ভাষণে আছে মনকে সেই জাগ্রত করিবার বাণী—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'[১]। জাগ্রতচিত্তেই জিজ্ঞাসা আসে। জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নের উদয় হয় সংশয় হইতে। সংশয়ের[২] বেদনায় ধর্ম তথা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সূত্রপাত। সংশয় ও নাস্তিক্য একধর্মী নহে। ঈশ্বরকে সামান্যভাবে স্বীকার করিলেই কেহ 'সংশয়ী নই' বলিতে পারেন না। সত্যসন্ধানের প্রথম সোপান এই সংশয় বা জিজ্ঞাসা। যথার্থ সংশয়ের বেদনা আত্মাকে সত্যের মধ্যে মুক্তিদানের আহ্বান। এই বেদনা জাগ্রত হইলে 'গোপনভাবে ঈশ্বর আমাদের চৈতন্যের একটা দিকে স্পর্শ করেন'। এ কথা খুবই সত্য, কারণ যাহাকে লইয়া প্রশ্ন, তিনিই তো সর্বদা আমাদের অলক্ষ্যে, আমাদের অস্বীকৃতির মধ্যে, আমাদের অজ্ঞানের মধ্যে মনকে স্পর্শ করিতেছেন। কেবলমাত্র 'জ্ঞানের প্রকাশে আমাদের সংশয়ের সমস্ত অন্ধকার দূর হয় না'। ঈশ্বর আছেন সে-সম্বন্ধে সংশয়ের অভাবেই যে তৎসম্বন্ধে আমাদের বোধ উদ্রিক্ত হয়, এমন নহে।

সংশয় করাটার মধ্যে মনের কার্যকরী ভাবটিকে দেখা যায়; কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে অভাব অনুভব না করার মধ্যে মানসিক জড়তাই প্রকাশ পায়। সেইজন্য সাধারণভাবে দেখা যায় যে ঈশ্বরকে বাদ দিয়া আমাদের অন্তঃকরণ কোনো 'অভাবই'[৩] অনুভব করে না; অভাব অনুভব না করাটাই অভ্যাসগত হয়, চিত্ত অসাড় হইয়া যায়। অভাব অনুভব না করিবার হেতু 'আত্মার দৃষ্টি'[৪] সেখানে পৌঁছায় না; আত্মার দৃষ্টিকে আধ্যাত্মিকতা বলা যাইতে পারে। এখন এই আধ্যাত্মিকতা বলিতে আমরা কী বুঝি তাহা দেখা যাক্। কবি বলিতেছেন, "আমাদের চেতনা আমাদের আত্মা যখন সর্বত্র প্রসারিত হয় তখন জগতের সমস্ত সত্তাকে আমাদের সত্তার দ্বারাই অনুভব করি, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নয়, বুদ্ধির দ্বারা নয়, বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা নয়। সেই পরিপূর্ণ অনুভূতি একটি আশ্চর্য ব্যাপার।"

সর্বত্র আত্মা প্রসারিত হয়, ইহার অর্থই যুক্তাত্মা হওয়া। কিন্তু সেই সম্প্রসারণ বা অনুভূতির অন্তরায় কোথায়, তাহাই বিচার্য। অন্তরের পাপ, বাহিরের অভ্যাস ও অতীতের সংস্কারের আবরণ হইতে মুক্ত হইলে আমাদের আত্মা

১ উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ১ম খণ্ড। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ. ৪৪৯।

২ সংশয়। ২৩ অগ্রহায়ণ ১৩১৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ. ৪৪৯-৪৫২।

৩ অভাব (অগ্রহায়ণ) শান্তিনিকেতন ১ম খণ্ড। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ. ৪৫৩-৪।

৪ আত্মার দৃষ্টি (অগ্রহায়ণ) ঐ পৃ ৪৫৪-৬।

সর্বত্রই আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়। অন্ধভাবে জড়ভাবে এই সাধনা সম্ভব হয় না। এসম্বন্ধে পরেও আমরা আলোচনা করিব।

আত্মা যখন সর্বত্র প্রসারিত হইতে প্রয়াসী, তখন আমাদের অন্তরের পাপ স্পষ্টতর হয়। সাধারণত আমরা নৈতিক বা চারিত্রিক অথবা সুকৃতি দুষ্কৃতিকেই পাপপুণ্যের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া দেখি। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে সূক্ষ্ম অদৃশ্য পাপ চিত্তের উপর বহু আচ্ছাদন বা আবরণ সৃষ্টি করে। এই পাপ কী তাহা কবি কোথাও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন নাই। "যা অনিত্য, বিশেষ সাময়িক প্রয়োজনে বিশেষ স্থানে যার প্রয়োজন তাকেই বলা হয় পাপ।"[১] যাহাকে যথাকালে বাহির হইতেই মরিতে দেওয়া উচিত ছিল, তাহাকে ভিতরে লইয়া গিয়া বাঁচাইয়া রাখাই নিজের হাতে পাপকে সৃষ্টি করা হয়।

পাপচিত্র রবীন্দ্রসাহিত্যে, অথবা পাপবোধ রবীন্দ্রকাব্যে কোনোদিন বড়ো স্থান পায় নাই। মহর্ষির ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানে (২য় প্রকরণ ১ম) পাপ ও অনুতাপ সম্বন্ধে একটি আলোচনা আছে বটে। কিন্তু তাঁহার ধর্মসাধনায় উহা কখনো উগ্রভাবে দেখা দেয় নাই। দেবেন্দ্রনাথের 'পাপ ও অনুতাপ' আলোচনা কেশবচন্দ্র সেনপ্রমুখ একদল ব্রাহ্ম-সাধকের পাপভীতির সহিত আদৌ তুলনা হয় না। রবীন্দ্রনাথের 'পাপ'[২] ভাষণে পাপ ও অনুতাপের সেরূপ কোনো বিশ্লেষণ নাই। তিনি উহাকে যুক্তাত্মা হইবার পথে আবরণরূপে দেখিয়াছেন; সেই পথমোচনের প্রার্থনা তিনি করিয়াছেন— তদতিরিক্ত কিছু নাই।

কয়েক বৎসর পূর্বে 'ধর্মের সরল আদর্শ ভাষণে (বঙ্গদর্শন ১৩০৯ মাঘ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৩৫৩) পাপবোধ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে হিন্দুশাস্ত্রে পাপের প্রতি মনোযোগের অভাব আছে বলিয়া যে দোষারোপ করা হয় তাহা হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ। পাশ্চাত্ত্য ধর্মশাস্ত্রে পাপ ও পাপ হইতে মুক্তি নিরতিশয় জটিল ও নিদারুণ, পাপের দিক হইতে দেখিলে ধর্মকে বিরাট বিভীষিকা করিয়া তুলিতে হয়। ভারতীয়রা পাপপুণ্যের মূলে গিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, অনন্ত আনন্দস্বরূপের সহিত চিত্তের সম্মিলন হইবামাত্র সমস্ত পাপ দূর হয় ও সমস্ত পুণ্য লাভ হয়।

হিন্দুশাস্ত্র বা ভারতীয়রা পাপের প্রতি মনোযোগী হয় নাই, এ কথা যথার্থ কিনা বিচার্য। পাপবোধ না থাকিলে হিন্দুশাস্ত্রে অসংখ্যপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত বিধি ও অগণিত নরকের বীভৎস জটিল কল্পনা কেমন করিয়া ও কোথা হইতে স্থান পাইল? আসল কথা, বৈদিক বা ঔপনিষদিক সাহিত্যে পাপের নিদারুণ চিত্র নাই; তাই কবি মনে করিয়া-ছিলেন হিন্দুশাস্ত্রই পাপের প্রতি মনোযোগী হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য সংগীতের মধ্যে এই পাপবোধ ও অনুতাপের উপর রচিত গান খুবই কম। তবে পাপবোধ না থাকিলেও 'দুঃখ'বোধ[৩] কবির বহুগানে প্রায় দুঃখবাদকে স্পর্শ করিয়াছে। কবির সেই দুঃখবাদকে কখনো morbid বলিতে পারি না, উহা ধর্মসাধনার অন্যতম স্তর মাত্র— উহাকে pessimism বলিলে প্রকাণ্ড ভুল করা হইবে।

যাহাই হউক মুমুক্ষু ব্যক্তি তাহার আত্মাকে প্রসারিত করিতে গিয়া পদে পদে নিজ জীবসীমায় ও মনোরাজ্যে অসংখ্য মূর্ত ও অমূর্ত বাধাদ্বারা প্রতিহত হয়। এই বাধাকে বলা হইয়াছে পাপ। এই পাপ বা বাধা বা আবরণ ছিন্ন করিয়া আপনাকে মুক্ত করিবার সংগ্রামে যে পরাভব তাহাকে বলা যাইতে পারে দুঃখ ও তাহার জয়েই সুখ আনন্দ। অর্থাৎ বাধা দূর করিতে পারিলে বা পাপ অপসারিত হইলে আত্মা আপনাকে সর্বত্র সমভাবে দেখিতে বাধা পায় না।

১ শান্তিনিকেতন ২য় সং, পৃ ১৮১।

২ পাপ। ২৫ অগ্রহায়ণ। শান্তিনিকেতন ১ম খণ্ড। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৪৫৬-৮।

৩ দুঃখ। ২৬ অগ্রহায়ণ ১৩১৫ শান্তিনিকেতন ১ম খণ্ড। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৪৫৮-৬০।

রবীন্দ্রনাথ দুঃখকে কিভাবে দেখিয়াছিলেন, তাহা তাহা মাঘোৎসবের এক ভাষণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ; "সংসারে দুঃখের শেষ নাই।...মানুষ যদি ক্ষুদ্র হইত এবং ক্ষুদ্রতাতেই মানুষের যদি শেষ হইত, তবে দুঃখের মতো অসংগত কিছুই হইতে পারিত না। এত দুঃখ ক্ষুদ্রের নহে। মহতেরই গৌরব দুঃখ।...পুষ্পের দুঃখ নাই, পশুপক্ষীর দুঃখসীমা সংকীর্ণ— মানুষের দুঃখ বিচিত্র...এই সংসারের মধ্যে তাহার বেদনার সীমা যেন সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না..."

"দুঃখই মানুষকে বৃহৎ করে...এবং এই বৃহত্ত্বেই মানুষকে আনন্দের অধিকারী করিয়া তোলে।.. মনুষ্যত্ব.. পরম দুঃখের ধন, তাহা বীর্যের দ্বারাই লভ্য।...দুঃখ বাধার সহিত নিরন্তর সংগ্রামে যে আত্মার সমস্ত শক্তি জাগ্রত,...সেই আত্মাই ব্রহ্মকে যথার্থভাবে লাভ করিবার উদ্যম প্রাপ্ত হয়...।[১]

কিন্তু সাধারণত দেখা যায় মানুষ দুঃখকে চায় না, নানাভাবে তাহাকে এড়াইবার চেষ্টা করে। কি সংসারাসক্ত লোক, কি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী সকলের একমাত্র চেষ্টা দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ। ধনী ও বিলাসীদের সমস্ত অর্থ উপার্জন ও ব্যয়ের উদ্দেশ্য এই দুঃখ হইতে ত্রাণ লাভ ; সাধুসন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্য পাপের দুঃখ হইতে আপনাকে রক্ষা করা। কিন্তু এই দুঃখের জন্য মানুষ সর্বদা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী নহে। সে যেসব দুঃখ পায়, তাহা সুসংগত কারণেও যেমন আসে, তেমনই অসংগত অজ্ঞাত কারণেও ঘটিতে পারে। অন্যের অন্যায়, অনবধানতার জন্য, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অবিচারের জন্য এবং নানা পরিহার্য কারণের জন্যও আমরা দুঃখ পাই। সমষ্টির পাপেও ব্যক্তিকে কষ্ট পাইতে হয়, ব্যক্তির পাপেও সমষ্টির দুঃখের অন্ত থাকে না। অখণ্ড মানবতার মধ্যে আঘাত যেখানে পড়ুক, তাহার স্পন্দন সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িবেই ; আঘাতের স্পন্দন পৌঁছাইতে সময় লাগিতে পারে ; এবং অজ্ঞতাবশত কোথাকার কী পাপ সর্বদা আমরা আবিষ্কার করিতেও পারি না। যাহাই হউক, দুঃখ ন্যায্য হউক, আর অন্যায্য হউক, উহার স্পর্শ হইতে নিজেকে নিঃশেষে বাঁচাইয়া চলিবার অতিচেষ্টায় মনুষ্যত্বকে দুর্বল ও ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া তোলা হয়। অতিবেদনশীল লোক আঘাতের ভয়ে নিজেকে নানাভাবে আবৃত করে, ফলে আবরণের ভিতরে ভিতরে মলিনতা জমিতে থাকে, লোকচক্ষুর অন্তরালে সেগুলি দূষিত হইয়া উঠিয়া স্বাস্থ্যকে বিকৃত করে। সেইজন্য সুখের ন্যায় দুঃখ জীবনে অপরিহার্য, দিন ও রাত্রির ন্যায় অচ্ছেদ্য, সমাজজীবনে অধীনতা ও স্বাধীনতার ন্যায় অখণ্ড।

দুঃখ আছে বলিয়াই দুঃখের কারণ কী জানিবার জন্য মানুষের এত প্রয়াস এবং সেই দুঃখ নিবৃত্তিরও পন্থা আবিষ্কারের জন্য এমন আকুলতা। রবীন্দ্রনাথ বলেন দুঃখতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্ব এক সঙ্গে বাঁধা ; সৃষ্টি অপূর্ণ বলিয়া— অপূর্ণতাই দুঃখের কারণ। আবার সৃষ্টি অপূর্ণ বলিয়াই—পূর্ণের প্রকাশ সম্ভব। "অপূর্ণ জগৎ শূন্য নহে, মিথ্যা নহে।" "জগৎ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা চঞ্চল, মানবসমাজ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা সচেষ্ট, এবং আমাদের আত্মবোধ অপূর্ণ বলিয়াই আমরা আত্মাকে এবং অন্য সমস্তকে বিভিন্ন করিয়াই জানি। (ধর্ম পৃ ৯, র-র ১৩ পৃ ৪০১)।

এই দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য এক শ্রেণীর জ্ঞানীরা বলিয়াছেন, সুখদুঃখ, লাভালাভ, জয়াজয়কে সমভাবে দেখো। "কিন্তু সুখদুঃখ তো কেবলই নিজের নহে, তাহা যে জগতের সমস্ত জীবের সঙ্গে জড়িত। আমার দুঃখবোধ চলিয়া গেলেই তো সংসার হইতে দুঃখ দূর হয় না।" (ধর্ম পৃ ১০ ঐ পৃ ৪০৫)।

রবীন্দ্রনাথ দুঃখ সম্বন্ধে বলিতেছেন, "বিশ্বজগতে তেজঃপদার্থ যেমন, মানুষের চিত্তে দুঃখ সেইরূপ ; তাহাই আলোক, তাহাই তাপ, তাহাই গতি, তাহাই ত্রাণ ; তাহাই চক্রপথে ঘুরিতে ঘুরিতে মানব-সমাজে নূতন নূতন কর্মলোক ও সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি করিতেছে— এই দুঃখের তাপ কোথাও বা প্রকাশ পাইয়া কোথাও বা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মানব-সংসারের সমস্ত বায়ুপ্রবাহগুলিকে বহমান করিয়া রাখিয়াছে।" (ধর্ম পৃ ১০৫। ঐ পৃ ৪০৫)।

দুঃখবাদের এই ভাবাত্মক বাণীতে মানুষের আশা তাহার ভরসা। তাই কবির প্রার্থনা, "দুঃখ আমাদের শক্তির

১ মনুষ্যত্ব। ১৩১০ মাঘোৎসবের ভাষণ। বঙ্গদর্শন ১৩১০ ফাল্গুন, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭, পৃ ৩৪৮-৩৫২, ধর্ম, পৃ ২৩-৪।

কারণ হউক, শোক আমাদের মুক্তির কারণ হউক, এবং লোকভয় রাজভয় এবং মৃত্যুভয় আমাদের জয়ের কারণ হউক।" (ধর্ম পৃ ১১২, ৪১০)। 'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা' এবং 'বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে' এসব রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ চিত্তের বাণী।

দুঃখের প্রধান কারণ সংসারকে আমরা আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই, কিন্তু সংসার আমাদের নিকট হইতে কেবলই সরিতে চায়। সেইজন্য মানুষ দুঃখকে এত ভয় করে; তাই দুঃখ হইতে ত্রাণের জন্য এত আয়োজন এত উপদেশ। কিন্তু ধর্মাত্মা মহাপুরুষগণ দুঃখকে তাঁহাদের ধর্মসাধনার পাথেয় করিয়া লইয়াছেন। ঈশ্বর হইতে বিরহ তাঁহাদের দুঃখের কারণ। এই বিরহবোধ হইতে বিরাট ধর্মসাহিত্যের উদ্‌ভব; বৈষ্ণব সাধকদের পদাবলী এই বিরহবেদনারই রূপ, রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্য এই বিরহেরই সংগীত, দুঃখেই তাহার আনন্দ। সে গাহে 'বিরহ মধুর হল আজি।' সে বলে 'তোমার দেখা পাইনি যেন, সে কথা রয় মনে।' আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে আত্মার প্রসারতালাভে বাধা হইতে দুঃখের উদ্‌ভব। এক্ষণে দেখা যাউক, সেই সম্প্রসারণের অর্থ কী। জগৎসংসার যে নিয়মবলে চলে, তাহাকে বলা হইয়াছে বিশ্বধর্ম (universal law); এই বিশ্বধর্মের বিধানের সঙ্গে আমাদের ইচ্ছা ও কর্মকে মিলানোর নামই আত্মার সম্প্রসারণতা। যেখানে নিজের ইচ্ছা বা কর্ম বাধাগ্রস্ত হইতেছে, বুঝিতে হইবে বিশ্বধর্ম কোনো-না-কোনো ভাবে নিশ্চয়ই ব্যাহত হইয়াছে। বুঝিতে হইবে আমাদের ইচ্ছা বিশ্ব-ইচ্ছার সহিত সুর মিলাইতে পারিতেছে না, আমাদের কর্ম ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইতেছে না, তাই বাধা, তাই বিরোধ পদে পদে।

এইখানে কবি ধর্মতত্ত্বের একটি বড়রকম প্রশ্ন বা সমস্যা তুলিলেন কর্ম ও কর্মফল। "অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলেই কর্মের উপর আমার পূর্ণ অধিকার জন্মে; নইলে কর্মের সঙ্গে জড়ীভূত হয়ে আমরা কর্মেরই অঙ্গীভূত হয়ে পড়ি, আমরা কর্মী হই নে। অতএব সংসারকে লাভ করতে হলে আমাদের সংসারের বাইরে যেতে হবে, এবং কর্মকে সাধন করতে গেলে আসক্তি পরিহার করে আমাদের কর্ম করতে হবে।"[১] এই সাধনার কারণ হইতেছে এই যে, "যদি কর্মটা মুক্তিবিবর্জিত হয় তা হলে আমরা দাস হই আর যদি মুক্তি কর্মবিহীন হয় তা হলে আমরা বিলুপ্ত হই। বস্তুত ত্যাগ জিনিসটা শূন্যতা নয়, তা অধিকারের পূর্ণতা।"

কিন্তু সাধারণত মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে 'ত্যাগের ফল'[২] কী। ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য কর্ম বা বাসনা কামনা কেন ত্যাগ করিব। আমরা শুনি মানুষ মুক্তির সন্ধানে ফিরিতেছে। কিন্তু গভীরভাবে যদি প্রশ্ন করি সত্যই কি মানুষ মুক্তিকামী। সে তো সংসারে যাহা ভোগ করে পরলোকে তাহাই বহুগুণিত করিয়া ভোগ করিতে চাহে এবং তাহাও আবার অনন্তকালের জন্য! এমনই তাহার তৃষ্ণার বহ্নি। এই পৃথিবীর সমস্ত ত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভ তাহার কাছে শূন্যতা। কিন্তু সমস্তই যদি ব্রহ্ম বা যিনি বৃহৎ তাঁহার মধ্যে সমর্পিত হয়, তবে সে ত্যাগ পরিপূর্ণতার মধ্যেই সার্থক হয়। তখন মানুষ প্রশ্ন করে ব্রহ্মের মধ্যে সমস্ত সমর্পণ করিয়া আমার কী লাভ। তাহার উত্তর— একমাত্র উত্তর— কোনো লাভ হয় না— কেবল আত্মার আনন্দ হয়। কিন্তু এই উত্তরে সকলে যে সুখী হইবে তাহা তো মনে হয় না। ধর্মতত্ত্বের দিক হইতে সমস্ত জটিল প্রশ্ন যে লীলা বা আনন্দবাদে গিয়া স্তব্ধ হইল তাহা যুক্তিপ্রমাণ-নিরপেক্ষ অনুভূতিমাত্র। জ্ঞান ও বুদ্ধির সীমানা পার হইলে হৃদয় ও অনুভূতির বিরাট ক্ষেত্র দেখা দেয়। যাহাই হউক, মানুষ যে দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করিতেছে— তাহারই অন্তে সে কূল পায় এই আনন্দলোকে। আত্মসমর্পণ করিতে গেলে প্রকৃতির ও প্রবৃত্তির বাধা অতিক্রম করিতে হয়; সেই বাধা অতিক্রমের জয়বোধই হইতেছে আনন্দ। সেই আনন্দকে লাভ করিতে হইলে ত্যাগের শিক্ষার প্রয়োজন।

১ ত্যাগ। ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ১ম। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৪৬২।

২ ত্যাগের ফল। ২৮ অগ্রহায়ণ ১৩১৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৪৬৩-৪।

ত্যাগশিক্ষার পদ্ধতি হইতেছে কোনো মঙ্গলকর্মের মধ্যে আপনার উৎসর্জন। এই মঙ্গল যে কী তাহা কবি বহুবার বহুস্থানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; মানবকে কেন্দ্র করিয়া এই মঙ্গলকর্মের অনুষ্ঠান, ইহা সামান্যভাবে লোকহিত নহে, ইহা কর্মযজ্ঞ বা কর্মযোগ, ইহা আত্মদান।

এই ত্যাগের উদ্দেশ্য ত্যক্তবস্তু হইতে মুক্তি নহে, ত্যক্তবস্তুকে পূর্ণতররূপে লাভ করাও নহে— ত্যাগের দ্বারা 'প্রেম'কে[১] পাওয়া যায় এইটাই হইতেছে বড় কথা। ত্যাগের সহিত প্রেমের একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, ত্যাগ ছাড়া প্রেম হয় না, প্রেম না থাকিলে ত্যাগ করাও যায় না। সুতরাং ঈশ্বর যে কেবল সত্যস্বরূপ তাহা নহে— তিনি রসস্বরূপ বা প্রেমস্বরূপ এই তত্ত্বটি আপনি আসিয়া পড়িতেছে। কিন্তু প্রেম স্বাধীন, মুক্ত; অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেম দাস্যভাবযুক্ত নহে। বরং দেখা যায় ঈশ্বরই মহাভিক্ষুক বেশে আমাদের কর্ম ও ত্যাগের অর্ঘ্য ভিক্ষা করিতেছেন; ঈশ্বরের এই রূপটির ব্যাখ্যা কবি নানা ভাবে করিয়াছেন; 'খেয়া'র মধ্যে তিনি 'নেয়ে'ও বটে, দুল্হাও বটে— আবার রাজার দুলালও।

ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার এই বিচিত্র সম্বন্ধের মধ্যে কোথাও একটা সামঞ্জস্য আছে, নহিলে তো সমস্ত সৃষ্টি একটা প্রলাপের মত হইত। চিন্তাশীল সাধনকামী ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন যে একমাত্র প্রেমের মধ্যেই সমস্ত দ্বন্দ্ব এক সঙ্গে মিলিয়া থাকিতে পারে; প্রেমের ক্ষেত্রে দ্বৈত এবং অদ্বৈত ঠিক একই স্থান জুড়িয়া 'সামঞ্জস্য'[২] সৃষ্টি করিয়া আছে 'প্রেমের মধ্যেই স্থিতিগতি এক নাম নিয়ে আছে।'

এখানে একটি জটিল প্রশ্ন উঠিবে; প্রেমের মধ্যে স্থিতিগতি যদি অভেদ্যভাবেই থাকে, তবে অনন্ত উন্নতি বা গতি কিরূপে সম্ভবে। পাশ্চাত্য ধর্মতত্ত্বের অনন্ত উন্নতির আদর্শ ব্রাহ্মসমাজীয় ধর্মতত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া এই জটিলতা; কবি 'সামঞ্জস্য' ভাষণে এই তত্ত্বের আলোচনা করিয়া বলিলেন যে, এই তত্ত্ব বিশ্বাস করিলে জীবনের সামঞ্জস্য ও বিশ্বের রচনারীতি সমস্তই বিপর্যস্ত হইয়া যায়; এই অনন্ত উন্নতি-মতবাদের সহিত আসিয়াছে পাশ্চাত্য শাস্ত্রসম্মত ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা; অনন্ত উন্নতি ও স্বাধীনতা মন্ত্রের একই অহমিকা হইতে জন্ম। কিন্তু কবির মতে গতি ও স্থিতি, অধীনতা ও স্বাধীনতা, জানা ও অজানা প্রভৃতি বহু বিপরীত পর্যায়ের সংজ্ঞা একমাত্র প্রেমের ক্ষেত্রে অর্থপূর্ণ হইয়া উঠে; প্রেমই সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং প্রেমই সম্পূর্ণ অধীন। "প্রেমেতেই অসীম সীমার মধ্যে ধরা দিচ্ছেন এবং সীমা অসীমকে আলিঙ্গন করছে— তর্কের দ্বারা এর কোনো মীমাংসা করবার জো নেই।" অর্থাৎ ধর্মতত্ত্ব যেখানে হার মানে বুদ্ধি যেখানে নিস্তব্ধ, তর্ক যেখানে মূক, মানুষের অনুভূতি সেখানে সত্যকে দেখে।

রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর বিশ্ব হইতে মুক্ত নহেন, যুক্তও নহেন— অথবা মুক্তও বটে, যুক্তও বটে। মুক্ত হইলে তো তিনি নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ। কিন্তু তিনি নিজেকে বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে বাঁধিয়াছেন; এই বন্ধনেই তাঁহার রূপ প্রকাশ পাইয়াছে; এই রূপ বা 'সীমা একটি পরমাশ্চর্য রহস্য'। সীমা হইতেছে ধারণাতীত বৈচিত্র্য। অসীমের অপেক্ষা সীমা কোনো অংশেই কম আশ্চর্য নয়, অব্যক্তের অপেক্ষা ব্যক্ত কোনো মতেই অশ্রদ্ধেয় নয়। "তিনি যে নিজেকে চারিদিকেই সীমার অপরূপ ছন্দে বেঁধেছেন— নইলে প্রেমের গীতিকাব্য প্রকাশ হয় না যে।" কবি রবীন্দ্রনাথ যেভাবে রূপকে দেখিয়াছেন, তাহাই এখানে ব্যক্ত; দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ রূপ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা 'রূপ ও অরূপ' প্রবন্ধে অতি বিস্তৃতভাবেই আলোচিত হইয়াছে।

সীমা ও অসীমের বোধ, রূপ ও অরূপের সংস্কার, গতি ও স্থিতির ধর্ম, দ্বৈত ও অদ্বৈতের স্বরূপ সম্পর্কীয় বিচিত্র

১ প্রেম (অগ্রহায়ণ ১৩১৫)। শান্তিনিকেতন ১ম খণ্ড। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৪৬৫-৬।

২ সামঞ্জস্য। ২৯ অগ্রহায়ণ ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ১ম। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৪৬৭-৭১।

প্রশ্ন মনে উঠে, তাহাদের বিচারও হয়, কিন্তু মানুষের আসল প্রশ্ন থাকিয়া গেল, আমরা 'কী চাই' ?[১] উত্তরে অধিকাংশ সংসারী লোকেই বলিবে শান্তি চাই। কিন্তু শান্তি তো মুখ্য প্রার্থনা হইতে পারে না। মানুষ কোনো সাময়িক দুঃখ কষ্ট বিপদ হইতে নিষ্কৃতি বা মুক্তি লাভের জন্য শান্তি চায়। সুতরাং পূর্বে মুক্তি সম্বন্ধে যে-বিচার করা হইয়াছে, শান্তি সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য। আমাদের জীবনে স্বার্থকেন্দ্র, অহংকেন্দ্র সবকিছুকেই টানিয়া জমা করিতেছে: ইহার মাঝে মাঝে শান্তি কতটুকু আমাদের চিত্তদৈন্য দূর করিতে সক্ষম।

শান্তিতে আমাদের আসল জিনিসটা ফাঁকি দিয়া অল্পে সন্তুষ্ট করিয়া রাখে। গীতিমাল্যের গান 'তোমার কাছে শান্তি চাব না'-র ভাবটি এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। তবেই এখন প্রশ্ন আমরা কী চাই। অন্তরের পুঞ্জীভূত দুঃখ হইতে মুক্তি পাইয়া আমরা যে শান্তি চাই, তাহা সত্য চাহিদা হইতে পারে না। কারণ, প্রেমের মধ্যে শুধু শান্তি নাই, তাহাতে অশান্তিও আছে। "প্রেম শান্তিরূপেও আসবে অশান্তিরূপেও আসবে, সুখ হয়েও আসবে দুঃখ হয়েও আসবে"— নানা বেশেই সে আসে।

মানুষ যাহা চায়, তাহাই প্রার্থনার রূপ নয়; ধন চাই, মান চাই, শক্তি চাই বলিয়াও প্রার্থনা উঠে, কিন্তু সেই চাই চাই, আরও চাই-এর শেষ হয় না। অন্তরাত্মা একদিন বুঝিতে পারে যে এই অসংখ্য চাওয়ার দ্বারা সে অমৃত লাভ করে না, অর্থাৎ মানুষ যে অমরত্ব প্রার্থনা করে, তাহা অপ্রাপ্তই থাকিয়া যায়। সে-যে অমরত্ব আকাঙ্ক্ষা করে তাহা দেহের অবিনশ্বরতা নহে, মৃত্যুর পর জন্মান্তরে টিকিয়া থাকা নহে, তাহা মৃত্যুর মধ্যে অ-মৃতের স্পর্শবোধ; অর্থাৎ দিন রাত্রির মধ্যে ব্যবধান থাকিলেও যেমন বিচ্ছেদ নাই তেমনই ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে যে ভেদ আমরা কল্পনা করি তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞতাবশত, তাহা একটি অখণ্ড পরিপূর্ণতার অংশমাত্র; ধ্যানের দ্বারা ইহাদের ঐক্য অনুভূত হয়।

প্রেমের মধ্যে মৃত্যু নাই, বিচ্ছেদ নাই— স্থিতিগতি অচ্ছেদ্যভাবে আবদ্ধ; "প্রেমেই আমরা অনন্তের স্বাদ পাই। প্রেমই সীমার মধ্যে অসীমতার ছায়া ফেলে পুরাতনকে নবীন করে রাখে, মৃত্যুকে কিছুতেই স্বীকার করে না।" মানুষের প্রার্থনা[২] 'যেনাহং নামৃতঃ স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্', উপকরণ-পীড়িত হৃদয়ের ইহাই হইতেছে আসল প্রার্থনা।

প্রেমের সাধনাই সাধকদের যথার্থ সাধনা; রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনার মূলকথা এই প্রেমতত্ত্ব, তাঁহার কাব্যসাধনা এই প্রেমের বিচিত্র অনুভূতিকে আশ্রয় করিয়া— তাঁহার কর্মযোগও এই প্রেমের প্রকাশ। কিন্তু প্রেমের সাধনায় গুরুতর 'বিকার শঙ্কা'[৩] আছে। বহুকাল পূর্বে নৈবেদ্যর একটি কবিতায় কবি যে কথা বলিয়াছিলেন কবিরূপে, আজ তাহাই স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন জ্ঞানদৃষ্টিতে। মত্ততা ভক্তি নহে; "প্রেম যদি সত্য থেকে জ্ঞান থেকে চুরি করে মত্ত হয়ে বেড়ায়, তার সংযম ও ধৈর্য নষ্ট হয়, তার কল্পনাবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে, তবে সে নিজের প্রতিষ্ঠাকে নিজের হাতে নষ্ট করে— নিজেকে লক্ষ্মীছাড়া করে তোলে।" ভক্তি বা প্রেম-সাধনার এই বাধা সম্বন্ধে কবি অত্যন্ত সতর্ক তাই তাঁহার ভক্তির সাধনায় সংযম (হ্রী), সুবিবেচনা (ধী) ও সৌন্দর্য (শ্রী) থাকিবে। "এ সাধনা কঠিন সাধনা, এ পুণ্যের সাধনা, এ কর্মের সাধনা", কেবল রসের সাধনা নহে।

বিশ্বসংসারে রসবস্তু আছে বলিয়া জগত জীবন্ত গতিশীল ও সুন্দর। বিশ্বসৃষ্টির মূলে এই রসপ্রবাহ অদৃশ্য হইলেও অমোঘ নিয়মবলে প্রবাহিত। আমরা যে রসানুভব করি, তাহা আদৌ নিয়মহীন উচ্ছৃঙ্খলতা নহে। "অমৃতের

১ কী চাই। ৩০ অগ্রহায়ণ ১৩১৫, শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ. ৪৭১-৭৪।

২ প্রার্থনা। ২ পৌষ ১৩১৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৪৭৪-৭৭।

৩ বিকার শঙ্কা। ৩ পৌষ ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ২। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৪৭৮-৮১।

নীচের তলায় সত্য বসে রয়েছেন তাঁকে একেবারে বাদ দিয়ে সেই আনন্দলোকে যাবার জো নেই··· সত্য হচ্ছেন নিয়মস্বরূপ।··· যা-কিছু সত্য অর্থাৎ যা-কিছু আছে এবং থাকে তা কোনোমতেই বন্ধনহীন হতে পারে না।"[১] সত্য বলিতে কেবল তত্ত্ব বুঝায় না তথ্যও বটে ; তত্ত্বের বুনিয়াদ হইতেছে তথ্য (facts), নিয়মহীন সত্য স্বপ্নের চেয়েও মিথ্যা।

এই নিয়ম যে কেবল বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে আছে তাহা নহে, মানুষের সমাজে তাহা ওতপ্রোত হইয়া আছে। বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম পালন করিলে মানুষ কেবল স্বাস্থ্যলাভ করে তাহা নহে, প্রকৃতির শক্তি তাহার আয়ত্তাধীন হইয়া তাহাকে আনন্দ দেয় ও সুখ দেয়। সমাজনিয়ম সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন লাভের প্রধান অন্তরায় হইতেছে যে আমরা প্রতিদিনের তুচ্ছ ব্যবহারকে অগ্রাহ্য করি : কিন্তু ছোটখাটো বিষয়ও ধর্মসাধনায় তাচ্ছিল্যের ব্যাপার নহে ; প্রকৃতির সঙ্গে এবং মানুষের ব্যবহারে প্রত্যহ ছোটখাটো কত অসত্য অন্যায়ই আমরা করি, সেদিকে দৃষ্টি না গেলে সত্যসাধনা সম্পূর্ণ হয় না।

যে ব্যক্তি নির্বিশেষের ধ্যানে অধ্যাত্মজীবন লাভের প্রয়াসী, তাহাকে দৃশ্যমান, শব্দায়মান বিশ্বচরাচরের বৈশিষ্ট্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্ভোগ করিতেই হইবে নতুবা তাহার সাধনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। জগতের সহিত জীবের প্রথম পরিচয় হয় চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের মারফত। সেই সত্যকার জগতের সৌন্দর্যময় জগতকে পরিপূর্ণ অধ্যাত্মজীবন লাভের জন্যই 'দেখা'[২] দরকার। কবি 'চোখ বুজে ধ্যানযোগে দেখবার কথা' আদৌ বলিতেছেন না ; এই চর্মচক্ষে দেখার কথাই বলিতেছেন। "আমি বলছি এই চোখ দিয়েই এই চর্মচক্ষু দিয়েই এমন দেখা দেখবার আছে যা চরম দেখা।" "আলোক যে-দেখাটা দেখায়... দিগন্তবিস্তৃত আকাশমণ্ডলের নীলোজ্জ্বল থালাটির মধ্যে যে সামগ্রী সাজিয়ে সে আমাদের সম্মুখে ধরে সে কী অদ্ভুত জিনিস তার মধ্যে বিস্ময়ের যে অন্ত পাওয়া যায় না।"

কবির অভিযোগ যে জগতের যা কিছু দেখিবার আছে তাহা আমরা সত্যভাবে দেখি না, কারণ "আমাদের মনই চোখকে চেপে রয়েছে।" পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বার দিয়া বিশ্বচরাচরের গণনাতীত বস্তু ও বিষয় নিয়ত মনের উপর আছড়াইয়া পড়িতেছে ; মন এই বিচিত্রের অভিঘাতে, অসংখ্যের কোলাহলে উদ্‌ভ্রান্ত ; স্মৃতির বোঝা আর কোনো ইন্দ্রিয়কে বহন করিতে হয় না, একা মনই সকলের তল্পী বহিয়া চলে। ইহার ফলে "আমাদের দৃষ্টি নির্মল নির্মুক্তভাবে জগতের সংস্রব লাভ" করিতে পারে না।

শুধু দেখা কেন— সর্ব-ইন্দ্রিয় দিয়া আমরা জগতকে পাই। বিশ্বজোড়া বিচিত্র শব্দ ও সুরের মধ্য দিয়া যে শব্দ-ব্রহ্ম আপনাকে প্রচার করিতেছে, তাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বার রোধ করিলে 'শোনা'[৩] যায় না। বহু কবি ও দার্শনিক বিশ্বের মধ্যে একটি অনাহত নাদ কল্পনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "এই প্রকাণ্ড বিপুল বিশ্ব-গানের বন্যা যখন সমস্ত আকাশ ছাপিয়ে আমাদের চিত্তের অভিমুখে ছুটে আসে তখন তাকে এক পথ দিয়ে গ্রহণ করতেই পারি নে, নানা দ্বার খুলে দিতে হয় ; চোখ দিয়ে, কান দিয়ে, স্পর্শেন্দ্রিয় দিয়ে, নানা দিক দিয়ে তাকে নানারকম করে নিই। এই একতান মহাসংগীতকে আমরা দেখি, শুনি, ছুঁই, শুঁকি, আস্বাদন করি।" মোট কথা সর্ব-ইন্দ্রিয় দিয়া বিশ্বের সর্ব-উপাদানকে সম্ভোগ করা কবির ধর্ম ; তাহাকে কবি ধর্মাদর্শ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন।

বিশ্বকে সংগীত বলিবার বিশেষ তাৎপর্য আছে। রবীন্দ্রনাথ কবি ও সংগীতকার, ছন্দ ও সুরের মধ্য দিয়া তাঁহার বিশ্ববোধ— আবাল্যের এই সংস্কার। সংগীত ও গায়ক অভিন্ন অর্থাৎ গান গীত হইতেছে গায়ক নাই— ইহা অসম্ভব

১ হিসাব। ৬ পৌষ ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ২। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৪৮৭-৯০।

২ দেখা। ৪ পৌষ [১৩১৫] শান্তিনিকেতন ২। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৪৮১-৮৪।

৩ শোনা। ৫ পৌষ [১৩১৫] শান্তিনিকেতন ২। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৪৮৫-৮৭।

কল্পনা, তেমনই বিশ্ব প্রতিমুহূর্তে সৃষ্ট হইয়া চলিতেছে, অথচ স্রষ্টা নাই, অথবা স্রষ্টা সৃষ্টি হইতে দূরে— তাহা কল্পনাতীত। তবে একথাও সত্য যে স্রষ্টা ও সৃষ্টি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হইলেও তাহারা পৃথক এবং পৃথক হইয়াও অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ। শিল্পী ও শিল্পের সঙ্গে কবি বিশ্বসৃষ্টির উপমা দেন নাই তাহার কারণ, শিল্পসৃষ্টির পর শিল্পীর সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায়; কিন্তু যেখানে গান সেখানেই গায়ক— ইহার কোনো ব্যত্যয় হইতে পারে না।

শব্দব্রহ্ম কথাটি কবির নিকট কেবলমাত্র শাস্ত্রবাক্য নহে, অথবা অনাহত নাদ কোনো রহস্যাবৃত পদমাত্র নহে; উহারা কবির অনুভূত সত্য। কবির জগৎ হইতেছে এই সুরের জগৎ, কথার জগৎ— কেবল রূপের জগৎ নহে। শব্দ সুর ও কথা— এই তিনটি হইতেছে সংগীতের উপাদান ও প্রাণ। প্রাকৃতিক জগতে শব্দমাত্র আছে, মেঘের গর্জন, পাতার মর্মর, জলের কল্লোল প্রভৃতি ঘর্ষণজাত নানা শব্দ অহর্নিশি চলিতেছে। জীবজগৎ হইতে অনুক্ষণ বিচিত্র শব্দ ও সুর উত্থিত হইতেছে— অসংখ্য পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ -কণ্ঠনিসৃত শব্দ ও সুর। আর জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের কণ্ঠনিসৃত শব্দ সুর ও কথা মিলিয়া সংগীত উচ্ছ্বসিত হইতেছে। এই অনন্ত শব্দস্রোত সুরশিল্পী কবির নিকট অত্যন্ত বাস্তব সত্য, তাই তিনি বিশ্বকে সংগীতের রূপকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এখন মানুষের প্রধান সমস্যা এই যে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সে এমনভাবে যোগযুক্ত থাকিয়াও কেন সে ঐক্যানুভূতি করিতে অক্ষম? মনুষ্যেতর প্রায় সকল জীবই প্রকৃতির সঙ্গে আপোস করিয়া বাস করে; কেবল মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে একটু বুদ্ধি বা অহংকার যুক্ত হওয়ায়, প্রকৃতির সহিত তাহার সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে; বিরাট বিশ্বের সহিত শান্তির সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিয়া, সে এমন সব বিষয় ও বস্তু প্রকৃতির কাছ হইতে দাবি করিয়াছে, যাহা আর কোনো জীবের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নহে।

এই অহংকার বা অহংবোধের গুণে মানুষে মানুষেও ভেদ, পরস্পরের রুচির ভেদ, আকাঙ্ক্ষার ভেদ। এই বিভিন্ন রুচি ও বিচিত্র ইচ্ছার জন্য মানুষে মানুষে সংগ্রামও এমন প্রবল, এমন প্রাণান্তক। আবার সেই বিরোধ বা অমিলকে মিলাইবার অপার চেষ্টা তাহাও এই মানুষেরই। অহংবোধ না হইলে বিচ্ছেদ হয় না, বিচ্ছেদ না হইলে মিলনও সম্ভবে না, এবং মিলন না ঘটিলে প্রেমও হয় না। কিন্তু "কখন সেই প্রেমকে পাই? যখন বিচ্ছেদ-মিলনের সামঞ্জস্য ঘটে, যখন বিচ্ছেদ মিলনকে নাশ করে না এবং মিলনও বিচ্ছেদকে গ্রাস করে না— দুই যখন একসঙ্গে থাকে, অথচ তাদের মধ্যে আর বিরোধ থাকে না— তারা পরস্পরের সহায় হয়। আমাদের যা-কিছু প্রয়াস যা-কিছু সৃষ্টি সে কেবল এই ভেদ ও অভেদের অবিরুদ্ধ ঐক্যের মূর্তি দেখবার জন্যই— দুইয়ের মধ্যেই একেকে লাভ করবার জন্যে।"[১]

একথা অতি সত্য যে সর্বজীবের সঙ্গে সামান্যভাবে মানুষের অনেক মিল; এই মিল জীবসীমায় আবদ্ধ; একজায়গায় একেবারেই মিল নাই— যেখানে সে হইতেছে 'বিশেষ'[২] individual। প্রত্যেকটি 'বিশেষের' আর কোনো দ্বিতীয় নাই। এই বিশেষকে দার্শনিকদের কেহ monad নাম দিয়াছেন। ইহাকে কবি বলিয়াছেন "অনুপম অতুলনীয় আমি" এবং "এই আমির যে জগত সে একলা আমারই জগৎ আমার অন্তর্যামী ছাড়া আর কাহারও প্রবেশ" করিবার পথও নাই শক্তি নাই। এই বিশেষ আমি-র (Personality) বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে স্বাধীন ইচ্ছা লইয়া সে বিশেষ। স্বাধীন ইচ্ছার স্বরূপ প্রকাশ অহংকারে ও প্রেমে। অহংকারে সে স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক; প্রেমে সে আত্মদানপরায়ণ, পরার্থপর। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা যেখানে অহংকারের রূপ লইয়াছে, সেখানে উহা দুঃখ, বিচ্ছেদ ও মৃত্যু। ঐ স্বাধীন ইচ্ছা যখন প্রেমের মধ্যে আত্মবিসর্জন করে, তখন উহা সুখ, মিলন ও অমৃত।

১ মানুষ। ৮ পৌষ ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ২। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৪৯৫-৯৮।

২ বিশেষ। ১৬ পৌষ ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৫১৪-১৫।

দর্শনশাস্ত্রে ও ধর্মতত্ত্বে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা সংজ্ঞাটি বহুবিধ আলোচনার বিষয় হইয়াছে। এই স্বাধীন ইচ্ছার বলে মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্ব-পর্যন্ত অস্বীকার করিবার সাহস ও যুক্তি লাভ করিয়াছে; প্রকৃতির রহস্যকে অনাহত করিয়া তাহাকে শৃঙ্খলিত করিয়াছে। আবার তাহার সেই ইচ্ছার গুণেই প্রেমের রাজ্যে ঈশ্বরের অংশীদার হইতে চাহিয়াছে; যে সাহসবলে সে বিধাতার অস্তিত্বকে অস্বীকার করিয়াছিল, সেই সাহসেই সে বলিল, সোঽহং তত্ত্বমসি, অনল হক, I and my father are one. মানবের দেহাস্তিত্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় কত নগণ্য— কিন্তু পরমাত্মার কণাস্পর্শে সে কী শক্তিমান। সে জগদীশ্বরের প্রেম চায় এত বড় তাহার অহংকার।[১] সে বলে 'বসব তোমার সনে, শরিক হব রাজার রাজা, তোমার আধেক সিংহাসনে।' একদিকে তিনি মহাভিক্ষুকরূপে আমাদের সমস্ত কিছু মাগিতেছেন, অন্যদিকে তিনি রাজরাজেশ্বর বেশে আমাকে তাঁহার অংশীদার হইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। অধ্যাত্মজীবনের এই আকুতিকে অহংকার বলা যায় না, ইহা প্রেমের অধিকার— যিনি প্রেমস্বরূপ তাঁহারই দান। কিছুকাল পরে এই ভাবটি কবি গানের ভাষায় ব্যক্ত করেন:

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।[২]

ঈশ্বর মানুষের মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়া সেই ইচ্ছাকেই পুনরায় প্রেমরূপে দাবি করেন ইহা ধর্মতত্ত্বের একটি আশ্চর্য বিষয়। ঈশ্বর মানুষের সমস্তকে কঠোর নিয়মের মধ্যে বাঁধিয়াছেন, ইচ্ছাকে তেমন করেন নাই। ইচ্ছার স্বাধীনতাকে তিনি কাড়িয়া লন নাই, তিনি মন ভুলাইয়া লন— তিনি চাহিয়া লন। এই রহস্যকে আমাদের দেশে লীলা বলা হইয়াছে। ইংরেজিতে ইহার অনুরূপ শব্দ নাই, কারণ 'লীলা'ভাব পাশ্চাত্য চিন্তাধারার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। লীলাভাব কবির বহু ধর্মসংগীতে প্রকাশ পাইয়াছে— সাধারণ প্রেমের কবিতায় উহার প্রয়োগ যথেষ্ট। ঈশ্বর মহাভিক্ষুকরূপে দ্বারে উপস্থিত, ঈশ্বর বিরহীরূপে কাতর ইত্যাদি কল্পনা সম্পূর্ণ মধ্যযুগীয় অথবা উপনিষদ যুগের পরের যোজনা। এই ধর্মসাধনা বহুল পরিমাণে বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের আধ্যাত্মিক রূপ হইতে উপলব্ধ বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কবি বাল্যকালে যে পদসমুদ্র হইতে কাব্যরত্ন সংগ্রহের জন্য নামিয়াছিলেন, তাহাই যে একসময়ে ভক্তিরত্নে পরিণত হইয়া দেখা দিয়াছিল, তাহা 'পরশপাথর'-এর সন্ন্যাসীর ন্যায় কবির কাছেই অজ্ঞাত ছিল; কবে যে লৌহশৃঙ্খল স্বর্ণময় হইয়া গিয়াছে, কবে যে প্রকৃতির গান ঈশ্বরস্তবে রূপায়িত হইয়াছে, তাহা কবিই জানেন না।

আধ্যাত্মিকতার অনুকূলে জীবনে যে পরিবর্তন ঘটে, তাহার মূলে আছে উপাসনা। রবীন্দ্রনাথ দৈনিক উপাসনা করিতেন এবং বিশেষ মন্ত্রকে ধ্যান করিতেন। "মন্ত্র জিনিসটি একটি বাঁধবার উপায়। মন্ত্রকে অবলম্বন করে আমরা মননের বিষয়কে মনের সঙ্গে বেঁধে রাখি।"[৩] মন্ত্র সম্বন্ধে কবি দুই বৎসর পরে এক পত্রে লিখিতেছেন, "আমি

১ প্রেমের অধিকার। ১৭ পৌষ ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৫১৬-১৯।

২ গীতাঞ্জলি নং ১২১। ২৮ আষাঢ় ১৩১৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১১, পৃ ৯৬।

৩ মন্ত্রের বাঁধন। ২৭ চৈত্র ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৮। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ৪২৩-২৪।

উপাসনাকালে এবং অন্য সময়েও 'পিতানোঽসি' এবং 'অসতোমা' এই দুই মন্ত্র বারম্বার উচ্চারণ করিতে থাকি— করিতে করিতে যে পর্যন্ত আমার মন এই দুটি মন্ত্র সম্বন্ধে সজ্ঞান হইয়া না উঠে ততক্ষণ ছাড়ি না। 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্', এ মন্ত্রও অনেক সময় আমার বিশেষ উপকারে আসিয়াছে— কোনো সাংসারিক কারণে মন ক্ষুব্ধ হইলে বা কোনো প্রকার ক্ষতি বা অনিষ্টের আশঙ্কায় মন উদ্বিগ্ন হইলে 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' মন্ত্র জপ করিয়া একটি গভীর শান্তি ও মঙ্গলের মধ্যে মন প্রবেশ করে। কখনো কখনো আমি গায়ত্রী মন্ত্রও ধ্যান করিয়া থাকি।"[১] কবির অন্তরের ইচ্ছা ছিল যে "প্রতিদিনের উপাসনা যেন আমাদের প্রতিদিনের নিঃশেষ সামগ্রী হয়।"[২] কিন্তু প্রতিদিনের সহিত বিশেষ দিনের ভেদ ঘটাইয়া মানুষ বিশেষ দিনের উত্তেজনার আনন্দ ভোগ করিবার প্রয়াস পায়; কিন্তু বিশেষ দিনের 'উৎসবশেষে'[৩] 'ভাঙাহাটে'[৪] মন তাহার অবসাদগ্রস্ত হয়; বিশেষ দিনে যাহা সে পায়, অন্য দিনে সে তাহা উড়াইয়া দিয়া, দেউলিয়া হইয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পড়িয়া থাকে। কিন্তু যথার্থ সাধক 'প্রতিদিনই কিছু কিছু সম্বল জমিয়ে তোলে'; তাহার জীবনে উৎসবদিনের সহিত প্রতিদিনের পার্থক্য নাই— সে নিত্য উপাসনাশীল, তাহার অন্তরে চির উৎসব।

উপাসনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সাধারণত লোকের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট; অনেকের ধারণা নিত্য উপাসনা করিলে পুণ্য সঞ্চয় হয়। এই ধারণা হইতে যাঁহারা ঈশ্বরসান্নিধ্যে যাইবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের পূজা ঈশ্বরে পৌঁছায় না, পুণ্যের জন্য পূজা হয়। বলা বাহুল্য ইহা একপ্রকার পারলৌকিক বৈষয়িকতা [other worldiness]। লোকহিত, দান কর্মাদির দ্বারা মানুষ যেসব পুণ্য সঞ্চয় করে, তাহার পিছনে আছে ভগবানের কাছে পুরস্কারের লোভ, সুতরাং এই ধর্মকার্য অন্য পাঁচ রকম বিষয়কর্ম হইতে কম বৈষয়িক হয় না। পুণ্য অর্জনের উত্তেজনা হইতে মানুষ পৃথিবীতে অনেক রক্তপাত করিয়াছে। "তখন ঈশ্বরকে পিছনে ঠেলে রেখে আমরা এগিয়ে চলতে থাকি। আমরা হিত করব, আমরা পুণ্য করব, আমরা ঈশ্বরকে প্রচার করব এই কথাটাই ক্রমে ভীষণ হয়ে বেড়ে উঠতে থাকে— ঈশ্বর করবেন সে আর মনে থাকে না।··· কোথায় থাকে শান্তি, কোথায় থাকে হিত, কোথায় থাকে পুণ্য।"[৫]

এই পুণ্যলোভাতুর মানুষ ইহলোক হইতে পরলোককে বড়ো করিয়া গড়িয়াছে। সে ভাবে এ জগতে বা এ জন্মে পুণ্য সঞ্চয়ের দ্বারা অন্যজগতে বা পরজন্মে ফললাভ করিবে। এপারে পুণ্য সঞ্চয় ওপারে ফল লাভ, এপারে আশা-আকাঙ্ক্ষা ওপারে পরিতৃপ্তি; এইভাবে মানুষের স্বর্গের কল্পনা রঙিন হইয়া উঠে।

খেয়ার একটি গান আছে 'তুমি এপার — ওপার কর কে গো, ওগো খেয়ার নেয়ে।' ধর্মসাধনায় এপার ওপারের কল্পনা অত্যন্ত সাধারণ। কিন্তু মানুষের এই যে পারে যাবার আকাঙ্ক্ষা ইহা এপার হইতে নিষ্কৃতির জন্য আকুলতা নহে; কারণ যখন আমরা 'পার করো'[৬] বলি, "তখন ওপারের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে।" কিন্তু সাধনার ক্ষেত্রে পারাপার নাই, "এইখানেই সমুদ্র, এইখানেই পার।' নৈবেদ্যের ভাষায় "একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়।" কিন্তু যখনই আমরা ঈশ্বরকে ওপারে আছেন কল্পনা করিয়া ডাকাডাকি করি, তখনই "তিনি জগতের সকলের চেয়ে দূরে গিয়ে পড়েন।"[৭] অথচ তিনিই হইতেছেন পরমা গতি; উপনিষদে যাহাকে 'এষ' অর্থাৎ 'ইনি' বলা হইয়াছে, তিনিই পরমা গতি। তাঁহাতে আমাদের আশ্রয় ও তাঁহাতেই আমাদের গতি— ইহাকেই বলা হয় পার হওয়া।

১ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র, ১৮ পৌষ ১৩১৭। দ্র. প্রবাসী ১৩৪৮ মাঘ পৃ ৪৬০।

২ সঞ্চয়তৃষ্ণা। ১০ পৌষ ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ২। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৫০২-৩।

৩ উৎসবশেষ। ৯ পৌষ ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ২। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৫০০-২।

৪ ভাঙাহাট। ৮ পৌষ। ২। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৪৯৯-৫০০।

৫ সঞ্চয়তৃষ্ণা। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৫০৩।

৬ পার করো। ১১ পৌষ। শান্তিনিকেতন ২। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৫০৪-৫।

৭ এপার ওপার। ১২ পৌষ ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ২। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৫০৫-৭।

জীবনের এপার-ওপারের মতো আলোক-অন্ধকার, নিদ্রা-জাগরণ, সংকোচন-প্রসারণ হইতেছে অস্তিত্বের জোয়ার ভাঁটা; সবের মাঝে আছে শান্তি ও শক্তি, স্থিতি ও গতি— অখণ্ড পরিপূর্ণতার লীলামূর্তি মাত্র। শান্তি একার মধ্যে, স্থিতি আপনার মধ্যে কেন্দ্রিত— বহুর যোগে শক্তি ও বহুর মধ্যে গতি অর্থপূর্ণ। "অচেতন, অন্ধকার ও সংকোচনের অবস্থায় আমরা একা— জাগরণ, আলোক ও সম্প্রসারণের অবস্থায় আমরা বিশ্বের। আমাদের যথার্থ তাৎপর্য আমাদের নিজেদের মধ্যে নেই, তা জগতের সমস্তের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে।"[১] আত্মাকে সর্বত্র উপলব্ধি হইতেছে মনের জাগ্রত অবস্থা, তাহাতেই চিৎ-শক্তির স্বরূপ জ্ঞান হয়। রবীন্দ্রনাথ সমস্ত জীবনকে কার্যকারণের সুশৃঙ্খলিত সম্বন্ধের ভিতর দিয়া, অখণ্ড পরিপূর্ণতার মধ্যে দেখিয়াছিলেন; সেইজন্য 'আত্মাকে সর্বত্র উপলব্ধি' কথাটি একটি আধ্যাত্মিক অবিচ্ছিন্নতা ও ভাববিলাসী নৈর্ব্যক্তিকতার মধ্যে দেখিতে পারেন নাই; "সাধারণের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগ যতই নানা প্রকার আচারে বিচারে বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকবে ততই আমাদের নিরানন্দ অক্ষমতা ও দারিদ্র্য কেবলই বেড়ে চলবে। আমাদের দেশে বহুর সঙ্গে ঐক্যযোগের নানা সুযোগ রচনা করতে না পারলে আমাদের মহত্ত্বের তপস্যা চলবে না।··· পাপ আছে তাই বাঁধছে না, ধর্মের অভাব আছে তাই কিছুই ধরা যাচ্ছে না।··· আমাদের আত্মা কোনোমতেই সেই বিশ্বকর্মা বিরাট পুরুষের সঙ্গে যুক্ত হবার যোগ্য নিজের বিরাট রূপ ধারণ করতে পারছে না।" এই কয়েকটি পংক্তির প্রত্যেকটি শব্দ যে কত গভীর তাহা কেবলমাত্র পাঠমাত্রে উপলব্ধি হইবে না। আমাদের ব্যবহারিক জীবন ও ধর্মের জীবন দুই পর্যায়ে খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে; আমরা ভুলিয়া যাই উহারা সমন্বিত সত্য, জোয়ার ভাটার ন্যায় অচ্ছেদ্য তত্ত্ব, গতি ও স্থিতির ন্যায় অবিশ্লিষ্ট। এই সামঞ্জস্যবোধ উপলব্ধি না হইলে, জগতটাকে যন্ত্র বলিয়া ভ্রম হয়; বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য ও যাথাযথ্য নষ্ট হয়। যে ধর্মহীনতা মানুষের পরস্পরের মধ্যে যোগধর্মকে বাধাগ্রস্ত করে, তাহাকেই কবি পাপ বলিয়াছেন। আজ সর্বমানবের মধ্যে যোগধর্ম ব্যাহত, পাপ বা অসামঞ্জস্য উদগ্র— তাই আজ জগত ধ্বংসোন্মুখী।

জগত-সংসারে এইরূপটি কেন হইল এ প্রশ্ন মানুষের মনে উঠে। ইহার উত্তরে পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মানুষের অহংবোধ হইতে ভেদের সৃষ্টি; বিশেষ অহং হইতে বিশেষ ইচ্ছারও জন্ম। এই ইচ্ছার আবার বিচিত্র রূপ; তবে প্রধানত দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত ক্ষেত্রে তাহার আত্মপ্রকাশ চোখে পড়ে— একটি শক্তিরূপে, অপরটি সেবারূপে। যখন ইচ্ছা শক্তিরূপে প্রকাশ পায়, তখনই সে বিরোধকে টানিয়া আনে; কারণ প্রত্যেকের ইচ্ছাই স্বাধীন এবং প্রত্যেকেই নিজ ইচ্ছাকেই চরম বলিয়া দাবি করে। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় কোন্ ইচ্ছা যে সত্য-ইচ্ছা তাহার পরখ বা প্রমাণ কী। ইহার উত্তর অতি সংক্ষিপ্ত— যখন অন্যের ইচ্ছার সঙ্গে আমার ইচ্ছাকে সম্মিলিত দেখিব, তখনি বুঝিব আমার ইচ্ছার মধ্যে সত্য আছে; যদি কোথাও বাধা ঘটে, বুঝিতে হইবে জীবনের কোথাও বেসুর বাজিতেছে। কিন্তু ইচ্ছার সম্মেলন কখনো শক্তির পথে সার্থক হয় না; একমাত্র সম্ভব হয় সেবার পথে প্রেমের পথে। যে সকলের সেবক, সে সকলের উপর। আধ্যাত্মিক জীবনে যে আপনাকে সকলের সেবক করিতে পারে, সেই কর্ত্রীশক্তি লাভ করে, সেইজন্য প্রেমই জীবনে শক্তি। "ইচ্ছা যে অহংকারের মধ্যে আপনাকে স্বাধীন বলে প্রকাশ করেই সার্থক হয় তা নয়, ইচ্ছা প্রেমের মধ্যে নিজেকে অধীন বলে স্বীকার করাতেই চরম সার্থকতা লাভ করে।"[২]

এখন এই ইচ্ছার উৎপত্তি, কোথায় ও কী কারণে তাহা বিচিত্র ও বিরুদ্ধ, তৎসম্বন্ধে কবি কী ভাবিয়াছেন, তাহা দেখা যাউক। মানবজীবনের যে তিনটি স্তর কল্পনা করা হয়, তাহারা হইতেছে প্রাকৃতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বা physical, moral and spiritual অথবা অন্যভাবে বলা যাইতে পারে তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক। মানবের

১ দিন। ১৩ পৌষ। শান্তিনিকেতন ৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৫০৮-১০।

২ ইচ্ছা। ১৮ পৌষ ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৫১৯-২১।

প্রথম জ্ঞান-উন্মেষের সময় প্রকৃতিই তাহার সর্বস্ব ; তথ্যকে সে তত্ত্ব হইতে পৃথক করিতে অপারক ; দেবতা তখন বাহ্য পদার্থের অন্তর্গত ; অন্তরের প্রকৃতি তখন ইন্দ্রিয়ের অনুবর্তী, প্রবৃত্তি তখন প্রবল।

প্রকৃতি সম্বন্ধে রহস্য বিজ্ঞানের সাহায্যে ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত হইতেছে ; প্রকৃতির ধর্ম মানুষ জানিতে পারে, তাহাকে শৃঙ্খলিত করিবার কৌশল তাহার আয়ত্তাধীন হয় ; কিন্তু অন্তরপ্রকৃতি বা প্রবৃত্তির অনেক বিষদন্ত ; সমাজশাসনে বা সম্মেলিত মানব-ইচ্ছার বলে তাহা শমিত হয়, কিন্তু নিরঙ্কুশ হয় না ; স্থূলরূপ প্রকৃতি হইতে সূক্ষ্মরূপ প্রবৃত্তি কম ভীষণ নহে। প্রবৃত্তি বা মনোপ্রকৃতির নানা রূপ, তাহার অন্যতম হইতেছে বাসনা (desire) ; বহির্জগত যে শক্তিবলে আমাদের চেষ্টাকে বাহিরের দিকে আকর্ষণ করে, তাহাকেই বাসনা বলা যাইতে পারে। "এই বাসনায় আমাদের বাহিরের বিচিত্র বিষয়ের অনুগত করে।"[১] সেইজন্য "বাসনা যদি ঠিক জায়গায় না থামে··· তাহলে আমাদের জীবন তামসিক অবস্থা"য় পড়িয়া থাকে ; এই অবস্থায় মানুষ কোনো স্থায়ী জিনিসকে গড়িয়া তুলিতে পারে না।

মানুষের বাসনা গিয়া থামে ইচ্ছায় (will)। বাসনার লক্ষ্য যেমন বাহিরের বিষয়কে পাওয়া, ইচ্ছার লক্ষ্য তেমনি ভিতরের অভিপ্রায়কে (intention) সফল করা। ইচ্ছা আমাদের বাসনাসমূহকে একটা কোনো আন্তরিক অভিপ্রায়ের চারিদিকে বাঁধিয়া ফেলে ; বাসনাগুলি 'ইচ্ছা'র শাসনে শৃঙ্খলিত হইয়া অন্তরে গিয়া বাসা বাঁধে। তখন ইচ্ছাশক্তি তামসিকতার স্তর পার হইয়া রাজসিকতার উৎকর্ষ লাভ করে। সেইখানে মানুষ বিদ্যায় ঐশ্বর্যে প্রতাপে অদ্বিতীয় হইতে চাহে। ইহাকেই আধুনিক ভাষায় বলা যাইতে পারে the will to power— দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই এই শক্তি-উপাসক। ভারতে একদল সাধক শক্তিসাধনা করিয়াছিলেন, আধ্যাত্মিক জগৎ জয়ের আশায়— প্রবৃত্তিকে বাসনাকে শমিত করিয়া জয়যুক্ত হইবার জন্য সে শক্তিসাধনা।

মানুষের ইচ্ছাও তাহার বাসনার ন্যায় অগণ্য ; তবে বাসনা হইতে তাহা প্রবল, নিষ্ঠুর। ইচ্ছাগুলিকে কোনো এক প্রভুর অনুগত করিবার জন্য মানবাত্মার নিত্য আকিঞ্চন। মানুষ অতিদুঃখে বলে, 'আমায় ছ জনায় মিলে পথ দেখায় ব'লে, পদে পদে পথ ভুলি হে'। মানুষের পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ও মন অথবা তাহার ষড়রিপু— ইহারাই শাসন-অভাবে দুর্দমনীয় হয়, আত্মাকে তামসিকতার স্তর ভেদ করিতে দেয় না।

তামসিকতায় প্রবৃত্তি প্রধান— রাজসিকতায় শক্তি প্রবল ; উভয়ই মানুষের আত্মার কাছে অসহ্য। মানুষ চাহে তাহার দুরন্ত ইচ্ছাগুলিকে বিশ্ব-ইচ্ছার সঙ্গে মিলাইয়া দেয়। সেই বিশ্ব-ইচ্ছাই জগতের একমাত্র ইচ্ছা, মঙ্গল-ইচ্ছা। যখন আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছার সহিত বিশ্বমানবের ইচ্ছার আর কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না, তখন ত্যাগে ক্ষতি হয় না, ক্ষমায় বীর্যহানি হয় না, সেবায় দাসত্ব হয় না। "তখন আত্মা পরমাত্মার পরম মিলনে বিশ্বজগৎ সম্মিলিত। তখন স্বার্থবিহীন করুণা, ঔদ্ধত্যবিহীন ক্ষমা, অহংকারবিহীন প্রেম— তখন জ্ঞানভক্তিকর্মে বিচ্ছেদবিহীন পরিপূর্ণতা।"[২] এই ব্যক্তিগত ইচ্ছা বিশ্বমানবের ইচ্ছার সহিত সম্পূর্ণরূপে একধর্মী হইবার অবস্থাকে বলা যাইতে পারে ধর্মসাধনার সাত্ত্বিক অবস্থা।

ব্যক্তিগত ইচ্ছার সহিত বিশ্বগত মঙ্গল ইচ্ছার যোগযুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা হইতেছে প্রার্থনা। প্রার্থনার অর্থ যাচ্‌ঞা নহে ; ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার মাঝখানে দৌত্য সাধন করে প্রার্থনা— ইহা দুই ইচ্ছার মাঝখানে সেতু। ব্যাখ্যাটি রূপকমূলক। মানবের হৃদয় হইতে বেদনার মূর্তিরূপে যে আকুতি উঠে তাহাই প্রার্থনা। এখন এই প্রশ্ন উঠে, ধর্মসাধনায় হৃদয়ের স্থান কী। সাধারণত দেখা যায় ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় ইন্দ্রিয় চৈতন্য ও বুদ্ধিকে সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া হয় ;

১ বাসনা, ইচ্ছা, মঙ্গল। ১১ ফাল্গুন ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৬। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ৩৪০-৩৪২।

২ তিনতলা। ১০ ফাল্গুন ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৬। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ৩৩৮-৩৩৯।

হৃদয় বা বোধিকে সহজে প্রমাণ বলিয়া কেহ মানিতে চাহেন না। কিন্তু এ কথা না শ্রদ্ধেয়, না যৌক্তেয়। যুক্তি ও শক্তির সংযোগে মানুষের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, কিন্তু ভক্তি ও প্রীতির বলে মানুষ বুঝিতে পারে ঈশ্বর রসস্বরূপ। হৃদয়ের বিচিত্র রহস্য মানুষ এখনো আবিষ্কার করিতে পারে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে 'নাই' বলিলেই যে সে যায় না, তাহা তো মানুষ নিত্যই 'অনুভব' করিতেছে। "আমাদের এই ইচ্ছার সময় হৃদয়টি জগদ্ব্যাপী ইচ্ছারসের নাড়ির সঙ্গে বাঁধা।"[১]

জ্ঞান, বুদ্ধি, তর্ক, শক্তির অভ্যুদয় যেমনভাবে মানবের মধ্যে হইয়াছে— ভক্তি বিশ্বাস, আত্মসমর্পণ, ইচ্ছা, স্নেহ, প্রেমও ঠিক তেমনিভাবে মানবের মধ্যে বাসা বাঁধিয়া আছে। অস্বীকৃতির দ্বারা তেমনি ভক্তি ও ভালোবাসাকে দূর করা সম্ভব হইবে না।

মানুষের ইচ্ছা প্রেম আনন্দ প্রভৃতি যদি সবই ঈশ্বরের লীলারূপের অঙ্গ হয়, তবে সংসারে এত শাসনের বন্ধন কেন, এত নিয়মনিষ্ঠা কেন এই প্রশ্ন স্বভাবতই ধর্মপিপাসু ব্যক্তির অন্তরে উঠিতে পারে। ইহার উত্তরে কবি উপনিষদের বাণী উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন[২] যে ঈশ্বর আমাদের জনিতা, বিধাতা ও বন্ধু। বিধানের অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বিশ্বসংসার গ্রথিত; বিধান জিনিসটা ব্যক্তিবিশেষের জন্য নহে, খণ্ড সময়ের জন্যও নহে; বিশ্ববিধানের যোগেই সমষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টি যোগযুক্ত, কালের সঙ্গে কাল অচ্ছেদ্যভাবে মিলিত। এই বিধান অনাদি অনন্ত কালের বিধান এবং "আদ্যোপান্ত যথাতথা— কোথাও ছেদ নেই, অসংগতি নেই।"

কবি অন্যত্র বলিয়াছিলেন, "আমাদিগকে যাহা-কিছু দিবার তাহা আমাদের প্রার্থনার বহুপূর্বেই দেওয়া হইয়া গেছে। আমাদের যথার্থ ঈপ্সিত ধনের দ্বারা আমরা পরিবেষ্টিত। বাকি আছে কেবল লইবার চেষ্টা— তাহাই যথার্থ প্রার্থনা।"[৩] পূর্ব হইতে সব দেওয়া আছে ইহা যদি স্বীকার করা হয়, তবে দর্শনের ও ধর্মের অনেক জটিল সমস্যা উঠে। Predestination মানিলে progress মানা যায় না; কবি এসব জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করেন নাই।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধের একটি বড় অঙ্গ হইতেছে প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম সম্বন্ধে সচেতনতা; মানুষ আপনাকে বিশ্বপ্রকৃতি ও অন্তরপ্রকৃতির নিয়মের অনুগত না করিতে পারিলে আপনাকে ব্যর্থ করে ও চারি দিকে অশান্তির সৃষ্টি করে। "এইজন্যে আমাদের শিক্ষা হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম শিক্ষা এবং নিজেকে নিয়মের অনুগত করতে শেখা", কবির মতে "এই শিক্ষার দ্বারাই আমরা সত্যের পরিচয় লাভ করি।"[৪] অর্থাৎ বিজ্ঞানের সাধনা হইতেছে ধর্মসাধনারই অঙ্গ। বিশ্বপরিচয় লাভ বিশ্ববিধাতাকে জানিবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়; কারণ শক্তির মধ্যে তিনি নিয়ম স্বরূপ, তথায় তিনি শান্তম্। শান্তম্ বলিয়াই তিনি সকলকে ধারণ করেন, রক্ষা করেন, সকলেই তাঁহাতে ধ্রুব আশ্রয় পাইয়াছে।

শক্তির মধ্যে যে শান্তরূপটি বিদ্যমান এই তত্ত্বটি আমরা জ্ঞানদ্বারা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। "যদি নিয়ম ছিন্ন হত, যদি নিয়ম শাশ্বত এবং যথাযথ না হত, মুহূর্তের মধ্যে এই বিপুল বিশ্বশান্তি ধ্বংস হয়ে একটি অর্থহীন পরিণামহীন প্রলয়ের প্রচণ্ড নৃত্য আরম্ভ হত, তা হলে বিশ্বসংসারে বিরোধই জয়ী হয়ে তার নখদন্ত দিয়ে সমস্ত ছিন্নভিন্ন করে ফেলত।" কিন্তু তাহা হয় না, কারণ সত্যের স্বরূপ হইতেছে শান্তম্। কবি অন্যস্থলে বলিয়াছেন, "জগতের মধ্যে যে প্রবল প্রচণ্ড শক্তি কেবলমাত্র শক্তিরূপে বিভীষিকা, শান্তম্ তাহাকেই ফলে-ফুলে প্রাণে-সৌন্দর্যে মঙ্গলময় করিয়া তুলিয়াছেন।

১ প্রার্থনার সত্য। ২০ পৌষ ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ. ৫২৪-৫২৬।

২ বিধান। ২১ পৌষ ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ. ৫২৬-৫২৮।

৩ প্রার্থনা। ১৩১১। ধর্ম, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৩৭২-৩৭৬।

৪ তিন। ২১ পৌষ ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৫২৮-৫২৯।

কারণ: যিনি শান্তম্ তিনিই শিবম্।"[১] এইজন্যই সত্য শান্তম্ বলিয়াই শিবম্ বা মঙ্গলময়। কারণ নিয়মের সঙ্গে নিয়মের বিচ্ছেদই অশিব, অমঙ্গল। সত্য যেখানে শিবস্বরূপ, সেইখানে তিনি আনন্দময়, প্রেমময় এবং সমস্ত বিধৃত অদ্বৈতমের ভিতর। আমাদের জীবনের বুনিয়াদ শান্তম্-এর মধ্যে, তাহার ব্যাপ্তি শিবম্-এ ও তাহার পরিণতি অদ্বৈতম্-এ।

একদিকে সত্য অর্থাৎ world of realities বা বিজ্ঞান অথবা প্রকৃতির জগৎ— অপর দিকে আনন্দলোক, মাঝখানে মঙ্গল। নিয়মের জগৎ ও আনন্দের জগতের মাঝখানে আছে সংসার ও সমাজ— মঙ্গল কর্মের ক্ষেত্র। আমাদের দেশে যে চতুরাশ্রম ছিল তাহার মধ্যে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ যথাক্রমে শান্তম্, শিবম্ ও অদ্বৈতম্-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মচর্যের দ্বারা জীবনে শান্তস্বরূপকে লাভ করিলে গৃহস্থধর্মে মঙ্গলস্বরূপকে উপলব্ধি করা সম্ভবপর হয়। আরম্ভে সত্যের পরিচয়, মধ্যে মঙ্গলের পরিচয়, পরিণামে আনন্দের পরিচয় বা অদ্বৈতের উপলব্ধি। "সত্যে শেষ নয়, মঙ্গলে শেষ নয়, অদ্বৈতেই শেষ। জগৎপ্রকৃতিতে শেষ নয়, সমাজ-প্রকৃতিতে শেষ নয়, পরমাত্মাতেই শেষ, এই হচ্ছে ভারতবর্ষের বাণী।"[২]

ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে ইচ্ছাশক্তি দ্বারা পার্থক্যদান বা বিশেষত্ব দান করিয়াছেন; তেমনই প্রকৃতির মধ্যে প্রত্যেকটি বস্তুতে যে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা নিয়মের দ্বারা পৃথকীকৃত। "বিশ্বজগতে ঈশ্বর জলের নিয়ম, স্থলের নিয়ম, বাতাসের নিয়ম, আলোর নিয়ম, মনের নিয়ম, নানাপ্রকার নিয়ম বিস্তার করে দিয়েছেন।"[৩] বিবিধ নিয়মের দ্বারা সীমার সৃষ্টি; নিয়ম না থাকিলে সমস্ত একাকার হইত— নিয়ম হইতে আকারের উদ্ভব।

কিন্তু প্রকৃতির এই বিভিন্ন রূপ যদি কেবলই নিজ নিজ নিয়ম অনুসারে চালিত হয়, তবে তো জগতকে সমষ্টিরূপে ধরাই যাইত না, অসংখ্য বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির প্রলাপ বলিয়া প্রতিভাত হইত। কিন্তু বিশ্বে সে প্রলাপ দেখা যায় না। কারণ ঈশ্বরের শক্তি এই সমস্ত পার্থক্যের উপর কাজ করিয়া বিশ্বসংসারকে একটি অভিপ্রায়ে বাঁধিয়াছে। এমনি করিয়া যিনি অসীম তিনি সীমার দ্বারাই নিজেকে ব্যক্ত করিতেছেন, যিনি অকালস্বরূপ খণ্ডকালের দ্বারা তাঁহার প্রকাশ চলিয়াছে। এই পরমাশ্চর্য রহস্যকেই বিজ্ঞানশাস্ত্রে বলে পরিণামবাদ।

"প্রকৃতির মধ্যে নিয়মের সীমাই হচ্ছে পার্থক্য, আর আত্মার মধ্যে অহংকারের সীমাই হচ্ছে পার্থক্য।" শক্তির ক্ষেত্রে প্রকৃতি নিয়মবদ্ধ, আর প্রেমের ক্ষেত্রে জীবাত্মা অহংকারাবদ্ধ। "প্রকৃতিতে শক্তির দ্বারা" ঈশ্বর "নিজেকে 'প্রচার' করছেন আর জীবাত্মায় প্রেমের দ্বারা তিনি নিজেকে 'দান' করছেন।"[৪] সেইজন্য প্রকৃতির ক্ষেত্রে যাহাদের সাধনা তাহারা শক্তিলাভ করে -- তাহারা ঐশ্বর্যশালী হয়। ইহাদের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ, তাহাদের ধর্ম হইতেছে শ্রেয়োনীতি। শক্তিলাভ করিতে হইলে অনেকের সঙ্গে মিলিতে হয়। নিয়মকে স্বীকার করিতে হয়; তাঁহারা জানেন এই শ্রেয়োনীতিবলে বিশ্বের আনুকূল্য আহরণ করা যায়। শক্তিবাদীরা জানেন নিয়মেই শক্তির জন্ম; যাহারা বুদ্ধিবলে বিশ্বব্যাপারে এই নিয়মকে দেখিতে বা প্রয়োগ করিতে পারে না, তাহারা জীবনের সর্ববিষয়েই অশক্ত, অকৃতার্থ, পরাভূত। আত্মবিশ্বাসী শক্তিসাধকেরা শ্রেয়োনীতিকেই মানুষের শেষসম্বল বলিয়া জ্ঞান করেন; বৈজ্ঞানিক সত্যকে তাঁহারা চরম সত্য বলিয়া মানেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান, শক্তির ক্ষেত্রে ঐশ্বর্যকে পাওয়া যায়, আনন্দকে পাওয়া যায় না।

১ শান্তং শিবমদ্বৈতম্। ১৩১৩ সালে শান্তিনিকেতনে পৌষ উৎসবের ভাষণ। বঙ্গদর্শন ১৩১৩ পৌষ। দ্র ধর্ম, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৪১০-৪১৬।

২ তিন। ২১ পৌষ ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৫২৮-৫২৯।

৩ পার্থক্য। ২৩ পৌষ ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৫৩০-৫৩২।

৪ প্রকৃতি। ২৪ পৌষ। শান্তিনিকেতন ৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৫৩২-৫৩৪।

শক্তিবাদীরা অনন্ত উন্নতির কথা বলেন[১]; গতির উপর তাঁহাদের বিশ্বাস, স্থিতির উপর তাঁহারা কোনো ভরসা রাখেন না।• তাঁহাদের মতে চলাটাই আনন্দ। কিন্তু প্রবাহের উপর যে লোক প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করে, তাহাকে ডুবিতে হয়। কেবল গতি, কেবল উন্নতি— পরিণতি কোথাও নাই, এমন অবস্থা কল্পনাতীত।

যাহাই হউক, শক্তির ক্ষেত্রে যাহারা সফল হয় তাহারা অহংকে বড় করিয়া সার্থক হয়-- আর অধ্যাত্মক্ষেত্রে যাহারা সফল হয় তাহারা অহংকে ত্যাগ করিয়া কৃতার্থ হয়। সুতরাং বিশ্বরাজ্যে শক্তি ও ভক্তি দুই স্তরে কাজ করে। প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে যাহা শক্তি ও নিয়ম, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাহা ভক্তি ও লীলা বা আনন্দ। এই প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক যেখানে সামঞ্জস্য লাভ করে সেখানেই পরিপূর্ণতা। প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক একটি অখণ্ডতার দ্বারা বিধৃত, যেমন পূর্ব ও পশ্চিম একটি অখণ্ড গোলকের মধ্যে সম্মিলিত। ইহারা পরস্পরের বিরোধী হইলে বিচ্ছিন্নতার ভিতর দিয়া প্রলয়সংঘাতে তাহারা আকৃষ্ট হয়।"[২]

শক্তি ও ভক্তি, নিয়ম ও লীলার সাধনাকে কবি অন্যত্র জাহাজের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিয়াছেন জাহাজের হালও চাই পালও চাই; অর্থাৎ তাহাকে নিয়মের দ্বারা যেমন বাঁধিতে হইবে তেমনি "ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন" করিতে হইবে।[৩]

রবীন্দ্রনাথ জীবনশিল্পী, জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখা ও ঐক্য সৃষ্টি করাই তাঁহার শিল্পধর্ম। প্রকৃতি ও আত্মার মধ্যে সামঞ্জস্যকে আবিষ্কার করিতে না পারিয়া এবং উভয়ের মধ্যে ব্যবধান দুর্লঙ্ঘ্য কল্পনা করিয়া, একদল জ্ঞানীলোক সংসারকে ও কর্মের সকল প্রকার বন্ধনকেই অস্বীকার করিলেন। অর্থাৎ জড় ও আত্মার মধ্যে থাকিয়া জীব বা সংসার সেতুরূপ উভয়কে যোগযুক্ত করিতেছে এবং কর্মই তাহার ধর্ম— এই রহস্যটুকু না বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা সংসারে বিরাগী। ফলে পরমাত্মা বা ব্রহ্ম তাঁহাদের নিকট নিষ্ক্রিয় নির্বিকল্প ও নির্গুণ বলিয়া প্রতিভাত হইলেন। জড় ও আত্মার মধ্যাবস্থিত জীব ও সংসারের কর্ম অ-জ্ঞান, অ-বিদ্যার কোঠায় নির্বাসিত হইল।

উপনিষদের ঋষিরা কর্মের নিন্দা করেন নাই। কারণ তাঁহারা সংসারকে অস্বীকার করেন নাই। কর্ম তখনই বন্ধন, যখন তাহা অভাব হইতে উদ্‌ভূত, কিন্তু যে কর্ম আমরা আনন্দে করি, তাহা বন্ধন হইতে পারে না; "কারণ কর্মের মুক্তি আনন্দের মধ্যে এবং আনন্দের মুক্তি কর্মে। সমস্ত কর্মের লক্ষ্য আনন্দের দিকে এবং আনন্দের লক্ষ্য কর্মের দিকে"।[৪] উপনিষদে আছে যাহারা "কেবল অবিদ্যায় অর্থাৎ সংসারের কর্মে রত তারা অন্ধকারে পড়ে, আর যারা বিদ্যায় অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মজ্ঞানে রত তারা ততোধিক অন্ধকারে পড়ে।··· ব্রহ্মহীন কর্ম অন্ধকার এবং কর্মহীন ব্রহ্ম ততোধিক শূন্যতা।" গীতায় একেই বলে কর্মযোগ।

আসলে জ্ঞান প্রেম ও শক্তি বা কর্মের পরিপূর্ণ মিলনেই পূর্ণ আনন্দ। এখন এই শক্তি বা কর্মের মধ্যে যে অমোঘ বিধানরাজি আছে তাহার কথা পূর্বেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে; বিধান বা নিয়মকে সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া তবেই বিধানের মধ্যে মানুষের কর্তৃত্ব জন্মে; সংসারের মধ্যে বাস করিয়া আমরা সংসারের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারি, কর্মের মধ্যে থাকিয়াই আমরা কর্মের চেয়ে বড় হইতে পারি, "কর্মেই আমাদের স্বাভাবিক মুক্তি"।[৫] কবি অন্যত্র কর্ম অর্থে মঙ্গল কর্ম বলিয়াছেন; "মঙ্গল কর্মের মধ্যে মঙ্গলময়ের আবির্ভাব আমাদের কাছে স্পষ্ট" হইয়া উঠে। "মঙ্গল অনুষ্ঠানের

১ পাওয়া। ২৫ পৌষ ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ২৮৫-২৮৭।

২ সমগ্র। ২৬ পৌষ ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ২৮৭-২৮৯।

৩ শক্ত ও সহজ। ২৪ চৈত্র ১৩১৫। শান্তিনেকেতন ৮। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ৪১৮-৪২০।

৪ কর্ম। ২৭ পৌষ ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ২৯০-২৯২।

৫ শক্তি। ২৮ পৌষ ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ২৯২-২৯৪।

চরম সার্থকতা" বিশ্বকর্মাকে সত্যদৃষ্টিতে দেখা। এইজন্যই কর্মের প্রয়োজন— নতুবা "কর্মের মধ্যেই কর্মের কোনো গৌরব থাকিতে পারে না।"[১]

শাস্ত্রমতে ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় নহেন, 'আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ'। ঈশ্বরের ইচ্ছা তাঁহার লীলামাত্র এই কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইতেছে, "অন্তরের মধ্যে যা আত্মক্রীড়া, যা পরমাত্মার সঙ্গে ক্রীড়া, বাহিরে সেইটিই যে জীবনের কর্ম। অন্তরের সেই আনন্দ বাহিরের সেই কর্মে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে, বাহিরের সেই কর্ম অন্তরের সেই আনন্দে আবার ফিরে ফিরে যাচ্ছে। এমনি করে অন্তরে বাহিরে আনন্দ ও কর্মের অপূর্ব সুন্দর আবর্তন চলছে এবং সেই আবর্তনবেগে নব নব মঙ্গল-লোকের সৃষ্টি হচ্ছে।"[২]

উপনিষদে যে কর্মের নিন্দা করা হয় নাই, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে ; পরবর্তীযুগে অদ্বৈতবাদীরা কর্মকে 'অবিদ্যার কোঠায় নির্বাসিত' করিয়া অত্যন্ত বিশুদ্ধ তত্ত্বদর্শী হইতে চাহিয়াছিলেন, দ্বৈতবাদীরা জগতের মূলে দুইটি তত্ত্ব স্বীকার করিয়া লইবেন – প্রকৃতি ও পুরুষ। "অর্থাৎ ব্রহ্মকে তাঁহারা নিষ্ক্রিয় নির্গুণ বলে একপাশে সরিয়ে রেখে দিলেন এবং শক্তিকে জগৎক্রিয়ার মূলে যেন স্বতন্ত্র সত্তারূপে স্বীকার করলেন। শক্তি ও শক্তির কার্য থেকে শক্তিমানকে দূরে বসিয়ে তাঁকে একটা খুব বড়ো পদ দিয়ে তাঁর সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ একেবারে পরিত্যাগ করলেন।"[৩]

ঈশ্বর সগুণ কি নির্গুণ তাহা দার্শনিকদের বা নৈয়ায়িকদের বিচার্য বিষয় ; ব্রহ্মজ্ঞানান্বেষীরা বলিবেন তিনি উভয়ই ; কারণ মনের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় তিনি কখনো নির্গুণ কখনো সগুণ। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি গায়ক হইতে গানকে যেমন পৃথক করা যায় না তেমনি ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে ভেদ কল্পনাতীত। পুরুষ হইতে প্রকৃতিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, যেমন কোনো চিত্রপট হইতে চিত্রকে পৃথক করা অসাধ্য।

দার্শনিক তত্ত্ব হইতে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় দর্শনের চিরন্তন দ্বন্দ্ব— দ্বৈত ও অদ্বৈত— বিচার করেন নাই। তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে "অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ নিয়ে আমরা যখন বিবাদ করি তখন আমরা মত নিয়েই বিবাদ করি, সত্য নিয়ে নয়।"[৪] 'মায়াবাদ' কথাটা শুনিলেই দ্বৈতবাদীরা অসহিষ্ণু হন ; অথচ কবির প্রশ্ন, "আমরা কি এককে আর বলে জানি নে।... আমি যে অনুভব করছি, মিথ্যার বোঝায় আমার জীবন ক্লান্ত। আমি যে দেখতে পাচ্ছি, যে পদার্থটাকে 'আমি' বলে ঠিক করে বসে আছি... যতই দুঃখ পাই কোনোমতেই তাকেই ফেলতে পারি নে। অথচ অন্তরাত্মার ভিতরে এক বাণী আছে, ও সমস্ত মিথ্যা ও সমস্ত তোমাকে ত্যাগ করতেই হবে।" লেখকের মতে মায়া হইতেছে এই চারি দিকে আপাতপ্রতীয়মান দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বের দ্বারাই বিশ্ব খণ্ডিত। আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণ-কেন্দ্রানুগ শক্তি, কেন্দ্রাতিগ শক্তি কেবলই বিরুদ্ধতার দ্বারা আপনাকে সৃষ্টিরূপে নিয়ত প্রকাশমান করিতেছে ; অথচ গভীরভাবে দেখিলে বিরোধ সংসারেই দেখা যায়— ব্রহ্মে পূর্ণতা।

অখণ্ড অদ্বৈতের সাধকগণ ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলিয়া জানেন ; অথচ বিশিষ্টতা বলিয়া একটি আশ্চর্য পদার্থ যে আছে, তাহাকেও মানুষ অস্বীকার করিতে পারিতেছে না ; তাহাকে "মিথ্যাই বলি আর মায়াই বলি, তার মস্ত একটা জোর, সে আছে।'[৫] এই বিশেষের উদ্ভব ও অস্তিত্ব কিভাবে হইল তাহার উত্তর পাওয়া যায় উপনিষদে 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে' অর্থাৎ "ব্রহ্মের আনন্দ থেকেই এ সমস্ত যা-কিছু হচ্ছে। এ তাঁর ইচ্ছা— তাঁর আনন্দ।" কিন্তু ইহা

১ ছুটির পর। [আষাঢ় ১৩১৬]। শান্তিনিকেতন ৯। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ৪৮০-৪৮২।

২ প্রাণ। ২৯ পৌষ ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ২৯৪-২৯৫।

৩ জগতের মুক্তি। ১ মাঘ ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪শ, পৃ ২৯৬-২৯৮।

৪ মত। ২ মাঘ ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ৩০১-৩০৩।

৫ নির্বিশেষ। ৩ মাঘ ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ৩০৩-৩০৬।

মুক্তি নহে, প্রমাণও নহে, সাধকের উক্তিমাত্র।

নির্বিকল্প নির্বিশেষ ব্রহ্ম বিচিত্র ও বিশেষের মধ্যে যে ধরা দিয়াছেন ইহার রহস্য কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। যিনি অ-কায়, তিনি রূপ গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্' তিনি পাপপুণ্যময় মনের অধিপতি হইয়াছেন। ইহার কারণ ব্রহ্ম শুধু আছেন তাহা নহে, তিনি করেন।[১] মানুষের স্বভাবের মধ্যে এই দুইটি আছে—"আমরাও হই এবং করি। আমাদের হওয়া যতই বাধামুক্ত ও সম্পূর্ণ হবে আমাদের করাও ততই সুন্দর ও যথাযথ হয়ে উঠবে।" পাপশূন্য বিশুদ্ধতাই হইতেছে পূর্ণতা, বৈরাগ্যদ্বারা আসক্তিবন্ধন হইতে মুক্ত হইলে পবিত্রতা ও নির্বিকারত্ব আসে। ব্রহ্মচর্য সাধনার দ্বারা বাধামুক্ত নিষ্পাপ চিত্তের পক্ষে সর্বত্র ব্যাপ্ত হওয়া সম্ভব; এবং তখনই সংসারকে কাব্যরূপে আমরা দেখিতে পারিব; মনকে রাজ্য করিয়া তুলিব, এবং বাহিরে ও অন্তরে আমাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। অর্থাৎ আত্মার স্বয়ম্ভূবত্ব সুস্পষ্ট হইবে।

ব্রহ্মসাধনায় জ্ঞানীরা নির্বিশেষ ঈশ্বরকে এমন একস্থানে লইয়া যান যে, যেখানে তাঁহার অস্তিত্ব ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে প্রায় অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে; অর্থাৎ নির্বিকার নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের সহিত মানবের সম্বন্ধ প্রায় অবলুপ্ত হইয়া যায়। আবার ব্রহ্মসাধনায় যাঁহারা হৃদয়ের ভাবরসে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে অভ্যস্ত হন, তাঁহারা ঈশ্বরকে দেবতার আসনে বসাইয়া মানবীয় গুণাগুণ তাহাতে আরোপ করিয়া অত্যন্ত স্থূল পূজায় প্রবৃত্ত হন।

ঈশ্বরকে আমরা যে দেবতার কোঠায় টানিয়া আনি, তাহার কারণ আমাদের হৃদয়ের রসভোগের একটি লোভ আছে,[২] এই রসভোগের অভ্যাসটি ক্রমে একটি নেশার মতো হইয়া দাঁড়ায়। রসোদ্রেক করিবার জন্য নিয়মিত বক্তৃতা পাঠ কীর্তন প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়, "ভগবৎরস নিয়মিত জোগান দেবার নানা দোকান তৈরি হয়ে ওঠে। এই রকম ভাবের পাওয়াকেই পাওয়া ব'লে ভুল করা মানুষের দুর্বলতার একটা লক্ষণ।... দুর্বল ক্ষীণ চিত্তের পক্ষে ভাবের খাদ্য কুপথ্য।" এই সকল পূজা, উপাসনার দ্বারা লোকে মনে ভাবে একটা কিছু লাভ হইল কিন্তু ধর্মসাধনার আসন প্রতিষ্ঠা হইতেছে শুদ্ধতায়, শান্ত ভাবনায়— অশ্রুপূর্ণ ভাবের আবেগে নহে।

এই কারণে যাহারা নিজের সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তিকে ভাবাবেগের উচ্ছ্বাসে ও উন্মাদনায় নিঃশেষিত করে, তাহাদিগকে আমরা যথার্থ প্রেমিক সংজ্ঞা দিতে পারি নে। এই ভাবাবেগ যাহাতে কূলপ্লাবী না হয়, তজ্জন্য একদল সাধক নির্জন গুহাশ্রয়ী হইতে চাহেন। কিন্তু সকলের পক্ষে নির্জনতার জন্য পর্বতগুহায় যাওয়া সম্ভব নহে; তা ছাড়া 'মানুষকে ত্যাগ' করিয়া 'যাওয়া তো মানুষের ধর্ম নহে'। সুতরাং সজনেই নির্জনতা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে এবং সে-নির্জনতা অন্তরেই প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। যাহার অন্তরে শান্তি নাই, শুদ্ধতা নাই, সে বিজনে গিয়াও দেখিবে তাহার চিত্ত কোলাহলে পূর্ণ। সুতরাং বাহিরের সংস্রব পরিহার করাই তাহার প্রতিকার নহে। ইহার যথার্থ প্রতিকার হইতেছে ভিতরের দিকেও আপনার প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া অন্তরে-বাহিরে নিজের সামঞ্জস্য স্থাপন করা।[৩] তাহা হইলেই কবির মতে জীবন সহজেই নিজেকে উন্মত্ত অপব্যয় হইতে রক্ষা করিতে পারিবে। 'নিভৃত চিত্তের মধ্যে নির্জন অবকাশে' ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার অভ্যাস হইতেছে ধর্মসাধনার একটি প্রধান অঙ্গ। অন্তর ও বাহিরের বিভাগটি সুনির্দিষ্ট রকম না হইলে উভয়ের মধ্যে ঐক্যটিও ভালো রকম হয় না। বাহিরের বা সংসারের জিনিস যাহাতে বাহিরেই থাকিতে পারে ও অন্তরে গিয়া যাহাতে সে বিকারের সৃষ্টি না করিতে পারে সেদিকে সাধকের তীব্র দৃষ্টির প্রয়োজন।

১ দুই। ৪ মাঘ ১৩১৫ কলিকাতা। শান্তিনিকেতন ৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ৩০৬-৩০৮।

২ ভাবুকতা ও পবিত্রতা। ২ ফাল্গুন ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ৩২২-৩২৪।

৩ অন্তর বাহির। ৩ ফাল্গুন ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ৩২৩-৩২৬।

সর্বজগৎ ব্রহ্মময়, এ কথা ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের মূলকথা। "এই বিশ্ব সংসারে এমন কিছু নেই, একটি কণাও নেই যার মধ্যে পরমাত্মা ওতপ্রোত হয়ে না রয়েছেন"[১] এই অদ্বৈত ধারণা রবীন্দ্রনাথের ধর্ম সংস্কারের মূলে। ব্রহ্ম সর্বগ হইয়া সবার অতীত; অথচ যে সংসার তাঁহার দ্বারা বিধৃত সেখানে সৃষ্টি ব্যাপার নিয়ত চলমান। "সৃষ্টি ব্যাপার চলছেই। যা ব্যাপ্ত তা সংহত হচ্ছে, যা সংহত তা ব্যাপ্ত হচ্ছে। আঘাত হতে প্রতিঘাত, রূপ হতে রূপান্তর চলেইছে— এক মুহূর্ত তার কোথাও বিরাম নেই। সকল জিনিসই পরিণতির পথে চলেছে কিন্তু কোনো জিনিসেরই পরিসমাপ্তি নেই।"[২] এখন প্রশ্ন উঠে জীব কি লক্ষ্যহীন অনন্তপথেই চলিবে? "…অবিশ্রাম চলা,…অনন্ত সন্ধান? ইহার মধ্যে কোথাও কোনোরকম প্রাপ্তির কোনোরকম স্থিতির তত্ত্ব নাই?"

অনন্তকাল গতি সরল রেখায় চলে না, সত্যে বা বিজ্ঞানে দেখা গেল। "অন্ধকারকে টেনে চলতে গেলে ধীরে ধীরে বেঁকে বেঁকে একজায়গায় সে আলোয় গোল হয়ে ওঠে।"[৩] ইহার একটি মাত্র কারণ অনন্তের মধ্যে বিরুদ্ধতার পক্ষপাত নাই, অবসরও নাই। অখণ্ড আকাশ-গোলকের মধ্যে পূর্বদিকের পূর্বত্ব নাই, পশ্চিমের পশ্চিমত্ব নাই, পূর্ব-পশ্চিমের মাঝখানে বিরোধ নাই, বিচ্ছেদও নাই। পূর্ব-পশ্চিমের বিশেষত্ব খণ্ড-আমির বিশেষত্বকে আশ্রয় করিয়া আছে।

এই সমাপ্তিহীন গতিকে মানুষ অনন্ত উন্নতি বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিয়াছে। তাই কবির প্রশ্ন – "যাঁকে কোনোকালেই পাব না তাঁকে অনন্তকাল খোঁজার মতো বিড়ম্বনা আর কী আছে?"[৪] সংসারের মধ্যে পাওয়ার তত্ত্ব নাই, সংসারের তত্ত্ব হইতেছে সরিয়া যাওয়া; পাওয়ার তত্ত্ব কেবল একমাত্র ব্রহ্মেই আছে। এবং সেই ব্রহ্ম কোনো একটি অনির্দেশ্য অনন্তের মধ্যে পরিপূর্ণ হইয়া আছেন তাহা যথার্থ উপলব্ধি হইতে কথিত বাণী নহে; তিনি সর্বময়, বৃহৎ ও অনন্ত; তাঁহার সম্বন্ধে ক্রমাভিব্যক্তির (creative evolution) কথা উঠিতে পারে না।

মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন বা ধর্মসাধনার বাধা অসংখ্য; তবে দুইটি বাধাই বড়ো। প্রধান ও প্রথম হইতেছে প্রত্যয়ের বাধা বা বিশ্বাসের অভাব। বিশ্বাস, কবির মতে, একটি নিশ্চিত আধার; উহা সমস্ত চিত্তের একটি অবস্থা, একটি অবিচলিত ভরসার ভাব। বিশ্বাস জ্ঞানের সামগ্রী নয় তবু তো মন ইহাতে ধ্রুব হইয়া অবস্থিতি করে।[৫] এই বিশ্বাসকে কৃত্রিমভাবে উত্তেজিত করিবার জন্য মানুষকে পুণ্যের জন্য ধর্মসাধনায় প্রবৃত্ত হইবার উপদেশ দেওয়া হয়। বিশুদ্ধ ধর্মের দিক হইতে উহাকে সদুপদেশ বলা যাইবে না।

সাধনার দ্বিতীয় বড়ো বাধা হইতেছে সাধনার অনভ্যাস। বিশ্বাস বা প্রত্যয়ে সাধকের চিত্ত স্থির হয়, কিন্তু সাধনার চেষ্টায় বা অভ্যাসে উহা গতিলাভ করে।[৬] ব্রহ্মসাধনার পথে সাধকের একমাত্র সম্বল হইতেছে নিষ্ঠা। নিষ্ঠা যে কেবল সাধনার শুষ্ক কঠিন পথের উপর দিয়া সাধককে চালনা করিয়া লয় তাহা নয়, সে সাধককে কেবলই সতর্ক করিয়া দেয়, শৈথিল্য ও অমনোযোগ যেন তাহার পথরোধ না করে।[৭] 'সাধনার দিনে নিষ্ঠার এই নিত্য সতর্কতার স্পর্শই আমাদের সকলের চেয়ে প্রধান আনন্দ'।[৮]

১ দ্রষ্টা। ৬ ফাল্গুন ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ৩৩২-৩৩৩।

২ পরিণয়। ৯ ফাল্গুন ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ৩৩৪-৩৩৭।

৩ নির্বিশেষ। ৩ মাঘ ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ৩০৩-৩০৬।

৪ পরিণয়। শান্তিনিকেতন ৫।

৫ দ্র শান্তিনিকেতন ২য় সং পৃ ৩৮৪। বিশ্বাস। ১৬ ফাল্গুন ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৬। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ৩৫৩-৩৫৫।

৬ সংহরণ। ১৬ ফাল্গুন ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৬। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ৩৫৫-৩৫৬।

৭ নিষ্ঠা। ১৭ ফাল্গুন ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৬। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ৩৫৭-৩৫৮।

৮ নিষ্ঠার কাজ। ১৭ ফাল্গুন ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৬। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ৩৫৮-৩৬০।

ধর্মসাধনার লক্ষণ ও লক্ষ্য কী? এতদ্‌সম্বন্ধে কবি ফলের উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন। উহা পাঠ করিয়া আমাদের একটি বাউলের গান স্মরণ হইতেছে—'ভিতরে রস না জমিলে, বাহিরে কি গো রং ধরে?' এই গানের সহজ পদটির মধ্যে অনেক কথা বলা হইয়াছে। সাধকের লক্ষণ প্রকাশ পায় এইভাবেই তাহার বাক্যে, তাহার ব্যবহারে। তাহার কঠিন হৃদয় কোমল হয়, চারিত্রিক তীব্রতা মাধুর্যে পরিণত হয়। "সকলের কাছে সে কোমল সুন্দর হয়ে ওঠে",[১] "যেখানে তার শ্রী প্রকাশ পায়। এই শ্রী জিনিসটি রসের জিনিস। কঠিন ধর্মসাধনার অন্তরালে থাকে।"[২] এই অবস্থায় তাহার অহংজ্ঞান লোপ পায়। সাধকের বহির্জগতের আকর্ষণ আসে শিথিল হইয়া, আর তাহার লাভটা হয় ভিতরে এবং দানটা হয় বাহিরে।

সাধনার লক্ষণ যদি ঠিক হইল, তবে তাহার লক্ষ্য কী এই প্রশ্ন স্বভাবতই মনে উঠিবে। ইহার উত্তরে সাধক বলিবেন আত্মার সহিত পরমাত্মার যোগসাধনই চরম উদ্দেশ্য। এই যোগসাধনের সহায়ও অহং, শত্রুও অহং। মিলনের পথে আছে আমার 'আমি' বোধ, আমার অহং জ্ঞান। আবার মিলনের পথও হইতেছে এই অহং সত্তা। সাধনার জীবনে অহং একেবারে নিষ্ফল নহে। অহং শক্তির দ্বারা আপনার মধ্যে বিশ্বের উপকরণ সংগ্রহ করে; সেই বিবিধ উপকরণকে সে বিশেষ ভাবে সাজাইয়া সমস্তকে একটি বিশেষত্ব দান করে। "এই বিশেষত্ব দানের দ্বারা সে যা-কিছু গড়ে তোলে তাকে সে নিজের জিনিস বলেই গৌরব বোধ করে।... এই গৌরবটুকু যদি সে বোধ না করবে তবে সে দান করবে কী করে? যদি কিছুই তার 'আমার' না থাকে তবে সে দেবে কী?"[৩] এইজন্যই অহং-এর প্রয়োজন।

তবে অহং-এর এই উপকরণ সঞ্চয়ধর্ম যদি উদগ্র হইয়া উঠে, তবে আত্মার ত্যাগের ধর্ম আচ্ছন্ন হইয়া যায়। তখন আত্মাকে দেখা যায় না, অহংটাই সর্বত্র ভয়ংকর হইয়া প্রকাশ পায়। তখন বুঝিতে পারি অহং-এর সঞ্চয়ধর্ম বা গ্রহণলিপ্সা ত্যাগের উপলক্ষ্যমাত্র, অহংটা কেবল অহংকারকে বিসর্জন দিবার জন্য।

রবীন্দ্রনাথ অহং ও আত্মার বিশ্লেষণ করিয়াছেন কিন্তু আত্মা বলিতে ঠিক কী বুঝা যায় তাহা তিনি দার্শনিক ভাবে কোথাও স্পষ্ট করেন নাই। তবে এ কথা বলিয়াছেন যে, আত্মা অমর ও অহং মরণধর্মী; "অহংই আত্মার সীমা আত্মার রূপ। এই রূপের মধ্য দিয়েই আত্মার প্রবাহ, আত্মার প্রকাশ।"[৪] এই মরণধর্মী অহং ও অমর আত্মার মধ্যে একটি আপাত বৈপরীত্যের বিরোধ রহিয়াছে; কিন্তু এই বিরোধের মধ্যে যদি একটি সামঞ্জস্য স্থাপিত না হয়, তবে অহং আত্মাকে প্রকাশ না করিয়া আচ্ছন্ন করিত। এই সীমায় অসীমের বৈপরীত্য আছে বলিয়া অসীমের প্রকাশ সম্ভব হইযাছে; বিরোধের মিলন ছাড়া প্রকাশ হইতে পারে না। জীবাত্মার পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইবার সাধনাই হইতেছে ধর্মের প্রথম ও শেষ জিজ্ঞাসা।

ধর্মসাধনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইতেছে ঈশ্বরকে পাওয়া। এই 'পাওয়া'[৫] কথাটি ধর্মসাধনার নানা স্তরের লোকের কাছে নানাভাবে প্রকাশ পায়। কিন্তু "ব্রহ্মকে পেতে হবে এ কথাটা বলা ঠিক চলে না— আপনাকে দিতে হবে বলতে হবে।"[৬] রবীন্দ্রনাথের কাছে পাওয়ার অর্থ— আপনাকে "দিনে দিনে ভক্তি দ্বারা ক্ষমা দ্বারা সন্তোষের দ্বারা

১ ফল। ২০ ফাল্গুন ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৬। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ৩৬৭-৬৯।

২ দ্র. শান্তিনিকেতন ২য় সং পৃ ৩৮৭।

৩ অহং। ৬ চৈত্র ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ৩৭৭-৩৮০।

৪ নদী ও কূল। ৭ চৈত্র ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ৩৮০-৩৮২।

৫ অখণ্ড পাওয়া। ১৭ চৈত্র ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৮। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ৪০৮-৪০৯।

৬ আত্মসমর্পণ। ১৮ চৈত্র ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৮। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ৪১০-৪১১।

সেবার দ্বারা তাঁর মধ্যে নিজেকে মঙ্গলে ও প্রেমে বাধাহীনরূপে ব্যাপ্ত করে দেওয়াই তাঁর উপাসনা। নিজেকে একেবারে হারাবার জন্য··· শর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রবেশ করে তন্ময় হয়ে যায় তেমনি করে তাঁর মধ্যে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে হবে।"

তবে তন্ময় হওয়াই ব্রহ্মপ্রাপ্তির চরমতা নহে; 'ব্রহ্মবিহার' হইতেছে সমস্ত জীবনের চরম কাম্য। এই সমস্ত জীবন বলিতে কবি তাঁহার সমগ্র ব্যক্তিত্বকে বুঝিতেন, তাহা কোনো বিষয়ে কোনো অংশে খণ্ডিত নহে তাহা জীবনশিল্পীর পরিপূর্ণতার আদর্শ।

ভগবান বুদ্ধদেব বলিয়াছেন যে, আত্মার এই বিশুদ্ধ স্বরূপটি শূন্যতা নহে, নৈষ্কর্ম্য নহে— তাহা হইতেছে মৈত্রী, করুণা, প্রেম। আর অপরিমিত মানসে প্রীতিভাবে মৈত্রীভাবে বিশ্বলোককে ভাবিত করিয়া তোলাকে বুদ্ধের ভাষায় ব্রহ্মবিহার কহে। তিনি আরও বলিয়াছেন, "অপরিমিত মানসে অপরিমিত মৈত্রীকে সর্বত্র প্রসারিত করে দিলে ব্রহ্মের বিহারক্ষেত্রে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন হয়।"[১]

যীশুখৃষ্ট ঈশ্বর সম্বন্ধে বলিলেন, পিতা যেমন সম্পূর্ণ, পুত্র তেমনই সম্পূর্ণ হইতে নিয়ত চেষ্টা না করিলে পিতাপুত্রে সত্যযোগ হইতে পারে না।[২] অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মার গুণধর্মী না হইলে যোগ সম্পূর্ণ হয় না। এই সম্পূর্ণতার লক্ষণ সম্বন্ধে তিনিও বুদ্ধের ন্যায় বলিলেন প্রেমই ঈশ্বর: তোমার প্রতিবেশীকে তোমার মত ভালোবাসো। শত্রুকে কেবলমাত্র ক্ষমা নহে, শত্রুকে ভালোবাসো— এই তাঁহার উপদেশ। মহাপুরুষরা আমাদের কাছে মহৎ লক্ষ্য স্থাপিত করিয়া আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা দুর্বলের জন্য আংশিক সত্যকে অনুবর্তনের উপদেশ দেন নাই।

বুদ্ধদেব ব্রহ্মবিহার ও ভগবান যীশু পিতার সমতুল্যতালাভের জন্য মানুষকে উপদেশ দান করেন, ইহাকে কবি কোনো মতেই সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মনে করিতে পারিতেছেন না, কী যেন স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই।[৩] বুদ্ধদেব ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব থাকিয়া মানুষকে তাহার আশু দুঃখ নিবারণের জন্য বলিলেন; দুঃখনিবৃত্তিকেই পরম লক্ষ্য বলিয়া উহা হইতে মুক্তিপথে আহ্বান করিলেন; কিন্তু মানুষ কি এই দুঃখনিবৃত্তিকেই অধ্যাত্মজীবনের পরম লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারে? মানুষ যে কারণে, অকারণে, স্বেচ্ছায়, সানন্দে দুঃখকে বরণ করিতেছে— সে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ইহার কারণ দুঃখ সম্বন্ধে মানুষের একটি স্পর্ধা আছে; তাহার সকলের চেয়ে সত্য-ইচ্ছা হইতেছে বড় হইবার, মহৎ হইবার ইচ্ছা— সুখী হইবার ইচ্ছা নহে— দুঃখকে এড়াইবার চেষ্টা নহে। সে দুঃখনিবৃত্তি হইতেও মহত্তর কিছুকে চায়। মানুষ চায় ভূমাকে, কারণ ভূমৈব সুখং। "যিনি ব্রহ্ম যিনি ভূমা যিনি সকলের বড়ো তাঁকেই মানুষের সামনে লক্ষ্যরূপে স্থাপন করলে মানুষের মন তাতে সায় দিতে পারে, দুঃখনিবৃত্তিকে নয়। যিনি উদ্দেশ্য তাঁকে যদি গোড়া থেকেই সাধনার পথে কিছু-না-কিছু পাই তা হলে এই দীর্ঘ অরাজকতার অবকাশে সাধনাটাই সিদ্ধির স্থান অধিকার করে, শুচিতাটাই প্রাপ্তি বলে মনে হয়, অনুষ্ঠানটিই দেবতা হয়ে ওঠে; পদে পদে সকল বিষয়েই মানুষের এই বিপদ দেখা গেছে।"[৪]

আমরা এই আলোচনার প্রারম্ভে বলিয়াছিলাম যে, রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন উপদেশমালায় যে ব্রাহ্মধর্মকে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা সনাতনী মত হইতে সামান্য পৃথক। তাঁহার ধর্মতত্ত্ব যুক্তি ও অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহা হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করা যায়, অথবা যাহা যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ হয় তাহা যদি প্রাচীন শাস্ত্রের সমর্থন লাভ করে তবেই

১ ব্রহ্মবিহার। ১১ চৈত্র ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ৩৮৯-৩৪।

২ পূর্ণতা। ১২ চৈত্র ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ৩৯৫-৩৯৭।

৩ যীশুর শিক্ষা। ১৩ চৈত্র ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ৩৯৭-৩৯৯।

৪ ভূমা। ১৪ চৈত্র ১৩১৫। শান্তিনিকেতন ৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ৩৯৯-৪০২।

তাহা গ্রহণযোগ্য হইয়াছে; শাস্ত্রে আছে বলিয়া কোনো মতকে গ্রহণ করা তাঁহার ধর্মবোধের পক্ষে অসম্ভব। অনুভূতি, যুক্তি ও প্রাচীন ঋষিদের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যকেই তিনি উপদেশমালায় ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেও তাঁহার আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ক্রমেই তাঁহাকে গণ্ডির বাহিরে টানিয়া আনিতেছিল। এইবারকার (১৩১৫) মাঘোৎসবের ভাষণে তিনি উহাকে ব্রাহ্মোৎসব বলিতে নারাজ— উহাকে তিনি ব্রহ্মোৎসব আখ্যা দান করিলেন। এই উৎসব কোনো সম্প্রদায়ের নহে উহা মানবসমাজের উৎসব বলিয়া অনুভব করিতেছেন। জীবনে যথার্থ আধ্যাত্মিক আকুতি আসিলে, তাহা কখনো কোনো বিশেষ ধর্মের মধ্যে সীমায়িত থাকিতে পারে না; তখন সম্প্রদায়ের মতবাদ হইতে শাশ্বত ধর্মের সত্য বড় হইয়া উঠে। আজ কবির মনে ধর্মসমন্বয় ও জাতিসমন্বয়ের কথা জাগিতেছে।[১] তিনি অনুভব করিতেছেন জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের, সমাজের সঙ্গে সমাজের, ধর্মের সঙ্গে ধর্ম এক পরমতীর্থে এক সাগরসংগমে মিলিত হইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনার অন্তে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিতে হইবে— সেটি হইতেছে ধর্মদেশনায় তাঁহার অধিকার। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের সন্দেহ ছিল এবং আজও সকলের সে বিষয়ে দৃষ্টি সংস্কারমুক্ত হয় নাই। আপত্তিকারীদের অভিযোগ এই যে, রবীন্দ্রনাথ ধনীর পুত্র, কবি, ভাববিলাসী আর্টিস্ট— ধর্মসম্বন্ধে তিনি কোনো গুরু-উপদেশ গ্রহণ করেন নাই, ধর্মসম্বন্ধে তাঁহার ভাষণ ভারতীয় কোনো দার্শনিক মতবাদ সমন্বিত নহে। সেইজন্য তাঁহার ধর্মবিষয়ক রচনাদি বস্তুতন্ত্রহীন। ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ বা কবি হওয়াটা কাহারো নিজ ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না; সুতরাং সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলাই যায় না। তবে তিনি ভাববিলাসী ছিলেন কি না সেসম্বন্ধেও মতভেদ হইবে, কারণ বিশ্বভারতী ভাববিলাসে সৃষ্ট হয় নাই এবং জমিদারী পরিচালনা ভাবুকতার দ্বারা সম্ভব না। কবিরা যে কখনো নিজেদের আদর্শকে কর্মে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ইহার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাই নাই। বোধহয় তাহার একমাত্র ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ। সমগ্র জীবনের যে একটি পরিপূর্ণতার আদর্শ তাঁহার অন্তরে ছিল তাহাই তাঁহার ধর্ম। সে ধর্ম ভাবাত্মক মতবাদ, শৌখিন ভাববিলাস নহে। কবির ধর্মমত কঠিন আত্মশাসনের ও সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত। তথাচ উহা সর্বজনসাধনোপযোগী। কবির ধর্ম নিখিল জ্ঞানের সমন্বয়, জীবনের আপাতবিরুদ্ধ অর্থহীনতা ওবৈপরীত্যের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন, মানুষের সকল বৃত্তি সুসংগতভাবে সুপুষ্ট হইবার সুযোগ দান। মানুষের ইন্দ্রিয় মন ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ হইতেছে এই ধর্মজীবনের আদর্শ। কোনো ইন্দ্রিয়কে কৃশ করা নহে, মনকে উপবাসী করা নহে, আত্মাকে শূন্যতার মধ্যে নিক্ষেপ করা নহে— এই হইতেছে নবযুগের ধর্মবোধ।

রবীন্দ্রনাথ কবি বলিয়া তাঁহাকে যাঁহারা ধর্মের কথা বলিবার অধিকারচ্যুত করিতে চাহেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান জগতের অধিকাংশ ভাবদ্রষ্টাই কবি। আমাদের দেশের অধিকাংশ ধর্মসাধকই কবি: বৈদিক ঋষিরা কবি, উপনিষদের দ্রষ্টারা কবি, পুরাণকাররা কবি। মধ্যযুগের কবীর, নানক, দাদূ, রবিদাস, তুলসীদাস, তুকারাম প্রভৃতি সকলেই কবি ও সাধক। বাংলার শক্তিসাধকদের অনেকেই কবি। বাংলার বিরাট বৈষ্ণবপদাবলী সাধক কবিদেরই অন্তরের বাণী। ইহুদী প্রফেটগণ কবি, বাইবেলের মধ্যে অনেক কবিতা আছে তাহা সাধারণের অনেকেই জানেন না; অস্কার ওয়াইল্ড যীশুখৃষ্টকে কেন যে Prince of poets বলিয়াছিলেন, তাহা ভাবিবার বিষয়। এইসব মহাপুরুষ ও দ্রষ্টারা যেসব বাণী প্রচার করিয়াছিলেন তাহা গুণপরম্পরার পুনরুক্তি হইলে আজ কেহই তাহা স্তব্ধ হইয়া শুনিত না। তাঁহারা অতীতের সহিত যুক্ত থাকিয়া যে বাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন তাহা গঙ্গোত্রীর জলনির্ঝর নহে, তাহা সাগরসংগমের বারিরাশির ন্যায় বিশাল, গভীর ও স্তব্ধ।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ এ-দেশের ও জগতের ভক্তদের ধারায় বহন করিয়া কবির ধর্মই পালন করিয়াছেন; তাঁহার গুরু

১ নবযুগের উৎসব। [১১ মাঘ ১৩১৫] শান্তিনিকেতন ৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ৩১৩-২১।

এই কবিসাধকদের দল, তাঁহার সাধনা সহজের উপাসনা। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই' এই হইতেছে যুগযুগের বাণী। রবীন্দ্রনাথ এই কথাই অন্যভাবে বলিলেন— তাঁহার 'মানুষের ধর্মে'— কোঁৎ (Comte) প্রমুখ পজিটিভিস্টদের মানবপ্রীতি বা মানবতা নহে— কবির ধর্ম একাধারে বাস্তবের উপর ও ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত; উহা স্পষ্ট, ভাবাত্মক, পরিপূর্ণ মানবতার ধর্ম— উহা কর্মে কঠোর, জ্ঞানে উজ্জ্বল, ভক্তিতে রসাপ্লুত, সৌন্দর্যে সমন্বিত।

গীতাঞ্জলির সূত্রপাত

১৩১৫ সালের শেষ পাঁচমাস শান্তিনিকেতনে কবির কিভাবে কাটে, তাহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। বিদ্যালয়ের নানাকাজের মাঝে 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালা ও 'গোরা' উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। কিন্তু বৎসরের শেষ দিকে নিয়মিত উপদেশ দান সম্বন্ধে কবির ক্লান্তি ও সংশয় আসিয়াছে। ধর্মোপদেশও যে একটা অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া যাইতেছে এবং শ্রোতাদের উপর তাহার ফল যে সর্বতোভাবে কল্যাণকর নহে, তাহা তীক্ষ্ণধী কবি বুঝিতে পারিতেছেন। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কবি ও জীবনশিল্পীর পক্ষে একই অবস্থা— তাহা যতই মনোরম, যতই মহান্ হউক— তাহার মধ্যে দীর্ঘকাল লিপ্ত থাকা সম্ভব নহে, সেইজন্য শান্তিনিকেতন হইতে কোথাও দূরে যাইবার জন্য, আপনার জাল হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য অন্তরে একান্ত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে।

ইতিমধ্যে জ্যেষ্ঠ জামাতা শরৎচন্দ্র বিলাত হইতে ব্যারিস্টার হইয়া আসিলেন।[১] তিনি ছিলেন এম.এ. বি.এল উকিল, মজঃফরপুরে থাকিতেন। তিনি এইবার ঈস্টারের ছুটির পর জোড়াসাঁকোর বাটীতে থাকিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি করিবেন। শরৎচন্দ্র ব্যারিস্টারিতে প্রতিষ্ঠিত হইলে রবীন্দ্রনাথ মনে ভাবিতেছেন তাঁহার 'সংসারের একটা চিন্তা অবসান হইবে'।[২] কবি শান্তিনিকেতনে বর্ষশেষ ও নববর্ষের[৩] (১৩১৬) উৎসব সম্পন্ন করিয়া কয়েকদিনের মধ্যেই কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। শান্তিনিকেতনে গত চারিমাস যে উপদেশ দিতেছিলেন তাহার শেষ ভাষণ প্রদত্ত হয় ৭ই বৈশাখ (১৩১৬)— প্রাত্যহিক উপাসনা এইখানেই শেষ।

কলিকাতায় গিয়া শরৎচন্দ্র ও বেলাকে জোড়াসাঁকোর বাটীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া কবি মীরাকে লইয়া কালকা রওনা হইলেন। কালকায় কবির কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর উপেন্দ্রনাথ[৪] কেলনার কোম্পানীর

১ ১৯০৯ সালে ২৬ জানুয়ারি শরৎচন্দ্র Hilary Term 1909 (Grays' Inn) শেষ করেন। ১৯০৯, ২ এপ্রিল কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি আরম্ভ করেন। এই তথ্যটি স্যর্ সি. সি. ঘোষের পুত্র ব্যারিস্টার রবীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় লেখককে পত্রযোগে (১২.৩.৬০) জানাইয়াছেন।

২ ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে পত্র— দেশ শারদীয়া সংখ্যা ১৩৪৯। পত্র ৭৪। ২৮ চৈত্র ১৩১৫।

৩ ১৩১৬ সালের নববর্ষের দিন (১৯০৯ এপ্রিল) এই জীবনীলেখক বালকবয়সে সর্বপ্রথম শান্তিনিকেতন দেখিতে আসেন। তখন গিরিধির হিমাংশুপ্রকাশ রায় ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অন্যতম শিক্ষক। তিনি তাঁহারই অতিথি হন ও লাইব্রেরীর উপরতলায় যে প্রকাণ্ড চালা ঘর ছিল, সেইখানে রাত্রিযাপন করেন। লাইব্রেরি ছিল বর্তমান লাইব্রেরির বারান্দায়, সেটি তখন ঘর। লাইব্রেরির পশ্চিমদিকের ঘরে বিধুশেখর শাস্ত্রী থাকিতেন তাঁহার ছোট ভাইপোকে লইয়া। চার-পাঁচ শেল্‌ফ সংস্কৃত পালি বই থাকিত সেই ঘরে। মাঝের ঘরে ছিল ল্যাবরেটারি। পূর্বের ঘরে দিনেন্দ্রনাথ গান শিখাইতেন। তখন হলঘর, নাট্যঘর ও লাইব্রেরির পিছনে একটা খড়ের বড় ঘর (সাধারণত চাকরদের ঘর বলা হইত, কারণ এক সময়ে চাকররা সেখানে থাকিত) ছিল ছাত্রাবাস। ছাত্রসংখ্যা ছিল ১০০র উপর, সবই স্কুলের ছাত্র। কবির সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎ হয়, সামান্য বালক বলিয়া কবি তাঁহাকে তখন উপেক্ষা করেন নাই।

৪ উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি নববিধান সমাজের ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের কন্যাকে বিবাহ করেন। ইঁহাদের এক কন্যা অরুণা আসফ আলি। উপেন্দ্রনাথ ও তাঁহার স্ত্রী উভয়েই মৃত।

বড় চাকুরে; কালকা বাসকালে[1] কবির 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকখানি বোধ হয় মুদ্রিত হয়। বইখানির ভূমিকা লেখা হয় ৩১শে বৈশাখ ১৩১৬ (১৯০৯ মে ১৪)।

কালকা হইতে ফিরিয়া কবি শান্তিনিকেতন অট্টালিকার দ্বিতলে আছেন। গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিয়াছে, এবার ছাত্রের বেশ ভিড়। এতদিন ছাত্রবেতন ছিল মাসিক ১৫৲— এই সময়ে করা হইল ১৮৲। এই টাকার মধ্যে অধ্যাপন, আহার, টিফিন, চিকিৎসা, ধোপা নাপিত প্রভৃতির সমস্ত ব্যবস্থা হইত; কবির ভাবনা "১৮ টাকা বেতন অভিভাবকদের পক্ষে কিছু কঠিন তবু তৎসত্ত্বে এতেও আমাদের টানাটানি হয়। ছেলে যত বাড়চে, মাস্টারও বাড়চে, সুতরাং খরচও বাড়চে। কবে একে নিজের শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব জানি নে।"[2]

সে সময়ে শিক্ষকদের বেতন ছিল কম সত্য, কিন্তু তাঁহারা সুযোগসুবিধা পাইতেন বিস্তর। তখন আশ্রমে পরিবার লইয়া থাকিবার উপযোগী বাড়ি ছিল না; শিক্ষকদের সকলেই ছাত্রাবাসে বাস করিতেন। তাঁহাদের পুত্র ভাই ভাইপো ভাগ্নেযদের মধ্যে যাঁহারা ছাত্রাবাসের ছাত্র ছিল, আশ্রম হইতেই তাহারা খাওয়া-দাওয়া পাইতেন। ধোপানাপিত, আলোবাতি, ঔষধপথ্য সমস্তই বিনাপয়সায় তাহাদিগকে দেওয়া হইত। এইসব কারণে বিদ্যালয়ের ঘাটতি পড়িত। কিন্তু সে ঘাটতি সামান্যই। বিধুশেখর ভট্টাচার্য ১৩১৬ সালে অধ্যাপকমণ্ডলীর সম্পাদকরূপে সমসাময়িক প্রতিবেদনে লিখিতেছেন যে বিদ্যালয়ে প্রতি মাসে ৫০৲ টাকা ঘাটতি হইতেছে, বৎসরে ৬০০৲ ঘাটতি পড়িতে থাকিলে বিদ্যালয় কয়দিন চলিবে! পঞ্চাশ বৎসর পরে ঘাটতির পরিমাণ পঞ্চাশ গুণ হওয়া সত্ত্বেও বিদ্যালয় চলিতেছে।

গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিলে এবার কবি প্রাতঃকালীন উপদেশ আর দিতেছেন না। তবে বুধবারের মন্দির নিয়মিত করেন। এতকাল যেসব কথা উপদেশমালায় ব্যক্ত হইয়াছিল তাহা এখন ধীরে ধীরে ছন্দে ও সুরে আত্মপ্রকাশ করিতে শুরু করিল। এই আষাঢ় (১৩১৬) মাসে গীতাঞ্জলির গানের প্রথম ধারা নামিল।—

জগৎ জুড়ে উদাস সুরে (১৫)
মেঘের 'পরে মেঘ জমেছে (১৬)
কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো (১৭)
আজি শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে (১৮)
আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল (১৯)
আজি ঝড়ের রাতে (২০)

এমন সময়ে কাজের ছল করিয়া পদ্মাধারে নির্জনতার মধ্যে আশ্রয় লইবার জন্য কবি শিলাইদহে চলিলেন। শ্রাবণ মাসটা সেখানেই বোটে কাটিল। সেখানে আসিয়া জুটিলেন বোলপুর হইতে অজিতকুমার জ্বর সারাইবার উপলক্ষে এবং কলিকাতা হইতে একদিন প্রাতে জগদীশচন্দ্র বসু হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন (স্মৃতি পৃ ৩৪)। সুতরাং পদ্মাচরের নির্জনতার মধ্যেও জনসমাগমের অভাব হইল না।

এবার এখানে আসিয়া কবি অনন্যমনে 'গোরা' লিখিতেছেন, 'মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ের দিকে মন টানে', কিন্তু এবার পণ করিয়া আসিয়াছেন, 'গোরা' গল্পটা শেস করিবেন।[3] ইতিমধ্যে খবর পাইলেন যে রথীন্দ্রনাথ আমেরিকা হইতে য়ুরোপে আসিয়াছেন— এখন জার্মেনীতে ভ্রমণ করিতেছেন। রথীন্দ্রনাথের ফিরিবার পাথেয় তারযোগে পাঠাইয়া

১ ২৬ বৈশাখ ১৩১৬ কালকা হইতে কবি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে একখানি পত্র দেন। দ্র বঙ্গবাণী ১৩৩৪ বৈশাখ পৃ ২৩৯।

২ স্মৃতি পৃ ৩৪।

৩ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র। ২৪ শ্রাবণ ১৩১৬ [১৯০৯ অগস্ট] পত্রখানি কিঞ্চিৎ ছিন্ন; 'স্মৃতি'তে নাই।

আশা করিতেছেন যে 'দুই কিম্বা আড়াই সপ্তাহ পরেই' তিনি ফিরিবেন, স্নেহশীল পিতা পুত্রের জন্য দিন গণনা করিতেছেন।

ভাদ্র মাসের গোড়াতেই (৪ ভাদ্র ১৩১৬) কবি শিলাইদহের নির্জনবাস হইতে 'কলিকাতায় অহোরাত্র লোকজনের ভিড়ে'র মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। সেখান হইতে 'পালাইতে পারিলে' বাঁচেন। আসিলেই পাঁচরকম পাবলিক কাজ করিতেই হয়, তাহা ভালো লাগুক আর না লাগুক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ব্যবস্থায় কবিকে ছাত্রসভায় একটি বক্তৃতা[১] করিতে হয়; বক্তৃতায় নূতন কথা কিছু ছিল না; বহুবার ছাত্রদের যেকথা বলিয়াছিলেন, তাহাই সুন্দর ভাষায় নূতনভাবে বলিলেন। গত বৎসর ঠিক এই সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ছাত্রসভায় কবি 'পূর্ব ও পশ্চিম' শীর্ষক বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

কলিকাতা হইতে কয়েকদিনের মধ্যে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন— তখন তাঁহার মন গীতসুধারসে পূর্ণ। পুনরায় কলিকাতায় যাইবার পূর্বে সেখানে যে নয়টি দিন ছিল তাহার মধ্যে আঠারোটি গান রচনা করেন (গীতাঞ্জলি ২১-৩৮)।

ভাদ্র মাসের শেষ দিকে কবি পুনরায় কলিকাতায় আসিয়াছেন, রথীন্দ্রনাথ আমেরিকা হইতে ফিরিয়াছেন। পাঠকের স্মরণ আছে, রথীন্দ্রনাথ ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে জাপানের পথে আমেরিকায় যান; সেখানে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বৎসর পড়িয়া B. S. (Bachelor of Science) ডিগ্রী লাভ করেন। ফিরিবার সময় য়ুরোপ ঘুরিয়া আসিয়াছেন। বিদেশে রথীন্দ্রনাথ প্রায় সাড়ে তিন বৎসর ছিলেন; তখন তাঁহার বয়স ২১ বৎসর মাত্র।

রথীন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে নানারূপ সামাজিকতার উত্তেজনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের দিন কাটে। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিতেছেন, "দেদার বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছি; প্রাণ বেরিয়ে গেল। এখনি এক বক্তৃতা-অভিযানে চলেছি।"[২] তবুও ইহার মধ্যে দুইটি গান লেখেন। 'হেথা যে গান গাইতে আসা আমার' (২৭ ভাদ্র ১৩১৬); 'যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে' (১ আশ্বিন ১৩১৬)। কয়েকদিনের মধ্যে পিতাপুত্রে আশ্রমে ফিরিলেন, কিন্তু

১ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছাত্রসভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিভাষণ। বঙ্গদর্শন ৯ম বর্ষ ১৩১৬ পৌষ, পৃ ৪২৫-৩১।

২ রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি পত্র ও অপ্রকাশিত রচনা, প্রবাসী ১৩৪৮ কার্তিক পৃ ১১৭। পত্র ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯০৯। আমাদের আলোচ্যপর্বে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসঞ্চয়ন 'চয়নিকা' সম্পাদিত হইতেছে; কবির সহিত পরামর্শক্রমে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি এই সম্পাদনকার্য করিতেছেন। চয়নিকার সাতখানি ছবি ছিল; সেগুলি তরুণ চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত হয়; ছবিগুলির মধ্যে 'রুদ্র বৈশাখ' নন্দলাল কর্তৃক পূর্বে অঙ্কিত; অপরগুলি রবীন্দ্রনাথের কথামত আঁকা। অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালকে কবির সহিত পরিচিত করিয়া দেন। রবীন্দ্রনাথ নন্দলালকে কবিতা পড়িয়া শোনান— শিল্পী কবির ভাবে রূপদান করেন (১৯০৯)।

চয়নিকায় ১৩০টি কবিতাকে নিম্নলিখিত খণ্ডে শ্রেণীত করা হয়—কবিমানস, উতলা, রসরূপ, রূপক, বিশ্বপ্রকৃতি, মানব, কণিকা, অতীত, কথা, ভূমা, পরিণাম, গান (৪৫৯ পৃষ্ঠা)। নিম্নলিখিত কবিতার উপর নন্দলালের চিত্র ছিল—

ক কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া।
খ ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে (ভূমিকা)
গ যদি মরণ লভিতে চাও এস তবে ঝাঁপ দাও
ঘ খেপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর
ঙ হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ (রঙিন)
চ ভূমির পরে জানু পাতি তুলি ধনুঃশর:
ছ আমায় নিয়ে যাবি কে রে দিনশেষের শেষ খেয়ায়

বেশি দিন থাকা হইল না; নানা বিক্ষিপ্ততার মধ্যে কয়েকটি গান লিখিত হয়।[১]

আশ্বিনের শেষ দিকে কবি রথীন্দ্রনাথকে লইয়া শিলাইদহে চলিলেন, তাঁহার ইচ্ছা শিলাইদহে রথীন্দ্রনাথের 'কর্মের রথ···চালাতে হবে' (স্মৃতি পৃ ৭৭)। সেখানে পৌঁছিয়া কবিকে নানা বৈষয়িক কর্মের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইতেছে। এত ব্যস্ততার মধ্যে রাখিবন্ধনের দিনটির কথা কবির স্মরণ আছে। শান্তিনিকেতনে অজিতকুমারকে একটি রাখি-সংগীত পাঠাইয়া দিলেন— 'প্রভু আজি তোমার দক্ষিণ হাত' (২৭ আশ্বিন ১৩১৬। গীতাঞ্জলি ৪৩)। এই দিনের পূর্বে রচিত 'গায়ে আমার পুলক লাগে' (২৫ আশ্বিন) ও পরে রচিত 'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ' (৩০ আশ্বিন) গান দুইটি ও রাখিসংগীতবিষয়ক গানটির মধ্যে যে বাণী উদ্‌গীত হয়, তাহা সমসাময়িক পত্রমধ্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই তিনটি কবিতা রচনার পর প্রায় দুইমাস গীতশ্রী অন্তর্হিতা। কবি পুত্রকে লইয়া জমিদারী পরিদর্শনে ব্যস্ত।

অজিতকুমারকে রাখিসংগীত পাঠাইবার পূর্বে শান্তিনিকেতনে রাখি-উৎসব কিভাবে হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধে কবি একখানি দীর্ঘ পত্র[২] লেখেন। তিনি স্পষ্ট করিয়া লিখিলেন—"সাধারণত আমাদের দেশে যে-ভাবের উত্তেজনা প্রচলিত হয়েছে আমি সেই ভাবটিকে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের উপযোগী মনে করি নে— বস্তুত সে-ভাবটি ও-জায়গার পক্ষে অসংগত।···ছুটি পর্যন্ত আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব মনে ছিল। যদি থাকতুম তা হলে ৩০শে আশ্বিনের উৎসবকে আমি একটা বড়ো দিক থেকে সত্য দিক থেকে দেখবার ও দেখাবার বিশেষ চেষ্টা করতুম। আমি কোনো সংকীর্ণ-বিরোধের ভাব এবং তৎসংক্রান্ত চিত্তদাহকে প্রশ্রয় দিতুম না, আমার রাখিবন্ধনের মধ্যে কোনো সাময়িকতার ক্ষোভ ও খণ্ডতা থাকতে দিতুম না। যে-রাখিতে আত্মপর শত্রু-মিত্র স্বজাতি-বিজাতি সকলকেই বাঁধে সেই রাখিই শান্তিনিকেতনের রাখি। ঈশ্বর শান্তির বীজকে বিরোধের ভিতরেই নিহিত করেন, কিন্তু বিরোধকে ভেদ করে তাকে অতিক্রম করেই সে বড়ো হয়ে ওঠে— বিরোধের মাটির ভিতরেই যদি সে থেকে যায় তবে সে পচে মরে। আমাদের রাখিবন্ধনের বীজ বিরোধের ভিতর থেকে তাকে ভেদ করেই ছায়াময় বনস্পতি হয়ে উঠবে। বর্তমান ভারতবর্ষে যাদের সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক স্বার্থের প্রতিকূলতা আছে এ-রাখি তাদের কাছ থেকেও নিরস্ত হবে না। তারা যদি প্রত্যাখ্যান করে আমরা প্রত্যাখ্যান করব না। আমরা বারংবার সহস্রবার সকলকেই প্রীতির বন্ধনে ঐক্যের বন্ধনে বাঁধবার চেষ্টা করব— এইটেই আমাদের একটা দায়; বিধাতা এইটেই আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। পূর্ব-পশ্চিম, রাজাপ্রজা সকলকেই ভারতবর্ষ সকলপ্রকার বিরুদ্ধতার ভিতরেও এক্ষেত্রে আকর্ষণ করবার জন্য চিরদিন চেষ্টা করছে— এই তার ধর্ম, এই তার কাজ, অন্য দেশের পোলিটিকাল ইতিহাস থেকে এ-সম্বন্ধে আমি কোনো শিক্ষা নিতে প্রস্তুত নই— আমাদের ইতিহাস স্বতন্ত্র। আমাদের দেশে মনুষ্যত্বের একটি অতি উদার অতি বিরাট ইতিহাস সৃষ্টির আয়োজন চলছে এই আমার নিশ্চয় বিশ্বাস— যেমন ইংরেজ পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গকে সত্যই স্বতন্ত্র করে দেবার মালিক নয় তেমনি আমরাও রাখিবন্ধনের গণ্ডির দ্বারা ভারতবর্ষে কেবল আমাদের মনের মতো জাতিকেই গড়ব এবং অন্যকে বর্জন করব তা চলবে না। যারা আমাদের আঘাত করতেও এসেছে তাদেরও আমরা আত্মসাৎ করব, আমাদের উপর এই আদেশ আছে। এখনকার কালে এ কথা বললে কারো কাছে উপাদেয় বলে মনে হবে না—

১ রাত্রি এসে যেথায় মেশে (১৫ আশ্বিন ১৩১৬।] নিশীথে। (শান্তিনিকেতন)—গীতিমাল্যের প্রথম গান। এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে (১৯ আশ্বিন ১৩১৬ গীতাঞ্জলি ৪১নং)। ১৩১৬ সাল শান্তিনিকেতন মাত্র উল্লেখ করিয়া দুটি গান গীতিমাল্যর গোড়ায় পাওয়া যায়—'আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি (২); 'ওগো শেফালি-বনের মনের কামনা (৩)। অনুমান, এই সময়ে শরৎ কালেই গানে দুটি লিখিত হয়। এর গান কয়টি গীতাঞ্জলির মধ্যে কবি যে কেন দেন নাই তাহা বুঝিতে পারি না।

২ বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা। ১৩৪৯ অগ্রহায়ণ, পৃ ৩০০-৩০২।

অনেকে মনে করবেন এ একটা কাপুরুষতার লক্ষণ, কিন্তু তবু এই সত্য কথাটি বলা চাই। সত্যকে কোনো কারণেই কোনো জায়গাতেই সীমাবদ্ধ করা চলবে না।

"তোমাদের আশ্রমে তোমাদের রাখিবন্ধনের দিনকে খুব একটা বড়োদিন করে তুলো। বড়োদিন মানেই প্রেমের দিন, মিলনের দিন— যে প্রেমে যে মিলনে ভারতের সকলেই আহূত, ভারতবর্ষের যজ্ঞক্ষেত্রে আজ বিধাতা যাদের নিমন্ত্রণ করে এনেছেন আমরা তাদের কাউকেই শত্রু ব'লে দূরে ফেলতে পারব না। আমরা কষ্ট পেয়ে, দুঃখ পেয়ে, আঘাত পেয়ে সর্বস্ব হারিয়েও সকলকে বাঁধব সকলকে নিয়ে এক হব— এবং একের মধ্যে সকলকেই উপলব্ধি করব। বঙ্গ-বিভাগের বিরোধক্ষেত্রে এই যে রাখিবন্ধনের দিনের অভ্যুদয় হয়েছে এর অখণ্ড আলোক এখন এই ক্ষেত্রকে অতিক্রম ক'রে সমস্ত ভারতের মিলনের সুপ্রভাতরূপে পরিণত হোক। তা হলেই এই দিনটি ভারতের বড়োদিন হবে। তা হলেই এই বড়োদিনে বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদের মিলন হবে। এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। আমাদের আশ্রমেও যদি ভূমা স্থান না পান— সেখানেও যদি সাময়িক বারোয়ারির ক্ষণকাল-স্থায়ী মৃন্ময় দেবতার পূজার মত্ততাই সঞ্চারিত হয় তা হলে আশ্রমধর্ম পীড়িত হবে। আমাদের মধ্যে অনেকেই সাময়িক নেশায় ভোর হয়ে আছি— সেইজন্যে ৩০শে আশ্বিনের মতো দেশব্যাপী উন্মত্ততার দিনে নিত্য সত্যকে অবজ্ঞা করার আশঙ্কা আছে— সেইজন্যই আমি বারবার করে তোমাদের সতর্ক করতে চাই। যা শ্রেষ্ঠ, যা মহত্তম, যা সত্যতম তার থেকে লক্ষ্য কোনো কারণেই কোনোমতেই ফেরাতে দিয়ো না। যদি লোকের কর্ণ বধির হয় তবু সত্যের মন্ত্রই শোনাতে হবে— অন্তত আমাদের আশ্রমে বেসুর না বাজে, যিনি শান্তং শিবমদ্বৈতং তাঁকে যেন কোনোদিনই কোনো-মতেই আমরা না ভুলি— তাঁর চেয়ে আর-কাউকে আমরা যেন বড়ো করে না তুলি। সেদিন তোমরা ছেলেদের ডেকে ভারতবর্ষের সকলের বড়ো যে-বাণী তাই শুনিয়ে দিয়ো। সেদিন সংযম পালন যখন হচ্ছে তখন সেই সংযমের উপযোগী সাধনাও যেন অবলম্বন করা হয়— এই তোমাদের সকলের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ।"

সাময়িক রাজনীতির উত্তেজনা বা জাতিপ্রেমের উগ্রতা হইতে কবি চিরদিনই শান্তিনিকেতনকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; তিনি জানিতেন আশ্রম সকলের আশ্রয়স্থল, সেখানে রাজনীতি— যত বড় নামেই সে প্রবেশ করুক— যদি একবার প্রশ্রয় পায় তবে তথাকার অন্তরের শান্তি চিরকালের মত নষ্ট হইবে।

শিলাইদহ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া কার্তিক মাসটা তথায় থাকিয়া অগ্রহায়ণ মাসের গোড়ায় পুনরায় পিতাপুত্রে ভ্রমণে বাহির হইলেন। রথীন্দ্রনাথকে উত্তরবঙ্গের যে জমিদারি দেখিতে হইবে ইহা তাহারই ভূমিকা। রথীন্দ্রনাথ তাঁহার একখানি ডায়েরিতে লিখিতেছেন, "আমরা আট নয় দিন হল বোটে করে শিলাইদহ থেকে বেরিয়েছি। প্রথম দুইদিন গোয়ালন্দ হয়ে পদ্মা ও যমুনা বয়ে আসা গিয়েছিল; আবার বুঝি একটা সাইক্লোনের ভিতর পড়া যাবে। তার পর বড়াল নদী দিয়ে চলন বিলে এসে পড়ি। বড়াল নদীটা ভারি সুন্দর।"[১]

১৩ই অগ্রহায়ণ কবিকে কলিকাতায় ফিরিতে হইল, কারণ ১৫ই ওভারটুন হলে (YMCA, কলেজ স্ট্রীট) 'তপোবন'[২] নামে বিখ্যাত প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। নানা স্থানে ঘোরাঘুরিই করুন অথবা বিচিত্র কর্মের মধ্যে লিপ্ত থাকুন, রবীন্দ্রনাথ আপনার মনকে সমস্ত বিক্ষোভের ঊর্ধ্বে সংযত করিতে পারিতেন, তা না হইলে তপোবনের ন্যায় প্রবন্ধ লেখা অসম্ভব। তপোবন বক্তৃতার দুই দিন পরে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া যান (৩ ডিসেম্বর)।[৩]

১ পারিবারিক সংগৃহীত পত্রাদি হইতে উদ্ধৃত।

২ তপোবন, প্রবাসী ১৩১৬ পৌষ, পৃ ৬৭৮-৯২। দ্র শিক্ষা ১৩৫১ সং, পৃ ১৩১-৭২। শান্তিনিকেতন ৯, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ৪৫৭-৮০।

৩ জোড়াসাঁকো। ১৬ অগ্রহায়ণ ১৩১৬। "রথীকে নিয়ে আমি এতদিন জলপথে ঘুরছিলাম—দিন-তিনেক হল ফিরেছি, রথী শিলাইদহে আছে। আমি আবার কাল লুপ মেলে বোলপুর যাচ্ছি।"— স্মৃতি পৃ ৭৯।

বহুদিন ঝড়বৃষ্টির মধ্যে নদীতে ঘুরিয়া শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত আকাশের তলে আসিয়া কবির মন গাহিয়া উঠিল— 'আলোয় আলোকময় ক'রে হে এলে আলোর আলো' (২০ অগ্রহায়ণ ১৩১৬)। অতঃপর শান্তিনিকেতনের সাতই পৌষ উৎসব। সেদিন প্রাতে যে ভাষণ দান করেন[১] তাহাতে তপোবনের সুর শোনা যায়। সন্ধ্যার ভাষণ[২] ভগবৎভক্তির কথাই বড় হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। এই সময়ে কবি 'ভক্তবাণী' নামে তিন খণ্ড গ্রন্থ শান্তিনিকেতন-উপদেশমালার অনুরূপ করিয়া সম্পাদন করেন। মোটকথা কবির এই যুগের আন্তর জীবন একটি গভীর ভক্তিরসে স্নিগ্ধ দেখা যায়। সমসাময়িক গান কয়টিও তাহার প্রমাণ: ১. আসনতলের মাটির 'পরে (১০ পৌষ ১৩১৬)। ২. রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি (১২ পৌষ)। ৩. আকাশতলে উঠল ফুটে (পৌষ)। ৪. হেথায় তিনি কোল পেতেছেন (পৌষ)। ৫. নিভৃত প্রাণের দেবতা (১৭ পৌষ)। ৬. কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ (১৭ পৌষ)। নিভৃত প্রাণের দেবতা কবিতাটি শিল্পী নন্দলাল বসুর 'দীক্ষা' নামে চিত্র উপলক্ষ্য করিয়া রচিত।[৩]

এবার কলিকাতায় মাঘোৎসব উপলক্ষে কবি যে বক্তৃতা দেন তাহার নাম 'বিশ্ববোধ'[৪]। এই বিশ্ববোধ প্রবন্ধটি ইংরেজি গ্রন্থ *Sadhana*-র মধ্যে আছে। গত দুই মাসের মধ্যে (১৫ অগ্রহায়ণ - ১১ মাঘ) কবি যে চারিটি বড় বড় ভাষণ দান করেন— তপোবন, আশ্রম, ভক্ত ও বিশ্ববোধ—নানা দিক হইতে এই রচনাগুলি বিশেষভাবে বিচার্য। তপোবন আধুনিক শিক্ষার সমালোচনা ও idyllic শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কল্পনা এবং এই প্রবন্ধ ভারতের সংস্কৃতি ও শিক্ষাসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা। আট বৎসর পূর্বে 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম' স্থাপন কালে তিনি কোনো পাবলিক বিবৃতি দেন নাই; কয়েক বৎসর পর জাতীয় শিক্ষাপরিষদ প্রতিষ্ঠার সময়ে দেশের কাছে রাজনৈতিক উত্তেজনার চাপে ও তাগিদে তাঁহাকে শিক্ষাসম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা করিতে হয়। কোনোটিতেই ভারতীয় শিক্ষার মূলকথাটি স্পষ্ট করিয়া বিশ্লিষ্ট হয় নাই। তার পর গত কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার জীবনের ও জাতীয়জীবনের এত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে যে জাতীয় শিক্ষা ও ভারতীয় সংস্কৃতিকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশই জটিল হইয়া উঠিতেছে; নানা নেতা ভারতের অভীষ্ট আদর্শ সম্বন্ধে নানা মত প্রচার করিয়া যুবমনকে বিভ্রান্ত করিতেছেন। ভারতবর্ষ কী চায়, কোন্ আদর্শকে রূপ দিবার জন্য সে আজ জীবনের চরম ত্যাগকেও বরণ করিতে প্রস্তুত, তাহার সুস্পষ্ট আলোচনা এই প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য।

শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে তিনি 'তপোবন'এ বলিলেন যে, কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা, জ্ঞানের শিক্ষার দ্বারা মানুষের মনুষ্যত্ববোধ জাগে না; "ভারতবর্ষ যে-সাধনাকে গ্রহণ করেছে সে হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ।... বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে।... বোধের তপস্যার বাধা হচ্ছে রিপু", প্রবৃত্তির অসংযম। সেইজন্য ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যে জীবের প্রতি হিংসা ত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়াছে ও জীবনে প্রতিপালন করিয়াছে। "হিংসা ত্যাগ না করলে জীবের সঙ্গে জীবের যোগসামঞ্জস্য নষ্ট হয়।...প্রাণ জিনিসটাকে" অত্যন্ত তুচ্ছ করিবার অভ্যাস হয় এবং সেই হইতে অহৈতুকী হিংসাকে মানুষ জলে স্থলে আকাশে দেশেবিদেশে ব্যাপ্ত করিয়া দেয়। সেইজন্যই ব্রহ্মচর্যের সংযমের দ্বারা বোধশক্তিকে বাধামুক্ত কবিবার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক— ভোগবিলাসের আকর্ষণ হইতে অভ্যাসকে মুক্তি দিতে হয়, যে-সমস্ত সাময়িক উত্তেজনা লোকের চিত্তকে ক্ষুদ্র এবং বিচারবুদ্ধিকে সামঞ্জস্যভ্রষ্ট করিয়া দেয় তাহার ধাক্কা হইতে বাঁচাইয়া বুদ্ধিকে সরল করিয়া বাড়িতে দিতে হয়।

১ আশ্রম, শান্তিনিকেতন ৯। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ৪৪৯-৪৫৭।
২ ভক্ত, শান্তিনিকেতন ১০। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ৪৮৬-৪৯৬।
৩ দীক্ষা, ভারতী ১৩১৭ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ১৭৭। গানটির সুর পূরবী, একতালা।
৪ বিশ্ববোধ, শান্তিনিকেতন ১০। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ৫০ -৫১৯।

ভারতবর্ষের তপস্বীরা প্রাচীনকালে অরণ্যে সাধনা করিত, 'আরণ্যক' সভ্যতা তাহার ইতিহাসের একটি বিশেষ অংশ। সেই আরণ্যক সভ্যতার ভারতবর্ষে উপনিষদ হইয়াছে— আমেরিকায় আরণ্যক সভ্যতার শহর উঠিয়াছে, প্রাচীন মানব নিশ্চিহ্ন হইয়াছে ; ভারতের অরণ্যে মানুষ প্রকৃতিকে পাইয়াছিল, সৌন্দর্যকে দেখিয়াছিল, পরম-সুন্দরকে লাভ করিয়াছিল।

দেশের সম্মুখে শিক্ষার সংস্কার সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠায় কবি বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষ যদি 'জবরদস্তি দ্বারা নিজেকে য়ুরোপীয় আদর্শের অনুগত' করিতে চায়, তবে সে 'প্রকৃত য়ুরোপ' হইবে না, 'বিকৃত ভারত' হইবে মাত্র। 'একজাতির সঙ্গে অন্য জাতির অনুকরণ-অনুসরণের সম্বন্ধ নয়, আদান-প্রদানের সম্বন্ধ।' আজ জগতের সম্মুখে সত্যই এই প্রশ্ন গভীরভাবে চিন্তনীয় independence না inter-dependence। কবির মনে এই প্রশ্নই জাগিতেছে—

"ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিতভাবে লাভ করতে পারে, সে সত্যটি কী। সে সত্য প্রধানত বণিগ্‌বৃত্তি নয়, স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয় ; সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা [internationalism]।...

"ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা। ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, সেই তপস্যা আজ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ ও ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে ; দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্ত্বিকভাবে, সাধকভাবে। যতদিন তা না ঘটবে ততদিন আমাদের দুঃখ পেতে হবে, অপমান সইতে হবে।...

"প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই। সমগ্রের সামঞ্জস্য নষ্ট করে প্রবলতা নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখায় বলে তাকে বড়ো মনে হয়, কিন্তু আসলে সে ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষ এই প্রবলতাকে চায় নি, সে পরিপূর্ণতাকেই চেয়েছিল। এই পরিপূর্ণতা নিখিলের সঙ্গে যোগে, এই যোগ অহংকারকে দূর করে বিনম্র হয়ে। এই বিনম্রতা একটি আধ্যাত্মিক শক্তি, এ দুর্বল স্বভাবের অধিগম্য নয়।... ভগবান যিশু বলেছেন যে, যে বিনম্র সেই পৃথিবিজয়ী, শ্রেষ্ঠ ধনের অধিকার একমাত্র তারই।"

কলিকাতায় মাঘোৎসব উপলক্ষের বক্তৃতা 'বিশ্ববোধ'এ কবি বলেন যে নিখিল মানবপ্রবাহের মধ্যে যে ঐক্যসূত্র রহিয়াছে, তদ্‌সম্বন্ধে অনুভূতির অভাবে ভারত আজ বিচ্ছিন্ন, এবং বিচ্ছিন্ন বলিয়া দুর্বল। বিশ্বজাগতিকতার দ্বারা মনের মুক্তি হইতে পারে, কিন্তু আত্মার শান্তি হইবে বিশ্বাত্মবোধে। কিছুদিন পরে 'অপমান' কবিতায় যে কথাটি লিখিয়াছিলেন 'অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান'— তাহারই আভাস দেন প্রথমে 'তপোবন'এ। এই 'বিশ্ববোধ' প্রবন্ধেও বলেন সেই কথাটিই জোর দিয়া। আমাদের দেশে নানা জাতি এসেছে, বিপরীত দিক থেকে নানা বিরুদ্ধ শক্তি এসে পড়েছে, মতের অনৈক্য, আচারের পার্থক্য, স্বার্থের সংঘাত ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।"

কবির মতে, যতক্ষণ না এইসব বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে মিলন ঘটাতে পারব "ততক্ষণ বারবার কেবল আঘাত পেতে থাকব, কেবলি অপমান কেবলি ব্যর্থতা ঘটতে থাকবে, বিধাতা একদিনের জন্যেও আমাদের আরামে বিশ্রাম করতে দেবেন না।"

১ শান্তিনিকেতন ১০, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ৫১৬

গোরা ১৩১৪-১৬

আমাদের আলোচ্য পর্বে 'গোরা' উপন্যাসখানির লেখা শেষ করিলেন। রবীন্দ্রনাথের ষোলো হইতে তিয়াত্তর বৎসর বয়সের মধ্যে যেসব উপন্যাস রচিত হয় তাহাদের ঠিক মধ্যখানে হইতেছে তাঁহার 'গোরা' উপন্যাস। ষোলো বৎসরের লেখা প্রথম উপন্যাস 'করুণা' (ভারতী ১২৮৪-৮৫) অসমাপ্ত বলিয়া আমরা যদি গণনা হইতে বাদ দিই, তবে 'গোরা'র পূর্বে লিখিত উপন্যাস হইতেছে বৌঠাকুরানীর হাট (ভারতী ১২৮৮-৮৯), রাজর্ষি (বালক ১২৯২), চোখের বালি (বঙ্গদর্শন ১৩০৮-৯), চিরকুমার সভা (ভারতী ১৩০৭-৮), নষ্টনীড় (ভারতী ১৩০৮) নৌকাডুবি (বঙ্গদর্শন ১৩১০-১২)। ১৩১৪ সালের ভাদ্র মাসে প্রবাসীতে শুরু হইল 'গোরা', ধারাবাহিক মাসে মাসে বাহির হইয়া শেষ হইল ১৩১৬ সালের ফাল্গুন মাসে। গোরার পরে লিখিত হয় চতুরঙ্গ (সবুজপত্র ১৩২১), ঘরে বাইরে (সবুজপত্র ১৩২২), যোগাযোগ (বিচিত্রা ১৩৩৪-৫), শেষের কবিতা (প্রবাসী ১৩৩৫) দুইবোন (বিচিত্রা ১৩৩৯), মালঞ্চ (বিচিত্রা ১৩৪০), চার অধ্যায় (৩৪১)। গোরার পূর্বে ছাব্বিশ বৎসরের মধ্যে লেখা হইয়াছিল ছয় খানি, এবং গোরা হইতে সাতাশ বৎসরের মধ্যে লেখা হয় সাত খানি উপন্যাস। সুতরাং রবীন্দ্রপ্রতিভার মধ্যাহ্নে গোরা রচনার সূত্রপাত হয়। সাতচল্লিশ বৎসর বয়সে আরম্ভ, উনপঞ্চাশে শেষ করেন।

গোরা গল্পের পটভূমি হইতেছে উনবিংশ শতকের শেষ সিকা। বাংলার শিক্ষিত সমাজের উপর ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব তখন অতি প্রবল; ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন জীবিত, আচার্যের উপদেশ শুনিবার কথা উপন্যাসের মধ্যেই আছে। গোরার বয়স তখন পঁচিশ বৎসর, কারণ সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাহার জন্ম অর্থাৎ ১৮৫৭ সালেই ধরা যাক। সুতরাং গল্পাংশ যেখানে আরম্ভ হইয়াছে, সেটি বাস্তবের দিক হইতে হিসাব করিতে গেলে, লেখকের গ্রন্থরচনার পঁচিশ বৎসর পূর্বের ঘটনা, কারণ গোরা রচনা শুরু হয় ১৯০৭ সালে। এইসব কাল্পনিক সন-তারিখের হিসাবে গোরার কাহিনী কাল হইতেছে ১৮৮২-৮৩ খ্রীস্টাব্দ বা বাংলা ১২৮৮-৮৯ সাল, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিশ-একুশ বৎসরের কলিকাতার ছবি আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গল্পের সূচনা হইয়াছে শ্রাবণের কলিকাতার বর্ণনা দিয়া— যে কলিকাতার কর্দমাক্ত পথে যৌবনে কবিকে ভাড়াটিয়া গাড়ি করিয়া প্রায়ই চলাফেরা করিতে হইত।

গল্পরচনার প্রেরণা ছিল বাহিরের। রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহ হইবে জ্যৈষ্ঠ মাসে (১৩১৪); অর্থের টানাটানি খুব। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসীর জন্য একটি গল্প লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন ও কিছু টাকা পাঠাইয়া দেন। কবি লিখিয়া পাঠান 'মাস্টার মশায়' গল্প, দুই কিস্তিতে (আষাঢ় ও শ্রাবণ) প্রবাসীতে বাহির হইল। কিন্তু কবির মনে হইল তিনি যে টাকা পাইয়াছেন তাহার উপযুক্ত প্রতিদান হয় নাই। তাই লিখিতে বসিলেন 'গোরা'। কত বড় কাহিনী হইবে— কোথায় তার শেষ কিছুই না ভাবিয়া লিখিতে শুরু করিলেন— মনের মধ্যে হয়তো একটা অতি সাধারণ রেখাঙ্কন করিয়া লইয়াছিলেন— ইহার অধিক নহে। প্রতি মাসে যথাসময়ে ৩২ মাস নিয়মিতভাবে লেখা পাঠাইয়াছেন, কোনো দিন দেরি হয় নাই। এমনকি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর পরেও ঠিক সময়েই গোরার কিস্তি প্রবাসী অপিসে হাজির হইয়াছিল।

গোরা উপন্যাস রচনা শুরু হয় বঙ্গচ্ছেদ-আন্দোলনের শেষভাগে, যখন রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতবাদের অনেক বিবর্তন হইয়াছে। উচ্ছ্বাসের পথ বাহিয়া যে স্বাদেশিকতার স্রোতে কবি সাময়িকভাবে আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন, আজ সে জোয়ারের বেগ নাই; কবি অন্তরে অন্তরে বুঝিয়াছেন যে বাংলার আন্দোলন যে-পথে চলিতেছে, তাহা ভারতীয়দিগকে মঙ্গলতীর্থে উপনীত করিতে পারিবে না। কবির সেই মনোভাব প্রকাশ পায় 'ব্যাধি ও প্রতীকার' প্রবন্ধে প্রবাসী ১৩১৪ শ্রাবণ)। গঠনমূলক কর্মের মধ্যে উত্তেজনাকে সংহত করিবার জন্যই ঐ প্রবন্ধের অবতারণা।

বয়কট আন্দোলন 'স্বদেশী আন্দোলনে'র মধ্য দিয়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে মুখ ফিরাইয়াছে। কিন্তু তাহা ক্রমে এমন জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, যেখানে জাতীয়তা বা ন্যাশনালিজম্-বোধ হিন্দুত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে বসিয়াছে। অথবা হিন্দুত্ব নূতন জাতীয়তার মধ্যে আশ্রয় পাইয়াছে। বিংশ শতকের শুরু হইতেই জাতীয়ত্ব ও হিন্দুত্ব কিভাবে পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হইয়া বাংলাদেশে নবশক্তির সৃষ্টি করিয়াছিল সে-সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা হইয়া গিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই এই মতবাদ প্রচারের জন্য দায়ী। যাহাই হউক, রবীন্দ্রনাথ অচিরেই বুঝিতে পারিলেন যে যথার্থ ধর্মবোধ জাতিপ্রেম-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ প্রেম মাত্র। তিনি স্পষ্টই বুঝিলেন যে, হয় মানুষকে জাতীয়তার সংকীর্ণতা ত্যাগ করিয়া বিশ্বমানবতার ধর্ম গ্রহণ করিতে হইবে, নয় তাহাকে মানবধর্ম জলাঞ্জলি দিয়া জাতিপ্রেমের উষরক্ষেত্রে আত্মাহুতি দিতে হইবে। হিন্দুজাতীয়তার ব্যর্থতা কোন্‌খানে— জাতীয়তা ও মানবতার মধ্যে বিরোধ যে কেন দুর্লঙ্ঘ্য—ইহাই 'গোরা'তে নানাভাবে আলোচিত হইয়াছে।

উপন্যাসের মূল কথাটি হইতেছে যে গোরা আইরিশম্যানের পুত্র ; সে বিদেশী, বিধর্মী, ইংরেজ শাসকশ্রেণীভুক্ত জাতির লোক। নিজ জন্মপরিচয় কিছুই না জানিয়া হিন্দুর ঘরে মানুষ হইয়া সে অতিনিষ্ঠাবান হিন্দু, স্বাদেশিক, ইংরেজ-বিদ্বেষী, খ্রীষ্টানধর্ম-বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে ; তাহার কাছে হিন্দুধর্মের সমস্তই সত্য, সমস্তই পবিত্র— নির্বিচারে সে সমস্তকে গ্রহণ করিবে ; এইখানেই তাহার অহংকার। এই মত একসময়ে বাংলাদেশে বিশেষভাবে প্রচার লাভ করে স্বামী বিবেকানন্দের তেজোদৃপ্ত বাণীর মাধ্যমে।

ভারতবর্ষকে সুমহান্ করিয়া দেখিবার একটা পর্ব কবির জীবনে চলিয়া গিয়াছিল। গোরার প্রবল দেশাত্মিকতার উগ্রতা তিনি স্বয়ং একসময়ে তীব্রভাবেই অনুভব করিয়াছিলেন। থ্যাকার স্পিংকের দোকানে ধুতি পরিয়া উড়্‌নী গায়ে দিয়া তিনিও গিয়াছিলেন, আপনার স্বাজাত্যবোধ জাহিরের উদ্দেশ্যে। সেইজন্য গোরার যুক্তিজাল এমন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই অবস্থাকেই জীবনের চরম সার্থকতা বলিয়া মানিয়া মাঝপথে বসিয়া যান নাই ; তাঁহার প্রগতিশীল মন আগাইয়া চলিয়াছে ; তিনি বাস্তবতাহীন দেশাত্মিকতার ত্রুটি কোন্‌খানে তাহা আত্মবিশ্লেষণ দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বলিয়া পরেশবাবুর আদর্শ-চরিত্র উপন্যাসের মধ্যে ফুটাইতে পারিয়াছেন। পরেশবাবুর কথার মধ্যে যুক্তি হইতে অনুভূতি প্রবল, বুদ্ধি হইতে বোধি উজ্জ্বল। পরেশবাবুর নিকট গোরা পরাভূত হয় নাই— সে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে হিন্দুত্ব ও জাতীয়তা সমন্বিত হইয়াছিল ; তিনি যে হিন্দুভারতকে সুমহান করিয়া দেখিয়াছিলেন তাহা-যে কতখানি বাস্তবতাবর্জিত তাহা তাঁহার অকালমৃত্যুহেতু তাঁহার নিকট স্পষ্ট হইবার অবকাশ পায় নাই। তাঁহার আদর্শায়িত হিন্দুসমাজের সাধ্য ছিল না যে আইরিশ মহিলা মিস্ মারগারেট নোবেলকে 'ভগিনী নিবেদিতা' আখ্যা দিয়া হিন্দুসমাজের কোনো পর্যায়ে কণামাত্র স্থান করিয়া দিতে পারে। সনাতন ব্রাহ্মণত্বের সংস্কার বর্জন না করিয়া কোনো ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে সন্ন্যাসিনী নিবেদিতার সহিত পংক্তিভোজন করাও অসম্ভব ছিল। গোরার চরিত্রে স্বামী বিবেকানন্দের ও নিবেদিতার মিশ্রিত স্বভাবকে পাই বলিলে আশা করি কেহ আঘাত পাইবেন না। নিবেদিতার পক্ষে হিন্দু হওয়ার অসম্ভবত্ব কল্পনা করিয়াই রবীন্দ্রনাথ যেন আইরিশম্যানের পুত্র গোরাকে উপন্যাসের নায়করূপে সৃষ্টি করিলেন। মিস্ নোবেলও জাতিতে আইরিশ। একবার শিলাইদহে নিবেদিতা কবির অতিথি রূপে আসেন। একদিন একটি গল্প মুখে মুখে কবি বলেন, সেটা খানিকটা 'গোরা'র মত। সুচরিতা গোরাকে তার বিদেশী জন্মের জন্য প্রত্যাখ্যান করে এই কথা শুনিয়া নিবেদিতা খুব ক্রুদ্ধ হন (চিঠিপত্র ৬। পৃ. ২০৬) রবীন্দ্রনাথ 'গোরা'র ইংরেজি অনুবাদক মিঃ উইলিয়াম উইন্‌স্ট্যান্‌লি পিয়ার্সনকে এক পত্রে (১৯২২) এইটি লেখেন।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার যৌবনে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন ; কিন্তু শেষপর্যন্ত ঐ সমাজে প্রবেশ করেন নাই। তাঁহার আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা রামকৃষ্ণপরমহংসের নিকট গিয়া তৃপ্তি লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের গোরা কঠোর মুক্তিবাদী হইতে নিষ্ঠাবান হিন্দু হইল হরচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রভাবে। হরচন্দ্রের নিকট আসাযাওয়ার পর হইতে গোরা উগ্রভাবে সনাতনী হইয়া উঠিয়াছিল, সকল প্রকার সামাজিক প্রগতির মূর্তিমান প্রতিবাদ। "দেশের যাহা-কিছু আছে তাহার সমস্তই সবলে ও সগর্বে মাথায় করিয়া লইয়া দেশকে ও নিজেকে অপমান হইতে রক্ষা"[১] করিবার সাধনা হইল তাহার ধর্ম। এই যুক্তি বিবেকানন্দের বহু রচনা হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে বিবেকানন্দের মনোভাব আদৌ প্রসন্ন ছিল না ; রবীন্দ্রনাথের মনও যে নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি অনুকূল ছিল, তাহা নহে ; তবে উভয়ের বিরোধিতা একধর্মী নহে। রবীন্দ্রনাথ গোরায় ব্রাহ্মসমাজের যে চিত্র আঁকিলেন, তাহা এক হিসাবে নৌকাডুবি-বর্ণিত ব্রাহ্মসমাজের স্পষ্টতর ও উগ্রতর সংস্করণ মাত্র। তবে ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে কবির দৃষ্টিভঙ্গি তারকনাথ গাঙ্গুলির (স্বর্ণলতার) বা বঙ্কিমচন্দ্রের (বিষবৃক্ষের) দৃষ্টিভঙ্গি হইতে অনেক পৃথক। কারণ তাঁহাদের মধ্যে ছিল ব্রাহ্মবিদ্বেষ ব্রাহ্মসমাজকে হাস্যাস্পদ করাই ছিল উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মসমাজকে নানাভাবে জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তিনি যেসব দোষত্রুটি জানিতেন অন্যদের পক্ষে তাহা জানা সম্ভব ছিল না ; কিন্তু বঙ্কিম প্রমুখ মনীষিগণ বাহির হইতেই ব্রাহ্মসমাজকে দেখিয়াছিলেন বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম বা সমাজের ভাবাত্মক দিকটির প্রতি তাঁহাদের মন ধাবিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ গোরার মধ্যে দুইটিই করিয়াছেন ; ব্রাহ্মদের যতদূর সম্ভব ব্যঙ্গ করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে উহার আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বকেও স্বীকার না করিলেও প্রকারান্তরে মানিয়াছেন।

হিন্দুসমাজে গোরা চলিতে পারে না, চালাইয়া দিলে কৃষ্ণদয়াল মহাপাতক হইবেন। এই আশঙ্কায় তিনি গোরাকে প্রথমে ব্রাহ্মসমাজে ভিড়াইয়া দিবার চেষ্টায় ছিলেন। ভরসা ছিল বন্ধু পরেশবাবুর উপর। পরেশ ব্রাহ্ম, 'জাত' মানে না, গোরাকে আপনার করিয়া লইতে পারিবে। ব্রাহ্মদের কাছে মানুষ মানুষহিসাবে সমাদৃত, বিদেশী ও বিধর্মীকে আপনাদের সমাজের মধ্যে কোনো প্রকারে ঢুকাইয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু গোরা তো সে পথে গেল না। পিতার আদেশে সে পরেশবাবুর বাসায় দেখা করিতে গেল, কিন্তু সে যেন সমস্ত আধুনিকতার মূর্তিমান প্রতিবাদরূপে সেখানে উপস্থিত হইল। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, হরচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট হইতে বেদান্তচর্চার পর হইতে সে প্রচণ্ডভাবে সাত্ত্বিক— দেশের সমস্ত আচার ও সংস্কারকে মানিয়া চলিতে শুরু করিয়াছিল। এমন কি একদিন মা আনন্দময়ীর ঘরে তাহার আহার করা সম্ভব হইল না ; শুধু তাহা নহে—তাহার বন্ধু 'ব্রাহ্মণের ছেলে' বিনয়কে পর্যন্ত তথায় খাইতে দিবে না, কারণ খ্রীষ্টান লছমিয়ার হাতে আনন্দময়ী জল খান। গোরা জানে না যে খ্রীষ্টানঘরেই তাহার জন্ম এবং মা আনন্দময়ীর জাতি সেদিনই গিয়াছিল যেদিন পলাতকা বিদেশী রমণী তাঁহার ঘরে সদ্যোজাত শিশু রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। গোরা জানে না খ্রীষ্টান য়ুরোপীয় বংশে তাহার জন্ম। ইংরেজের উপর তাহার অপরিসীম ঘৃণা, অথচ সেই ইংরেজই তাহার প্রথম ও পরম আত্মীয়। যে মুহূর্তে হিন্দুসমাজ জানিল গোরা আইরীশ— খ্রীষ্টান সাহেব— সেইক্ষণেই হিন্দুর সমস্ত মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল, হিন্দুর কোনো ভোজনপংক্তিতে তাহার আর স্থান রহিল না। সেই মুহূর্তে গোরা অনুভব করিল যে সে হিন্দু নহে, ব্রাহ্মণ নহে—সে অস্পৃশ্য, ম্লেচ্ছ, যবন।

রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত নিপুণতার সহিত গোরার নিজ জন্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতাটিকে এমনভাবে তাহার কাছ হইতে গোপন রাখিয়া— অথচ পাঠকদের জানাইয়া— গ্রন্থের শেষ পর্যন্ত চলিয়াছেন যে তাহা যথার্থ নাট্যীয় রূপ

১ গোরা, প্রথম প্রকাশ দুই খণ্ডে, ১৯ মাঘ ১৩১৬ (১৯১০ ফেব্রুয়ারী ১)। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬, পৃ ১৩৮।

লইয়াছে। ইহার মধ্যে একদিকে যেমন বেদনাদায়ক ট্রাজেডি, তেমনি রহিয়াছে হাস্যকর পরিস্থিতি। পাঠক তো গোড়া হইতে জানিয়া গিয়াছেন গোরা আইরিশম্যানের পুত্র ; সুতরাং তাহার পক্ষে ব্রাহ্মণত্বের জয়গান ও হিন্দুত্বের বড়াই করা যে আদৌ স্বভাবিক নহে তাহা পাঠক সকৌতুকে উপভোগ করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গোরার মুখে যেসব যুক্তি দিয়াছেন, তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ভগিনী নিবেদিতা হিন্দুত্বের সমর্থনে যেসব রচনা লেখেন, তাহা পড়িলে তাঁহার মনীষা যুক্তি ও সর্বোপরি তাঁহার অকৃত্রিম প্রেম সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয় না যে তিনি ভারতকে ভালবাসেন নাই। কিন্তু তবু প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে তথাকথিত হিন্দুধর্মকে তিনি অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা দিয়া নির্বিচারে গ্রহণ করিয়াছিলেন—সেই হিন্দুধর্মবিশ্বাসী মানুষেরা কি তাঁহাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিযাছিল, না, তাঁহার পক্ষে হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রবেশের কোনো পথ ছিল? "হিন্দুসমাজে প্রবেশের কোনো পথ নেই। অন্তত রাস্তা নেই, খিড়কির দরজা থাকতেও পারে। এ সমাজ সমস্ত মানুষের সমাজ নয়— দৈববশে যারা হিন্দু হয়ে জন্মাবে এ সমাজ কেবলমাত্র তাদের।"[১] স্বামীজির মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মঠের সন্ন্যাসীরা এই বিদেশিনীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা সুপরিচিত ঘটনা বলিয়া আলোচনা করিলাম না।

হিন্দুভারতের তথা অখণ্ড ভারতের সমস্যা আজ এ নহে যে কে কতখানি হিন্দু, কে কতখানি মুসলীম ; সমস্যা হইতেছে এই বাধা ভাঙিয়া কি ভাবে লোকে আপনাকে মানুষ বলিয়া পরিচয় দিবে ও মানুষের ধর্ম নিষ্ঠার সহিত পালন করিবে। সমসাময়িক প্রবন্ধ 'তপোবনে' কবি লিখিয়াছেন (প্রবাসী ১৩১৬ পৌষ) "ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, সেই তপস্যা আজ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে ; দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্ত্বিকভাবে, সাধকভাবে। যতদিন তা না ঘটবে ততদিন নানাদিক থেকে আমাদের বারম্বার ব্যর্থ হতে হবে (রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ৪৭৯)।" তাই লেখক পরেশবাবুকে যেখানে বাহির করিয়া আনিলেন— তাহা কোনো গণ্ডিকাটা ধর্মের আবেষ্টনী নহে— তাহা যথার্থ শ্রীক্ষেত্র— এবং সেই অবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ শ্রীক্ষেত্রেই গোরার সহিত সুচরিতার মিলন সম্ভব হইল। ধর্মসম্প্রদায়ের সংকীর্ণতার মধ্যে মানুষের মুক্তি নাই, মানুষের মিলন নাই— এই কথাটাই কবির নানা রচনার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছিল— গোরার মধ্যেও তাহা অন্যতম রীতিতে আত্মপ্রকাশ করিল।

রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেও ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডি ধীরে ধীরে কাটিয়া ফেলিতেছিলেন। তাঁহার কাছে স্বাদেশিকতার উগ্রতা যেমন ব্যর্থ, ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডিকাটা ধর্মও আজ তেমনি নিরর্থক। হিন্দুসমাজের পক্ষে গোরাকে আপনাদের গণ্ডির মধ্যে গ্রহণ করা যেমন কঠিন, ব্রাহ্মসমাজের পক্ষেও একদিন পরেশবাবুর অবচ্ছিন্ন উদারতাকে মানিয়া লওয়া তেমনি সমস্যাপূর্ণ হইল। ব্রাহ্মসমাজের কোন্‌টা ব্রাহ্ম কোন্‌টা অব্রাহ্ম লইয়া যে খুঁতখুঁতানি দেখা যায়, তাহা কবির মতে উদারতার পরিচায়ক নহে। গণ্ডিমাত্রই তাঁহার কাছে অসত্য এবং এই গণ্ডি ভাঙাই হইতেছে রবীন্দ্রনাথের জীবনের আদর্শ ও সাহিত্যের বাণী। গণ্ডি— যতই মোহন নামে মানুষের কাছে আসুক— দেশের নামে, ধর্মের নামে — কবির মনে তাহা সায় পায় না। তিনি সেই গণ্ডির মধ্যে বাস করিয়া এককালে তাহার জয়গান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বুঝিয়াছেন খাঁচা যতই সুন্দর হউক, আকাশ সুন্দরতর। স্বদেশ প্রণম্য নিঃসন্দেহে, সমাজ জীবনধারণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ; কিন্তু ধর্ম— দেশ ও সমাজের ঊর্ধ্বে। রবীন্দ্রনাথ গোরা, সুচরিতা ও পরেশবাবুকে যেখানে বাহির করিয়া আনিলেন, তাহা মানুষের ধর্মের উদার ক্ষেত্র— সেখানে তাহারা হিন্দুও নহে, ব্রাহ্মও নহে, খ্রীস্টানও নহে, তাহারা মানুষ। উপন্যাসিক মুলুক রাজ আনন্দ ইংরেজীতে 'রবীন্দ্রপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য' প্রবন্ধে পরেশবাবুর চরিত্রের সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছেন, "পরেশবাবুর মত জ্ঞানবৃদ্ধ, সংযত, শান্ত,

১ গোরা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৬, পৃ ৫১৮।

ঋষিচরিত্র···যুক্তিবাদে শ্রদ্ধাশীল, সংস্কারের প্রতি স্নেহবান্···উদারনৈতিক উদারমনা চরিত্র ত্রিশ বত্রিশ বছর আগেও এই সমাজে ছিল।···যুগচেতনার সঙ্গে এদের মনোভাব না মিলতে পারে, কিন্তু ঐতিহ্যবাহক এইসব জ্ঞানবৃদ্ধ একেবারে অবহেলায় আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেবার মত নয়।"[১]

গোরা উপন্যাসের মধ্যে লেখক দেশের সমস্যাকে মানবীয় পটভূমিতে সর্বপ্রথম বর্ণনা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে ও পরে তিনি প্রবন্ধাদির মধ্য দিয়া সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন, তাহা তত্ত্ব ও তথ্য পর্যায়ভুক্ত, বাস্তবের মধ্যে দেখাইলেন এই উপন্যাসে। চোখের বালি ও নৌকাডুবির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যেসব সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা প্রধানত যৌনসম্বন্ধীয়। 'গোরা'য় যৌনসমস্যা থাকিলেও তাহা কোনো নরনারীহৃদয়ে দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার বিষয় হয় নাই; হৃদয় লইয়া কেহই বাড়াবাড়ি করে নাই; সকলের মধ্যেই প্রেম আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত সংযত। প্রেমের পথ স্বভাবকে কোথায়ও অতিক্রম করে নাই।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ১৩১৪ সাল হইতে রবীন্দ্রনাথ দেশের সম্পর্কে সকল সমস্যা সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিতেছিলেন। বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন ক্রমে দেশকে যেপথে লইয়া চলিয়াছিল, তাহা কবির আদর্শ-অনুমোদিত নহে। সমালোচনার দ্বারা কোনো গঠনমূলক কার্য হয় না, উত্তেজনার গর্ভেই অবসাদ নিহিত। সত্যকার দেশসেবা যে কত কঠিন কাজ সে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কিছু অভিজ্ঞতা ছিল। কলিকাতায় বসিয়া গোরা যে হিন্দুসমাজকে আদর্শায়িত করিয়া দেখিয়াছিল, তাহা-যে কত মিথ্যা তাহা দেশভ্রমণে বাহির হইয়াই সে জানিতে পারিয়াছিল। নন্দর অপমৃত্যুতেও সে বুঝিয়াছিল দেশ কোথায় মরিয়া আছে।

রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থে যেসব সমস্যা দেখাইলেন তাহা কল্পনার বিষয় ছিল না; সেগুলি অত্যন্ত সত্য, অত্যন্ত বাস্তব; কবিকে নিজ জীবনে জমিদারির মধ্যে যেসব সমস্যার সহিত প্রতিদিন সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলি এই উপন্যাসের ঘটনা।

মানুষের দুঃখের আশু উপশমের দ্বারা দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। লোকের দুঃখ দূর করিবার জন্য আমরা যে সেবা-ব্যবস্থা করি, তাহা সূক্ষ্মবিচারে নঞাত্মক; অর্থাৎ সাময়িক সেবার দ্বারা সাময়িক দুঃখের লাঘব হইতে পারে, কিন্তু দুঃখের কারণ দূর হইতে পারে না। গোরা ও তাহার শিষ্যগণ দেশসেবার যে উদ্যোগ করিয়াছিল, তাহারই মধ্যে এই ব্যর্থতার বীজ উপ্ত ছিল। কারণ, দেশের বাস্তবতা সম্বন্ধে অজ্ঞের দল উচ্ছ্বাসের পথ বাহিয়া সেবাকর্মে নামিতে যায়। দেশের লোকের চিত্তকে সকল দিক হইতে উদ্‌বোধিত করিবার প্রয়াস তাহাদের কর্মপদ্ধতির অন্তর্গত নয়। সেই প্রয়াস করিতে গেলেই বাস্তবের সহিত বিরোধ বাধিবে; প্রাচীনের সংস্কার, আভিজাত্যের অভিমান, ধনতন্ত্রের বুনিয়াদ, জাতিভেদের মূঢ়তা প্রভৃতি বহু প্রিয় অতিপ্রিয় সংস্কারকে ভাঙিতে হইবে। সেই বাস্তব জীবনের সহিত গোরার পরিচয় ছিল না; কিন্তু পল্লীভ্রমণ করিয়া, সমাজকে নাড়া দিতে গিয়া, হিন্দুধর্মের আচার পালন করিতে গিয়া সে দেখিল যে পথে সে চলিতেছে সেখানে না আছে যুক্তি, না আছে মুক্তি।

সমস্যার বিশ্লেষণ ও বিতর্ক (problem for discussion) হইতেছে গোরা উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। চোখের বালিতে সমাজ যেন নিশ্চিহ্ন হইয়াছে: মহেন্দ্র-বিনোদিনীর অন্ধ কামনার বহ্নি-উৎসবে সমাজ অবলুপ্ত। কিন্তু গোরায় সমাজ ও ধর্ম বিচারই প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। বিনয় ও ললিতার প্রেমের মধ্যে সংগ্রাম কম, তাহাদের সংগ্রাম সমাজকে কেন্দ্র করিয়া। গোরা ও সুচরিতার সংগ্রাম ধর্মবিশ্বাসকে লইয়া— বিতর্ক ঘুরিতেছে তত্ত্বের চারিপাশে, সামাজিক মতামতকে বা ধর্মসংস্কারকে কেন্দ্র করিয়া যত কথার সৃষ্টি: তাই যেন ঘটনাস্রোতে দ্রুত চলে না;

১ ক্রান্তি ৩য় বর্ষ, ১৩৬১ বৈশাখ, পৃ-১৬৮

কথার জালে গতি মন্দীভূত হইলেও গ্রন্থমধ্যে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া রাখিবার একটি মোহিনী শক্তি আছে; তাই বার বার পাঠ করিলেও 'গোরা' যেন পুরাতন হয় না।

সংসার ও বিদ্যালয়

মাঘোৎসবের তিন দিন পরে রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথের বিবাহ হইল (১৩১৬ মাঘ ১৪)। এই বিবাহের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ছিল; রথীন্দ্রনাথের বধূ প্রতিমা দেবী-- গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভগ্নী বিনয়িনী দেবীর[১] বিধবা কন্যা। বিধবাবিবাহ ঠাকুরবাড়িতে এই প্রথম, সুতরাং সামাজিক দিক হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে ইহা বিপ্লবাত্মক। বিবাহের চারিদিন পরে (২০ মাঘ) আমেরিকায় জামাতা নগেন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন, "বিবাহটি বিধবাবিবাহ হয়েছে তাও বোধ হয় শুনেছ। তা নিয়ে গোড়ায় একটা ঝড় ওঠবার সম্ভাবনা হয়েছিল, কিন্তু তার প্রতি মনোযোগ না করাতে সেটা কেটে গেল।"[২] আইনের সাহায্যে হিন্দুসমাজের কোনোপ্রকার সামাজিক সংস্কার করা বিষয়ে মহর্ষির ঘোর আপত্তি ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় আইনদ্বারা বিধবাবিবাহ সিদ্ধ করিবার জন্য আন্দোলন করায় মহর্ষির অনুকূলতা তিনি লাভ করেন নাই। কেশবচন্দ্র সেন যখন সিভিল ম্যারেজ বিল পাস করাইবার আন্দোলন (১৮৭২) করিতেছিলেন তখনো মহর্ষি উঁহার বিরোধী ছিলেন। যাহাই হউক, এতকাল পরে ঠাকুরপরিবারের বহুপ্রাচীন সংস্কার রবীন্দ্রনাথের হাতেই আঘাত পাইল; তবে তিনি কোনো আইনের দ্বারা এই বিবাহ সিদ্ধ করেন নাই।[৩] এই ঘটনার পর আদিসমাজের বহু সংস্কার একে একে ভাঙিয়া যায়।

যাহাই হউক, বৈষয়িক সাংসারিক ও সামাজিক নানা কাজে কবি এখন ব্যস্ত, তাই সাহিত্যিক সৃষ্টি বড়ই ক্ষীণ। মাঘ ও ফাল্গুন মাসে মাত্র তিনটি গান লিখিতে দেখি ১. তুমি আমার আপন, তুমি আছ আমার কাছে (মাঘ ১৩১৬, গীতাঞ্জলি ৫২), ২. নামাও নামাও আমায় তোমার চরণতলে (মাঘ ১৩১৬, গীতাঞ্জলি ৫৩) ৩. আজি গন্ধবিধুর সমীরণে ফাল্গুন ১৩১৬, গীতাঞ্জলি ৫৪)। অন্যান্য রচনা চোখে পড়ে কম, তবে একটি প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: সেটি হইতেছে শিবাজী ও শিখ গুরুদের সম্বন্ধে একটি তুলনামূলক আলোচনা।[৪] এটি লেখেন শরৎকুমার রায়ের 'শিখগুরু ও শিখজাতি'র ভূমিকা রূপে।

শরৎকুমার রায় শান্তিনিকেতনের শিক্ষক। ইনি বরিশালের লোক— স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায়ের সতীর্থ। অশ্বিনী-কুমার দত্তের সংস্পর্শে আসিয়া যেসব যুবকের জীবনে চারিত্রিক নিষ্ঠা দেখা দিয়াছিল, শরৎকুমার তাহাদের অন্যতম। শান্তিনিকেতনে আসিবার পর রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে তিনি বাংলায় ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন। শরৎকুমারের গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ মারাঠা ও শিখদের পতনের কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। তাঁহার মতে শিখরা মোগলদের অত্যাচারের ফলেই একটি সম্প্রদায়ে সংহত হইয়া দাঁড়ায়, নিজেদের সম্প্রদায়কে বিনাশ ও উপদ্রব হইতে রক্ষা করাই তাহাদের প্রধান চেষ্টা হইল। ফলে নানকাদি ভক্তহৃদয় হইতে যে শুভ্র নির্মল শক্তিধারা বিশ্বকে পবিত্র উর্বর করিতে বাহির হইয়াছিল, তাহা কালে "সৈন্যের বারিকে রক্তবর্ণ পঙ্কের মধ্যে পরিশোষিত হইয়া গেল।"

১ বিনয়িনী দেবীর স্বামীর নাম শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়। বিনয়িনী দেবার মৃত্যুসংবাদে পিকিং হইতে প্রতিমা দেবীকে পত্র, ২০মে ১৯২৪, চিঠিপত্র ৩য় (১৫ নং), পৃ ৩০-৩৩।

২ দেশ ১৩৬২ কার্তিক ২৫। পৃ.৯১

৩ কিন্তু দৌহিত্রী নন্দিতার সহিত কৃষ্ণ কৃপালিনীর বিবাহ ১৮৭২ সালে ৩ আইন (ব্রাহ্ম বিবাহ) অনুসারে সম্পন্ন হয়।

৪ শিবাজি ও গুরুগোবিন্দ সিংহ, প্রবাসী ১৩১৬ চৈত্র, পৃ. ১০৩৬-৪০। দ্র. ইতিহাস।

রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে কানিংহামের[১] শিখ-ইতিহাস পড়িয়াছিলেন; এই সময়ে মেকলীফ-লিখিত[২] সুবৃহৎ শিখধর্ম (৬ খণ্ড) গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। এইসব দেখিয়া-শুনিয়া তিনি তাঁহার এই প্রবন্ধে শিখদের সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করেন, তাহা ইতিহাসসম্মত কি না জানি না। কিন্তু এ কথা সত্য যে শেষগুরু গোবিন্দসিংহের পর হইতে শিখরা ধর্মসম্প্রদায় হইতে যোদ্ধসম্প্রদায়ে পরিণত হইল এবং বর্তমানে তাহারা ধর্মপ্রাণ আধ্যাত্মিক ভক্তরূপে জগতে খ্যাত নহে। গুরুগোবিন্দ শিখদিগকে স্বধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ শিক্ষা দিয়াছিলেন; কিন্তু ইংরেজ আমলে ধর্মরক্ষার জন্য যখন আর যুদ্ধের প্রয়োজন থাকিল না, তখন যুদ্ধ করার অভ্যাসটার জন্যই তাহারা ভারতে যোদ্ধজাতির খ্যাতি অর্জন করিল। প্রবল রাজা শিখদিগকে তাহাদের সাম্রাজ্য রক্ষার কাজে নিযুক্ত করিয়াছিল। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ শিখজাতির শেষ ইতিহাসটাকে ব্যর্থ মনে করেন।

এই সময়ে ভাগলপুরে একটি সাহিত্যসম্মিলনী আহূত হয় ফাল্গুন মাসের শেষ ভাগে; কবিকে তথায় যাইতে হইল। বহু সাহিত্যিক জমায়েত হন, তা ছাড়া আসেন বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র রায়, পর্যটক পণ্ডিত শরৎচন্দ্র দাস প্রভৃতি। সম্মেলনের সভাপতি হন চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (১২৫৬-১৩২৯); 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'এর লেখকরূপে বাংলাসাহিত্যে ইঁহার খ্যাতি, বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের যুগে ইনি ছিলেন অ-বিশ্বাসী বা ফ্রী-থিন্‌কারের দলে; সাহিত্যসমঝদারের অশেষ গুণ ইঁহার ছিল। রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে তিনি প্রায়ই গ্রন্থ-সমালোচনা লিখিতেন। কবির মুখে চন্দ্রশেখরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কয়েকবারই শুনিয়াছি।

ভাগলপুরে কবি কোনো লিখিত ভাষণ দেন নাই। মুখে মুখে যাহা বলেন তাহা পাটনা কলেজের অধ্যাপক যদুনাথ সরকার ও বিক্রমপুরের ইতিহাস-প্রণেতা যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত শ্রুতিলিখন করেন; পরে খগেন্দ্রনাথ মিত্র ভাষাদান করিয়া প্রকাশ করেন।[৩] এইসময়ে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যসুন্দর বসু প্রভৃতি তরুণ সাহিত্যসেবিগণ ভাগলপুরে রবীন্দ্রভক্তদের অগ্রণী।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরিযাছেন; যথাবিধি বুধবার মন্দিরে উপাসনা করেন, গীতাঞ্জলির গান লেখেন।[৪] সেইসময় তিনি 'গুহাহিত'[৫] নামে এক ভাষণ দান করেন (২৩ চৈত্র ১৩১৬)। কিন্তু তাঁহার ভাষণ ও গান পাঠ করিয়া কেহ যদি মনে করেন যে কবি এই সময়ে একটি তুরীয় আধ্যাত্মিক অবস্থায় বাস করিতেছেন, তবে খুবই ভুল করিবেন; কবির গান বা উপাসনা তাঁহার অন্তর-মধ্যে যে রস সৃষ্টি করিত, তাহা তাঁহাকে দৈনন্দিন কর্তব্য হইতে বিচলিত করিতে পারিত না। বহুবিধ কর্মজালের ও বৈষয়িক প্রয়োজনের ক্ষুদ্র চাহিদা আসে নিত্য, মানুষ-রবীন্দ্রনাথ বিষয়ী-রবীন্দ্রনাথকে সেসব সমস্যার সমাধান করিতে হয় একাই।

রবীন্দ্রনাথের দেশে ফিরিবার কয়েকমাসের মধ্যেই তাঁহার বন্ধু সন্তোষচন্দ্র মজুমদারও ফিরিলেন। সন্তোষচন্দ্রের

১ Cunningham, Joseph Davey (1812-1851): ১৮৩১ হইতে ভারতে বেঙ্গল ইনজীনিয়ার্স' বিভাগে কাজ করেন। *History of the Sikhs* (1849) গ্রন্থের লেখক। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে ঐতিহাসিক এমন সকল ঘটনার আলোচনা ছিল, যাহাতে সরকার লেখকের উপর অতিশয় বিরক্ত হন; সে গ্রন্থ পরিবর্তন করিয়া ছাপিতে হয়।...ইঁহার ভ্রাতা ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক সার্ আলেকজাণ্ডার কানিংহাম (১৮১৪-১৮৯৩)।

২ Macauliffe, M A. *The Sik Religion*, 6 vols. Oxford. 1909.

৩ ভাগলপুরে সাহিত্যসম্মিলনে রবীন্দ্রবাবুর বক্তৃতা। প্রবাসী ১৩১৬ চৈত্র, পৃ. ৯৬৯-৭২।

৪ ২৬শে চৈত্র হইতে ১২ই বৈশাখ ১৩১৭ গীতাঞ্জলির গান রচনা করেন। গীতাঞ্জলি (৫৫) আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে (২৬ চৈত্র ১৩১৬)। (৫৬) তব সিংহাসনের আসন হতে (২৭ চৈত্র)। (৫৭) তুমি এবার আমায় লহো (২৮ চৈত্র)। (৫৮) জীবন যখন শুকায়ে যায় (ঐ)। (৫৯) এবার নীরব করে দাও (৩০ চৈত্র ১৩১৬)। (৬০) বিশ্ব যখন নিদ্রামগন (৪ বৈশাখ ১৩১৭)। (৬১) সে যে পাশে এসে বসেছিল (১২ বৈশাখ)।

৫ গুহাহিত, প্রবাসী ১৩১৭ আষাঢ়, পৃ. ২০৭-২১১। শান্তিনিকেতন ১১, রবীন্দ্র-বচনাবলী ১৫, পৃ. ৫৫২-৫৮।

বিদেশে বাসকালে তাঁহার পিতা শ্রীশচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছিল (৮ নভেম্বর ১৯০৮)। সন্তোষের উপর সুবৃহৎ পরিবারের দায়িত্ব পড়িল। সন্তোষচন্দ্রের আত্মীয়স্বজনদের ও রথীন্দ্রনাথের একান্ত ইচ্ছা কলিকাতার নিকট সকলে মিলিয়া একটি কোম্পানী খুলিয়া গোগৃহ স্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ঠিক তাহার বিপরীত। তাঁহার ইচ্ছা সন্তোষ শান্তিনিকেতনে গোশালা স্থাপন করিয়া ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বালকদের দুধের সমস্যা দূর করেন। শান্তিনিকেতনের মরুভূমিতে গোশালা সফল হওয়ার বাধা যে কত তাহা কবিও বুঝিতে পারে নাই, সন্তোষচন্দ্রেরও বুঝিবার বয়স বা অভিজ্ঞতা তখনো হয় নাই।

কলিকাতার কাছে কোম্পানী খুলিয়া গোগৃহ স্থাপনের কথা জানিতে পারিয়া কবি রথীন্দ্রনাথকে যে পত্র দেন তাহাতে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, দেশে অনেক বড়ো বড়ো কোম্পানী খোলা হইয়াছে, কোনোটাই সুবিধাজনক হয় নাই। এই পত্রে কবি তাঁহার তিক্ত অভিজ্ঞতার কয়েকটি উদাহরণ দিয়াছেন।[১]

কবির আশঙ্কা, পাছে সন্তোষচন্দ্রের আত্মীয়বন্ধুরা মনে করেন যে "সন্তোষকে বিদ্যালয়ে বেঁধে রাখবার জন্যে" তাঁহার "একান্ত ইচ্ছা"। তাঁহার বক্তব্য ছিল যে সন্তোষ যেন অনিশ্চিতের মধ্যে না যায়, স্বাধীনভাবে শান্তিনিকেতনে গোশালা চালায়, গ্রামের সম্মুখে একটি আদর্শ স্থাপন করে, এই ছিল কবির ইচ্ছা। তবে তাহাকে বিদ্যালয়ের কাজের মধ্যে বাঁধিবার ইচ্ছা ছিল না, সে কথা জোর করিয়া বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের প্রতি সন্তোষের অকৃত্রিম অনুরাগ ও আকর্ষণের কথা কবি ভালো করিয়াই জানিতেন; এবং সেইজন্যই মনে মনে ছিল সন্তোষও সতীশ রায় এবং অজিত চক্রবর্তীর ন্যায় আশ্রমের কাজে যোগ দেন। শেষপর্যন্ত সন্তোষচন্দ্র শান্তিনিকেতনে গোশালা স্থাপন করিলেন। কিন্তু স্বাধীনভাবে কাজ হইল না—সন্তোষকে আশ্রমে ২০০৲ টাকা বেতনে চাকুরী গ্রহণ করিতে হইল, এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঐ বেতনেই কাজ করিয়া যান। গোশালার অবস্থা কী হইল তাহার বিস্তারিত আলোচনা অবান্তর। সংক্ষেপত এইটুকু— কয়েক বৎসর বহু শত টাকা লোকসান দিয়া বিদ্যালয়ের পক্ষে গোশালা চালানো অসম্ভব হইয়া উঠিলে, সন্তোষচন্দ্র ব্যক্তিগতভাবে উহার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন ও নিজ গৃহের নিকট গোশালা উঠাইয়া লইয়া গেলেন। কবির অনেক স্বপ্নই যেমন সফল হয় নাই—শিলাইদহের চাষবাস ও শান্তিনিকেতনে গোশালার পরীক্ষাও সেইরূপ হইল।

রবীন্দ্রনাথ ১২ই বৈশাখ (১৩১৭) পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে থাকিয়া কয়েকদিনের জন্য কলিকাতায় যান। এই সময়ে অজিতকুমার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যানচেস্টার বৃত্তি লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। কবি (২৮ এপ্রিল ১৯১০) ডা. পি. কে. রায়কে অজিত সম্বন্ধে একটি সুপারিশ পত্র দেন।[২] এই পত্রের বলেই অজিতকুমার ঐ বৃত্তি লাভ করেন। কলিকাতা হইতে কবি ১৮ই বৈশাখ (১৩১৭) আশ্রমে ফিরিলেন।[৩] আসিয়া দেখেন আশ্রমবাসী ছাত্র অধ্যাপকে মিলিয়া তাঁহার জন্মোৎসবের আয়োজন করিতেছেন। কবি উনপঞ্চাশ পার হইয়া পঞ্চাশ বৎসরে পদার্পণ করেন, তাহারই উৎসব।

কবির এই জন্মোৎসবের কথা তখনো আশ্রমের বাহিরে সাধারণের কাছে জানানো হয় নাই। আশ্রমের নিরালার মধ্যে যে আনন্দ-উৎসব সম্পন্ন হইল, তাহা অত্যন্ত আন্তরিক এবং নিতান্ত আত্মীয়দের উৎসব। উৎসবান্তে কবি যে ভাষণ[৪] দেন, তাহার একস্থলে তিনি বলেন, "মানুষের মধ্যে দ্বিজত্ব আছে; মানুষ একবার জন্মায় গর্ভের মধ্যে,

১ চিঠিপত্র ২, পৃ. ১২-১৫। ৭ এপ্রিল ১৯১০, ২৪ চৈত্র ১৩১৬।

২ কবিপ্রণাম, বাণীচক্র ভবন, শ্রীহট্ট, অগ্রহায়ণ ১৩৪৮। পৃ. ১০৫

৩ চিঠিপত্র ২, পৃ. ৭-১১। ১৯ বৈশাখ রথীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন, 'কাল রাত্রে এসে পৌঁচেছি।' এই পত্রে কবি গার্হস্থ্যজীবন সম্বন্ধে আদর্শ ব্যক্ত করিয়াছেন।

৪ জন্মোৎসব, শান্তিনিকেতন ১১, পৃ ৭২। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, পৃ ৪৬২-৬৮।

আবার জন্মায় মুক্ত পৃথিবীতে। তেমনি আর-একদিকে মানুষের জন্ম আপনাকে নিয়ে, আর-এক জন্ম সকলকে নিয়ে।···একদিন আমি আমার পিতামাতার ঘরে জন্ম নিয়েছিলুম···সেখানকার সুখদুঃখ ও স্নেহপ্রেমের পরিবেষ্টন থেকে আজ জীবনের নূতন ক্ষেত্রে জন্মলাভ করেছি।···পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়ে তবে মানুষের জন্মের সমাপ্তি, তেমনি স্বার্থের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে মঙ্গলের মধ্যে উত্তীর্ণ হওয়া মনুষ্যত্বের সমাপ্তি।" তিনি আরও বলিলেন যে বাল্যকালে তাঁহার যে জন্মদিন হইত, তাহাতে আত্মীয়-পরিজনরা আনন্দ করিতেন; কিন্তু একদিন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে জন্মদিনের উৎসব বন্ধ হইয়া গেল। আজ প্রৌঢ় বয়সের প্রান্তে আসিয়া যাহারা তাঁহার জন্মোৎসব করিতেছে, তাহারা তাঁহার আত্মীয়কুটুম্ব নহে; তাহারা তাঁহার সহকর্মী অধ্যাপক ও তাঁহার ভক্ত ছাত্রের দল। তাই বলিলেন, "আমি আজ তোমাদের মধ্যে যেখানে এসেছি, এখানে আমার পূর্বজীবনের অনুবৃত্তি নেই। বস্তুতঃ, সে জীবনকে ভেদ করেই এখানে আমাকে ভূমিষ্ঠ হতে হয়েছে। এইজন্যেই আমার জীবনের উৎসব সেখানে বিলুপ্ত হয়ে এখানেই প্রকাশ পেয়েছে।"

এইবার গ্রীষ্মাবকাশের পূর্বে (১৩১৭ বৈশাখ) শান্তিনিকেতনে ছাত্র ও অধ্যাপকগণে মিলিত হইয়া রবীন্দ্রনাথের 'প্রায়শ্চিত্তে'র অভিনয়[1] করিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইহাতে কোনো অংশ গ্রহণ করেন নাই; তিনি ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায় নামেন দ্বিতীয় বার, যখন পূজার ছুটির পূর্বে উহার পুনরভিনয় হয়।

বিদ্যালয় গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বন্ধ হইল (২৫ বৈশাখ ১৩১৭) জন্মোৎসবের পরেই। কবি কলিকাতায় গেলেন ৩০শে, অজিতকুমারের বিবাহ লাবণ্যলেখার সহিত—কবিরই কন্যাসম্প্রদানের কথা। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল শান্তিনিকেতনে অজিতকুমারের বিবাহ হয়—পাত্রপাত্রী উভয়েই আশ্রমের সেবক-সেবিকা। তাঁহার আরও ইচ্ছা ছিল আদিব্রাহ্মসমাজ-অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারে এই বিবাহ হয়। কিন্তু বাধা দুইটিতেই পড়িল। প্রথমে আশ্রমের অন্যতম ট্রাস্ট্রি দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে অসবর্ণ বিবাহ নিষ্পন্ন হইতে আপত্তি করিলেন। বিনা রেজিস্ট্রেশনে আদিসমাজীয় মতে বিবাহের বাধা কোথায় তাহা দেখাইলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। তিনি বলিলেন অজিত অসবর্ণ বিবাহের সন্তান, কারণ তাঁহার পিতা ব্রাহ্মণ, মাতা বৈদ্য। বিবাহ হইয়াছিল ১৮৭২ সালের সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুসারে। তাহাতে 'আমি হিন্দু নহি' বলিয়া ঘোষণা করিতে হয়। সুতরাং অজিতের বিবাহ আদিসমাজীয় মতে আইনসিদ্ধ না হইবার আশঙ্কা আছে। অগত্যা কবিকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের রীতি অনুসারে বিবাহ দিতে হইল।

কলিকাতায়[2] সপ্তাহকাল থাকিয়া কবি তিনধরিয়া (শিলিগুড়ি-দার্জিলিং রেলপথের এক স্টেশন) চলিলেন। সঙ্গে এবার অনেকে—রথীন্দ্রনাথ ও তাঁহার স্ত্রী, মীরা ও জামাতা নগেন্দ্রনাথ এবং হেমলতা দেবী। তিনধরিয়াতে জ্যৈষ্ঠের দিন-কুড়ি কাটে: এই সময়ে গীতাঞ্জলির অনেকগুলি গান রচিত হয়।[3]

কবি তিনধরিয়া হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন। কলিকাতায় দিন সাত ছিলেন। গীতধারা কিন্তু পূর্বের ন্যায় সমানে চলিতেছে।[4]

১ প্রায়শ্চিত্তের অভিনয়ে যাঁহারা অংশ গ্রহণ করেন তাঁহাদের নাম: ধনঞ্জয় বৈরাগী—৺অজিতকুমার চক্রবর্তী। প্রতাপাদিত্য—৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বসন্ত রায়—৺সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। উদয়াদিত্য—৺নগেন্দ্রনাথ আইচ। রামচন্দ্র—৺জগদানন্দ রায়। রমাইভাঁড়—৺হীরালাল সেন। রামমোহন—৺কালীমোহন ঘোষ। ফার্নান্দিস—৺চুনিলাল মুখোপাধ্যায়। বিভা—যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। মুক্তিয়ার খাঁ—৺কালিদাস বসু। মন্ত্রী—৺শরৎকুমার রায়। বাজওয়ালক—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। মাধবপুরের প্রজারা—৺অক্ষয়কুমার রায়, অনঙ্গমোহন চক্রবর্তী, অন্নদাচরণ বর্ধন, উপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি।

২ কলিকাতায় রচিত 'তোরা শুনিস্ নি কি', ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭। গীতাঞ্জলি ৬২।

৩ তিনধরিয়া, ৭-২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭। গীতাঞ্জলি ৬৩-৭৪।

৪ কলিকাতা ২৪-২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭। গীতাঞ্জলি ৭৫-৭৯।

বিদ্যালয় খুলিতে এখনো প্রায় পনেরো দিন বাকি, কবি আশ্রমে চলিয়া আসিলেন (২৮ জ্যৈষ্ঠ[১], শান্তিনিকেতনের দ্বিতলেই আছেন, গানের ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে ভাসিয়া আসিতেছে, মন আনন্দ-বিষাদে ভরপুর। বিদ্যালয় খুলিল ১০ আষাঢ়। সেইদিন রাত্রে আশ্রমে সন্তোষচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা সরোজচন্দ্র[১] (ভোলা) অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে মারা গেল। শ্রীমানের বয়স তখন মাত্র পনেরো বৎসর; শমীন্দ্রের সে আবাল্যের বন্ধু ছিল। এই ঘটনাটি আশ্রমে ছাত্র-অধ্যাপকগণের মনের উপর গভীর বিষাদরেখা টানিয়া দেয়; কবিরও আঘাত কিছু কম লাগে নাই, কিন্তু কোনো প্রকাশ পায় নাই। পরদিন লিখিলেন— 'আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে' কবিতাটি।[২]

বিদ্যালয়ে এখন ছাত্রসংখ্যা অনেক; নূতন ছাত্রাবাস 'বীথিকা' (শালতলার দক্ষিণে ঐ গৃহের ভিত্তি দেখা যায়) গ্রীষ্মের ছুটিতে নির্মিত হইয়াছিল। শিশুবিভাগের ছেলেরা থাকে 'নূতন বাড়ি'তে, 'দেহলি'তে মেয়েরা। গ্রীষ্মের ছুটির পূর্বে বালিকাবিভাগের কর্ত্রী সুশীলা সেনকে (মোহিতচন্দ্রের স্ত্রী) ঐ কর্ম হইতে মুক্তি দান করা হয়। তাঁহার স্থানে আসিলেন লেখকের জননী গিরিবালা দেবী (১০ আষাঢ় ১৩১৭)।[৩]

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয় খুলিবার পর যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া শিলাইদহ চলিলেন (২১ আষাঢ়)। সেখানে পৌঁছিয়া এক পত্রে লিখিতেছেন, "ইচ্ছা করে অনেকদিন ধরে···এখানে শান্তি ও নির্মলতার মধ্যে আবিষ্ট হয়ে কাটিয়ে দিয়ে যাই। কিন্তু যিনি প্রভু তিনি ছুটি না দিলে কিছুই হবে না— তিনি এখনো আমার হাতে কাজ রেখে দিয়েছেন।"[৪]

কিন্তু 'অনেক দিন ধরে' থাকা তো হইলই না, এমনকি শান্তভাবেও না। যে সাত দিন ছিলেন— সমানে নৌকাযোগে গোরাই নদী ও পদ্মার শাখা-প্রশাখা দিয়া জানিপুর কয়া প্রভৃতি নানাস্থানে ঘুরিতে হইল; কারণ বিষয়সম্পত্তি দেখা চাই— রথীন্দ্রনাথকে সব বুঝাইয়া দিতে হইবে; তাঁহার আশা, রথীন্দ্রনাথ শিলাইদহে আদর্শ জমিদার ও আদর্শ কৃষকের জীবন যাপন করিবেন। কিন্তু যতই ঘোরাঘুরি করুন মনটা দেবতার চরণে— একটি করিয়া গীতের অঞ্জলি দৈনিক নিবেদন করিতেছেন।[৫]

আষাঢ়ের শেষদিকে কলিকাতা[৬] হইয়া আশ্রমে ফিরিলেন ও এবার প্রায় তিন সপ্তাহ তথায় থাকিলেন। প্রায় প্রতিদিন একটি করিয়া গান লিখিতেছেন— এ যেন তাঁহার প্রতি প্রাতের উপাসনার অর্ঘ্য।

কবি যখন আশ্রমে থাকেন তখন তথাকার নানা কাজের মধ্যে জড়াইয়া পড়েন। একটি সামান্য ঘটনার

১ সরোজ-স্মৃতি। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম হইতে প্রকাশিত। ১৩১৮, আশ্বিন ১২। সন্তোষচন্দ্র মজুমদার এই গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যয় বহন করেন। ইহাতে ১৩১৮, আষাঢ় ১০ই মৃত্যুবার্ষিকীতে যে প্রবন্ধ পঠিত হয় তাহাই গ্রন্থের ভূমিকা। সরোজচন্দ্রের রচিত গদ্য ও পদ্য কয়েকটি পড়িলে বালকের অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

২ ১১ আষাঢ়। গীতাঞ্জলি ১০০। ভারতী ১৩১৭ শ্রাবণ, পৃ ৩৪৫ 'বরষা'।

৩ ১৩১৭ সালের গোড়ায় আশ্রমে যাঁহারা অধ্যাপক ও কর্মী ছিলেন: জগদানন্দ রায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ আইচ, অজিতকুমার চক্রবর্তী, বিধুশেখর ভট্টাচার্য, ক্ষিতিমোহন সেন, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সত্যেশ্বর নাগ, শ্রীশচন্দ্র রায়, বঙ্কিমচন্দ্র রায়, কালিদাস বসু, শরৎকুমার রায়, তেজেশচন্দ্র সেন, হিমাংশুপ্রকাশ রায়, সুশীলা সেন, ওঁকারানন্দ (ড্রয়িং শিক্ষক), ভূপেন্দ্রনাথ সেন। বীরেশ্বর নাগ, হরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—দপ্তরখানা। চিকিৎসা বিভাগ— হরিচরণ মুখোপাধ্যায় (বোলপুরের ডাক্তার), সেবক— অক্ষয়কুমার রায়, অন্নদাচরণ বর্ধন, অনঙ্গমোহন চক্রবর্তী। শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের কর্মচারী: উপাসক—পরশুরাম পণ্ডিত (অচ্যুত-রাম পণ্ডিতের পুত্র)। মন্দিরের গায়ক— শ্যামশরণ ভট্টাচার্য, রসিক দাস, গৌর দাস। ১৩১৭ সালের ছুটির পর শ্রীশচন্দ্র রায় আর আসেন নাই; তাঁহার স্থলে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করা হয়।

৪ চিঠিপত্র ৩। ১নং পৃ ১-২, ২৩ আষাঢ় ১৩১৭।

৫ শিলাইদহ, আষাঢ় ২২-২৯। গীতাঞ্জলি ১১০-১২২।

৬ কলিকাতা, আষাঢ় ৩১ - শ্রাবণ ১। গীতাঞ্জলি ১২৩-১২৫।

উল্লেখ করিব। মেয়ে বোর্ডিং-এর ছাত্রীদের লইয়া 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র অভিনয়ের ব্যবস্থা হইল। এই নাটিকার সমস্ত ভূমিকাই মেয়েদের।[১] শান্তিনিকেতনের দ্বিতলে অভিনয় হইল— অভিনেত্রীরাই শুধু মেয়ে নয়, দর্শক পর্যন্ত মেয়েরা; অর্থাৎ কোনো পুরুষ অধ্যাপক এমনকি ছাত্রদের সেখানে যাইতে দেওয়া হয় নাই। তখন আশ্রমে মেয়েদের পর্দা মানিয়া চলাফেরা করিতে হইত; যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন ঘুরিবার অনুমতি ছিল না। পৌষ-উৎসবের সময় বধূরা ও ছাত্রীরা মেলায় যাইতে পাইত না; সন্ধ্যার পর বাজিপোড়ানো দেখাইবার জন্য তাহাদিগকে একটা কাঠের প্রকাণ্ড গাড়ির মধ্যে ভরিয়া ছেলেরা ও অধ্যাপকরা টানিয়া মন্দিরের নিকট মেলার এক কোণে দাঁড় করাইয়া দিত— তাহার ভিতর হইতে যে-যেমন দেখিতে পাইল! 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অভিনয় মেয়েদের দ্বারা আশ্রমে প্রথম অভিনয় বলিয়া ঘটনাটি স্মরণীয়; আর সে-যুগ হইতে আধুনিক যুগের আশ্রমের নারীদের কী পরিবর্তন হইয়াছে তাহাই দেখাইবার জন্য এই ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বলিলাম।

'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র পর কবি কলিকাতায় যান, গীতাঞ্জলির শেষ কয়টি গান[২] সেখানে রচিত। ৩১ শ্রাবণ গীতাঞ্জলি ছাপাইয়া দিয়া কবি পুনরায় উত্তরবঙ্গে রওনা হইলেন। এবার যান পতিসরে। পতিসর হইতে (৭ ভাদ্র) কবি নূতন বধূমাতাকে একখানি যে পত্র লেখেন, তাহাতে কবির অন্তর্বেদনা মূর্ত হইয়াছে। "আমরা কাল রাত্রে পতিসর পৌঁচেছি।...আমি যে ঠিক কাজের তাগিদে এসেছি সে কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। লোকজনের মধ্যে যখন জড়িয়ে থাকি তখন ছোটো বড়ো নানা বন্ধন চারিদিকে ফাঁস লাগায়— নানা আবর্জনা জমে ওঠে— দৃষ্টি আবৃত এবং বোধশক্তি অসাড় হয়ে পড়ে— তখন কোথাও পালিয়ে যাবার জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।"[৩] ...দিন সাত-আট রথীন্দ্রনাথের সহিত জমিদারিতে ঘুরিয়া কলিকাতা ফিরিলেন। সেখানে আসিয়া 'অহরহ এমন জনতার মধ্যে' থাকেন 'যে কোনো কাজ' করা তাঁহার 'পক্ষে একেবারে অসম্ভব'—স্মৃতি পৃ ৭৯। তাই চলিলেন বোলপুর (১৩ ভাদ্র)।

কবি যখন আশ্রমে থাকেন তখন নিয়মিত মন্দিরে বুধবার দিন উপাসনা করেন। এইসব ভাষণের কোনো-কোনোটির মধ্যে কবির সহিত আশ্রমবাসী ছাত্র-অধ্যাপকের যে ব্যক্তিগত যোগ ছিল— তাহার চিহ্ন আছে। এই শ্রেণীর ভাষণ হইতেছে 'পূর্ণ'[৪] 'মাতৃশ্রাদ্ধ'[৫]।

গীতাঞ্জলি যে একটি তুরীয়তার মধ্যে বাস করিয়া রচিত হয় নাই, তাহা যে দৈনিক জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত, তুচ্ছ কথা ও কাজের ফাঁকে ফাঁকে, অফুরন্ত চলাফেরার মাঝে মাঝে লেখা— সেইটি স্পষ্ট করিয়া দিবার জন্য আমরা কবির ঘোরাঘুরির ইতিহাস এত করিয়া বলিলাম। কবি আধ্যাত্মিক অবিচ্ছন্নতার মধ্যে গানগুলিকে পান নাই— তাহাই আমাদের বলিবার কথা। এই সঙ্গে নৈবেদ্য রচনার কথাও স্মরণ করাইয়া দিতেছি। জীবনকে বাদ দিয়া, জীবননাথের সঙ্গসুখের প্রয়াসী তিনি ছিলেন না। 'সবার মাঝারে' তাহাকে স্বীকার করাই ছিল তাঁহার সাধনা।

১ নূতন বধূমাতা 'ক্ষীরো'র অংশ গ্রহণ করিলেন। ছাত্রীদের মধ্যে হেমলতা (টুলু) 'রানী কল্যাণী', ইন্দু 'লক্ষ্মী', প্রতিভা 'মালতী', লেখকের দুই ভগ্নী 'কিনিবিনি'দের দলে।

২ শান্তিনিকেতন, ১৩১৭ শ্রাবণ ২-২৫। গীতাঞ্জলি ১২৬-১৫১। রেলপথে (২৫শে শ্রাবণ) ১৫২-১৫৪, কলিকাতায় (২৬-২৯ শ্রাবণ) ১৫৬-১৫৭। ৩রা শ্রাবণ লেখেন 'কমন করে এমন বাধা ক্ষয় হবে'। দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ১১, পৃ ২৯৭; গীতাঞ্জলি, সংযোজন।

৩ চিঠিপত্র ৩, নং ২, পৃ ৩।

৪ পূর্ণ। ১১ শ্রাবণ ১৩১৭ (২৭ জুলাই ১৯১০) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের অষ্টাদশ জন্মদিনে (জ-১৮৯২) কথিত। দ্র প্রবাসী ১৩১৭ আশ্বিন, পৃ ৫৭৮-৫৮১। শান্তিনিকেতন ১২।—রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫। পৃ ৪৮১-৪৮৬

৫ মাতৃশ্রাদ্ধ। ১৮ ভাদ্র ১৩১৭। আশ্রমের ছাত্র হীতেন্দ্র হীরেন্দ্র নরেন্দ্র ও মণীন্দ্র নাথ নন্দীর মাতা, মথুরানাথ নন্দীর পত্নী যোগমায়া দেবীর তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মন্দিরে কথিত। দ্র প্রবাসী ১৩১৭ কার্তিক। পৃ ১-৪। শান্তিনিকেতন ১২। রবীন্দ্র-রচনাবলী, পৃ ৪৮৬-৪৯১।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন কবির শরীর অর্শরোগে মাঝে মাঝে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে। তাহার উপর তাঁহার রচনা লইয়া যখন সমসাময়িক পত্রিকাদির আক্রমণ চলে— তখন স্পর্শকাতর কবিচিত্ত যেন ভাঙিয়া পড়ে, তাহা সাময়িক হইলেও তীব্রতায় সামান্য নহে। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় পত্রিকার মধ্যে অগ্রণী ছিল 'সাহিত্য', যশস্বী লেখকদের মধ্যে ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।[১]

সাহিত্য পত্রিকার সমালোচনার নমুনা আমরা উদ্ধৃত করিলাম : "শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'অপমান'[২] নামক কবিতায় আপনার প্রতিভারই অপমান করিয়াছেন।…'মাতৃ-অভিষেক' নামক কবিতার ছন্দে কবির 'মানসী' ও 'সোনার তরী'র মন্দ্রধ্বনি মনে পড়ে। কিন্তু 'মাতৃ-অভিষেক'[৩] কবিতা নহে, ছন্দে গ্রথিত বক্তৃতা। 'পোহায় রজনী জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে'—সুকল্পনা নহে। 'এই ভারতের মহাসাগরের তীরে'র নীড়ে অর্থাৎ পাখির বাসায় জননী জাগিতেছেন, এই খঞ্জকল্পনা রবীন্দ্রনাথের যোগ্য নহে।" আরেকটি নমুনা : "প্রথমেই শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনটি কবিতা — ত্র্যহস্পর্শ[৪]। স্বাক্ষর দেখিয়া বুঝিলাম, রবীন্দ্রনাথের রচনা। নতুবা বিশ্বাস করিতাম না। ইহাতে কবিবরের প্রতিভার পরিচয় নাই। ধর্মোপদেশ আছে, কবিত্ব নাই। শিক্ষানবীশ ও রবীন্দ্রনাথের অনুকারীদের রচনাতেও এত অক্ষমতা দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রতিষ্ঠাপন্ন কবি এই অপচারগুলি সাধারণের দ্বারে নিক্ষেপ করিতেছেন কেন, তাহা কে বলিবে? জগতে কিছুই অবিনশ্বর নহে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাও অবশেষে ব্রহ্মসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া 'নির্বাণ' লাভ করিল। 'রাখো রে ধ্যান, থাক্ রে ফুলের ডালি, ছিঁড়ুক্ বস্ত্র, লাগুক্ ধুলাবালি, কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে (সাধনা)।' রবীন্দ্রনাথ ইহা মুদ্রিত করিতে লজ্জিত হন নাই, কিমাশ্চর্য-মতঃপরম্। কর্মযোগে ঘর্ম ঝরিয়া পড়িবে কিনা, বলিতে পারি না; কিন্তু কবিতাত্রয়ের শ্রীঅঙ্গ কবিবরের ললাটের ঘর্মে সিক্ত হইয়াছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দেখিতেছি না। এতদিন ঘাম হইতে 'ঘামচি'র সৃষ্টি হইতেছিল; কিন্তু রবীন্দ্রবাবু 'কর্মযোগের ঘর্ম' কবিতায় পরিণত হইতেছে। রবীন্দ্রবাবু যদি গদ্যে 'আধ্যাত্মিকতা'র প্রচার করেন, তাহা হইলে তাঁহার কবিকীর্তিকে এত ক্ষতবিক্ষত হইতে হয় না।"[৬]

এইসব সমালোচনায় কাতর হইয়া কবি চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে[৫] (২৯ ভাদ্র ১৩১৭) লিখিতেছেন—"আমার লেখা সম্বন্ধে কিছু না লিখলেই ভাল করতে। প্রবাসীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, এই কারণে প্রবাসীতে আমার কাব্যের গুণগান ঠিক সুশ্রাব্য হবে না। সেজন্যেও না— আসল কথা, অনেক দিন ধ'রে লিখে আস্‌ছি, বয়সও কম হয়নি—আর অল্পকাল অপেক্ষা করলেই আমার রচনার সমালোচনার দিন উপস্থিত হবে— আমি যখন রঙ্গমঞ্চ থেকে একেবারে আলো নিবিয়ে স'রে যাব তখন সকলপ্রকার ব্যক্তিগত রাগদ্বেষের বাইরে গিয়ে

১ সাহিত্য ২১শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা ১৩১৭ ভাদ্র, পৃ ৩৪৪

২ অপমান, 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' [২০ আষাঢ় ১৩১৭]—প্রবাসী ১৩১৭ শ্রাবণ, পৃ ৩৭৩।
—গীতাঞ্জলি ১০৮। এই দিনের কাদম্বরী দেবীকে লিখিত পত্র দ্রষ্টব্য, প্রবাসী ১৩৩৪ পৌষ, পৃ ৯৯৩-৯৯৫।

৩ মাতৃ-অভিষেক—'হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে' (১৮ আষাঢ়)—প্রবাসী ১৩১৭ শ্রাবণ, পৃ. ৪০৭। গীতাঞ্জলি ১০৬।

৪ ত্র্যহস্পর্শ। প্রবাসী ১৩১৭ ভাদ্র মাসে কবির ৩টি কবিতা, পৃ ৪০৯-১০
প্রণতি—'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন' (১৯ আষাঢ়) গীতাঞ্জলি ১০৭।
সাধনা—'ভজন পূজন সাধন আরাধনা' (২৭ আষাঢ়) গীতাঞ্জলি ১১৯।
রাজবেশ—'রাজার মতো বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে' (২ শ্রাবণ ১৩১৭)—গীতাঞ্জলি ১২৭।

৫ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বহুকাল ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের ম্যানেজার ছিলেন। সম্প্রতি ঐ কাজ ছাড়িয়া প্রবাসী পত্রিকার সহসম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। পত্র ২৯ ভাদ্র ১৩১৭। দ্র প্রবাসী ১৩৩২ কার্তিক। পৃ ২-৩।

৬ সাহিত্য ১৩১৩ আশ্বিন, পৃ ৪০১

পড়ব— তখন আমাকে যথাসম্ভব বাদ দিয়ে আমার লেখাগুলোকে বিচার করতে পারবে। তোমরা যদি আমার লেখার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা কর তবে একদল লোককে আঘাত দেবে— অথচ সে আঘাত দেবার কোনো দরকার নেই, কেননা আমার কবিতা তো রয়েইছে— যদি ভালো হয় তো ভালোই, যদি ভালো না হয় তো ও-আবর্জনা দূর করবার জন্যে ঢোলাই খরচা লাগবে না · আপনি নিঃশব্দে সরে যাবে। তোমরা আমার লেখা ভালো বললে আমার ভালো লাগে না এমন কথা বল্‌লে মিথ্যা বলা হয়— প্রশংসা শুনলে মনের ভিতরটা বেশ একটু নেচে ওঠে, সেই জন্যেই নেশাটাকে প্রশ্রয় দিতে কোনোমতে ইচ্ছা হয় না— কারণ, ঐ জিনিসটার মধ্যে অনেকটা আছে যা মিথ্যা —অর্থাৎ সত্যকে জানবার ইচ্ছা নয়, নিজের প্রশংসাবাদ শোনবার ইচ্ছা— সেই ইচ্ছা এ-সম্বন্ধে মিথ্যাকেও কামনা করে, অত্যুক্তিকে ভালোবাসে— নিজের নাম-নামক জিনিস এমনি একটা বিশ্রী জিনিস। যখন আমার নিজের নাম আর আমার নিজের কানে পৌঁছবে না তখন তোমরা সেটাকে বর্জ্জয়িসেই হোক্ আর ইংলিশ অক্ষরেই হোক ছাপিয়ো —ওটাকে ঢাকা দিয়ে আড়াল করে রাখ, যথাসম্ভব ওটাকে ভুলতে দাও, ঐটেকে সর্ব্বদা নাড়া দিয়ে চতুর্দ্দিকে বিদ্বেষের বিষ মথিত করে তুলো না। কাল থেকে জ্বরে পড়েছি।"

কবির এই পরাজয়ের মনোভাব ক্ষণস্থায়ী, মনের বেদনাকে ভাষায় লিখিয়া ফেলিতে পারিলে তাহা হইতে মুক্তি পান—তাহা পত্রই হউক, কবিতাই হউক, বা অভিনয় হউক—expression দিতে পারিলেই মনের মুক্তি।

পূজার ছুটির পূর্বে আশ্রমে ছাত্র-অধ্যাপক মিলিয়া পুনরায় 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের অভিনয় করিবে, রবীন্দ্রনাথ ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায় নামিবেন। চারুচন্দ্রকে পত্র লিখিবার তিন দিন পরে রামেন্দ্রসুন্দরকে যে পত্র লিখিতেছেন তাহার মধ্যে বিষাদের বা হতাশের কোনো সুর নাই, সম্পূর্ণ নূতন জগতে গিয়া পড়িয়াছেন। তিনি আশ্রমের ছাত্রদের সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "আমার এইসব ছেলেদের কাছে আমি অত্যন্ত দুর্ব্বল, এরা আমার সংসারপক্ষের ছেলে নয়, দ্বিতীয়পক্ষের ছেলে— এইজন্যে এদের জোর বেশি, এরা চেপে ধরলে আমার পথ বন্ধ।"[১] অভিনয়ের দিন কাছে আসিয়াছে, অথচ হইয়া উঠিতেছে না। একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "সুস্থ হবে কি করে? দিন রাত নানা লোকের সঙ্গে আলাপ করতেই দিন কেটে যায়। কলকাতা থেকে লোক এখান পর্য্যন্ত এসে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌চে।"[২] ১৭ আশ্বিন অভিনয় হইবার পর পূজাবকাশের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ হইল (৪ অক্টোবর ১৯১০)।[৩]

এই বৎসরের (১৩১৭) গোড়া হইতে কবি শান্তিনিকেতনের শিক্ষকদের দ্বারা 'প্রবাসী'র জন্য সংকলন করাইতে প্রবৃত্ত হন। কবি চিরদিনই বিদেশী ইংরেজি পত্রিকা প্রচুর পরিমাণে পড়িতেন; এইসব পত্রিকা হইতে ভালো ভালো রচনা বাংলায় তর্জমা বা ভাবানুবাদ করিবার জন্য শিক্ষকদের দিতেন। সমস্ত লেখাই কবি প্রবাসীতে পাঠাইবার পূর্বে স্বয়ং সংশোধন করিয়া দিতেন, এবং কোনো কোনো অনুবাদ সন্তোষজনক না হইলে কাটিয়া পাশে লিখিয়া দিতেন; অনুবাদক একটি আদর্শ পাইত। কবি জীবনী-লেখকের ন্যায় তরুণগণকেও অগ্রাহ্য করিতেন না।

পূজাবকাশের পূর্বে বিদ্যালয়ের মধ্যে কিছু অদলবদল হইল। ভাদ্র মাসে অজিতকুমার ম্যান্‌চেস্টার বৃত্তি পাইয়া অক্সফোর্ড যাত্রা করিলেন। তাঁহার স্থানে আসিলেন নেপালচন্দ্র রায় (১৯১০ আষাঢ়); ইনি এলাহাবাদ কায়স্থ কলেজের

১ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখিত পত্র, ৩২ নং, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭। দ্র বঙ্গবাণী ১৩৪৪ আষাঢ়, পৃ ৫৯৯।

২ চিঠিপত্র ৬, পৃ ৬।

৩ শ্রাবণের শেষে গীতাঞ্জলি ছাপাখানায় যায়। আশ্বিন মাসে শান্তিনিকেতনে বাসকালে কবি তিনটি গান লেখেন, সেগুলি ঐ কাব্যখণ্ডের অন্তর্গত না হইলেও এই বর্গেরই গান। ১. জাগো নির্মল নেত্রে (৪ আশ্বিন) ২. প্রভু আমার, প্রিয় আমার (৫ আশ্বিন) ৩. তব গানের সুরে হৃদয় (১৯ আশ্বিন ১৩১৭)—দ্র সংযোজন রবীন্দ্র-রচনাবলী ১১, পৃ ২৯৭-৯৯।

শিক্ষক, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ পরিচিত। এলাহাবাদে তাঁহার রাজনৈতিক মতামত ও কর্মাদির জন্য যুক্তপ্রদেশের শিক্ষাবিভাগ ও সরকার তাঁহাকে নানাভাবে নির্যাতন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রৌঢ় বয়সে আইন পরীক্ষা পাস করিয়া তিনি মনস্থ করেন যে কলিকাতায় প্র্যাকটিস করিবেন ও রাজনীতি করিবেন। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরোধে আগত ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীদের তরাইবার জন্য তিনি আসেন; কথা ছিল পরীক্ষাদির ব্যবস্থা হইয়া গেলে তিনি চলিয়া যাইবেন। কিন্তু সেই-যে আসিলেন, আর আশ্রম ত্যাগ করিতে পারিলেন না— সেখানকার আদর্শের সহিত, কর্মের সহিত অচ্ছেদ্যবন্ধনে যুক্ত হইয়া পড়িলেন। বিশ্বভারতীর কল্যাণকর্মে তাঁহার দানের কথা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।[১]

পূজার ছুটির সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে বোর্ডিং বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ১৩১৫ সালের পূজাবকাশের পর হইতে ১৩১৭ সালের পূজাবকাশের পূর্ব পর্যন্ত দুই বৎসর উহা চলে। বিদ্যালয়ে সহশিক্ষা পরিচালনা করিতে হইলে, প্রারম্ভ হইতে যে প্রকার কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতার প্রয়োজন এবং সমভাবে যাহা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রছাত্রীদের উপর প্রয়োগ করা উচিত ছিল, তাহা কবির অভিজ্ঞতার অভাবে এবং উপযুক্ত কর্ত্রী নিযুক্ত না হওয়ার জন্য যথাসময়ে প্রযুক্ত হয় নাই। ফলে এমনসব সমস্যা দেখা দিয়াছিল, যাহা তৎকালীন সমাজ-আদর্শের পক্ষে সকলের পক্ষেই হানিকর বলিয়া মনে হইল। এইসব বিবেচনা করিয়া ঐ বিভাগ উঠাইয়া দেওয়া হইল। ইহার নয় বৎসর পর বিশ্বভারতীর প্রথম পর্বে শান্তিনিকেতনে পুনরায় বালিকা-বিভাগ খোলা হইয়াছিল। যথাস্থানে সে আলোচনা উত্থাপন করা হইবে।

মনীষী ও কবি-রবীন্দ্রনাথকে জানা ছাড়া মানুষ-রবীন্দ্রনাথকে জানিবার ব্যক্তিগত যে সুযোগ হয়, তাহার উল্লেখ না করিলে কবিচরিত অসম্পূর্ণ থাকিবে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি লেখকের মাতা আষাঢ় মাস হইতে বালিকা-বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়া 'দেহলি'তে থাকিতেন। তিনি মাঝে মাঝে কবির সহিত শান্তিনিকেতনে দেখা করিতে যাইতেন। একদিন তথায় গিয়া হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন; কবি তাঁহাকে নিজ বাসায় হাঁটিয়া আসিতে দিলেন না; এবং দুই দিন শান্তিনিকেতনে রাখিয়া রাত্রি জাগিয়া চিকিৎসা করেন।[২] বহু বৎসর পরে, জননী যখন মারাত্মক ব্যাধিতে শয্যাশায়ী, তখন কবি প্রায় প্রতিদিন গুরুপল্লীর বাড়িতে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যাইতেন। কবিচরিত্রের এই দিকটা খুবই অজ্ঞাত।

গীতাঞ্জলি

গীতাঞ্জলি ১৩১৭ সালের পূজার পূর্বে প্রকাশিত হইল (১৯১০ সেপ্টেম্বর)। এই কাব্যে মোট ১৫৭টি গান ও কবিতা আছে; ইহার মধ্যে প্রথম ২০টি গান ইতিপূর্বে 'শারদোৎসবে' (১৯০৮) ও 'গানে' (১৯০৯) মুদ্রিত হয়। এই সম্বন্ধে গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে কবি লিখিয়াছেন, "অল্প সময়ের ব্যবধানে যে-সমস্ত গান পরে পরে রচিত হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি ভাবের ঐক্য থাকা সম্ভবপর মনে করিয়া তাহাদের সকলগুলিই এই পুস্তকে বাহির করা হইল।"— ৩১ শ্রাবণ ১৩১৭। সুতরাং যথার্থ গীতাঞ্জলির পর্ব হইতেছে ১৩১৬ সালের ১০ই ভাদ্র (জানি জানি কোন্ আদিকাল) হইতে ১৩১৭ সালের ২৯শে শ্রাবণ পর্যন্ত। এই সাড়ে দশ মাসের মধ্যে ১৩৭টি কবিতা ও গান রচিত হয় কিন্তু যথার্থ রচনার দিন হইতেছে ৯০ দিন। গীতাঞ্জলির সবগুলি গান নহে, মাত্র ৫৬টিতে সুর-দেওয়া ও অবশিষ্ট

১ দ্র শান্তা দেবী, 'রামানন্দ ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা', পৃ ১০৯।

২ "প্রভাতের মার শরীর বড়ই খারাপ। তিনি শান্তিনিকেতনেই আছেন। তাঁকে নিয়ে দু তিন রাত জাগ্রত হয়েছে।"—চিঠিপত্র ৩, পৃ ৭।

৮১টি কবিতা অথবা সুর-না-দেওয়া গান। কিন্তু এই কালটিকেও আমরা দুইটি পর্বে ভাগ করিতে চাহি; প্রথমটি হইতেছে ১০ই ভাদ্র হইতে ফাল্গুন (১৩১৬) মাস পর্যন্ত পর্ব— এই সাত মাসের মধ্যে মাত্র ৩৪টি গান রচিত হয় (গীতাঞ্জলি ২১-৫৪), রচনা-দিনের সংখ্যা মাত্র ২৩। দ্বিতীয় পর্ব হইতেছে ২৬ চৈত্র (১৩১৬) হইতে ২৯ শ্রাবণ (১৩১৭)— এই চারি মাসের মধ্যে ৬৮টি দিনে ১০৩টি কবিতা লেখা হয়। কবিতাগুলি এক-একবার এক-এক গুচ্ছে যে আবির্ভূত হইয়াছে উহাই পাঠকদের দৃষ্টিগত করিবার জন্য এই বিস্তৃত বিশ্লেষণ।[১] এই এক বৎসর কবির জীবন কী কর্মকোলাহলে ও সংগ্রামের মধ্যে গিয়াছে তাহার কথা তো পূর্ব পরিচ্ছেদেই বিবৃত হইয়াছে।

গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হইলে সাময়িক সাহিত্যে যে উহা কিছু অভাবনীয় সম্বর্ধনা লাভ করিয়াছিল তাহা নহে; কবিতা বিশেষের যে তীব্র সমালোচনা হয় তাহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এদেশে গীতাঞ্জলির যথার্থ সমাদর শুরু হয় ১৯১২।১৩ সালের হইতে — ইংরেজি গীতাঞ্জলি বিলাতে আদৃত হইবার পরে।

গীতাঞ্জলি পর্বের গোড়ার গানগুলি বর্ষাসংগীত। কিন্তু এই বর্ষাসংগীতের সুরে কেবল বর্ষণের ঝংকার নাই, বর্ষণের অন্তরালে যিনি আছেন তাঁহারই নূপুরনিক্কণ শোনা যায়, সৌন্দর্যের অন্তরালে সুন্দরকে যেন দেখা যায়। এতাবৎকাল কবি ধর্মসম্প্রদায়ের প্রয়োজনে ও প্রেরণায় ঈশ্বরবিষয়ক অসংখ্য গান রচিয়াছেন, প্রকৃতির অর্চনা নানা সুরে ও ছন্দে গাঁথিয়াছেন; এই উভয়শ্রেণীর গীতধারা হইতে কবির এই নবগীত-ধারার সুর স্পষ্টতই পৃথক, তাহা স্বল্প প্রণিধানেই রসজ্ঞ পাঠক বুঝিবেন।

এই গীতধারায় দেবতা ও প্রকৃতি এবং তাহার সঙ্গে মানব অচ্ছেদ্যবন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছে— সৌন্দর্য ও সুন্দর একাঙ্গীভূত অদ্বৈত হইয়াছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে কবির যথার্থ আধ্যাত্মিক সংগীতে (spiritual as opposed to religious) সূত্রপাত এই গীতাঞ্জলির পর্ব হইতে। সুতরাং এগুলিকে ব্রহ্মসংগীত বলা ভুল হইবে। রবীন্দ্রনাথের এই নূতন গীতধারা আলোচনাকালে আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে তিনি মুখ্যত স্বভাব-কবি, প্রকৃতির সৌন্দর্য সম্ভোগ তাঁহার আবাল্যের সংস্কার। ঈশ্বরকে অবিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া জীবনশিল্পী কবির স্বভাব হইতে পারে না। তাই গীতাঞ্জলিপ্রমুখ কাব্যে ঈশ্বর ও প্রকৃতি এমন আশ্চর্যরূপে ওতঃপ্রোতভাবে মিলিত, প্রিয়তমের বিরহ-বেদনা ছন্দে ও সুরে মুখর। সেইজন্য এখনকার গানে ঈশ্বর মুখ্য ও প্রকৃতি গৌণ; কিন্তু কবির জীবন যতই গভীরে প্রবেশ করিল, প্রকাশের ভাষা ততই রূপকে, সুরে, ছন্দে, রহস্যে ভরিয়া উঠিল; ক্রমে ঈশ্বর ও প্রকৃতির মধ্যে মুখ্য-গৌণ ভেদ ঘুচিয়া গিয়া অখণ্ড রসবোধে সমস্ত চিত্ত প্লাবিয়া একাকার হইয়াছিল। সাধারণ প্যঠকের কাছে মনে হইবে যে কবির পরযুগের কাব্যে ঈশ্বরের কথা স্পষ্ট নহে, সৌন্দর্যবোধ-স্পৃহা যেন সমস্ত দেহ মনকে আবিষ্ট

১ গীতাঞ্জলির ১ হইতে ২০ সংখ্যক গান ইতিপূর্বে শারদোৎসব ও গানে মুদ্রিত হইয়াছিল, সুতরাং সেগুলিকে আমরা এই বিশ্লেষণ হইতে বাদ দিলাম—

সংখ্যা	স্থান	পর্ব	রচনার দিন	সংখ্যা	স্থান	পর্ব	রচনার দিন
২১-৩৮=১৮	বোলপুর	১০ ভাদ্র-১৮ ভাদ্র ১৩১৬	৯	৫৫-৬১=৭	বোলপুর	২৬ চৈত্র-১২ বৈশাখ ১৩.৭	৬
৩৯-৪০=২	কলিকাতা	২৭ ভাদ্র-১ আশ্বিন	২	৬২=১	কলিকাতা	৩ জ্যৈষ্ঠ	১
৪১-৪৪=৪	শিলাইদহ	১৯-৩০ আশ্বিন	৪	৬৩-৭৪=১২	তিনধরিয়া	৭-২১ জ্যৈষ্ঠ	৭
৪৫=১	বোলপুর	২০ অগ্রহায়ণ	১	৭৫-৭৯=৫	কলিকাতা	২৪-২৮ জ্যৈষ্ঠ	৪
৪৬-৫১=৬	বোলপুর	১৫-১৭ পৌষ	৫	৮০-১১০=৩১	বোলপুর	২৯ জ্যৈষ্ঠ-২১ আষাঢ়	২০
৫৩-৫৪=২		মাঘ-ফাল্গুন	৩	১১১-১২২=১২	শিলাইদহ	২২-২৯ আষাঢ়	৬
				১২৩-১২৫=৩	কলিকাতা	৩১ আষাঢ়-১ শ্রাবণ	৩
মোট ৩৪টি			মোট ২৪ দিন	১২৬-১৫৫=৩০	বোলপুর	২-২৫ শ্রাবণ	১৯
				১৫৬-১৫৭=২	কলিকাতা	২৬-২৯ শ্রাবণ	২
				মোট ১০৩টি			মোট ৬৮ দিন

মধ্য রেখার বামদিকে ২১-৫৪ সংখ্যক কবিতা অর্থাৎ ৩৪টি লিখিত হয় প্রায় ৭ মাসের মধ্যে, কিন্তু রচনার দিন মাত্র ২৪। অবশিষ্ট ৫৫-১৫৭ সংখ্যক অর্থাৎ ১০৩টি লেখা হয়। ৪ মাসের মধ্যে (১২৮ দিন) রচনার দিন হইতেছে ৬৮।

করিয়াছে। পরবর্তীযুগের কাব্য ও কথাসাহিত্য সম্বন্ধে একশ্রেণীর সমালোচকের অভিযোগ এই যে, কবির রচনার ধারা ক্রমশই অধ্যাত্মলোক হইতে প্রকৃতিলোক বা অতীন্দ্রিয়লোক হইতে ইন্দ্রিয়লোকে নামিয়া পড়িয়াছিল; এবং তিনি জীবনকে শেষ পর্যন্ত আর্টরূপে সম্ভোগ করিয়াছিলেন—প্রকৃতিই ক্রমশ গীতে ও কাব্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। অভিযোগকারীদের ধারণা যে কবির আধ্যাত্মিক অনুভূতি পূর্বের ন্যায় তীব্র ও আন্তরিক ছিল না। আমাদের মতে এই অভিযোগ একদেশদর্শী; কারণ, রবীন্দ্রনাথ কবি ও তাঁহার কবিধর্মে তিনি প্রকৃতির পূজারী। শান্তিনিকেতন উপদেশমালায় কবি যাহাকে ব্যাখ্যান করিয়াছিলেন বাক্যে, গীতাঞ্জলিতে তাহাকে পাইলেন সুরে। জীবনের আরম্ভে কবি-রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৌন্দর্যের পূজারী, জীবনের অন্তিমে সাধক-রবীন্দ্রনাথ সুন্দরের উপাসক। এই দুই অনুভূতি বিভিন্ন গুণধর্মী — একটি অজ্ঞানের পাওয়া, অপরটি রসের উপলব্ধি; আজ যাহাকে সুরে ও ছন্দে পাইতেছেন, তাহা রসের ধর্ম বুদ্ধির ধর্ম নহে। সেইজন্য আমরা কবির শেষ দিককার গান বা কবিতাকে কেবলমাত্র সৌন্দর্য-সম্ভোগী আর্টিস্টের সৃষ্টি বলিয়া বিচার করিতে পারি না— উহারা কবির পরিপূর্ণ দৃষ্টিলব্ধ, অশেষ সৌন্দর্যমণ্ডিত তুলনাহীন সৃষ্টি।[১]

এইখানে আর-একটি কথা বলিতে চাই; আমাদের দেশে ধার্মিকতা (religiosity) ও আধ্যাত্মিকতার (spirituality) সহিত সন্ন্যাসের (asceticism) কৃচ্ছ্রতা ও গুহ্য সাধনা (esotericism) এমনভাবে মিশিয়া আছে যে, ইহার বাহিরে যে অন্য সাধনপন্থা থাকিতে পারে তাহা সাধারণের ধারণাতীত। রবীন্দ্রনাথ যে সহজ ধর্মসাধনাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও যে মানুষকে পূর্ণাঙ্গ তৃপ্তি দিতে পারে, তাহা সহজে স্বীকৃত হইতে চাহে না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে-সন্ন্যাস-কৃচ্ছ্রতার জয়গানে লোকে মুখর, তাহাকে যদি সত্যই তাহারা ধর্মপন্থা হিসাবে বিশ্বাস করিত, তবে তো সেই পথকেই ব্যক্তিগত জীবনে বরণ করিয়া লইত। কিন্তু জীবনে কেহ তাহা অনুসরণ করে না, কারণ সে জীবনে তাহাদের বিশ্বাস নাই এবং বিশ্বাস যে নাই তাহা স্বীকার করিবার মত সৎ-সাহসের অভাবে অবাস্তবকেই সত্য বলিয়া জানে এবং সত্যজীবনকে তাহার যথাযথ পরিপ্রেক্ষায় দেখিতেও পায় না।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পর্যন্ত কবিধর্ম ও সাধকধর্মের আনাগোনা চলিয়াছিল; কোনোটিই কাহারও কাছে পরাভব মানিতে চাহে নাই; এবং উভয়ের সংশ্লেষণে যে কাব্যধারা বারে বারে উৎসারিত হয়, যথাস্থানে তাহার আলোচনা আমরা করিব; গীতাঞ্জলি হইতে কবির নূতন গীতধারার সূত্রপাত হইল। গীতাঞ্জলির সকল গান ও কবিতা—আমরা যাহাকে আধ্যাত্মিক বলি— সে-শ্রেণীর অন্তর্গত করা যায় না। যেসকল রচনায় কবির অধ্যাত্মসাধনার আভাস ইঙ্গিত আছে সেগুলিকে আমরা প্রধানত তিনটি ধারায় বিভক্ত করিতে পারি। রবীন্দ্রসাহিত্যের সমালোচক-চূড়ামণি অজিত-কুমারের কথা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

"সংসারের দুঃখ-আঘাত-বেদনার একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। ইহারা তাঁহার 'দূতী'; তিনি যে আমাদের জন্য অভিসারে বাহির হইয়াছেন ইহারাই সেই সংবাদ জানায়। আমাদের চিত্ত যখন অসাড় থাকে তখন এই দুঃখ-

১ এই মতের সমর্থন পাইলাম ক্লাইভ বেলের রচনা হইতে; নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্‌ধৃত করিলাম—

Art and Religion are two roads by which men escape from circumstance to ecstasy. Between aesthetic and religious rapture there is a family alliance. Art and Religion are means to similar states of mind. And if we are licensed to lay aside the science of aesthetics and, going behind our emotion and its object, consider what is in the mind of the artist, we may say, loosely enough, that art is a manifestation of the religious sense. If it be an expression of emotion—as I am persuaded that it is—it is an expression of that emotion which is the vital force in very religion, or, at any rate, it expresses an emotion felt for that which is the essence of all. We may say that both art and religion are manifestations of man's religious sense, if by "man's religious sense" we mean his sense of ultimate reality. What we may not say is, that art is the expression of any particular religion; for to do so is to confuse the religious sprit with the channels in which it has been made to flow."—Clive Bell, *Art*, p 92-93

আঘাতই তো তাঁহার স্পর্শ, তিনি আমাদের জাগাইয়া দেন। ধূপকে না পোড়াইলে সে যেমন গন্ধ দেয় না, দুঃখের আঘাত ভিন্ন আমাদের জীবনের পূজা তাঁহার দিকে উচ্ছ্বসিত হয় না। কবি তাই বলিয়াছেন, 'আমার জীবনে তব সেবা তাই বেদনার উপহারে'। এই ব্যথার গানই তাঁহার পূজার শ্রেষ্ঠ অঞ্জলি।

"'সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে'— অহংকারের বাঁধন যতক্ষণ প্রবল ততক্ষণ বিশ্বের সকলের সঙ্গে এবং ভগবানের সঙ্গে মিলন হইতেই পারে না— কারণ অহংকার 'সকল সুরকে ছাপিয়ে দিয়ে আপনাকে সে বাজাতে চায়'। গীতিমাল্যের একটি গানে আছে—

বেসুর বাজে রে,
আর কোথা নয়
কেবল তোরই আপন মাঝে রে।

এই অহংকারের মধ্যেই সমস্ত বেসুর— এইখানে বিশ্ব প্রতিদিন প্রতিহত, আনন্দ সংকীর্ণ, প্রেম সংকুচিত। এই অহংটিকে তাঁহার পায়ে বিসর্জন না করা পর্যন্ত আমাদের শান্তি নাই।

"এ দেশের 'সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে' অপমানের তলায় ভগবানের চরণ নামিয়াছে—সেইখানে তাহাকে প্রণাম না করিলে তাঁহাকে প্রণাম করাই হইবে না। সেইখানে তাহাদের [সবহারা] সঙ্গে এক না হইলে 'মৃত্যুমাঝে হতে হবে চিতাভস্মে সবার সমান'— সেই বড়ো যাত্রায়, সেই সকল মানুষের মধ্যে, ভিড়ের মধ্যে কর্মযোগে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া সকল কর্ম করিতে হইবে, তবেই মুক্তি। কারণ—

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ,
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ
খাটছে বারো মাস।

বাংলা গীতাঞ্জলিতে কবির সাধনার ধারার এইরূপ সুস্পষ্ট চেহারা দেখিতে পাওয়া যায়।"[1]

ভাব ও ভাষার কৃত্রিম আভিজাত্য হইতে মুক্তির আভাস এই কবিতায় ফুটিয়াছে।

গীতাঞ্জলি যে নিছক আধ্যাত্মিক কাব্য নহে, তাহা পাঠক আশা করি লক্ষ্য করিয়াছেন। এখন এই প্রশ্নই স্বভাবত উঠিবে যে, বর্ষামুখর আষাঢ়ে কবিচিত্ত আধ্যাত্মিক সুরে ঝংকৃত হইতেছিল, তাহার শেষদিকে দেশাত্মবোধের তীব্রসুর হঠাৎ কেন মন্দ্রিত হইল? ১৩১৭ সালের ১৮ই আষাঢ় লিখিলেন 'হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে'; ১৯শে লিখিলেন 'যেথায় থাকে সবার অধম'; ২০শে রচিলেন 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ'; ও তৎপর দিন (২১ আষাঢ়) সর্বহারাদের উদ্দেশ্যে বলিলেন, 'ছাড়িস নে ধরে থাক এঁটে, ওরে হবে তোর জয়। অন্ধকার যায় বুঝি কেটে ওরে আর নেই ভয়'।

অব্যবহিত পূর্বের ও পরের কবিতার সহিত এই কয়টি কবিতার ভাবসূত্র সম্পূর্ণ ছিন্ন; এ অবস্থায় পাঠকের মনে স্বতই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এই কবিতা কয়টি রচনার তাৎপর্য কী এবং এই উগ্র অনুভূতির প্রেরণাই বা কোথায়। পাঠকের স্মরণ আছে ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ করিবার জন্য মনকে জাগ্রত করিতে গিয়া 'নৈবেদ্যে'র মধ্যে দেশের দুঃখদারিদ্র্য ভয়সংকোচের ভাবনা কবিমানসকে কিরূপ পীড়িত করিয়াছিল। 'নৈবেদ্যে'রও পূর্বে বিশুদ্ধ কাব্যসৃষ্টি-কালে দেশের বাস্তবতা ও আদর্শতা সম্বন্ধে প্রশ্ন বারেবারে কবিতার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। কবি নিজে যে রসসম্ভোগ করিতেছেন, যে-আনন্দ পাইতেছেন তাহা নিখিলের জন্য পরিবেশন না করিতে পারিলে তাহা যেন পরিপূর্ণ আনন্দরূপ

১ অজিতকুমার চক্রবর্তী, কাব্যপরিক্রমা, পৃ ১১৮-১৭

গ্রহণ করিতে পারে না। তাঁহার অনুভূতি কী করিয়া অপরের মধ্যে সঞ্চারিবেন, তাহারই প্রয়াসে সাহিত্যের অসংখ্য প্রকাশরীতি, রচনার কলাকৌশলের উদ্‌ভব— ইহাই হইতেছে কবিধর্ম। কবি দেখেন চারিদিকের রূঢ় আবর্জনায় মানুষের মন সমাচ্ছন্ন— জাতি-অভিমান মানুষে মানুষে দুস্তর পাথাররূপে বিরাজমান; এইসবকে নিরাকৃত করিবার জন্য কবিচিত্ত ব্যাকুল হয়। মনের এই ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে এই কয়টি কবিতার মধ্যে।

প্রত্যক্ষ কারণও অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যায়। এই সময়ে কাদম্বরী দেবীর সহিত কবির ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে পত্রব্যবহার চলিতেছিল; দেশের আচারক্লিষ্ট চিত্তের যে চিত্র তিনি এইসব পত্র হইতে পাইতেছিলেন তাহা তাঁহাকে যেমন ব্যথিত, তেমনি উত্তেজিত করিয়াছিল। হিন্দুসমাজের মূঢ় সংস্কারের প্রতি এইরূপ অন্ধ আকর্ষণ দেখিয়া কবি স্তম্ভিত। ২০শে আষাঢ় কবি কাদম্বরী দেবীর পত্রের যে উত্তর দেন, তাহা হইতে আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি; সেইদিনই 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' কবিতাটি লেখেন। কবি পত্রে লিখিতেছেন—

"সাম্প্রদায়িক সংস্কারবশত অন্ধভাবে আমি কোনো কথা বলচিনে। যখন থেকে আমি আমার জীবনের গভীরতম প্রয়োজনে আমার অন্তরতম প্রকৃতির স্বাভাবিক ব্যাকুলতার প্রেরণায় সাধনার পথে প্রবৃত্ত হলুম তখন থেকে আমার পক্ষে যা বাধা তা বর্জ্জন করতেই হয়েছে এবং যা অনুকূল তাই গ্রহণ করেছি।···

"এইরকম অবস্থায় আমি আমাদের দেশ-প্রচলিত দেবপূজার প্রণালীকে কেন-যে সমস্ত মন থেকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি তা নিশ্চয়ই আমার সমস্ত 'শান্তিনিকেতনে'র লেখাগুলির ভিতরে কতকটা প্রচ্ছন্ন ও কতকটা প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত হয়েছে।···আমাদের দেশে দেবতা কেবলমাত্র মূর্ত্তি নন—অর্থাৎ কেবল যে আমরা আমাদের ধ্যানকে বাইরে আকৃতি দিয়েছি তা নয়, তাঁরা জন্মমৃত্যুবিবাহ সন্তান-সন্ততি ক্রোধ-দ্বেষ প্রভৃতি নানা ইতিহাসের দ্বারা অত্যন্ত আবদ্ধ। সে-সমস্ত ইতিহাসকে সত্য ব'লে বিশ্বাস করতে গেলে নিজের বুদ্ধিকে একেবারেই অন্ধ করতে হয় এবং সে-সমস্ত ইতিহাসকে সত্য বলে বিশ্বাস করলে ভগবানের সার্ব্বভৌমিকতা একেবারে চলে যায়—তিনি নিতান্ত আমাদের দেশের ও গ্রামের মানুষটি হয়ে পড়েন— সেইরকম বেশভূষা স্নানাহার আচার-ব্যবহার।

"অথচ তিনিই আমাদের একমাত্র যাঁকে অবলম্বন ক'রে আমাদের চিত্ত দেশ ও জাতি -গত সমস্ত সঙ্কোচ অতিক্রম ক'রে বিশ্বের সঙ্গে মিলিত হবে - তাঁকে অবলম্বন ক'রে আমাদের সর্বত্র প্রবেশাধিকার বিস্তৃত হবে। কিন্তু আমাদের দেশে ধর্মই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ঘটিয়েছে। আমরাই ভগবানের নাম ক'রে পরস্পরকে ঘৃণা করেছি, স্ত্রীলোককে হত্যা করেছি, শিশুকে জলে ফেলেছি, বিধবাকে নিতান্তই অকারণে তৃষ্ণায় দগ্ধ করেছি, নিরীহ পশুদের বলিদান করচি এবং সকল-প্রকার বুদ্ধি-যুক্তিকে একেবারে লঙ্ঘন ক'রে এমন সকল নিরর্থকতার সৃষ্টি করেছি যাতে মানুষকে মূঢ় ক'রে ফেলে। আমরা ধর্ম্মের নামে অপরিচিত মুমূর্ষুকে পথের ধারে পড়ে ম'রে যেতে দিই; পাছে জাত যায় (এ আমার জানা) অপরিচিত মৃতদেহকে সৎকার করিনে—মানুষের স্পর্শকে বীভৎস জন্তুর চেয়ে বেশী ঘৃণা করি। কেন এমন হয়েছে? আমরা ধর্ম্মকে আমাদের নিজের চেয়ে নেবে যেতে দিয়েছি; আমরা কেবলি বলেছি, আমরা নিকৃষ্ট অধিকারী, আমরা পারিনে; বিশুদ্ধ সত্য, বিশুদ্ধ মঙ্গল আমাদের জন্য নয়, অতএব আমাদের পক্ষে এই সমস্ত মুগ্ধ কল্পনাই ভালো···। ধর্মকে যে উপরে রেখেছে ধর্ম্ম তাকে উপরে টেনেছে, কিন্তু হিন্দু কেবলি বলেছে মেয়েদের জন্যে, সর্ব্বসাধারণের জন্যে এইরকম আটপৌরে মোটা ধর্ম্মই দরকার। এই বলে সমস্ত দেশের বুদ্ধি ও আকাঙ্ক্ষাকে সেই মোটার দিকে ভারাক্রান্ত ক'রে নেবে যেতে দিয়েছে। আর যাই হোক, সাধনাকে নীচের দিকে নামতে দিলে কোনো মতেই চলবে না। কল্পনাকে, হৃদয়কে, বুদ্ধিকে, কর্ম্মকে কেবলি মুক্তির অভিমুখে আকর্ষণ করতে হবে—তাকে কোনো কারণেই, কোনো সুযোগের প্রলোভনেই ভুলিয়ে রাখতে হবে না। আমি নিজের জন্যে এবং দেশের জন্যে সেই মুক্তি চাই। মনে কোরো না সেই মুক্তি—জ্ঞানের

মধ্যে মুক্তি, সে—প্রেমের মধ্যে মুক্তি। তুমি মনে কোরো না প্রতিমা-পূজা ছাড়া প্রেম হতেই পারে না। যদি সুফীদের প্রেমের সাধনার বিবরণ প'ড়ে থাক তবে দেখবে তাঁরা কি আশ্চর্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে কি অপরিসীম প্রেমের মিলন সাধন করিয়েছেন। তাঁদের সেই প্রেম কেবল একটা শূন্য ভাবের জিনিস নয়, তা অত্যন্ত নিকট, অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ; অথচ তার সঙ্গে কোনো-প্রকার কাল্পনিক জঞ্জালের আবর্জ্জনা নেই।"[১]

পূর্বোক্ত কবিতা চতুষ্টয় লিখিবার কয়েকদিন পরে শিলাইদহে (২৯ আষাঢ়) যে কবিতাটি (গীতাঞ্জলি ১২২) লেখেন তার মধ্যে আছে :

এসো বন্ধু তোমরা সবে
একসাথে সব বাহির হবে,
আজকে যাত্রা করব মোরা
অমানিতের ঘরে
দুঃখীর শেষ আলয় যেথা
সেই ধূলাতে লুটাই মাথা,
ত্যাগের শূন্যপাত্রটি নিই
আনন্দরস ভরে।

এইদিনই কবি সেই অপরিচিতা কাদম্বরী দেবীকে, যাঁহাকে পূর্বপত্রে সামাজিক আচারনিষ্ঠা প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে পুনরায় সেই বিষয়ে লিখিতেছেন : "তুমি প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাব সত্ত্বেও নিশ্চয়ই আমাকে অনেকটা পরিমাণে জান— তার থেকে এটুকু তুমি বুঝতে পারবে আমাদের সমাজে যদিচ এমন অনেক জিনিস আছে যাকে আমার বুদ্ধি সমর্থন করতে পারে না, কিন্তু তার প্রতি আমার হৃদয়ের বেদনা যথেষ্ট আছে।...আমাদের দেশে প্রচলিত পূজার্চ্চনা-বিধির মধ্যে এমন সুগভীর তত্ত্ব আছে যা বহুমূল্য। আমাদের দেশে যাঁরা মহাপুরুষ জন্মেছিলেন আধ্যাত্মিক সাধনায় তাঁরা আশ্চর্য্য সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এ সমস্তই আমি মানি, কিন্তু আমার মনের সমস্ত শ্রদ্ধা সত্ত্বেও দেশব্যাপী দুর্গতি এবং তার কারণের কথা যখন ভাবি তখন কল্পনার ইন্দ্রজাল দিয়ে নিজেকে এবং অন্যকে ভোলাবার প্রবৃত্তি একেবারেই চ'লে যায়। আমাদের ধর্ম্মের মধ্যে এত মূঢ়তা! নিজের শক্তিকে এমন চারি দিক থেকে পঙ্গু করা, নিজের বুদ্ধিকে একান্তভাবে অন্ধ করা।..."[২]

এই কবিতা কয়েকটি লিখিবার আরও একটি কারণ ছিল বলিয়া আমাদের সন্দেহ হয়। ১৯১০ সালে মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে ভারতবর্ষে অবৈতনিক আবশ্যিক শিক্ষা (free and compulsory) ব্যবস্থা গবর্নমেণ্টের সাহায্যে দেশমধ্যে প্রবর্তিত করিবার আন্দোলন উপস্থিত করেন। দেশের প্রায় সর্বত্রই উচ্চবর্ণের ধনী হিন্দুরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। গোখলে এই বিল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাতেও পাস করাইতে পারেন নাই। বিদেশী গবর্মেণ্ট যে কেবল জনশিক্ষার বিরোধী ছিল তাহা নহে, দেশের সর্বস্বহরা শ্রেণীও সর্বহারাদের অন্ধতা ঘুচাইতেও পরাঙ্মুখ। আমাদের মনে হয় কবি সমগ্র ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতি ও শক্তির মধ্যে সমন্বয়ের কথা চিন্তা করিতেছিলেন, এবং তাহার বাধা কোন্‌খানে তাহা বুঝিতে পারিয়া মনের কথা এই কয়টি কবিতার মধ্য দিয়া প্রকাশ করেন। এই সময়ে হিন্দু অসবর্ণবিবাহ সিদ্ধ করিবার জন্য ভূপেন্দ্রনাথ বসু যে আন্দোলন উপস্থিত করেন তাহাও শিক্ষিত

১ কয়েকখানি পত্র, ২০ আষাঢ় ১৩১৭, প্রবাসী ১৩৩৪ পৌষ, পৃ ৩৯৪-৯৫। চিঠিপত্র ৭

২ কয়েকখানি পত্র, শিলাইদা, নদিয়া, ২৯শে আষাঢ় ১৩১৭। প্রবাসী ১৩৩৪ পৌষ, পৃ ৩৯৬। চিঠিপত্র ৭

হিন্দুদের দ্বারা বাধা পাইতেছিল। এইসব পারিপার্শ্বিক ঘটনা কবির মনে যে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, তাহারই প্রতিক্রিয়া কবিতা কয়টির মধ্যে সুস্পষ্ট।

গীতাঞ্জলির পরে

১৩১৭ সালের পূজাবকাশের জন্য শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় বন্ধ হইলে (১৯১০ অক্টোবর) কবি আশ্বিনের শেষাশেষি শিলাইদহে গেলেন। এইবার নৌকায় নহে—কুঠিবাড়িতে উঠিলেন। রথীন্দ্রনাথ আমেরিকা হইতে প্রায় একবৎসর ফিরিয়াছেন। শিলাইদহ তাঁহার কর্মকেন্দ্র। জামাতা নগেন্দ্রনাথও আমেরিকা হইতে গ্রাজুয়েট হইয়া আসিয়াছেন; তিনি ও মীরা দেবী এখন শিলাইদহে; জমিদারির কৃষিউন্নতি বিষয়ে সেখানেই গবেষণাগারে কাজ করিবেন। রথীন্দ্রনাথের জন্য কুঠিবাড়ির অনেক পরিবর্তন হইয়াছে নানা ভাঙচোর করিয়া, বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া সেখানে কৃষিসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ল্যাবরেটরি লাইব্রেরি প্রভৃতির ব্যবস্থা হইল। কবির কল্পনায় ছিল যে ঐ কুঠিবাড়ি একাধারে ইংলণ্ডের মধ্যযুগীয় জমিদারদের ম্যানর হাউসের ন্যায় গ্রামের সকল প্রকার আলোক ও আনন্দের কেন্দ্র হইবে ও আমেরিকার কৃষিবিষয়ক এক্‌সপেরিমেণ্টাল স্টেশন হইবে। এছাড়া কন্যা ও পুত্রবধূকে আধুনিকা করিবার উদ্দেশ্যে মিস বুর্ডেট (Bourdette) নামে এক মার্কিন মহিলাকে ইহাদের সহচরী করিয়া আনা হইল।[1]

রবীন্দ্রনাথ পুত্র-পুত্রবধূর নূতন সংসারে আসিয়া আজ বহু বৎসর পরে গৃহের আনন্দ পাইলেন। শরীর ও মন পূর্বাপেক্ষা সুস্থ ও প্রফুল্ল। মনের এই বিরামের অবস্থায় লিখিলেন 'রাজা' নাটক। রাজা নাটকের ২০টি গান এই সময়েই লেখা। পাঠকের স্মরণ আছে, গীতাঞ্জলি-পর্বের শেষ গান লিখিত হয় ১৯এ আশ্বিন ১৩১৭। গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্য গানের পর্বের মধ্যে ব্যবধান হইতেছে প্রায় দেড় বৎসরের। এই সময়ের মধ্যে রাজা অচলায়তন ও ডাকঘর নাটিকাত্রয় রচিত হয়। 'ডাকঘরে' নূতন গান নাই, অপর দুইটির মধ্যে যথাক্রমে ২৫ ও ২৬টি নূতন গান আছে।

শান্তিনিকেতনের উপদেশমালায় ও গীতাঞ্জলির গীতধারায় কবিচিত্তের অনেক কথা প্রকাশ পাইলেও, সকল কথা নিঃশেষিত হয় নাই। ব্রহ্মের অনুভূতি এত বিচিত্র যে তাহা নানা রীতি ও ভঙ্গিতে প্রকাশ ব্যতীত সাধক কবির তৃপ্তি হয় না। বিশ্বের রসরহস্য সাধক ও সাহিত্যিকের অন্তরে নানা রূপকের রূপে প্রকাশ পায়। তাই দুই রসনির্ঝর গীতপর্বের মধ্যভাগে কবির রহস্যলোকের অনুভূতি নাট্যসাহিত্যে নূতন রূপে মুক্তি লাভ করিল। 'রাজা' নাটক সেই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার অন্যতম প্রকাশ।

অগ্রহায়ণ মাসের গোড়ায় বিদ্যালয় খুলিবার সঙ্গে সঙ্গেই কবি শিলাইদহ হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। এবার আশ্রমে ফিরিয়া কবি বিদ্যালয়ের নানাপ্রকার বিধিব্যবস্থা লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত। বিদ্যালয় পরিচালনার নানাপ্রকার নিয়ম নিষেধ, অপিস পত্তন, নানাপ্রকার রিপোর্ট বা প্রতিবেদন পেশ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতেছেন। লাইব্রেরির পাশে একটি ঘর ছিল সেইখানে হইল অপিস। তথায় কবি নিয়মিত বসেন, স্কুলের সমস্ত খুঁটিনাটি কাজকর্ম দেখেন; এই কার্যে তাঁহার প্রধান সহায় হইলেন অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। জ্ঞানেন্দ্রনাথ নলহাটির অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র; অঘোরনাথ আশ্রমপ্রতিষ্ঠার পর বহু বৎসর শান্তিনিকেতনের কর্মকর্তা ছিলেন।

১ মিস্ মার্গারেট নোব্‌ল (ভগিনী নিবেদিতা) প্রথম কলিকাতায় আসিলে কবি তাঁহার উপর নিজ কন্যাদের শিক্ষাভার দান করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু নিবেদিতা উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন। শিলাইদহের গৃহবিদ্যালয়ে ইংরেজ শিক্ষক লরেন্সকে নিয়োগ এই সঙ্গে স্মরণীয়।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বি. এ. পাস (১৯০৮) করিবার কয়েকমাস পরে (১৯০৯ জানুয়ারি) বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইয়া আসেন। তিনি আশ্রমের কর্মশালা সর্বপ্রথম সুব্যবস্থিত করেন।

এই সময়ে বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য 'সর্বাধ্যক্ষ' পদের সৃষ্টি হয়। প্রথম 'সর্বাধ্যক্ষ' হন জগদানন্দ রায়। সর্বাধ্যক্ষ প্রাক্‌ বিশ্ববিদ্যালয় যুগের সচিবের ন্যায় পদ, তবে তিনি অধ্যাপকমণ্ডলীর দ্বারাই নির্বাচিত হইতেন ও অন্যান্য শিক্ষকদের ন্যায় অধ্যাপনা করিতেন; অপিসের কাজের জন্য কোনো বিশেষ উপরি-বেতন তিনি পাইতেন না। এছাড়া ছাত্র-পরিচালনার জন্য তিনটি বিভাগ— আদ্য মধ্য ও শিশু— পৃথক করা হয়। প্রত্যেক বিভাগের জন্য এক-একজন অধ্যক্ষ নির্বাচিত হইতেন। শিক্ষাদি ব্যাপার সর্বাধ্যক্ষ সাধারণভাবে দেখাশুনা করিতেন, তবে আসল ভার থাকিত বিষয়ের পরিচালকদের উপর। ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞানের পৃথক পৃথক পরিচালক ছিলেন; তাঁহাদের কাজ ছিল নিজ নিজ বিষয়ের প্রত্যেক ছাত্রের পাঠোন্নতি লক্ষ্য রাখা। ইঁহারা মাসান্তে প্রত্যেক অধ্যাপকের নিকট হইতে তাঁহাদের নিজ নিজ বর্গের পাঠচর্চা, প্রত্যেক ছাত্রের উন্নতি বা অবনতির বিস্তারিত সংবাদ, মাসিক বা সাপ্তাহিক পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ আকারে আদায় করিতেন। সেই প্রতিবেদন অথবা তাহা হইতে চুম্বক করিয়া বিষয়ানুযায়ী প্রতিবেদন লিখিতেন পরিচালকগণ। মাসান্তে নিয়মিত সভা বসিত এবং তাঁহাদের এইসব রিপোর্ট আলোচিত হইত। এখানে একটি কথা বলা দরকার। তখনো বিদ্যালয়ে শ্রেণী বা class-প্রথা প্রবর্তিত হয় নাই— বর্গ (group) প্রথা ছিল। বর্গের নামকরণ করা হইত— ছাত্রদের নাম দিয়া, যেমন 'অমিতাভ বর্গ'। এই বর্গ-প্রথার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সকল ছাত্র সকল বিষয়ে একই বর্গে নাও পড়িতে পারিত। কোনো ছাত্র বাংলায় ভালো বলিয়া এক বর্গে পড়ে কিন্তু ইংরেজিতে কাঁচা বলিয়া ইংরেজি পড়ে অন্য বর্গে। ম্যাট্রিকের শেষ দুই বৎসর কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পড়ানো হইত। বিদ্যালয়ে কখনো বাজারের পাঠ্য পুস্তক পড়ানো রীতি ছিল না; Murche Scienco Readers, Highroads of History, Highroads of Literature, Britain and her neighbours, Gateways to History প্রভৃতি শ্রেণীর বই নির্বাচন করা হইত ইংরেজির জন্য। জর্জ ম্যাকডোনাল্ড (১৮২৪-১৯০৫) নামে লেখকের *The Shadows* নামে শিশুপাঠ্য বই একবার পাঠ্য করা হয়। উপরের ক্লাসে ইংরেজি সাহিত্য অজিতকুমার পড়াইতেন। তখন সংস্কৃত পড়াইতেন বিধুশেখর ও ক্ষিতিমোহন; বিজ্ঞানাগারে রীতিমত পরীক্ষা দেখাইয়া বিজ্ঞান পড়াইতেন জগদানন্দ রায়। সন্ধ্যার পর বিরাট এক টেলিস্কোপের সাহায্যে মাঝে মাঝে আকাশের গ্রহনক্ষত্র দেখানো হইত। সন্ধ্যার পর প্রথম দুই বর্গের ছাত্রদের ছাড়া অন্যদের জন্য নিয়মিত 'বিনোদন' পর্ব বসিত; এইসব সময়ে অধ্যাপকেরা সাহিত্যের গল্প ছাত্রদের জন্য মনোরম করিয়া বলিতেন। এ প্রথা বহুকাল হইতে ছিল। ছাত্রদের সাহিত্যসভা হইত মঙ্গলবারে সন্ধ্যার পর— সাহিত্য, ভ্রমণ, পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত প্রবন্ধ পঠিত হইত— গান বা নৃত্যে সভাগুলি তখনো ভারাক্রান্ত হয় নাই।

ছাত্রদের ব্যক্তিগত পড়াশুনার উপর যেমন নজর দেওয়া হইত, স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও সেইরূপ। বুধবারে মন্দিরের পর ছাত্ররা শ্রেণীবদ্ধভাবে হাসপাতালে যাইত। সেখানে প্রত্যেক ছাত্রের ওজন লওয়া হইত ও পাকা খাতায় লেখা হইত। দুই সপ্তাহ পর পর কাহারও ওজন কমিলে তখনই তদারক শুরু হইত। সকল ছাত্রের পক্ষে প্রাতে স্নান ও ব্যায়াম ও বৈকালে ক্রীড়া আবশ্যিক ছিল। এ ছাড়া প্রত্যেক বিভাগের ছাত্ররা পালা করিয়া বাগানের কাজ করিত। এই বাগানের কাজে উৎসাহী ছিলেন সত্যজ্ঞান ভট্টাচার্য নামে একজন শিক্ষক। সন্তোষচন্দ্র আমেরিকা হইতে আসিয়া আশ্রমের কাজে যোগদান করিবার পর হইতে ছাত্রদের মধ্যে ড্রিল প্রবর্তিত হয়, সেই mass drill একটা দেখিবার জিনিস ছিল; মাঝে মাঝে তাহাদের দিয়া fire drill করানো হইত। আমেরিকায় শেখা yell তিনি ছাত্রদের শেখান; দুই শত ছাত্রের সমবেত চীৎকার রীতিমত কম্প সৃষ্টি করিত।

রবীন্দ্রনাথ এই সমস্ত কাজের খুঁটিনাটির সংবাদ রাখিতেন এবং প্রায় প্রত্যেক বিষয়ের জন্য নিয়মাবলী তৈয়ারি করিয়া দিতেন। তবে এই শ্রেণীর কাজ কবির পক্ষে দীর্ঘকাল করা সম্ভব ছিল না, তিনি কর্মান্তরে মনোনিবেশ করিলে অথবা স্থানান্তরে গমন করিলেই কর্মের সমস্ত সুর নামিয়া পড়িত— নিয়মপালনের দিকে হয়তো নিষ্ঠা থাকিত, কিন্তু প্রাণ চলিয়া যাইত; চারি দিকে স্বাভাবিক শৈথিল্য নগ্নমূর্তিতে দেখা দিত।

বিদ্যালয়ের কর্মব্যবস্থায় যেমন পরিবর্তন আনিলেন, আশ্রমের পরম্পরাগত আদর্শের মধ্যে কিছু কিছু অভিনবত্ব প্রবর্তন করিলেন। এবার পৌষ-উৎসবে 'বড়দিন' খ্রীষ্টোৎসব হইল (১৯১০)[১]; কবি স্বয়ং মন্দিরে উপাসনা করিলেন। অনেকের ধারণা যে, এণ্ড্রুস ও পিয়ার্সন সাহেবের আগমনের ফলে আশ্রমের এই উদারপন্থা অবলম্বিত হয়, তাহা যথার্থ নহে। এই সময়ে অজিতকুমার চক্রবর্তী 'খৃস্ট' নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করেন, রবীন্দ্রনাথ তাহার নাতিদীর্ঘ ভূমিকায় খ্রীষ্টজীবনের মূলগত কথাটি বলেন। এই বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমায়[২] মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব উপলক্ষেও মন্দিরে কবি ভাষণ দান করেন। এখন হইতে স্থির হয় যে, অতঃপর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণকে উপযুক্ত দিনে বা তিথিতে স্মরণ করা হইবে। এতদিন শান্তিনিকেতন মন্দিরে আদিসমাজীয় পদ্ধতি-অনুযায়ী উপাসনাদি চলিয়া আসিতেছে, ঔপনিষদ-ধর্ম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মের বিশেষ আলোচনা হয় নাই। এইবার বিশ্বমানবের বিচিত্র সাধনাকে কবি আশ্রমে স্বীকার করিয়া লইলেন। এইসব তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের ও সামাজিক মতের ক্রম-অভিব্যক্তির পরিচায়ক। পৌষ উৎসবে[৩] প্রাতে 'জাগরণ'[৪] ও সন্ধ্যায় 'সামঞ্জস্য'[৫] নামে দুইটি ভাষণ দান করেন, তাহার মধ্যে যে নূতন কথা প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা নিম্নে আলোচিত হইতেছে।

'সামঞ্জস্য' প্রবন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে ধর্মসাধনায় জ্ঞানের, ভক্তির ও কর্মের যে সামঞ্জস্য হইয়াছিল, তাহা অতিবিস্তারে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের কর্মসাধনার ইতিহাস হইতে কবি দেখাইলেন যে একদা বৈদিক যুগে কর্মকাণ্ড যখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন মন্ত্র এবং অনুষ্ঠানই দেবতা এবং মানুষের হৃদয়ের চেয়ে বড় হইয়া উঠিয়াছিল। নিরর্থক কর্মই চূড়ান্ত ছিল। ইহারই পাশাপাশি ছিল উপনিষদের ও ভগবৎগীতার অপ্রমত্ত সাধনা, পরিপূর্ণতার সাধনা। কিন্তু বৌদ্ধযুগে পরিপূর্ণতার সাধনা নির্বাণের সাধনার আকার ধারণ করিল। পূর্ণতার শান্তি একদিন শূন্যতার শান্তি আকারে এদেশের সাধনাক্ষেত্রে দেখা দিল। ভারতবর্ষের সাধনায় সামঞ্জস্যের স্থলে রিক্ততা আসিল, প্রাচীন তাপসাশ্রমের স্থলে প্রবল হইয়া উঠিল সন্ন্যাসাশ্রম, উপনিষদের পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম শঙ্করাচার্যের শূন্যস্বরূপ ব্রহ্মরূপে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদে পরিণত হইল। কঠোর চিন্তার জোরে সাধনক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হওয়াতে, অজ্ঞানীর দল সাধনার বাহিরে পড়িয়া গেল; অজ্ঞানীদের অনধিকারী বলিয়া জ্ঞানীর দল ঠেলিয়া দিলেন, মূঢ়ভাবে তাহারা যাহা মানিত তাহাকে ইহারা সকরুণ অবজ্ঞাভরে প্রশ্রয় দিলেন।

১ যিশুচরিত [১৯১০ ডিসেম্বর বা ১৩১৭ সালের ১১ পৌষ খ্রীষ্টোৎসবে কথিত ভাষণ]—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা শকাব্দ ১৮৩৩ (১৩১৮) ভাদ্র, পৃ ৯৪-৯৯।

২ ১৩১৭ ফাল্গুন (৩০) পূর্ণিমায় (১৯১১ মার্চ ১৪) চৈতন্যদেবের জন্মোপলক্ষে মন্দিরে উপদেশ, তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা ১৮৩২ শক (১৩১৮) বৈশাখ।

৩ এই পৌষ উৎসবের একটি ঘটনা সামান্য হইলেও উল্লেখযোগ্য, ৭ই পৌষ সন্ধ্যায় জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কবির নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কাহাকেও কবি দীক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। ইতিপূর্বে কবির কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথকেও তিনি দীক্ষা দেন (১৩১৪ জ্যৈষ্ঠ)। নগেন্দ্রনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্য ছিলেন; আদিসমাজীয় মতে দীক্ষা ব্যতীত বিবাহ দেওয়া হইত না; জ্যেষ্ঠ জামাতাকে দীক্ষা লইতে হয়। এটা ছিল পরিবারের নিয়ম। এই দীক্ষা গ্রহণ ব্যবহারিক; কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রনাথের দীক্ষা আধ্যাত্মিক প্রেরণা হইতে অনুষ্ঠিত হয়।

৪ জাগরণ, প্রবাসী ১৩১৭ মাঘ। দ্র শান্তিনিকেতন ১২শ খণ্ড। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, পৃ ৫০৬-১৫।

৫ সামঞ্জস্য, ভারতী ১৩১৭ মাঘ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, পৃ ৪৯৪-৫০৬।

দেশের জ্ঞান ও দেশের অজ্ঞানের মধ্যে দুস্তর বিচ্ছেদ সৃষ্টি হইল। এইভাবে জ্ঞান আপনার অধিকার হইতে হৃদয় ও কর্ম উভয়কে নির্বাসিত করিয়া দিয়া নিরতিশয় বিশুদ্ধ হইয়া থাকিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ভক্তি যখন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, তখন সেও জ্ঞানকে পায়ের তলায় চাপিয়া ও কর্মকে রসের স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া, একমাত্র নিজেই মানুষের পরম স্থানটি সম্পূর্ণ জুড়িয়া বসিল, এমনকি, ভাবের আবেগকে মথিত করিয়া তুলিবার জন্য বাহিরের কৃত্রিম উত্তেজনার বাহ্যিক উপকরণগুলিকেও আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ করিয়া লইল। এইভাবে মানুষ ভক্তি করিবার, পূজা করিবার আবেগটাকেই বড় করিয়া ধরিল, কাহাকে পূজা করিতে হইবে তাহা গৌণ হইয়া গিয়া পূজার সামগ্রী দ্রুতবেগে বাড়িয়া চলিল। সেই অবস্থায় আমাদের দেশে সত্যের সঙ্গে রসের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির একান্ত বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল।

মহর্ষি তাঁহার জীবনে এই সামঞ্জস্যের সাধনা করিয়াছিলেন; তিনি বলিয়াছিলেন তাঁহাকে প্রীতি করা তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। এই মহৎ বাণীর ব্যাখ্যা কবি এই প্রবন্ধে করিয়াছেন। এই প্রিয়কার্য সম্বন্ধে কবি অল্পকাল পরেই মাঘোৎসব উপলক্ষে 'কর্মযোগ' প্রবন্ধে বিস্তৃত করিয়া আলোচনা করিলেন।

এই প্রবন্ধে কবি বলিলেন যে কর্মের দ্বারা জীবনের বহুবিধ বিচ্ছিন্নতা দূর ও বন্ধন ক্ষয় করিয়াই পরিপূর্ণ জীবনের সার্থকতা লাভ করা যায়। আমাদের ধর্মনীতিতে কর্মকাণ্ড বলিতে যে জিনিস বুঝায়, তাহা যে কিরূপ নিরর্থক তাহা প্রাচীন ধর্মসংস্কারকগণ বলিয়া গিয়াছিলেন। আবার পাশ্চাত্য জগত কর্মের যে আদর্শ আজ পৃথিবীর সম্মুখে স্থাপন করিতেছে, তাহাও মানুষকে না দিতেছে শান্তি, না দিতেছে স্বস্তি। এ অবস্থায় জীবনে কর্মের স্থান কী তাহার বিশ্লেষণ হইতেছে এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। পূর্ব-পূর্ব বহু প্রবন্ধেও বিশেষভাবে শান্তিনিকেতনের উপদেশ-মালায় কবি কর্মযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন; এখানে সেই কথাই আরও জোর দিয়া বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করিলেন 'কর্মযোগ' প্রবন্ধে। তিনি বলিলেন, "কর্মকে ত্যাগ করা নয়, কিন্তু আমাদের প্রতিদিনের কর্মকেই চিরদিনের সুরে ক্রমশ বেঁধে তোলবার সাধনাই হচ্ছে সত্যের সাধনা, ধর্মের সাধনা।" তাঁহার মতে কর্মেই মানুষের 'বিরাট আত্মপ্রকাশ হয়'।[১]

কিছুদিন পূর্বে গীতাঞ্জলিতে 'উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে' ও 'ভজন পূজন সাধন আরাধনা' কবিতাদ্বয়ে কবি যে কর্মসাধনার কথা বলিয়াছিলেন, এই প্রবন্ধ যেন তাহারই ভাষ্য ও ব্যাখ্যান। কয়েক বৎসর পরে বিলাতে তিনি যে-কয়টি বক্তৃতা করেন, তাহার অন্যতম হইতেছে 'কর্মযোগ' (Sadhana)।

পৌষ-উৎসবের পর কবি কলিকাতায় গেলেন (১৯১০ ডিসেম্বর)। এই সময়কার একটি ঘটনা স্মরণীয়। সেই সময়ে বৃটিশ শিল্পাচার্য উইলিয়াম রোটেনস্টাইন ভারতভ্রমণে আসিয়া কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন। প্রায়ই তিনি জোড়াসাঁকোর অবনীন্দ্রনাথদের বাড়িতে তাঁহাদের চিত্রশালা দেখিতে আসেন; তখন বাংলার নূতন আর্ট অবনীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করিয়া সবেমাত্র আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। রোটেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথকে এইখানে প্রথম দেখেন; কবির সৌম্য মূর্তি দেখামাত্র তাঁহার প্রতি অন্তরের এমন আকর্ষণ অনুভব করিলেন যে তিনি তাঁহার ছবি স্কেচ করিবার অনুমতি না চাহিয়া পারিলেন না। তখন তিনি জানিতেন না, এবং তাঁহাকে কেহ বলিয়াও দেন নাই যে রবীন্দ্রনাথ একজন বড় কবি ও মনীষী। তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায়[২] পরে আশ্চর্য হইয়া লিখিয়াছিলেন যে উড্‌রফ সাহেব যিনি ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা লইয়া এত আলোচনা করিয়াছেন, তিনিও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোনো সংবাদ তাঁহাকে দেন নাই।

১ কর্মযোগ, ভারতী ১৩১৭ ফাল্গুন। শান্তিনিকেতন ১৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬, পৃ ৩৪৩-৩৫৬।

২ 'Sir Willam Rothenstein (1872-1945) British painter, studied at the Slade School as a pupil of Alphonse Legros and then in Paris, becoming a member of the New Art Club in 1894. Visited India in 1910:

এই সময়ে (১৯১০) আর-একজন তরুণ জার্মান দার্শনিক ভারতভ্রমণে আসেন—কাউণ্ট কাইসারলিঙ; তিনি তাঁহার বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনীতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন : Rabindranath, the poet, impressed me like a guest from higher, more spiritual world. Never, perhaps, have I seen so much spiritualised substance of soul condensed into one man.[১] কাইসারলিঙের (১৮৮০) বয়স তখন মাত্র ত্রিশ বৎসর ; কিন্তু উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তি হইতেই তাঁহার গভীর মনের সন্ধান পাওয়া যায়। এই কাইসারলিঙের সহিত আমাদের পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে।

কয়েকদিন কলিকাতায় কাটাইয়া[২] কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। এই মাসেই বিলাত হইতে অজিতকুমার দেশে ফিরিয়া আসিলেন, সেখানে তাঁহার স্বাস্থ্য টিকিল না। তিনি চিরদিনই দুর্বলস্বাস্থ্য ছিলেন এবং পড়াশুনা ছাড়া কখনো কোনো প্রকার শারীরিক শ্রমসাধ্য কর্ম করেন নাই ; বিদেশের সম্পূর্ণ নূতন পারিপার্শ্বিক সহ্য হইল না। তিনি গত ভাদ্র মাসে ইংলণ্ডে যান ও পৌষ মাসে ফেরেন— সুতরাং তিন-চার মাস মাত্র সে দেশে থাকা হয়। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কবির বহু রচনা ইংরেজিতে তর্জমা করিয়া বন্ধুমহলকে অবাক করিয়া দিয়াছিলেন ; রবীন্দ্রনাথের ন্যায় এত বড় সাহিত্য-প্রতিভা যে জগতে থাকিতে পারে, তাহা তৎকালীন অক্সফোর্ডের ছাত্রদের কল্পনার বাহিরে। অজিত কবির সহিত সাক্ষাৎ করিবা বন্ধুবান্ধবদের appreciationএর কথা মহোৎসাহে ব্যাখ্যা করেন। র‍্যাট্রে নামে এক উৎসাহী ইংরেজের কথা অজিত প্রায়ই বলিতেন ; ১৯১২ সালে কবির সহিত নিউইয়র্কে র‍্যাট্রের দেখা হয়।

মাঘোৎসবের জন্য রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিলেন ; সে-সময়ে এই উৎসব খুব জাঁকাইয়া হইত। সন্ধ্যার উপাসনায় ভিড় হইত অসম্ভব, তজ্জন্য পূর্বাহ্নে টিকিট বিতরণ করা হইত। জোড়াসাঁকোর উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল কবির ভাষণ ও ঠাকুরবাড়ির গান। উৎসবের গান বহুদিন হইতে মহড়া দিয়া প্রস্তুত হইত, শান্তিনিকেতন হইতেও কবির সঙ্গে তথাকার ছাত্ররা আসিত এই গানের জন্য।[৩]

এবারকার মাঘোৎসবের ভাষণের বিষয় ছিল— আত্মবোধ[৪] ও কর্মযোগ। পর দিবস (১২ মাঘ ১৩১৭) সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা'[৫] সম্বন্ধে এক লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন। এই শেষোক্ত ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য,

became professor of civic art at the University of Shefield and from 1920 to 1935 was principal of the Royal College of Art. An official artist with English and Canadian armies during the World War I (1914—18) : Painted both figure pictures and landscapes : it is for his portrait drawings he is chiefly remembered. His book ; Men and Memoirs 1931, 1932—interesting volumes of reminescences, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লেখেন—'I was attracted, each time, I went to Jorasanko, by their uncle, a strikingly handsome figure, dressed in a white *dhoti* and *chadur*, who sat silently listening as we talked. I felt an immediate attraction, and asked whether I might draw him, for I discerned an inner charm as well as physical beauty, which I tried to set down with my pencil'. *Men and Memoirs* II p 24. এই স্কেচটি ইংরেজি গীতাঞ্জলিতে মুদ্রিত আছে। এই সময়ে গগনেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের একখানি স্কেচ করেন। রচনানিবত রবীন্দ্রনাথ, (১৪ পৌষ ১৩১৭) দ্র ভারতী ১৩১৭ মাঘ। দ্র অসিতকুমার হালদার, উইলিয়াম রোটেনস্টাইন। ভারতী ১৩১৭ চৈত্র, পৃ ১০২।

১ *Travel Diary* 1925 vol. I. p. 335. F. A, Aronson *Rabindranath through Western eyes* (1943) p 64-71.

২ এই পৌষ মাসে 'রাজা' নাটক প্রকাশিত হইল। প্রথমে খাতায় যেমনটি লিখিয়াছিলেন তাহার কতকটা কাটিয়া-ছাটিয়া বদল করিয়া ছাপানো হয় ; পরের সংস্করণে মূল লেখাটি অবলম্বিত হইয়াছিল। সুতরাং প্রথম সংস্করণের পাঠকরা কবির দ্বারা সংশোধিত পাঠই পাইয়াছিলেন।

৩ এই সময়ে কবির সৌজন্যের একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করি। মাঘোৎসবের পর এই লেখক বাড়ি চলিয়া আসিতেছেন— জগদানন্দ রায় তথায় তাহাকে আহার করিয়া যাইতে বলায় তিনি বলেন, তাহা সম্ভব নহে—'কবির বাড়িতে আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিনা'। জগদানন্দবাবু কবিকে গিয়া এই কথা বলিলে কবি সেই সম্ভ্রান্তদের ভিড় হইতে চলিয়া আসিয়া বলিলেন 'তুমি না খাইয়া যাইবে কি—খাইয়া যাইবে।' আত্মীয়স্বজন ধনী আভিজাত্যের কী ভিড় তাহার মধ্য হইতে চলিয়া আসিয়া অতি নগণ্য শিক্ষকের প্রতি যে সৌজন্য দেখাইলেন তাহা আজও মনে গাঁথা আছে।

৪ আত্মবোধ, ১১ মাঘ ১৩১৭। প্রবাসী ১৩১৭ ফাল্গুন, পৃ ৫০১-৫১২। দ্র শান্তিনিকেতন ১৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬, পৃ ৩৫৬-৩৭৩।

৫ ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা। প্রবাসী ১৩১৮ বৈশাখ। দ্র শান্তিনিকেতন ১৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬, পৃ ৩৭৪-৩৮২।

কারণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে মাঘোৎসবের সময়ে রবীন্দ্রনাথকে ভাষণ দান করিতে দেওয়াই একটি বিশেষ ঘটনা। উক্ত সমাজের প্রাচীন ব্যক্তিরা রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীতকে মনপ্রাণ দিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের মন্দিরে রবীন্দ্রনাথকে প্রসন্নচিত্তে ধর্মসম্বন্ধে কোনো ভাষণ দান করিবার অধিকার দিতে বড়ই নারাজ। এইবার তরুণ ব্রাহ্মদের চেষ্টায় উহা সম্ভব হইল। কবিরও মনে কিছুকাল হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্মের মধ্যে ইহাদিগকে টানিবার কথা জাগিতেছে; তাঁহার বিশ্বাস, এই তরুণদের সহায়তায় হয়তো তাঁহাদের মুমূর্ষু সমাজ পুনরায় প্রাণবান হইতে পারে। এতাবৎকাল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি কবিরও মনোভাব যে বিশেষ সুপ্রসন্ন ছিল তাহা নহে; কয়েক বৎসর পূর্বে 'ধর্মপ্রচার' সম্বন্ধে একেশ্বরবাদীদের সম্মেলনে যে বক্তৃতা করেন, তাহা এক হিসাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ধর্মপ্রচার -পদ্ধতিরই নিন্দা; কারণ প্রত্যক্ষভাবে ধর্মপ্রচার কার্যে তাঁহারা বরাবর লিপ্ত আছেন ও ধর্ম-প্রচারে তাঁহারা বিশ্বাসবান। আদর্শের প্রচার ছাড়া আর কিভাবে লোকসমাজকে বিশেষ কোনো আদর্শবাদে শিক্ষিত করা যায়, তাহা জানি না; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম প্রচার কল্পে স্বয়ং বহু বৎসর নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং প্রচারের জন্য বেতনভোগী লোকও নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন; ধর্মপ্রচারের জন্য কোনো-না-কোনো প্রকারের চেষ্টা ধর্মাত্মাগণ চিরকালই অনুসরণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ যখন সমালোচনা করেন, তখন আধুনিক প্রচারপদ্ধতির ব্যর্থতার কথাই তাঁহার মনে ছিল। মোটকথা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের লোকদের সেরূপ সমালোচনা ভালো লাগে নাই। তার পর নৌকাডুবির অন্নদাবাবু, গোরায় পানুবাবু ও বরদাসুন্দরীকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে অঙ্কন করেন, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা বিশেষ প্রীত হইতে পারে নাই। গোরার গ্রন্থশেষে যখন পরেশবাবুকে তাঁহার মতের উদারতার জন্য ব্রাহ্মসমাজের লোকেদের দ্বারা লাঞ্ছিত করিলেন, তখন অ-ব্রাহ্মদের নিকট ব্রাহ্মসমাজের 'অনুদারতা' অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিল। সমস্তকে স্বীকার, সমস্তকে মানিয়া চলার নাম কখনো উদারতা হইতে পারে না। 'গোরা' পাঠ করিয়া ব্রাহ্ম-দ্বেষীরা বেশ উল্লসিত হইয়া ভাবিয়াছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ধর্ম ও সমাজের জয়গান করিয়া সনাতন পথকেই সমর্থন করিয়াছেন। কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে কবি বর্ণাশ্রম ধর্মের ভাবাত্মক ব্যাখ্যান দিয়া ও জাতীয়তার নামে গঙ্গাস্নানাদিতে যোগ দিয়া যে হিন্দু-জাতীয়তার পৃষ্ঠপোষকতা করেন তাহাতে প্রাচীন ব্রাহ্মেরা রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-বিষয়ক মতামত সম্বন্ধে শঙ্কিত হইয়া উঠেন। এইসব কারণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি কঠোর মনোভাব বৃদ্ধ ও অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মদের মধ্যে ছিল। সেই বিরুদ্ধতা আজ তরুণ ব্রাহ্মদের চেষ্টায় দূর হইয়াছে; তাহারই স্বীকৃতি হইল মাঘোৎসবের মধ্যে তাঁহাকে সমাজমন্দিরে বক্তৃতা করিতে দিয়া; কবিও আজ 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা' দেখাইয়া সকলকে নিঃসন্দেহে বুঝাইয়া দিলেন যে রাজা রামমোহনের ধর্মমতই তাঁহার ধর্ম।

উৎসবান্তে কবি আশ্রমে ফিরিয়াছেন। রাজা নাটক মুদ্রিত হইয়াছে। 'রাজা'র মূর্তিটি অভিনয়ের মধ্যে দেখিবার জন্য তাঁহার আর্টিস্ট সত্তা ব্যাকুল হইল। ৫ চৈত্র অভিনয় হইল। সমসাময়িক দর্শক শান্তাদেবী লিখিয়াছেন, "মাটির নাট্যঘরে খড়ের চালার তলায় নবীন কিশলয়ে ও সদ্যতোলা পুষ্পদলে সজ্জিত রঙ্গমঞ্চে গান ও অভিনয় যেন আতশ বাজির ফুলের মতো ঝলমল করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।"[১] রবীন্দ্রনাথ সে-সময়ে কিভাবে শান্তিনিকেতনে থাকিতেন, অতিথি অভ্যাগতের সহিত কিরূপ মধুর ব্যবহার করিতেন তাহার একটি নিখুঁত চিত্র শান্তাদেবী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জীবন-কাহিনীতে আঁকিয়াছেন। কবি 'রাজা' নাটকে 'ঠাকুরদা'র[২] ভূমিকায়

১ রামানন্দ ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা পৃ ১৬০।

২ রাজা নাটকে যাঁহারা নামিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম: সুদর্শনা— সুধীরঞ্জন দাশ (ভারতের ভূতপূর্ব চীফ জস্টিস, বর্তমানে উপাচার্য এস. আর. দাশ), সুরঙ্গমা— সুশীলচন্দ্র চক্রবর্তী (অজিতকুমারের ভ্রাতা), রোহিণী—নরেন্দ্রনাথ খাঁ (ছাত্র), ঠাকুরদা—রবীন্দ্রনাথ, রাজবেশী— অন্নদাচরণ বর্ধন (হাসপাতালের সেবক), কাঞ্চীরাজ— জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কোশলরাজ— জগদানন্দ রায়, কলিঙ্গরাজ— প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। বাউলের দলে শিক্ষক ও কর্মীদের অনেকেই ছিলেন।

নামেন ; সেদিন আশ্রমের নিভৃতে কয়েকটি ছাত্র ও অধ্যাপকে মিলিয়া কী আনন্দ কোলাহলে এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিত তাহা আজ ভাবিলেও আনন্দে-বিষাদে মন ভরিয়া যায়। নাট্যকলা ও নৃত্যকলার শ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রেরণা ও বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ-সংগ্রহের বেদনা তখনো রবীন্দ্রনাথের সহজ সরল কবিজীবনকে আচ্ছন্ন করে নাই।

এই বৎসরের ফাল্গুন মাসের কোনো সময়ে শান্তিনিকেতনে বেড়াইতে আসেন বিখ্যাত কলাশাস্ত্রী আনন্দ কুমারস্বামী (১৮৭৭-১৯৪৭ সেপ্টেম্বর)। কুমারস্বামীর শেষজীবন আমেরিকায় কাটে ; কিন্তু স্বদেশী যুগের আরম্ভ ভাগে এই তরুণ আর্ট-ক্রিটিকের বহু রচনা ভারতের শিল্প ও কলার সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সহায়তা করিয়াছিল। কবির কবিতার ইংরেজি অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হইল কুমারস্বামীর সহযোগিতায় ; অজিতকুমার যেসব কবিতা বিলাতে অনুবাদ করেন তাহার মধ্যে 'শিশু'র 'জন্মকথা' ও রবীন্দ্রনাথের নিজ অনুবাদ 'বিদায়' কবিতা কুমারস্বামীর সহিত যুগ্মনামে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হইল (১৯১১ মার্চ ও এপ্রিল)।[১] এইভাবে বাংলার বাহিরে কবির রচনা সর্বপ্রথম প্রচারিত হইল। ইতিপূর্বে মডার্ন রিভিউ-এ ১৯১০ সালের মার্চ মাসে (১৩১৬ মাঘ) পান্নালাল বসু[২]-কৃত 'ক্ষুধিত পাষাণে'র অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদ-ধারার এই প্রথম রচনা। অতঃপর ১৯১১ সাল হইতে মডার্ন রিভিউ-এর প্রায় প্রত্যেকটি সংখ্যায় (অক্টোবর মাস ছাড়া) কবির রচনার অনুবাদ বাহির হয়। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার ছিলেন অনুবাদকদের অগ্রণী, তৎকৃত বহু অনুবাদ ১৯১১,-১৯১২,-১৯১৩ সালের মডার্ন রিভিউ-এ মুদ্রিত হয়।

কবির সকল কাজ ও ভাবনার মধ্যে শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয় ও তথাকার ছাত্রদের মঙ্গল চিন্তা তাঁহাকে কখনো ত্যাগ করে নাই। এই সময়ে সর্বপ্রথম কবির মনে শান্তিনিকেতনে কলেজ স্থাপনের কথা জাগে। ব্রহ্মচর্যাশ্রম হইতে ছাত্রেরা প্রবেশিকা পাস করিয়া কলিকাতা বা অন্যত্র যায় কলেজে পড়িবার জন্য ; ঠিক যে-সময়ে বড় আদর্শ, বড় চিন্তা বুঝিবার সময় আসে, সেই গঠনের ও গ্রহণের মুখে তাহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন এমন-কি বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে গিয়া পড়ে ; ফলে তাহাদের মনের সমস্ত সুকোমল প্রস্ফুটোন্মুখ বৃত্তিগুলি প্রতিকূলতার মধ্যে নষ্ট হইয়া যায়। তাই শান্তিনিকেতনে কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব লইয়া কবি কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চানসেলর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন ; কিন্তু আলাপ-আলোচনায় কলেজ-পরিচালনার খরচের যে-ফর্দ পাইলেন, তাহা সংগ্রহ করা কবির সাধ্যাতীত বুঝিয়া কলেজ-স্থাপনের আশা ছাড়িয়া দিলেন।[৩] ইহার পনেরো বৎসর পর ১৯২৬ সালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পাঁচ বৎসর পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনে শান্তিনিকেতন কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল।

'রাজা' রচনার পর কবির সাহিত্যিক রচনা কিছুকাল চোখে পড়ে না। তিনি কিছুকাল হইতে মাঝে মাঝে 'জীবনস্মৃতি'র খসড়াটি আশ্রমের অধ্যাপকদের নিকট পড়িয়া শুনাইতেছেন। অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেনের মতে ১৩১৮ সালের ১২ বৈশাখ হইতে ২১ তারিখ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে তাহার কাব্য ব্যাখ্যান করিয়াছিলেন।—বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা, পৃ. ৬।

১ ১৩১৭, ফাল্গুন ৩০ (১৯১১ মার্চ ১৪) কবি তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন : 'কুমারস্বামীকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম, তাঁর এখানকার কাজ ভাল লেগেচে—সমস্ত দিন আমার কাব্যগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর ভারি ইচ্ছা ওর থেকে উনি অনেকগুলো অনুবাদ করেন।" অজিতকুমার ও কবির সহযোগে কুমারস্বামী কয়েকটি অনুবাদ করেন। সেগুলি তাঁহার *Art and Swadeshi* গ্রন্থে **Poems of Rabindranath Tagore** প্রবন্ধে সংকলিত আছে। দ্র. দেশ ১৩৬২ অগ্রহায়ণ ৩, পৃ. ১৭০।

২ পান্নালাল বসু— মুন্সেফ, জজ। ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার বিচারক। বৃদ্ধবয়সে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হন।

৩ পত্র ২৫, মার্চ ১৯১১ [১১ চৈত্র ১৩১৭] আশ্রমের ছাত্র মনোরঞ্জন চৌধুরীকে লিখিত।

কবি জীবনস্মৃতির খসড়া কাটাছাটা করা ছাড়া বুধবারে প্রদত্ত মন্দিরের উপদেশগুলি[১] লেখেন। বর্ষশেষের দিন পূর্ণিমা ছিল, আশ্রমের খোলা মাঠে কবি উপাসনা করিলেন ; পরদিন নববর্ষে[২] সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরে উপাসনা হইল। কবির এইসব দিনের ব্যাকুল উপাসনা, ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ করিবার আবেগ, প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া কাহারও পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নহে।

এইবার কবির পঞ্চাশৎ জন্মদিনে (১৩১৮ সালের ২৫ বৈশাখ) স্থির হইল আশ্রমে উৎসব হইবে। কিন্তু কলিকাতার বন্ধু ও ভক্তেরা এই দিবসটিকে জাতীয় উৎসবরূপে পালন করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। ১৩১৮ সালের প্রবাসী পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় জন্মোৎসব উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে অভিনন্দন দিবার প্রস্তাব প্রকাশিত হইল। কিন্তু কবির ভাগ্যদোষে বরাবরের ন্যায় এবারও একদল লোক জন্মোৎসবের বিরোধিতা ও কবিকে এই উদ্যোগের প্ররোচক বলিয়া সন্দেহ করিয়া নিন্দাবাদ রটাইতে শুরু করিল। রবীন্দ্রনাথ উৎসবের কয়েকদিন পূর্বে শান্তিনিকেতন হইতে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখিলেন (২১ বৈশাখ)—"আপনারা পরিষৎ হইতে যে উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন একদল তাহার বিরুদ্ধে একখানি পত্র মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতেছেন।··· তাহার মধ্যে আমার প্রতি যে কটাক্ষপাত আছে তাহা পড়িয়া বুঝিলাম আমার চিরন্তন ভাগ্য আমার পঞ্চাশিক জন্মোৎসবেও অবিচলিত আছেন। ভগবানের কৃপায় আমি সত্য মিথ্যা অনেক নিন্দা জীবনে বহন করিয়া আসিয়াছি। আজ আমার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইবার মুখে এই আর-একটি নিন্দা আমার জন্মদিনের উপহার স্বরূপ লাভ করিলাম এই যে আমি আত্মসম্মানের জন্য লোলুপ হইয়াছি এবং অভিনন্দনের দায় হইতে পরিষদ্‌কে নিষ্কৃতি দান করা আমারই উপরে নির্ভর করিতেছে। এই নিন্দাটিকেও নতশিরে গ্রহণ করিয়া আমার এক-পঞ্চাশৎ বৎসরের জীবনকে আরম্ভ করিলাম আর আপনারা আশীর্বাদ করিবেন সকল অপমান সার্থক হয় যেন।"[৩]

২৫ বৈশাখ (১৩১৮) আশ্রমে সবিশেষ আড়ম্বরে কবির পঞ্চাশৎ জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইল। সেইদিন প্রাতে অজিতকুমার প্রাতের সভায় তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথ'[৪] শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করেন ; এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে, তাহাকে আজ পর্যন্ত কেহ 'পুরাতন' বলিয়া তাচ্ছিল্য করিতে পারেন নাই ; রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই গ্রন্থই প্রথম প্রবেশক।

গত বৎসর শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন' উপলক্ষে যে উৎসব হইয়াছিল, তাহা ছিল আশ্রমের ঘরের জিনিস, এবার তাহা হইল সার্বজনিক, কলিকাতা হইতে বহু কবিভক্ত আসিলেন।[৫] এতদুপলক্ষে রাজা নাটক অভিনীত হয়।[৬]

১ সুন্দর, ১৫ চৈত্র ১৩১৭, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৩১৮ আষাঢ়, শান্তিনিকেতন ১৪, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬, পৃ ৩৮৩-৩৮ বর্ষশেষ, (৩০ চৈত্র ১৩১৭)

২ নববর্ষ, ১ বৈশাখ ১৩১৮, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৩ শক (১৩১৮ জ্যৈষ্ঠ) পৃ ২৯-৩১ ; ৩১-৩৪। বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা, ৬ বৈশাখ ১৩১৮, তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা ১৩১৮ শ্রাবণ। শান্তিনিকেতন ১৪, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬, পৃ ৩৯৮-৪০১।

৩ বঙ্গবাণী, ৬ষ্ঠ বর্ষ। ১৩৩৪, পৃ ৫০০।

৪ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবন্ধটি ২ কিস্তিতে প্রকাশিত হয়, প্রবাসী ১১শ ভাগ ১৩১৮ আষাঢ়, পৃ ২৩৩-২৫২। শ্রাবণ পৃ ৩৪০-৩৫১।

৫ "সেই প্রচণ্ড রৌদ্রে বোলপুরের ভুবনডাঙার মত জলহীন প্রান্তরে জন্মোৎসবের নামে দলে দলে ছেলেবুড়ো গিয়া হাজির।"—শান্তাদেবী, রামানন্দ ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা, পৃ ১৬১।

৬ রাজা অভিনয়ে সুদর্শনার ভূমিকা গ্রহণ করেন অজিতকুমার ; অন্যান্য অংশ প্রায় পূর্বের ন্যায়ই।

রাজা

রাজা নাটক রচিত হয় আশ্বিনে (১৩১৭), মুদ্রিত হয় পৌষে; প্রথম অভিনয় হয় শান্তিনিকেতনে ৫ চৈত্র (১৩১৭); দ্বিতীয়বার অভিনয় হয় কবির জন্মদিনে ২৫ বৈশাখ ১৩১৮। ইংরেজিতে এই নাটকের নাম The King of the Dark Chamber অর্থাৎ আঁধার-ঘরের রাজা। 'রাজা' নাটকের গল্পাংশ বৌদ্ধজাতকের কুশজাতকের মধ্যে পাওয়া যায়। "মল্লরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র কুশ ছিল অসাধারণ প্রজ্ঞাবান্ কিন্তু অত্যন্ত কুরূপ। তাহার বিবাহ হইয়াছে মদ্ররাজকন্যা অপূর্বসুন্দরী প্রভাবতীর সহিত। পতিকে দিবালোকে দেখিলে প্রভাবতী তাহাকে ঘৃণা করিবে এই ভয়ে কুশের মাতা পুত্র-পুত্রবধূকে দিনের বেলা সাক্ষাৎ করিতে দেয় না। অবশেষে পুত্রের আগ্রহে রানী ছল করিয়া প্রভাবতীকে দেখাইল। প্রভাবতী স্বামীকে দেখিতে চাহিলে স্বরূপ দেবরকে দেখাইয়া তাহাকে প্রবোধ দেওয়া হইল। কিন্তু পতিপত্নীর সাক্ষাৎ বেশিদিন আটকাইয়া রাখা গেল না। প্রভাবতী কুরূপ স্বামীকে দেখিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে চলিয়া গেল। কুশ তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য শ্বশুরালয়ে নীচবৃত্তি করিতে লাগিল, এবং শেষে প্রভাবতীর পাণিপ্রার্থী রাজাদের হাত হইতে শ্বশুরকে উদ্ধার করিয়া বীর্যশুল্কে পত্নীপ্রেম লাভ করিল।"[১]

রাজা নাটকে তাহা রূপান্তরিত হইয়াছে এইভাবে: রানী সুদর্শনা রাজার বাল্যবিবাহিতা পত্নী, রাজার সহিত অন্ধকার গর্তগৃহে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বাহিরে কখনো দেখেন নাই। রানীর সন্দেহ রাজা কুরূপ, তাই তাঁহাকে দেখা দেন না। দাসী সুরঙ্গমা রাজা সম্বন্ধে যাহা বলে তাহাতে রানীর সন্দেহ বাড়ে। সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে দেখিতে চাহিলে রাজা বলিলেন, "বসন্তপূর্ণিমার উৎসবে তুমি তোমার প্রাসাদের শিখরের উপর দাঁড়িয়ে— চেয়ে দেখো— আমার বাগানে সহস্র লোকের মধ্যে আমাকে দেখবার চেষ্টা কোরো।"[২] অনেক লোকের বিশ্বাস রাজা আদৌ নাই; তাই উৎসবক্ষেত্রে সুবর্ণ রাজবেশ ধরিয়া দেখা দিল। রানী তাহাকেই রাজা মনে করিয়া মুগ্ধ হইল। কাঞ্চীর রাজা সুবর্ণকে সহজেই চিনিয়া ফেলিয়া ও তাহাকে শিখণ্ডী খাড়া করিয়া সুদর্শনাকে পাইবার ষড়যন্ত্র করিল। এই উদ্দেশ্যে প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে অগ্নিসংযোগ করাইল; ঐ অগ্নি দেখিতে দেখিতে প্রাসাদকে ঘিরিয়া ফেলিল। রানী প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অসহায়ভাবে সুবর্ণর নিকট আসিয়া বলিল, "রাজা, রক্ষা করো! আগুনে ঘিরেছে।"[৩] সুবর্ণ নিজ ছলনা স্বীকার করিয়া অতিকষ্টে কাঞ্চীরাজসহ উদ্যান হইতে পলায়ন করিল। রানী লজ্জায় ধিক্কারে জ্বলন্ত প্রাসাদে ফিরিয়া গেল। এমন সময় রাজা তাহাকে উদ্ধার করিতে আসিলেন। আগুনের আলোকে রানী রাজার মুখ ক্ষণিকের জন্য দেখিয়াছিল। সে মুখ কালো, "ধূমকেতু যে আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মতো তুমি কালো …ঝড়ের মেঘের মতো কালো, কূলশূন্য সমুদ্রের মতো কালো…।"[৪] রানীর নয়নে তখনো রূপের নেশা লাগিয়া; সে রাজাকে গ্রহণ করিল না। প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেল।

পিত্রালয়ে সুদর্শনার প্রায়শ্চিত্ত শুরু হইল। কাঞ্চী কোশল প্রভৃতি রাজারা তাহাকে পাইবার জন্য তাহার পিতৃরাজ্য আক্রমণ করিল। স্বয়ংবরা-সভায় ডাক পড়িলে সুদর্শনা দেহপাত করিতে প্রস্তুত হইল; সে অন্তরে রাজার উদ্দেশ্যে বলিল, "দেহে আমার কলুষ লেগেছে, এ দেহ আজ আমি সবার সমক্ষে ধুলোয় লুটিয়ে যাব। কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমার দাগ লাগে নি— বুক চিরে সেটা কি তোমাকে আজ জানিয়ে যেতে পারব না?"[৫]

১ সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। ৩য় খণ্ড ১ম সংস্করণ ১৩৫৯, পৃ ১৮৬।

২ রাজা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ২০০।

৩ রাজা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ২৩৪।

৪ রাজা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ২৩৬।

৫ তু ঘরে-বাইরে। এই কথাই কি একদিন বিমলার মনে আসে নাই, যেদিন নিখিলেশের চলিয়া যাইবার সংবাদ আসে?—রাজা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পৃ ২৫১।

এমন সময়ে রণক্ষেত্রে ডাক পড়িল রাজাদের। ঠাকুরদা যিনি বসন্তপূর্ণিমার উৎসবে সবার সঙ্গে খেলা করিয়া বেড়াইতেছিলেন, সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে যিনি যোগযুক্ত ছিলেন, তিনি আসিলেন বর্ম পরিয়া রাজ-সেনাপতিরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে। যুদ্ধশেষে সুদর্শনা অভিমান আশ্রয় করিয়া বসিয়া আছে বিজয়ী স্বামীর প্রতীক্ষায়। এমন সময় ঠাকুরদা আসিয়া খবর দিল যে রাজা চলিয়া গিয়াছেন। অভিমানের জমাট অশ্রু উথলিয়া উঠিল; রানী সুরঙ্গমাকে সঙ্গে লইয়া পথে বাহির হইল রাজার অভিসারে। রাত্রি শেষ, সূর্য উঠিলে বহুকাল পরে সে তাহার প্রভুর সঙ্গলাভ করিল। যে প্রভু কোনো বিশেষরূপে, বিশেষ স্থানে, বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে-প্রভু সকল দেশে, সকল কালে, আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায় সেই অরূপকে। রানীর প্রেমদৃষ্টি এখন রাজার রূপকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে, তাই রাজা তাহাকে বাহিরে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'এসো, এবার আমার সঙ্গে এসো, বাইরে চলে এসো— আলোয়।'

ইহাই হইতেছে রাজা নাটকের গল্পাংশ। নাটকটি যদিও শুরু হয় একটা বাহিরের উৎসব লইয়া কিন্তু উহা পৌঁছিল গিয়া গভীরের মধ্যে। উহাতে বাহিরের জগৎ হইতে অন্তরের জগতে প্রবেশের অভিযানকে রূপকে নাট্যায়িত করা হইয়াছে। বাহির হইতে অন্তরে প্রয়াণপথে যে আধ্যাত্মিক সংগ্রাম তাহাই ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে। অজিতকুমার ইহাকে অধ্যাত্মরসের নাট্য বলিয়াছেন।

রাজা নাটকের মধ্যে ২৫টি গান আছে; আমরা পূর্বেই বলিয়াছি এগুলিকে গীতাঞ্জলির গীতধারারূপে গ্রহণ করাই উচিত। এই গানগুলির মধ্যে একটি গান বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়:

> বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে।
> দেখিস নে কি শুকনো পাতা ঝরা ফুলের খেলা রে।
> যে ঢেউ ওঠে তারি সুরে
> বাজে কি গান সাগর জুড়ে।
> যে ঢেউ পড়ে তাহারো সুর জাগছে সারা বেলা রে।
> বসন্তে আজ দেখ্‌ রে তোরা ঝরা ফুলের খেলা রে।
> আমার প্রভুর পায়ের তলে
> শুধুই কি রে মানিক জ্বলে।
> চরণে তাঁর লুটিয়ে কাঁদে লক্ষ মাটির ঢেলা রে।
> আমার গুরুর আসন-কাছে
> সুবোধ ছেলে ক'জন আছে।
> অবোধ জনে কোল দিয়েছেন, তাই আমি তাঁর চেলা রে।
> উৎসবরাজ দেখেন চেয়ে ঝরা ফুলের খেলা রে।

এই গানটির মধ্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নূতন ভাবের অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে; ঈশ্বর কেবল ভক্তদের নহেন, তিনি 'লক্ষ মাটির ঢেলা' অবোধজনদেরও কোল দেন। উৎসব এই জনতাকে (mass)কে লইয়া, অবোধজনদের লইয়া— ভক্তদেরও লইয়া।

'রাজা' নাটক পৌষ (১৩১৭) মাসে প্রকাশিত হইল। নয় বৎসর পরে এই নাটিকার অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণরূপে 'অরূপরতন' (১৩২৬ মাঘ) বাহির হইল। এই নাটিকার ভুমিকায় কবি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাই

হইতেছে এই নাটিকার মর্মকথা। 'আমার ধর্ম'[১] প্রবন্ধে কবি প্রসঙ্গক্রমে এই নাটকখানির সর্বপ্রথম আলোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন— "রাজা নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে, রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা ; তার পরে সেই ভুলের মধ্যে দিয়ে, পাপের মধ্যে দিয়ে, যে অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিলে, তা অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে তাতেই তো তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে। প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টির পথ। তাই উপনিষদে আছে, তিনি তাপের দ্বারা তপ্ত হয়ে এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলেন। আমাদের আত্মা যা সৃষ্টি করছে তাতে পদে পদে ব্যথা। কিন্তু তাকে যদি ব্যথাই বলি তবে শেষ কথা বলা হল না, সেই ব্যথাতেই সৌন্দর্য, তাতেই আনন্দ।"

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব বলিয়াছেন,[২] "রূপক ছাড়িয়া দিয়া 'রাজা'কে কেবল একখানি নাটক হিসাবে দেখিলেও আমরা ইহার চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হই। ইহার প্রত্যেক চরিত্রটি স্বাভাবিক ও সজীব। রাজার চরিত্র মাহাত্ম্যপূর্ণ। তিনি বজ্রের মতো কঠিন আর ফুলের মতো কোমল। তাই তাঁহার ধ্বজাচিহ্ন পদ্মের মাঝে বজ্র। কোনো দীনতা, কোনো হীনতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি অদম্য, অনম্য ; কিন্তু অন্তরে অন্তরে কত প্রেমপূর্ণ। এই রাজা বিশ্বরাজের সুন্দর প্রতীক। মঞ্চে তিনি দেখা দেন না। ইহাতে তাঁহার লোকাতীত মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে। রানী সুদর্শনা সকল রানীরই মতো অভিমানিনী, কৌতূহল চরিতার্থ করিতে ব্যগ্র। যখন তিনি বাহ্যত স্বামীর প্রতি বিরাগিণী অন্তরে তিনি তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরাগিণী। দুঃখ-কষ্ট ভোগের পর স্বামীর প্রতি প্রাণের আকর্ষণে তাঁহার অভিমানে ছাই পড়িল। পরিশেষে তিনি তাঁহার চরণের দাস্রী হইয়াই জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিলেন। ভণ্ড যেরূপ ভীরু হয় ভণ্ডরাজ তেমনই ভীরু। তাহার বাহ্যরূপ ব্যতীত আর কোনো গুণই নাই। এইজন্য তাহার ধ্বজায় কিংশুক ফুল আঁকা। কাঞ্চীরাজ সাহসী, দুরাকাঙ্ক্ষ বীর। বুদ্ধি ও উপায়-কৌশলে তিনি সুনিপুণ। তিনি যুদ্ধে নির্ভীক। কিন্তু পরাজিত হইলে তিনি বিজয়ী বীরের নিকট বশ্যতা স্বীকারে কুণ্ঠিত নন। ইহা বীরত্বের প্রতি বীরের শ্রদ্ধাঞ্জলি দান। ঠাকুর্দা সরল সদানন্দ। বন্ধুর কাজ করিয়াই তাঁহার আনন্দ, এই তাঁহার পুরস্কার। কে সহজে বিশ্বাস করিতে পারে যে বন্ধুর প্রয়োজনে এই নাচিয়ে গাইয়ে আপনভোলা মানুষটিও অসি ধারণ করিতে পারে? বন্ধুত্বের খাতিরে তিনি পারেন না এমন কিছুই নাই। সুরঙ্গমা ভক্তিমতীর নারীর চিত্র। রোহিণী বুদ্ধিমতী নারীর ছবি। নাটকের আদ্যোপান্ত সমস্ত পাত্রপাত্রী আপনাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছে। কেহ নাম বলিয়া না দিলেও তাহাদিগকে চিনিয়া লইতে কষ্ট হয় না।

"ভালোবাসা, বিরহ, মিলন, প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রেমাস্পদ, উৎসব-উদ্যান, রণক্ষেত্র, নৃত্য-গীত, যুদ্ধ-বিগ্রহ যাহা-কিছু নাটকে গতি দান করে, বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে সমস্তই এই 'রাজা' নাটকে আছে। রানীর মনে গভীর বিষাদ। বাহিরে প্রমোদ-বনে আনন্দ উৎসব। ইহাতে নাটকে একসঙ্গে আলো-আঁধারের বৈচিত্র্য দান করিয়াছে। অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক দ্বারা চিহ্নিত না হইলেও দৃশ্যকাব্যের সকল লক্ষণই ইহাতে আছে। প্রেমাস্পদের আলিঙ্গন অন্তে তাহার প্রেমের অনুভূতি যেমন দেহ-মন আনন্দবিহ্বল করিয়া রাখে, তেমনই 'রাজা' নাটকের অভিনয় শেষে তাহার অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক মধু রসটি সমগ্র হৃদয়-মন ভাবাবিষ্ট করে। নাট্যকারের চরম সার্থকতা এইখানে।"

১ আমার ধর্ম, সবুজ পত্র, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪। আত্ম-পরিচয়, পৃ ৬২-৬৩।

২ বেতার-বক্তৃতা, ঢাকা। প্রবাসী ১৩৫২ শ্রাবণ, পৃ ২৫৬-২৫৭।

জীবনস্মৃতি

শান্তিনিকেতনে পঞ্চাশৎ জন্মোৎসবের (১৩১৮ বৈশাখ ২৫) পরদিনই কবি কলিকাতায় ও তথা হইতে অচিরকালের মধ্যে শিলাইদহে চলিয়া গেলেন। সেইখানে রথীন্দ্রনাথরা আছেন।

তাঁহারা জমিদারিতে কৃষি প্রভৃতি উন্নতির জন্য মহোৎসাহে কাজে লাগিয়াছেন; জামাতা নগেন্দ্রনাথও কৃষিবিষয়ক নানা পরীক্ষায় নিযুক্ত। শান্তিনিকেতনে সন্তোষচন্দ্র বিরাট গোগৃহ স্থাপন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কল্পনাপ্রবণ মন সেদিন নিশ্চয়ই আশায় আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছিল। হয়তো সেদিন ভাবিয়াছিলেন যে, দেশে উন্নতির যে-স্বপ্ন বঙ্গচ্ছেদ-আন্দোলনের দিনে দেখিয়াছিলেন, যে-আদর্শ 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে প্রচার ও নিজ জমিদারিতে প্রবর্তনের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তাহা আজ মূর্তি লইবে! তিন বৎসর মাত্র আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া তথাকার ডিগ্রীমাত্র লইয়া যে যুবকরা দেশে ফিরিয়াছেন, দেশ সম্বন্ধে যাঁহাদের কোনো অভিজ্ঞতা নাই, মানুষ সম্বন্ধে জ্ঞান যাঁহাদের নিতান্ত সংকীর্ণ, সেই কাণ্ডজ্ঞানহীনদের উপর বিরাট কর্মের ভার দিয়া কবি আশার স্বপ্ন বুনিতেছেন! বাস্তবের রূঢ়তা পদে পদে যে তাঁহার কল্পনাকে ধূলিসাৎ করিবার জন্য বদ্ধমুষ্টি— কবি, কবিপুত্র, জামাতা ও বন্ধুপুত্রের নিকট সেদিন তাহা স্বপ্নের অতীত ছিল; তাঁহাদের সকলেরই 'মনে ছিল আশা, আরামে দিবস যাবে'।

কবি মাস দেড় শিলাইদহে কাটাইলেন[১] আষাঢ়ের বর্ষা নামিলে, তাঁহার অন্তরেও গানের সুর জাগিল, তিনি লিখিলেন 'অচলায়তন' (১৫ আষাঢ় ১৩১৮)। বর্ষার আবাহন দিয়া ইহার সূত্রপাত। বোধ হয় বর্ষাঋতুর উপযোগী ছেলেদের জন্য একখানি নাটক রচনার কথা কবির মনে হইয়াছিল, শারদলক্ষ্মীর আবাহনে 'শারদোৎসব' মুখরিত হইয়াছিল; বসন্তরাজের উৎফুল্ল উপবনে 'রাজা'র আবির্ভাব হয়।

আষাঢ়ের শেষভাগেই কবি কলিকাতায় ফিরিয়াছেন. সেখানে সম্পূর্ণ অন্য জগৎ। একখানি পত্রে লিখিতেছেন (৬ শ্রাবণ ১৩১৮), "পাঁচ ছয় দিন হইল বিশেষ চেষ্টায় বিদ্যালয়ের জন্য তিন হাজার টাকা শতকরা বারো টাকা সুদে ধার লইয়াছি; কি উপায়ে শোধ করিতে হইবে এখন হইতে তাহা চিন্তার বিষয়। প্রাচীন দেনার বোঝা [কুষ্টিয়ার ব্যাবসার]··· আছে··· প্রতিমাসে তাহার সুদ জোগাইতেছি। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন চপলা লক্ষ্মী আমার প্রতি নিগ্রহ সম্বন্ধে কিরূপ অচপল···। আমার হাতে দেনা কেবলি বাড়িয়া চলিয়াছিল দেখিয়া বিষয়ের ভার সম্পূর্ণ রথীর হাতে দিয়া আমি সংসারের রণে হার মানিয়া ভঙ্গ দিয়াছি।"[২]

গত দশ বৎসর কি অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্য দিয়া বিদ্যালয়ের দিন গিয়াছিল, তাহার ইতিহাস আজ কেইবা জানে? 'আয়' বলিতে ছিল ছাত্রদত্ত বেতন, ত্রিপুরা মহারাজার বাৎসরিক সহস্র মুদ্রা ও শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের কিছু টাকা। বলা বাহুল্য, এই আয় হইতে বিদ্যালয়ের সাধারণ ব্যয় বহন করা অসম্ভব। তাই কবিকেই ঘাটতি পূরণ করিতে হইত। নিজ সামর্থ্যে যখন কুলাইত না তখন দেনা করিতে হইত। ঐ দেনা শোধ করিতে পুনরায় বেশি হারে সুদ দিয়া দেনা করিতে হইত, কখনো বা নিজের বই বা গ্রন্থাবলী ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রয় করিয়া ঋণ শোধ দিয়াছেন। মোট কথা বিদ্যালয়ের জন্য অর্থের ব্যবস্থা কবিকে যে প্রকারেই হউক করিতেই হইত। কিন্তু তিনি তো প্রায়ই এখানে সেখানে ঘুরেন। শান্তিনিকেতনে দীর্ঘকাল একসঙ্গে খুবই কম থাকিতেন। বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজের ঝঞ্ঝাট বহন করিতেন দ্বিপুবাবু বা দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মহর্ষির মৃত্যুর পর দ্বিপেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে চলিয়া আসেন ও অতিথিশালার একতল গৃহে বাস করিতেন। বহু বৎসর বিদ্যালয়ের দুর্দিনে তিনি উহার হাল ধরিয়া ছিলেন। শান্তিনিকেতনের ইতিহাসের সহিত একটা পর্ব পর্যন্ত তাঁহার কথা অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিল।

১ কয়েকখানি পত্র, কাদম্বরী দেবীকে লিখিত। নং ৩, শিলাইদা ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ [১৯১১ জুন ১১], পত্র নং ৩ শিলাইদা নদিয়া, ৮ আষাঢ় ১৩১৮ [১৯১১ জুন ২৩)। প্রবাসী ২৭শ ভাগ, ২য় খণ্ড ১৩৩৪ পৌষ, পৃ ৩৯৬-৭৯৭।

২ স্মৃতি পৃ ৮২।

শ্রাবণ মাসের গোড়ার দিকে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। এবার 'জীবনস্মৃতি'র খসড়া লইয়া উহাকে 'সুখপাঠ্য' 'বিশুদ্ধ সাহিত্যের সৌরভে' ফুটাইয়া তুলিবার জন্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময়ে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে আহ্বান আসিল ভাদ্রোৎসবে ভাষণ দানের জন্য। আদি ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারপ্রচেষ্টা হইতে সাধারণ সমাজের যুবকদের সহিত কবির ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই আহ্বান সেই যোগস্থাপনেরই ফলে। কবি ৬ ভাদ্র (১৩১৮) কলিকাতায় গিয়া 'ধর্মের অর্থ'[১] শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। ৬ ভাদ্র হইতেছে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার দিন (১৮২৬ আগষ্ট ২০)।

এই ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে কবির জীবনস্মৃতি প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হইল। ধারাবাহিকভাবে শ্রাবণ ১৩১৯ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি সকলের সুপরিচিত গ্রন্থ; সুতরাং এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই। কবি ঠিক কোন্ সময়ে যে এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছিলেন বলা যায় না; ১৩১৮ সালের ভাদ্র মাস হইতে প্রবাসীতে উহা প্রকাশিত হয়। কয়েক মাস পূর্বে 'বেঙ্গলি' ইংরেজি দৈনিকের সহকারী সম্পাদক পদ্মিনীমোহন নিয়োগী কবিকে তাঁহার জীবনের ঘটনা জানিবার জন্য পত্র দেন। কবি তদুত্তরে (১৩১৭ ভাদ্র ২৮) এক পত্রযোগে জীবনের কয়েকটি কথা জ্ঞাপন করেন।[২] জীবনস্মৃতির সূচনায় কবি লিখিয়াছেন, "কয়েক বৎসর পূর্বে একদিন কেহ আমাকে আমার জীবনের ঘটনা জিজ্ঞাসা করাতে একবার এই ছবির ঘরে খবর লইতে গিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, জীবনবৃত্তান্তের দুই-চারিটা উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। কিন্তু দ্বার খুলিয়া দেখিতে পাইলাম, জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে— তাহা কোন্ এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা।" আমাদের মনে হয় কবি এই যে ঘটনাটির উল্লেখ করিলেন তাহা ১৩১১ সালের 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের জন্য আত্মকাহিনী রচনার আহ্বান। সেখানে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা জীবন-কাহিনী নহে, তাহা তাঁহার অদৃশ্য জীবনদেবতা কিভাবে স্বহস্তে তাঁহাকে রচনা করিয়াছিলেন তাহারই ব্যাখ্যান।[৩]

জীবনস্মৃতির খসড়া গত বৎসর সমাপ্ত হয়; কবি তাঁহার জন্মোৎসবের পূর্বে এই গ্রন্থখানি খসড়া হইতে পড়িয়া আমাদিগকে শোনান। জন্মোৎসবের পর চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবাসীতে জীবনস্মৃতি ধারাবাহিক প্রকাশের জন্য চাহিয়া বসিলেন। কবি তাঁহাকে লিখিলেন (৮ জ্যৈষ্ঠ), "এতদিন আমার কাব্য নিয়ে অনেক টানাটানি গিয়েছে —এখন বুঝি জীবন নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি করতে হবে?··· আপাতত আমার জীবন নিরাপদে আমারই অধীনে থাকবে, এইটেই সংগত।" তবে তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে রামানন্দবাবুর মত জানিতে পারিলে তিনি উহা প্রবাসীতে প্রকাশ সম্বন্ধে ভাবিবেন। সাত দিন পরে চারুচন্দ্রকে লিখিলেন যে, "তোমার হাতেই জীবন সমর্পণ করা গেল।" তবে পত্রিকায় পাঠাইবার পূর্বে বহু অদল-বদল করিয়া রচনাটিকে 'সুখপাঠ্য' করিয়া তুলিলেন।[৪]

জীবনস্মৃতি সন তারিখ বিবর্জিত কবিকাহিনী; জীবনীর উপাদান উহাতে আছে প্রচুর কিন্তু যথার্থ জীবনেতিহাস বলিতে যাহা সাধারণত বুঝায় ইহা সে-শ্রেণীর গ্রন্থ নহে। পৃথিবীর অনেক সেরা লেখক আত্মজীবনী লিখিয়াছেন।

১ ধর্মের অর্থ, তত্ত্ববোধনী পত্রিকা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১৮। সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ৩৫৬-৩৭২।

২ দ্র প্রবাসী ১৩৪৮ কার্তিক।

৩ ১৩০২ সালে 'সখা ও সাথী'র শ্রাবণ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী বাহির হয়। পরমাসে ঐ প্রবন্ধের কয়েকটি ভ্রম প্রদর্শন করাইয়া কবি নিজ জীবনী সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য লেখেন। ইহাই বোধ হয় কবির নিজহস্ত রচিত প্রথম জীবনকথা। দ্র শনিবারের চিঠি ১৩৪৮ আশ্বিন।

৪ দ্র জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭, শ্রীনিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত পরিশ্রমের সহিত সম্পাদন করিয়া বহু তথ্য আমাদের গোচরীভূত করিয়াছেন।

তাঁহাদের কেহ কেহ নিজ জীবনকথা অসংকোচে বলিয়া গিয়াছেন, ঘটনার বাছাবাছি করেন নাই। "আত্মজীবনীর মূল কথা হল··· জীবন ব্যাখ্যা। সুতরাং আত্মজীবনীর সবটা বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় না, যেমন বোঝা যায় জীবনীর। বৃত্তান্তের ভার কমিয়ে অন্তর্লোকের যে রহস্যের ব্যাখ্যা স্রষ্টারা করে থাকেন তাকে অনেকটা বুঝে নিতে হয় নিজের বোধ দিয়ে, নিজের অনুভূতি দিয়ে।··· আত্মজীবনী ইতিহাস নয়, আত্মজীবনী মানুষের হয়ে-ওঠার কাহিনী। চেতনার জাগরণ আর বিকাশই হল আত্মজীবনীর বলবার কথা।"[১] রবীন্দ্রনাথ জীবনের যে কথাগুলি স্মরণীয়, সেইগুলি সুন্দর সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কবিজীবনের প্রথম চব্বিশ বৎসর মাত্র এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে অর্থাৎ 'কড়ি ও কোমলে'র অন্তে আসিয়া থামিয়াছেন। জীবনের গঠন-পর্বটি বর্ণিত হইয়াছে, পরিণত পর্বের কোনো কথা বলেন নাই। তাই উপসংহারে লিখিলেন, "জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে সমস্ত ভালোমন্দ সুখদুঃখের বন্ধুরতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে তাহাকে কেবলমাত্র ছবির মতো করিয়া হালকা করিয়া দেখা আর চলে না।··· অতএব খাসমহালের দরজার কাছে পর্যন্ত আসিয়া এইখানেই আমার জীবনস্মৃতির পাঠকদের কাছ হইতে আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।" ইহার পর বহুবার বহু অনুরক্ত ভক্তদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়াও কবি নিজ জীবনকাহিনী লিখিতে আর প্রবৃত্ত হন নাই। তবে তাঁহার 'ছিন্নপত্র' যাহা একই সময়ে 'জীবনস্মৃতি'র সহিত প্রকাশিত হয়, তাহাকে আমরা কবির পরবর্তী জীবনের দশ বৎসরের আত্মকথাই বলিব। এবিষয়ে আমরা প্রথম খণ্ডে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি।

'প্রবাসী'তে জীবনস্মৃতি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলেই সমালোচকের তীক্ষ্ণ কশাঘাত কবির উপর যথাসময়ে আসিয়া পড়িল। 'সাহিত্য' পত্রিকা লিখিলেন (১৩১৮ কার্তিক, পৃ ৫৭১), "রবীন্দ্রনাথের সাত আট বৎসর বয়সের সংঘটিত ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পড়িয়া কবিবরের স্মৃতিশক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। 'জীবনস্মৃতি' পল্লবিত রচনার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।" অন্যত্র সমালোচক লিখিতেছেন যে, কবি "আপনার অতীতকে বর্তমান কালের চিন্তা ও অনুভূতির রাগে রঞ্জিত করিয়া ফলাইয়া তুলিতেছেন। সুদূর অতীতে তখনকার রবীন্দ্রনাথ যে-যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, সেই-সেই অবস্থাচক্রে পড়িলে এখনকার রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে ও ভাবনায় অনুপ্রাণিত হইতেন, কল্পনাকুশল কবি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া সুখপাঠ্য সুন্দর সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছেন।" —সাহিত্য ১৩১৯ বৈশাখ।

'জীবনস্মৃতি'র পাণ্ডুলিপি প্রবাসীতে দিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া ফেলেন বোধ হয় আষাঢ়ের শেষেই। সামনে এখন কাজ কম, তাই আপনমনে ব্যাকরণের সমস্যা ও সমাধান লইয়া মগ্ন। ভাষা লইয়া আলোচনা তাঁহার আবাল্যের বিলাস। তাই দেখি এখন লিখিতেছেন 'বাংলা ব্যাকরণের তির্যকরূপ' (প্রবাসী ১৩১৮), 'বাংলা ব্যাকরণের বিশেষ বিশেষ্য' (ভাদ্র), 'বাংলা নির্দেশক' (আশ্বিন), 'বাংলা বহুবচন' (কার্তিক), 'স্ত্রীলিঙ্গ' (অগ্রহায়ণ)।

দীর্ঘ অবকাশের পূর্বে শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা কবির কোনো-না-কোনো নাটক অভিনয় করিত: এখনো সে প্রথা আছে। তবে এখন কবির রচনা ছাড়া অন্যের রচিত নাটকাদিরও অভিনয় মাঝে মাঝে হইয়া থাকে। এবার পূজাবকাশের পূর্বে 'শারদোৎসব' নাটকটির অভিনয় হইল (৬ আশ্বিন ১৩১৮)। কবি সন্ন্যাসীর ভূমিকা গ্রহণ করেন।[২] অভিনয়ের পরের দিনই বোধ হয় কবি কলিকাতা চলিয়া গেলেন।

১ সোমেন বসু, 'বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী', পৃ ৩।

২ চিঠিপত্র ৪, পৃ ৩০। চিঠিপত্র ৩, পৃ ১৭।

অচলায়তন

পাঠকের স্মরণ আছে গত আষাঢ় মাসে কবি যখন শিলাইদহে সেই সময়ে 'অচলায়তন' নাটকখানি লেখেন। (১৫ আষাঢ় ১৩১৮, ৩০ জুন ১৯১১) কলিকাতায় আসিয়া কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশের গৃহে প্রথম পাঠ করিয়া শোনান। পাঠের সঙ্গে গানগুলি কবিকণ্ঠে গীত হইয়াছিল। তিন মাস পরে এতদিনে প্রবাসীর পূজা সংখ্যায় নাটকটি প্রকাশিত হইল। গ্রন্থখানি এই অবস্থায় অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের নামে উৎসর্গীত করা হয়। কিন্তু পর বৎসর (১৩১৯) শ্রাবণ মাসে যখন উহা পুস্তকাকারে আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল তখন তাহাতে উৎসর্গ-পত্রটি আর দেখা যায় না। কবির বহু গ্রন্থেই এরূপ হইয়াছে, প্রথম সংস্করণের উৎসর্গপত্র পরবর্তী সংস্করণে নাই। ইহা অনবধানতা হইতেও পারে, না হইতেও পারে।

বর্ষার আবাহন দিয়া 'অচলায়তন' আরম্ভ; বর্ষার বারিধারা চিরদিনই রসিকচিত্তে বিরহের সুর ধ্বনিয়া তোলে— 'কৈসে গোঙায়বি হরি বিনে দিনরাতিয়া'— এই ভাবটি চিরবিরহীর অন্তরের অশ্রুসিক্ত বাণী। অচলায়তনে পঞ্চকের তৃষিত চিত্ত তথাকার আচারনিষ্ঠ যন্ত্রজীবনের মধ্যে থাকিয়া অকারণে চঞ্চল। অহেতুকী তাহার বেদনা। তাই তাহার ক্রন্দন সংগীতে মুখরিয়া উঠিল—"তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে কেউ তা জানে না।" অচলায়তনের মধ্যে আমাদের চিরপিপাসিত আত্মা সেই আহ্বানের অপেক্ষায় প্রতীক্ষমাণ।

অচলায়তন নাটকে মহাপঞ্চক ও পঞ্চক দুইটি বিপরীত প্রকৃতি ও বিভিন্ন শক্তি। আখ্যানের দিক হইতে ইহারা পরস্পর সহোদর ভ্রাতা, সুতরাং উভয়ের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। অথচ দুইজন সর্বপ্রকারেই বিপরীত-ধর্মী— একজন নিষ্ঠার প্রতীক, অপরজন নিষ্ক্রমণের মূর্তি— এ যেন দিন ও রাত্রি, তবে দিন ও রাত্রি পরস্পরের বিপরীত হইলেও বিরুদ্ধ নহে, তাহারা পরস্পরের পরিপূরক— একের অভাবে অন্যের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং উহাদের সম্বন্ধ আপেক্ষিক এবং সেইজন্য উভয়ে মিলিয়াই পূর্ণ। আমাদের অধ্যাত্ম জীবনেও এই পঞ্চক ও মহাপঞ্চকের বাস— উহারা জীবনের গতি ও স্থিতির প্রতীক, কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রানুগ শক্তির মূর্তি। জীবনক্ষেত্রে যে বলে গতিই সত্য, স্থিতি মিথ্যা— সে সত্যকে জানে না। আবার যে বলে স্থিতিই শাশ্বত, গতি মিথ্যা— সেও সত্য হইতে বহু দূরে। যাহা-কিছু স্থিতিশীল ও প্রাচীন, শাস্ত্রীয় ও সনাতনী তাহাকেই অন্ধভাবে পুনরাবৃত্তি করিয়া যাওয়াই হইতেছে মহাপঞ্চকের আচারক্লিষ্ট ধর্মসংস্কার। আর এই সমস্তকে আঘাত করাতেই পঞ্চকের উল্লাস। প্রাচীন আচারকে পঞ্চক মানে না, শাস্ত্র সে পড়ে না, যাগযজ্ঞ সে করে না, ব্রত-উপবাস পালে না — জ্যেষ্ঠদের যুক্তিহীন ধার্মিকতা তাহার নিকট অসহ্য। যাহা-কিছু যুক্তিসিদ্ধ নহে, যাহা-কিছু অনুভূতিলব্ধ নহে— তাহাতেই পঞ্চকের সংশয়। তাহার কাছে বিচার ও বোধি (criticism, intuition) হইতেছে সত্যজ্ঞানের পথ। অথচ তাহার জ্যেষ্ঠ মহাপঞ্চক নিষ্ঠায় নির্ভর: যুক্তিহীন বিশ্বাস, দাসসুলভ আনুগত্য, রসহীন সাধনায় সে মগ্ন। সে বিশ্বাস করে 'তাসের দেশের' পুতুল -সৃষ্টিতে। এই নাটকে কবি নিষ্ঠা ও নিষ্ক্রমণের মধ্যে বিরোধের চিত্রটি আঁকিয়াছেন সত্য, কিন্তু শেষকালে উভয়েরই জয় ও উভয়েরই পরাজয় ঘটাইয়া যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহাই হইতেছে যথার্থ সমন্বয়ধর্মের আদর্শ। অতীতের স্মৃতির উপরেই বর্তমানের প্রতিষ্ঠা, প্রাচীনের স্থিতির বুকেই নবীনের গতি সম্ভব।

নাটকে শোণপাংশু (যূনক) ও দর্ভকরা দুইটি বিপরীত শক্তির প্রতীক। ইহারা যেন প্রতীচ্য ও প্রাচ্য জগতের মূর্তি। একদল সর্বকাজেই হাত লাগায়, কঠিন লোহার কঠিন ঘুম ভাঙায়, হারজিতকে ও অদৃষ্টকে হাস্যমুখে পরিহাস করে; অকারণে তাহারা চঞ্চল। শোণপাংশুরা হইতেছে যেন দুরন্ত য়ুরোপের যৌবনশক্তি, যাহারা বলে কর্মেই কর্মের

শেষ— তাহার পরিণাম নাই, উদ্দেশ্য নাই, যাহারা পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে গিয়া ধর্মকর্ম করিবার কল্পনা মনে আনে না, যাহারা বলে, life is real, life is earnest, যাহাদের আদর্শ to die in harness অর্থাৎ লাগামমুখে হুমড়াইয়া পড়িয়া মরা।

আয়তনের বাহিরে দর্ভকপল্লী; ভক্তিবিনম্র দাস্যভাবের সাধনা তাহাদের। বিশ্বাস কেন করিব— সে প্রশ্নই তাহাদের মনে আসে না; অহেতুকী ভক্তিতে তাহারা গদগদ। নৈষ্কর্ম্য ও নিষ্ক্রিয়তা তাহার কাছে সমার্থক, উদারতা ও ঔদাসীন্য প্রতিশব্দবাচক।

সমস্ত আয়তন ও আবেষ্টনীর মধ্যে একমাত্র পঞ্চকই আপনাকে মানাইতে পারিতেছে না, অথচ সমস্ত কিছুকে দলিয়া ভাঙিয়া বাহিরে আসিবার প্রেরণা সে পায় না; আশ্রয়চ্যুত হইবার সাহস তাহার নাই - ঐতিহ্য ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করিতেও তাহার মন চায় না। তাই পঞ্চক বিদ্রোহী, বিপ্লবী নহে। সে আয়তনের নিয়মনিষেধ না মানিয়া আয়তনের আশ্রয়েই ফিরিয়া আসে। শোণপাংশু ও দর্ভকদের সহিত একান্ত হইবার জন্য তাহার ইচ্ছা জাগে, কিন্তু কার্যে পরিণত করিবার বাধা অন্তরের সংস্কারে। তাছাড়া, এই ম্লেচ্ছ ও ব্রাত্যদের মধ্যে সে পরিপূর্ণ জীবনের সন্ধান পায় না, যাহার জন্য তাহার সংস্কার ত্যাগ করা সার্থক হইতে পারে। তাই পঞ্চকের সংগ্রাম প্রবীণের সহিত, তাহার সংগ্রাম নবীনের সহিত, তাহার সংগ্রাম গতির সহিত, তাহার সংগ্রাম স্থিতির সহিত। সে অতীতের সহিত বর্তমানকে, গতির সহির স্থিতিকে, প্রাচীনের সহিত নবীনকে একই মাল্যবন্ধনে বাঁধিতে চায়— এই তাহার কঠোর সাধনা।

পঞ্চককে কবি যদি কেবল বিদ্রোহী করিয়া গড়িতেন, তবে পঞ্চকের চরিত্র এত জটিল হইত না। কবি তাহার মধ্যে এমন-একটি ভাবপ্রবণতা দিয়াছেন যাহা আপাতদৃষ্টিতে পাঠককে বিভ্রান্ত করে। ভাঙিবার জন্য তাহার যেমন উৎসাহ, গড়িবার জন্য তাহার উৎকণ্ঠা তদপেক্ষা কম নাই; তাই তাহার বলিষ্ঠ অস্বীকৃতি নঙাত্মক নহে। তাহার অস্বীকৃতি বাহিরের আবরণ ও আচরণের বিরুদ্ধে— অন্তরে সে রসপিপাসু, সত্যসন্ধানী, সৃজনশিল্পী; তাহার অন্তরের কথা—'আমার মন যে কাঁদে আপন-মনে, কেউ তা মানে না।' এ যেন কবির নিজ অন্তরের মূর্তি ও বাণী।

এখানে একটি কথা পরিষ্কার করিয়া বলা উচিত— শোণপাংশুদের সদাচঞ্চল জীবনধারার গতি ও পঞ্চকের মুক্তিকামী মনের গতি একধর্মী নহে। অপরদিকে সে আপনাকে রসের মধ্যে নিমজ্জিত করিতে চাহে; তবে সে-রসের সাধনা দর্ভকদের কর্মহীন ভক্তিমার্গ নহে। সে শোণপাংশুদের কর্মও চায়, দর্ভকদের ভক্তিও চায় এবং গুরুর নিকট হইতে জ্ঞানও চায়; পঞ্চকের সংশয় অবিশ্বাসীর মূঢ় দম্ভ নহে, নাস্তিকের নেতিবাদ নহে, তাহা বর্ষার মেঘের ন্যায় রসসিক্ত— কালবৈশাখীর ভৈরব মূর্তিতে তাহার প্রকাশ হয় না। সে চায় কর্ম ভক্তি ও জ্ঞানের সংশ্লেষণ নিজ জীবনে।

আয়তনের মধ্যে যেসব বিভিন্ন বিপরীত ও বিরুদ্ধ ভাবধারা সন্নিবেশ অর্জন করিতেছে— তাহাদিগকে শাশ্বত বলিয়া মানিয়া লওয়া হয় নাই। সমস্তই সমন্বিত হইযাছে গুরুর মধ্যে— যিনি শোণপাংশুদের দাদাঠাকুর, দর্ভকদের গোঁসাই, আয়তনের গুরু— ও পঞ্চকের দাদাঠাকুর-গুরু। এই গুরুই আয়তনের প্রাচীর ভেদ করিয়া ম্লেচ্ছ অস্পৃশ্যদের লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। আয়তনের কেহই গুরুকে চেনে না, চেনে কেবল মন্দিরের শঙ্খবাদক ও মালঞ্চের মালি— যাহাদের মন শাস্ত্রের কুয়াশায় আচ্ছন্ন নহে, যাহারা শব্দ ও রূপের মধ্য দিয়া বিশ্বকে জানিয়াছে। আর গুরুকে জানে পঞ্চক যে সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়া গুরুকে সর্বত্র অনুভব করে; তবে তাহা আয়তনের গুরু বলিয়া নহে— তাঁহাকে সে জানে দাদাঠাকুর-গোঁসাই বলে। পঞ্চকের দৃষ্টি স্বচ্ছ— শাস্ত্র ও আচারের আবর্জনায় উহা মলিন নহে, মূঢ় ভক্তিরসে তাহার চিত্ত উন্মত্ত নহে— আচারক্লিষ্ট, দেহমনের অবসরহীনতার অগৌরবকে সে স্পর্ধাভরে জীবনের চরম সার্থকতা বলিয়া ঘোষণা করে না, গুরুকে চিনিতে ও তাঁহাকে স্বীকার করিয়া লইতে তাহার বিলম্বও হইল না— দ্বিধাও হইল না —সে যেন ফাল্গুনীর চন্দ্রহাস যে জীবন সর্দারকে সহজেই চিনিয়া লয়।

আয়তনের দুর্লঙ্ঘ্য দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভাঙিলে গুরুর নেতৃত্বে ম্লেচ্ছ ও অস্পৃশ্যরা আয়তন অধিকার করিল— সকলেরই মনে হইতেছে বিদ্রোহেরই জয়, গতিরই জয়, ভাঙনদেবতার জয়— সনাতনের পরাভব ও প্রাচীনের উচ্ছেদ সুনিশ্চিত। কিন্তু মহাপঞ্চকের সাধনাকে গুরু অস্বীকার করিলেন না ; বিধ্বস্ত আয়তনের ধ্বংসস্তূপের উপর নূতন করিয়া সাধনপীঠ বসিল— নিষ্ঠার উপর সত্যের সাধনা প্রতিষ্ঠিত। চঞ্চলতা জীবনের একমাত্র লক্ষণ নহে, শান্তভাব মৃত্যুর চিহ্ন নহে। পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের তাড়না হইতে আত্মাকে রক্ষা ও বিদ্রোহ হইতে চিত্তকে শমিত করিতে পারিলেই সাধনা সম্পূর্ণ ও সার্থক হয়। পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের উপর হইতেছে মন, সেই ইন্দ্রিয়োত্তম বা ইন্দ্রিয়শ্রেষ্ঠকে মহাপঞ্চক বলা যাইতে পারে। ইন্দ্রিয়ের দমন করা বরং যায়, কিন্তু মনকে দমন করা বড়ই কঠিন। মহাপঞ্চক নিজ নামকে সার্থক করিয়া মনের পঞ্চ-ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়াছেন। সেইজন্য আয়তনকে নূতন করিয়া গড়িবার ভার পঞ্চকের উপর অর্পিত হইলেও মহাপঞ্চকের নির্বাসন হইল না। "তার ওখানে কাজ। . কী করে আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে উঠতে হয় সেইটে শেখাবার ভার ওর উপর। ক্ষুধা-তৃষ্ণা লোভ-ভয় জীবন-মৃত্যুর আবরণ বিদীর্ণ করে আপনাকে প্রকাশ করবার রহস্য ওর হাতে আছে।"[১] ইহাই ভারতের চিরন্তন শিক্ষা। আয়তনের শোণপাংশুদের উপর নূতন সৌধ রচিবার ভার পড়িল। নিষ্ঠা ও নিষ্ক্রমণের মিলনে নূতন জগত গড়িতে সকলে চলিল।

আশ্বিনের প্রবাসীতে 'অচলায়তন' প্রকাশিত হইলে, সাময়িক সাহিত্যে এই নাটকের বহু সমালোচনা বাহির হয়। ইহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা (আর্যাবর্ত ২য় বর্ষ, ১৩১৮ কার্তিক)। ইহাতে নাটিকাটির প্রশস্তি ও তিরস্কার দুইই ছিল। অধ্যাপক ললিতকুমারকে লিখিত একটি পত্রে[২] রবীন্দ্রনাথ সমালোচনার উত্তর দেন।

রবীন্দ্রনাথ সমাজ ভাঙিতেছেন, তিনি মন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন প্রভৃতি দোষারোপের জবাবে তিনি লিখিলেন, "অচলায়তনের গুরু কি ভাঙিবার কথাতেই শেষ করিয়াছেন ? গড়িবার কথা বলেন নাই ? পঞ্চক যখন তাড়াতাড়ি বন্ধন ছাড়াইয়া উধাও হইয়া যাইতে চাহিয়াছিল তখন কি তিনি বলেন নাই 'না যাইতে পারিবে না— যেখানে ভাঙা হইল এইখানেই আবার প্রশস্ত করিয়া গড়িতে হইবে' ? গুরুর আঘাত, নষ্ট করিবার জন্য নহে, বড়ো করিবার জন্যই। তাঁহার উদ্দেশ্য ত্যাগ করা নহে, সার্থক করা।" রবীন্দ্রনাথ একদিকে বিদ্রোহী অন্যদিকে reformist। 'অচলায়তনে মন্ত্রমাত্রের প্রতি তীব্র শ্লেষ প্রকাশ করা হইয়াছে' বলিয়া যে অভিযোগ উঠিয়াছিল তাহার জবাবে বলিলেন, "মন্ত্রের সার্থকতা সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু মন্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য মননে সাহায্য করা। কিন্তু সেই মন্ত্রকে মনন-ব্যাপার হইতে যখন বাহিরে বিক্ষিপ্ত করা হয়, মন্ত্র যখন তাহার উদ্দেশ্যকে অভিভূত করিয়া নিজেই চরম পদ অধিকার করিতে চায় তখন তাহার মতো মননের বাধা আর কী হইতে পারে। কতকগুলি বিশেষ শব্দসমষ্টির মধ্যে কোনো অলৌকিক শক্তি আছে, এই বিশ্বাস যখন মানুষের মনকে পাইয়া বসে তখন সে আর সেই শব্দের উপরে উঠিতে চায় না। তখন মনন ঘুচিয়া গিয়া সে উচ্চারণের ফাঁদেই জড়াইয়া পড়ে। তখন চিত্তকে যাহা মুক্ত করিবে বলিয়া রচিত তাহাই চিত্তকে বদ্ধ করে। এবং ক্রমে দাঁড়ায় এই, মন্ত্র পড়িয়া দীর্ঘজীবন লাভ করা, মন্ত্র পড়িয়া শত্রু জয় করা ইত্যাদি নানা প্রকার নিরর্থক দুশ্চেষ্টায় মানুষের মন প্রলুব্ধ হইয়া ঘুরিতে থাকে।" —৩ অগ্রহায়ণ ১৩১৮। কয়েকদিন পরে (২৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৮) অধ্যাপক ললিতকুমারকে পুনরায় লিখিতেছেন, "অচলায়তন লেখায় যদি কোনো চঞ্চলতাই না আনে তবে উহা বৃথা লেখা হইয়াছে বলিয়া জানিব। সংস্কারের জড়তাকে আঘাত করিব, অথচ তাহা আহত হইবে না, ইহাকেই বলে নিষ্ফলতা।··· নিজের দেশের আদর্শকে যে

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১১, পৃ ৩৭৫

২ শান্তিনিকেতন, ৩ অগ্রহায়ণ ১৩১৮। পত্রটি আর্যাবর্তে (১৩১৮ অগ্রহায়ণ) প্রকাশিত হয়। দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ১১, পৃ ৫০৪-৫১০।

ব্যক্তি যে-পরিমাণে ভালোবাসিবে সে'ই তাহার বিকারকে সেই পরিমাণেই আঘাত করিবে, ইহাই শ্রেয়স্কর। ভালোমন্দ সমস্তকেই সমান নির্বিচারে সর্বাঙ্গে মাখিয়া নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকাতেই প্রেমের পরিচয় বলিতে পারি না। দেশের মধ্যে এমন অনেক আবর্জনা স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে যাহা আমাদের বুদ্ধিকে শক্তিকে ধর্মকে চারি দিকে আবদ্ধ করিয়াছে।··· ইহার বেদনা কি প্রকাশ করিব না। কেবল মিথ্যা কথা বলিব এবং সেই বেদনার কারণকে দিনরাত্রি প্রশ্রয় দিতেই থাকিব? অন্তরের যে-সকল মর্মান্তিক বন্ধন আছে বাহিরের শৃঙ্খল তাহারই স্থূল প্রকাশ মাত্র— অন্তরের সেই পাপগুলাকে কেবলই বাপু বাছা বলিয়া নাচাইব, আর ধিক্কার দিবার বেলায় ওই বাহিরের শিকলটাই আছে? আমাদের পাপ আছে বলিয়াই শাস্তি আছে। যত লড়াই ওই শাস্তির সঙ্গে? আর যত মমতা ওই পাপের প্রতি?··· আমার পক্ষে প্রতিদিন ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের সমস্ত-দেশ-ব্যাপী এই বন্দীশালাকে এক দিন আমিও নানা মিষ্ট নাম দিয়া ভালোবাসিতে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু তাহাতে অন্তরাত্মা তৃপ্তি পায় নাই।··· অচলায়তনে আমার সেই বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু বেদনা নয়, আশাও আছে।"[১]

অচলায়তন লিখিবার এবং প্রকাশিত হইবার প্রায় দুই বৎসর পরে গ্রীষ্মাবকাশের পূর্বে ২৫ বৈশাখ ১৩২১ শান্তিনিকেতনে প্রথম অভিনয় হয়। ইহার কথা পরে যথাস্থানে বলা হইবে।

ডাকঘরের পূর্বে ও পরে

১৩১৮ সালের ভাদ্র মাসের শেষভাগে তিনি সংবাদ পাইলেন যে রথীন্দ্রনাথ সস্ত্রীক জাহাজে করিয়া সিঙাপুর পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিবার কল্পনা করিতেছেন। ভ্রমণের প্রস্তাব শোনামাত্র কবির মন নিতান্ত বালকের ন্যায় বাহিরে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি বধূমাতা প্রতিমাকে লিখিতেছেন, "আচ্ছা বেশ— তোমরাও যদি ছুটিতে সিঙ্গাপুরে যাও তা হলে আমিও তোমাদের সঙ্গে ঘুরে আসব।" কয়েকদিন পরে পুনরায় লিখিতেছেন, "তোমরা ভয় করচ আমার বুঝি ভ্রমণে যাওয়ার মত উল্টে গেছে— একেবারেই না— ভ্রমণে বেরিয়ে পড়বার আবেগ আমার আরো বেড়ে যাচ্ছে— আমি দুই এক মাসের জন্যে কোথাও খুচ্‌রো রকমের বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করি নে— পৃথিবীর কাছে বেশ ভাল রকমে বিদায় নেবার জন্যে মনটা উতলা হয়ে উঠেছে। কলকাতায় গিয়ে দেখব যদি বাধা কাটাতে পারি তাহলে আমি দূরেই বেরিয়ে পড়ব"[২]। কলিকাতায় মীরা দেবীকে পত্রে লিখিতেছেন যে রথীন্দ্রনাথকে "আজ লিখেচি যদি তিন মাসের ছুটি নিয়ে জাপান বেড়িয়ে আসতে সে রাজি থাকে তাহলে আমি এই সুযোগে একটু ভাল রকম করে হাওয়া খেয়ে নিতে পারি। একবার কিছুদিনের মত সমস্ত বোঝা নামিয়ে ছুটোছুটি করে আস্‌তে পারলে একটু তাজা বোধ হবার সম্ভাবনা আছে।"[৩]

কলিকাতায় গিয়া কল্পনা আর সিঙাপুর ও জাপানের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারিল না, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিতেছেন, "আমাদের য়ুরোপ যাওয়া স্থির হয়ে গেছে। আগামী ১৯ই অক্টোবরের [১৯১১] জাহাজ বোম্বাই ছাড়বে · তার ৩।৪ দিন আগে আমাদের রওনা হতে হবে··· রথী এবং বৌমা আমার সঙ্গে বিলাত যাচ্ছেন। রথী মাস তিন-চার থেকে চলে আস্‌বেন— আমরা হয়ত বছর খানেক অথবা ভাল লাগলে তার চেয়ে বেশি দিনও থাকতে পারি— অতএব দীর্ঘকালের জন্য— পাড়ি দিতে চললুম।"[৪]

১ পত্র। ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৮, অধ্যাপক ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত। দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ১১, পৃ ৫১০।

২ চিঠিপত্র ৩, পৃ ১৫, ১৭। ৩ চিঠিপত্র ৪, পৃ ২৯।

৪ ১৩ই আশ্বিন ১৩১৮ (30 Sep 1911)। স্মৃতি, পৃ ৮৪।

সুতরাং দশ-বারো দিনের মধ্যেই যাত্রার কথা; প্রস্তাবিত যাত্রার কয়েকদিন পূর্বে নির্ঝরিণী দেবীকে লিখিতেছেন (২২ আশ্বিন ১৩১৮), "আমি দূর দেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। আমার সেখানে কোনো প্রয়োজন নেই কেবল কিছুদিন থেকে আমার মন বলছে যে পৃথিবীতে জন্মেছি সেই পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে নিয়ে তবে তার কাছ থেকে বিদায় নেব।··· সমস্ত পৃথিবীর নদী গিরি সমুদ্র এবং লোকালয় আমাকে ডাক দিচ্ছে— আমার চারিদিকের ক্ষুদ্র পরিবেষ্টনের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্যে মন উৎসুক হয়ে পড়েছে।"[১] পরদিন ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে লিখিতেছেন "দীর্ঘকালের জন্য আমি দূরদেশে যাইবার সংকল্প করিয়াছি।"[২] সেই দিনই হেমলতা দেবীকে[৩] লিখিতেছেন[৪] "আপনার সমস্ত কামনা যখন আপনাকে বন্দী করতে উদ্যত হয় তখন এক মুহূর্ত আর বিলম্ব না করে পালাতে ইচ্ছা করে... আমার টাকা নেই, কাজ রয়েছে, আমার অনেক অসুবিধা, তবু আমাকে আর বদ্ধ হয়ে বসে থাকতে দিচ্ছে না, আমাকে আজ এমন করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে যে কালের কোনো প্রয়োজন সংসারের কোনো দায়িত্ব আমাকে কোনোমতেই বসে থাকতে দিচ্ছে না। বেরো, বেরো, বেরো, রাস্তায় বেরিয়ে পড়্··· আজ আমার আর অন্য কোনো চিন্তা করবার জো নেই— তাই বেরিয়ে পড়বার আয়োজনে আমার একটুও ক্লান্তি বা কৃপণতা নেই।— মন একবারো পিছনে ফিরে তাকাতে চাইছে না।"[৪]

কিন্তু ভবিতব্য অন্যরূপ। নানা সাংসারিক ও আর্থিক কারণে কাহারও কোথাও যাওয়া হইল না। সিঙাপুর, জাপান, য়ুরোপ নানাস্থানে যাইবার কল্পনা যখন পাখা মেলিয়া ছটফট করিতেছে, দেখা গেল বাস্তব সংসারের শৃঙ্খল কাটা বড়ই কঠিন। তখন রুদ্ধপক্ষ বিহঙ্গ নিজ পিঞ্জরের মধ্যে আপনাকে আপনি আঘাত করে। ভ্রমণের সমস্ত কবি-কল্পনা নিবিয়া গেল, কবি চলিলেন শিলাইদহ; এবার আর কুঠিবাড়িতে নহে— নৌকায় আশ্রয় লইলেন, নির্জনতার বড় প্রয়োজন। বৃহত্তর জগতকে চোখ দিয়া দেখিবার জন্য যে-মন উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, আঘাত পাইয়া অন্তর্জগতে স্থান পাওয়া যায় কিনা কবি তাহারই সন্ধান করিতেছেন। মনের ইচ্ছা—'বোট ছেড়ে দিয়ে চলে' যাবেন, 'কোনো স্থির ঠিকানা থাকবে না।'

শিলাইদহ ও বোট হইতে হেমলতা দেবীকে যে কয়খানি পত্র এই সময়ে লেখেন তাহার মধ্যে তাঁহার মনের একটি অন্ধকার পর্বের খবর পাই। প্রায় প্রত্যেক খানি পত্রের মধ্যে, একটি ধুয়া 'আপন হতে বাইরে দাঁড়া'। তিনি শিলাইদহ হইতে (১৫ কার্তিক) লিখিতেছেন, "এ জায়গাটি বেশ ভাল লাগচে— নির্জ্জনে ভাল থাকব বলেই মনে হচ্চে —পদ্মায় শরীরও ভাল থাকবে। যেমন করে হোক্ নিজের গর্তটার ভিতর থেকে নিজের নির্মল বিশুদ্ধ সত্তাটিকে বাহির করে আনতেই হবে।··· যদি বেশ আপনাকে সকল বাধামুক্তভাবে সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে না পারি তা হলে বুঝব আমার এ জীবনের ভিতরকার শক্তি নিঃশেষ হয়েছে, এটাকে বদলে ফেলে আবার নতুন বাহন জুততে হবে— ···মৃত্যু ভাল কিন্তু মুক্তি চাই— ···খোলা রাস্তায় খোলা আলোয় খোলা হাওয়ায় ডাক পড়েছে··· আবরণ সব জীর্ণ

১ পত্র ২২, আশ্বিন ১৩১৮। নির্ঝরিণী দেবীকে লিখিত। দেশ ১৩৪৮ শারদীয় সংখ্যা।

২ পত্র ২৩, আশ্বিন ১৩১৮। দেশ ১৩৪৯, ২৬ বৈশাখ, পৃ ৫৭১। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র 'ধীমু' নামে খ্যাত। পরে বি. এ পাস করিয়া শিক্ষক হন। আশ্রম ত্যাগ করিয়া মেদিনীপুরের এক গ্রামের বিদ্যালয়ে প্রধানশিক্ষক।

৩ হেমলতা দেবী হইতেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ, দ্বিপেন্দ্রনাথের পত্নী, মোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের ভগ্নী। তিনি আশ্রমে থাকেন, বৃদ্ধ শ্বশুর ও অসুস্থ স্বামীর সেবা করিয়া যে সময়টুকু পান পড়াশুনা করেন ও আশ্রমের শিশুদের সেবা করেন। তিনি তাহাদের আহারের ভার গ্রহণ করিয়া পরিপাটি রূপে তাহা বহুকাল চালাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্য অনুবাদাদি করিয়া দিতেন— এইভাবে বাংলা লিখিবার ক্ষমতা আয়ত্তে আসে। স্বামীর মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর শ্বশুরের সেবা লইয়া দিন কাটে ও তাঁহার মৃত্যুর পর আশ্রম ত্যাগ করিয়া বাংলার বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে নারীশিক্ষায় তিনি আত্মোৎসর্গ করেন ও পুরীতে বিধবা আশ্রমের সেবায় নিযুক্ত আছেন।

৪ চিঠিপত্র, ২৩ আশ্বিন ১৩১৮। বিশ্বভারতী পত্রিকা ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৩৫৪, পৃ ১।

হয়েছে মলিন হয়েছে, সেগুলো এবার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক্— সর্বাঙ্গে লাগুক আকাশ।" পুনরায় [১৯ কার্তিক] লিখিতেছেন, "নিজের মধ্যে বেড়া দিয়ে আমি কখনই টিঁকতে পারব না— চিরদিনই ঘোর বন্ধনদশার মধ্যেও আমার চিত্ত কেবলি মুক্তিকে চেয়েছে, সেই মুক্তিকে হারিয়ে আমি কি একেবারে ব্যর্থ হয়ে চলে যাব? কখনই না।" কয়েকদিন পরে পুনরায় লিখিতেছেন, "নিজের বাইরের আবেষ্টন ভেদ করে আপনার যথার্থ সত্যরূপটিকে লাভ করবার জন্যে মনে ভারি একটা বেদনা বোধ করচি। সেই চিন্তা আমাকে এক মুহূর্ত বিশ্রাম দিচ্চে না। কেবলি বল্‌চে, বেরও, বেরও— না বেরোতে পারলে অন্ধকারের পর অন্ধকার— আপনার প্রকাশ একেবারে আচ্ছন্ন।··· আমি যেন আর সহ্য করতে পারচি নে—বেরও, বেরও, বেরও,— সমস্ত অসত্য থেকে সমস্ত স্থূলত্ব জড়ত্ব থেকে বেরও, বেরও— একবার নির্মল মুক্তির মধ্যে প্রাণ ভরে বিশ্বাস গ্রহণ কর— আর নয়— আর দিনের পর দিন এমন ব্যর্থতার মধ্যে কেবলি নষ্ট করে ফেলা নয়— কোথায়, ভূমা কোথায়— কোথায় সমুদ্রের হাওয়া, আকাশের আলো, অপরিমিত প্রাণের বিস্তার।"[১]

মনের যে অবস্থায় একদিন বাহিরের জগতকে দেখিবার জন্য মন পিপাসিত হইয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইলে— সমস্ত আবেগটা অন্তঃসলিলা হইয়া আপনাকে বাহিরে প্রকাশের জন্য আজ ব্যাকুল। মনের মধ্যে বেদনা ভাষার মূর্তি খুঁজিতেছে— সেই বেদনায় ভাষা না দিতে পারিলে কবির মন তৃপ্ত হইতে পারে না— সংগীত নাই, সৃষ্টি নাই। মনের এই অবস্থার সহিত কবির শারীরিক ব্যাধি— অর্শের দারুণ যন্ত্রণাভোগাদির সম্বন্ধ যুক্ত ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয়। অধ্যাপক বিশী বলিতেছেন, "কবির প্রায় সব বয়সের প্রতিকৃতিই আছে কিন্তু এই সময়ের ছবিগুলিতে যে কৃশতা, স্বাস্থ্যহীনতা এমন-কি একটা রুগ্ন নিস্তেজতা দেখা যায়, এমন আর কখনো নয়।"

বিদ্যালয় খুলিল অগ্রহায়ণের গোড়ায়— কবি শিলাইদহ হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। মনের অন্ধকার কাটে নাই; মনের এই অবস্থা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "শান্তিনিকেতনের ছাদের উপর মাদুর পেতে পড়ে থাকতুম। প্রবল একটা আবেগ এসেছিল ভিতরে। চল চল বাইরে, যাবার আগে তোমাকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে হবে— সেখানকার মানুষের সুখদুঃখের উচ্ছ্বাসের পরিচয় পেতে হবে। সে সময় বিদ্যালয়ের কাজে বেশ ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কি হল। রাত দুটো-তিনটের সময় অন্ধকার ছাদে এসে মনটা পাখা বিস্তার করল। যাই-যাই এমন একটা বেদনা মনে জেগে উঠল।··· আমার মনে হচ্ছিল একটা-কিছু ঘটবে, হয়ত মৃত্যু। স্টেশনে যেন তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠতে হবে সেই রকমের একটা আনন্দ আমার মনে জাগছিল। যেন এখান হতে যাচ্ছি। বেঁচে গেলুম। এমন করে যখন ডাকছেন তখন আমার দায় নেই। কোথাও যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা উভয় মিলে, খুব একটা আবেগে সেই চঞ্চলতাকে ভাষাতে 'ডাকঘরে' কলম চালিয়ে প্রকাশ করলুম। মনের আবেগকে একটা বাণীতে বলার দ্বারা প্রকাশ করতে হল। মনের মধ্যে যা অব্যক্ত অথচ চঞ্চল তাকে কোনো রূপ দিতে পারলে শান্তি আসে। ভিতরের প্রেরণায় [ডাকঘর] লিখলুম। এর মধ্যে গল্প নেই। এ গদ্য-লিরিক। আলংকারিকদের মতানুযায়ী নাটক নয়, আখ্যায়িকা।"[২]

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী উপরাংশ উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন, কবির "মানসিক এই পটভূমি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন না হইলে ডাকঘর নাটক খাপছাড়া বলিয়া বোধ হইবে; পূর্বাপরের সহিত ইহাকে যুক্ত করা যাইবে না···।"[৩]

কিন্তু ইহাকেই রবীন্দ্রনাথের পরিপূর্ণ সত্তা বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। কবিমানসের কৃষ্ণাপ্রতিপদের

১ বিশ্বভারতী পত্রিকা ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৩৫৪, পৃ ১-৩।

২ শান্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্রসংগীত পরিবর্ধিত সংস্করণ পৌষ ১৩৬৫, পৃ ২০৮। কালীমোহন ঘোষের ডায়ারি হইতে গৃহীত।

৩ প্রমথনাথ বিশী, ডাকঘর, বিশ্বভারতী পত্রিকা। ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৩৫৪ শ্রাবণ-আশ্বিন, পৃ ৫৯।

চন্দ্রে যে সামান্য অন্ধকার দেখা দিয়াছে তাহা অবশিষ্ট অংশের তুলনায় তীব্র বোধ হইতে পারে ; কবি-জীবনের সন্ধ্যা-সংগীত যুগকে কবি হৃদয়ারণ্য বলিয়াছিলেন কিন্তু আমরা দেখাইয়াছি যে তাহা কবির অন্তর্লোকের অতি সামান্য অংশ ; তেমনি এই অন্ধকার পর্বটার কৃষ্ণচ্ছায়া কবিচিত্তকে অতি অল্পকালই আচ্ছন্ন করিয়াছিল, কারণ ডাকঘর লিখিবার পূর্বে পরে ও সম-সময়ে অনেকগুলি রচনা আছে, যাহার মধ্যে কবিচিত্তের এই অন্ধকারের সন্ধান মেলে না।

'ডাকঘর' লিখিয়া কবি প্রথমে শুনাইলেন আশ্রমের অধ্যাপক ও ছাত্রদের কাছে ; কিন্তু তাঁহার সাহিত্যের আসল সমঝদাররা থাকেন কলিকাতায়। সেখানে চলিয়া গেলেন তাঁহাদের শুনাইবার জন্য। এই ভক্তবৃন্দের মধ্যে প্রধান ছিলেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গাঙ্গুলি, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,[১] যতীন্দ্রমোহন বাগচী, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি ; এ ছাড়া গগনেন্দ্র, অবনীন্দ্র ও সমরেন্দ্র ছিলেন পাশের বাড়ির। এবার কলিকাতায় আসিয়া কবির মন এমনি সেখানে বসিয়া গিয়াছে যে শান্তিনিকেতনের পৌষ-উৎসবে পর্যন্ত উপস্থিত হইলেন না। ভারতবর্ষে থাকিতে আশ্রমের উৎসবে কবি উপস্থিত নাই— এ ঘটনা ঘটে একবার মাত্র ১৩১৪ সালে শমীন্দ্রের মৃত্যুর পর। কিছুকাল হইতে কলিকাতা শিলাইদহ ও বোলপুরের মধ্যে কবির জীবন ত্রিধা হইয়া গিয়াছে··· দীর্ঘকাল আশ্রমে থাকিতে পারেন না। পূর্বে বলিয়াছি ১৩১৮ সালের গোড়া হইতে কবি আদি ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারে মন দিয়াছিলেন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদন-দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাই কলিকাতায় আসিলেই বিচিত্র সমস্যা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়। নানা প্রকারের চাহিদা, প্রার্থনা, আবদার পূরণ করিতে হয়। সেইরূপ চাহিদার প্রতিক্রিয়ায় লিখিলেন দুইটি ছোট গল্প।

এই সময়ে 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক-গোষ্ঠিতে আছেন মণিলাল গাঙ্গুলি। মণিলাল হইতেছেন অবনীন্দ্রনাথের জামাতা, সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকরূপে তৎকালে সুপরিচিত ; মণিলালের আগ্রহে কবির কয়েকটি রচনা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। ইঁহার অনুরোধে পুনরায় ছোটগল্প রচনায় প্রবৃত্ত হন ; ছোটগল্প কবি বহুদিন লেখেন নাই। ১৩১৪ সালের গোড়ায় লেখেন 'মাস্টারমশায়' (প্রবাসী ১৩১৪ আষাঢ় ও শ্রাবণ) ও ১৩১৫ সালের শেষে লেখেন 'গুপ্তধন' (ভারতী ১৩১৫ চৈত্র)। শেষ গল্প লিখিবার আড়াই বৎসর পর এইবার লিখিলেন 'রাসমণির ছেলে' ও 'পণরক্ষা'।[২] 'রাসমণির ছেলে'র ন্যায় এতবড়ো মর্মন্তুদ ট্রাজেডি গল্প অল্পই চোখে পড়ে। রাসমণির ছেলে ও পণরক্ষা সমপর্যায়ের গল্প। রাসমণির ছেলে'তে স্বামিবাৎসল্য পুত্রবাৎসল্য ও মাতাপিতৃ-অনুরক্তি অভিব্যক্ত হইয়াছে। পণরক্ষায় রসিক বংশীর ছোটভাই হইলেও তাহার প্রতি স্নেহ মাতৃস্নেহেরই রূপান্তর। (সুকুমার সেন)

বিশুদ্ধ সাহিত্য গল্প ও নাটকের আকারে দেখা দিলেও সাময়িক সমস্যা ও প্রয়োজনের জন্য তাঁহাকে লেখনী ধারণ করিতে হয়। দেশের রাজনৈতিক সমস্যা নানাভাবে নূতনরূপে দেখা যাইতেছে। রাষ্ট্রনীতির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ তো বহুকাল হইতে উপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এখন শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যের জন্য আন্দোলন নূতনভাবে দেখা দিল। এই স্বাতন্ত্র্যের জন্য দাবী হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই। কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও আলিগড়ে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব প্রায় একই সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে তথা রাজনীতিক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। এই সমস্যার উপর রবীন্দ্রনাথ চৈতন্য লাইব্রেরির অধিবেশন উপলক্ষে রিপন কলেজ হলে (২৯শে অক্টোবর ৭ কার্তিক

১ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতা নন্দলাল কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল, পুত্রকে জাপান পাঠান। সুরেশ দেশে ফিরিয়া কিছুকাল শিল্প-উৎপাদনের চেষ্টা করেন। ব্যর্থ হইয়া প্রবাসী অফিসে কাজ লন ; সাহিত্যপ্রতিভা ছিল। 'জাপান', 'পোর্ট আর্থারের ক্ষুধা' প্রভৃতি পুস্তক লেখেন।

২ ভারতী ১৩১৮ আশ্বিন-পৌষ দ্র গল্প চারিটি ১৩১৮ ফাল্গুন। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২ পৃ ৩৭১-৪২৭।

১৩১৮) 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমরা অন্য পরিচ্ছেদে আলোচনা করিব বলিয়া এখন নিবৃত্ত রহিলাম।

যে মাসে 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় সেই মাসেই 'ভগিনী নিবেদিতা'[১] সম্বন্ধে রচনা বাহির হয়, নিবেদিতার মৃত্যু হইয়াছে গত মাসে। নিবেদিতা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্য। ইঁহার আসল নাম মারগরেট এলিজাবেথ নোবল, জাতিতে আইরিশ, ১৮৯৬ সালে স্বামী বিবেকানন্দের ইংল্যাণ্ড বাসকালে মিস নোবল স্বামিজির শিষ্যত্ব ও 'নিবেদিতা' নাম গ্রহণ করেন। কলিকাতায় আসিয়া সামান্য একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ভারতীয় হিন্দু আদর্শে তাহাদের শিক্ষাদানে ব্রতী হন। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। রবীন্দ্রনাথ ভাবিয়াছিলেন সাধারণত ইংরেজ মিশনারি মহিলারা যেমন হইয়া থাকেন ইনিও সেই শ্রেণীর, কেবল ধর্মসম্প্রদায় স্বতন্ত্র। সেই ধারণা কবির মনে ছিল বলিয়া তিনি তাঁহার কন্যাকে শিক্ষা দিবার ভার লইবার জন্য অনুরোধ জানান। শিক্ষা সম্বন্ধে তখন এই মহীয়সী নারী কবিকে যে কথাটি বলিয়াছিলেন, তাহা কবির অন্তরে গাঁথিয়া যায়। নিবেদিতা বলিয়াছিলেন, "বাহির হইতে কোনো একটা শিক্ষা গিলাইয়া লাভ কি? জাতিগত নৈপুণ্য ও ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতারূপে মানুষের ভিতরে যে জিনিসটা আছে তাহাকে জাগাইয়া তোলাই আমি যথার্থ শিক্ষা মনে করি। বাঁধা নিয়মের বিদেশী শিক্ষার দ্বারা সেটাকে চাপা দেওয়া আমার কাছে ভালো বোধ হয় না।" নিবেদিতা ধনীর গৃহের কন্যাকে ইংরেজি পড়াইতে এদেশে আসেন নাই, তিনি কবির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার পর কবির সহিত নানা সময়ে নানা ক্ষেত্রে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "তাঁহার সঙ্গে আমার মিলনের নানা অবকাশ ঘটিলেও এক জায়গায় অন্তরের মধ্যে আমি গভীর বাধা অনুভব করিতাম। সে যে ঠিক মতের অনৈক্যের বাধা তাহা নহে, সে যেন একটা বলবান আক্রমণের বাধা। আজ এই কথা আমি অসঙ্কোচে প্রকাশ করিতেছি তাহার কারণ এই যে, একদিকে তিনি আমার চিত্তকে প্রতিহত করা সত্ত্বেও আর একদিকে তাঁহার কাছ হইতে যেমন উপকার পাইয়াছি এমন আর কাহারও কাছ হইতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না।" ধর্মে সংস্কারে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জগতের হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ 'ভগিনী নিবেদিতা' সম্বন্ধে যাহা লিখিলেন, তাহা তাঁহারও মহত্ত্বের পরিচায়ক।[২]

ডাকঘর

১৩১৮ সালের পূজার ছুটির পর কবি শিলাইদহ হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া 'ডাকঘর'[৩] লিখিয়াছিলেন। 'রাজা'র ন্যায় এই ক্ষুদ্র নাটিকাটিও সাধারণ পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য। ডাকঘর নাটিকা হইলেও নাটকীয় বস্তু ইহাতে সামান্য, ইহাতে না আছে গল্প, না আছে ঘটনা, ক্ষুদ্র একটি আখ্যান মাত্র। একটি রুগ্ন-বালকের সৌন্দর্যমুগ্ধ কল্পনা-পীড়িত চিত্ত বিশ্বের মধ্যে বাহির হইবার জন্য ব্যাকুল। মাধব দত্ত সংসারী লোক, অপুত্রক। অমল তাহার স্ত্রীর গ্রামসম্পর্কে ভাইপো— অল্পদিন হইল সে তাহাকে পোষ্য লইয়াছে। বালকটি রুগ্ন বলিয়া শরতের রৌদ্রে ও হাওয়ায়

১ ভগিনী নিবেদিতা, প্রবাসী ১৩১৮ অগ্রহায়ণ, পৃ ১৬৩-১৭৩। পরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ৪৮৭-৪৯৭। এই প্রবন্ধের আংশিক অনুবাদ নিবেদিতার *Studies from an Eastern Home* (1913) গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। দ্র চিঠিপত্র ৬ পৃ ২০৬।

২ নিবেদিতার *The web of Indian life* (৯ম সং ১৯১৮) গ্রন্থের ভূমিকা কবি লেখেন ১৯১৭ অক্টোবর ২১— কলিকাতা কংগ্রেসের দুই মাস পূর্বে।

৩ ডাকঘর প্রথম প্রকাশ ১৬ জানুয়ারি ১৯১২। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১১, পৃ ৩৮১-৪০৬। ডাকঘর প্রথম অভিনয় হয় ১০ অক্টোবর ১৯১৭, বিচিত্রা-ভবনে। ইহার পূর্বেও একবার হইয়াছিল তাহার কথা যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে।

যাওয়া নিষেধ; সে-বিষয়ে কবিরাজ মাধব দত্তের সহিত একমত। অথচ অমলের প্রাণ বাহিরে যাইবার জন্য ছটফট করে। জানালার ধারে বসিয়া দূর পাহাড়ের দৃশ্য সে দেখে; ঝরনার ধারে পথিককে বিশ্রাম করিতে দেখিয়া সে ঐ ঝরনাতলায় যাইতে চায়। পথিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়া সে পথে বাহির হইতে চায়; এইভাবে পথিক, প্রহরী, দইওয়ালা, ফকির, শশী-মালিনীর ছোট মেয়ে সুধাকে সে ডাকে। তাহাদের সঙ্গে তাহাদের মত হইয়া থাকিবার জন্য তাহার বিচিত্র সাধ।

এমন সময়ে বাড়ির সম্মুখে রাজার ডাকঘর বসিল। বালক কল্পনা করে রাজা তাহাকে একদিন তাঁহার পত্র পাঠাইবেন। গ্রামের মোড়ল বালকের এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া একদিন আসিয়া হাজির। ঠাট্টা করিয়া সে বলে রাজার ডাকঘর বসিয়াছে তাহারই জন্য; বালকের হাতে সাদা এক টুকরা কাগজ দিয়া বলে যে রাজার চিঠি তাহারই নামে আসিয়াছে। অমল পড়িতে পারে না, সে মোড়লের কথা বিশ্বাস করে, ভাবে সত্যই বুঝি চিঠি আসিয়াছে। ঠাকুরদা বলিলেন, "রাজা লিখছেন তিনি স্বয়ং অমলকে দেখতে আসছেন, তিনি তাঁর রাজকবিরাজকেও সঙ্গে করে আনছেন।" সেদিন সন্ধ্যার পর অন্ধকার যখন ঘনাইয়াছে, বদ্ধদ্বার ভাঙিয়া রাজদূত আসিল, রাজকবিরাজ আসিল সঙ্গে। তাহারা খবর দিল রাজা আসিতেছেন। রাজকবিরাজ বদ্ধগৃহের প্রত্যেকটি দ্বার ও বাতায়ন খুলিয়া দিয়া বালকের শিয়রের কাছে স্তব্ধ হইয়া বসিলেন, বলিলেন "প্রদীপের আলো নিভিয়ে দাও— এখন আকাশের তারাটি থেকে আলো আসুক। ওর ঘুম এসেছে।" এমন সময়ে শশী মালিনীর মেয়ে সুধা ফুল লইয়া আসিল অমলকে দিবার জন্য। সুধা শুধাইল, 'ও কখন জাগবে।' রাজকবিরাজ বলিলেন, 'এখনই যখন রাজা এসে ওকে ডাকবেন।' সুধা বলিয়া গেল, 'বোলো যে, সুধা তোমাকে ভোলে নি।'

ইহাকে যদি গল্প বলা যায় তো ইহাই হইতেছে নাটিকার বিষয়বস্তু। রবীন্দ্রনাথ নিজে বলিয়াছেন, "এর মধ্যে গল্প নেই। এ গদ্য-লিরিক। আলংকারিকদের মতানুযায়ী নাটক নয়, আখ্যায়িকা।" অজিতকুমার ইহাকে বলিয়াছেন symbolic drama অর্থাৎ বিগ্রহরূপী নাট্য। অধ্যাপক সুকুমার সেন বলেন, নাটকের ধরণে লেখা হইলেও ইহাকে ঠিক নাটক বলা চলে না। ইহা episodical বা উপাখ্যানীয়, dramatic বা নাটকীয় নয়। যাহাই হউক, এই শ্রেণীর বিগ্রহীরূপী নাট্য অথবা উপাখ্যানীয় রচনার অসংখ্য ব্যাখ্যা হইতে পারে এবং তজ্জন্য রসজ্ঞের চিত্তে বিচিত্র ভাব সৃষ্টি করাও সম্ভব।[১]

'রাজা' ও 'ডাকঘরে'র মধ্যে কয়েকটি বিষয় সাধারণ; যেমন উভয় নাটকে 'রাজা' অদৃশ্য; রাজার সন্ধান জানে ঠাকুরদা। রাজা দেখা দেন অন্ধকারে। রাজাকে বিশ্বাস করে না এমন লোক আছে উভয় নাটকেই। 'রাজা নাট্যের— তাহার মধ্যে হাসিঠাট্টা নৃত্যগান অগ্নিকাণ্ড যুদ্ধ পরাজয় অনেক কিছুই আছে যাহাতে নাটকখানিকে নানাভাবে উজ্জ্বল করিয়াছে। কিন্তু 'ডাকঘরে' সে বৈচিত্র্য নাই, সে বেগও নাই। অথচ রসজ্ঞ পাঠক ইহার মধ্যে গভীর অধ্যাত্মরস পাইয়া তৃপ্ত হন। এক সময়ে ইহার অনুবাদ য়ুরোপের নানাদেশে অভিনীত ও সমাদৃত হয়।

ডাকঘরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বাল্যস্মৃতির বেদনা জড়িত। অল্পকাল পূর্বে 'জীবনস্মৃতি' লিখিতে গিয়া বাল্যের অনেক কথাই মনে হইয়াছিল। সেই শিশুকালের রুদ্ধ দেহমনের অব্যক্ত ক্রন্দন অমলের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। একটা বড় সাহিত্যসৃষ্টিকে নানা দিক হইতে দেখা যায়; কেউ দেখেন ডাকঘরের মধ্যে অমল আত্মার ঘরের সন্ধান —কেউ দেখেন কবি-জীবনের শৈশব-স্মৃতি— কেউ বা দেখেন মানব সভ্যতার ট্রাজেডি।[২]

কবি চিরদিন সুদূরের পিয়াসী; ভ্রমণের জন্য জগৎকে দেখিবার ও জানিবার জন্য বিচিত্রকে সম্ভোগের জন্য, চিত্ত

১ অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস: সাঙ্কেতিক নাটক অংশ দ্র, পৃ ২৫৩।

২ অরবিন্দ পোদ্দার ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের কিশোর-সাহিত্য। ক্রান্তিকাল ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা ১৩৬৪-৬৫। পৃ ১৭৩-১৮১।

তাঁহার চিরদিনই পিপাসিত ছিল। সেই নিরুদ্ধ মনের আকুলতা, অবচেতনে স্তব্ধ ছিল— নাটিকায় তাহা ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আধ্যাত্মিক দিক হইতে ডাকঘরের একটি সুষ্ঠু ব্যাখ্যা করা যায়।

পৃথিবীর' এক নাম মাধবী। শাস্ত্রমতে পৃথিবীতে যে জীবাত্মা আছে তাহা নিষ্পাপ, অমল। জীবাত্মা যথার্থভাবে জগতের সহিত সম্বন্ধশূন্য; সে প্রবাসীর ন্যায় এই জগতে আছে। অমল মাধবের কেহই হয় না অর্থাৎ জড়জগতের সহিত জীবাত্মার এক হিসাবে তো সম্বন্ধ নাই। এই জীবাত্মা যতক্ষণ দেহাশ্রয়ে আছে, ততক্ষণ সে প্রকৃতির সর্ব সৌন্দর্যকে সম্ভোগ করিতে চায়, মানবের মধ্যে আপনাকে পরিব্যাপ্ত দেখিতে চায়। কিন্তু এই নিখিলের সহিত যোগযুক্ত হইবার বাধা হইতেছে লৌকিক ধর্ম বা সংস্কার। এই ধর্ম বিধিনিষেধের অচলায়তন গড়িয়া অমলাত্মাকে বাঁধিতে চায়; সংস্কারের আবর্জনায় তাই তাহার বহিরবয়ব শীর্ণ। নাটকে অমল সেইজন্য রুগ্ন বালক। কিন্তু তাহার পক্ষে এভাবে স্থির থাকা সম্ভব নহে; সে চায় লোক হইতে লোকান্তরে চলিতে। কিন্তু সংগ্রাম চলে জড়ের সহিত জঙ্গমের, স্থূলের সহিত সূক্ষ্মের। নিখিলের সহিত যুক্ত হইবার বাধা যে কেবল মানুষের গড়া ধর্ম তাহা নহে; মানবসমাজও তাহার অন্তরায়। দেহাশ্রয়ী জীব এই নৈর্ব্যক্তিক সমাজের ভয়ে সদাই আড়ষ্ট। সমাজের প্রতীক হইতেছেন মোড়ল; মহৎ ভাবনা, বৃহৎ আদর্শকে সে বিশ্বাস করে না, সে সমস্তকেই ব্যঙ্গ করে; দেবতার ডাক সে শুনিতে পায় না, ইঙ্গিতও বুঝে না। এইভাবে আচারধর্ম ও অন্ধ সমাজ অমল জীবাত্মাকে মিথ্যার দ্বারা, ভীতির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন করিতে প্রয়াসী। অথচ অমল অন্তর হইতে শুনিতে পায় রাজার ডাক,—ঘরে যাইবার জন্য আহ্বান সে অনুভব করে; যে-পত্রের মধ্যে লেখন নাই, তাহারও মধ্যে রাজার নিমন্ত্রণলিপি পায়। ঠাকুরদা হইতেছেন সেই ভক্ত, যিনি বিনাসুতায় মুক্তাহার গাঁথেন, অদেখাকে মনের চোখে দেখেন, অলিখিত লেখন পাঠ করেন বিশ্বের সর্বত্র। ভক্তের নিকট বিশ্বের রহস্য অতি সরল,— শূন্যতা তাহার কাছে পরিপূর্ণার্থ। অবশেষে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলনের মুহূর্ত আসে। যে শাস্ত্র রচে, চৌপদী লেখে, নীতিকথা ও পুরাণ কথা ছন্দে প্রচার করে সাধারণ লোকে তাহাকে বলে 'কবিরাজ', আসলে সে কবিও নহে রাজাও নহে— কবিদের কেহই নহে বলিয়া তাহার সম্বন্ধে এই অশিষ্ট প্রয়োগ লোকসমাজে চলিয়া আসিয়াছে। কবিরাজ বলে, প্রকৃতিকে সৌন্দর্যকে বর্জন করিতে হইবে, ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ না করিলে চিত্ত চঞ্চল হয়। কবিরাজের ন্যায় লম্বোশ্বর ও মহাপঞ্চক এই একই কথা বলিয়াছিলেন— প্রকৃতির সংসর্গ ত্যাগ করো। কিন্তু যিনি রাজ-কবিরাজ, যিনি শাস্ত্র লেখেন না, সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন— তিনি আসিয়া বলেন, বন্ধ দ্বার খুলিয়া দাও, অনন্ত আকাশ হইতে তারার আলোক আসুক। তখন সে জড়ের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া অনন্তের মধ্যে বিলীন হয়।

ধর্মের নবযুগ

রবীন্দ্রনাথ এতকাল ধর্মকে দেখিয়াছেন ঔপনিষদীয় তত্ত্বরূপে ও স্বানুভূত তথ্যরূপে। 'ধর্ম'[১] নামক গ্রন্থের ভাষণ-গুলিকে মোটামুটিভাবে ধর্মতাত্ত্বিক (theological) ও শান্তিনিকেতনের উপদেশমালাকে আধ্যাত্মিক (spiritual) বলা যাইতে পারে, যদিও এরকম কাটাছাঁটা ভেদ করা যায় না। কিন্তু ধর্ম বা আধ্যাত্মিক অনুভূতির যে একটি তত্ত্ব বা দার্শনিক ভিত্তি আছে তাহা কবির অগোচরেই মনকে নাড়া দিতেছিল। কবির জ্যেষ্ঠ সহোদর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর আজীবন ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয় প্রচেষ্টায় কালাতিপাত করিয়াছিলেন, উহার প্রভাব যে কবির উপর অস্পষ্টভাবে কাজ করে নাই, তাহা তো মনে হয় না। আবার সমসাময়িক ভাবুকসমাজে ধর্মের সংজ্ঞা যে পরিবর্তিত হইয়া ক্রমেই সমাজ বা

১ ধর্ম, প্রথম প্রকাশ গদ্য-গ্রন্থাবলীর ষোড়শ ভাগরূপে ১২ মাঘ ১৩১৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩, পৃ ৩৩৫-৪৪৫।

মানবকেন্দ্রিক হইয়া উঠিতেছিল, তদ্‌সম্বন্ধে কবি আজ অত্যন্ত সচেতন। আমাদের দেশে লৌকিক মত religion ও ধর্ম একাত্মক শব্দ নহে; religion এর dogma বা মতদেহ ও ritual বা ক্রিয়াকলাপ থাকা চাই। হিন্দুদের 'ধর্ম' শাস্ত্রের অর্থ হইতেছে— যাহা কিছু মানুষকে ধারণ করিয়া আছে, তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে তাহাই ধর্ম; হিন্দুধর্মকে religion বলা যায় না। কারণ উহার বিশেষ dogma নাই, উহা সনাতন, শাশ্বত, অপৌরুষেয়; আধুনিকভাবে বলা যাইতে পারে ethnic। তবে একথা সাধারণভাবে সত্য হইলেও বিশেষভাবে সত্য নহে। কারণ হিন্দুধর্মের সাধারণভাবে কোনো সংজ্ঞা বা definition দেওয়া যায় না; তাহার অসংখ্য সম্প্রদায় নিজ নিজ dogma-র উপরেই প্রতিষ্ঠিত এবং ritual বা ক্রিয়াকলাপে আপাদমস্তক আবৃত। সুতরাং নৈয়ায়িক ও বৈয়াকরণের মতে ধর্মের যে অর্থই থাকুক না কেন— আজ ধর্ম ও religion প্রায় প্রতিশব্দবাচক হইয়াছে। আজ য়ুরোপের ভাবুকসমাজ তাহাদের religion-এর সংজ্ঞা পরিবর্তন করিতে চাহিতেছেন; আমাদের হিন্দুধর্মেরও পরিবর্তন সেই কারণেই আবশ্যিক হইয়া পড়িয়াছে; কারণ ধর্ম ও religion-এর পুরাতন সংজ্ঞা আধুনিক যুগ-ধর্মে অচল।

উনবিংশ শতক হইতে ভারতবর্ষের শিক্ষিত মন যে কেবল পাশ্চাত্য সাহিত্য বিজ্ঞান রাজনীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল তাহা নহে— পাশ্চাত্য দর্শন ও ধর্মতত্ত্বও তাহার মনকে প্রাচীন আশ্রয় হইতে কক্ষচ্যুত করিয়াছিল। বিজ্ঞান মনস্তত্ত্ব সমাজবিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতি বিচিত্র জ্ঞানধারার অধ্যয়ন ও আলোচনা মানুষের মনে যে বিপ্লব শুরু করিয়াছিল তাহাতে সনাতনী ধর্ম ও দর্শনের আসন সর্বত্র টলমল করিয়া উঠিয়াছিল। য়ুরোপে নেপোলিয়ানোত্তর যুগ বা ভিক্টোরীয় যুগ ছিল মানুষের complacent বা আত্মতৃপ্তির যুগ। বিজ্ঞানী দার্শনিক সাহিত্যকরা দুনিয়ার সকল বিষয়ের সকল প্রকার সমস্যার শেষ সমাধান করিয়া যেন পরম পরিতৃপ্ত। মানুষে মানুষে দুস্তর ভেদ সৃষ্টি করিয়া, ভাগ্যবানের দল অলীক স্বর্গরাজ্য গড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাহা যে অচিরে ধূলিসাৎ হইবে, তাহা তাঁহারা কল্পনা করিতেও ভয় পাইতেন। এই আত্মতৃপ্ত যুগের অন্তরেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপ্লবের বহ্নিকণা গুমরাইতেছিল— মনের ভাবনায় তাহারা স্তব্ধ।

মানুষের ইতিহাসে এমন একদিন ছিল যখন ধর্ম বা ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানই তাহার মনের সমস্তটাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল— তখন দর্শন ও বিজ্ঞান ছিল ধর্মের পাদপীঠতলে। কালে য়ুরোপে দর্শনশাস্ত্র খ্রীস্টধর্মের কবল হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া আপনার স্বাধীন চিন্তার পথ মোচন করিয়া লইল। পরে বিজ্ঞানও মুক্তিলাভ করিল ধর্ম ও দর্শনের যুগল বন্ধন হইতে। মানুষের মনন ও সমীক্ষণ হইতে বঞ্চিত হইয়া ধর্ম প্রাচীন শাস্ত্রবাক্য, অন্ধ বিশ্বাস ও আত্মানুভূতির বিষয়মাত্র থাকিল— এক কথায় ধর্ম জ্ঞানরাজ্য হইতে বিছিন্ন হইয়া পড়িল। অপর দিকে দর্শন ও বিজ্ঞান ধর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নৈর্ব্যক্তিকে কঠোর আত্মবিশ্লেষণ ও বিশ্ববিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইল। সেই জয়যাত্রায় দর্শন ও বিজ্ঞান ধর্মের পাশাপাশি সমান্তরাল রেখায় ভাসিয়া চলিল, কেহ কাহাকেও স্বীকার করিল না, স্পর্শও করিল না। এইভাবে জগতের সমন্বয় ও সামঞ্জস্যবোধ লুপ্ত হইতে চলিল।

এইভাবে মানুষের ইন্দ্রিয়চর্চা বা বিজ্ঞান, তাহার মননক্রিয়া বা দর্শন, তাহার আত্মানুভূতি বা ধর্মবোধ নিজ নিজ পথে উল্কার মত চলিল ও আত্মতৃপ্তিকর শব্দ সৃষ্টি করিয়া তাহারই মোহে আপনাকে ভুলাইতে বসিল।

শব্দের মোহ বড় মোহ। বিজ্ঞান দর্শন ধর্ম মানবের মনে সেই মোহজাল বিস্তার করিয়াছে। 'বিজ্ঞানসম্মত' বা scientific বলিলেই আমরা উহাকে না-বুঝিয়াও অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করি— এ মোহ শাস্ত্রের প্রতি অন্ধ মোহ হইতে কম মূঢ় নহে। দার্শনিকতত্ত্ব বলামাত্র আর-একদল সগর্বে ঘোষণা করেন যে তাঁহারা কর্মবাদী— দর্শনাদি হইতেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রদের অধীতব্য বিষয়; তাঁহারা ব্যবহারিকতাকে বিশ্বাস করেন। আবার ধর্মের কথা শোনামাত্র ভক্তের দল অকারণ অশ্রু বর্ষণ করেন। আর তাঁহাদের উল্টাপথের পথিকরা ঠিক সেই বস্তুকেই তেমনি

অকারণে উদ্ধতভাবে অস্বীকার করেন। মোটকথা বিজ্ঞান দর্শন ও ধর্ম যে মানুষের সমন্বিত জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা মাত্র, তাহা আমরা ভুলিয়া আত্মখণ্ডন করিয়া চলিয়াছি। আমরা ভুলিয়া যাই মানুষই ইহাদের দ্রষ্টা স্রষ্টা ও ভোক্তা; এই বিজ্ঞান-দর্শন-ধর্ম রূপ ত্রয়ীশক্তি তাহারই চিত্তসমুদ্রমন্থিত সমন্বিত সত্য, মানবের বিরোধের জন্য ইহাদের উদ্‌ভব হয় নাই— জীবনে সমন্বয়, সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য দর্শাইবার জন্য ইহাদের প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বই প্রচার করিয়াছেন, তাঁহার সমগ্র রচনায়।[১]

কিন্তু এতাবৎকাল বিজ্ঞানী, তত্ত্বজ্ঞানী ও ধার্মিকেরা এমন উৎসাহের সহিত নিজ নিজ 'বিষয়' রক্ষা করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন যে, সচরাচর বিষয়ী ব্যক্তিদের মধ্যেও ঐ শ্রেণীর 'বৈষয়িকতা' চোখে পড়ে না। বিজ্ঞানীর ভয় পাছে দার্শনিক আসিয়া তাঁহাদের তথ্যগুলিকে তত্ত্বে পরিণত করেন; এবং বিজ্ঞানী ও দার্শনিক উভয়েরই ভয় ধর্মাত্মাকে— পাছে তিনি আসিয়া সমস্ত কিছুকেই অধ্যাত্ম, অতিন্দ্রিয় ও রাহস্যিক (mystical) করিয়া তোলেন।

ইন্দ্রিয় দিয়া যাহা পাওয়া যায়, তাহা তো বিজ্ঞানীদের রাজ্য; ইহারা মনকেও সহ্য করিতে পারেন— কারণ অনেকের মতে মন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। সুতরাং মননের দ্বারা যাহা উপলব্ধি করা যায়, তাহার সহিত বিজ্ঞানীর মতের হয়তো মিল হইতে পারে। তাই সত্যের সন্ধানে ইন্দ্রিয়ের পথে ও মননের পথে দুইজন বৃত্তের দুই বিপরীত দিক হইতে যাত্রা করিয়া, আজ প্রায় উভয়ে মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছেন; পথ বিপরীত হইলেও বৃত্ত ঘুরিয়া গম্যস্থানে মিলিত হইবেই। তাই আজ দর্শন ও বিজ্ঞানে ভেদ সৃষ্টি করা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু যাঁহারা আত্মবাদী বা আস্তিক— যাঁহারা ইন্দ্রিয় ও মনের বাহিরে কোনো অনির্বচনীয় অনুভূতির কথা বলেন, সেই ধর্মপ্রাণ লোকদের অধ্যাত্ম সত্য লইয়াই প্রাকৃত জনের অর্থাৎ যাঁহারা প্রকৃতিকেই চেনেন আত্মাকে জানেন না— তাঁহাদের মুশকিল। বিজ্ঞানী পরীক্ষাদ্বারা সাধারণ সত্যকে সকলের গোচরীভূত করিতে পারেন; কিন্তু তদতিরিক্ত তথ্যাদি প্রমাণের জন্য অনুমানাদির আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হয়। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পরীক্ষা যেখানে নিষ্ফল— সেখানে সে যুক্তি ও অনুমানের সাহায্যে আপনার প্রমেয়কে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করে। বিজ্ঞানীর শেষ সম্বল অনুমান ও গাণিতিক যুক্তিবাদ। দার্শনিকের আদি সম্বল হইতেছে এই মনন ও যুক্তিবাদ; তাহার মননলব্ধ বিষয়কে সে যুক্তির উপর গড়িতে চায়।

কিন্তু একেবারে যাঁহারা কূট বিজ্ঞানী— তাঁহারা বলিয়া বসেন, যুক্তিবাদের পিছনে আছে মানুষের মন— যে মন নিজের কথা যুক্তিদ্বারা পরকে বুঝায় ও পরের কথা যুক্তির সাহায্যে হৃদয়ংগম করে কিন্তু এই মনকে কি বিশুদ্ধ ও নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞানগ্রহণের চরম আধার বলিয়া স্বীকার করা যায়। মানুষের পঞ্চ-ইন্দ্রিয় পৃথক গুণধর্মী, বিভিন্ন পাত্রে বা ব্যক্তিতে উহাদের প্রতিক্রিয়া পৃথক হইতে বাধ্য; তেমনই পৃথক ব্যক্তির মনন-শক্তির মধ্যেও পার্থক্য না থাকিবে কেন। সুতরাং মননসিদ্ধ হইলেই জ্ঞান বিশুদ্ধ হইবে, তাহার প্রমাণাভাব। সেইজন্য মননসিদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রের বা যুক্তিবাদের প্রমাণকে চরম সত্য বলিয়া স্বীকার করা বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদীদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তদ্‌হেতু আধুনিক দার্শনিকগণ যুক্তিপদ্ধতিকে ব্যক্তিগত মনন-নির্বিশেষ বিশুদ্ধ গণিতের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। তাঁহাদের বিশ্বাস এইভাবে সত্যান্বেষী হইলে জ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক হইবে। সুতরাং গাণিতিক বিশ্লেষণ ছাড়া যাহা কিছু আমাদের জ্ঞানগম্য, তাহা কখনো বিশুদ্ধ জ্ঞান হইতে পারে না— তাহা ব্যক্তিমনের সংস্পর্শে নৈর্ব্যক্তিক বিশুদ্ধ থাকে না।

এইভাবে আজ গণিত যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাকে তথ্য বলিব, কি তত্ত্ব বলিব জানি না। বিজ্ঞানের

১ দার্শনিক-বিজ্ঞানী Whitehead বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞান 'divides the seamless coat or, to change the metaphor into a happier form, it examines the coat, which is superficial, and neglects the body, which is fundamental."— *Twentieth century Philosophy* p 136.

ন্যায় যুক্তিশাস্ত্র ও গণিতশাস্ত্র সম্পূর্ণ বিপরীত পথে যাত্রা করিয়া আজ বৃত্তকে ঘুরিয়া আসিয়া মুখোমুখি হইয়াছে।

মানুষ একদিন মূঢ়ভাবে সর্বজ্ঞানকে সমন্বিত দেখিত; তার পর স্বল্প জ্ঞান লাভ করিয়া সে তাহার মনের রাজ্যে বিদ্যা-অবিদ্যা ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া পৃথক পৃথক জগৎ রচনা করে। কিন্তু আবার পরিপূর্ণ জ্ঞান-উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সে মানুষকে অখণ্ডভাবে এককরূপে দেখিতেছে— ইহাকেই কহে সমন্বয় বা সংশ্লেষণ। রবীন্দ্রনাথ এই সমন্বয়-বাণীর উদ্‌গাতা।

তথ্যের দ্বারা জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ, তত্ত্বের দ্বারা তাহার বোধশক্তি উদ্দীপ্ত— কিন্তু তবু মানুষ দেখে তাহার অন্তর শূন্য, অসংখ্য সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে। মানুষের মন আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ও প্রেমের অভাবে আজ অত্যন্ত শুষ্ক কঠোর বিষয়ী হিংস্র কুটিল। তখনই প্রশ্ন উঠে 'ততঃ কিম'। তাহা হইলে কি পৃথিবী হইতে ধর্মের স্থান লুপ্ত হইল। ঈশ্বর কি সত্যই এই তথ্য ও তত্ত্বের জগত হইতে নির্বাসিত! অথবা ধর্মকে নূতনভাবে নবযুগের পরিপ্রেক্ষণীতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে? এই জটিল প্রশ্নের উত্তরেই মনীষীরা যে-ধর্মের কথা বলিতেছেন, তাহা কোনো জাতিবিশেষের ধর্ম নহে, তাহা কোনো কালবিশেষে উদ্‌ভূত ঐতিহাসিক ধর্ম নহে— তাহা মানুষের সহজ ধর্ম— বিজ্ঞান ও দর্শনের সমন্বয়ে তাহা গঠিত— মানুষের বুদ্ধি ও প্রীতির উপর উহা প্রতিষ্ঠিত— ইহা অনুভূতির দ্বারা বোধ্য।

বড়ই আশ্চর্যের বিষয়— মানুষের বিজ্ঞান কলা সাহিত্য শিক্ষা, বাণিজ্য, রাষ্ট্রতন্ত্র— সবই বিশ্বজনীন, সবই দেশকাল-অতীত সর্বমানবের জন্য উন্মুক্ত— কেবল ধর্মবোধই যুগপ্রগতির সহিত তাল রক্ষা করিয়া চলিতে অপারগ। বিশ্বজ্ঞান তাহার কাছে সত্য, কিন্তু বিশ্বমানবের সহজধর্ম সম্বন্ধে সে বর্ণান্ধ। ধর্মের বেলায় সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্পদ বানাইয়া তাহার মধ্যে আপনার চিত্তকে নিমজ্জিত রাখিয়া সে সুখী! বিজ্ঞান, রাষ্ট্রশাসন, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে সে অত্যাধুনিক ও প্রগতিপরায়ণ, আর ধর্মের বেলায় সে প্রাচীন ও প্রাগৈতিহাসিক। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে ভাবুকসমাজের (idealist) সমক্ষে এই সমস্যা নূতনভাবে দেখা দিয়াছিল— খ্রীষ্টান হইয়াও বিশ্বজনীন হওয়া যায় কি না। ভারতের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই প্রশ্নের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন— হিন্দুর পক্ষে বিশ্বজনীন হওয়া সম্ভব কি না; ইহাই নবযুগের নবভারতের প্রশ্ন।

গত শতাব্দীর শেষাশেষি পাশ্চাত্ত্য দেশে নূতন বিশ্বসমস্যাসমূহকে যে কয়জন মনীষী নবতর দৃষ্টিভঙ্গি হইতে বিচার করিতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যেমন ব্রাডলে, জেমস্, অয়কেন, বের্গসঁ ও হাউস্টন্ চেম্বারলেন। ইঁহাদের কেহ কর্মবাদ, কেহ শক্তিবাদ, কেহ শান্তিবাদের, কেহবা জাতিবিশেষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট। মোট কথা, য়ুরোমেরিকার ভাবুকসমাজ মানুষের ব্যক্তিগত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে ধর্মের সহিত সমন্বিত করিবার জন্য বিচিত্র পন্থা নির্দেশ করিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপীয় সাহিত্য সম্বন্ধে যে কেবল ওয়াকিবহাল ছিলেন তাহা নহে, য়ুরোপীয় চিন্তাধারার সহিতও তাঁহার পরিচয় স্বল্প ছিল না। এই পরিচয়ের খানিকটা প্রত্যক্ষ অধ্যয়নপ্রসূত, অবশিষ্টটা অন্যের সহিত অলোচনার ফলে আয়ত্ত। এই সমসাময়িক চিন্তাধারার আলোকে হিন্দুধর্ম তথা ব্রাহ্মধর্মকে নূতনভাবে দেখিবার প্রেরণা তিনি লাভ করিয়াছেন। অতীতকে অস্বীকার না করিয়া, বর্তমানকে অবজ্ঞা না করিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবাস্তবতার আকাশকুসুম না রচিয়া— হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজকে বিশ্বধর্ম ও বিশ্বমানবের পটভূমিতে রাখিয়া দিতে চাহিলেন। এই আকাঙ্ক্ষা হইতে তাঁহার রসবিদগ্ধ চিত্ত ভাবধারার নূতন পথ পাইল; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদন, তত্ত্ববোধিনী সভা পুনস্থাপন প্রভৃতি এই নবচেতনার লক্ষণ মাত্র।

তত্ত্ববোধিনী পর্ব

সঞ্চয় ও পরিচয় ১৩১৮-১৯

১৩১৮ সালের বৈশাখ মাস (১৯১১ এপ্রিল) হইতে রবীন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদকপদ গ্রহণ করিয়া পত্রিকাখানিকে বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মুখপত্ররূপে প্রকাশ করিলেন। ইহার দ্বারা ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সহিত ব্রাহ্মসমাজের নিবিড় সম্বন্ধ যেমন ঘোষিত হইল, তেমনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শুষ্ক তত্ত্বকথা প্রচার ছাড়াও যে একটি মানবীয় ও সামাজিক দিক আছে— এই কথাটি স্বীকৃত হইল।

তত্ত্ববোধিনীর ভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কবি আদি সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের কয়েকজন উৎসাহী কবিগুণগ্রাহী ব্যক্তি তাঁহার এই সাধু সংকল্পে সহায়তা দান করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কলিকাতা সিটি কলেজের অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতনের নেপালচন্দ্র রায়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ হইলেন বটে, কিন্তু কাজ চালাইবার ভার পড়িল জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও নগেন্দ্রনাথের উপর। নগেন্দ্রনাথ শিলাইদহ-কলিকাতার মধ্যে আপনার কাজ ভাগ করিয়া লইয়াছেন,আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেসের ও পত্রিকার যাবতীয় কাজ মুখ্যত জ্ঞানেন্দ্রনাথকেই দেখিতে হয়।

কিন্তু অচিরেই বুঝা গেল এই মুমূর্ষ সমাজকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করা যাইবে না; আদি সমাজীয় স্থবিরবাদ যে কালধর্মে অচল তা হয় কবি বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না।

আমেরিকা হইতে এক পত্রে নগেন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন—

"অন্যান্য সকল ব্রাহ্মসমাজেই সাম্প্রদায়িকতার খোলসটা শক্ত হয়ে উঠেছে। তাদের মতবাদের বেড়া ভেদ করে সকলের সঙ্গে সত্যভাবে তাদের এক করে মিলিয়ে নেওয়া অত্যন্ত শক্ত— তাদের ভাষা, তাদের চিন্তাপ্রণালী, তাদের আচার-ব্যবহার অনেক দিন থেকে এমন একটা পথ একেবারে অভ্যাস করে ফেলেছে, যার থেকে তাদের নড়ানো অসম্ভব বললেই হয়। তাদের এই পথটি এখানকার [আমেরিকার] য়ুনিটেরিয়ান খৃষ্টানদের গির্জার পথের যথাসম্ভব অনুকরণ। আমাদের দেশের আবিষ্কৃত পথ দিয়ে তারা সত্যকে অনুকরণ করতে একেবারেই নারাজ। তাদের দ্বারা আদি ব্রহ্মসমাজের যথার্থ সৃষ্টিকার্য ঘটবে না।

আর একখানি পত্রে লিখিতেছিলেন—

"ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শে হিন্দুসমাজ উৎকট লাভ করতে পারে।···আমি আমাদের সমাজের [আদি ব্রাহ্মসমাজ] গোঁড়া সভ্যদের ত্যাগ করেছি কারণ তারা হিসন্দুমাজের দোষকে গ্রহণ করে হিন্দুসমাজ ও সেই সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজকে দুর্বল করেছিলেন। তেমনি আবার অন্য সমাজের [নববিধান ও সাধারণ] যারা গোঁড়া তারা সাম্প্রদায়িক ঔদ্ধত্য বশতঃ হিন্দুসমাজকে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করে স্বজাতীয় সমাজের সুতরাং নিজের সম্প্রদায়ের মঙ্গলকে আঘাত করবেন— এও কোনো মতে চলবে না—এই জন্যেই আদি ব্রাহ্মসমাজকে আমরা তার বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দিতে চাই। এই জন্যেই আমি শান্তিনিকেতনের সঙ্গে এর যোগ রেখে এর মধ্যে একটি নূতন অথচ উদার প্রাণ সঞ্চয় করতে চেয়েছিলুম— এই জন্যেই আমি একান্তভাবে কামনা করি শান্তিনিকেতনের দলের সঙ্গে তোমার যোগ কোনো কারণে বাধাগ্রস্ত না হয়। তাঁদের দ্বারাই আমি আদি ব্রাহ্মসমাজের যথার্থ উন্নতি প্রত্যাশা করি। আমরা অন্যান্য ব্রাহ্ম-সমাজের সংকীর্ণ সীমার দ্বারা সীমাবদ্ধ হতে চাইনে। আমরা তাঁদের চেয়েও বড় হতে চাই।"

এই আশা লইয়া কবি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ভার লইয়া ইহার মাধ্যমে আদি ব্রাহ্মসমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় মতামত ব্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

নৈবেদ্য-উত্তর পর্বে কবি ধর্মকে যেভাবে দেখিয়াছিলেন তাহার আলোচনা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার পর কয়েক বৎসর বাহিরের জগতের উপর দিয়া ও মানবের অন্তরের ভিতর দিয়া এবং কবির ব্যক্তিগত জীবনের মধ্য দিয়া এত সব বিপ্লবের ঝড় বহিয়া গিয়াছে যে, আজ আর পূর্বের একান্ত দৃষ্টিতে ধর্মের পূর্ণাঙ্গ মূর্তি উদ্‌ভাসিত হইতেছে না; ধর্মের প্রবন্ধ বা শান্তিনিকেতনের উপদেশমালা যে দৃষ্টিভঙ্গি হইতে ব্যাখ্যাত বা কথিত হইয়াছিল, এখন তদপেক্ষা প্রশস্ততর পটভূমির প্রয়োজন হইয়াছে। তজ্জন্য এই যুগের বক্তৃতা বা প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে আলোচনীয়। তত্ত্ববোধিনী পর্বে রবীন্দ্রনাথ যে কয়টি প্রবন্ধ লেখেন বা প্রকাশ করেন, সেগুলিকে আমরা প্রকাশের কাল ধরিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম; এই পর্বে শান্তিনিকেতনে কথিত (বা লিখিত) ভাষণ আমরা আলোচনা হইতে বাদ দিলাম। আলোচ্য প্রবন্ধগুলির নাম— ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা ১৩১৭ মাঘ ১২, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে পঠিত।[১] ধর্মের অর্থ—১৩১৮ ভাদ্রোৎসবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে পঠিত।[২] হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়—১২ কার্তিক ১৩১৮ চৈতন্য লাইব্রেরির আয়োজনে রিপন কলেজ হলে পঠিত।[৩] রূপ ও অরূপ।[৪] ধর্মশিক্ষা—কলিকাতা সিটি কলেজে একেশ্বরবাদিগণের সম্মিলনীতে ১১ পৌষ ১৩১৭ সায়ংকালে পঠিত।[৫] ধর্মের নবযুগ—আদিব্রাহ্মসমাজের ১৩১৮ সালের ১১ই মাঘ মাঘোৎসবে মহর্ষি-ভবনে পঠিত।[৬] ধর্মের অধিকার।[৭] ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা—৪ চৈত্র ১৩১৮ ওভারটুন হলে পঠিত।[৮] আত্মপরিচয়—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে পঠিত।[৯]

এই সব প্রবন্ধের প্রথমটি ও শেষটি ব্রাহ্মসমাজের সমর্থনে আলোচিত; রচনা দুইটি বিশুদ্ধ ধর্মবিষয়ক না হইলেও, উহাতে ধর্মের বিশিষ্টতা ও বিশ্বজনীনতা স্পষ্ট হইয়াছে। ধর্ম বিশেষ হইয়াও বিশ্বজনীন হইতে পারে কি না তাহাই ছিল আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন আলোচনার সহিত রবীন্দ্রনাথ কেন বিশেষ সমাজের ধর্মমত সমর্থন ও ব্যাখ্যান করিলেন— এ প্রশ্ন সহজেই পাঠকের মনে উদিত হইতে পারে। ইহার প্রধান কারণ রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত, তাঁহার অন্তরের সহানুভূতি ব্রাহ্মধর্মের সহিত। তিনি এই সমাজের আদর্শ বা নীতি কোনোদিন ত্যাগ করেন নাই। আবার তিনি ব্রাহ্ম হইলেও হিন্দু। অর্থাৎ তিনি ধর্মে ব্রাহ্ম, সংস্কৃতিতে হিন্দু। তজ্জন্য প্রথম প্রবন্ধটিতে ব্রাহ্মধর্ম সাধনার ফল ও 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধটিতে হিন্দুধর্মের বিশ্বজনীনতা ঘোষণা করিলেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে যেদিন সত্যের আলোক উদ্‌ভাসিত হইল, সেদিন তিনি ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা কোথায় তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলেন। 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা' প্রবন্ধে উক্ত সমাজের প্রতি তাঁহার গভীর সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার মতে ব্রাহ্মসমাজের আরম্ভের দিকের কাজ একটা সমাপ্তির মধ্যে পৌঁছিয়াছে। "যে-সমস্ত প্রাণহীন অভ্যস্ত লোকাচারের জড় আচরণের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে হিন্দুসমাজ আপনার চিরন্তন সত্য সম্বন্ধে চেতনা হারিয়ে বসেছিলেন ব্রাহ্মসমাজ তার সেই আচরণকে ছিন্ন করবার জন্যে তাকে আঘাত করতে প্রস্তুত হয়েছিল।" আজ হিন্দুসমাজের চিত্ত জাগিয়াছে।

পশ্চিমের রাজনৈতিক আক্রমণের সঙ্গে যে প্রবল সাংস্কৃতিক অভিঘাত আসিয়া ভারতের চিত্তকে অভিভূত করিয়া

১ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৩১৮ বৈশাখ। ২ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৩১৮ আশ্বিন-কার্তিক। সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ৩৫৬-৭২। ৩ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও প্রবাসী ১৩১৮ অগ্রহায়ণ। পরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ, ৪৭০-৮৭। ৪ প্রবাসী ১৩১৮ পৌষ। সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ৩৩৫-৪৬। ৫ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৩১৮ মাঘ। সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ৩৭২-৯২। ৬ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভারতী ১৩১৮ ফাল্গুন। সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ৩৪৭-৫৫। ৭ প্রবাসী ১৩১৮ ফাল্গুন। সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ৩৯৩-৪১১। ৮ প্রবাসী ১৩১৯ বৈশাখ। পরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ৪২৩-৪৫১। ৯ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৩১৯ বৈশাখ। পরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ৪৫২-৭০।

তাহার নিজস্ব সাধনাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহারই প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া রামমোহন কিভাবে ভারতের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক সাধনাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার কথা এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ খুব স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছিলেন।

"ব্রাহ্মসমাজকে তার সাম্প্রদায়িকতার আবরণ ঘুচিয়ে দিয়ে মানব-ইতিহাসের এই বিরাটক্ষেত্রে বৃহৎ করে উপলব্ধি করবার দিন আজ উপস্থিত হয়েছে।" বক্তৃতা শেষে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "যে সাধনা সকলকে গ্রহণ ও সকলকে মিলিয়ে তুলতে পারে, যার দ্বারা জীবন একটি সর্বগ্রাহী সমগ্রের মধ্যে সর্বতোভাবে সত্য হয়ে উঠতে পারে সেই ব্রহ্মসাধনার পরিপূর্ণ মূর্তিকে ভারতবর্ষ বিশ্বজগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করচে এই হচ্ছে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস।" ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ও সাধনা তাঁহার জীবনের প্রত্যুষ হইতে তাঁহার মধ্যে নানাভাবে কাজ করিয়া আসিয়াছে—ব্রাহ্মধর্ম বা ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী বা পরিপন্থী কোনো মত ব্যক্ত বা কার্য সম্পন্ন করা খুবই কঠিন। ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্তিত তাঁহার এই নূতন আকর্ষণের ফলে আদিব্রাহ্মসমাজকে নবীন ভাবে গড়িবার দিকে তাঁহার দৃষ্টি গেল।

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধগুলি প্রায়ই অভিব্যক্তিবাদ ও ইতিহাসের পারম্পর্যের দিক হইতে আলোচিত; অর্থাৎ আলোচ্য বিষয় বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ও ইতিহাসের ভিতর দিয়া সার্থক রূপে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। রবীন্দ্রজীবনীর পাঠকগণ অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, কবির উপর একসময়ে হার্বার্ট স্পেন্সরের জৈবিক অভিব্যক্তিবাদ বা 'সমন্বিত দর্শন'বাদের প্রভাব সুস্পষ্টভাবেই ছিল। কিন্তু স্পেন্সরের ঈশ্বর সম্বন্ধে বোধহীনতা বা তাঁহার অজ্ঞেয়বাদ কবির মনকে তৃপ্ত করে নাই; কারণ ঈশ্বর-জিজ্ঞাসা তাঁহার সহজজ্ঞানের ধর্ম ছিল। স্পেন্সরের খণ্ডনকারী লেখক কেয়ার্ড (Caird)-এর গ্রন্থ কবি পড়িয়াছিলেন, তাহা আমরা জানিতে পারি তাঁহার পত্রধারা হইতে। স্পেন্সর অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া যাহাকে কেবল কার্যকারণের ঘাতপ্রতিঘাতজাত ঘটনা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, কেয়ার্ডপ্রমুখ লেখকগণ সেই অভিব্যক্তিকে ইতিহাসের মধ্য দিয়া মঙ্গলরূপ পরমেশ্বরের প্রকাশরূপে দেখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মানব-ইতিহাসের বিবর্তনকে বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছার সার্থকতা অথবা একটি অমোঘ শক্তির স্বতঃউৎসারিত লীলাছন্দ রূপে দেখিতেন। ভারতবর্ষ চিরদিন ঈশ্বরকে মঙ্গলময় বলিয়া আসিয়াছেন সত্য, কিন্তু মানব-ইতিহাসের মধ্য দিয়া বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছা অভিব্যক্ত হইতেছে, এই তত্ত্ব য়ুরোপের একদল দার্শনিক ইতিহাস-শাস্ত্রী তথা ধর্মতাত্ত্বিকের মননলব্ধ সত্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারত-ইতিহাসকে দেখিতেছেন; সেই ঐতিহাসিক তথা তাত্ত্বিকের তথাকথিত মঙ্গল-দৃষ্টি হইতে তত্ত্ববোধিনী পর্বের প্রবন্ধগুলি রচিত।

কবির প্রতিপাদ্য ছিল যে ভারতের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে ভারতের সাধনার যে বাণীকে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে মিলনের মন্ত্র— ভেদের মন্ত্র নহে। অর্থাৎ এতকাল লোকে হিন্দুধর্ম ও সমাজের মধ্যে যে ভেদবুদ্ধিকেই হিন্দুত্ব বলিয়া জানিয়া আসিয়াছিল, কবি তাহাই অপ্রমাণিত করিয়া বলিলেন, ভারতের দ্রষ্টা বা ঋষিরা মিলনের কথাই প্রচার করিয়াছেন, ভেদের কথা বলেন নাই।

Racial বা শ্রেণীগত সমস্যা যে আজই দেশে দেশে রাষ্ট্রনীতিকগণকে উদ্‌ভ্রান্ত করিতেছে তাহা নহে, প্রাচীন ভারতের ভাবুকসমাজের সম্মুখে এইসব অত্যন্ত স্বাভাবিক সমস্যা, অত্যন্ত সাধারণভাবেই দেখা দিয়াছিল; রবীন্দ্রনাথ তাহারই আলোচনা করিলেন 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা' ও 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে। ভারতের ইতিহাসে জাতিসংঘাত বারে বারে কঠিন সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে।[1] প্রাচীন ইতিহাস ও কাহিনীর অনেকখানি

১ ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা (৪ চৈত্র ১৩১৮) প্রবাসীতে প্রকাশিত (১৩১৯ বৈশাখ, পৃ ১-১৯) হইলে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সম্বন্ধে মনোজ্ঞ মন্তব্য লেখেন; প্রাচীনভারতের ইতিহাস অনুসন্ধানী ছাত্র-গবেষকগণ রবীন্দ্রনাথের মূল প্রবন্ধ ও দ্বিজেন্দ্রনাথের মন্তব্য হইতে ভাবিবার মত বহু তথ্য ও তত্ত্ব পাইবেন। —দ্র. প্রবাসী ১৩১৯ আষাঢ়, পৃ. ৩১৪-১৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, গ্রন্থপরিচয় পৃ ৫৭৭-৮০। শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

হইতেছে এই আর্য ও নওআর্য সংঘাত। আমেরিকার নূতন মহাদেশে স্থানীয় লালমানুষকে ও অন্যান্য দ্বীপে ও দেশে স্থানীয় অধিবাসীকে নিশ্চিহ্ন করিবার যে প্রয়াস য়ুরোপীয় ঔপনিবেশিকগণের মধ্যে দেখা গিয়াছিল, সেই হিংসাবিষ আর্য বীরদের মধ্যেও ছিল— কিন্তু সমসাময়িক ভাবুকসমাজ সেই জাতিবৈর ও সংঘাতকে চরম বলিয়া স্বীকার করেন নাই, মানবের এই অত্যন্ত স্বাভাবিক হিংসাপ্রবৃত্তিকে নানাভাবে শমিত করিবার জন্য কতই-না উপদেশ ও ব্যবস্থা দান করিয়াছিলেন। যাঁহারা এই মিলনমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই বলা হয়— ঈশ্বরের অংশ-অবতার। রবীন্দ্রনাথের মতে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ এই মিলনের অগ্রদূত। বুদ্ধদেবও সর্বজাতির মিলনের কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া তিনিও হিন্দুদের নিকট অবতার রূপেই পূজা পাইয়াছেন।

আর্যদের আগমনের পর কত জাতি এদেশে প্রবেশ করিয়াছে; পারসিক গ্রীক শক হূন— কোথায় তাহাদের পৃথক অস্তিত্ব? সকলেই তো বিরাট হিন্দুদের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে, কাহারও পৃথক অস্তিত্ব আজ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। হিন্দুত্বের পরিপূর্ণ প্রাণশক্তিবলে তাহারা বিদেশীকে আত্মীয় করিতে পারিয়াছিল।

মধ্যযুগে যখন তুর্কীরা আসিয়া ইসলামের সাম্যবাণী প্রচার করিল সেদিনও প্রাচীনের সহিত নবীনের বিরোধ বাধিয়াছে। এই বিরোধাগ্নিকে শমিত করিবার জন্য হিন্দুমুসলমান সাধকগণকে গভীর অধ্যাত্ম মিলনের কথা ভাবিতে হইল।[২] রামদাস নানক দাদূ রবিদাস চৈতন্য প্রভৃতি মধ্যযুগীয় সাধকগণ হিন্দুমুসলমানের মধ্যে বিরোধের কথা প্রচার করিলেন না, ভেদনীতি ধর্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন না— সর্বধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী প্রেমের কথা— সর্বসাধারণের কাছে বলিলেন। ইহার কয়েক শতাব্দী পরে আসিল পশ্চিম হইতে য়ুরোপ। য়ুরোপীয় সংস্কৃতির সহিত সেদিনও ভারতীয় সকল শ্রেণীর ধর্ম ও কৃষ্টির বিরোধ বাধিল। নূতন যুগে নূতন পরিস্থিতির সম্মুখে রাজা রামমোহন রায় আবার ধর্মের শাশ্বত বাণী প্রচার করিলেন, তিনি যাহা বলিলেন তাহার নিহিতার্থ হইতেছে সর্বধর্মের মিলনমহোৎসবে অধ্যাত্মজীবনের পূর্ণতা ও সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথের মতে ব্রাহ্মসমাজ সেই মিলনের বাণী প্রচার করিয়াছে বলিয়াই 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা' প্রমাণিত।

রবীন্দ্রনাথ কেন এই মিলনের দৃষ্টিতে ইতিহাসকে দেখিতেছেন তাহা সমসাময়িক জগৎ-প্রবাহ দেখিলেই বুঝা যাইবে। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে জাতিতে জাতিতে মারণাস্ত্র প্রস্তুতের যে গোপন প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল তাহা নহে— ভেদের ও বৈষম্যের সকল প্রকার যুক্তিজাল ও বিষমন্ত্র নানাভাবে প্রচার লাভ করিতেছিল। এই প্রচারকার্যে সাহিত্যিক ও সাংবাদিক, রাষ্ট্রনীতিক ও অর্থশাস্ত্রী, ধার্মিক ও দার্শনিক সকলেই লিপ্ত হন। জাতিবৈষম্য ও জাতিবৈর, জাতিপ্রেম ও জাতীয়তা প্রভৃতি সকল শব্দই একই ব্যাধির উপসর্গ মাত্র; সেই ব্যাধির নাম প্রভুজাতির শক্তিমত্ততা।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে উনবিংশ শতকের পণ্ডিত ও ভাবুকের দল তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ধর্মতত্ত্ব দেবতত্ত্ব নৃতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনার দ্বারা মানুষের মধ্যে মূলগত ঐক্য আবিষ্কার করিয়া মনে করিয়াছিলেন পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু শতাব্দীর শেষভাগে যে প্রতিক্রিয়া neo-romantic movement রূপে জীবনের নানা কোঠায় দেখা দিল, তাহাতে পুরাতনের অনেক কিছুরই নূতন করিয়া মূল্য নিরূপণ শুরু হইল; এই আন্দোলনে পুরাতন নীতির মান বা valueর অনেক অদলবদল হইয়া গেল। শতাব্দী কালের জ্ঞানসাধনায় পণ্ডিতরা যেসব তত্ত্বকে মহামানবের মিলনতত্ত্ব রূপে কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা যে কত মিথ্যা তাহা বাস্তবতার কঠিন পরীক্ষায় প্রমাণিত হইল। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য, অস্ট্রিয়ান্ সাম্রাজ্য, রুশ সাম্রাজ্য, তুর্কী সাম্রাজ্য, চীন সাম্রাজ্য এই মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়া এতকাল টিঁকিয়াছিল, এইসব

সাহিত্য পত্রিকায় 'ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ' নাম দিয়া প্রবন্ধধারা প্রকাশ করেন; ইহা কবির প্রতি আক্রমণ ও তাঁহার রচনার তীব্র সমালোচনা। —দ্র. সাহিত্য ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ. আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র।

২ সুফী সম্প্রদায়ের ভগবৎ-প্রেমের বাণী হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বীদের গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

প্রভুজাতির রাষ্ট্রনায়কগণ মনে করিয়াছিল বিচিত্রকে এক-ভূষণ এক-ভাষণ করিলেই একজাতি হইবে ; uniformity দ্বারা unity আসিবে। বিংশ শতকের আবির্ভাবের পূর্বেই এইসব কাল্পনিক মৈত্রীবন্ধন শিথিল হইয়া আসিয়াছিল।

ইতিমধ্যে য়ুরোপে ও বিশেষভাবে জারমেনিতে প্রভুজাতির বৈশিষ্ট্যের যে নূতন ব্যাখ্যান বাহির হইল, অচিরে তাহার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি বিকৃতি-অনুকৃতি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। পৃথিবীর সর্বত্র য়ুরোপীয় কয়েকটি জাতির প্রভুশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার নিগূঢ় কারণ আবিষ্কার করিতে গিয়া একদল পণ্ডিত race superiority মতবাদ খাড়া করেন। ইহার ফলে জগতের মানুষে-মানুষে (race) ভেদটা একটা স্বতঃসিদ্ধ ঘটনারূপেই স্বীকৃত হইয়াছিল। ভেদ যখন শুরু হয়, তখন কোথায় যে তাহার শেষ বলা কঠিন। য়ুরোপীয়রা যখন শ্বেত জাতি (race) হিসাবে পীতকায় ও কৃষ্ণকায় জাতি হইতে শ্রেষ্ঠ, তখন য়ুরোপীয় জাতিদের (nation) মধ্যে উচ্চ নীচ নেশন বা পীপল্ থাকিবে না কেন— এ-প্রশ্ন শক্তিবাদী জাতির মধ্যে উঠা স্বাভাবিক। য়ুরোপের মধ্যে জারমান জাতি বা টিউটনিক পীপল্রা সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ এই নূতন তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন বার্নাড্ হাউফটন চেম্বারলেন। 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বুনিয়াদ' নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ সালে। বিংশ শতকের গোড়াতেই ঐ জারমান বইএর অনুবাদ ইংরেজিতে বাহির হয়। চেম্বারলেন ইতিহাস হইতে যেসব যুক্তি দেখাইয়া টিউটন জারমান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন তাহা যুক্তি দ্বারা অপ্রমাণ করা কঠিন। ইংরেজ অনুবাদক (Readesdale) ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন 'The foundations,…are built upon rocks so solid that they will defy the cunningest mines that can be laid against them.' এই গ্রন্থ হইতে জারমানদের Nordic race মতবাদের উৎপত্তি ; পরযুগে ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া হিট্‌লারের Aryan মতবাদের উদ্ভব। এই শক্তিবাদের পরিণাম হইল uniformity। এক ধর্ম, এক ভাষা, এক বেশ, এক আশার বুলি প্রচার করিয়া যুগে যুগে শক্তিমানরা বিচিত্রকে বিলোপ করিয়া, বিশেষকে তাহার যথাযথ স্থান না-দিয়া জগতে মিলন-শান্তি খুঁজিয়াছে। মিলন তো হয়ই নাই— বরং প্রত্যেক বার এই কৃত্রিম একীকরণের প্রতিক্রিয়ার হিংস্রতা শতগুণিত হইয়া দেখা দিয়াছে। রাজনীতিজ্ঞরা ভুলিয়া যান যে uniformity বাহ্যিক, unity আত্মিক। য়ুরোপ বাহ্যিকব্যাপারে অত্যন্ত এক-রূপ ; কিন্তু যে আত্মিক বা spiritual (religious নহে) সাধনাগুণে মানুষ পরস্পরকে শ্রদ্ধা করিতে পারে, সে-শিক্ষা তাহারা পায় নাই। এইসব কারণে বিংশ শতকের আরম্ভ হইতে পৃথিবীর সর্বত্র গত শতাব্দীর বাস্তবতাবর্জিত কল্পনামূলক আদর্শবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়।

জগতের এই বিচিত্র সমস্যার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে জগতের সমস্যা আজ এ নহে যে কেমন করিয়া ভেদ লুপ্ত করিয়া মিলন হইবে— সমস্যা হইতেছে ভেদ স্বীকার করিয়া কিভাবে মিলন হইবে। বিশেষের বিলোপের দ্বারা অথবা একীকরণের দ্বারা সমস্যা পূরণ হইবে না। রবীন্দ্রনাথ দেখাইলেন প্রাচীন ভারতবর্ষ uniformity বা বাহ্যিক মিলনের দিকে কোনোদিন জোর দেয় নাই, জাতিমাত্রকে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া অন্তরের মিলনের (unity) জন্য উপদেশ করিয়াছিল। ভারতে সেই আত্মার মিলনের দিকে জোর এতই বেশি পড়িল যে, বাহিরের মিলনের কথা সাধকেরা একেবারেই ভুলিয়া গেলেন। য়ুরোপীয় রাজনীতি ধর্মনীতি ও অর্থনীতির মূলে থাকিল জাতিগত বৈষম্য ও ভেদকে চিরন্তন করিয়া রাখার শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক জগতের এই মারাত্মক ভেদ-বুদ্ধিকে নিন্দা করিলেন ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা। কবির মতে ভারতবর্ষে ইতিহাসের মধ্য দিয়া অসংখ্য বিরুদ্ধ বিপরীত বিসদৃশ জাতি সংশ্লিষ্ট হইয়া যে একটি নূতন সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিয়াছে তাহা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি নহে, আর্য সংস্কৃতি নহে— তাহা হিন্দু বা ভারতীয় (Indian) সংস্কৃতি— আর্য, অন-আর্য, তুর্কী, য়ুরোপীয় জাতিসমূহের মন্থনজাত অ-মৃত সত্য। কবির মতে ভারতের ঋষিদের মধ্যে এই দিব্যদৃষ্টি ছিল, তাঁহারা বলিয়াছিলেন 'বহুধা শক্তি-যোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি' অর্থাৎ তাহারা বিচিত্রকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন— unity in diversity-

কে মানিলেন, তাঁহারা বলিলেন একীকরণ বা সমসমাজ দ্বারা ঐক্য বা সাম্য হয় না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র কুলস্বাতন্ত্র্য গোষ্ঠি-স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াও অন্যের সহিত মিলিত হইতে পারা যায়। ক্ষুদ্র এককের বিলোপ না সাধিয়াই ভূমা সার্থক।

রবীন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা' ও 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধদ্বয়ে ইতিহাস হইতে এই মিলনের কথা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ য়ুরোপীয় মনীষীরা বহু আড়ম্বরে, বহু পণ্ডিতম্মন্যতার দ্বারা যে ভেদধর্ম ও প্রভুজাতির শক্তিধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন— কবি ভারতের ইতিহাস হইতে তাহারই বিপরীত কথা ব্যাখ্যা করিলেন। কবির এই রচনায় ভাবুকতা থাকিতে পারে, উদাহরণাদির মধ্যে ভ্রম-প্রমাদও থাকা বিচিত্র নহে— কিন্তু কবি বলিয়া তাঁহার দৃষ্টি স্বচ্ছ, ও সত্য বহুদূরপ্রসারিত।[১]

এই প্রবন্ধদ্বয়ে এবং 'আত্মপরিচয়' শীর্ষক বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মকে যেভাবে ব্যাখ্যা করিলেন তাহা কখনো কোনো হিন্দু গ্রহণ করিতে পারিবে না। রবীন্দ্রনাথের হিন্দুধর্মে প্রতিমাপূজার স্থান নাই, জাতিভেদ থাকিতে পারে না, শাস্ত্র অভ্রান্ত নহে। তাঁহার মতে সত্যের দিক হইতে যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহাই যদি ধর্মের অঙ্গ হয়, তবে সর্বধর্মের পক্ষে যাহা শ্রেষ্ঠ ও মানবীয়, সকল মানবের পক্ষে যাহা প্রয়োজনীয়— তাহাই হিন্দুধর্মের অঙ্গভূষণ হইবে। রবীন্দ্রনাথের মতে হিন্দুধর্ম বিশ্বজনীন ধর্ম অর্থাৎ সবলোকের আশ্রয়স্থল ; এ কথা যদি সত্য হয় তবে হিন্দুধর্মের সহিত ইসলাম বা খ্রীষ্টীয় ধর্মের মূলতত্ত্বের বিরোধকণ্টক তো একেবারেই উৎপাটিত হইয়া যায়। খ্রীষ্টান ধর্মমত বলিতে রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতকের ভাবুকসমাজের ধর্মমতের কথা বলিয়াছিলেন, যাঁহারা খ্রীষ্টান ধর্মকে বিশ্বজনীন ধর্মরূপেই দেখিতে প্রয়াসী। ইসলাম শুরু হইতে মানুষের বাহিরের ভেদকে ঘুচাইয়া দিয়াছিল ; তাহাকে নামে ভাষায় বেশভূষায় আহারে বিহারে শিল্পে সাহিত্যে ধর্মসাধনায় একটি পরিপূর্ণ একীকরণের রূপ দান করিতে চাহিয়াছিল ; uniformity দ্বারা unity বা ঐক্য আনিবার চেষ্টায় বহুল পরিমাণে ইসলাম কৃতকার্যও হইয়াছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হওয়া মানব-মনস্তত্ত্বের দিক হইতে অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ যে ব্রাহ্মধর্ম তথা হিন্দুধর্মকে ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা উদারতম বিশ্বমানবতার ধর্ম। কিন্তু প্রকৃত হিন্দুধর্ম এই বিশ্বমানবতায় সাড়া দেয় না। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম তথা হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আদি ব্রাহ্মসমাজের পূর্বাচার্যগণের মতকেই ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করিলেন। বহুবৎসর পূর্বে রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' প্রবন্ধে যে হিন্দুধর্মের চিত্র আঁকিয়াছিলেন, তাহা যথার্থভাবে আদিসমাজের কল্পিত হিন্দুধর্ম ; বঙ্কিম-চন্দ্র রাজনারায়ণের পুস্তিকাকে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যান বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। তেমনি আজও রবীন্দ্রনাথ হিন্দুব্রাহ্ম প্রশ্নের মীমাংসায় ব্রাহ্মেরা হিন্দু এবং ব্রাহ্মধর্মই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ঘোষণা করিলে সে-সিদ্ধান্ত সকলে গ্রহণ করিলেন না। হিন্দুধর্মকে কবি বিশ্বজনীন ধর্মরূপে যে ঘোষণা করিলেন, তাহা কি সনাতনী কি অর্বাচীন হিন্দু কেহই স্বীকার করিতে পারেন নাই। স্বীকার না করিলেও এই সত্যই রহিয়া গেল যে, যদি হিন্দুধর্ম বা সমাজ পৃথিবীর ধর্মসভায় স্থায়ী স্থানলাভ করিতে চায়, তবে তাহাকে ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের আদর্শতেই প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে— লৌকিক বৈদিক পৌরাণিক তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম জগৎধর্মসভায় দাঁড়াইতে পারিবে না।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-পর্বে কবিচিত্তের প্রধান জিজ্ঞাসাই হইতেছে 'ধর্মের অর্থ' কী। 'ধর্মের নবযুগে' মানুষের 'ধর্মশিক্ষা'ই বা কিরূপ হইবে, আর তাহার 'ধর্মের অধিকার'ই বা কী রূপ লইবে। নবযুগের ধর্মবিচারের সঙ্গে অনাদিকালের প্রশ্ন ঈশ্বরকে 'রূপ ও অরূপ' বলিলে কী বুঝায় সে প্রশ্নও আসিয়া পড়িল।

এইবার রবীন্দ্রনাথ 'ধর্মের অর্থ' লইয়া যে বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন তাহা সতই 'ধর্মে'র বিচার, বিশেষ কোনো

১ 'অচলায়তন' এই সময়ের রচনা। আদর্শায়িত সমাজের দুর্গতি কোথায় সে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কোনো মোহ ছিল না। ভবিষ্যতের ভারতীয় সমাজে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যকে ভেদ ঘুচাইয়া প্রাচীনের ভিত্তির উপর নূতনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে— এই ছিল অচলায়তনের গুরুর বাণী।

ধর্মমতের বিচার নহে। কবি বলিলেন "মানুষের ধর্ম ধর্মই— তাহাকে আর কোনো নাম দিবার দরকার করে না।"[১]

রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ দ্বৈতও বটে, অদ্বৈতও বটে। মানুষ যদি সত্য করিয়া আপনাকে বিশ্লেষণ করে এবং বিশ্লেষণ করিয়া সে কী পায় তাহা সাধুভাবে প্রকাশ করে, তবে তাহাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, সে বিশেষ কোনো দার্শনিক 'বাদ'এর মধ্যে সকল সময় থাকিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ কবি, অন্তরের অনুভূতি প্রকাশই তাঁহার ধর্ম, তাই তিনি নানা সময়ে নানা অনুভূতির মধ্য দিয়া সত্যকে দেখিয়াছেন ও তাহাই ভাষায় বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গির মধ্যে দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষের উপর একটা মস্ত সমস্যার মীমাংসার ভার পড়িয়াছে। তাঁহার জীবনে ও মননে বড় ও ছোট ওতোপ্রোতভাবে মিশাইয়া আছে— আলো ও আঁধারের ন্যায়ই অচ্ছেদ্য— দুইয়ের মধ্যে একটা ভেদ আছে, কিন্তু ছেদ নাই। "এই দুইয়ের সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টাই তাহার [মানুষের] সকল চেষ্টার মূল। এই সামঞ্জস্য যদি না করিতে পারা যায় তবে ছোটোরও কোনো অর্থ থাকে না, বড়োটিও নিরর্থক হইয়া পড়ে।"[২]

কবির বক্তব্য এই যে, আমাদের ব্যক্তিগত বা ক্ষুদ্র মন একটি বৃহৎ মনোলোকের সঙ্গে ভালোরকম করিয়া মিলিতে চায়। যে পরিমাণে ভালো করিয়া এই মিল ঘটে সেই পরিমাণেই তাহার পূর্ণতা— ইহাকে আমরা in tune with the infinite বলিতে পারি। এই মিল বা মিলনের জন্য মানুষ নিজের বাহিরে পরিবার, পরিবারের বাহিরে দেশ, দেশের বাহিরে বিশ্বমানবসমাজের দিকে আপন চিত্ত বিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন। নবযুগের ধর্মের অর্থ এই ব্যাপ্তি বা আত্মব্যাপকতা; নিজের ক্ষুদ্রত্ব হইতে মুক্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টাই হইতেছে নূতন যুগের সাধনা।

যুগযুগান্তর হইতে মানুষ মুক্তি চাহিয়া আসিতেছে; কিন্তু প্রশ্ন, সে মুক্তি চায় কী হইতে। আশ্চর্যের বিষয়— মানুষ যাহা চাহিতেছে সেই ঈপ্সিত, অর্জিত বস্তুপিণ্ডের বন্ধন ও শাসন হইতেই তাহার মুক্তির কামনা। কিন্তু মুক্তি ও বন্ধন যে অঙ্গাঙ্গীভাবে আবিষ্ট— ইহাদের পৃথক করিবে কে? মুক্তির অন্তে গম্যস্থান কোথায়? গম্যস্থানেই আমরা পৌঁছিয়া আছি। ইহার কোথায়ও শেষ নাই, অথচ ইহার সর্বত্রই শেষ; ইহার মধ্যে সমাপ্তি ও ব্যাপ্তি একেবারে অচ্ছেদ্যভাবে লিপ্ত, অখণ্ডভাবে যুক্ত। কবির মতে মানুষের অন্তহীন ব্যাপ্তির গম্যহীন পথের অবসান হয় তখনই, যখন সে এক অখণ্ড অমৃতে জগতকে ও জীবনকে আদ্যন্ত পরিপূর্ণ করিয়া দেখিতে পারে। তিনি বলেন যে আমরা পূর্ণতাকে পর্বে পর্বে পাইয়াই চলিয়াছি। বস্তুত আমার মধ্যে একদিকে চলা, এবং আর এক দিকে পৌঁছানো, এক দিকে বহু আর এক দিকে এক— এক সঙ্গেই রহিয়াছে। এক দিকে আমার শক্তি বাহিরের বিচিত্রের দিকে চলিয়াছে, আর এক দিকে আমার আনন্দ ভিতরের একের দিকে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-দর্শনের মূল সূত্রটি এই কয়টি কথার মধ্যে নিহিত। 'বলাকা'র কবিতা এই ধর্মেরই গীতা। 'ধর্মের অর্থ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ধর্মের যে ব্যাখ্যান করিলেন, তাহা তাঁহার ধর্মসম্বন্ধীয় পূর্বরচনা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, এখন তিনি ধর্মকে দার্শনিকের দৃষ্টিতে দেখিতে চেষ্টা করিতেছেন, কেবলমাত্র ব্রাহ্মধর্মের দৃষ্টিতে নহে।

কিন্তু 'রূপ ও অরূপ' প্রবন্ধে এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি আরও গভীর ও জটিল। জগৎ মায়া অলীক এ কথা এ দেশের পুরাতন তত্ত্ব। 'জগৎ' যে গতিশীল তাহা শব্দের ধাতুগত অর্থের মধ্যেই সুস্পষ্ট। অধুনা পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানীরা জগতের বস্তুপিণ্ডকে অণু-পরমাণু-ত্রসরেণু-তস্যাণুরেণুতে ভাগ করিতে করিতে এমন জায়গায় পৌঁছিয়াছেন যেখানে বস্তুর কোনো স্থিরতা খুঁজিয়া পাইতেছেন না, তাঁহারা দেখিতেছেন কেবল গতি, কেবল স্পন্দন। তাঁহাদের কেহ কেহ বলেন

১ ধর্মের অর্থ, সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ. ৩৬৮।

২ ধর্মের অর্থ, সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ. ৩৬৬।

গতিই বস্তুর মূলগত ধর্ম। বের্গসঁ এই গতিধর্মের নাম দিয়াছেন সৃজনশীল অভিব্যক্তি (creative evolution)। আমাদের আলোচ্যপর্বে য়ুরোপে যে কয়জন মনীষী তথাকার ভাবুকজগৎকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, বের্গসঁ তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার গতিবাদের দর্শন সাধারণ শিক্ষিত ভাবুকসমাজের নিকট অত্যন্ত মনোরম ঠেকিয়াছিল।

'রূপ ও অরূপ' প্রবন্ধে কবি বলিলেন যে গতিই সত্য স্থিতি সত্য নহে এ কথা শ্রদ্ধেয় নহে। তিনি বলিলেন, "যাহা অনন্ত সত্য, অর্থাৎ অনন্ত স্থিতি, তাহা অনন্ত গতির মধ্যেই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। এইজন্য সকল প্রকাশের মধ্যেই দুই দিক আছে। তাহা এক দিকে বদ্ধ, নতুবা প্রকাশই হয় না, আর এক দিকে মুক্ত, নতুবা অনন্তের প্রকাশ হইতে পারে না। এক দিকে তাহা হইয়াছে আর এক দিকে তাহার হওয়া শেষ হয় নাই, তাই সে কেবলই চলিতেছে। এইজন্যই জগৎ জগৎ, সংসার সংসার।" অন্যত্র বলিলেন, "সমস্ত চঞ্চলতার মাঝখানে একটি স্থিতি আছে বলিয়া সেই বিধৃতিসূত্রে আমরা যাহা কিছু জানিতেছি, নহিলে সেই জানার বালাইমাত্র থাকিত না— যাহাকে মায়া বলিতেছি তাহাকে মায়াই বলিতে পারিতাম না যদি কোনোখানে সত্যের উপলব্ধি না থাকিত।"[১] অপর দিকে প্রত্যেক মুহূর্ত অন্য মুহূর্তের সঙ্গে যোগযুক্ত বলিয়া আমরা কালকে জানিতে পারি ; বিচ্ছিন্নতাকে জানা যায় না। রবীন্দ্রনাথ এই যোগের তত্ত্বকে স্থিতির তত্ত্ব বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে যাহা অনন্তসত্য অর্থাৎ অনন্তস্থিতি তাহা অনন্তগতির মধ্যেই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। তিনি বলিতেছেন যে এই অন্তহীন গতিদ্বারা যে অন্তহীন স্থিতিকে নির্দেশ করিতেছে সেইখানেই আমাদের চিত্তের চরম আশ্রয় চরম আনন্দ। কবির মতে শিল্প ও সাহিত্যের সাধনায় "মানুষের চিত্ত আপনাকে বাহিরে রূপ দিয়া সেই রূপের ভিতর হইতে পুনশ্চ আপনাকেই ফিরিয়া দেখিতেছে।"[২] শিল্প-সাহিত্যে "ভাবব্যঞ্জনার দ্বারা রূপ আপনার একান্ত ব্যক্ততা যথাসম্ভব পরিহার করে বলিয়াই অব্যক্তের অভিমুখে আপনাকে বিলীন করে বলিয়াই মানুষের হৃদয় তাহার দ্বারা প্রতিহত হয় না।"[৩] ভাবব্যঞ্জনার অন্যমত প্রকাশ হইতেছে শিল্পে ভাবের রূপ গ্রহণ। রূপ ও অরূপের প্রশ্নে স্বভাবতই প্রতিমাপূজার কথা আসে। কারণ এ দেশের হিন্দুদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের ধারণা যে রূপবিবর্জিত ঈশ্বর-সাধনা অসম্ভব। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথকে এই প্রবন্ধে সেই বহু পুরাতন প্রশ্নের নূতন করিয়া উত্তর দিতে হইল। লেখকের মতে প্রতিমাপূজার দ্বারা ভাব রূপ পায় না, সাহিত্যে আমরা কল্পনাকে মুক্তি দিতে পারি ; কিন্তু মূর্তিতে আমরা কল্পনাকে বদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু কল্পনা তখনই কল্পনা যখন তাহার প্রবাহ থাকে, যখন সে সত্যের অনন্তরূপকে প্রকাশ করে। মূর্তির দ্বারা তাহা হয় না। "সেইজন্য বিশ্বজগতের বিচিত্র ও নিত্যপ্রবাহিত রূপের চির-পরিবর্তনশীল অন্তহীন প্রকাশের মধ্যেই আমরা অনন্তের আনন্দকে মূর্তিমান দেখিতে পাই।"[৪] বস্তুর বৈষম্য সৃষ্টির মূলতত্ত্ব ; কবির মতে চঞ্চলতার দ্বারাই লক্ষ্মী বৈষম্যের মধ্যে সাম্যকে আনেন। ইহার অনেকগুলি কথা কবি শান্তিনিকেতন উপদেশমালায় বিচ্ছিন্নভাবে বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

লেখকের মতে, "সত্যকে সুন্দরকে মঙ্গলকে যে রূপ যে সৃষ্টি ব্যক্ত করিতে থাকে তাহা বদ্ধরূপ নহে, তাহা একরূপ নহে, তাহা প্রবহমান এবং তাহা বহু। এই সত্যসুন্দর মঙ্গলের প্রকাশকে যখনি আমরা বিশেষ দেশে কালে পাত্রে বিশেষ আকারে বা আচারে বদ্ধ করিতে চাই তখনি তাহা সত্য সুন্দর মঙ্গলকে বাধাগ্রস্ত করিয়া মানবসমাজে দুর্গতি

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ৩৩৭। Eucken বলিতেছেন There must be a unity of some kind ruling within us ; but the mechanism of nature can never produce such a unity. —*Main Currents* p. 69. সমসাময়িক চিন্তাধারার নমুনারূপে এই অংশটি উদ্ধৃত হইল।

২ সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ৩৩৮।

৩ সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ৩৩৯।

৪ সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ৩৪১।

আনয়ন করে।" রূপমাত্রেরই একটি মায়া চঞ্চলতা অনিত্যতা আছে; আমরা যদি ধর্মের সেই রূপ বা অবয়বকে tradition বা প্রথার পিঞ্জরে অচল করিয়া বাঁধিতে চাই, তবে আমরা কেবল বন্ধনকেই লাভ করিব, গতিকে একেবারেই হারাইয়া ফেলিব।[১]

ধর্মের নবযুগ আসিয়াছে। কিন্তু বিশেষ ধর্মের বিশেষ শিক্ষার মধ্যে মানুষে মানুষে ভেদের বিষবীজই বপন করা হইয়াছে। আমরা এ দেশে নূতন করিয়া ধর্মের ভেদ স্পষ্ট করিবার জন্য ব্যগ্র। অথচ মুষ্টিমেয় ভাবুকসমাজ সর্বত্র এই কৃত্রিম ভেদবুদ্ধিকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। 'নবযুগের ধর্ম' মানুষে মানুষে ভেদ ঘুচাইবার বাণী বহন করিতেছে। অজ্ঞানের বেড়া ভাঙিয়া ইহাই প্রমাণিত হইতেছে জড়ে জীবে সর্বত্রই একের সঙ্গে আরের যোগ অত্যন্ত সুবিস্তৃত। মানুষের ভেদবুদ্ধি সহজে মরিতে চায় না; কিন্তু আজ মানুষের দেহগঠনের তুলনা, ভাষার তুলনা, সমাজের তুলনা, ধর্মের তুলনা দ্বারা ইহাই দেখা যাইতেছে যে মানুষ এক। ভাবুকসমাজ নানাভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐক্যের সন্ধানে ফিরিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের মতে নূতন যুগের মানুষ প্রাচীন ধর্মের সহিত তাহার নূতন বোধের সামঞ্জস্য করিতে পারিতেছে না; "সে এমন-একটি ধর্মকে চাহিতেছে যাহা কোনো বিশেষ কালের বিশেষ ধর্ম নহে; যাহাকে কতকগুলি বাহ্য পূজাপদ্ধতির দ্বারা বিশেষ রূপের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলা হয় নাই; মানুষের চিত্ত যতদূর প্রসারিত হউক যে, ধর্ম কোনো দিকেই তাহাকে বাধা দিবে না, বরঞ্চ সকল দিকেই তাহাকে মহানের দিকে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিবে। মানুষের জ্ঞান আজ যে মুক্তির ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সেইখানকার উপযোগী হৃদয়বোধকে এবং ধর্মকে না পাইলে তাহার জীবন-সংগীতের সুর মিলিবে না, এবং কেবলই তাল কাটিতে থাকিবে।"[২]

নবযুগের ধর্ম মানব-ইতিহাসে কিভাবে বিকশিত হইয়াছে তাহা আলোচনা করিয়া কবি যাহা বলিলেন তাহার সহিত আমাদের পূর্বে-আলোচিত বের্গসঁর গতিবাদের মিল একটা স্থানে দেখিতে পাই। কবি বের্গসঁর ন্যায় ভাবুকতার চোখেই ধর্মকে দেখিয়া বলিতেছেন, "আজ মানুষের জ্ঞানের সম্মুখে সমস্ত কাল জুড়িয়া, সমস্ত আকাশ জুড়িয়া একটি চিরধাবমান মহাযাত্রার লীলা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে— সমস্তই চলিতেছে সমস্তই কেবল উন্মেষিত হইয়া উঠিতেছে। প্রকাশ কোনো জায়গাতেই স্থির হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে নাই, এক মুহূর্ত তাহার বিরাম নাই; অপরিস্ফুটতা হইতে পরিস্ফুটতার অভিমুখে কেবলই সে আপনার অগণ্য পাপড়িকে একটি একটি করিয়া খুলিয়া দিকে দিকে প্রসারিত করিয়া দিতেছে। এই পরমাশ্চর্য নিত্যবহমান প্রকাশব্যাপারে মানুষ যে কবে বাহির হইল তাহা কে জানে— সে যে কোন্ বাষ্পসমুদ্র পার হইয়া কোন্ প্রাণরহস্যের উপকূলে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল তাহার ঠিকানা নাই।"[৩]

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম সম্বন্ধে এই কথাটুকু আশ্চর্যরূপে বের্গসঁর[৪] অভিব্যক্তিবাদের সহিত মেলে; কিন্তু তাহার আসল তত্ত্বের সহিত ভেদ বেশ স্পষ্ট। কবি, অনন্ত-উন্নতি বা স্থিতি নাই গতি আছে এই মতবাদকে সমর্থন করেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ ক্রমশই ধর্মকে যে উদারদৃষ্টিতে দেখিতেছেন তাহাতে ধর্ম আর কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। মানুষের মধ্যে যাঁহারা সকলের বড় তাঁহারা প্রয়োজন সাধনের জন্য সত্যকে কখনো ছোট করিয়া

১ সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ৩৪৩।

২ সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ৩৫০।

তু° Everywhere the individual is the central point...only the individual is real. For knowledge, this individual is fact, experience; for the will individual action; for religion and morality individual conscience, for the state individual citzens.—Stein, *Philosophic Essays* I, p 5.

৩ সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ৩৫০।

৪ Radhakrishnan, *The Reign of Religion in Contemporary Philosophy*, p 150.

দেখেন নাই। তাঁহারা যে পরম লাভ, যে অসাধ্যসাধনের কথা বলেন তাহাকেই তাঁহারা মানুষের ধর্ম বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাহাই মানুষের পুরিপূর্ণ স্বভাব, তাহাই মানুষের সত্য। তবে মানুষের পক্ষে যাহা সত্য তাহাই যে তাহার পক্ষে সহজ নহে। সত্যের আহ্বানে মানুষ যে পাশবতার দিক হইতে মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে এইটেই বড় করিয়া দেখিতে পান তিনিই— যিনি বড়। কিন্তু "আমাদের দেশে সকলের চেয়ে নিদারুণ দুর্ভাগ্য এই যে, মানুষের দুর্বলতার মাপে ধর্মকে সুবিধামতো খাটো করিয়া ফেলা যাইতে পারে এই অদ্ভুত বিশ্বাস আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। আমরা এ কথা অসংকোচে বলিয়া থাকি, যাহার শক্তি কম তাহার জন্য ধর্মকে ছাঁটিয়া ছোটো করিতে দোষ নাই, এমন-কি, তাহাই কর্তব্য।"[১] ধর্মের ইতিহাস থেকে লেখক দেখাইলেন যে জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মোপদেষ্টাগণ পুরাতনকে মূঢ়ভাবে অনুসরণ করিতে বলেন নাই। কেহই এ কথা বলেন নাই যে দশজনে যাহা মূঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়া থাকে তাহাই ধর্ম, তাহাই পালনীয়। মানুষ চিরদিন তাহার অতীতকে অতিক্রম করিয়াছে নহিলে "যুগযুগান্তর ধরিয়া মানুষ মউমাছির মতো একই রকম মউচাক তৈরি করিয়া চলিত। বস্তুত অবিচলিত সনাতন প্রথার বড়াই যদি কেহ করিতে পারে তবে সে পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ, মানুষ নহে।" হিন্দুসমাজ যে জাতিভেদ স্বীকার করিয়া মানুষে মানুষে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, ব্যক্তি ও জাতিবিশেষের 'ধর্মের অধিকার' ক্ষুণ্ণ করাই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলিয়া রটনা করিতেছে— কবির সমস্ত প্রতিবাদ সেইখানে কেন্দ্রিত। তাঁহার দুঃখ— আমাদের ধর্ম আমাদের হৃদয়ের চেয়ে অনেক নীচে পড়িয়া গিয়াছে, আমাদের ধর্ম আমাদের সহজ বুদ্ধি হইতে অধোগামী নামিয়া রহিয়াছে। মানুষের পূর্ণ সত্যে অধিকার নাই এ কেবল হিন্দু ধর্মই বলিয়া থাকে, অসম্পূর্ণে সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবার উপদেশ এদেশের হিন্দুরা শোনে। "যাহা ক্ষুদ্র, যাহা স্থূল, যাহা অসত্য যাহা অবিশ্বাস্য তাহাকেও দেশকালপাত্র অনুসারে ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া কী প্রকাণ্ড, কী অসংগত, কী অসংলগ্ন জঞ্জালের ভয়ংকর বোঝা মানুষের মাথার উপরে আজ শত শত বৎসর ধরিয়া চাপাইয়া রাখিয়াছে! সেই ভগ্নমেরুদণ্ড, নিষ্পেষিতপৌরুষ, নতমস্তক মানুষ প্রশ্ন করিতেও জানে না, প্রশ্ন করিলেও তাহার উত্তর কোথাও নাই।...নিষেধজর্জরিত চিরকাপুরুষ নির্মাণ করিবার এত বড়ো সর্বদেশব্যাপী ভয়ংকর লৌহযন্ত্র ইতিহাসে আর কোথাও কি কেহ সৃষ্টি করিয়াছে— এবং সেই মনুষ্যত্ব চূর্ণ করিবার যন্ত্রকে আর কোনো দেশে কি ধর্মের পবিত্র উপাধিতে আখ্যাত করা হইয়াছে?" "নানা জাতির বোঝা ও নানা কালের আবর্জনাকে লইয়া নির্বিচারে আমরা কেবলই একটা প্রকাণ্ড মোট বাঁধিতে বাঁধিতেই চলিয়াছি এবং সেই উত্তরোত্তর সঞ্চীয়মান উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট নূতন পুরাতন আর্য ও অনার্য অসম্বদ্ধতাকে হিন্দুধর্ম নামক এক নামে অভিহিত করিয়া এই সমস্তটাকে আমাদের চিরকালীন জিনিস বলিয়া গৌরব [illegible]তেছি— ইহার ভয়ংকর ভারে আমাদের জাতি কত যুগযুগান্তর ধরিয়া ধূলিলুণ্ঠিত; কোনোমতেই সে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।"

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন যে, ধর্মের বিকারেই গ্রীস রোম প্রভৃতি মরিয়াছিল; আমাদের দুর্গতির কারণ আমাদের ধর্মের মধ্যে ছাড়া আর-কোথাও নাই; এবং আত্মরক্ষার উপায়কে বাহিরে খুঁজিতে যাওয়া দুর্বল আত্মার মূঢ়তা।

ধর্মকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে ও সকল প্রকার সম্বন্ধ হইতে নিরবচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলেই পরম্পরাগত সাধনাকে বাদ দিতে হইবে তাহার কোনো মানে নাই। দেশের বিশেষ ধর্মসাধনার মধ্যে যাহা ভাবাত্মক তাহা ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ব্যর্থ হয় না। রবীন্দ্রনাথ ধর্মের অর্থ ব্যাখ্যান করিয়া ধর্মের নবযুগে মানুষের ধর্মের অধিকার কিরূপ হইবে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিলেন; কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই ভারতীয় সাধনাকে পাশ কাটাইয়া যাইতে পারেন নাই, কারণ সেটি তাঁহার রক্তের মধ্যে মিলাইয়া আছে।

১ ধর্মের অবিচার, সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮।

ধর্মমাত্রই বিশেষ স্থান কাল ও পাত্রের মধ্যে উদ্‌ভূত হইয়াছে— এ কথা স্বতঃসিদ্ধ। লোকপরম্পরা ও ইতিহাসের দ্বারা প্রত্যেক ধর্মই কমবেশি প্রভাবান্বিত। ধর্মভীরু লোকের পক্ষে ধর্ম মানিতে গেলে এমন সব জিনিস মানিতে হয়, যাহার সহিত যুক্তি সহজজ্ঞান ও অধীত বিদ্যার আপস করা কঠিন। ধর্ম সনাতন, অতীতের— কিন্তু বিদ্যা ঠিক উল্‌টা, কারণ, জ্ঞান নিত্য অগ্রসর হইতেছে; ফলে জ্ঞানবিজ্ঞানের সহিত ধর্মবিশ্বাসের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। এই অবস্থায় হিন্দুধর্ম ও জ্ঞানবিজ্ঞানের মধ্যে সাম্য রক্ষা করা কঠিন।

মানুষ সামাজিক জীব; সে সন্তানের মধ্যে দেহে অমর, সে তাহার মনের মধ্যেও ভাবধারায় অমর হইতে চাহে। মানুষের দেহের মধ্যে লক্ষ বৎসরে বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নাই, কিন্তু ঐ কালের মধ্যে তাহার মনের প্রগতি যাহা হইয়াছে, তাহা দ্বারা মানুষকে চেনা ভার। অথচ যুগে যুগে মানুষ চাহিয়াছে— সে যাহা বিশ্বাস করিয়াছে সে যাহাকে অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়াছে, সে যাহাকে শ্রদ্ধা দিয়াছে, তাহার পরবর্তীরাও সেইভাবে চিন্তা করুক, সেইভাবে ভক্তি করুক, সেই ভাবেই চলুক। সেইজন্য মানবসমাজের একটি বিশেষ কাজ হইতেছে, সমাজের ভবিষ্যৎ-বংশধরগণকে ধর্মের অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া। স্কুলে কলেজে, মক্তবে পাঠশালায়, টোলে মাদ্রাসায় যে-যাহার মত ধর্মমত অল্পবিস্তর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতে উৎসুক, কিন্তু তাহাতেও এ যুগের মানুষ তৃপ্ত নহে; প্রণালীবদ্ধভাবে ক্লাস করিয়া ধর্মশিক্ষা দেওয়া উচিত কি না সেই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু হইয়াছে। ইহার সঙ্গে হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় ও মুসলীম-বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাবার্তা শোনা যাইতেছিল। মোটকথা ধর্মশিক্ষার একটা কথা এদেশে সর্বত্র আলোচিত হইতেছিল, এমন-কি ক্ষুদ্র ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও ধর্মশিক্ষার অভাবে বালকবালিকা শ্রদ্ধাহীন বিশ্বাসহীন হইয়া পড়িতেছে বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের মতে ধর্মশিক্ষা নিতান্তই সহজ, নিশ্বাসের ন্যায় সহজ। উপমা দিয়া তিনি বলিলেন মানুষ যখন নিশ্বাস লইতে কষ্টবোধ করে, তখন যেমন তাহার চিকিৎসকের আশঙ্কা হয়, মানুষ তেমনি ধর্মবিষয়ে সহজ না হইলে বুঝিতে হইবে সভ্যতার মধ্যে কঠিন পাপ প্রবেশ করিয়াছে। ধর্ম যেখানে জীবনে পরিব্যাপ্ত, ধর্মশিক্ষা সেইখানেই স্বাভাবিক। ধর্মশিক্ষা আর-পাঁচটি বিষয় শিক্ষার ন্যায় শিখানো যায় না, সে যাহা শিখানো হইবে, তাহা হইতেছে সম্প্রদায়বিশেষের ধর্মমত (dogma) মাত্র। সেইপ্রকার ধর্মমত জানা ও ধর্মের আচার প্রতিপালনের দ্বারা মানুষের ধর্মজীবন লাভ হয় না। সেইজন্য প্রতিদিন জীবনের কর্ম ও সেবার মধ্য দিয়া, প্রকৃতির মধ্য দিয়া মনের যে বন্ধনমুক্তি ও সুন্দরের অনুভূতি হয়, তাহাই ধর্মশিক্ষার মূল কথা। নিষ্ঠার সহিত কর্তব্য পালন ও শ্রদ্ধার সহিত সেবা আমাদের চিত্তের বহু সংস্কার দূর করে। 'ধর্মশিক্ষা' প্রবন্ধের উপসংহারে কবি নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার কথাই বলিলেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমবিদ্যালয়টির সহিত তাঁহার জীবনের একাদশ বর্ষ জড়িত; তিনি সেই বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা বলিতে কী দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন তদ্‌বিষয়েই আলোচনা করিয়া বলিলেন :

"আমি সবিনয়ে অথচ অসংশয় বিশ্বাসের দৃঢ়তার সঙ্গেই বলিতেছি যে, যে ধর্ম কোনো প্রকার রূপকল্পনা বা বাহ্য প্রক্রিয়াকে সাধনার বাধা ও মানুষের বুদ্ধি ও চরিত্রের পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়াই মনে করে, সাময়িক বক্তৃতা বা উপদেশের দ্বারা সে ধর্ম মানুষের চিত্তকে সম্পূর্ণ অধিকার করিতে পারিবে না। সে ধর্মের পক্ষে এমন সকল আশ্রমের প্রয়োজন, যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের যোগ ব্যবধানবিহীন ও যেখানে তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে মানুষের আত্মীয়-সম্বন্ধ স্বাভাবিক; যেখানে ভোগের আকর্ষণ ও উপকরণবাহুল্য নিত্যই মানুষের মনকে ক্ষুব্ধ করিতেছে না; সাধনা যেখানে কেবলমাত্র ধ্যানের মধ্যেই বিলীন না হইয়া ত্যাগে ও মঙ্গলকর্মে নিয়তই প্রকাশ পাইতেছে; কোনো সংকীর্ণ দেশকালপাত্রের দ্বারা কর্তব্য-বুদ্ধিকে খণ্ডিত না করিয়া যেখানে, বিশ্বজনীন মঙ্গলের শ্রেষ্ঠতম আদর্শকেই মনের মধ্যে গ্রহণ করিবার অনুশাসন গভীরভাবে বিরাজ করিতেছে; যেখানে পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে শ্রদ্ধার চর্চা হইতেছে,

জ্ঞানের আলোচনায় উদারতার ব্যাপ্তি হইতেছে এবং সকল দেশের মহাপুরুষদের চরিত স্মরণ করিয়া ভক্তির সাধনায় মন রসাভিষিক্ত হইয়া উঠিতেছে ; যেখানে সংকীর্ণ বৈরাগ্যের কঠোরতার দ্বারা মানুষের সরল আনন্দকে বাধাগ্রস্ত করা হইতেছে না ও সংযমকে আশ্রয় করিয়া স্বাধীনতার উল্লাসই সর্বদা প্রকাশমান হইয়া উঠিতেছে ; যেখানে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত ও নৈশ আকাশে জ্যোতিষ্কসভার নীরব মহিমা প্রতিদিন ব্যর্থ হইতেছে না, এবং প্রকৃতির ঋতু-উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আনন্দসংগীত একসুরে বাজিয়া উঠিতেছে ; যেখানে বালকগণের অধিকার কেবলমাত্র খেলা ও শিক্ষার মধ্যে বদ্ধ নহে— তাহারা নানা প্রকারে কল্যাণভার লইয়া কর্তৃত্বগৌরবের সহিত প্রতিদিনের জীবনচেষ্টার দ্বারা আশ্রমকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছে এবং যেখানে ছোটোবড়ো বালকবৃদ্ধ সকলেই একাসনে বসিয়া নতশিরে বিশ্ব-জননীর প্রসন্ন হস্ত হইতে জীবনের প্রতিদিনের এবং চিরদিনের অন্ন গ্রহণ করিতেছে।"[১] এই কয়েকটি পংক্তির মধ্যে কবি যে কেবল ধর্মশিক্ষার আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নহে, ইহার মধ্যে ধর্মজীবনের একটি পরিপূর্ণ আদর্শ ধরিয়াছেন।

ধর্মশিক্ষার নূতন সমস্যা দেশে দেখা দিয়াছিল সাম্প্রদায়িকতাকে কেন্দ্র করিয়া। কিন্তু কবি এই উগ্র সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে নিহিতার্থটুকু অতি সহজেই আবিষ্কার করিতে পারিলেন। তাই তিনি হিন্দু মুসলমানের সমস্যা বিষয়ে যাহা বলিলেন তাহা যথার্থ ঋষিবাক্য।

তাঁহার মতে প্রত্যেকটি একক, তাহা ক্ষুদ্রই হউক আর বৃহৎই হউক নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে সচেতন হইবার পরই মিলন ঘটিবে। তাহার পূর্বে যে মিলন তাহা মোহাচ্ছন্ন জড়ত্বের মিলন মাত্র। শক্তির পূর্ণবিকাশ হইলে পরস্পরের সহিত মিলন সত্বর ও সহজ হয়। নতুবা বৃহৎ একটা-কিছুর জন্য ছোট ছোট ভেদ, যে-ভেদ সত্যই আছে— তাহার বিকাশ হইতে না-দেওয়াটাতেই যে বৃহৎ ব্যাপারটা আপনি সাধিত হইবে, তাহার কোনো অর্থ নাই।

পদ মান শিক্ষার বৈষম্য ঘুচিয়া যাওয়া শক্ত নহে। কিন্তু "সত্যকার স্বাতন্ত্র্য···বিলুপ্ত করা আত্মহত্যা করারই সমান।"[২] মুসলমানেরা যে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে উদ্যত হইতেছে সে সম্বন্ধে কবি বলিলেন, "মুসলমান নিজের প্রকৃতিতেই মহৎ হইয়া উঠিবে এই ইচ্ছাই মুসলমানদের সত্য ইচ্ছা। এইরূপে বিচিত্র স্বাতন্ত্র্যকে প্রবল হইয়া উঠিতে" দেখিয়া সকলের মনেই ভয় হইতে পারে ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন সেই আশঙ্কার কাল চলিয়া গিয়াছে। এখন পৃথিবীর কোথায়ও কাহারো পক্ষে "অসংগতরূপে অবাধে একঝোঁকা রকম বাড় বাড়িয়া একটা অদ্ভুত" কিছু সৃষ্টি করা অসম্ভব। "যাহারা স্বতন্ত্র তাহারা পরস্পরের পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইলে তবেই তাহাদের বাড়াবাড়ি কাটিয়া যায় ও তাহাদের সত্যটি যথার্থভাবে প্রকাশ পায়।···হিন্দু বা মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি বিশ্বকে স্থান দেওয়া হয় তবে সেই সঙ্গে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে স্থান দিলে কোনো বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না।" "সেখানে তাহাকে সমান হইয়া লইতে হইবে। এই বৈষম্যটি দূর করিবার জন্য মুসলমান সকল বিষয়েই হিন্দুর চেয়ে বেশি দাবি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের এই দাবিতে আমাদের আন্তরিক সম্মতি থাকাই উচিত। পদ-মান শিক্ষায় তাহারা হিন্দুর সমান হইয়া উঠে ইহা হিন্দুরই পক্ষে মঙ্গলকর। ···"গম্যস্থানে পৌঁছিতে তাহাদের কোনো বিলম্ব না হয় ইহাই যেন আমরা প্রসন্নমনে কামনা করি।"

কিছুকাল পূর্বে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্য অনুভূতি তীব্র ছিল না। ইহা প্রাণশক্তির অভাবজনিত অবস্থা। অতঃপর "একটা দিন আসিল যখন হিন্দু আপন হিন্দুত্ব লইয়া গৌরব করিতে উদ্যত হইল।···ঠিক "সেই কারণেই মুসলমানের মুসলমানি মাথা তুলিয়া উঠিল। এখন সে মুসলমানরূপেই প্রবল হইতে চায়, হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়া প্রবল হইতে চায় না। এখন জগৎ জুড়িয়া সমস্যা এ নহে যে, কী করিয়া ভেদ ঘুচাইয়া এক হইব— কিন্তু কী

১ সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ৩৯২। ২ হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়, পরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ৪৭৬।

করিয়া ভেদ রক্ষা করিয়াই মিলন হইবে।...

"আজ আমাদের দেশে মুসলমান স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিতেছে।" তাহা হিন্দুদের পক্ষে যতই অপ্রিয় হউক,..."একদিন পরস্পরের যথার্থ মিলনসাধনের ইহাই প্রকৃত উপায়।... আধুনিক কালের শিক্ষার প্রতি সময় থাকিতে মনোযোগ না করায় ভারতবর্ষের মুসলমান হিন্দুর চেয়ে অনেক বিষয়ে পিছাইয়া পড়িয়াছে।" "নিদ্রিত মানুষের মধ্যে প্রভেদ থাকে না— জাগিয়া উঠিলেই প্রত্যেকের ভিন্নতা নানা প্রকারে আপনাকে ঘোষণা করে। বিকাশের অর্থই ঐক্যের মধ্যে পার্থক্যের বিকাশ।" এই "স্বাতন্ত্র্যের গৌরববোধ জন্মিলেই মানুষ দুঃখ স্বীকার করিয়াও আপনাকে বড়ো করিয়া তুলিতে চাহিবে। বড়ো হইয়া উঠিলে তখনি পরস্পরের মিলন সত্যকার সামগ্রী হইবে।" "হিন্দুমুসলমানের মধ্যে সকল দিক দিয়া একটি সত্যকার ঐক্য জন্মে নাই বলিয়াই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে এক করিয়া তুলিবার চেষ্টায় সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সূত্রপাত হইল। এ সন্দেহকে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিল চলিবে না।" আমরা রাজনৈতিক অভিপ্রায়ে তাহাকে আহ্বান করিয়াছিলাম, "তাহাকে যথার্থ আমাদের সঙ্গী বলিয়া অনুভব করি নাই, আনুষঙ্গিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছি।"

অসামঞ্জস্যের মধ্যে শরিকীয়ানার বন্ধন বেশিদিন থাকে না। কবি বলিলেন, "আজকালকার দিনে পৃথিবী জুড়িয়া আনাগোনা মেলামেশা চলিতেছে। মানুষের নানা জাতি নানা উপলক্ষ্যে পরস্পরের পরিচয় লাভ করিতেছে" অথচ "স্বাতন্ত্র্যবোধ যেন" দিন দিন আরও প্রবল হইয়া উঠিতেছে। "এক সময় মনে হইত মিলিবার উপায় ছিল না বলিয়াই মানুষেরা পৃথক হইয়া আছে কিন্তু এখন মিলিবার বাধা-সকল যথাসম্ভব দূর হইয়াও দেখা যাইতেছে পার্থক্য দূর হইতেছে না।... আসল কথা, পার্থক্য যেখানে সত্য, সেখানে সুবিধার খাতিরে, বড়ো দল বাঁধিবার প্রলোভনে তাহাকে চোখ বুজিয়া লোপ করিবার চেষ্টা করিলে সত্য তাহাকে সম্মতি দিতে চায় না। চাপা-দেওয়া পার্থক্য ভয়ানক একটা উৎপাতক পদার্থ, তাহা কোনো-না-কোনো সময়ে ধাক্কা পাইলে হঠাৎ ফাটিয়া এবং ফাটাইয়া একটা বিপ্লব বাধাইয়া তোলে। যাহারা বস্তুতই পৃথক, তাহাদের পার্থক্যকে সম্মান করাই মিলন রক্ষার সদুপায়।"

'সঞ্চয়ে'র ও 'পরিচয়ে'র পূর্ব-আলোচিত নয়টি প্রবন্ধের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ ধর্ম দর্শন ও ভারতীয় সমাজের সমস্যা বিষয়ে যে আলোচনা করিলেন তাহাতে ধর্মের নৈর্ব্যক্তিক, অসাম্প্রদায়িক তত্ত্বটি প্রধানত ব্যক্ত হইয়াছে। বিজ্ঞান বলিতে যেমন ইংরেজের বিজ্ঞান, ভারতীয়ের বিজ্ঞান বলিয়া পৃথক বস্তু থাকিতে পারে না, বিজ্ঞান সর্বত্রই বিজ্ঞান— তেমনি ধর্ম বলিতে মানুষের ধর্মই বুঝায়, কোনো বিশেষ religion[১] বুঝায় না। বিশেষ ধর্ম যদি মানবধর্মকে আঘাত করে তবে বুঝিতে হইবে অসত্য গোপনে কাজ করিতেছে তাহাই শয়তান, তাহাই মার। নবযুগের ধর্ম হইতেছে মানবের ধর্ম। ধর্মের নবযুগে ধর্মশিক্ষার আদর্শ বদলাইয়া গিয়াছে, ধর্মের অধিকার আজ বিশ্বব্যাপী মানবের জন্মাধিকার। তৎসত্ত্বেও যেসব পুরাতন বিশ্বজনীন ধর্ম আছে, তাহাদিগকেও নূতন আলোকে নূতন যুগের সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

ধর্মের সংকীর্ণতা ও সমাজের গণ্ডিবদ্ধতা হইতে কবি আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য যতই প্রয়াস করুন-না কেন— এ কথা অবশ্যস্বীকার্য যে রবীন্দ্রনাথের ধর্মের বুনিয়াদ ব্রাহ্মধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং তাঁহার সমাজচেতনা ব্রাহ্মসমাজের আদর্শআশ্রিত। কিন্তু ব্রহ্মোপসনাকে লইয়া যখন লোকে সম্প্রদায় গড়িয়া বিরোধ সৃষ্টি করে, যখন ব্রহ্মসাধনা হইতে

১ "Philosophy fails of its purpose and is unfaithful to its ideal if it *assumes* that particular religious beliefs should be accepted."—Radhakrishnan, Cont. Phil p 7.

সমাজবিজ্ঞান মানুষের মনকে জুড়িয়া বসে— তখন কবির পক্ষে কোনো সাম্প্রদায়িকতার সমর্থন সম্ভব হয় না। সেইরূপ ঘটনা ঘটে ১৯১১ সালে— আদমসুমারীর ব্যাপার লইয়া। একদল ব্রাহ্মের মত যে ব্রাহ্মধর্ম বিশ্বজনীন ধর্ম, পৃথক ধর্ম— এখানে হিন্দু ছাড়া, মুসলমান খ্রীষ্টানও আশ্রয় পায় ; এই ধর্ম বিশেষ কোনো ধর্মগ্রন্থ, বিশেষ কোনো মহাপুরুষের বাণী কেন্দ্র করিয়া আবির্ভূত হয় নাই : ব্রাহ্মধর্ম মননের ধর্ম, ধ্যানের ধর্ম, মুক্তির ধর্ম, ভক্তির ধর্ম, সকলের জন্য যখন ইহা উন্মুখ, তখন ইহাকে হিন্দুধর্মের সম্প্রদায় বা ব্রাহ্মদিগেকে 'হিন্দু' আখ্যা দেওয়া যায় না— ব্রাহ্ম ব্রাহ্মই।

রবীন্দ্রনাথ ১৮৯১ সালে আদমসুমার গ্রহণের সময়ে এই হিন্দুব্রাহ্ম প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন ; এবারও তিনি বলিলেন, "আমি হিন্দসমাজে জন্মিযাছি এবং ব্রাহ্মসম্প্রদায়কে গ্রহণ করিয়াছি।...আমরা যে-ধর্মকে গ্রহণ করিয়াছি তাহা বিশ্বজনীন তথাপি তাহা হিন্দুরই ধর্ম। এই বিশ্বধর্মকে আমরা হিন্দুর চিত্ত দিয়াই চিন্তা করিয়াছি, হিন্দুর চিত্ত দিয়াই গ্রহণ করিয়াছি।"

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ছাত্রসমাজের আহ্বানে 'আত্মপরিচয়'[১] নামে যে ভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে কবি স্পষ্ট করিয়া বলেন যে ব্রাহ্মধর্ম তাহার আধ্যাত্মিক প্রেরণা পাইয়াছে হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থ হইতে ; হিন্দুসংস্কৃতির উপর ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা। ঐতিহাসিক দিক হইতে ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা কোথায় তাহাও তিনি এই প্রবন্ধে অতি প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেন।

এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্বকৌমুদী'তে কবির মতামতের সমালোচনা হয়। [আদিসমাজ ও উন্নতিশীল ব্রাহ্মসমাজ, ১ বৈশাখ ১৩১৯] কবিও 'তত্ত্ববোধিনী'তে 'হিন্দু ব্রাহ্ম' নামে এক প্রবন্ধে তত্ত্বকৌমুদীর তীব্র প্রতিবাদ করেন ; তিনি বলেন, ব্রাহ্মসমাজ আকস্মিক অদ্ভুত একটা খাপছাড়া কাণ্ড নহে। ইহা স্বতন্ত্র সমাজ নহে, উহা সম্প্রদায় মাত্র।' এই রচনার মধ্যে কবির যথেষ্ট উষ্মা ও ব্যঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছে।

জন্মোৎসব

'ডাকঘর' রচনার অব্যবহিত কালের মধ্যে কবি কলিকাতার ভক্তশ্রোতাদের নিকট নাটকখানি শুনাইবার জন্য চলিয়া যান। তার পর পৌস-উৎসবের জন্য শান্তিনিকেতনে আসিলেন না। কলিকাতায় নানা কাজ, বিচিত্র উত্তেজনা ; অল্পদিন পরে মাঘোৎসব, তাহার তিন দিন পরেই তাঁহার পঞ্চাশৎ জন্মোৎসব। সুতরাং কলিকাতায় থাকিয়া গেলেন।

কলিকাতায় মাঘোৎসবের দিন ১১ মাঘ ১৩১৮ কবি যথারীতি উপাসনা করিলেন— প্রাতে 'পিতার বোধ'[২] ও সন্ধ্যায় 'ধর্মের নবযুগ' শীর্ষক ভাষণ দান করেন। এই উৎসবে কবির নূতন গান 'জনগণমনঅধিনায়ক জয় হে, ভারতভাগ্যবিধাতা' গানটি ব্রহ্মসংগীত[৩] রূপে সর্বপ্রথম গীত হয়। এই গানটি এখন 'জাতীয় সংগীত' রূপে গৃহীত বহুকাল পরে একদল লোক রাষ্ট্র করেন যে এই গানটি সম্রাট পঞ্চম জর্জের দিল্লিদরবার উপলক্ষ্যে (১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর) রচিত, শিমলার কোনো উচ্চ রাজকর্মচারীর অনুরোধে নাকি উহা লেখা হয়। এই অনুযোগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একখানি পত্রে শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে লিখিয়াছিলেন যে রাজপুরুষের অনুরোধ "শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম, এই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায়

১ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৩১৯। পরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ৪৫২-৪৭৪।

২ শান্তিনিকেতন ১৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬, পৃ ৪২১-৪৩২।

৩ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৩১৮ মাঘ সংখ্যায় উহা ব্রহ্মসংগীত রূপে উক্ত হইয়াছে। জানা গিয়াছে ইহার পূর্বে ১৯১১ সালের কলিকাতা কন্‌গ্রেসে এই গানটি গীত হইয়াছিল। আলোচনা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

আমি 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানে সেই ভারতভাগ্যবিধাতার জয়ঘোষণা করেছি, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় যুগযুগধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথি, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথপরিচায়ক, সেই যুগযুগান্তরের মানব-ভাগ্যরথচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বা কোনো জর্জই কোনোক্রমেই হতে পারেন না সেকথা রাজভক্ত বন্ধুও অনুভব করেছিলেন। কেননা তাঁর ভক্তি যতই প্রবল থাক্, বুদ্ধির অভাব ছিল না। এ গান বিশেষভাবে কন্‌গ্রেসের জন্য লিখিত হয় নি।"[১] রচনার প্রেরণা যাহাই হউক, সৃষ্টির সময়ে কবি যাহা রচেন— তাহা সাময়িকতার তুচ্ছতাকে অতিক্রম করিয়া অপরূপ হইয়া উঠে। এইখানে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সাময়িকতাকে ছাড়াইয়া যায়, তাঁহার চিত্ত বিরাটের মধ্যে বিস্ময়কে দেখে। 'জনগণ' সেইরূপ একটি মহান সৃষ্টি।

মাঘোৎসবের তিন দিন পরেই (১৪ মাঘ ১৩১৮) কলিকাতা টাউন-হলে কবির পঞ্চাশৎ জন্মোৎসব হইল। পাঠকের স্মরণ আছে, গত এক বৎসর হইতে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবের বিপুল আয়োজন চলিতেছে। অধ্যাপক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ[২] বাংলার মনীষীদের একটি সমিতি গঠিত হয়। দেশের মধ্যে এক আবেদন প্রচার করিয়া তাঁহারা কবির জন্মোৎসব সম্বন্ধে দেশবাসীর সহায়তা প্রার্থনা করেন। আবেদনের একস্থানে লেখা ছিল, "ইতিপূর্বে আমরা দেশের সাহিত্যিকগণকে যথোচিত সম্মান দেখাই নাই; তাহাতে আমাদের জাতীয় ত্রুটি হইয়াছে। রবীন্দ্রবাবুর আগামী জন্মতিথি উপলক্ষে যেন আমরা ঐ ত্রুটির সংশোধন আরম্ভ করিতে পারি। রবীন্দ্রবাবুর প্রতি সম্মানদান যাহাতে দেশব্যাপী হয়, তজ্জন্য সমিতি দেশের প্রতিভূস্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌কে এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিবেন। এবং পরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া উৎসবের দিন ও প্রণালী ধার্য করিবেন।"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি তখন শ্রীসারদাচরণ মিত্র, সম্পাদক শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। সাহিত্য-পরিষদই জন্মোৎসবের ব্যবস্থাভার গ্রহণ করিলেন। ১৪ই মাঘ ১৩১৮ [২৮ জানুয়ারি, ১৯১২] কলিকাতা টাউন-হলে সম্বর্ধনা-সভা আহূত হইল। পরিষদের সভাপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভার কার্য আরম্ভ করিয়া বলিলেন, 'কবিকে সম্মান করিয়া আমরা আপনাদিগকে সম্মান করিতেছি।' অধ্যাপক পণ্ডিত ঠাকুরপ্রসাদ আচার্য উপনিষদ হইতে মন্ত্রাদি পাঠ করিলেন। সংগীতাচার্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী রচিত সময়োপযোগী গান গীত হইল। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনারায়ণ রায় একটি সুলিখিত ভাষণ পাঠ করিয়া কবিকে রৌপ্যাধারে অর্ঘ্য দান করিলেন। অতঃপর সভাপতি কবিকে মাল্যচন্দন দিয়া একটি স্বর্ণকমল উপহার দিলেন। সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভায় বলেন যে, ত্রিশ বৎসর পূর্বে তরুণ রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকিপ্রতিভা গীতনাট্যের অভিনয় দেখিয়া তখন তাঁহার যে ভাবোদয় হইয়াছিল, তাহা তিনি সেই সময়েই একটি কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; এই সভায় তিনি সেই কবিতাটি পাঠ করিয়া তাঁহার ভবিষ্যদ্‌বাণী কিভাবে সফল হইয়াছে তাহা দেখিয়া আজ অহংকৃত হইতেছেন।[৩]

অতঃপর সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক, রিপন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় পরিষদের তরফ হইতে অভিনন্দন পাঠ করিলেন।[৪] টাউন-হলের সভা সম্বন্ধে সমসাময়িক 'প্রবাসী' (১৩১৮ ফাল্গুন পৃ ৫১১) বলিয়াছিলেন, "টাউন-হলে এই উপলক্ষে এরূপ জনতা হইয়াছিল যে যাঁহারা অল্পমাত্র বিলম্বে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের

১ পত্র ২০ নভেম্বর '৯৩৭। বিচিত্রা, ১৩৪৪ পৌষ, পৃ ৭০৯। দ্র. ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত, প্রবোধচন্দ্র সেন।

২ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী. শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীআশুতোষ চৌধুরী, শ্রীসারদাচরণ মিত্র, শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু।

৩ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড, ৩য় সং।

৪ রবীন্দ্রজীবনী ১ম সং। দ্র পরিশিষ্ট।

মধ্যে কেহ কেহ প্রবেশ করিতে না পারিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, কিম্বা ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। সভাস্থলে আবালবৃদ্ধ-বনিতা সর্বশ্রেণীর লোক উপস্থিত ছিলেন।

টাউন-হলে সভা ভিন্ন আরও একদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছাত্রসভ্যগণ এবং একদিন সম্বর্ধনাসমিতির সভ্যগণ সান্ধ্যসম্মিলনে কবিকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন (২০ মাঘ ১৩১৮)। সাহিত্য-পরিষদের আনন্দমিলনে কবি যে অভিভাষণ দান করেন, তাহার একস্থানে বলেন, "কেবল একটি কথা আজ আমি নিজের পক্ষ হইতে বলিব, সেটি এই যে, সাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত আমি যাহা দিবার যোগ্য মনে করিয়াছি তাহাই দিয়াছি, লোকে যাহা দাবি করিয়াছে তাহাই জোগাইতে চেষ্টা করি নাই। আমি আমার রচনা পাঠকদের মনের মতো করিয়া তুলিবার দিকে চোখ না রাখিয়া আমার মনের মতো করিয়াই সভায় উপস্থিত করিয়াছি। সভার প্রতি ইহাই যথার্থ সম্মান।[১]

জন্মোৎসবের কয়েকদিনের মধ্যে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন বটে; কিন্তু দীর্ঘকাল সেখানে থাকেন নাই। ৩রা ফাল্গুন (১৩১৮) অজিতকুমার-লাবণ্যলেখার প্রথমা কন্যা অমিতার নামকরণ উপলক্ষ্যে উপাসনা[২] করিবার পরদিন পুনরায় কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

এই সময়ে আশ্রমের উপর দিয়া খুব বড় একটা অশান্তির ঝড় বহিয়া যাইতেছিল। পূর্ববঙ্গ-আসামের গবর্মেণ্ট এক গোপন ইস্তাহার প্রচার করিয়া সরকারী কর্মচারীদের জানাইয়া দেন যে, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় তাহাদের সন্তানদের শিক্ষার সম্পূর্ণ অনুপযোগী (altogether unsuitable for the education of the sons of Government servants)।

পূর্ববঙ্গ-আসাম গবর্মেণ্ট তাঁহাদের শেষ দংশন সর্বত্র দিতেছেন; কারণ ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর দিল্লিদরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে বঙ্গচ্ছেদ রদ হইবে; সুতরাং ১৯১২ সালের এপ্রিল মাস হইতে পৃথক বঙ্গের আর অস্তিত্ব থাকিবে না। তাই বোধ হয় পূর্ববঙ্গের কর্মচারী হিতচিকীর্ষু ইংরেজ রাজপুরুষেরা এই গোপন সার্কুলারটি দেন। ছোট ছোট ছেলেরা যখন চোখের জল ফেলিয়া, দলে দলে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিল তাহার আঘাত কবিকে খুবই লাগে। কিন্তু তিনি নিরুপায়; শিক্ষক হীরালাল সেনকে আশ্রমে রাখিবার জন্য কবি অনেকদিনই হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু সরকারপক্ষ হইতে চাপ এতই আসিতে লাগিল যে, অগত্যা তাঁহাকে বিদায় দিতে হইল (১৩১৮ চৈত্র)।

ম্যারিয়ন ফেল্‌প্‌স নামে নিউইয়র্কের জনৈক আইনজীবী এই সময়ে ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন; আশ্রম হইতে ছাত্ররা যখন চলিয়া যাইতেছে তখন তিনি সে-দৃশ্য দেখেন। তিনি আশ্রমের একটি বর্ণনা সামসাময়িক বিলাতী কাগজে প্রকাশ করেন; তাহাতে তিনি বলেন যে ছাত্রদিগের বিদ্যালয়কে এমন আপন করিয়া দেখিবার দৃষ্টান্ত তিনি কখনো কোথায়ও দেখেন নাই। রবীন্দ্রনাথকে ও তাঁহার বিদ্যালয়কে বঙ্গীয় সরকার কী চক্ষে দেখিতেন এই ঘটনাটি তাহারই পরিচায়ক। অথচ এখন কবি রাজনীতি হইতে বহু দূরে সরিয়া আসিয়াছেন; এবং রাজনীতিও কয়েক বৎসরের মধ্যে রাজপথ ছাড়িয়া সুড়ঙ্গপথে চলিয়াছে।

কবি সপরিবারে বিলাত যাইবেন; তাহার সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ; জাহাজ ছাড়িবার দুই দিন পূর্বে কলিকাতার ওভার্টুন হলে তিনি 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' (৩ চৈত্র ১৩১৮) শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। কবির বিলাতযাত্রা এবারও পণ্ড হইল। কলিকাতা বন্দর হইতে স্টীমারযোগে যাইবার কথা; এই স্টীমারে কবির সহযাত্রী ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র লিখিতেছেন:

১ ভারতী ১৩১৮ ফাল্গুন, পৃ ১১১২। আত্মপরিচয়, পৃ ৩৬।

২ নামকরণ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৩১৮ চৈত্র, পৃ ২৮৫-৮৮।

"১৯শে মার্চ [১৯১২ । ৬ চৈত্র ১৩১৮] ভোরে কল্‌কেতা থেকে জাহাজ ছাড়বে। আমি জাহাজে উঠ্‌লাম ; কবির বাক্স-পেট্‌রাও কিছু কিছু আমাদের ক্যাবিনে উঠ্‌ল ; সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়! কিন্তু কবি কই? বহুলোক তাঁকে বিদায়ের নমস্কার জানাতে ফুল ও মালা নিয়ে উপস্থিত ; তাঁদের মুখ বিষণ্ণ হ'ল। খবর এলো যে, কবি অসুস্থ ; আস্‌তে পারবেন না। ঐ [চৈত্রমাসের] গরমে উপর্যুপরি নিমন্ত্রণ-অভ্যর্থনাদির আদর-অত্যাচারে রওনা হবার দিন ভোরে প্রস্তুত হ'তে গিয়ে, মাথা ঘুরে তিনি প্রায় পড়ে যান। ডাক্তাররা বল্লেন, তাঁর এ-যাত্রা কোনোমতেই সমীচীন হ'তে পারে না। রইলেন তিনি, আর গোটা ক্যাবিনে একা রাজত্ব ক'রে, তাঁর বাক্স-পেট্‌রা নিয়ে চল্লুম আমি একলা।"[১]

কবির মনে য়ুরোপ-যাত্রা স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল ; যাত্রার পূর্বে যে পুলকচাঞ্চল্য বহুদিন হইতে অনুভব করিতেছিলেন তাহা হঠাৎ অন্তর্হিত হইল। শরীর সামান্য ভালো হওয়া মাত্রেই তিনি কালবিলম্ব না করিয়া পদ্মাবক্ষে আশ্রয়ের জন্য শিলাইদহ চলিয়া গেলেন। পদ্মা চিরদিনই কবিচিত্তের গুরুভারকে দূর করিয়া আসিতেছে। আজও কবি সেখানে গিয়া দেহে ও মনে শান্তি পাইলেন।

য়ুরোপ-যাত্রার কল্পনার পটভূমি হঠাৎ সরিয়া যাওয়াতে কবির মনে যে আঘাত লাগে, তাহারই বেদনায় 'গীতিমাল্যে'র গান ও কবিতার সূত্রপাত। ১৫ই চৈত্র হইতে ৩০শে চৈত্রের (১৩১৮) মধ্যে রচিত আঠারোটি গান ও কবিতা। গান ছাড়া অন্যগুলিকে লিরিক কবিতাগুচ্ছের অন্তর্গত করা হইলে, তাহাদের প্রতি সুবিচার করা হইত। যাঁহারা গান করেন তাঁহারা এগুলিকে বাদ দেন গান নয় বলিয়া, আর যাঁহারা কেবল কবিতার মধ্যে লিরিক-সৌন্দর্য খোঁজেন তাঁহারা গীতাঞ্জলি প্রভৃতি গ্রন্থ আধ্যাত্মিক গানের সংগ্রহ মনে করিয়া এগুলির প্রতি কম দৃষ্টি দেন ; অথচ লিরিকসৌন্দর্যে ইহার মধ্যে কয়েকটিকে 'খেয়া'র কবিতার সঙ্গে তুলনা করা যায়। 'ভাগ্যে আমি পথ হারালেম কাজের পথে' 'নাম হারা এই নদীর ধারে' 'কে গো তুমি বিদেশী' 'ওগো পথিক দিনের শেষে' 'এই দুয়ারটি খোলা' 'এই যে এরা আঙিনাতে এসেছে জুটি' প্রভৃতি কবিতাকয়টির কথাই আমরা বিশেষভাবে বলিতেছি। গভীর আধ্যাত্মিক মিস্টিসিজম্ লক্ষণীয় বিষয় হইলেও বিশুদ্ধ কাব্য হিসাবেও ইহারা বিচার্য। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে যে কয়টি গান লিখিয়াছেন, তাহা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সংগীতরাজির অন্যতম। 'আমি হাল ছাড়লে তবে তুমি হাল ধরবে জানি' (১৭ই চৈত্র ১৩১৮) 'আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ' (ঐ), 'কোলাহল তো বারণ হল এবার কথা কানে কানে' (১৮ই), 'এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী' (২৬শে), 'যেদিন ফুটল কমল কিছুই জানি নাই' (ঐ) 'এখনো ঘোর ভাঙে না তোর যে' (২৭শে), 'ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো' (২৮শে), 'তুমি একটু কেবল বসতে দিও কাছে' (২৯শে), 'এবার তোরা যাবার বেলাতে সবাই জয়ধ্বনি কর্' (৩০শে চৈত্র ১৩১৮)।

গান ও কবিতা লেখা ছাড়া কবি প্রায় সারাদিন বসিয়া ইংরেজিতে নিজের গানের ও কবিতার তর্জমা[২] করিতেছেন। বিলাতে যদি যাওয়াই হয়, তাহা হইলে তথাকার নূতন পরিচিতদের কাছে হয়তো তাঁহাকে কিছু পড়িয়া শুনাইতে হইবে। অজিতকুমার দুই বৎসর পূর্বে বিলাতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি সেখানে বন্ধুমহলে প্রায়ই কবির রচনা অনুবাদ করিয়া শোনাইতেন। অজিতকুমার কবিকে বলেন যে, সে-সব ইংরেজ বন্ধুদের খুবই ভালো লাগিত। তাই খানিকটা নিজ চিত্তবিনোদনের জন্য, খানিকটা অভাবিতের আশায় কবি তর্জমা করিতে লাগিলেন। কে জানিত কবির এই অবসর মুহূর্তের খামখেয়ালী তাঁহাকে জগতে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সহিত একাসনে বসিবার গৌরব

১ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, রবীন্দ্র-সংস্পর্শে। জয়ন্তী-উৎসর্গ, পৃ ১৯৩।

২ দ্র চিঠিপত্র ৫, পৃ ২০-২১। ইন্দিরাদেবীকে লিখিত, লণ্ডন ৬ মে ১৯১৩।

দান করিবে। ১৯০১ সালে জগদীশচন্দ্র বসু যখন বিলাতে তখন তিনি রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি গল্পের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া বারে বারে পত্র দেন। লোকেন পালিতকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা তর্জমা করিবার অনুরোধ জগদীশচন্দ্র করেন। কোনোটিই শেষ পর্যন্ত হয় নাই। কবি লিখিয়াছিলেন, "আমার গল্পের অনুবাদ ছাপাইয়া কিছু যে লাভ হইবে, ইহা আমি আশা করি না—যদি লাভ হয় আমি তাহাতে কোন দাবী রাখিতে চাহি না —তুমি যাহাকে খুসি দিয়ো।"[১] ১৯০১ সালে হিন্দি 'সরস্বতী' পত্রিকায় 'মুক্তির উপায়' গল্পের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ইহাই ভাষান্তরিত হইবার বোধহয় সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত।[২]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবি হইলেও দরদী জমিদার; সুতরাং প্রজাদের মঙ্গল-অমঙ্গলের চিন্তা তাঁহাকে করিতে হয়। কলিকাতায় রথীন্দ্রনাথকে যে পত্রখানি লিখিতেছিলেন, তাহাতে কবির মনের আর-একটি সম্পূর্ণ নূতন দিকের ছবি ফুটিয়াছে। তিনি লিখিতেছেন[৩]—

"বোলপুরে একটা ধানভানা কল চলচে— সেইরকম একটা কল এখানে আনতে পারলে বিশেষ কাজে লাগবে। এ দেশ ধানেরই দেশ— বোলপুরের চেয়ে অনেক বেশি ধান এখানে জন্মায়। আমার ইচ্ছা ৫।১০ টাকা শেয়ার করে এখানকার অনেক চাষায় মিলে এই কলটা যদি চালায় তা হলেই ওদের মধ্যে মিলে কাজ করবার যথার্থ সূত্রপাত হতে পারবে। আমাদের ব্যাঙ্ক [পতিসর কৃষিব্যাঙ্ক] থেকে ধার দিয়ে এই ধানভানার ব্যবসাটা এখানে সহজেই চালানো যেতে পারে— নগেন্দ্র এবং জানকী দুজনেরই বিশ্বাস এই কাজটা এখানকার যোগ্য এবং এতে প্রজাদের উপকার হবে। এই কলের সন্ধান দেখিস্।

"তার পরে এখানে চাষাদের কোন Industry শেখানো যেতে পারে সেই কথা ভাবছিলুম। এখানে ধান ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না— এদের থাকবার মধ্যে কেবল শক্ত এঁটেল মাটি আছে। আমি জানতে চাই Pottery জিনিসটাকে Cottage industry রূপে গণ্য করা চলে কি না। একবার খবর নিয়ে দেখিস— অর্থাৎ ছোটোখাটো furnace আনিয়ে এক গ্রামের লোক মিলে একাজ সম্ভবপর কি না। মুসলমানরা যে রকম সান্‌কির জিনিস ব্যবহার করে এরা যদি সেইরকম মোটা গাছের প্লেট বাটি প্রভৃতি তৈরি করতে পারে তা হলে উপকার হয়।

"আরেকটা জিনিস আছে ছাতা তৈরি করতে শেখানো। সে রকম শেখাবার লোক যদি পাওয়া যায় তা হলে শিলাইদহ অঞ্চলে এই কাজটা চালানো যেতে পারে। নগেন্দ্র বলছিল খোলা তৈরি করতে পারে এমন কুমোর এখানে আনতে পারলে বিস্তর উপকার হয়। লোকে টিনের ছাদ দিতে চায় পেরে উঠে না— খোলা পেলে সুবিধা হয়। যাই হোক্ ধানভানা কল, Potteryর চাক ও ছাতা তৈরির শিক্ষকের খবর নিস্— ভুলিস্‌নে।"

প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে কবি গ্রাম সম্বন্ধে যেসব কথা ভাবিয়াছিলেন, তাহার মীমাংসা ও সমবায় মারফতে সেইগুলি পরিচালনা ও ব্যাঙ্ক মারফত টাকার সুব্যবস্থার কথা যেভাবে ভাবিয়াছিলেন, তাহাই যে গ্রামোন্নতির শ্রেষ্ঠ পন্থা তাহা রাজনীতিক ও অর্থনীতিকগণ আজ স্বীকার করিতেছেন।

শোনা গিয়াছিল কবি গ্রীষ্মকালটা শিলাইদহে কাটাইবেন; কিন্তু হঠাৎ বর্ষশেষের দিন শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন (৩১শে চৈত্র ১৩১৮)। অকস্মাৎ তাঁহাকে পদব্রজে স্টেশন হইতে একলা আসিতে দেখিয়া আমাদের যে কী বিস্ময় ও আনন্দ হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি এখনো অস্পষ্ট হয় নাই। পরদিন প্রাতে নববর্ষের মন্দিরে যে উপদেশ প্রদান

১ প্রবাসী ১৩৩৩ ফাল্গুন, পৃ ৬৩৫। দ্র চিঠিপত্র ৬, পৃ ১৯ ও পৃ ১৭৫-৭৭।

২ প্রবাসী ১৩৩৩ চৈত্র, পৃ ৭৬৬। চিঠিপত্র ৬, পৃ ৩৬-৩৭।

৩ চিঠিপত্র ২, পৃ ১৯-২০।

করেন, তাহা 'রোগীর নববর্ষ'[১] নামে প্রকাশিত হয়।

বিলাত যাত্রা করিবার মুহূর্তে তিনি যে অসুস্থ হইয়া পড়েন তাহারই কথা স্মরণ করিয়া বলিলেন, "আমার রোগ-শয্যার উপর নববর্ষ আসিল। নববৎসরের এমন নবীন মূর্তি অনেক দিন দেখি নাই।" গীতিমাল্যের কবিতা ও গানের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক আকূতি প্রকাশ পাইয়াছিল তাহারই রেশ এই ভাষণে রূপ লইয়াছে। যখন শরীর সবল থাকে তখন অবকাশটাকে একেবারে নিঃশেষে বাদ দিবার আয়োজন চলে, "কেবল কাজ এবং কাজের চিন্তা; কেবল অন্তবিহীন দায়িত্বের নিবিড় ঠেসাঠেসির মাঝখানে চাপা পড়িয়া নিজেকে এবং জগৎকে স্পষ্ট করিয়া ও সত্য করিয়া দেখিবার সুযোগ" মানুষ হারায়। শরীর অসুস্থ হওয়াতে 'দায়িত্বের বাঁধন' কাটিয়া যায়, 'কাজের নিবিডতা আলগা' হইয়া যায়, "মনের চারিদিকের আকাশে আলো এবং হাওয়া" বহে। "তখন দেখা গেল আমি কাজের মানুষ একথাটা যত সত্য তাহার চেয়ে ঢের বড়ো সত্য আমি মানুষ। আমার রোগশয্যা আজ দিগন্তপ্রসারিত আকাশের নীলিমাকে অধিকার করিয়া বিস্তীর্ণ হইযাছে।...আমি বিরাটের ক্রোড়ে শয়ান।...মৃত্যুর পরিপূর্ণতা যে কী সুগভীর আমি যেন আজ তাহার আস্বাদন পাইলাম।...ইহাই আশ্চর্য যে এমন অভেদ্য রহস্যময় জ্যোতির্ময় লোকলোকান্তরের মাঝখানে এই অতি ক্ষুদ্র মানুষের জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ খেলাধুলা কিছুমাত্র ছোটো নয়, সামান্য নয়, অসংগত নয়।...কিন্তু ইহাও বাহিরে। আরও ভিতরে যাও— সেখানেই সকলের চেয়ে আশ্চর্য।" সেই আশ্চর্য হইতেছে প্রেম। "ওই প্রেমের মূল্যে ছোটোও যে সে বড়ো, ওই প্রেমের টানে বড়োও যে সে ছোটো।...ওই প্রেমই তো ছোটোর সমস্ত লজ্জাকে আপনার মধ্যে টানিয়া লইযাছে, বড়োর সমস্ত প্রতাপকে আপনার মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়াছে, ওই প্রেমের নিকেতনের মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাই বিশ্বজগতের সমস্ত সুর আমারি ভাষাতে গান করিতেছে...।...জগতের গভীর মাঝখানটিতে এই যেখানে সমস্ত একেবারেই সহজ, যেখানে বিশ্বের বিপুল বোঝা আপনার সমস্ত ভার নামাইয়া দিয়াছে, সত্য যেখানে সুন্দর, শক্তি যেখানে প্রেম, সেইখানে একেবারে সহজ হইয়া বসিবার জন্য আজ নববর্ষের দিনে ডাক আসিল।" রবীন্দ্রনাথের এই অনুভূতি 'গীতিমাল্যে'র গানের ধারা বহিয়া চলিল। শান্তিনিকেতনে যে-কয়দিন ছিলেন মন পদ্মাতীরে আহরিত গীতিসুধায় পরিপূর্ণ ছিল। এই কয়টি দিনে লিখিলেন,[২] 'কে গো অন্তরতর সে' (৬ই বৈশাখ ১৩১৯), 'আমারে তুমি অশেষ করেছ' (৭ই), 'হার-মানা হার পরাব তোমার গলে' (৭ই), 'এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে' (৯ই) 'পেযেছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই' (৯ই), 'আজিকে এই সকালবেলাতে' (১৩ই)।

ইহার পর গীত-উৎস বন্ধ। একবারে বিলাত যাইবার পথে জাহাজে তাঁহাকে পুনরায় গান রচনায় প্রবৃত্ত দেখি। গ্রীষ্মাবকাশের (১৩ বৈশাখ - ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯) জন্য বিদ্যালয় বন্ধ হইবার পূর্বে প্রতি বৎসর একটা-না-একটা নাটক অভিনীত হইত; এবার 'রাজা ও রানী' অভিনীত হইল[৩] (১০ই বৈশাখ ১৩১৯)। তৎপর দিন বুধবারের মন্দিরে উপাসনাকালে কবি আশ্রমের কাছ হইতে ছুটি লইতেছেন কেন, তাহারই একটা ব্যাখ্যা দান করেন। "বিশ্বপ্রকৃতিতে কাজের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রাম একেবারে গাঁথা হইয়া আছে— কিন্তু কাজের মধ্যে কোথাও সেই পরিপূর্ণ অবকাশটিকে দেখিতে পাওয়া যায় না— কিন্তু মানুষের জীবনে ক্লান্তি আসে, তাই তাহাকে মধ্যে মধ্যে ছুটি

১ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ। দ্র সঞ্চয় ১৩২৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ৩৩১-৩৩৫।

২ গীতিমাল্য ২২-২৭ সংখ্যক।

৩ রবীন্দ্রনাথ এই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন নাই। অভিনেতাদের নাম; বিক্রমদেব—অজিতকুমার। কুমারসেন—সন্তোষচন্দ্র। দেবদত্ত—ক্ষিতিমোহন। শঙ্কর—নেপালচন্দ্র রায়। রানী সুমিত্রা—শ্রীসুধীরঞ্জন দাস। ইলা—শ্রীসুশীল চক্রবর্তী। দ্র. সীতা দেবী, পুণ্যস্মৃতি পৃ ১০৪। প্রবাসী ১৩৪৮ ফাল্গুন, পৃ ৫০৪।

লইতে হয়। ইহাতে মানুষের গৌরব নাই— বরং এই প্রমাণ হয় যে মানুষ আপনার কাজের মধ্যে বড়ো একটা আনন্দের সঞ্চার করিতে পারিতেছে না, যাহাতে কাজের ভিতর হইতেই সে আপনার কাজের মূল্য পায়— তাহার খাটুনি তাহাকে ছুটি দেয়। আশ্রমের কিন্তু তাহাই উদ্দেশ্য— সেইজন্য যেখানে ধর্মসাধনার স্থান, সেইখানে শিক্ষার ক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে। শিক্ষাদানে ও শিক্ষাগ্রহণে একটা আনন্দের সম্বন্ধ আছে। জীবনে সাধনা যতই বড়ো হইয়া উঠিবে ততই শিক্ষা সুন্দর ও সার্থক হইবে, তখন ছুটির প্রয়োজন হইবে না, কারণ তখন কর্মের ভিতর হইতেই কর্মের যেটি লভ্য আনন্দ তাহা প্রত্যক্ষ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।"[১]

শারীরিক দিক হইতে বিলাতযাত্রার প্রয়োজন যে ছিল সে কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি; কিন্তু আর-একটি গভীরতর প্রয়োজন তিনি অন্তরে অনুভব করিতেছিলেন। কবি প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য নানাভাবে অনুভব করিয়াছেন; কিন্তু বিপুলা ধরিত্রীর বিচিত্র মানবের বিবিধ শক্তি ও সৌন্দর্যকে নিজ অন্তর দিয়া স্পর্শ করিবার জন্য আজ তাঁহার চিত্ত পিপাসু। 'যাত্রার পূর্বপত্রে'[২] তিনি বলিলেন "মানুষের জগতের সঙ্গে আমাদের এই মাঠের বিদ্যালয়ের সম্বন্ধটিকে অবারিত করিবার জন্য পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার প্রয়োজন অনুভব করি। আমরা সেই বড়ো পৃথিবীর নিমন্ত্রণের পত্র পাইয়াছি।" তিনি এই ভ্রমণকে তীর্থভ্রমণ বলিয়াছিলেন: "য়ুরোপে গিয়া সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিব, এই শ্রদ্ধাটি লইয়া যদি আমরা সেখানে যাত্রা করি তবে ভারতবাসীর পক্ষে এমন তীর্থ পৃথিবীতে কোথায় মিলিবে?" সেদিন রবীন্দ্রনাথকে য়ুরোপের সভ্যতা ও তথাকথিত আধ্যাত্মিকতা কী মুগ্ধই করিয়াছিল? সাধারণত ভারতীয়দের ধারণা যে, য়ুরোপের সভ্যতা বস্তুপ্রাণ materialistic। তাহার মূলে কোনো আধ্যাত্মিক আদর্শবাদ নাই। রবীন্দ্রনাথ এই বুলিকে শ্রদ্ধা করেন নহে; তিনি বলিতেছেন—

"মানবসমাজে যেখানেই আমরা যে-কোনো মঙ্গল দেখি-না কেন, তাহার গোড়াতেই আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। অর্থাৎ, মানুষ কখনোই সত্যকে কল দিয়া পাইতে পারে না, তাহাকে আত্মা দিয়াই লাভ করিতে হয়। য়ুরোপে যদি আমরা মানুষের কোনো উন্নতি দেখি তবে নিশ্চয়ই জানিতে হইবে, সে উন্নতির মূলে মানুষের আত্মা আছে— কখনোই তাহা জড়ের সৃষ্টি নহে। বাহিরের বিকাশে আত্মারই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।...

"কেবল বস্তুসঞ্চয়ের উপর কোনো জাতিরই উন্নতি দাঁড়াইতে পারে না এবং কেবল বিষয়বুদ্ধির জোরে কোনো জাতিই বললাভ করে না।...আজ পৃথিবীকে য়ুরোপ শাসন করিতেছে বস্তুর জোরে, ইহা অবিশ্বাসী নাস্তিকের কথা। তাহার শাসনের মূলশক্তি নিঃসন্দেহই ধর্মের জোর।" তা ছাড়া মানুষের "ধর্মবল অত্যন্ত সচেতন। তাহা মানুষের কোনো দুঃখ কোনো অভাবকেই উদাসীনভাবে পাশে ঠেলিয়া রাখিতে পারে না।" য়ুরোপ দুঃখ দূর করিবার জন্য নিরন্তর দুঃসহ দুঃখকে বহন করিয়াছে, সে দুঃখ তাহার ধর্মে জ্ঞানে বিজ্ঞানে আবিষ্কারে প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ উপদেশের উপসংহারে বলিলেন, "ঐশ্বর্যকে অধিকার করিবার শক্তি যাহাদের আছে দারিদ্র্য তাহাদেরই ভূষণ। যে ভূষণের কোনো মূল্য নাই তাহা ভূষণই নহে। এইজন্য ত্যাগের দারিদ্র্যই ভূষণ, অভাবের দারিদ্র্য ভূষণ নহে।"

বিদ্যালয় বন্ধ হইবার পর কবি কলিকাতায় যান, বিদেশযাত্রার আয়োজন হইতেছে।

১ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৩১৯, জ্যৈষ্ঠ পৃ ৪৮।

২ যাত্রার পূর্বপত্র, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৩১৯ আষাঢ়। পথের সঞ্চয়, প্রথম প্রকাশ ১৩৪৬ ১৩৫৪ পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ ৪৫৯-৪৭৫।

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল

আমাদের আলোচ্য পর্বে রবীন্দ্রনাথকে দীর্ঘকাল নানা অজুহাতে সাহিত্যসমালোচকদের অহেতুকী নিন্দাবাদে জর্জরিত হইতে দেখি। তাঁহার ভাগ্যগুণে জীবনে প্রশংসা ও স্তুতিবাদ যেমন পাইয়াছিলেন, ভাগ্যদোষে নিন্দাবাদ এবং অখ্যাতিও কম পান নাই।

সাহিত্যের দ্বন্দ্ব চিরকালের। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কৈশোরে ও যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রনাথ বসু ও নব্যহিন্দু আন্দোলনের নেতাদের মতামত লইয়া সমালোচনা এবং কখনো কখনো তীব্র ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্লীলতা ও শালীনতার সীমানা ছাড়াইয়া লেখনীকে কলঙ্কিত করেন নাই। কোনো কোনো রচনার মধ্যে সাময়িক উষ্মা বা চপলতা যে প্রকাশ পায় নাই, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু সেসব রচনাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্থায়ী সাহিত্য-সংগ্রহ হইতে নির্মমভাবে নির্বাসিত করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উপর যেসব আক্রমণ সমালোচনার নামে সাময়িক সাহিত্যে চলিয়াছিল, তাহার পুরোভাগে ছিল কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের 'মিঠে ও কড়া'—'কড়ি ও কোমলে'র ব্যঙ্গ-অনুকৃতি। এই ধরণের অনেক রচনা বাংলা সাহিত্যে ও সাময়িক পত্রিকাদিতে একটু সন্ধান করিলেই চোখে পড়িবে।[১]

মাসিক পত্রের মধ্যে প্রধানত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' ও সাপ্তাহিকের মধ্যে 'বঙ্গবাসী' রবীন্দ্রনাথ ও বিশেষভাবে রবীন্দ্রভক্ত ও অনুকারকদের উপর বহু বৎসর ধরিয়া নানাভাবে আক্রমণ পরিচালনা করেন। রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন এইসব সমালোচনার উত্তর দেন নাই। তবে বন্ধুবান্ধবরা সমবেদনাপূর্ণ পত্র লিখিলে সুখী হইতেন এবং তাঁহারা পত্রিকাদিতে 'বন্ধুকৃত্য'[২] করিলে যে খুশি হইবেন সে ইঙ্গিত পত্রমধ্যে দিতেন।

আলোচ্যপর্বে যিনি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সমালোচনায় ও অবশেষে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তিনি হইতেছেন শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় বা ডি. এল. রায়। কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশের সাহিত্যিক মহলে পত্রিকার আপিস হইতে কলেজের হস্টেল পর্যন্ত সর্বত্র, লেখাপড়া-জানা ভদ্রসমাজ যেন দুই দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল, 'দ্বিজুরায়ের দল' ও 'রবিঠাকুরের দল'।

দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত রবীন্দ্রনাথের যে মতান্তর তাহা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাসংক্রান্ত নয়, ইহার মধ্যে বাংলা সাহিত্যের একটা বিশেষ যুগের মনোবৃত্তি ও রুচিবোধের ইতিহাস নিহিত রহিয়াছে। তাই ইহার সম্যক্ আলোচনা প্রয়োজন।

সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায়, রুচি ও নীতি, রীতি ও ভঙ্গি প্রভৃতি বিষয়ে মতভেদ বা দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যহেতু নূতন নূতন সম্প্রদায় (school) গড়িয়াছে। এই শাশ্বত কারণেই লেখকদের মতান্তর অনেক সময়ই মনান্তরে পরিণত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে জাগতিক ও অতিজাগতিক বিষয় সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গির এমনই পার্থক্য ছিল যে, উভয়ের মধ্যে মত-সামঞ্জস্য হওয়া কঠিন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অন্তর্মুখী দৃষ্টি হইতে যে-বিষয়কে উপমার উপর উপমা সংযোগে, তুলনার উপর তুলনাযোগে অতুলনীয় ভাষার ইন্দ্রজালে অনির্বচনীয় ভাবের সৃষ্টি করিতেন, তাহাকেই অত্যন্ত বাস্তবভাবে দেখিয়া, নিরলংকৃত স্পষ্টতায়, সহজ ভাষায় প্রকাশ করা ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের ধর্ম। শিক্ষাভিমানহীন সরল হৃদয়ের মধ্যে অনায়াস উদ্দীপনা সৃষ্টি করিবার অসামান্য ক্ষমতা তাঁহার ছিল। সেইজন্যই প্রাকৃত-জনের মনোহরণ করা তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহা পারেন নাই।

১ দ্র অমৃতলাল বসু প্রণীত 'বৌমা' (১৩০৩) প্রহসন। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কটাক্ষ করিয়া একটি কবিতা ও ভানুসিংহের পদাবলীর একটি গানের প্যারডি আছে।—সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড পৃ ৩৮২।

২ প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি, পৃ ২৭৫-৭৭। পত্র ৭ই আষাঢ় ১৩০৬, ১০ই আষাঢ়।

রবীন্দ্রনাথ যাহাকে আদর্শবাদের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সুন্দর করিয়া গড়িতেন, মরমিয়ার ভাষায় যাহাকে প্রাণস্পন্দিত করিতেন— তাহার উল্টা দিকের রূপটিকে বিদ্রূপিত (grotesque) করিয়া দেখাইবার অসামান্য শক্তি রাখিতেন দ্বিজেন্দ্রলাল। সুন্দরের পূজারীর পক্ষে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর সম্মানের জন্য বাহিরের প্রসাধন আবশ্যক। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সামান্য রচনাকে শুধু প্রকাশ করিয়া খুশি হইতেন না, তাহাকে সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য অসামান্য শ্রম স্বীকার করিতেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন স্পষ্টবাদী, বাস্তবপন্থী; তাই তাঁহার প্রকাশধর্মে আবেগটাই বড় হইয়া উঠিত, রীতিটা নহে। সেইজন্য তাঁহার পক্ষে ভাষা ছন্দ মিল বিষয়ে খুব বেশি হুঁশিয়ার হইয়া সাহিত্যের রাজপথে চলিবার প্রয়োজন ছিল না; সাধারণের সমক্ষে বাহির হইবার জন্য আটপহুরে সাজ পরিলেই তাঁহার চলিত। লালিত্য বা finesse তাঁহার কাম্য ছিল না— স্পষ্ট কথা মোটা করিয়া বলিলে সকলেই বুঝিতে পারে— এইখানেই ছিল তাঁহার গর্ব। বাংলা দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে এই আন্দোলনের মন্থনে উঠিল সাহিত্যে বস্তুতান্ত্রিকতার কথা: আরও কিছুকাল পরে সেইটি আসিয়া দাঁড়াইল বাস্তব সাহিত্যের সৃষ্টি-পরিকল্পনায়।

সংগীতে কবিতায় হাসির গানে নাটক-রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান বঙ্গসাহিত্যে সুনির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথ হইতে বয়সে দুই বৎসরের কনিষ্ঠ; কিন্তু সাহিত্য-দরবারে তিনি প্রবেশ করেন অনেক পরে। বাংলার সাহিত্য-সমাজে দ্বিজেন্দ্রলালকে রবীন্দ্রনাথই যে প্রথম পরিচিত করিয়া দেন, তাঁহার কাব্য ও গানকে তিনিই যে সমাদৃত করেন, সে-তথ্য দ্বিজেন্দ্র-চরিত পাঠকদের নিকট অজ্ঞাত নহে। পাঠ্যাবস্থায় তিনি 'আর্য্যগাথা'র যে প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন, সে-সম্বন্ধে আমরা কোনো আলোচনা করিব না। দ্বিজেন্দ্রলাল ১৮৮৬ সালের শেষ দিকে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন ও সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করেন। ১৮৯৪ সালে তাঁহার 'আর্য্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। সুতরাং বিলাত হইতে ফিরিবার বেশ কয়েক বৎসর গত না হইলে তিনি বাংলা সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারেন নাই। তাঁহার 'আর্য্যগাথা' দ্বিতীয় খণ্ড কবিতা ও গানের সংগ্রহ। এইসব রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব নাই এমন কথা বলা চলে না। দ্বিজেন্দ্রলাল যে রবীন্দ্র-সাহিত্য খুব ভালো করিয়া পড়িয়াছিলেন এবং উদারভাবে তাঁহার ভাব ও ভাষা নিজ রচনার মধ্যে প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিতেন সে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। 'আর্য্যগাথা'র অধিকাংশই গান, তবে কবিতাও আছে। প্রেমের কবিতা ও বৈষ্ণবভাবাপন্ন কবিতাই বেশি। এ ছাড়া 'কড়ি ও কোমলে'র মধ্যে যেমন বিদেশী কবিতাগুচ্ছের অনুবাদ আছে, দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যখণ্ডেও অনুরূপ অনুবাদ-অংশ রহিয়াছে।

'আর্য্যগাথা' প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্রনাথ এই উদীয়মান কবিকে সাহিত্য-দরবারে অভিনন্দন করিয়া লইলেন (সাধনা ১৩০১ অগ্রহায়ণ)। তখন রবীন্দ্রনাথের কবি-খ্যাতি 'সোনার তরী' পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে; 'চিত্রা'র কবিতা সাধনায় বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছে; জনসাধারণের নিকট 'রাজা ও রানী' নাটকের রচয়িতা বলিয়া কবি সুপরিচিত। 'আর্য্যগাথা'র সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ সংগীত সম্বন্ধে দীর্ঘ মন্তব্য করিয়াছিলেন, কারণ দ্বিজেন্দ্রলালের অনেকগুলি গান ঐ কাব্যখণ্ডের অন্তর্গত। রবীন্দ্রনাথ এই আলোচনায় হিন্দুস্থানী সংগীতের সহিত বাংলা গানের পার্থক্য কোথায়, তাহা বিস্তৃতভাবে দেখাইয়াছিলেন। বাংলা গান যে কেন হিন্দী গানের মত হইতে পারে না, তাহারই আলোচনা এই প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য।

যে মাসে 'সাধনা'য় আর্য্যগাথার সমালোচনা প্রকাশিত হইল, সেই সংখ্যাতেই দ্বিজেন্দ্রলালের 'কেরাণী' কবিতা (১৩০১ অগ্রহায়ণ) বাহির হইল। দ্বিজেন্দ্রলাল তখন ঢাকায়। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাকে খুবই প্রশংসা করিয়াছিলেন।

এখন, দ্বিজেন্দ্রলাল এই কবিতার প্রেরণা কোথা হইতে পাইয়াছিলেন, তাহার সন্ধান লওয়া যাউক। কয়েক মাস পূর্বে রবীন্দ্রনাথ সাধনায় (১৩০০ ফাল্গুন) 'প্রেমের অভিষেক' নামে এক কবিতা লেখেন। 'চিত্রা'য় ঐ কবিতার যে পাঠ

আমরা পাই, তাহা হইতে সাধনার পাঠ অনুরূপ ছিল। তাহাতে 'কেরানি-জীবনের বাস্তবতার ধূলিমাখা ছবি ছিল অকুণ্ঠিত কলমে আঁকা'। তৎসত্ত্বেও সেখানে ছিল আদর্শবাদ :

…সেথা হতে ফিরে এসে
স্মিতহাস্যসুধাস্নিগ্ধ তব পুণ্যদেশে,
কল্যাণকামনা যেথা নিয়ত বিরাজে
লক্ষ্মীরূপে, সেই তব ক্ষুদ্র গৃহমাঝে
বুঝিতে পেরেছি, আমি ক্ষুদ্র নহি কভু,
যত দৈন্য থাক্ মোর, দীন নহি তবু।[১]

এই কবিতা পাঠ করিবার পর পাঠক যদি 'কেরাণী' কবিতাটি পাঠ করেন তো দেখিবেন, দ্বিজেন্দ্রলাল কোথা হইতে তাঁহার উদ্দীপনা (inspiration) পাইয়াছিলেন। সংসার-জীবনে 'প্রেমের অভিষেকে'র বৈপরীত্যে প্রেমের নির্বাসন ছিল বর্ণনার বিষয়। কবিতাটির মধ্যে অদ্ভুত রস ও হাসিবার বিষয় থাকিলেও উহার ভিতরে একটু দীর্ঘশ্বাস থাকিয়া গিয়াছিল। বিবাহিত জীবনের উপর, প্রেমের উপর ধিক্কার— এই ছিল মুখ্যতত্ত্ব।

আমাদের বোধ হয়, রবীন্দ্রনাথের মনে এই 'কেরাণী' কবিতাটি পাঠের পর 'কৌতুক-হাস্য' সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে এবং তিনি 'পঞ্চভূতের ডায়েরি' আলোচনায় অতি বিস্তৃতভাবে উহার ব্যাখ্যা করেন।[২]

রবীন্দ্রনাথ বহু বিচার দ্বারা কৌতুকের কারণ কী হইতে পারে, তাহা আবিষ্কারের চেষ্টা করিলেন : তাঁহার মতে কৌতুকের একটা প্রধান উপাদান আকস্মিক নূতনত্ব : অসম্ভব ও অসংগতের মধ্যে যেমন নিছক বিশুদ্ধ নূতনত্ব আছে, সম্ভব ও সংগতের মধ্যে তেমন নাই। কেরানি-জীবনের মধ্যে স্ত্রীর ব্যবহার ও পরুষ বাক্য প্রয়োগের মধ্যে অসম্ভবতা কিছুই নাই, বিস্ময়ের ব্যাপারও নাই। 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই আলোচনাটি ব্যাপকভাবেই করিয়া বলিলেন যে, কৌতুকের মধ্যে যতটুকু নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায়, তাহাতে আমাদের হাসি পায় ; কিন্তু সে মাত্রা ছাড়াইয়া গেলেই উহা হয় ট্রাজেডি— হাস্য ক্রমে অশ্রুজলে পরিণত হইয়া যায়। যথার্থ কৌতুক-হাস্যের মধ্যে সংগতি রক্ষার প্রয়োজন হয় না। 'হিং টিং ছট্' ও 'জুতা আবিষ্কার'-এর মধ্যে অসংগতি ও অসম্ভবতা অত্যন্ত অদ্ভুতভাবে আসিয়া পড়ে বলিয়া উহা আমাদের হাস্য উদ্রেক করে। যাহা হউক, ইহার পর হইতে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যপ্রতিভা এই কৌতুকহাস্যের পথ বাহিয়া চলিল।[৩]

ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ প্রহসন রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; সংগীত-সমাজের উৎসাহে ও তাগিদে তিনি ১২৯৯ সালের ভাদ্র মাসে 'গোড়ায় গলদ'[৪] প্রহসন রচনা করেন ; সে কথা অতি বিস্তৃতভাবে অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে। বিপুল সাফল্যের সহিত উহা সংগীত-সমাজে অভিনীত হয়। 'গোড়ায় গলদ' রচনার পর রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল আর কোনো প্রহসন লেখেন নাই ; প্রায় দুই বৎসর পরে কয়েকটি ছোট ছোট satire বা বিদ্রূপাত্মক 'ব্যঙ্গকৌতুক' লিখিলেন।[৫]

১ গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪, পৃ ৫৪৬।

২ কৌতুকহাস্য, সাধনা ১৩০১ পৌষ, পৃ ১২৮-১৩৬। কৌতুকহাস্যের মাত্রা, ঐ ফাল্গুন, পৃ ৩৬৪-৩৭৪। পঞ্চভূত, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২, পৃ ৬১৫-৬২৬।

৩ দ্বিজেন্দ্রলাল অতঃপর অদলবদল, রাজা গোপীকা রায়ের সমস্যা, হারাধনের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা প্রভৃতি বহু আষাঢ়ে গল্প তাঁহার অপরূপ ভঙ্গিতে লিখিয়া চলিলেন।

৪ প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি 'চিত্রাঙ্গদা' ঠিক এই সময়েই প্রকাশিত হয়— ২৮শে ভাদ্র ১২৯৯। গোড়ায় গলদ ৩১শে ভাদ্র ১২৯৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৩।

৫ ব্যঙ্গকৌতুক, গদ্যগ্রন্থাবলী ৭, ১৩১৪। রবীন্দ্র-রনাবলী ৭।

Satire-এর উদ্দেশ্য কেবল হাস্যসৃষ্টি নহে, প্রতিপক্ষকে বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করাই তার মূল অভিপ্রায়। সেগুলি হইতেছে 'অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি' (সাধনা ১৩০১ ভাদ্র), 'স্বর্গীয় প্রহসন' (১৩০১ আশ্বিন-কার্তিক), 'নূতন অবতার' (১৩০১ পৌষ)। সকলগুলিই দেবতাদের লইয়া এবং প্রচলিত লৌকিক ধর্ম লইয়া বিদ্রূপ ; উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট— নব্য হিন্দুদের উদ্ভট ধর্মমতবাদের ব্যঙ্গ। ইন্দ্র চন্দ্র বৃহস্পতি শচী কার্তিক ছাড়া শীতলা মনসা ঘেঁটু ওলাবিবি প্রভৃতি অনেককেই 'স্বর্গীয় প্রহসন' নাটকের মধ্যে লেখক আনিয়াছেন। 'নূতন অবতারে' গঙ্গা ও ভগীরথকে টানিয়াছেন। এই প্রহসনকয়টি পাঠের পর পাঠক যদি দ্বিজেন্দ্রলালের 'কল্কি অবতার' (১৩০২) পড়েন তো দেখিবেন দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে রবীন্দ্রনাথের এইসব satire-এর প্রেরণা আছে কি না। অবশ্য বহু হাস্যমুখর গানে নাটকটি উজ্জ্বল হইয়াছে। ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন যে 'স্থানে স্থানে দেবদেবী লইয়া একটু আধটু রহস্য আছে।' ইহা ছাড়াও অন্য উদ্দেশ্য ছিল ; তিনি লিখিয়াছেন, 'বর্তমান সমাজের চিত্র সম্পূর্ণ করিবার জন্য সমাজের সর্বশ্রেণী অর্থাৎ পণ্ডিত গোঁড়া, নব্য হিন্দু, ব্রাহ্ম, বিলাতফেরত এই সকলের চিত্রই অপক্ষপাতিতার সহিত এই প্রহসনের অন্তর্গত করা হইয়াছে।" নাটক রচনার 'উদ্দেশ্য' কী তাহা ভূমিকায় স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

'কল্কি অবতার' লিখিবার দুই বৎসর পরে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার 'বিরহ'[১] নামক সামাজিক প্রহসন (১৩০৪) রচনা করেন। ইহা পদ্য ও গদ্যের মিশ্রণে রচিত। প্রহসনখানি 'কবিবর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের করকমলে' উৎসর্গ করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথকে তখন কিভাবে দেখিতেন ও উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি কিরূপ প্রগাঢ় ছিল, তাহারই নিদর্শনস্বরূপ আমরা নিম্নে উৎসর্গপত্রখানি উদ্ধৃত করিলাম।

"বন্ধুবর ! আপনি আমার রহস্যগীতির পক্ষপাতী। তাই রহস্যগীতিপূর্ণ এই নাটিকাখানি আপনার করে অর্পিত হইল— সব বিষয়েরই দুটি দিক আছে— একটি গম্ভীর, অপরটি লঘু। বিরহেরও তাহা আছে। আপনি ও আপনার পূর্ববর্তী কবিগণ বিষাদবেদনাপ্লুত বিরহের করুণগাথা গাহিয়াছেন। আমি— 'মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী' হইয়া বিরহের রহস্যের দিকটা জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। আপনাদের বিরহ-বেদনাকে ব্যঙ্গ বা উপহাস করা আমার উদ্দেশ্য নহে।

"আমাদের দেশে এবং অন্যত্র অনেকে হাস্যরসের উদ্দীপনাকে অযথা চপলতা বিবেচনা করেন। কিন্তু তাহাতে বক্তব্য এই যে, হাস্য দুই প্রকারে উৎপাদন করা যাইতে পারে। এক, সত্যকে প্রভূত পরিমাণে বিকৃত করিয়া, আর এক, প্রকৃতিগত অসামঞ্জস্য বর্ণনা করিয়া। যেমন, এক, কোনো ছবিতে অঙ্কিত ব্যক্তির নাসিকা উল্টাইয়া আঁকা, আর এক, তাহাকে একটু-আধটু দীর্ঘ করিয়া আঁকা। একটি প্রাকৃত— অপরটি প্রাকৃতবৈষম্য। স্নায়ুবিশেষের উত্তেজনা দ্বারা হাস্যরসের সঞ্চার করা ও চিমটি কাটিয়া করুণ-রসের উদ্দীপনা করা একই শ্রেণীর। হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া বা মুখভঙ্গী করিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া কারুণ্যের উদ্রেক করার নাম ন্যাকামি। তাই বলিয়া রহস্যমাত্রই ভাঁড়ামি বা করুণ গান মাত্রই ন্যাকামি নহে। স্থানবিশেষে উভয়েই উচ্চ সুকুমার কলার বিভিন্ন অঙ্গমাত্র। আমার এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য— অল্পায়তনের মধ্যে বিরহের প্রকৃত হাস্যকর অংশটুকু দেখানো। তাহাতে আপনার ও আপনার ন্যায় সহৃদয় ব্যক্তির চক্ষে যৎসামান্য পরিমাণেও কৃতকার্য্য হইলে আমি শ্রম সফল বিবেচনা করিব। অলমিতি বিস্তারেণ। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।"

'বিরহ' প্রহসন থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল, এমন-কি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেও উহার অভিনয় হয়। রবীন্দ্রনাথকে উহা উৎসর্গীত হইলেও, তিনি উক্ত গ্রন্থের গুণাগুণ সম্বন্ধে কোনো মতামত প্রকাশ করেন নাই, করিলেও তাহা প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু পর বৎসরে (১৩০৫) দ্বিজেন্দ্রলালের 'আসাঢ়ে' নামক কাব্য প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'তে (১৩০৫ অগ্রহায়ণ) তাহার দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন,

১ পাবলিক থিয়েটারে 'বিরহ' ১৩০৬ কার্তিক ১৯এ (১৮৯৯ নভেম্বর ৪) অভিনীত হয়।

"প্রতিভার প্রথম উদ্দাম চেষ্টা, আরম্ভেই একটা নূতন পথের দিকে ধাবিত হয়, তাহার পরে পরিণতিসহকারে পুরাতন বন্ধনের মধ্যে ধরা দিয়া আপন মর্মগত নূতনত্বকে বহিঃস্থিত পুরাতনের উপর দ্বিগুণতর উজ্জ্বল আকারে পরিস্ফুট করিয়া তুলে। 'আষাঢে'র গ্রন্থকর্তাও যে কতকগুলি কবিতা লিখিয়াছেন, সকলেরই মধ্যে তাঁহার প্রতিভার স্বকীয়ত্ব প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু যে কবিতাগুলিকে তিনি ছন্দের পুরাতন ছাঁচের মধ্যে ঢালিয়াছেন সেইগুলিতে নূতনত্বের উজ্জ্বলতা ও পুরাতনের স্থায়িত্ব উভয়ই একত্র সম্মিলিত হইযাছে।...তাঁহার হাস্যসৃষ্টির নীহারিকা ক্রমে ছন্দোবন্ধে ঘনীভূত হইয়া বঙ্গ-সাহিত্যে হাস্যের ধ্রুবনক্ষত্রপুঞ্জ রচনা করিবে।"

এদিকে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নব নব পরীক্ষা করিয়া চলিয়াছেন; 'কাহিনী' (১৩০৬ ফাল্গুন) গ্রন্থের অন্তর্গত নাট্যকাব্যগুলি তাঁহার সেই অপরূপ পরীক্ষার অন্যতম প্রকাশ। এই নাট্যকাব্যে রবীন্দ্রনাথ যে ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজস্ব সৃষ্টি। দ্বিজেন্দ্রলাল এই সময় হইতে যেসব নাটক রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে নাট্যকাব্যের পদ্ধতিকে অনুকরণ করিবার প্রয়াস দেখা যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রচলিত গৈরিশ ছন্দ অনুসরণ না করিয়া রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যের ছন্দ গ্রহণ করেন। পাষাণী (১৩০৭ আশ্বিন), সীতা (১৩০৯), তারাবাঈ (১৩১০) প্রভৃতি নাটকগুলি রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যের ন্যায় পৌরাণিক ও অর্ধ-ঐতিহাসিক আখ্যান অবলম্বনে রচিত। ডাঃ সুকুমার সেন বলিয়াছেন, "পাষাণীর অমিত্রাক্ষর ছন্দে রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থ অনুকরণের পরিচয় আছে।...কয়েকটি গান আছে। সেগুলিও প্রায়ই রবীন্দ্রনাথের গানের অনুকৃতি।"[১]

ইতিমধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের 'মন্দ্র' (১৩০৯) কাব্য প্রকাশিত হইয়াছিল। 'আর্যগাথা' ও 'আষাঢে'র ন্যায় 'মন্দ্র'কেও রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শনে' (১৩০৯ কার্তিক) সমাদৃত করিলেন। এই সমালোচনা-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে যে কথা বলিলেন, তাহাতে বোধ হয় উক্ত কবির কাব্যশক্তির চরম বিচার হইয়া গিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিধর্ম রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম হইতে একেবারে স্বতন্ত্র বলিয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার প্রশংসা এমন অকুণ্ঠ হইল। তিনি লিখিলেন, "এই কাব্যে যে ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অবলীলাকৃত ও তাহার মধ্যে সর্বত্রই প্রবল আত্মবিশ্বাসের একটি অবাধ সাহস বিরাজ করিতেছে। সে সাহস কি শব্দনির্বাচনে, কি ছন্দোরচনায়, কি ভাববিন্যাসে সর্বত্র অক্ষুণ্ণ।...কাব্যে যে নয় রস আছে, অনেক কবিই সেই ঈর্ষান্বিত নয় রসকে নয় মহলে পৃথক্ করিয়া রাখেন—দ্বিজেন্দ্রলালবাবু অকুতোভয়ে এক মহলেই একত্রে তাহাদের উৎসব জমাইতে বসিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে হাস্য করুণা মাধুর্য বিস্ময় কখন কে কাহার গায়ে আসিয়া পড়িতেছে, তাহার ঠিকানা নাই।"

অধ্যাপক সুকুমার সেন বলেন, "মন্দ্র কাব্যের 'জাতীয় সঙ্গীত' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের 'দুরন্ত আশা'র অনুকৃতি লক্ষণীয়। 'আলেখ্য' কাব্যের কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের 'শিশু'র ক্ষীণ প্রভাব আছে।"

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যনাটিকা রঙ্গমঞ্চে তেমন সমাদর লাভ করিল না; সে যুগে 'পাষাণী' রঙ্গমঞ্চে স্থানই পায় নাই। তিনি বুঝিলেন যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিতে হইলেই সংস্কৃতবহুল ভাষায় নাটকের সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করা সম্ভব নহে; সংলাপে স্বচ্ছন্দগতি পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়। এই ধরণের নাটক রচনার ব্যর্থতা তিনি বুঝিতে পারিলেন; রবীন্দ্রনাথও নাটক সম্বন্ধে ভালোমন্দ কোনো কথা বলিলেন না; যাহা তাঁহার ভালো লাগে তাহার প্রশংসা করেন, যাহা ভালো লাগে না তৎসম্বন্ধে নীরব থাকেন, ইহাই কবির স্বভাব।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন শুরু হওয়াতে সাহিত্যিকগণ নূতন ধরণের নাটক রচনার প্রয়োজন অনুভব করিতে লাগিলেন। বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে যে নূতন আত্মচেতনা আসে, তাহা বিংশ শতকের শুরু হইতে এমন-কি তাহার পূর্ব হইতেই সাহিত্যের মধ্যে দেখা দিয়াছিল। নাটকে ও রঙ্গমঞ্চে তাহার প্রথম

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড, পৃ ৩৮৬।

প্রতিক্রিয়া হইল; রাজসিংহ দেবীচৌধুরানী সীতারাম আনন্দমঠ শিবাজী বঙ্গবিজেতা সিরাজদ্দৌলা পৃথ্বিরাজ প্রভৃতি নাটকের অভিনয় বাঙালির চিত্তকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের 'বউঠাকুরানীর হাটে'র নাট্যরূপ 'বসন্ত রায়' আবার এই সময়ে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইল (১৯০১ এপ্রিল ৬)। এ কথা বলিলে বোধ হয় দুঃসাহসিকতা হইবে না যে, 'বসন্ত রায়' বাংলার প্রতাপাদিত্যকে বাংলার শেষ বীররূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নাট্যকারগণকে উদ্‌বোধিত করে। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' (স্টারে ১৯০৩ অগস্ট ১৫) 'বঙ্গের শেষ বীর' (ক্লাসিকে ১৯০৩ অগস্ট ২৯) স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বেই অভিনীত হয়। মোট কথা, বাঙালি সেদিন রাষ্ট্রনীতিতে আদর্শের সন্ধানে ফিরিতেছিল। দেশের মধ্যে এই শ্রেণীর নাটকের চাহিদা দেখা দিলে, দ্বিজেন্দ্রলালও এই দিকেই ঝুঁকিলেন। স্বদেশের জন্য যে তীব্র বেদনা তিনি অন্তরে অন্তরে বোধ করিতেছিলেন, তাহা ব্যক্ত করিবার পক্ষে ঐতিহাসিক নাটক রচনাই প্রশস্ত। স্বদেশী আন্দোলনের উৎসাহের মুখে বীরত্বব্যঞ্জক নাটক রচনা করিতে পারিলে লোকের ভাবপ্রবণ মনকে সহজেই উদ্দীপিত করা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর প্রথম নাটক হইতেছে প্রতাপসিংহ (১৩১২ বৈশাখ)। এই সুপরিচিত নাটকখানি কিভাবে স্বদেশী যুগের গোড়ার দিকে বাঙালির চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল, তাহা সমসাময়িক পত্রিকাদি হইতে জানা যায়।

দেশব্যাপী অভিনন্দনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করিলেন না। এই নীরবতার কঠোরতা দ্বিজেন্দ্রলালের মনে আঘাত দিল। এতদিন পরে দুই বন্ধুর মধ্যে বিচ্ছেদের সূত্রপাত হইল। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' নাট্যাকারে পরিণত করিয়া ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনয় করান (১৩১১ অগ্রহায়ণ ১২)।[১] অমর দত্ত 'মহেন্দ্র', মনোমোহন গোস্বামী 'বিহারী', কুসুম 'বিনোদিনী', ব্লাকী 'আশা'র ভূমিকায় নামিয়াছিলেন— সকলেই তখন কলিকাতার সেরা নটনটী। এই অভিনয়ের সম্ভাবনাতেই সাহিত্য-সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের উপর কঠোর ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন (১৩১১ কার্তিক)। দ্বিজেন্দ্রলালও রবীন্দ্রনাথের উপর নানা কারণে বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উপর 'ন্যায্য' ক্রোধ প্রকাশের সুযোগ কবিই দিয়েছিলেন।

বঙ্গবাসী পত্রিকার কার্যালয় হইতে সহকারী-সম্পাদক শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'বঙ্গভাষা ও লেখক'[২] নামে এক সুবৃহৎ জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করেন (১৩১১ ভাদ্র ২০ [১৯০৪ সেপ্টেম্বর ১৪])। এই পুস্তকে বঙ্গসাহিত্যের জীবিত ও মৃত ও বহু লেখকের জীবনী সংগৃহীত হয়; আর জীবিতগণের মধ্যে কেহ কেহ অনুরুদ্ধ হইয়া নিজেদের জীবনকথা নিজেরাই লিখিয়া দেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনকথা লিখিতে গিয়া তাঁহার কাব্যজীবনের ক্রমবিকাশের ধারাটি ব্যক্ত করেন। আমরা পূর্বে এক স্থানে বলিয়াছি যে, ১৩১০ সালে মোহিতচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যগ্রন্থ' সম্পাদন করিয়াছিলেন; এই কাব্যগ্রন্থের ২৬টি খণ্ডের জন্য কবি যে প্রবেশক-কবিতা লিখিয়া দেন, তাহা জীবনদেবতার উদ্দেশ্যে রচিত। তিনি তাঁহার সমস্ত কাব্যের মধ্যে কাহার যেন নির্দেশ অনুভব করিতেছিলেন; সমস্ত কাব্যগ্রন্থের ভূমিকারূপে উদ্‌ধৃত করেন 'আমারে কর তোমার বীণা' এই গানটি। এই আত্মকাহিনীতে কবি-রবীন্দ্রনাথের কথাই ছিল, মানুষ-

১ সাহিত্য পত্রিকা (১৩১১ কার্তিক, পৃ ৪৬০) লিখিতেছেন, "রঙ্গমঞ্চে বিনোদিনীর বাহার দেখিবার জন্য অনেকে উৎসুক ছিলেন; তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইল। কিন্তু 'চোখের বালি'র নাটকত্ব কোথায়, বলিতে পারি না।"

২ বঙ্গভাষা ও লেখক। প্রথম ভাগ। 'বঙ্গবাসী'-স্বত্বাধিকারী মহাশয়ের উদ্যোগে ও ব্যয়ে বঙ্গবাসীর সহকারী সম্পাদক শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা ৩৮।২ ভবানীচরণ দত্তের স্ট্রীট, "বঙ্গবাসী ইলেক্‌ট্রো মেসিন প্রেসে" শ্রীনুটবিহারী রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।—সন ১৩১১ সাল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [আত্মকথা] পৃ ৯৬৪-৯৮৬। এই প্রবন্ধটি আত্মপরিচয় গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিশ্বভারতী ১ বৈশাখ ১৩৫০।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি পংক্তিও ছিল না। 'বঙ্গভাষা ও লেখক' গ্রন্থখানিতে বহু অখ্যাত জীবিত লেখকের জীবনীও সন্নিবিষ্ট হয়, অথচ দ্বিজেন্দ্রলালের নাম যে কেন নাই, তাহা বুঝিলাম না।'

রবীন্দ্রনাথের এই আত্মচরিত পাঠ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল অভাবিতরূপে বিরক্ত উত্যক্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া রবীন্দ্রনাথকে একখানি পত্র লেখেন ও জানিতে চান, যথার্থই সেই আত্মজীবনীর মর্মানুসারে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সকল রচনা সম্পর্কেই Divine inspiration (ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা) দাবি করেন কি না, এবং করিলে, তিনি উহার কিভাবে ব্যাখ্যা করিতে চাহেন। এই লইয়া রবীন্দ্রনাথের সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের পত্রব্যবহার চলে। দ্বিজেন্দ্রলালের চরিতকার দেবকুমার রায়চৌধুরী বলেন, রবীন্দ্রনাথ জবাবে লিখিয়াছিলেন যে, 'তিনি যাহা ভালো বুঝিয়াছেন, তাহাই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি কাহারও মতামত গ্রহণ করিতে উৎসুক নহেন; আর যাঁহারা গূঢ় অভিসন্ধি বা মতলব (motive) লইয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতে আসেন, তাঁহাদের কাছে তিনি কোনোরূপ কৈফিয়ৎ দিতে প্রস্তুত নহেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এই পত্রের জবাবে তাঁহাকে পুনরায় লিখিয়া পাঠান যে, তিনি যদি তাঁহার দুর্নীতিমূলক ও লালসাপূর্ণ লেখাগুলি সম্পর্কেও ঐরূপ inspiration দাবি করিতে লজ্জিত ও সংকুচিত না হন, তবে প্রকাশ্যত সত্যের খাতিরে, তিনিও স্পষ্টভাবে প্রমাণ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিবেন যে সেসকল রচনা দৈবশক্তিপ্রণোদিত নহে। এই তথ্যগুলি দেবকুমার লিখিত 'দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থ হইতে গৃহীত (পৃ ৪৭৫-৭৭)। দ্বিজেন্দ্রলালের ও রবীন্দ্রনাথের পত্র আমরা দেখি নাই, পত্রগুলি কোথায়ও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়াও আমাদের জানা নাই।

১৩১১ সালের শেষ দিকে উভয় সাহিত্যিকের মধ্যে মনোমালিন্য কী আকার গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র হইতে জানা যাইবে। দ্বিজেন্দ্রলালের মনে কী সব প্রশ্ন উঠিয়াছিল, তাহা তাঁহার লিখিত পত্রের অভাবে রবীন্দ্রনাথের উত্তর হইতে স্পষ্ট হইবে। তজ্জন্য আমরা পত্রখানি[১] নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

বোলপুর

প্রিয়বরেষু

আপনি আমার স্তাবকবৃন্দের মধ্যে ভর্তি হইতে পারিবেন না এ কথাটা এতটা জোরের সঙ্গে কেন যে বল্লেন আমি ভালো বুঝতে পারলাম না। "আপনার নিন্দুকের দলে আমি যোগ দিতে পারব না" এ কথাও তো আপনি বলতে পারতেন। এ সমস্ত অনাবশ্যক কথা গায়ে পড়ে উত্থাপন করা কি জন্যে?

স্তাবকতা বলতে যদি এই বোঝায় যে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে পরের স্তুতিবাদ করা তবে এ কাজ আপনি পারবেন না এমন কথা বলাও আপনার পক্ষে অযোগ্য হয়েছে।

স্তাবকতা বলতে যদি এই বোঝায় বিচারশক্তির দোষে একজন লোকের মন্দকেও ভালো বলা— সে কাজ আপনি পারবেন না এ কথা আপনি জোর করে কি বলবেন? আপনার "মন্দ্র"কে আমি ভালো বলেছিলেম বলে অনেকে আমার বিচারশক্তির প্রতি দোষারোপ করেছিলেন— যদি বস্তুতই আমি সে দোষের ভাগী হই তবে তার উপরে আমার হাত নেই।

স্তাবকতা বলতে যদি এই বোঝায় অন্যের ভালোকে ভালো বলা তবে আমার সম্বন্ধে আপনি সে কাজে অক্ষম এ কথা এতটা উগ্রতার সঙ্গে না বল্লেও ক্ষতি হত না।

বোধ হয় আপনার বিশ্বাস আমার একদল স্তাবক আছে অর্থাৎ যাদের প্রশংসা-উক্তির সঙ্গে আপনার মতের মিল হয় না— হয় তাদের বুদ্ধির, নয় তাদের স্বভাবের দোষ দিয়ে আপনি তাদের প্রশংসা-বাক্যকে স্তাবকতা শব্দে অভিহিত করচেন। আপনি তাদের যা মনে করচেন তারা যদি সত্যই তা হয় তবে নিজেকে তাদের চেয়ে অনেক

১ পত্রখানি রবীন্দ্র-ভবন হইতে প্রাপ্ত। শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পত্রখানির সন্ধান দেন।

উঁচুদরের লোক বলে ঘোষণা করা কিছু না হোক অনাবশ্যক। ওতে কেবল আপনার অন্তঃকরণের একটা অতিমাত্র উত্তেজিত অবস্থা প্রকাশ হচ্ছে।

অপ্রিয় সত্য বলা সম্বন্ধে আপনি কিছু অহংকার প্রকাশ করেছেন। এমন একদল লোক আছেন অপ্রিয় সত্য বলাটা যাঁদের একটা বিশেষ সখ— আমরা কাউকে খাতির করে কিছু বলিনে মুখের উপর স্পষ্ট কথা বলে থাকি এই বলে তাঁরা গায়ে পড়ে গর্ব প্রকাশ করেন। মনের অবস্থাটা এ রকম হলে পর সত্য নির্ণয়ের প্রতি তেমন দৃষ্টি থাকে না, ঔদ্ধত্যের আনন্দে অপ্রিয়তাটাকেই যতদূর সম্ভব কচ্‌লে তোলা হয়।

কিন্তু সে আপনার নিজের স্বভাব নিজে বুঝবেন— আপনি আমাকে অপ্রিয় সত্য জানাবার জন্যে যতটা উদ্দীপনা অনুভব করেছেন যতদূর শ্রমস্বীকার ও সময় ব্যয় করেছেন— কোনোদিন সত্য প্রিয় শোনাবার জন্য ততটা উৎসাহ অনুভব ও ক্লেশ বহন করতে যদি না পেরে থাকেন তবে তার ক্ষতি পুরস্কার আপনার অন্তরের মধ্যে থেকেই লাভ করবেন।

এবারে আপনার চিঠি থেকে এই বুঝলুম আমাদের পরিবারের সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা যে আমরা অহংকৃত। এর বিপরীত ধারণার কথাও আপনারই ন্যায় ভালো লোকের মুখ থেকে শুনেছি— আপনি বলবেন যাঁর কাছে শুনেছি তিনি স্তাবক—তা যদি হয় তবে যাঁরা নিন্দার কথা বলেন তাঁরা যে নিন্দুক নন তা কেমন করে বুঝব? এর থেকে বস্তুত এই বোঝা যাচ্ছে আমাদের পরিবারকে কেউবা এক রকম বলেন কেউবা অন্য রকম বলেন— সকলেই একভাবে একই কথা বলেন না।

দ্বিতীয় নালিশ এই যে, আমাদের বাড়িতে নিজেদের নাটকেরই অভিনয় করা হয়েছে। সেটা আপনার মতে "Self-advertising"। আপনার বাড়ীতে এবং অন্য বাড়ীতেও আপনার মুখে আপনারই রচিত গান বিস্তর শুনেছি, কিন্তু কোনোদিন সে কাজটাকে "Self-advertising" বলে গণ্য করিনি। এমন-কি, আপনার নিজের শিশু সন্তানগুলিকেও আপনি নিজের গানের দোহারকি বানিয়ে যখন অতিথিদের আপ্যায়িত করেছেন তখনো এক মুহূর্তের জন্য আমার এবং আশা করি আর কোনো ভদ্রলোকের মনে আপনার প্রতি এ রকম সংশয় উদয় হয়নি— আপনি যখনি কবিতা আবৃত্তি করেছেন তখনি আপনার স্বরচিত কাব্য আপনার মুখ থেকে শুনেছি একবারো তার অন্যথা হয়নি। কিন্তু তাতে আমি প্রত্যেকবারেই বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করেছি, "disgusted" হইনি। তার পরে আর একটা কথা বলা আবশ্যক আপনি বোধ হয় জানেন আপনার "বিরহ" সমারোহ সহকারে আমাদের বাড়ীতে অভিনীত হয়েছে—এ ছাড়া আলিবাবা, আবুহোসেনের অভিনয় হয়েছে—কিন্তু হয়েছে কি না হয়েছে সে তর্ক আমি অনাবশ্যক বোধ করি।

সঙ্গীত-সমাজে আমার লেশমাত্র কর্তৃত্ব নেই— এমন-কি, সেখানে জ্যোতিদাদাও নিজের শান্ত স্বভাববশতই কর্তৃত্ব করতে বিরত। সেখানে অন্যান্য বহুতর নাটকের অভিনয়ের মধ্যে যদি মাঝে মাঝে আমার রচনাও অভিনীত হয়ে থাকে তবে তার থেকে আপনি এইটেই জানবেন সেখানে কর্তৃপক্ষের মধ্যে কেউ কেউ আমার রচনা পছন্দ করে থাকেন— তাদের সবাইকে আমার স্তাবক বলে যদি সান্ত্বনা লাভ করেন তবে সে পথ মুক্ত আছে।

নিজের কথা বলামাত্রের মধ্যেই অহমিকা আছে আত্মজীবনী লিখতে গেলে সেই আত্মাকে বাদ দিয়ে লেখা চলে না, সেই অনিবার্য অহমিকার জন্যই আমি উক্ত লেখার আরম্ভে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেম— এটাকে ইচ্ছাপূর্বক অহংকার করতে বসে মাপ চাওয়ার বিড়ম্বনা বলে মনে করবেন না।

মেজদাদা আমার রচিত কবিতা আবৃত্তি করে আমাকে advertize করে বেড়িয়েছেন এ কথা আপনারই মুখে শোনা গেল— তার কারণ আপনি অপ্রিয় কথা বলবার ভার নিয়েছেন— আর কারো মুখে শুনিনি তার কারণ

এ নয় যে আপনি ছাড়া আর কেউ সত্য বলেন না। আপনি অতি সহজেই এমন কথা মনে করতে পারতেন যে আমার কবিতা তাঁর কাছে পরিচিত এবং প্রিয়, সেই জন্যেই তিনি একথা ভুলে যান যে আমার কবিতা আবৃত্তি করলে আর কারো মনে বেদনা লাগতে পারে। আমার কবিতা আবৃত্তি করা তাঁর পক্ষে অবিবেচনার কাজ হতে পারে। কিন্তু যিনি চিরজীবন নিজের মানমর্য্যাদা সমস্তই অতি সহজে সকলের কাছে নত করে রেখেছেন একদিনের জন্যও যাঁকে কেউ অহংকার অনুভব করতে দেখেনি তিনি আমার কবিতা advertize করবার ভার নেবেন একথা অশ্রদ্ধেয়। এমন-কি আমার বিশ্বাস, আপনিও জানেন তিনি পারিবারিক আত্মশ্লাঘার জন্য এ কাজ করেননি— স্নেহবশত বা পরিচয়বশতই করেছেন— কিন্তু আপনি এমন এক স্থানে ক্ষুণ্ণ হয়েছেন যেখানে আঘাত পেলে শান্তভাবে সত্য গ্রহণের প্রতি লক্ষ্য থাকে না।

আদি ব্রাহ্মসমাজে আমাদেরই রচিত গান গাওয়া হয়, এ কথা সত্য নহে— এমন সকল লোকের গান আছে যাহাদের নামও কেহ জানে না এবং ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তকে আমাদের কোন গান যে কাহার এ পর্যন্ত তাহা advertize করাও হয় নাই— কোন গানই যে আমাদের তাহা অনুমান ছাড়া জানবার উপায় নাই।

আপনি আমার এবং আমাদের সম্বন্ধে আপনার মনের ভাব অকুণ্ঠিতচিত্তে আমার এবং সর্বসাধারণের সমক্ষে ঘোষণা করতে পারেন আমাকে এই কথা বলে সতর্ক করে দিয়েচেন— ভালোই করেছেন— আমার এ বয়সে আমি যদি কোনো শিক্ষা পেয়ে থাকি তবে আশা করি আপনার অপ্রিয় আচরণ আমার পক্ষে দুঃসহ হবে না। ইতি ২৩শে বৈশাখ, ১৩১২।"

ইহার পর প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গেল। ১৩১২ সালের শেষ দিকে বরিশালে আহূত প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন উপলক্ষে যে সাহিত্য সম্মিলনীর কথা হইতেছিল, তাহাতে রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি মনোনীত করা হয়। 'বঙ্গবাসী'-আদি কয়েকখানি পত্রিকা ঐ প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল এই সময়ে বরিশালে দেবকুমারকে একখানি পত্র লেখেন, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের মনের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমি যদিও রবিবাবুর ঐ লালসামূলক রচনাবলীর নিতান্ত বিরোধী তবু এ কথা মুক্তকণ্ঠেই আমি মানি যে, বর্তমান সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি সর্বাপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি এবং তাঁর প্রতিভার সঙ্গে এখন আর কাহারও তুলনাই হইতে পারে না। অবশ্য সে বিষয়েও যে ঘোর মতভেদ আছে তা বলাই বাহুল্য।"[১]

এইসকল ব্যক্তিগত পত্রাদি বিনিময় ছাড়া এখন পর্যন্ত প্রকাশ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল কিছু লেখেন নাই। তাঁহার প্রথম আক্রমণ হইল কাব্যে অস্পষ্টতা লইয়া, দুর্নীতির আলোচনা আরও কয়েক বৎসর পরে শুরু হয়। ১৩১৩ সালের আশ্বিন মাসের 'সাহিত্য' পত্রিকায় (বোধ হয় পূজা সংখ্যায়) দ্বিজেন্দ্রলাল 'সোনার তরী' কবিতার প্যারডি ও তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা খুব রসাইয়া প্রকাশ করিলেন।

১৩১৩ সালের আষাঢ় (১৯০৬ জুলাই) মাসে দ্বিজেন্দ্রলাল গয়ায় বদলি হন; সেই সময়ে লোকেন পালিত গয়ার জেলা জজ। এই গয়া হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রকাশ্যে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন-চরিতকার বলেন যে গয়াবাস-কালে লোকেন পালিতের সহিত তাঁহার প্রায়ই সাহিত্য লইয়া আলোচনা হইত। লোকেন সাহিত্য-রসিক ছিলেন; সাহিত্যের মধ্যে সুনীতি-দুর্নীতির প্রশ্ন তুলিয়া রসসম্ভোগকে ব্যাহত হইতে দিতেন না। আর্টের দিক হইতে যাহা অনবদ্য তাহাই তাঁহার উপভোগ্য ছিল। লোকেন পালিতের সহিত তাঁহার তর্ক ও মতভেদ এমনি প্রবল হইয়া উঠিল যে, তিনি অবশেষে প্রকাশ্যভাবে রবীন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গয়া

১ দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃ ৫১১।

হইতে দেবকুমার রায়চৌধুরীকে যে পত্র লেখেন, তাহা হইতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব বুঝা যায়। তিনি লিখিতেছেন :

"এতদিন চুপ করেই ছিলাম, স্পষ্টত হাতে-কলমে রবিবাবুর বিপক্ষে কোন কথা বলিনি। কিন্তু, ক্রমে যেরূপ দেখা যাচ্ছে, রবিবাবুর এইসব অন্ধ স্তাবক ও অনুকারকদের মধ্যে তাঁর দোষগুলির বড়ই বেশি প্রতিপত্তি বেড়ে চল্‌ল এবং রবিবাবুর প্রতিভার যে রকম দুর্দম্য প্রতাপ তাতে নিশ্চয়ই পরিণামে এসব দোষ আমাদের সাহিত্যে অধিকাংশ নবীন লেখকদের মধ্যে অল্পাধিক সংক্রামিত হয়ে পড়বে।... আজ তিনদিন ধরে' [লোকেন] পালিতের সঙ্গে ক্রমাগত তর্ক করলাম ; তা রবিবাবুর personality এম্‌নি dangerously strong যে, তিনি আমার যুক্তি খণ্ডন করতে অক্ষম হয়েও আমার points সব avoid করে কেবল সেইসব অস্পষ্ট দুর্নীতিপূর্ণ লেখার art ও গুণই দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। এখন স্বয়ং পালিতের মত বিজ্ঞ ও বিদ্বান লোকেরই যখন এই দশা তখন আর অন্যের কথা কি ? ... নব্য সাহিত্যিক ও কবির দল রবিবাবুর গুণের তো আর নাগাল পাবেন না, কেবল এই সব নিকৃষ্ট style ও ideaর অনুকরণই করে ক্রমে আমাদের আরাধ্যা মাতৃভাষার templeএ আঁস্তাকুড়ের আবর্জনা জমিয়ে তুলবেন।"[১]

আমাদের মনে হয়, এই উত্তেজিত মনোভাব হইতেই তিনি 'সোনার তরী' কবিতাটির প্যারডি ও 'কাব্যের অভি-ব্যক্তি' প্রবন্ধ লেখেন (সাহিত্য ১৩১৩ আশ্বিন, কার্তিক)। 'সোনার তরী' কবিতাটি সাধনায় প্রকাশিত হয় ১৩০০ সালে আষাঢ় মাসে, তাঁহার 'কেরাণী' কবিতা প্রকাশিত হইবার নয়মাস পূর্বে। তেরো বৎসর পরে দ্বিজেন্দ্রলাল ঐ কবিতাটি বাছিয়া তাহার অর্থোদ্ধারে যে কেন চেষ্টান্বিত হইলেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

'বঙ্গদর্শনে' ১৩১৩ সালের শ্রাবণ মাসে অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'কাব্যের প্রকাশ' নামে একটি অকিঞ্চিৎকর লেখা উপলক্ষ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্র-সাহিত্যাদর্শের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রবাসী ১৩১৩ সালের কার্তিক মাসে তাহা অভিব্যক্তি' নামে এক প্রবন্ধে তিনি লিখিলেন— "বঙ্গদর্শনে 'কাব্যের প্রকাশ' নামক একটি প্রবন্ধ পড়িলাম। 'কাব্যের অস্পষ্ট কাব্যের সমর্থন। শুধু তাহা নহে, যাঁহারা স্পষ্ট কবি, লেখক তাঁহাদিগকে একটু ব্যঙ্গ করিতেও ছাড়েন নাই। যদি এটি রবীন্দ্রবাবুর মতের প্রতিধ্বনি মাত্র না হইত, তাহা হইলে ইহার এই প্রতিবাদ করিতাম না... আমাদের...এই অস্পষ্ট কবিদের অগ্রণী শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

দ্বিজেন্দ্রলালের মতে "এই অস্পষ্ট কবিদিগের মধ্যে একটা 'বৃহৎ আইডিয়া' আছে।... কাব্যের জড়তা সাধারণতঃ আইডিয়ার জড়তা হইতেই প্রসূত হয়। যেখানে আইডিয়া স্পষ্ট, সেখানে ভাষা প্রাঞ্জল। যেখানে আইডিয়া অনেকাংশে কবির নিজের নিকটেই প্রচ্ছন্ন, সেখানে ভাষা অবশ্য অস্পষ্ট হইতে হইবে। কিন্তু সেটা বৃহৎ আইডিয়ার ফল নহে অস্পষ্ট আইডিয়ার ফল।"

ইহার পর দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'সোনার তরী'র অস্পষ্টতার উল্লেখ করিয়া বহু বিচার করিলেন ও অবশেষে বলিলেন, "এ কবিতাটি দুর্বোধ্য নয়, অবোধ্যও নহে— একেবারে অর্থশূন্য, স্ববিরোধী।" শুধু তাই নহে, অত্যন্ত তীব্রতার সঙ্গে লিখিলেন, "যদি স্পষ্ট করিয়া লিখিতে না পারেন, সে আপনার অক্ষমতা। তাহাতে গর্ব করিবার কিছুই নাই। অস্পষ্ট হইলেই গভীর হয় না, কারণ ডোবার পঙ্কিল জলও অস্পষ্ট, স্বচ্ছ হইলে shallow বা অগভীর হয় না ; কারণ, সমুদ্রের জলও স্বচ্ছ ; অস্পষ্টতা লইয়া বাহাদুরী করিয়া, 'miraculous' দাবী করিয়া, স্পষ্ট কবিতার ব্যঙ্গ করিবার কারণ নাই। অস্পষ্টতা একটা দোষ ; গুণ নহে।"

ইহার এক বৎসর পরে দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গদর্শনে (১৩১৪ মাঘ) 'কাব্যের উপভোগ' নামে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতার প্রশংসা আছে বটে তবে প্রবন্ধটির বেশির ভাগই হইতেছে

১ দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃ ৫৬৭-৭৮।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা'বাদের সমালোচনা। দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিতেছেন, "আমার 'কাব্যের অভিব্যক্তি' নামক প্রবন্ধ পাঠে অনেক ব্যক্তি অনেক রকম অদ্ভুত ওকালতি করেছিলেন। কবি স্বয়ং যেসব কবিতার ভাবগ্রহণ করতে অসমর্থ, সেসব কবিতা দেখলাম যে, কবির চেলাগণ বেশ বোঝেন। আমি সেই চেলাদিগকে এইখানে বলে রাখি যে, রবীন্দ্রবাবুর কাব্য আমি যেরূপ উপভোগ করি, সেই চেলাগণ তাহার দশমাংশও করেন কি না সন্দেহ। তবে রবীন্দ্রবাবু যাই লেখেন তাতেই তাধিন তাকি, ধিন তাকি, ধিন তাকি, ধিন তাকি, ম্যাও এঁও এঁও' বলে কোরাস দিতে পারি না— রবীন্দ্রবাবুর বন্ধুত্বের খাতিরেও নয়।

"রবীন্দ্রবাবু তাঁর আত্মজীবনীতে ('বঙ্গভাষা ও লেখক' গ্রন্থে যাহা প্রকাশিত হয়) inspiration দাবী করে যখন নিজের কবিতাবলীর সমালোচনা করতে বসেছিলেন, তখন তাঁর দম্ভ ও অহমিকায় আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম।" ইহার পর 'সোনার তরী'র উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "পাঁচজন শিক্ষিত ব্যক্তি সেই নগণ্য কবিতাটির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বাহির করে নিজেদের মধ্যে বিবাদ করেছেন— তখন এ সিদ্ধান্ত অমূলক নয় যে কবিতাটির সত্যই কোন অর্থ নাই।"

এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পূর্বে বঙ্গদর্শনের সম্পাদক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার রবীন্দ্রনাথের নিকট তাঁহার মতামত জানিবার জন্য উহা পাঠাইয়া দেন। রবীন্দ্রনাথ তাহার জবাব দেন (বঙ্গদর্শন ১৩১৪ মাঘ)। দ্বিজেন্দ্রলাল ও 'সাহিত্যে'র সকল আক্রমণের ইহাই একমাত্র উত্তর— ইহার পূর্বে বা পরে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রকাশ্যে আর কিছুই লেখেন নাই। রবীন্দ্রনাথের উত্তরের মধ্যে দুঃখ ও বিরক্তি আছে, কিন্তু কোথাও উষ্মা বা তিক্ততা নাই। তিনি লিখিয়াছিলেন, "ভাল কবিতা না লিখিতে পারাকে ঠিক অপরাধ বলিয়া ধরা যায় না।···শক্তির অভাবে যে ত্রুটি ঘটে তাহার সকলের চেয়ে বড় শাস্তি নিষ্ফলতা···আমার 'আত্মজীবনী' প্রবন্ধে আমি অলৌকিক শক্তির প্রেরণা দাবী করিয়া দম্ভ প্রকাশ করিয়াছি দ্বিজেন্দ্রবাবুর এইরূপ ধারণা হইয়াছে। এবং সেই কারণে তিনি আমার দর্পহরণ করা কর্তব্য মনে করিয়াছেন।

"আমি যাহা বলিতে চেষ্টা করি, সকল ক্ষেত্রে তাহা যে স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না, দ্বিজেন্দ্রবাবু তাহা আমার কাব্য সমালোচনা উপলক্ষে পূর্বেই বলিয়াছেন। আমার সেই বুদ্ধি ও বাণীর জড়িমা আমার গদ্য-প্রবন্ধেও নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইয়া থাকে নহিলে দ্বিজেন্দ্রবাবু আমার আত্মজীবনী পড়িয়া এমন ভুল বুঝিলেন কেন? কারণ আমি মনে জানি, অহংকার প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় আমার ছিল না।" রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যের মধ্যে পারম্পর্যের যে ধারাবাহিকতা অনুভব করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে অধ্যাপক কেয়ার্ডের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন, আইডিয়া সম্বন্ধে মানুষ প্রথমে অচেতন থাকে, সেই আইডিয়াই মানুষকে চালায় মানুষকে করায়। "আমাদের অপরিণত অবস্থারও কথা ও কাজকে আমাদের অজ্ঞাতসারে সেই আইডিয়ারই শক্তি প্রবর্তিত করিয়াছে।" আত্মজীবনীতে তিনি সেই কথাটাই বলিতে চাহিয়াছিলেন। "কথাটা সত্য কি মিথ্যা সেকথা স্বতন্ত্র, কিন্তু ইহা অহংকার নহে।··· কিন্তু···তবু অহংকার আপনি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে ইহা কিছুই অসম্ভব নহে।···আমার সেইরূপ বিকৃতি যদি লক্ষিত হইয়া থাকে, তবে দ্বিজেন্দ্রবাবু তাহার শাস্তি দিতে কিছুমাত্র আলস্য করেন নাই ইহা নিশ্চিত। তিনি প্রবন্ধে ও গানে, সভাস্থলে ও মাসিকপত্রে এবং যে ব্যঙ্গ কদাচ কোনো ব্যক্তিবিশেষের মর্মভেদ করিবার জন্য নিক্ষিপ্ত হয় নাই সেই ব্যঙ্গে ও ভর্ৎসনায় অশ্রান্তভাবে আমার লাঞ্ছনা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই।"[১]

দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনচরিতকার দেবকুমার বলেন যে, দ্বিজেন্দ্রলাল সভাসমিতিতে 'ব্যঙ্গ' 'ভর্ৎসনা' প্রভৃতি কিছুই করেন নাই। উভয়েরই 'চেলারা' উভয়ের মধ্যে বিরোধের ইন্ধন নিত্য জোগাইয়া আসর জমাইবার জন্য এইরূপ করিয়া বিষয়টিকে কুৎসিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।[২]

১ রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য, বঙ্গদর্শন ১৩১৪ মাঘ পৃ ৫০১-৫।

২ দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃ ৫৭৭-৭৮।

বঙ্গদর্শনে তাঁহার বক্তব্য লিখিবার কয়েকদিন পরে তিনি একখানি পত্রে এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা কবির নির্বিকার মনের পরিচায়ক। তিনি শিলাইদহ হইতে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন (১৩১৪ ফাল্গুন ৮): "দ্বিজেন্দ্রবাবু আমাকে কিছু বলে নিয়েছেন আমিও তাঁকে কিছু বলে নিয়েছি। তার পরে এইখানেই খেলাটা শেষ হয়ে গেলেই চুকে যায়— অন্তত আমি তো এই বলেই চুকিয়ে দিলুম—। এতে বৃথা অনেক সময় যায়— আমার আর সে সময়ের বাহুল্য নেই। আগুনের উপর কেবলি ইন্ধন চাপিয়ে আর কতদিন এইরকম বৃথা অগ্নিকাণ্ড করে মরব? দূর হোক গে সমস্ত নিঃশেষে মিটিয়ে দিয়ে প্রাণটাকে জুড়োতে পারলে বাঁচি। ঈশ্বর করুন তাঁর কথা ছাড়া আর কারো কথা যেন এ বয়সে আমাকে টানাটানি করে না মারে— সব পাপ শান্ত হোক" (স্মৃতি, পৃ ৬৮-৬৯)।

আইডিয়ার অস্পষ্টতা লইয়া সমালোচনান্তে বৎসরাধিককাল পরে আরম্ভ হইল রবীন্দ্রকাব্যে দুর্নীতিপরায়ণতার আলোচনা।[১] দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে দুর্নীতি দেখিয়া লিখিলেন, "দুর্নীতি কাব্যে সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইতেছে: তাহার উচ্ছেদ করিতে হইবে। যাঁহারা ধর্ম ও নীতির দিকে, তাঁহারা আমার সহায় হউন।"

দুর্নীতির উদাহরণস্বরূপ তিনি রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি প্রেমসংগীত বাছিয়া লইয়া বলিলেন যে, সেগুলি সবই ইংরাজি কোর্টশিপের গান, আর কতকগুলি লম্পটের বা অভিসারিকার গান। তিনি আরও বলিলেন যে, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এরূপ গানে মৌলিকতা নাই। শয্যারচনা, মালাগাঁথা, দীপজ্বালা, এ সকল ব্যাপার বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতা হইতে অপহরণ।...রবিবাবুর খণ্ড কবিতায়ও ঐরূপ পদ্ধতি দেখিতে পাই। নায়িকা হিসাবে ছাড়া রমণী জাতির অন্যরূপ কল্পনা তিনি করেন নাই বলিলেই হয়।" 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যের কথা তুলিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল বলিলেন, "রবীন্দ্রবাবু অর্জুনকে কিরূপ জঘন্য পশু করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা দেখুন। একজন যে-কোনও ভদ্রসন্তান এরূপ করিলে তাহাকে আমরা একাসনে বসিতে দিতে চাহিতাম না।... অশ্লীলতা ঘৃণার্হ বটে কিন্তু 'অধর্ম' ভয়ানক। ঘরে ঘরে বিদ্যা [বিদ্যাসুন্দরের] হইলে সংসার আঁস্তাকুড় হয়। কিন্তু ঘরে ঘরে এই চিত্রাঙ্গদা হইলে সংসার একেবারে উচ্ছন্ন যায়; সুরুচি বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সুনীতি অপরিহার্য। আর রবীন্দ্রবাবু এই পাপকে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করিয়াছেন তেমন বঙ্গদেশে আর কোনও কবি অদ্যাবধি পারেন নাই।" সেই হইতে 'চিত্রাঙ্গদা' অশ্লীল এই ধুয়া উঠে। প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি চিত্রাঙ্গদা প্রকাশিত হয় ১২৯৯ সালে, দ্বিজেন্দ্রলালের এই সমালোচনার আঠারো বৎসর আগে; রবীন্দ্রনাথ এই আক্রমণের কোনো জবাব দেন নাই। তবে প্রিয়নাথ সেন এক দীর্ঘ প্রবন্ধে 'চিত্রাঙ্গদা'র সৌন্দর্য নানাভাবে ব্যাখ্যা[২] করিলেন। এরূপ বিস্তৃত রসবিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথের আর কোনো নাট্যকাব্য সম্বন্ধে ইতিপূর্বে লিখিত হয় নাই।

ইতিমধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল জাতীয় সংগীত রচনার দ্বারা যশোমণ্ডিত হন। স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভ হইতে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে বাঙালিকে সংগীতে মাতাইয়াছিলেন তাহার আলোচনা যথাস্থানে হইয়াছে। 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় (১৩১২ ভাদ্র, আশ্বিন) এই গীতরাজি প্রথম বাহির হয় এবং অনতিবিলম্বে 'বাউল' নামে পুস্তকাকারে সেগুলি প্রকাশিত হয়। ইহার এক বৎসর পরে দ্বিজেন্দ্রলাল গয়া বাস কালে (১৩১৩ আশ্বিন) 'বঙ্গ আমার জননী আমার'

১ কাব্যে নীতি, সাহিত্য ১৩১৬ জ্যৈষ্ঠ।

২ প্রিয়নাথ সেন, চিত্রাঙ্গদা, সাহিত্য ১৩১৬ কার্তিক। দ্র প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, কাব্যসমালোচনা, সাহিত্য। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রাঙ্গদার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, সাহিত্য ১৩১৬ অগ্রহায়ণ। তু কাব্যে নীতি, মানসী, ১৩১৬ ভাদ্র; কাব্যে অপহরণ ১৩১৬ অগ্রহায়ণ।

বিখ্যাত সংগীতটি রচনা করেন (দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃ ৫৪২-৪৩)। রবীন্দ্রনাথের 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' গানটি ইতিপূর্বে রচিত হইয়াছিল। উভয় গীতের ভাবধারা তুলনীয়। বস্তু বা তথ্যবিশ্বাসী কবি দ্বিজেন্দ্রলাল গানটিকে নানা তথ্যের দ্বারা জনপ্রিয় করিতে সমর্থ হন। রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সংগীত অপেক্ষা দ্বিজেন্দ্রলালের 'বঙ্গ আমার' অধিক লোকপ্রিয় হইল।

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম ঐতিহাসিক নাটকে সফলতা লাভ করিয়া পর পর ঐ শ্রেণীর অনেকগুলি নাটক রচনা করিলেন। 'প্রতাপসিংহে'র (১৩১২) পর 'দুর্গাদাস', 'নূরজাহান' (১৩১৩), 'মেবারপতন', 'সাজাহান' (১৩১৫)। উগ্র স্বাদেশিকতার সহিত দেশসম্বন্ধে অবাধ উচ্ছ্বাস মিশ্রিত হওয়ায় সেদিন এইসব নাটক বাঙালির খুবই ভালো লাগিয়াছিল।

দেশ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে মোহ স্বদেশী যুগের গোড়ার দিকে ছিল, তাহা এখন বহু পরিমাণে সত্যপথাশ্রয়ী হইয়া শান্ত হইয়া আসিয়াছে। ১৩১৪ সাল হইতে তাঁহার জীবনের গতি ক্রমেই গভীরের দিকে চলিয়াছিল; আদর্শকে মূর্তি দিবার চেষ্টায় 'গোরা'র সৃষ্টি। বাঙালি স্বদেশী আন্দোলনের শুরু হইতে আদর্শ বাঙালি-বীরকে জাতীয় জীবনের সংগ্রামের আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল। বীরপূজা শুরু হয় সেই সময় হইতে এবং রবীন্দ্রনাথই 'শিবাজী উৎসব' কবিতায় তাহার প্রথম মঙ্গলাচরণ করেন। আজ ক্ষীরোদপ্রসাদ ও হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রতাপাদিত্যকে এই বীরের সম্মান দান করিলেন; দ্বিজেন্দ্রলাল সেই বীরের জয় ঘোষণা করিয়া লিখিলেন "যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য তুই ত মা সেই ধন্য দেশ! ধন্য আমরা যদি এ শিরায় থাকে মা তাঁদের রক্ত লেশ।" সমসাময়িক নাটকে, উপন্যাসে, সংগীতে এই বীরকে নানা কল্পনার জালে জড়াইয়া, নানা কালবিরুদ্ধ বাণী তাঁহার কণ্ঠে দিয়া, তাঁহাকে যে দেবোপম চরিত্ররূপে প্রকাশের চেষ্টা হয়, তাহারই প্রতিক্রিয়ায় 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক লিখিত হইল (১৩১৫)।

এই নাটকে তিনি প্রতাপাদিত্যকে যথার্থ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষণীতে দেখিয়া নৃশংসতার মূর্তিরূপে চিত্রিত করিলেন। এবং প্রতাপাদিত্যের চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র ধনঞ্জয় বৈরাগীকে সৃষ্টি করিলেন। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কবির মন কোনোদিন প্রসন্ন ছিল না, তাহা তিনি রচনাবলী সংস্করণের 'বউঠাকুরানীর হাটে'র ভূমিকায় ব্যক্ত করিয়াছেন। দেশাভিমানের অবাস্তবতাকে প্রশ্রয় দেন নাই বলিয়া, তাঁহার 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক কোনোদিন লোকপ্রিয় হয় নাই।

এদিকে কাব্যে দুর্নীতি ও সুনীতি লইয়া রবীন্দ্রনাথের ভক্তদের সহিত দ্বিজেন্দ্রলাল ও তদীয় ভক্তদের মধ্যে মাসিক পত্রিকা মারফত কথা কাটাকাটি চলিতেছে। এইসব ঘাতপ্রতিঘাতে কবির মন অত্যন্ত ক্লান্ত। একখানি পত্রে তিনি লিখিতেছেন[১]: "আমার লেখা সম্বন্ধে কিছু না লিখলেই ভাল করতে। 'প্রবাসী'র সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, এই কারণে প্রবাসীতে আমার কাব্যের গুণগান ঠিক সুশ্রাব্য হবে না।...তোমরা আমার লেখার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে যদি চেষ্টা কর তবে একদল লোককে আঘাত দেবে— অথচ সে আঘাত দেবার কোনো দরকার নেই, কেননা আমার কবিতা ত রয়েইছে— যদি ভালো হয় ত ভালোই, যদি ভালো না হয় ত ও আবর্জনা দূর করবার জন্যে ঢোলাই খরচা লাগবে না— আপনি নিঃশব্দে স'রে যাবে। যতদিন বেঁচে আছি নিজের নাম নিয়ে আর ধুলো ওড়াতে ইচ্ছে করিনে।...চতুর্দিকে বিদ্বেষের বিষ মথিত ক'রে তুলো না।"

ইতিমধ্যে 'গোরা' উপন্যাস প্রকাশিত হইলে দ্বিজেন্দ্রলাল 'বাণী' পত্রিকায় (১৩১৭ কার্তিক) উহার এক সহৃদয় সমালোচনা প্রকাশ করেন। তখন অনেকে দুই সাহিত্যিকের পুনর্মিলনের আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু সাময়িকভাবে 'গোরা'র প্রতি দরদ দেখাইলেও অন্তর হইতে কাঁটা তিনি তুলিতে পারেন নাই; এদিকে সাময়িকপত্রে কাব্যে

১ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র, ১৩১৭ ভাদ্র ২৯। দ্র প্রবাসী ১৩৩২ কার্তিক।

রুচি ও নীতি লইয়া উভয়ের ভক্তদের মধ্যে মসীবর্ষণ চলিতেছে। এই মসীযুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ নামেন নাই; দ্বিজেন্দ্রলাল নাকি প্রায়ই বলিতেন, "কেন রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্য আখড়ায় নামছেন না—এই সব অশক্ত শিখণ্ডীদের বাণ মেরে কী হবে?"[১] সত্যই রবীন্দ্রনাথকে তিনি 'কবি'র লড়াই-এর আখড়ায় নামাইতে পারিলেন না। রবীন্দ্রনাথের এই তূষ্ণীম্ভাবই বোধ হয় দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল। এইবার তিনি কবিকে নিজের নাটকের মধ্যে নামাইয়া চরমভাবে অপমানিত করিবেন স্থির করিলেন।

কয়েক বৎসর পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল 'আনন্দ-বিদায়' নামে একটি প্যারডি নাটিকা 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাইবার পর তিনি সেই রচনাটিকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ধিত করিলেন। নাটিকাটি অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'নন্দ-বিদায়ে'র প্যারডি। দ্বিজেন্দ্রলাল ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন,'এ নাটিকায় কোন ব্যক্তিগত আক্রমণ নাই।' একথা স্টারে অভিনয় রাত্রে দর্শকরা বিশ্বাস করে নাই এবং নাটিকাটি পাঠ করিলে লেখকের সে উক্তিকে যথার্থভাবে গ্রহণ করা কঠিন। তিনি ভূমিকায় আরও লিখিলেন, "ন্যাকামি, জ্যেঠামি, ভণ্ডামি ও বোকামি লইয়া যথেষ্ট ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। তাহাতে যদি কাহারও অন্তর্দাহ হয় তো তাহার জন্য তিনি দায়ী, আমি দায়ী নহি। আমি তাহার সম্মুখে দর্পণ ধরিয়াছি মাত্র।...একজন কবি অপর কোন কবির কোন কাব্যকে বা কাব্যশ্রেণীকে আক্রমণ করিলে যে তাহা অন্যায় বা অশোভন, তাহা আমি স্বীকার করি না। বিশেষত যদি কোন কবি কোনরূপ কাব্যকে সাহিত্যের পক্ষে অমঙ্গলকর বিবেচনা করেন, তাহা হইলে সেইরূপ কাব্যকে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে চাবকাইয়া দেওয়া তাঁহার কর্তব্য। Browning মহাকবি Wordsworthকে এইরূপেই চাবকাইয়াছিলেন এবং ওয়ার্ডসয়ার্থ মহাকবি শেলি ও বাইরনকে এইরূপ কশাঘাত করিয়াছিলেন।" এইরূপ মানদণ্ড হস্তে লইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথকে দণ্ডিত করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি আরও বলিলেন, "যিনি দুর্নীতির স্বপক্ষে, তিনি সাহিত্যের শত্রু; এবং এইরূপ কাব্যের নিহিত বিভৎসতা ও অপবিত্রতা যিনি আচ্ছাদন খুলিয়া প্রকাশ করিয়া না দেন, তিনিও সাহিত্যের প্রতি নিজ কর্তব্য পালন করেন না।"

'আনন্দ-বিদায়' নাটকখানি অভিনীত হয় স্টার থিয়েটারে (১৩১৯ পৌষ ১, ১৯১২ ডিসেম্বর ১৬)। দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং নাট্যালয়ে উপস্থিত থাকিয়া কৌতুক উপভোগ করিবেন আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু দর্শকমণ্ডলীর মনোভাব দেখিয়া তাঁহাকে রঙ্গালয় ত্যাগ করিয়া আসিতে হয়।[২] রবীন্দ্রনাথ তখন বিলাতে; সেদিন বাঙালি ভদ্র শিক্ষিত দর্শকগণ রবীন্দ্রনাথের এই অপমান নীরবে সহ্য করে নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল সেদিন বুঝিলেন, গত সাত বৎসর ধরিয়া তিনি যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে; তাঁহার প্রতিভার দ্বারা রবীন্দ্রপ্রতিভা ম্লান হইবার নহে। 'আনন্দ-বিদায়' নাটিকাটিতে যে কী পরিমাণ ব্যক্তিগত আক্রমণ ছিল, তাহা ঐ অপাঠ্য গ্রন্থখানি না পড়িলে জানা যায় না। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি তখন বিলাতে সমাদৃত হইতেছে, তিনি সেখানে যশস্বী হইতেছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল সে-যশকে বাঙালির যশ, ভারতীয়ের গৌরবরূপে গ্রহণ করিতে না পারিয়া নিজের অকিঞ্চিৎকর নাটকের মধ্যে তাঁহার বহুদিনের সঞ্চিত মনোভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। আমরা কয়েকটি মাত্র অংশ ঐ নাটিকা হইতে উদ্‌ধৃত করিতেছি। সেগুলি আর যাই হোক, 'উদাসী' মনের পরিচায়ক নহে:

১ উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃ ৫২।

২ বীরবল, সাহিত্যে চাবুক, সাহিত্য ১৩১৯ মাঘ পৃ ৮৭।
"সেদিন স্টার থিয়েটারে 'আনন্দ-বিদায়ে'র অভিনয় শেষে দক্ষযজ্ঞে পরিণত হয়েছিল শুনে দুঃখিত এবং লজ্জিত হলুম। তার প্রথম কারণ এই যে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মত লেখককে দর্শকমণ্ডলী লজ্জিত করেছেন এবং তার দ্বিতীয় কারণ এই যে, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রকাশ্যে লাঞ্ছনা দেবার উদ্দেশ্যেই আনন্দ-বিদায় রঙ্গমঞ্চে অবতারণা করেছিলেন।"

একাধারে কবি, অধিকারী, ঋষি[1] কিবা ত্যাগ কিবা দান,
পরিষৎ জল ছিটায়ে দিলেই (কবিবর) স্বর্গে উঠিয়া যান। —২য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য

আমি লিখছি যে সব কাব্য মানব জাতির জন্যে
নিজেই বুঝি না তার অর্থ বুঝবে কি আর অন্যে!
আমি যা লিখেছি এবং আজকাল যা সব লিখছি,
সে সব থেকে মাঝে মাঝে আমিই অনেক শিখছি।
এখন কর গৃহে গমন— নিয়ে আমার কাব্য
আমি আমার তপোবনে এখন একটু ভাবব। —২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য

"২য় ভক্ত—এই একবার বিলেত ঘুরে এলেই ইনি P.D. হয়ে আসবেন।

৩য় ভক্ত—P. D. কি?

২য় ভক্ত—Doctor of Poetry.

৩য় ভক্ত। ইংরেজরা কি বাংলা বোঝে যে এঁর কবিতা বুঝবে?

৪র্থ ভক্ত। এ কবিতা বোঝার ত কিছু দরকার নেই। এ শুধু গন্ধ। গন্ধটা ইংরেজিতে অনুবাদ করে নিলেই হোল।

২য় ভক্ত। তারপর রয়টার দিয়ে সেই খবরটা এখানে পাঠালেই আর Andrew-এর একটা certificate যোগাড় করলেই P. L.[2]

৩য় ভক্ত। P. L. কি!

২য় ভক্ত। Poet Laureate।

১ম ভক্ত। ইত্যবসরে একখানা মাসিক বের কর, মাসিক বের কর। আমরা ইত্যবসরে একে একদম ঋষি বানিয়ে দেই— —২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য

'আনন্দ-বিদায়ে'র অভিনয়ের পর (১৩১৯ পৌষ ১) দ্বিজেন্দ্রলালের বোধ হয় মনের পরিবর্তন হয়। তাই 'ভারতবর্ষ' মাসিকের সূচনায় তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পরে দেববাণীর ন্যায় সত্যরূপে পরিণত হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমাদের শাসনকর্তারা যদি বঙ্গ সাহিত্যের আদর জানিতেন, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল Peerage পাইতেন ও রবীন্দ্রনাথ Knight উপাধিতে ভূষিত হইতেন।"

দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর (১৩২০ জ্যৈষ্ঠ ৩; ১৯১৩ মে ১৭) পর দেবকুমার তাঁহার জীবনচরিত লেখেন। সে গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের সম্বন্ধটি অল্প কথায় ব্যক্ত হইয়াছে। "দ্বিজেন্দ্রলাল যখন বাংলার পাঠকসাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন না তখন হইতেই তাঁহার কবিত্বে আমি গভীর আনন্দ পাইয়াছি এবং তাঁহার প্রতিভার মহিমা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ সত্য, অর্থাৎ আমি যে তাঁর গুণপক্ষপাতী, এইটেই আসল কথা এবং এইটেই মনে রাখিবার

১ সাহিত্য ১৩১৭ ভাদ্র, পৃ ৩৪৪। প্রবাসী ১৩১৭ শ্রাবণে শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী লিখিত 'মানস-সুন্দরী'র আলোচনার সমালোচনায় আছে "চক্রবর্তী লেখকের প্রতিপাদ্য এই প্রত্যেক কবিই আংশিকরূপে ঋষি। রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব এইখানে।"

২ C. F. Andrews, An evening with Robindranath, Modern Review 1912 August.

যোগ্য। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে এখনকার অনেক পাঠক দ্বিজেন্দ্রলালকে আমার প্রতিপক্ষশ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া কলহের অবতারণা করিয়াছেন। অথচ আমি স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারি এ কলহ আমার নহে এবং আমার হইতেই পারে না। পশ্চিম দেশের আঁধি হঠাৎ একটা উড়ো হাওয়ার কাঁধে চড়িয়া শয়ন বসন আসনের উপর এক পুরু ধুলা রাখিয়া চলিয়া যায়। আমাদের জীবনে অনেক সময়ে সেই ভুল বোঝার আঁধি কোথা হইতে আসিয়া পড়ে তাহা বলিতেই পারি না। কিন্তু উপস্থিতমত সেটা যত বড়ো উৎপাতই হোক্ সেটা নিত্য নহে এবং বাঙালী পাঠকদের কাছে আমার নিবেদন এই যে তাঁহারা এই ধুলা জমাইয়া রাখিবার চেষ্টা যেন না করেন, করিলেও কৃতকার্য হইতে পারিবেন না।···সাময়িক পত্রে যে সকল সাময়িক আবর্জনা জমা হয় তাহা সাহিত্যের চিরসাময়িক উৎসব-সভার সামগ্রী নহে। দ্বিজেন্দ্রলালের সম্বন্ধে আমার যে পরিচয় স্মরণ করিয়া রাখিবার যোগ্য তাহা এই যে আমি অন্তরের সহিত তাঁহার প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করিয়াছি এবং আমার লেখায় বা আচরণে কখনও তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি নাই।--- আর যাহা কিছু অঘটন ঘটিয়াছে তাহা মায়া মাত্র, তাহার সম্পূর্ণ কারণ নির্ণয় করিতে আমি ত পারিই না, আর কেহ পারেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না।" [১৩২৪, ভাদ্র]

প্রায় নয় বৎসর পরে (১৩৩৩ পৌষ) রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র শ্রীদিলীপকুমার রায়কে তাঁহার এক পত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেন যে কোনোদিনই তিনি তাঁহার পিতার বিরুদ্ধে কাহারো সঙ্গে আলোচনা করেন নাই। "তার কারণ যার কাছ থেকে কোনো ক্ষোভ পাই তার সম্বন্ধে আমি সর্বপ্রযত্নে আত্মসংবরণ করে থাকি।··· তোমার পিতাকে আমি শেষ পর্যন্ত শ্রদ্ধা করেছি। সেকথা জানিয়ে তাঁকে ইংলণ্ড থেকে আমি পত্র লিখেছিলাম, শুনেছি সে-পত্র তিনি মৃত্যুশয্যায় পেয়েছিলেন এবং তার উত্তর লিখেছিলেন। সে-উত্তর আমার হাতে পৌঁছায় নি।"[১]

বিলাতের পথে

১৩১৮ সালের আশ্বিন মাস হইতে রবীন্দ্রনাথের বিলাত যাইবার কথাবার্তা চলিতেছে; নানা বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া অবশেষে তাহা এতদিনে সম্ভব হইল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লইয়া বিলাত যাত্রা করিলেন (১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯, ১৯১২ মে ২৪)।

বোম্বাই পৌঁছিয়া তাঁহারা ওয়াটসন হোটেলে উঠিলেন, সে হোটেল এখন নাই। বোম্বাই শহর তাঁহাদের নিকট অপরিচিত; পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে বালকবয়সে বিলাত যাইবার পূর্বে এখানে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। এই পথেই বিলাত যান দুইবার— প্রথমবার, আঠারো বৎসর বয়সে বিদ্যাশিক্ষার জন্য; দ্বিতীয়বার উনত্রিশ বৎসর বয়সে— কেবল খেয়ালবশে ভ্রমণ মানসে। কিন্তু এবারের উদ্দেশ্য বিচিত্র, জটিল। যাত্রার পূর্বপত্রে[২] লিখিতেছেন, "অল্পবয়সে যখন বিদেশে গিয়াছিলাম তখন তাহার মধ্যে একটা আর্থিক উদ্দেশ্য ছিল, সিভিল সার্ভিসে প্রবেশের বা বারিস্টার হওয়ার চেষ্টা একটা ভালো কৈফিয়ত— কিন্তু, বায়ান্ন বৎসর বয়সে সে কৈফিয়ত খাটে না, এখন কোনো পারমার্থিক উদ্দেশ্যের দোহাই দিতে হইবে।" সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিতেছেন— "কেবলমাত্র বাহির হইয়া পড়াই আমার উদ্দেশ্য। ভাগ্যক্রমে পৃথিবীতে আসিয়াছি, পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করিয়া যাইব···দুইটা চক্ষু পাইয়াছি, সেই দুটা চক্ষু বিরাটকে যত দিক দিয়া যত বিচিত্র করিয়া দেখিবে ততই সার্থক হইবে।" 'ক্ষণিকা'য় কবি গাহিয়াছিলেন—

১ জানুয়ারি ১৯২৭। তীর্থংকর, পৃ ২৮২।

২ যাত্রার পূর্বপত্র, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৪ (১৩১৯) আষাঢ় পৃ ৫৩। দ্র পথের সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ ৪৫৯-৪৭৫।

শুধু অকারণ পুলকে
নদীজলে-পড়া আলোর মতন ছুটে যা ঝলকে ঝলকে।"

এবারকার তো সে দৃষ্টি নহে। যাহাই হউক দেখার উদ্দেশ্যেই বোম্বাই শহরটার উপর চোখ বুলাইবার জন্য একদিন বাহির হইলেন। এই সামান্য ভ্রমণেই কলিকাতার সহিত বোম্বাই-এর পার্থক্যটুকু স্পষ্ট হইয়া উঠিল। কবি লিখিতেছেন, "সবচেয়ে যাহা দেখিয়া হৃদয় জুড়াইয়া যায় তাহা এখানকার নরনারীর মেলা। নারীবর্জিত কলিকাতার দৈন্যটা যে কতখানি তাহা এখানে আসিলেই দেখা যায়। কলিকাতায় আমরা মানুষকে আধখানা করিয়া দেখি, এইজন্য তাহার আনন্দরূপ দেখি না। নিশ্চয়ই সেই না-দেখার একটা দণ্ড আছে।"[১] অপরাহ্নে স্ত্রীপুরুষ ও শিশুরা সমুদ্রের ধারে একই আনন্দে মিলিত হয় এই দৃশ্যটি কবির খুব ভালো লাগে। তাঁহার মনে প্রশ্ন বাঙালি নরনারী ঘরের কোণের মধ্যে যেভাবে মিলিয়া থাকে, তাহা কি সম্পূর্ণ। কবির চোখে বোম্বাই-এর নরনারী বেশের পারিপাট্য ও বর্ণচ্ছটা বিশেষভাবে ধরা পড়িয়াছে। "পরিচ্ছন্নতার দ্বারা ইহারা নিজেকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে...আপনার সমাজকে কুদৃশ্য দীনতা হইতে প্রত্যেকেই যদি রক্ষার চেষ্টা না করে তবে কত বড়ো একটা শৈথিল্য সমস্ত দেশকে বিশ্বের চক্ষে অপমানিত করিয়া রাখে, তাহা অভ্যাসের অসাড়তাবশতই আমরা বুঝিতে পারি না।

"আর-একটা জিনিই বোম্বাই শহরে অত্যন্ত বড়ো করিয়া চোখে পড়িল। সে এখানকার দেশী লোকের ধনশালিতা।...কলিকাতার...ধন চাকরিতে ও জমিদারিতে ; এইজন্য তাহা বড় ম্লান। জমিদারির সম্পদ বদ্ধ জলের মতো ; তাহা কেবলি ব্যবহারে ক্ষীণ ও বিলাসে দূষিত হইতে থাকে। তাহাতে মানুষের শক্তির প্রকাশ দেখি না ; তাহাতে ধনাগমের নব নব তরঙ্গলীলা নাই। এইজন্য আমাদের দেশে যেটুকু ধন সঞ্চয় আছে তাহার মধ্যে অত্যন্ত একটা ভীরুতা দেখি। মাড়োয়ারি পার্সি গুজরাটি পাঞ্জাবিদের মধ্যে দানে মুক্তহস্ততা দেখিতে পাই, কিন্তু বাংলাদেশ সকলের চেয়ে অল্প দান করে।...ধন জিনিসটাকে আমাদের দেশ সচেতনভাবে অনুভব করিতেই পারিল না, এইজন্য আমাদের দেশের কৃপণতাও কুশ্রী, বিলাসও বীভৎস। এখানকার ধনীদের জীবনযাত্রা সরল, অথচ ধনের মূর্তি উদার, ইহা দেখিয়া আনন্দবোধ হয়।"

বোম্বাই হইতে জাহাজ ছাড়িল শুক্লপক্ষের শেষ দিকে ২৭ মে ১৯১২ (১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪)। "যেমন সমুদ্র তেমনি সমুদ্রের উপরকার রাত্রি ; স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দুই অন্তহীনের সুন্দর মিলনটি"[২] কবি দেখিতে থাকেন, "স্তব্ধের সঙ্গে চঞ্চলের, নীরবের সঙ্গে মুখরের, দিগন্তব্যাপী আলাপ চুপ" করিয়া শোনেন। কবির মন আদর্শবাদে সৌন্দর্যে তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু বিশ্লেষণী মন এভাবে দীর্ঘকাল আত্মতৃপ্ত থাকিতে পারে না ; চারি দিকের বস্তুজগৎ ও প্রাণপ্রবাহ মনে অসংখ্য প্রশ্ন আনে। 'যাত্রার পূর্বপত্রে' দেশের আধ্যাত্মিক দিকটার যে অভাবাত্মক রূপের উপর তাঁহার তীব্র কশাঘাত পড়িয়াছিল, আজ দেশ চোখের সম্মুখ হইতে সরিয়া যাওয়া মাত্রেই তাহার আদর্শমূর্তি কল্পলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। য়ুরোপীয় যাত্রীদের জীবনযাত্রার প্রণালী নিরীক্ষণ করিয়া লিখিতেছেন, "আমাদের ক্ষুদ্র জীবনটুকুর চারি দিকেই যে-একটি অক্ষুব্ধ অনন্ত রহিয়াছেন, তাঁহার দিকে এই যাত্রীদের এক মুহূর্তও তাকাইবার অবকাশ নাই।" দেশের কথা মনে করিয়া লিখিতেছেন, "এ জাহাজ যদি ভারতবাসী যাত্রীদের জাহাজ হইত তাহা হইলে দিনের সমস্ত কাজকর্ম-আমোদ-আহ্লাদের অত্যন্ত মাঝখানেই দেখিতে পাইতাম মানুষ অসংকোচে অনন্তকে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিতেছে...কিন্তু, এই ইংরেজ যাত্রীরা তাহাদের হাস্যালাপের কোনো-একটা ছেদে ধর্মসংগীত গাহিতেছে, এ কথা মনে

১ বোম্বাই শহর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৪ আষাঢ়। পৃ ৬৫। দ্র পথের সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী, পৃ ৪৭৫-৪৭৮।

২ সমুদ্রপাড়ি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮৩৪ শ্রাবণ পৃ ৯২। দ্র পথের সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ ৪৮৩-৪৯০।

করিতেই পারি না।...ইহাদের কাজকর্ম-হাস্যালাপের মধ্যে কেবলই এক-দিক-ঘেঁষা একটা তীব্রতা প্রকাশ পায়।"

জাহাজের নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ, যাত্রীদের সুবিধার জন্য অশেষ আয়োজন, সময়নিষ্ঠা, সমস্ত কর্মের মধ্যে অনায়াস-গতি প্রভৃতি কবিকে মুগ্ধ করে, সেই সঙ্গে নিজের দেশবাসীর আরাম সুখ দাবি করিবার সাহসের অভাবে দুর্ভোগ ভুগিবার কথা ভাবিয়া মন বিষণ্ণ হয়। আমরা কোনোমতে অভাবের সঙ্গে আপোস করিয়া দিন কাটাই, "আমরা কেবলই দুঃখ এবং অসুবিধা বহন করি কিন্তু দায়িত্ব বহন করিতে চাই না।"

জাহাজে চড়িয়া কবির মনে আর-একটি কথা বড়ই তীব্রভাবে বিঁধিতেছে; সেটি হইতেছে এই যে "আমরা যে জাহাজে চড়িয়া চলাফেরা করি, তাহাতে ভারতীয়দের স্থান কোথায়! সাহেবরা প্রাণ দিয়া চলাইতেছে আর আমরা টাকা দিয়া চলিতেছি।"

জাহাজে উঠিয়া কবির ভয় ছিল ডাঙার জীব সাগরদোলা সহিতে পারিবেন না। কিন্তু "মহাসাগর কবির কবিত্বটুকুকে ঝাঁকানি দিয়া নিঃশেষ করিয়া দেন নাই।...ভাবখানা দেখিয়া মনে হইতেছে, ভীরু ভক্তের উপর এ যাত্রায় তাঁহার সেই অট্টহাস্যের তুমুল পরিহাস প্রয়োগ করিবেন না।" লোহিত সাগরে প্রবেশ করিয়া কবি লিখিতেছেন, "মনের আনন্দে চলিতেছি। ভয় ছিল, সমুদ্রের দোলা আমার শরীর সহিবে না! সে ভয় কাটিয়া গিয়াছে।[১] সমুদ্রে চলিতে চলিতে কবির মনে হইতেছে, মানুষ কি শক্তি বলেই না প্রকৃতিকে তাহার অনুকূলে আনিয়াছে। "বিশাল সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত মানুষটা যে কিরকম, আজ আমরা জাহাজে চড়িয়া তাহাই অনুভব করিতেছি।··· ···যাহা-কিছু আমাদের বাধা তাহাকেই আমাদের চলিবার পথ, আমাদের মুক্তির উপায় করিয়া লইতে হইবে, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের এই আদেশ আছে। যাহারা এই আদেশ মানিয়াছে তাহারাই পৃথিবীতে ছাড়া পাইয়াছে। যাহারা মানে নাই এই পৃথিবী তাহাদের পক্ষে কারাগার। নিজের গ্রামটুকু তাহাদিগকে বেড়িয়াছে, ঘরের কোণটুকু তাহাদিগকে বাঁধিয়াছে, প্রত্যেক পা ফেলিতেই তাহাদের শিকল ঝম্‌ঝম্‌ করে।" তাই তিনি বলিতেছেন, "কেবলমাত্র এই চলিবার আনন্দটুকুই পাইব বলিয়া আমি বাহির হইয়াছি।...প্রাণ আপনি চায় চলিতে। সেই তাহার ধর্ম। না চলিলে সে যে মৃত্যুতে গিয়া ঠেকে। এইজন্য নানা প্রয়োজনের ও খেলার ছুতায় সে কেবল চলে।"

জাহাজে উঠিবার পর হইতে কবির লেখনী বেশ সচল; নূতন পারিপার্শ্বিক ও পরিস্থিতির মধ্যে বিচিত্র চিন্তা কবিচিত্তে ভিড় করিতেছে। তাহাদের মুক্তি হইতেছে পত্রধারায়। গীতাঞ্জলির কাব্যধারা স্তব্ধ হইবার প্রায় দেড় বৎসর পর গীতিমাল্যের গানের পালা শুরু হয় গত চৈত্র মাসে। বিলাতযাত্রার গোলমালে ও উত্তেজনায় গীত রচনা কয়েকদিন বন্ধ ছিল; জাহাজে মন বেশ তৃপ্ত— পত্রধারায় নানা সমস্যায়, নানা প্রশ্নের আলোচনায় মন মগ্ন। কিন্তু মনের গভীরে আছে আনন্দরূপের স্পর্শ। জাহাজ লোহিতসমুদ্রে চলিতেছে। কবি লিখিতেছেন, (১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ ২২) "আজ সকালে জাহাজের ছাদের উপর রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। আকাশের পাণ্ডুর নীল ও সমুদ্রের নিবিড় নীলিমার মাঝখান দিয়া পশ্চিম দিগন্ত হইতে মৃদুশীতল বাতাস আসিতেছিল। আমার ললাট মাধুর্যে অভিষিক্ত হইল। আমার মন বলিতে লাগিল, 'এই তো তাঁহার প্রসাদসুধার প্রবাহ।'···এই অনির্বচনীয় মাধুর্য কি জলে। ইহা কি বাতাসে। এই ধারণার অতীতকে কে ধারণ করিতে পারে। ইহাই আনন্দ, ইহাই প্রসাদ।"[২] মনের এই পরিপূর্ণ আনন্দিত অবস্থায় গান উৎসরিল—'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।'[৩]

ভূমধ্যসাগারতীরে মিশরের আন্তর্জাতিক বন্দর পোর্ট সৈয়দে পৌঁছাইবার পর জাহাজে বেশ ভিড় হইল; সেই ভিড়ের

১ যাত্রা (লোহিত সমুদ্র। ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯), তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮৩৪ শ্রাবণ পৃ ২৭৯-৮১। দ্র পথের সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ ৪৯০-৪৯৪।

২ আনন্দরূপ (লোহিতসমুদ্র। ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৪ শ্রাবণ। পথের সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ ৪৯৫।

৩ ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯। লোহিতসাগর। গীতিমাল্য ২৮। ১৩ বৈশাখের পর এই প্রথম গান।

লোকের খেলাধুলা কাজকর্ম প্রভৃতি দেখিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নিয়মনিষ্ঠার তুলনা মনে উদয় হইতেছে।[১] কবির অভিযোগ দেশে যেখানে আমরা সম্মিলিত হইয়া কোনো কাজ করিতে প্রবৃত্ত হই, সেখানে নিজেদের নিয়মের দ্বারা নিজেদের কোনো প্রতিষ্ঠান চালনা করিবার সুযোগ পাই, সেখানেই পদে পদে বিচ্ছেদ ও শৈথিল্য প্রবেশ করিয়া সমস্ত ছারখার করিয়া দেয়। "যে নিয়ম মানুষের গলার হার তাহাকে পায়ের বেড়ি করিয়া পরিব না, এই কথা একদিন আমাদিগকে সমস্ত মনের সঙ্গে বলিতে হইবে।"

অন্তর-বাহিরের বিচিত্র আন্দোলনের অন্তে কবি সপরিবারে য়ুরোপের উপকূলে পৌঁছিলেন জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে। ইহারা ওভারল্যাণ্ড যাত্রী, তাই ফ্রান্সের দক্ষিণে মার্সাই বন্দরে নামিলেন।

সমুদ্রের পালা শেষ হইল। মার্সাই হইতে এক দৌড়ে পারিসে আসিয়া একদিনের মত তাঁহারা তথায় বিশ্রাম করিয়া লইলেন। সমুদ্রপথে শেষ দুই দিন সাগারদোলা তাঁহাদিগকে বেশ বিব্রত করিয়াছিল। যাহাই হউক পারিস শহর একদিনে যতটা দেখা যায় দেখিয়া লইলেন। মহানগরীর চারি দিকের আমোদ-উৎসব দেখিয়া কবির মনে হইতেছে যে পুরাকালে প্রমোদের চূড়ান্ত ছিল রাজারই ঘরে। এখন সমস্ত মানুষের জন্য বিচিত্র প্রমোদের আয়োজনে বহু লোক ব্যাপৃত। "এই মানুষ-রাজার আমোদ এমন প্রকাণ্ড, এমন বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহাকে অলস বিলাসীর প্রমোদের সঙ্গে তুলনা করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ইহা প্রবল চিত্তের প্রবল আমোদ।"[২]

১৬ই জুন রবীন্দ্রনাথ পুত্র ও পুত্রবধূসহ ডোভার হইয়া লণ্ডন পৌঁছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে-লণ্ডনকে জানিতেন সে লণ্ডন আর নাই। ১৮৭৮ সালের বা ১৮৯০ সালের লণ্ডন ও ১৯১২ সালের লণ্ডনের মধ্যে অনেক পার্থক্য। কবি লিখিতেছেন "অনেককাল পরে লণ্ডনে আসিলাম। তখনো লণ্ডনের রাস্তায় যথেষ্ট ভিড় দেখিয়াছি, কিন্তু এখন মোটর গাড়ির একটা নূতন উপসর্গ জুটিয়াছে। তাহাতে শহরের ব্যস্ততা আরও প্রবলভাবে মূর্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। মোটর রথ, মোটর-বিশ্বম্বহ (অম্নিবাস) মোটর-মালগাড়ি লণ্ডনের নাড়ীতে নাড়ীতে শতধারায় ছুটিয়া চলিতেছে। আমি ভাবি, লণ্ডনের সমস্ত রাস্তার ভিতর দিয়া কেবলমাত্র এই চলিবার বেগ পরিমাণে কী ভয়ানক প্রকাণ্ড! যে মনের বেগের ইহা বাহ্যমূর্তি তাহাই বা কী ভীষণ! দেশ-কালকে লইয়া কী প্রচণ্ড বলে ইহারা টানাটানি করিতেছে।··· দ্রুত দেখা, দ্রুত শোনা ও দ্রুত চিন্তা করিয়া কর্তব্য স্থির করিবার শক্তি কেবলই বাড়িয়া উঠিতেছে। দেখিতে শুনিতে ও ভাবিতে যাহার সময় লাগে সেই এখানে হটিয়া যাইবে।"

লণ্ডনের সমস্তই অপরিচিত; রথীন্দ্রনাথ তিন বৎসর পূর্বে আমেরিকা হইতে ফিরিবার পথে এখানে কয়েকদিন ছিলেন, তাহাতে এই বিরাট নগরীর সহিত পরিচয় হয় না। এবার তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে টমাস্ কুক্ কোম্পানির উপর আত্মনির্ভর করিয়া লণ্ডনে প্রবেশ করিতে হইল।

লণ্ডনে

লণ্ডনে আসিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রথমে এক হোটেলে আশ্রয় লইলেন। হোটেলের ভিতর লোকদের বিশেষ সময়ে আসা-যাওয়া, খাওয়া-দাওয়া ব্যাপারে কী ব্যস্ততা। তার পরই সব শান্ত হইয়া যায়; এই দৃশ্যটি কবিকে মুগ্ধও করে চঞ্চলও করে। জানালা খুলিয়া দেখেন লণ্ডনের জনস্রোত চারি দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাঁহার মনে হয় ইহারা যেন কোন্ এক অদৃশ্য কারিগরের হাতুড়ি। লক্ষ লক্ষ হাতুড়ি দ্রুত প্রবল বেগে লক্ষ লক্ষ জায়গায় গিয়া পড়িতেছে।

১ খেলা ও কাজ। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৪ ভাদ্র। পথের সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ ৫০৭-৫১৩।

২ লণ্ডনে। প্রবাসী ১৩১৯ ভাদ্র, পৃ ৪৭৯। পথের সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ ৫১৩-৫২১।

কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁহারা হাম্পস্টেড্ হীথ-এ হলফোর্ড রোডে (২ নং) এক বাসা ভাড়া করিলেন; এই পাড়ার কাছেই রোটেনস্টাইনের সহিত সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় তাঁহার বাড়ির নিকটে বাসা ব্যবস্থা হয়। উইলিয়ম রোটেনস্টাইন সুবিখ্যাত চিত্রকর; কেবল চিত্রকর বলিলে যথেষ্ট বলা হয় না, কারণ তিনি মনীষীও বটে। ভারতবর্ষ-ভ্রমণে তিনি একবার আসেন (১৯১১); সেই সময়ে ইঁহার সঙ্গে কবির সামান্য পরিচয় হয়।

ইঁহার কিছুকাল পরে তিনি মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় (১৯১২ জানুয়ারি) ভগিনী নিবেদিতা-অনূদিত 'কাবুলিওয়ালা' গল্প পাঠ করিয়া রবীন্দ্র-প্রতিভায় মুগ্ধ হন। রবীন্দ্রনাথের ঐ শ্রেণীর আরও গল্প আছে কি না জানিবার জন্য তিনি অবনীন্দ্রনাথদের পত্র দেন। এই পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ অজিতকুমার চক্রবর্তীকৃত কতকগুলি কবিতার অনুবাদ রোটেনস্টাইনকে পাঠাইয়া দেন। এই অনুবাদগুলি পাঠ করিয়া তাঁহার বিস্ময়ের অবধি থাকে নাই, তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আরও তথ্য জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। সেই সময়ে লণ্ডনে ছিলেন নববিধান সমাজের পুণ্যাত্মা ভাই প্রমথলাল সেন (লালুদা) ও দর্শনাচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। রোমের আন্তর্জাতিক নৃতত্ত্ব সম্মেলনে যোগদানের জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ তখন য়ুরোপে গিয়াছেন। ইঁহাদের নিকট হইতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রোটেনস্টাইন অনেক কথা জানিতে পারেন। ব্রজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে বিলাতে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, বিলাতে তাঁহারই মনের মত কয়েকটি হৃদয় তাঁহার অপেক্ষায় আছে।

ইহার পর রবীন্দ্রনাথ কিভাবে ও কেন নিজ কবিতার অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে। লণ্ডনে পৌঁছিয়া তিনি রোটেনস্টাইনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন ও গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার হাতে একখানি ছোটো নোট বহি দিলেন, উহাতে কবির নিজকৃত অনুবাদ ছিল।[১] ইহাই ইংরেজি গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি, রোটেনস্টাইনকে উৎসর্গীত।

হোটেল হইতে হ্যাম্পস্টেড হীথ-এর বাসায় উঠিয়া আসিবার পর রোটেনস্টাইনের গৃহে কবির সহিত ইংলণ্ডের ভাবুক সমাজের অনেকের সাক্ষাৎ হইবার সুযোগ হইল। ইতিমধ্যে রোটেনস্টাইন ইংরেজি গীতাঞ্জলির টাইপকরা কপি কয়েকজনের নিকট পাঠাইয়া দিলেন— আইরিশ কবি উইলিয়ম বাটলার য়েট্স্ তাঁহাদের অন্যতম।

ইতিমধ্যে একদিন কবি Nation পত্রিকার মধ্যাহ্ন-ভোজনে আমন্ত্রিত হইলেন। Nation বিলাতের উদারপন্থীদের প্রধান সাপ্তাহিক পত্র। "ইংলণ্ডে যে-সকল মহাত্মা স্বদেশ ও বিদেশ, স্বজাতি ও পরজাতিকে স্বার্থপরতার ঝুঁটা বাটখারায় মাপিয়া বিচার করেন না, অন্যায়কে যাঁহারা কোনো ছুতায় কোথাও আশ্রয় দিতে চান না, যাঁহারা মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু, Nation তাঁহাদেরই বাণী বহন করিবার জন্য নিযুক্ত।"[২] কবি সকল বিষয় ও বস্তুকে ভাবাত্মক ও আদর্শাত্মক দিক হইতে দেখিয়া যে আনন্দ পাইতেন এই উক্তি তাহারই নিদর্শন।

ইংলণ্ডের ভাবুক সমাজের সহিত কবির পরিচয় খুব বেশি দিনের নয়, অন্তরঙ্গও নয়— ক্ষণকালের দেখাসাক্ষাৎ মাত্র, তবু সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি একটি জিনিস লক্ষ্য করিয়াছিলেন— সেটা হইতেছে ইহাদের মনের ক্ষিপ্রতা।[৩] পশ্চিম যে বড় হইয়াছে তাহার কারণ অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কার বা বাণিজ্য ব্যবসার বিস্তার নহে। বিলাতে আসিয়াই তিনি লক্ষ্য করিলেন যে বাহিরে কাজের ক্ষেত্রেও ইহাদের যেমন হাঁকাহাঁকি দৌড়াদৌড়ি চিন্তার ক্ষেত্রেও ঠিক

১ As he entered the room he handed me a note book in which, since I wished to know more of his Poetry, he had made some translations during his passage from India. *Men and Memories II*. p. 262

২ লণ্ডনে, প্রবাসী ১৩১৯ ভাদ্র, পৃ ৪৮০। পথের সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ ৫১৫।

৩ ইংলণ্ডের ভাবুকসমাজ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮৩৪ শক ১৩১৯ কার্তিক। পথের সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬ পৃ ৫৩৩-৫৩৯।

তেমনি। তিনি লিখিতেছেন, "কত হাজার হাজার লোক যে ঊর্ধ্বশ্বাসে চিন্তা করিয়া চলিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। দৈনিক কাগজে, সাপ্তাহিকে, মাসিকে, ত্রৈমাসিকে, বক্তৃতাসভায়, শিক্ষাশালায়, পার্লামেন্টে, পুঁথিতে, চটিতে মনের ধারা অবিশ্রাম বহিয়া চলিয়াছে।·· এ দেশের চিন্তার হাটে কী ভয়ংকর কোলাহল এবং ঠেলাঠেলি।"

রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডের চিন্তাধারা ও সাহিত্যের সহিত পূর্বাহ্নে পরিচতি ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার মন তথাকার সমসাময়িক মনীষীদের সহিত মিলিত হইবার জন্য উৎসুক ছিল। বলা বাহুল্য আমাদের মনের খোরাক শতাব্দী-কালের উপর যোগান দিয়াছে ইংলণ্ড। সুতরাং পাশ্চাত্য মনীষীদের কথাবার্তা চিন্তাধারা কবির মনকে সহজেই স্পর্শ করিতে পারিয়াছিল। ইংলণ্ডে পৌঁছিবার কয়েকদিনের মধ্যেই রোটেনস্টাইন মারফত ইংলণ্ডের সমসাময়িক কয়েকজন সেরা মনীষীর সহিত পরিচয় হইল। এইচ. জি. ওয়েলসকে পরিচিত করিবার জন্য রোটেনস্টাইন তাঁহাকে এক ডিনারে নিমন্ত্রণ করিলেন; ওয়েলস্ রবীন্দ্রনাথের বয়সী অর্থাৎ পঞ্চাশ-পার। কবি দেশে থাকিতে ওয়েলসের কয়েকখানি উপন্যাস ও আমেরিকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে (*Future in America* 1906) একখানি গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন। ওয়েলসের প্রতিভার আভাস ঐ পুস্তক হইতেই তিনি পান। কবির ঐ লোকটি সম্বন্ধে মনের মধ্যে একটু ভয় ছিল। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন; দেখিলেন "মানুষটি সজারুজাতীয় নহে।··· ইহার প্রখরতা চিন্তায়, কিন্তু প্রকৃতিতে নয়।" ওয়েলসের সঙ্গে কথা কহিতে গিযা কবি বুঝিতে পারিলেন যে "ইঁহাদের চিন্তাশীলতা ও রচনাশক্তির অবলম্বন মানুষ,···ইঁহাদের চিন্তার তীক্ষ্ণতা সজীব তীক্ষ্ণতা, তাহা দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা।"

জুন মাসের শেষদিকে কেমব্রিজের Kings College-এর অধ্যাপক লোয়েস ডিকিন্‌সনের আমন্ত্রণে কবি দিন-দুইএর জন্য সেখানে গেলেন। ডিকিন্‌সন 'জন্ চীনাম্যানের পত্র' নামে গ্রন্থের লেখক। পাঠকের স্মরণ আছে বঙ্গদর্শনের যুগে রবীন্দ্রনাথ এই বইখানির বিস্তারিত সমালোচনা করিয়াছিলেন। তখন লোকে মনে করিয়াছিল যে ঐ গ্রন্থের লেখক বুঝি চীনা; পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার সমালোচনা পাঠে অনেকেই লেখকের প্রতি আকৃষ্ট হন। উক্ত প্রবন্ধ লিখিবার পরে অবশ্য কবি জানিতে পারেন যে লেখক ইংরেজ অধ্যাপক। এতকাল পরে তাঁহার সহিত চাক্ষুষ পরিচয় লাভের পর কবি লিখিতেছেন, "যে দুইদিন ইঁহার বাসায় ছিলাম ইঁহার সঙ্গে প্রায় নিয়ত আমার কথাবার্তা হইয়াছে। স্রোতের সঙ্গে স্রোত যেমন অনায়াসে মেশে তেমনি অশ্রান্ত আনন্দে তাঁহার চিত্তবেগের টানে আমার চিত্ত ধাবিত হইয়া চলিতেছিল।" দশ বৎসর পর ডিকিনসন এই সাক্ষাৎকারের কথা স্মরণ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

It is a June evening, in a Cambridge garden Mr. Bertrand Russell and myself sit there alone with Tagore. He sings to us some of his poems, the beautiful voice and the strange mode floating away on the gathering darkness. Then Russell begins to talk, coruscating like lightning in the dusk. Tagore falls into silence But afterwards he said, it had been wonderful to hear Russell talk. He had passed into a 'higher state of consciousness' and heard it, as it were, from a distance. What, I wonder, had he heard?"[১]

রবীন্দ্রনাথ বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল সম্বন্ধে সেই সময়ে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাও উদ্‌ধৃতিযোগ্য; ডিকিনসন ও রাসেলের "আলাপের আন্দোলন আমার মনকে পদে পদে অভিহত করিয়া আনন্দিত করিয়া তুলিল। গণিতের তেজে কাহারও মন দগ্ধ হইয়া শুকাইয়া যায়, কাহারও মন আলোকিত হইয়া উঠে। রাসেল সাহেবের মন যেন প্রখর আলোকে দীপ্যমান। সেই চিন্তার আলোকের সঙ্গে সঙ্গে অপর্যাপ্ত হাস্যরশ্মি মিলিত হইয়া আছে, সেইটে আমার কাছে সবচেয়ে

১ New Leader, 22 February. 1928. Quoted by Aranson, *Rabindranath through Western Eyes*. p. 15.

সরস লাগিল। রাত্রে আহারের পর আমরা কলেজের বাগানে গিয়া বসিতাম, সেখানে একদিন রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত প্রাচীন তরুসভার গভীর নীরবতার মধ্যে এই দুই অধ্যাপক বন্ধুর আলাপ আমি শুনিতেছিলাম।...প্রকৃতি এবং চিত্ত এই দুইয়ের যোগ আমি সেই প্রাচীন বিদ্যালয়ের পুরাতন বাগানে বসিয়া অনুভব করিতেছিলাম।...নিস্তব্ধ রাত্রে দুই বন্ধুর মৃদু কণ্ঠের কথাবার্তায় আমি মানুষের মনের মধ্যে সমস্ত বিশ্বের সেই আনন্দ সেই ঐশ্বর্য অনুভব করিতেছিলাম।"[১]

রোটেনস্টাইন সম্বন্ধে কবি সেদিন লিখিয়াছিলেন, "ইঁহার অনুভূতিশক্তিও দ্রুত এবং প্রবল।...যেটাকে গ্রহণ করিতে হইবে সেটাকে ইনি একেবারেই অসংশয়ে গ্রহণ করেন। মানুষকে ও মানুষের শক্তিকে গ্রহণ করিবার সহজ ক্ষমতা ইঁহার এমন প্রবল বলিয়াই ইনি ইঁহার দেশের নানা শক্তিশালী নানা শ্রেণীর লোককে এমন করিয়া বন্ধুত্বপাশে বাঁধিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা কেহ বা কবি, কেহ সমালোচক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ দার্শনিক, কেহ গুণী, কেহ জ্ঞানী, কেহ রসিক, কেহ রসজ্ঞ; তাঁহারা সকলেই বিনা বাধায় এক ক্ষেত্রে মিলিবার মতো লোক নহেন, কিন্তু তাঁহার মধ্যে সকলেই মিলিতে পারিয়াছেন।"[২]

রোটেনস্টাইনের এই মনের ব্যাপ্তির সংবাদ যদি কেহ ভালো করিয়া জানিতে চান তবে তিনি যেন শিল্পীর *Men and Memories* গ্রন্থ তিন খণ্ড পাঠ করেন। স্বীয় চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য রোটেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার বন্ধুমহলে পরিচিত করিয়া দিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলেন না, তিনি কবির কাব্যকে রসিকমহলে পরিচিত করিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

সে সময়ের যেসব প্রধান সাহিত্যিকের সঙ্গে রোটেনস্টাইনের ঘনিষ্ঠতা ছিল, তিনি তাঁহাদের কাছে গীতাঞ্জলির টাইপ-প্রতিলিপি পাঠাইয়া প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ব্রাড্‌লে, স্টপফোর্ড ব্রুক, ও য়েট্‌সের নিকট গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি-কপি প্রেরিত হইল। ব্রাড্‌লে[৩] গীতাঞ্জলির টাইপ-করা কপি পাঠ করিয়া লিখিয়া পাঠান যে, এতদিনে মনে হইতেছে আমাদের মধ্যে একজন যথার্থ কবির আবির্ভাব হইয়াছে। "It looks as though we have at last a great poet among us again." ব্রাড্‌লের এই মত সংক্ষিপ্ত হইলেও সামান্য নহে।

স্টপফোর্ড ব্রুকের[৪] নিকট গীতাঞ্জলির একটি টাইপ-কপি প্রেরিত হয়। তিনি এই পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া লিখিতেছেন—"I send back the poems. I have read them with more than admiration; with gratitude for their spiritual help, and for the joy they bring and confirm and for the love of beauty which they deepen and for more than I can tell. I wish I were worthy of them."[৫]

কবি তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য উৎসুক; ব্রুক কিন্তু রোটেনস্টাইনকে বলিলেন, "কবিকে আনিবে, কিন্তু তাঁহাকে বলিয়ো যে আমি মহাত্মা নহি।" তাহার কারণ তিনিও পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বে বিশ্বাসী; তাঁহার ভয় ছিল রবীন্দ্রনাথ বুঝি অত্যন্ত puritan ও ascetic। গীতাঞ্জলি পাঠে অনেকেরই সেই ধারণা হয়। দেশে থাকিতে রবীন্দ্রনাথ ব্রুকের

১ ইংলণ্ডের ভাবুকসমাজ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৩১৯। পথের সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ ৫৩৮-৫৩৯।

২ পথের সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ ৫৩৬।

৩ Andrew Cecil Bradley, (1851-1935)। English literary critic, Author of *Shakespearean Tragedy* (1904), *Oxford Lectures on Poetry* (1909)

৪ স্টপফোর্ড ব্রুক Brooke, Stoford Augustus (১৮৩২-১৯১৬) ইংলণ্ডের যশস্বী লেখক। ১৮৫৭ সালে ইনি পাদরি হন এবং ১৮৭২-এ মহারানী ভিক্টোরিয়ার পুরোহিত (chaplain) পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু ১৮৮০ সালে চার্চ অব্‌ ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া ইউনিটেরিয়ান বা একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টীয় সংঘে প্রবেশ করেন। ধর্মোপদেশের লেখক ছাড়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল সাহিত্যশাস্ত্রী রূপে; ইংরেজি সাহিত্যের অনেকগুলি গ্রন্থের তিনি রচয়িতা এবং বইগুলি সাহিত্যের standard রচনা বলিয়া এখনো পরিচিত।

৫ দ্র পত্র নং ৮ (নিজ সংগ্রহ) ২২ অক্টোবর ১৯১২। সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত।

Sunshine and Shadow, Onward Cry প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন ; তা ছাড়া তিনি একেশ্বরবাদী বা unitarian বলিয়াও কবির আকর্ষণ ছিল। ব্রুক সম্বন্ধে কবি লিখিতেছেন, "তিনি বৃদ্ধ, বোধ করি তাঁহার বয়স সত্তর বছর পার হইয়া গিয়াছে।...ইঁহার শরীরমনে বার্ধক্য তাহার জয়পতাকা তুলিতে পারে নাই। আশ্চর্য ইঁহার নবীনতা। আমার বার বার মনে হইতে লাগিল, বৃদ্ধের মধ্যে যখন যৌবনকে দেখা যায় তখনই তাহাকে সকলের চেয়ে ভালো করিয়া দেখা যায়। কেননা, সেই যৌবনই সত্যকার জিনিস।" রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার বৃদ্ধবয়সে যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা কবির এই উক্তির সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। কবি লিখিতেছেন, "ইঁহার ধর্মোপদেশ ও কাব্যসমালোচনা আমি পূর্বেই পড়িয়াছি। সেদিন দেখিলাম, ছবি আঁকাতেও ইঁহার বিলাস। ইঁহার আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি ঘরের কোণে অনেক জমা হইয়া আছে। এগুলি সব মন হইতে আঁকা। আমার চিত্রশিল্পী বন্ধু এই ছবিগুলি দেখিয়া বিশেষ করিয়া প্রশংসা করিলেন। এ ছবিগুলি যে প্রদর্শনীতে দিবার বা লোকের মনোরঞ্জন করিবার জন্য তাহা নহে, ইহা নিতান্তই মনের লীলা মাত্র।"[১]

বৃদ্ধবয়সে কবিরও ছবিআঁকার বিলাসের কথা যথাস্থানে আলোচিত হইবে ; এই চিঠিখানি যখন লেখেন তখন তিনিও জানিতেন না যে তিনিও একদিন এমনিভাবে আপনার মনের লীলা রঙের খেলায় প্রকাশ করিবেন।

ব্রুক ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অনেকক্ষণ নিভৃত আলাপ চলিল। কবি লিখিতেছেন, "তাঁহার কথাবার্তা হইতে আমি এইটে বুঝিলাম যে, খ্রীষ্টান ধর্মের বাহ্য কাঠামো, যেটাকে ইংরেজি ভাষায় বলে creed, কোনোকালে তাহার যেমনই প্রয়োজন থাক্, এখন তাহাতে ধর্মের বিশুদ্ধ রসপ্রবাহের বাধা ঘটাইতেছে।...তিনি আমাকে বলিলেন, 'তোমার এই কবিতাগুলিতে কোনো ধর্মের কোনো creed-এর কোনো গন্ধ নাই ; ইহাতে এগুলি আমাদের দেশের লোকের বিশেষ উপকারে লাগিবে বলিয়া আমি মনে করি।'"

ব্রুকের সহিত কবির যে নানা আলোচনা হয়, তাহার মধ্যে জন্মান্তর সম্বন্ধে আলোচনাটি উল্লেখযোগ্য। কবি লিখিতেছেন, "কথায় কথায় তিনি এক সময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি জন্মান্তরে বিশ্বাস করি কি না। আমি বলিলাম, আমাদের বর্তমান জন্মের বাহিরের অবস্থা সম্বন্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট কল্পনা আমার মনে নাই এবং সে সম্বন্ধে আমি চিন্তা করা আবশ্যক মনে করি না। কিন্তু, যখন চিন্তা করিয়া দেখি তখন মনে হয়, ইহা কখনো হইতেই পারে না যে, আমার জীবনধারার মাঝখানে এই মানবজন্মটা একেবারেই খাপছাড়া জিনিস— ইহার আগেও এমন কখনো ছিল না, ইহার পরেও এমন কখনো হইবে না, যে কারণবশত জীবনটা বিশেষ দেহ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে সে কারণটা এই জন্মের মধ্যেই প্রথম আরম্ভ হইয়া এই জন্মের মধ্যেই সম্পূর্ণ শেষ হইয়া গেল। শরীরী জন্ম পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইতে হইতে আপনাকে পূর্ণতর করিয়া তুলিতেছে এইটেই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু, পূর্বজন্মে কোনো মানুষ পশু ছিল এবং পরজন্মেই সে পশুদেহ ধরিবে এ কথাও আমি মনে করিতে পারি না। কেননা, প্রকৃতির মধ্যে একটা অভ্যাসের ধারা দেখা যায় ; সে ধারার হঠাৎ অত্যন্ত বিচ্ছেদ ঘটা অসংগত। স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুক বলিলেন, তিনিও জন্মান্তরে বিশ্বাসটাকে সংগত মনে করেন। তাঁহার বিশ্বাস, নানা জন্মের মধ্য দিয়া যখন আমরা একটা জীবনচক্র সমাপ্ত করিব, তখন আমাদের পূর্বজন্মের সমস্ত স্মৃতি সম্পূর্ণ হইয়া জাগ্রত হইবে। এ কথাটা আমার মনে লাগিল। আমার মনে হইল, একটা কবিতা পড়া যখন আমরা শেষ করিয়া ফেলি তখনি তাহার সমস্তর ভাবটা পরস্পর গ্রথিত হইয়া আমাদের মনে উদিত হয় ; শেষ না করিলে সকল সময় সেই সূত্রটি পাওয়া যায় না। আমরা প্রত্যেকে একটা অভিপ্রায়কে অবলম্বন করিয়া এক-একটা জন্মমালা গাঁথিয়া চলিয়াছি ; গাঁথা শেষ হইলেই যে একেবারেই ফুরাইয়া যায় তাহা নহে, কিন্তু একটা পালা শেষ হইয়া যায়। তখনি সমস্তটাকে স্পষ্ট করিয়া

১ বিলাতের চিঠি। [স্টপফোর্ড ব্রুক] প্রবাসী ১৩১৯ কার্তিক। পথের সঞ্চয় ১৩১৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬৩, পৃ ৫২৮-৫৩৩।

গ্রহণ করিতে পারি।"[১]

এদিকে রোটেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার বন্ধুমহলে পরিচিত করিবার জন্য আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। তাঁহার বাড়িটি ইংলণ্ডের অনেক খ্যাত ও উদীয়মান লেখক-লেখিকার মিলনভূমি। আইরিশ কবি য়েট্‌স্, ইংরেজ কবি মেস্‌ফীল্‌ড, আরনেস্ট রীহ্‌স্, কুমারী সিনক্লেয়ার, এভেলিন আন্‌ডারহিল, রবার্ট ট্রেভেলিন, ফক্স-স্ট্রাংওয়েস, তরুণ কবি এজরা পাউণ্ড, মিল্লাল পরিবারের অনেকে সেখানে আসেন। একদিন সন্ধ্যায় (৩০ জুন) তাঁহার গৃহে একটি বৈঠক আহূত হইল; সেই সভায় য়েট্‌স্ ছিলেন, কবির কয়েকটি কবিতা তিনিই আবৃত্তি করিয়া শোনান। সেদিন সে-সভায় কয়টিই বা লোক ছিল, তবে যাঁহারা ছিলেন সকলেই সাহিত্যরসিক অথবা সাহিত্যিক।

এই সান্ধ্যসভায় (৩০ জুন) যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— তিনি হইতেছেন রেভারেণ্ড সি. এফ. এন্‌ড্রুস্। আজ এন্‌ড্রুসের নাম ভারতবর্ষে সুপরিচিত। তখন সেরূপ ছিল না। মডার্ন রিভিউ (১৯১২ অগস্ট) পত্রিকায় তাঁহার লিখিত 'রবীন্দ্রসকাশে এক সন্ধ্যায়' (An evening with Rabindra) প্রবন্ধ পাঠ করিলে জানা যায় যে তিনি দূর হইতেই বাংলার এই কবির প্রতি কী শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। এন্‌ড্রুস্ ভারতবর্ষে কবিকে কখনো দেখেন নাই, তিনি থাকিতেন দিল্লীতে— সেণ্ট স্টিফেন্‌স কলেজের অধ্যাপক (১৯০৪)। ভারতে থাকিতেই তিনি কবির রচনার (অনুবাদ) নিয়মিত পাঠক ছিলেন। কবির সহিত বিলাতে তাঁহার এই সামান্য পরিচয় অল্পকালের মধ্যে চিরজন্মের বন্ধনে পরিণত হইয়াছিল।

ব্যক্তিগতভাবে কবির সঙ্গে অনেকে পরিচিত হইলেও, ব্যাপকভাবে তাঁহাকে পরিচিত করিবার জন্য য়েটস্ প্রমুখ সাহিত্যিকগণ উৎসুক হইলেন।[২] ইহাদের চেষ্টায় ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে (১২ জুলাই ১৯১২) ট্রকেডারো হোটেলে রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনার ব্যবস্থা হইল। এইখানে ইণ্ডিয়া সোসাইটি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন, কারণ এই সমিতিই কয়েক মাস পরে কবির 'গীতাঞ্জলি'র প্রথম নির্দিষ্ট সংখ্যক বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করিয়া কবিকে পাশ্চাত্য জগতে পরিচিত করিলেন।

কয়েক বৎসর পূর্বে বিলাতের কোনো সভায় সার্ জর্জ বার্ড উড[৩] একটি বক্তৃতায় ভারতের কারুশিল্পের (crafts) প্রচুর প্রশংসা করিয়া বলেন যে, চারুশিল্প (fine art) বলিতে ভারতে কিছুই নাই। বুদ্ধের মূর্তিকে তিনি boiled suet pudding-এর সহিত তুলনা করেন। এই বক্তৃতা শুনিয়া রোটেনস্টাইনের এমনি বিরক্তি বোধ হয় যে, তিনি তদ্দণ্ডেই ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপনের সংকল্প গ্রহণ করেন। ইহার পর হ্যাভেলের গৃহে এক বৈঠকে এই সমিতির স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন ডক্টর ও মিসেস হেরিংহাম,[৪] টমাস আর্নলড,[৫] রজার ফ্রাই,[৬] ডক্টর এফ টমাস,[৭] রোল্‌স্‌টন্,[৮] হ্যাভেল, রোটেনস্টাইন প্রভৃতি কয়েকজন সাহিত্য অথবা শিল্পরসিক।

১ পথের সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ ৫৩০-৫৩১।

২ Yeats, William Butler (1865-1939), Irish poet and dramatist, য়েটস্ গীতাঞ্জলির টাইপ-কপি পাইয়া অবধি মুগ্ধ। তিনি লিখিয়াছেন, "I have carried in the manuscript of these translations about with me for days, reading it in railway trains or in the top of omnibuses and in restaurants and I have often had to close it lest some stranger would see how much it moved me."

৩ Birdwood, Sir George Christopher Molesworth (1832-1917) Medical practitioner, Bombay 1858-68. Served 30 years in the India office.

৪ মিসেস হেরিংহাম অজন্টার ছবি বহু ব্যয়ে কপি করান।

৫ টমাস আর্নল্ড (১৮৬৪) ছিলেন ইসলাম ধর্ম ও সাহিত্যের খ্যাতনামা পণ্ডিত ও মুসলীম শিল্পের সমঝদার।

৬ Fry, Roger Elliot (1866-1934) English painter & art critic.

৭ ফ্রেডারিক উইলিয়াম টমাস (১৮৬৭-১৯৫৬)। ইণ্ডিয়া অপিসের লাইব্রেরিয়ান. বহু ভাষাবিৎ সংস্কৃত পণ্ডিত।

৮ Rolleston, Thomas William (1857-1920) Journalist & Essayist.

ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে সংবর্ধনা হইবার দুই দিন পূর্বে এমার্সন ক্লাবে Union of East and West নামক সভার তরফ হইতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংবর্ধনা হয়। এই সভার উদ্যোক্তা ছিলেন কেদারনাথ দাশগুপ্ত। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে এই কেদারনাথ সাত বৎসর পূর্বে স্বদেশীযুগের প্রারম্ভে 'ভাণ্ডার' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ (১৩১২ ও ১৩) করেন, তাহার সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিলাতে আসিয়া ভারতের সাহিত্য দর্শন আর্ট সংগীত অভিনয়াদি প্রচার করিবার অভিপ্রায়ে তিনি 'ইউনিয়ন অব ঈস্ট অ্যাণ্ড ওয়েস্ট' নামে সমিতি স্থাপন করেন। সুতরাং বিলাতে রবীন্দ্রসংবর্ধনার আদি গৌরব বাঙালিরই প্রাপ্য।

ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে আহূত ট্রোকাডেরো হোটেলে সান্ধ্যসভায় ইংলণ্ডের প্রায় সকল বড় বড় সাহিত্যিক এবং সুধীবর্গ উপস্থিত ছিলেন। কবি য়েটস ছিলেন সভাপতি। এইচ. জি. ওয়েল্‌স্ উপস্থিত ছিলেন— সোস্যালিষ্ট এবং ঔপন্যাসিক বলিয়া তখন তাঁহার খ্যাতি; মিস্ মে. সিন্‌ক্লেয়ার[1] একজন প্রসিদ্ধ উপন্যাস-রচয়িত্রী। নেভিন্‌সন্,[2] হ্যাভেল, রোটেনস্টাইন তো সুপরিচিত নাম। রটলস্‌টন্ ছিলেন, তিনিও একজন উদীয়মান কবি। একটা বিরাট জনতাময় সভা না করিয়া ইণ্ডিয়া সোসাইটি যে এই বাছা বাছা লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া কবিসংবর্ধনার আয়োজন করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহারা তাঁহাদের সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন।

কবি য়েটস সেদিন কবিকে যে স্তুতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেরই নিকট অতিবাদ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা য়েটসের কাব্যের সহিত পরিচিত, যাঁহারা আধুনিক সাহিত্যের রহস্যঘোরের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া জানিয়াছেন কী ব্যাকুলতা তখন ইউরোপীয় চিত্তে প্রকাশের জন্য ছটফট করিতেছে— তাহারা য়েটসের স্তুতিবাদকে কখনই অতিশয়োক্তি বলিবেন না। যাহা হউক, য়েটসের সমস্ত কথাগুলির অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল—

"একজন শিল্পীর জীবনে সেইদিন সকলের চেয়ে বড় ঘটনার দিন, যেদিন তিনি এমন একজন প্রতিভার রচনা আবিষ্কার করেন, যাহার অস্তিত্ব তিনি পূর্বে অবগত ছিলেন না। আমার কাব্যজীবনে আজ এই একটি মহৎ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে যে অদ্য আমি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সংবর্ধনা ও সম্মান করিবার ভার পাইয়াছি। গত দশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার লিখিত প্রায় ১০০টি গীতি-কবিতার গদ্যানুবাদের একটি খাতা আমি আমার সঙ্গে সঙ্গে করিয়া ফিরিতেছি। আমার সমসাময়িক এমন কোনো ব্যক্তিকে আমি জানি না, যিনি এমন কোনো রচনা ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন— এই কবিতাগুলির সহিত যাহার তুলনা হইতে পারে। এই অবিকৃত গদ্যানুবাদগুলি পাঠে আমি দেখিতে পাইতেছি যে, কি রচনারীতিতে, কি চিন্তায়, ইহারা অতুলনীয়। বহুশত বৎসর পূর্বে একদা ইউরোপে এই রচনারীতি পরিচিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ একজন বড় গীতরচয়িতা— তাঁহার কবিতাতে তিনি সুর বসাইয়া থাকেন এবং তারপর তিনি সেই কবিতা ও গান কাহাকেও শিক্ষা দেন। এবং এইরূপে মুখে মুখে সেই গান তাঁহার দেশবাসী কর্তৃক গীত হইয়া চলিতে থাকে— যেমন তিন চারি শতাব্দী পূর্বে ইউরোপে কবিতা গীত হইত। ইঁহার সকল কবিতার একটি মাত্র বিষয়— ঈশ্বরের প্রেম।) আমি যখন ভাবিয়া দেখিলাম যে, আমাদের পশ্চিম দেশে এমন কি গ্রন্থ আছে যাহার সহিত ইহাদের তুলনা করা যাইতে পারে, তখন আমার মনে পড়িল টমাস্ এ-কেম্পিসের "খৃস্টের অনুকরণের" কথা। ইহারা সদৃশ বটে— কিন্তু এই দুই ব্যক্তির রচনায় কী আকাশপাতাল প্রভেদ। পাপের চিন্তার দ্বারা টমাস্ এ-কেম্পিস্ কিরূপ গুরুতররূপে অধিকৃত— কী ভীষণ উপমার সাহায্যে তিনি তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু যে শিশু লাটিম লইয়া খেলা করিতেছে, সে যেমন পাপের চিন্তা জানে না— ঠিক তেমনই এই কবিও পাপ সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তা ব্যয় করেন নাই। টমাস্ এ-কেম্পিসের মধ্যে

১ Sinclair May (1865 (?)-1946). Poet, Writer and Philosopher. First novel—*The Divine Fire* (1904).

২ Nevinson, Henry Woodd (1856-1941). Journalist, Writer.

প্রকৃতির প্রতি প্রেমের কোনো স্থান নাই, তাঁহার কঠোর চিত্তের মধ্যে সেরূপ প্রেম প্রবেশ করিতে পারিত না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির প্রেমিক— তাঁহার কবিতার মধ্যে প্রকৃতির অনেক সৌন্দর্যের সূক্ষ্মরেখাপাত হইয়াছে, যাহা তাঁহার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও গভীর প্রেমেরই পরিচায়ক।"[১]

য়েট্‌স্ ইহার পর কবির অনুবাদিত তিনটি কবিতার গদ্যানুবাদ পাঠ করেন। তাহার মধ্যে একটি কবিতা নৈবেদ্যের। 'জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যেক্ষণে' এবং 'মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর'— মৃত্যুর উপরে এই দুইটি কবিতাকে ভাঙিয়া ইংরেজি অনুবাদে একটি করিয়া লওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়টি গীতাঞ্জলির একটি গান— 'শ্রাবণঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে'। য়েট্‌সের পর দু একজন কিছু বলিবার পরে কবি স্বয়ং সেই সভায় যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার স্বাভাবিক বিনয় রহস্যপ্রিয়তা এবং দূরদর্শিতা সমস্তই একাধারে ফুটিয়াছে। তাঁহার বক্তৃতাটিরও বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল—

"আজ এই সন্ধ্যায় আপনারা আমাকে যে সম্মানে সম্মানিত করিলেন, আমার ভয় হয়, যে ভাষার মধ্যে আমি জন্মগ্রহণ করি নাই সে ভাষায় আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইবার যথেষ্ট ক্ষমতা আমার নাই। আশা করি আপনারা আমাকে মার্জনা করিবেন— আপনাদের এই গৌরবান্বিত ভাষায় যদিও আমার সামান্য জ্ঞান আছে— তথাপি আমি কেবল আমার নিজের ভাষাতেই ভাবিতে পারি এবং অনুভব করিতে পারি। আমার বাংলা ভাষা অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণা গৃহিণীর ন্যায় বরাবর আমার সমস্ত সেবা দাবি করিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁর রাজ্যে আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের অনধিকারপ্রবেশকে তিনি প্রশ্রয়মাত্র দেন নাই। সেইজন্য আমি কেবলমাত্র আপনাদিগকে একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি যে, এ দেশে আসা অবধি যে নিরবচ্ছিন্ন প্রীতি দ্বারা আপনারা আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আমাকে এত মুগ্ধ করিয়াছে যে আমি প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না। আমি একটি শিক্ষালাভ করিয়াছি— এবং সহস্র মাইল পথ সেই শিক্ষালাভের জন্য আমার আসা সার্থক— যে, যদিও আমাদের আচারব্যবহার সমস্তই পৃথক তথাপি ভিতরে ভিতরে আমাদের হৃদয় এক। নীলনদীর তীরে যে বর্ষার মেঘ উৎপন্ন হয় সে যেমন সুদূর গঙ্গার উপত্যকাকে শস্যশ্যামল করিয়া দেয়, তেমনি পূর্বাকাশের সূর্যালোকের অনিমেষ দৃষ্টির নিম্নে যে আইডিয়া আকারপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাকে হয়ত সমুদ্রপার হইয়া পশ্চিমে আসিতে হইবে— সেখানকার মনুষ্যহৃদয়ের মধ্যে তাহার সম্ভাষণ লাভের জন্য সেখানকার সমস্ত সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণ করিবার জন্য। প্রাচী প্রাচীই এবং প্রতীচীও প্রতীচী সন্দেহ নাই এবং ঈশ্বর না করুন যে ইহার অন্যথা হয়— তথাপি এই উভয়ই মিলিতে পারে।—না—সখ্যে, শান্তিতে এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ পরিচয়ে ইহারা একদিন মিলিবেই। ইহাদের ভিতরে প্রভেদ আছে বলিয়াই ইহাদের মিলন আরও সফল মিলন হইবে— কারণ সত্যকারের প্রভেদ কখনই বিলুপ্ত হইবার নয়— তাহা ইহাদের উভয়কে বিশ্বমানবের সাধারণ বেদিকার সম্মুখে এক পবিত্র বিবাহবন্ধনে মিলিত করিবার দিকেই লইয়া চলিবে।"

ইহার পর কবির কাছে নানা স্থান হইতে ভক্তির অর্ঘ্য বহন করিয়া যেসকল পত্র আসিয়াছে তন্মধ্যে দুইজন স্ত্রী-কবির পত্রই শুনাইবার মত। কুমারী র‍্যাডফোর্ড লিখিয়াছেন, "যেদিন প্রথম বাইবেলের কয়েকটি অংশ পাঠ করিয়াছিলাম সেই দিনটি বাদে, আমার মনে পড়ে না যে গতরাত্রে যেমন অনুভব করিয়াছিলাম জীবনে আর কোনোদিন সেরূপ অনুভব করিয়াছি কি না।" কুমারী সিনক্লেয়ার লিখিয়াছেন, "আপনার কবিতাগুলির যে কবিত্ব হিসাবে একটি সম্পূর্ণতা এবং অখণ্ড সৌন্দর্য আছে মাত্র তা নয়— কিন্তু যে অতীন্দ্রিয় জিনিস বিদ্যুৎচমকের মত আসে, যাহা অনিশ্চয়তার বেদনায় অন্তরকে পীড়া দিতে থাকে— সেই তাহারই একটি চিরন্তন রূপ ইহাদের মধ্যে আমি পাইলাম। একজন লোক আরেকজনের চোখ দিয়া দেখিতে পারে কিনা আমি জানি না, বোধ হয় পারে না; কিন্তু একজনের অন্তরের সুদৃঢ় প্রত্যয়

১ দ্র. ইংলণ্ডে সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা, প্রবাসী ১৩১৯ ভাদ্র, পৃ ৫৬১-৫৬৬।

নিশ্চয় আর-একজনের বিশ্বাসকে জাগায়। St. John of the Cross[১] "আত্মার অন্ধকার রাত্রি" নামক কবিতাটি ছাড়া আপনার কবিতার তুলনা খুঁজিয়া পাই না— কিন্তু আপনি একটি পরিপূর্ণ অদ্বৈত বোধে এবং একটি অধ্যাত্ম তত্ত্বদৃষ্টিতে St. John এবং অপর সকল খ্রীষ্টান কবিকেই অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্টান 'মিস্টিসিজম্' ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপমায় পরিপূর্ণ; সে যথেষ্ট সূক্ষ্ম নয়— জগতের মায়াবরণ ভেদ করিয়া সে সত্যকে দেখে নাই। সেই জন্য তাহার হৃদয়াবেগ যথেষ্ট নির্মল নয়। তাহার এই অসম্পূর্ণতা আমাকে কোনোদিনই সন্তোষ দেয় নাই। কিন্তু যে পরিপূর্ণ তৃপ্তিটি আমি চাই, গতরাত্রে আপনার কাব্যই আমাকে দিয়াছে। আপনি অতি স্বচ্ছসুন্দর ইংরেজিতে এমন জিনিস আনিয়া দিয়াছেন যাহা আমি ইংরাজিতে কেন, কোনো পাশ্চাত্য ভাষায় কোনোদিন দেখিব না ভাবিয়া নিরাশ হইয়া গিয়াছিলাম।"

হাউস্ অব্ কমন্সে ভারতবর্ষীয় বজেট্ আলোচনাকালে সহকারী সচিব মিঃ মণ্টেগু[২] কবির বক্তৃতার যে উল্লেখ করিয়াছিলেন বা ইংলণ্ডের টাইমস্ পত্রে যে তাঁহার সম্বন্ধে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, তাহা আমরা খুব উল্লেখযোগ্য মনে করি না। কারণ কবির যথার্থ সম্মান রসিকসমাজে— জনগণের হৃদয়মধ্যে— রাষ্ট্রদরবারে তাঁহার উল্লেখমাত্র তাহার তুলনায় অতি নগণ্য।

ইংলণ্ডের একজন প্রথিতনামা মনীষীর নিকট হইতে আমাদের জনৈক শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু যে পত্র পাইয়াছেন তাহার কিয়দংশের অনুবাদ এখানে দেওয়া সংগত বোধ হইতেছে। তিনি লিখিতেছেন—

"কবি আসিতেছেন শুনিয়া প্রথমটা যে আনন্দ হইয়াছিল, এখন তাঁহাকে নিকটে পাইয়া তদপেক্ষা কত যে বেশি আনন্দ হইতেছে তাহা আর বলিবার নয়। আমি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কল্পনা করিয়াছিলাম তাহার সমস্তই এই মধুরস্বভাব সাধুটির মধ্যে দেখিতে পাইতেছি এবং যাহা কল্পনা করি নাই এমনও বহু সদ্‌গুণরাশি দেখিতেছি। ইহার চেয়ে মহত্তর আত্মা কে কবে দেখিয়াছে— ইহার অপেক্ষা গভীরতর সত্যপ্রেরণা আর কোথায় মিলিয়াছে। আমি যে ইঁহার কবিতাকে কত উচ্চে আসন দিই তাহা আপনাকে আমি বলিতে পারি না— যদি বলি, তবে আপনি মনে করিবেন যে আমি বাড়াইয়া বলিতেছি। ইঁহার অন্তরতর গভীর অভিজ্ঞতা হইতেই ইঁহার সকল লেখার উৎপত্তি— তাহার মধ্যে নৈপুণ্য বা শক্তি ফলাইবার প্রয়াসমাত্র দেখি না— তাঁহার সমস্ত রচনাই এই বিশ্বজগতের প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান সৌন্দর্যের নম্রমধুর আবেগপূর্ণ হৃদয়োত্থিত স্তব-অর্ঘ্য। তাঁহার কাছে সেই সৌন্দর্যই বিশেষ ঐক্যের পরিপূর্ণ এবং সুস্পষ্ট প্রকাশ— অনন্ত বিশ্বসৌন্দর্য ভগবানের অনন্ত প্রেমের বাহ্যচিহ্ন মাত্র। সহস্র পদার্থে ইহাই তিনি দর্শন করেন এবং সহস্র রূপে জীবনের ও মৃত্যুর অক্লান্ত স্তবগানে ইহাই তিনি ব্যক্ত করেন। আপনাদের বাংলা ভাষায় যে ইঁহার কবিতার সৌন্দর্য কিরূপ, তাহা আমি আবছায়া-মত কল্পনা করিতে পারি মাত্র— কিন্তু ইঁহার কবিতার বাহ্যরূপটি না পাইলেও তাহার নিগূঢ়-গভীর অর্থ হৃদয়কে ব্যথিত ও আত্মাকে আলোড়িত করিবার পক্ষে যথেষ্ট। এই গদ্যানুবাদেও আমি এমন জিনিস পাই যাহা আর কোনো সমসাময়িক কাব্যের মধ্যে পাই না। এত বড় আপনাদের কবি, আপনাদের কী গর্বের কথা! বিশেষত যখন এত বড় কবির সঙ্গে এমন একটি চরিত্রের সম্মিলন ঘটিয়াছে। যদি এমন অনেক দূত আপনার দেশ হইতে এদেশে আসিতেন! এই কবিকে যে-কেহ দেখিয়াছেন, তিনিই ভালোবাসিয়াছেন, এবং ইংরেজিগদ্যে ইঁহার কবিতা অনুবাদিত হইবার জন্য ইঁহার প্রতি অনেকের গভীর ভক্তি হইয়াছে। সামনের শরতেই

১ Saint John of the Cross (St. Jean de la Croix 1549-91)। সাধ্বী থেরেসার (Saint Teresa 1515-82) শিষ্য। সাধ্বী জন্ স্পেনীশ ভাষায় যে কবিতা লেখেন তাহার ইংরেজি The obscure night of the soul (আত্মার অন্ধকার রাত্রি)। ইংরেজিতে Arthur Symons ইহার অনুবাদ করিয়াছেন। দ্র. *An anthology of world Literatures*, Ed. by Philo M. Buck. The Macmillan 1954. p 640-41।

২ Montague, Edwin Samuel (1879-1924) Parliamentary Under Secretary 1910-14. Sec. of States for India 1917-22.

ইণ্ডিয়া সোসাইটি কবির অনুবাদগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবেন এবং য়েট্স্ স্বয়ং তাহার ভূমিকা লিখিয়া দিবেন। আমার বিশ্বাস যে, এই গ্রন্থ বাহির হইলে বহু লোকের নিকট তাহা সমাদর লাভ করিবে।"

অনেকের ধারণা গীতাঞ্জলির অনুবাদ এনড্রুস, য়েট্স্ প্রভৃতির দ্বারা সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ইংরেজি রচনা সম্বন্ধে আদৌ অহংকৃত ছিলেন না, তিনি কবি য়েট্স্‌কে ঐগুলি মার্জিত করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "এই অনুবাদের কোনো কথা বদল করিয়া মার্জিত করিয়া তুলিতে পারা যায়, যদি কেহ এমন কথা বলে তবে সে সাহিত্য কী তাহা জানে না।" —প্রবাসী ১৩১৯ ভাদ্র, পৃ ৫৬৬:

মোট কথা, সেদিন ইংলণ্ডের অনেক সুধী স্বীকার করিয়াছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও ভাবুক, এ বিষয়ে তাঁহার তুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি জগতের কোনো দেশে নাই। ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান বলিলেন, "রবীন্দ্রনাথের আগমনে এ দেশে যে সম্মান সম্ভ্রম প্রশংসা ও কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং রসিকসমাজে যে সাড়া পড়িয়াছে এমনটি এযুগের লোকের জীবদ্দশায় কখনো কোনো প্রাচ্য অতিথির জন্য হইতে দেখা যায় নাই।" সাময়িক পত্রিকাদির স্তুতিবাদ ও ব্যক্তিবিশেষের ভক্তি-উচ্ছ্বাস কবিকে অত্যন্ত বিব্রত করিতেছে। কবিসংবর্ধনার যে বর্ণনা 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় বাহির হয় তাহাতে একটি খবর ছিল যে, কে-একজন ভারতীয় সিবিল সার্বিসের লোক কবিকে প্রণাম করেন। খবরটা ভুল জানাইয়া কবি অজিতকুমারকে যে পত্রখানি লেখেন, তাহাতে মানুষ রবীন্দ্রনাথের অন্তরের রূপটি প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি লিখিতেছেন, "পৃথিবীতে কবির দাবির উচ্চসীমা কোলাকুলি পর্যন্ত— প্রণামের দ্বারা তার জাত যায়; আমি কবি ছাড়া যে আর কিছু নই সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহমাত্র নেই। আমি তোমাদের হৃদয়ের সমভূমিতে দাঁড়াতে চাই···আমাকে ভুল আসনে তোমরা বসিয়ো না—।·· আমি তোমাদের বন্ধু, কিছু দেব, কিছু নেব।···গুরুর পদ আমার নয়, নয়, নয়। আমি নিজে কিছু শিখি নি এবং কাউকে শেখাতেও পারব না···।"[১] নিজের অন্তর্জীবন সম্বন্ধে কবির দীনতা এই পত্র মধ্যে যেমন ব্যক্ত হইয়াছে, নিজের কাব্য সম্বন্ধেও তাঁহার নিরভিমান আর-একখানি পত্রে তেমনি আন্তরিকতার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। কবি ইংরেজিতে যে কিছু লিখিবেন তাহা কখনো কল্পনা করেন নাই। তিনি ইন্দিরা দেবীকে আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া লিখিয়াছিলেন, "গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জমা···যে কেমন করে লিখ্‌লুম এবং কেমন করে লোকের এত ভালো লেগে গেল, সে কথা আমি আজ পর্য্যন্ত ভেবেই পেলুম না। আমি যে ইংরেজি লিখ্‌তে পারিনে এ কথাটা এমনি সাদা যে এ সম্বন্ধে লজ্জা করবার মত অভিমানটুকুও আমার কোনো দিন ছিল না।··রোটেনস্টাইন যখন কথাপ্রসঙ্গে আমার কবিতার নমুনা পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, আমি কুণ্ঠিতমনে তাঁর হাতে আমার খাতাটি সমর্পণ করলুম। তিনি যে অভিমত প্রকাশ করলেন সেটা আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না। তখন তিনি কবি য়েট্সের কাছে আমার খাতা পাঠিয়ে দিলেন।"[২]

গীতাঞ্জলিকে কেন্দ্র করিয়া য়েট্স্ ও বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে প্রীতির বন্ধন দেখা দিল, ইহার মধ্যে একটি বিশেষ কথা আছে। Circumstance বা অবস্থার উপর-যে art— এই কথা,[৩] এই দুই ভাবুক ও কবির রচনায় প্রকাশ পাইয়াছিল বলিয়া উভয়ের জন্য উভয়ের এতটা সমবেদনা— যদিও এসম্বন্ধে কেহই আত্মচেতন ছিলেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ য়েট্স্‌কে কেন মুগ্ধ করিয়াছিল, সে কথা তো য়েট্স্-এর মুখ হইতেই শোনা গিয়াছে। এখন য়েট্স্ (১৮৬৫) রবীন্দ্রনাথকে কেন মুগ্ধ করিল, তাহাও দেখা যাক। কবি লিখিতেছেন—

১ পত্র। Alfred Place W. London। দ্র প্রবাসী ১৩৪১ পৌষ, পৃ ৩৩৫।

২ চিঠিপত্র ৫। পত্র নং ১, ৬ই মে ১৯১৩ [২২ বৈশাখ ১৩২০] পৃ ১৯।

৩ Times, 7 Nov, 1912.

"ইংলণ্ডের বর্তমানকালের কবিদের কাব্য যখন পড়িয়া দেখি তখন ইহাদের অনেককেই আমার মনে হয়, ইঁহারা বিশ্বজগতের কবি নহেন। ইঁহারা সাহিত্যজগতের কবি। এ দেশে অনেক দিন হইতে কাব্যসাহিত্যের সৃষ্টি চলিতেছে, হইতে হইতে কাব্যের ভাষা উপমা অলংকার ভঙ্গী বিস্তর জমিয়া উঠিয়াছে। শেষকালে এমন হইয়া উঠিয়াছে যে, কবিত্বের জন্য কাব্যের মূল প্রস্রবণে মানুষের না গেলেও চলে। কবিরা যেন ওস্তাদ হইয়া উঠিয়াছে; অর্থাৎ, প্রাণ হইতে গান করিবার প্রয়োজনবোধই তাহাদের চলিয়া গিয়াছে এখন কেবল গান হইতেই গানের উৎপত্তি চলিতেছে। যখন ব্যথা হইতে কথা আসে না, কথা হইতেই কথা আসে, তখন কথার কারুকার্য ক্রমশ জটিল ও নিপুণতর হইয়া উঠিতে থাকে; আবেগ তখন প্রত্যেক্ষ ও গভীরভাবে হৃদয়ের সামগ্রী না হওয়াতে সে সরল হয় না; সে আপনাকে আপনি বিশ্বাস করে না বলিয়াই বলপূর্বক অতিশয়ের দিকে ছুটিতে থাকে; নবীনতা তাহার পক্ষে সহজ নহে বলিয়াই আপনার অপূর্বতা। প্রমাণের জন্য কেবলই তাহাকে অদ্ভুতের সন্ধানে ফিরিতে হয়।...

"এখনকার কাব্যসাহিত্যের যুগে কবি য়েট্‌স্ যে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছেন, তাহার গোড়াকার কথাটা ঐ। তাহার কবিতা তাহার সমসাময়িক কাব্যের প্রতিধ্বনির পন্থায় না গিয়া কবির নিজের হৃদয়কে প্রকাশ করিয়াছে।... কবি য়েট্‌সের কাব্যে আয়র্লণ্ডের হৃদয় ব্যক্ত হইয়াছে।" এইজন্য কবি-য়েট্‌সের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই মমত্ব। তিনি বলিতেছেন, "সকলেই জানেন, কিছুকাল হইতে অয়ের্লণ্ডে একটা স্বাদেশিকতার বেদনা জাগিয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের শাসন সকল দিক হইতেই আয়র্লণ্ডের চিত্তকে অত্যন্ত চাপা দিয়াছিল বলিয়াই এই বেদনা এক সময়ে এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক দিন হইতে এই বেদনা প্রধানত পোলিটিকাল বিদ্রোহ-রূপেই আপনাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। অবশেষে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা চেষ্টা দেখা দিল। আয়র্লণ্ড আপনার চিত্তের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করিয়া তাহাই প্রকাশ করিতে উদ্যত হইল।...আয়র্লণ্ড নিজের চিত্তস্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করিবার চেষ্টায় নিজের ভাষা কথা কাহিনী ও পৌরাণিকতাকে অবলম্বন করিবার যে উদ্যোগ করিয়াছে সেই উদ্যোগের মধ্যে এক-একজন অসামান্য লোকের প্রতিভা আপনার যথার্থ ক্ষেত্র পাইয়াছে। কবি য়েট্‌স্ তাঁহাদেরই মধ্যে একজন। ইনি আয়র্লণ্ডের বাণীকে বিশ্বসাহিত্যে জয়যুক্ত করিতে পারিয়াছেন।"[১] রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়াও ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী বিশ্ববাণীরূপে প্রকাশ পাইতেছে— সেইজন্য কবির প্রতি য়েট্‌সের এই অনুরাগ স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ আয়র্লণ্ডের ইতিহাস ও সাহিত্য সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিলেন, তাহা ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রযোজ্য। উভয় দেশই তখন ইংরেজদের পদানত এবং আপনার শাশ্বত আত্মাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল।[২]

বাহিরে আদর আপ্যায়ন দেখাশুনার পরেও কবির যে অপর্যাপ্ত সময় পড়িয়া থাকে নিরলসভাবে তিনি তাহার সদ্‌ব্যবহার করিতেছেন। গীতাঞ্জলির সমাদরে তৃপ্ত হইয়া তিনি তাহার অন্যান্য রচনা অনুবাদ করিতেছেন।

এই সময়ে কবির 'দালিয়া' গল্পের অভিনয়ের আয়োজন হইতেছে। দালিয়ার ইংরেজি করেন কেদারনাথ দাশগুপ্ত এবং উহাকে নাট্যীয় রূপ[৩]...দেন জর্জ কলডেরন (George Calderon)[৪]। ৩০শে জুলাই রয়েল আলবার্ট

১ কবি য়েট্‌স্ ১৯ ভাদ্র ১৩১৯, ৩৭ আলফ্রেড প্লেস, সাউথ কেন্‌সিংটন, লণ্ডন। প্রবাসী ১৩১৯ কার্তিক, পৃ ৪৪-৪৫। পথের সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ ৫২১-৫২৮।

২ আশ্চর্যের বিষয় য়েট্‌স্ বৃদ্ধ বয়সে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অশোভন উক্তি করিয়াছিলেন। য়েট্‌সের এই মনোবিকৃতির কারণ ও পটভূমি সম্বন্ধে শ্রীআদিত্য ওহ্‌দেদার 'ক্রান্তি' পত্রিকায় বহু বিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। ১৩৬২ বৈশাখ, পৃ. ১৫৯-৬৩।

৩ The Maharani of Arakan: A Romantic Comedy in one Act, adapted by George Calderon, from the Bengali short story *Daliya* by Rabindranath Tagore. Illustrated by Clarisa Miles with a character sketch [by Ramananda Chatterji, Ananda K. Coomarswami, Rev. C. F. Andrews, W. B. Yeats] of Rabindranath Tagore compiled by K(edar)n(ath) Dasgupta. Published by Francis Griffiths. London 1915 (p64),

৪ George Calderon (1868-1915) dramatist and writer : Served in the World War I and was reported missing at Dardanelles.

হল থিয়েটারে উহা অভিনীত হইল, সমস্ত ব্যবস্থা করেন কেদারনাথ। এই নাটকের জন্য কবি একটি ইংরেজি গান রচিয়া দেন— বোধ হয় ইহাই কবির একমাত্র ইংরেজি কবিতা যাহা সনাতনী রীতিতে ছন্দ ও মিল রাখিয়া লেখা। সুরও কবির নিজের দেওয়া। গানটি এই—

The bee is to come and the bee is to hum
Till the heart of the flower comes out.
The bud says 'yea', and the bud says 'nay',
She sways with a fear and a doubt.
O errant of wayward wings.
O guest of the sumptuous summer.
Give up thy hope, yet keep, yet keep up thy heart,
O sunny day's newcomer !
Whisper in tearful tunes untired
And wait with a faith devout.
For the bud says 'yea', and the bud says 'nay',
She sways with a fear and a doubt.

লণ্ডনে বাসকালে রবীন্দ্রনাথ সুবিধা ও সময় পাইলেই পাশ্চাত্য সংগীত[১] ও অভিনয় দেখিতে যাইতেন। তাঁহারা যখন লণ্ডনে পৌঁছিলেন, তখন তথায় সংগীতের আসর ভাঙিবার মুখে। তবুও তিনি গিয়া পাইলেন হাণ্ডেল্‌-উৎসব। ক্রিস্টাল প্যালেসের গীতশালায় বিখ্যাত জার্মান সংগীতস্রষ্টা হাণ্ডেল (George Frederic Handel 1685-1759) স্মরণে উৎসব— চারি সহস্র যন্ত্রী ও গায়ক তজ্জন্য মিলিত হইয়াছে; এই গীত-উৎসব হইতে ফিরিয়া কবির মনে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সংগীতকলার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যেসব চিন্তার উদয় হইতেছে তাহা তিনি 'সংগীত' নামক প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করেন।[২]

ভারতীয় সংগীত পাছে য়ুরোপের সংসর্গে পড়িয়া আপনাকে বিস্মৃত হয়, এই ভয়ের কথা আমরা চিরকাল শুনিয়া আসিয়াছি; রবীন্দ্রনাথ তাহা বিশ্বাস করেন না, তিনি বলেন তার উল্টা কথাই সত্য; "য়ুরোপীয় সংগীতের সঙ্গে ভালো করিয়া পরিচয় হইলে তবেই আমাদের সঙ্গীতকে আমরা সত্য করিয়া বড়ো করিয়া, ব্যবহার করিতে শিখিব।" "য়ুরোপের···প্রবল সজীব শক্তির প্রথম সংঘাতে কিছুকালের জন্য আমরা দিশা হারাইয়া থাকি, কিন্তু শেষকালে আমরা নিজের প্রকৃতিকেই জাগ্রততর করে পাই।···আমাদের শিল্পকলায় সম্প্রতি যে উদ্বোধন দেখা যাচ্চে তার মূলেও য়ুরোপের প্রাণশক্তির আঘাত রয়েছে।" সেইজন্য কবি স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন, "আমার বিশ্বাস সংগীতেও আমাদের সেই বাহিরের সংস্রব প্রয়োজন হয়েছে।" কয়েক বৎসর পর "সোনার কাঠি' (সবুজপত্র ১৩২২, পরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ৫২১-৫২৪) প্রবন্ধে, ভারতীয় সংগীত পাশ্চাত্য সংগীতকে গ্রহণ করিয়া বড় হইবে তাহার কথা স্পষ্টতর করিয়াই বলেন।[৩]

গ্রীষ্মকাল পড়িতেই লণ্ডনের ভিড় কমিয়া গেল। অগস্ট মাস "গ্রীষ্ম-ঋতুর অধিকারের মধ্যে গণ্য। সে সময়ে

১ রোটেনস্টাইনের স্টুডিয়োতে কবি একদিন Jelly d' Aranyi-র বেহালা শোনেন, ইনি অসাধারণ বেহালাবাদক ছিলেন। *Men and Memories* II, p 378.

২ সংগীত। ভারতী ১৩১৯ অগ্রহায়ণ, পৃ ৮৪৩-৪৯। পথের সঞ্চয়, পৃ ৬৪-৬৯। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ ৫৪০-৫৫৪।

৩ কবির মৃত্যুর পর গান্ধীজি যে শেষবার শান্তিনিকেতনে আসেন সে-সময়ে অধ্যাপকদের সহিত মিলিত হইয়া বিদ্যায়তন সম্বন্ধে বহু আলোচনা করেন; সেই সময়ে তিনি বলেন শান্তিনিকেতনে পাশ্চাত্য সংগীত চর্চা প্রবর্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শহরের লোক পাড়াগাঁয়ে হাওয়া খাইয়া আসিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে।" তাই কবিও অগস্ট মাসের গোড়ায় লণ্ডন ত্যাগ করিয়া পাড়াগাঁয়ে একটি পাদরীর বাড়িতে আশ্রয় লইলেন[১] পাড়াগাঁয়ের নাম বাটার্টন, স্ট্রাফোর্ডশায়ারের মুন্সিপাল বরো Newcastle-under-Lyne এর অন্তর্গত ক্ষুদ্র গ্রাম। সেখানে রেভারেণ্ড এনড্রুসের এক পাদরী বন্ধু (vicar) ছিলেন, তাঁহারই গৃহে কয়েকদিনের বাসের ব্যবস্থা তিনি করিয়া দেন। এন্ড্রুস কবিকে এক পত্রে লেখেন যে, ইংলণ্ড ত্যাগ করিবার পূর্বে তিনি যেন একবার সে-দেশের গৃহস্থবাড়ি দেখিয়া যান, শহরে তাহার অনেক রূপান্তর হইয়াছে।

নিমন্ত্রণকর্তা ছিলেন গ্রামের ভিকার— সিপাহী-বিদ্রোহযুগের বিখ্যাত সেনাপতি উট্রামের[২] পুত্র। গম্যস্থানের স্টেশন হইতে ভিকার তাঁহার খোলা ঘোড়ার গাড়ি করিয়া কবিকে গ্রামের বাড়িতে লইয়া চলিলেন— সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। এই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের পাদরীর সুন্দর সরল জীবনযাত্রা, কৃষকদের সহিত তাঁহার মিষ্ট সম্বন্ধ প্রভৃতি দেখিয়া নিজদেশের গ্রামের দৈন্যের কথা বারে বারে কবির মনে হইতেছে। মধ্যবিত্ত পাদরির বাড়িঘরের পারিপাট্য পরিচ্ছন্নতাও তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। 'নিজের চারিদিকের প্রতি শৈথিল্য যে নিজেরই অবমাননা তাহা ইহারা খুব বুঝে।' ইংলণ্ডের গ্রামের সৌন্দর্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তিনি লিখিতেছেন, "গ্রীষ্ম ঋতুতে ইংলণ্ডে ফুলপল্লবের যেমন সরসতা ও প্রাচুর্য এমন তো আমি কোথাও দেখি নাই। এখানে মাটির উপর ঘাসের আস্তরণ যে কী ঘন ও তাহা কী নিবিড় সবুজ তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না।"[৩]

কিন্তু এখানে থাকিতে থাকিতে তাঁহার মনে আধ্যাত্মিক ধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে নানা চিন্তার উদয় হইতেছে। প্রাচীন ধর্মমতের গোঁড়ামি সর্বত্র খসিয়া পড়িতেছে বলিয়াই য়ুরোপের পক্ষে তাহার অনির্বাণ প্রাণশক্তিকে রক্ষা করা সম্ভব হইতেছে। চলা য়ুরোপের ধর্ম। সেইজন্য খ্রীষ্টান ধর্মমত যেখানে গতিহীন তাহার বিরুদ্ধে তথাকার প্রবল প্রাণের প্রতিক্রিয়া চলিতেছে। "অবশেষে এখানকার মনীষীরা যাহাকে খ্রীষ্টানধর্ম বলিয়া পরিচয় দিতেছেন তাহা নিজের স্থূল আবরণ সম্পূর্ণ পরিহার করিয়াছে। তাহা ত্রিত্ববাদ মানে না, যিশুকে অবতার বলিয়া স্বীকার করে না, খ্রীষ্টান পুরাণ-বর্ণিত অতিপ্রাকৃত ঘটনায় তাহার আস্থা নাই, তাহা মধ্যস্থবাদীও নহে। য়ুরোপের ধর্মপ্রকৃতির মধ্যে খুব একটা আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে।" বিলাত যাইবার পূর্বেই কবি এই আন্দোলন সম্বন্ধে যে অনেক তথ্য অবগত হন তাহার কথা আমরা আভাস দিয়াছি। কিন্তু যে লৌকিক খ্রীষ্টধর্ম মিশনারীদের দ্বারা পৃথিবীর নানা স্থানে প্রচারিত হইতেছে কবির মতে তাহার মধ্যে কোনো গৌরব নাই ; তাহার কারণ তিনি বলেন যে,আজ পৃথিবীর খুব কম জায়গায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে, স্বজাতির অত্যাচারের বিরুদ্ধে পাদরীদের দাঁড়াইতে দেখা যায়। "এইজন্যই সমস্ত দেশ জুড়িয়া পাদ্রির দল বসিয়া থাকা সত্ত্বেও নিদারুণ দস্যুবৃত্তি ও কসাইবৃত্তি করিতে রাষ্ট্রনৈতিক অধিনায়কদের লেশমাত্র সংকোচ বোধ হয় না ; তাঁহাদের সেই পুণ্যজ্যোতি নাই যাহার সম্মুখে এই-সকল বিরাট পাপের কলঙ্ককালিমা সর্বসমক্ষে বীভৎসরূপে উদ্‌ঘাটিত হয়।"[৪]

বাটার্টন হইতে ফিরিয়া কবি গ্লস্টরশায়ারে যান রোটেনস্টাইন পরিবারের সঙ্গে; তাঁহারা ছিলেন চ্যালফোর্ড নামক এক গ্রামে— রেলস্টেশন হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে। এইখানে অগস্ট মাসটা কাটিয়া যায়। চ্যালফোর্ডে বাসকালে একদিন রোটেনস্টাইন, তাঁহার পত্নী ও কবি বেড়াইতে বেড়াইতে একটি স্থানে উপস্থিত হন,

১ পত্র। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত, ২২ শ্রাবণ ১৩১৯ [৭ অগস্ট ১৯১২]।—দ্র প্রবাসী ১৩৩২ অগ্রহায়ণ, পৃ ১৯৪।

২ Sire James Outram (1803-63).

৩ ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদরী, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮৩৪ শক ১৩১৯ পৌষ, পৃ ২২১। পথের সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ ৫৩৯-৫৪৭।

৪ ঐ পৃ ৫৪৭।

স্থানটি শিল্পীপ্রিয়ার অত্যন্ত পছন্দ হয় এবং ঐ স্থানটি কিনিয়া গৃহাদি সংস্কার করিয়া গ্রামে বাস করিবার সংকল্প জাগে। এই স্থানটি Far Oakridge নামে পরিচিত। আমেরিকা হইতে ফিরিয়া এইখানে কবি আসিয়া কয়েকদিন থাকিয়া যান।[১]

কবি চ্যালফোর্ড গ্রামের নিরালায় বসিয়া তত্ত্বোধিনী পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ ও পত্রধারা লিখিতেছেন। শিক্ষাসম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ এইস্থানে বসিয়া লেখা 'শিক্ষাবিধি'[২] ও 'লক্ষ্য ও শিক্ষা'[৩]। কবি লিখিতেছেন, "এখানে [বিলাতে] আসিবার সময় আমার একটা সংকল্প ছিল, এখানকার বিদ্যালয়গুলিকে ভালো করিয়া দেখিয়া-শুনিয়া বুঝিয়া লইব।" ইংলণ্ডে বাসকালে বিচিত্র কর্মের মধ্যে কবি সে সময় করিয়াছিলেন।[৪] শিক্ষাবিধি প্রবন্ধে কবি আমাদের দেশের শিক্ষার ও বিলাতের শিক্ষার মধ্যে মূলগত ভেদ কোন্‌খানে তাহা আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের দেশের শিক্ষার মধ্যে সমাজের যুগযুগান্তের সংস্কারের বোঝা রহিয়াছে; পশ্চিম হইতে আবার যে শিক্ষা আসিয়াছে তাহাও সংস্কারমুক্ত নহে, উহাও রাজকীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ছাঁচে-ঢালা; মোট কথা, আমাদের 'সামাজিক বিদ্যালয়ের পুরাতন শিকল ও রাজকীয় বিদ্যালয়ের নূতন শিকল দুইই আমাদের মনকে যে-পরিমাণে বাঁধিতেছে সে-পরিমাণে মুক্তি দিতেছে না'— ইহাই হইতেছে রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত।

আমরা যে-সময়ের কথা বলিতেছি—অর্থাৎ ১৯১২ সালের, তখনো 'জাতীয় শিক্ষা' লইয়া দেশের মধ্যে স্বদেশীযুগের আন্দোলন একেবারে নির্বাপিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ এককালে উহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবেই যুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রগতিপরায়ণ মন সে-যুগের সেই অভাবাত্মক জোড়াতালি দেওয়া 'জাতীয়' শিক্ষার সৌধনির্মাণে উৎসাহ হারাইয়াছিল; তাই তিনি লিখিতেছেন, "জাতীয় নামের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া আমরা কোনো-একটা বিশেষ শিক্ষাবিধিকে উদ্ভাবিত করিয়া তুলিতে পারি না। যে শিক্ষা স্বজাতির নানা লোকের নানা চেষ্টার দ্বারা নানাভাবে চালিত হইতেছে তাহাই জাতীয় বলিতে পারি। স্বজাতীয়ের শাসনেই হউক আর বিজাতীয়ের শাসনেই হউক যখন কোনো-একটা বিশেষ শিক্ষাবিধি সমস্ত দেশকে একটা কোনো ধ্রুব আদর্শে বাঁধিয়া ফেলিতে চায়, তখন তাহাকে জাতীয় বলিতে পারিব না — তাহা সাম্প্রদায়িক, অতএব জাতির পক্ষে তাহা সাংঘাতিক।" সেইজন্যই তিনি প্রবন্ধের অন্যত্র বলিতেছেন, "যেমন করিয়াই হউক আমাদের দেশের বিদ্যার ক্ষেত্রকে প্রাচীরমুক্ত করিতেই হইবে।"

অগস্ট মাসের শেষে কবি লণ্ডনে ফিরলেন। লণ্ডনে বাসা ভাড়া করিয়া গৃহস্থালি চালনা খুবই ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। সেইজন্য এবার তাঁহারা বাসা উঠাইয়া দিয়া আলফ্রেড প্লেসে ঘর (flat) লইলেন। সেখানে তাঁহারা মাস দুই কাল ছিলেন। এই সময় কবির সহিত বিচিত্র লোকের পরিচয় হয়, বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠতা হয় এন্‌ড্রুসের সহিত। ইহারই সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, তিনি 'পাদরীর চেয়ে খ্রীস্টান বেশী'। "এমন মানুষকে কেহ মনে করিতে পারে না

১ 'Then, when the summer came, we escaped to Gloucestershire, where Tagore joined us. It happened that the summer (1912) was one of the rainiest on record. 'A traveller always meets with exceptional conditions', said Tagore, when I apologised for the cold and rain, and the absence of the sun. When kept indoors, he busied himself with translations of more poems and plays." —*Men and Memories* II, p 266.

২ শিক্ষাবিধি। ৩১ শ্রাবণ ১৩১৯ (১৬ অগস্ট ১৯১২) চ্যালফোর্ড। প্রবাসী ১৩১৯ আশ্বিন, ৫৮৭। শিক্ষা, ১৩৫১ সং পৃ ১৬৩-৭০। পথের সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ ৫৬৭-৫৭৩।

৩ লক্ষ্য ও শিক্ষা। ১৯ অগস্ট ১৯১২, চ্যালেফোড। তত্ত্বোধিনী পত্রিকা ১৮৩৪ অগ্রহায়ণ, পৃ ১৮১-৮৪। শিক্ষা ঐ পৃ, ১৭১-১৭৯। পথের সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ ৫৭৩-৫৭৬।

৪ বিলাত হইতে কবি জীবনীলেখককে মণ্টেসরী শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা পাঠাইয়া দেন। বাংলায় আধা-তর্জমা করিয়া 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় বোধ হয় ইহা মণ্টেসরী সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধ।

যে 'ইনি আমাদের পক্ষের লোক নহেন, তিনি অন্য দলের'। ইহাই অত্যন্ত অনুভব করি, ইনি মানুষ—ইনি সত্যকে মঙ্গলকে সকল মানুষের মধ্যে দেখিতে আনন্দ বোধ করেন—তাহা খ্রীষ্টানেরই বিশেষ সম্পত্তি মনে করিয়া ঈর্ষা করেন না।"— ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রি, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ ৫৪১। এই বিশ্লেষণ যে কত সত্য তাহা দীনবন্ধু এনড্রুসের পরবর্তী জীবনধারা প্রমাণিত করিয়াছিল।

ইতিমধ্যে জানা গেল ইণ্ডিয়া সোসাইটি হইতে গীতাঞ্জলি প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কথা হইল সোসাইটির সদস্যদের জন্য কয়েকখানি কপি মাত্র মুদ্রিত হইবে। সেপ্টেম্বরের ৭ তারিখে য়েট্‌স্ রোটেনস্টাইনকে আয়ারল্যাণ্ড (Coole park, Gort, County Galway) হইতে লিখিতেছেন যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুচ্ছের জন্য এক ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহা দুই একদিনের মধ্যেই তাঁহাকে পাঠানো হইবে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভদ্রতা করিয়া কিছু ছাঁটকাট না করেন। "I don't want anything crossed out by Tagore's modesty".[১] কিন্তু তিন বৎসর পরে রবার্ট ব্রিজেস যখন তাহার *Spirit of Man* নামক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের একটি রচনা নিজে কবিতায় লিখিয়া কবির কাছে পাঠাইয়া দেন তখন তিনি রোটেনস্টাইনকে লেখেন, (৪ এপ্রিল ১৯১৫) "But since I have got my fame as an English writer I felt extreme reluctance in accepting alterations in my English poems by any of your writers." —*Men and Memories* II p. 300। রবার্ট ব্রিজেসের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত লেখকের সামান্য সহযোগিতা গ্রহণ করিতে কবি এখন বিমুখ। রোটেনস্টাইন লিখিতেছেন, "The changes he made seemed to me so suggestive that Tagore, I felt, would approve; but all didn't run smoothly." —*Ibid.* p 29। যাহাই হউক সেপ্টেম্বরে লণ্ডনে আসিয়া য়েট্‌স্ রবীন্দ্রনাথের সহিত কয়েকদিন বসিয়া পাণ্ডুলিপির প্রয়োজনীয় সংশোধনাদি করেন। এই সম্বন্ধে কবি রোটেনস্টাইনকে লিখিতেছেন, "Then came those delightful days when I worked with Yeats and I am sure the magic of his pen helped my English to attain some quality of permanance. It was not at all necessary for my own reputation that I should find my place in the history of your literature. It was an accident for which you were also responsible and possibly most of all Yeats. But yet sometimes I felt almost ashamed that I, whose undoubted claim has been recognised by my country-men to a sovereignty in our own world of letters, should not have waited till it was discovered by the outside world in its own true majesty and environment, that I should even go out of my way to court the attention of others having their own language for their enjoyment and use. At least it is never the function of a poet to personally help in the transportation of his poems to an alien form and atmosphere, and be responsible for any unseemly risk that may happen to them."[২]

রবীন্দ্রনাথ য়েট্‌স্-লিখিত ভূমিকা পাঠ করিয়া লিখিতেছেন, "সেটা পড়েছি। পড়ে লজ্জা বোধ হয়। এটা আমার বহুমূল্য অলংকার সন্দেহ নেই, কিন্তু যাকে বলে অতিশয়োক্তি অলংকার।"[৩]

যাহাই হউক কবির অনুবাদ-লেখনী নিরন্তর চলিতেছে। তিনি লিখিতেছেন, "আমার কবিতার একটা দ্বিতীয়

১ *Men and Memories*, p 267.

২ Since fifty, *Men and Memories* 1922-1938, Recollections of William Rothenstein, p 112-13

৩ পত্র। ২ আশ্বিন ১৩১৯ (১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১২)। প্রবাসী ১৩৪১ কার্তিক, পৃ ৪।

ভাগ প্রেসে দেবার জন্যে প্রস্তুত করছি। অনেকগুলোই তর্জমা করে ফেলেছি। তাতে নানা বিচিত্র রকমের কবিতা থাকবে— খুব হাল্কা থেকে খুব গম্ভীর। ওর মধ্যে ক্ষণিকার 'মাতাল' কবিতাটা পর্যন্ত দিয়েছি। আমার এই নানা সুরের কবিতাগুলো দেখে এরা আশ্চর্য বোধ করে, আমার এই মনিহারি দোকানে জিনিস তো কম জমেনি।" এক-বৎসর পরে এই কবিতাগুলি (১৯১৩ সনে) 'গার্ডনার' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

অন্যান্য রচনার মধ্যে চিত্রাঙ্গদা মালিনী এবং ডাকঘর তর্জমা হইয়াছে।[১] রোটেনস্টাইন এই অনুবাদগুলি রবার্ট ট্রেভেলিয়ান[২] নামক উদীয়মান নাট্যকার ও কবিকে দেখিতে দেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ট্রেভেলিয়ানের দেখা হয়। কবি লিখিতেছেন, "তিনি এ-সম্বন্ধে যে-রকম অভিমত প্রকাশ করলেন তাতে বোধ হচ্ছে এগুলো এ-দেশে চলবে— এমন-কি, তিনি এই নাটকগুলিকে অন্য তর্জমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে চান। ···ইনি নিজে গ্রীক পৌরাণিক কথা নিয়ে নাটক লিখে থাকেন। আমার এই লেখাগুলির মধ্যে তিনি সেই গ্রীক সাহিত্যের রস পান। আমাকে এনড্রুস সাহেব বলছিলেন 'মালিনী' পড়ে তাঁর গ্রীক নাটকের কথা মনে পড়ে। এনড্রুস সাহেবের সঙ্গে অল্প কয়দিনে আমার বিশেষ একটু হৃদ্যতা হয়েছে। বড় চমৎকার সহৃদয় লোকটি।"

এই সময়ে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন[৩] নামক এক প্রতিভাবান্ ছাত্র কবির 'রাজা' নাটক তর্জমা করেন। রবীন্দ্রনাথ য়েট্‌স্‌কে 'ডাকঘর' ও 'রাজা'র তর্জমা পড়িতে দেন; য়েট্‌স্ 'ডাকঘর'কে আইরিশ থিয়েটরে অভিনয় করাইবার আয়োজনে মন দিলেন।

সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের অধিকাংশটা লণ্ডনে কাটিয়া গেল, কবি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন; ভাবিয়াছিলেন 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত হইবার পর আমেরিকা রওনা হইবেন। কিন্তু মহানগরীর হট্টগোল পার্টি লাঞ্চ ডিনার অনুবাদ লইয়া আলোচনা ও গ্রন্থমুদ্রণ ব্যাপার লইয়া শলাপরামর্শ— তাঁহার আর ভালো লাগিতেছে না। তিনি অজিতকুমারকে লিখিতেছেন, "ইচ্ছা করে কোনো দূর সমুদ্রপারে আলোর দেশে গিয়ে ঘর বাঁধি···মানুষকে বিধাতা মন্থরগামী করে সৃষ্টি করেছেন··· নইলে আজ এমন সকালে কে আমাকে ধরে রাখতে পারত?"[৪] সুদূরের পিয়াসী কবিমনের ব্যর্থ ক্রন্দন।

পুনরায় লিখিতেছেন, "এখানকার বন্ধনজাল কাটিয়ে আবার একবার মুক্তিলাভ করবার জন্যে সমস্ত মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আমি শিলাইদহের নির্জন ঘরে বসে গীতাঞ্জলির তর্জমা করেছিলুম, সে আমার আপন মনের আনন্দে করেছিলুম। সেই বিজনতা থেকে একেবারে মানুষের ভিড়ের মাঝখানে এসে পড়েছি— এখন যা কিছু করচি সে তো আনন্দের কাজ নয়, সে তাগিদের কাজ। সে আমার বেশি দিন পোষাবে না।"[৫] তৎসত্ত্বেও দেশে ফিরিতে প্রায় এক বৎসর লাগিল।

লণ্ডনে বাসকালে অক্টোবরের শেষদিকে (২১।২২এ) আমেরিকা যাত্রার কয়েকদিন পূর্বে কবি হঠাৎ সুরুলের একটি ভাঙা কুঠিবাড়ি আট হাজার টাকায় ক্রয় করিয়া ফেলিলেন। ইহার মালিক ছিলেন কর্নেল নরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ— সার্

১ ২রা কার্তিক (১৮ অক্টোবর) একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "কাল রাত্রে য়েট্‌সের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ডাকঘরের তর্জমা তাঁর খুব ভাল লেগেছে। ওটা তিনি তাঁর আইরিশ থিয়েটারে অভিনয় করবার জন্য উৎসুক হয়েছেন। ···'রাজা' তর্জমা··· কাল রাত্রে Yeatsকে দিয়েছি, আমার বিশ্বাস এইটেই আমার সকল লেখার চেয়ে এঁদের ভালো লাগবে।" —প্রবাসী ১৩৪১ চৈত্র পৃ ৭৫২।

২ Robert C. Trevelyan (1872-1951) Translator of Greek dramas etc; poet and dramatist.

৩ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন আই. সি. এস. (জন্ম ১৮৮৮), ১৯১৩ সালে বোম্বাই সরকারে কাজ গ্রহণ করেন। পরে হাইকোর্টের জজ হন।

৪ পত্র। ১৫ আশ্বিন ১৩১৯। প্রবাসী ১৩৪১ কার্তিক, পৃ ৫-৬। পথের সঞ্চয়, পরিশিষ্ট, প্রথম সংস্করণ ১৩৪৬, পৃ ৮০।

৫ পত্র। ৩০ আশ্বিন ১৩১৯। প্রবাসী ১৩৪১ চৈত্র, পৃ ৭৫২।

(পরে লর্ড) সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের ভ্রাতা — বোলপুরের নিকটে একদা-বর্ধিষ্ণু রায়পুর নিবাসী। সুরুলের সেই কুঠিবাড়ি আজ বিশ্বভারতী গ্রামোন্নয়ন-বিভাগের কেন্দ্র, শ্রীনিকেতন নামে ভারতের সর্বত্রই উহা প্রসিদ্ধ। এই বাড়িটি ইস্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে নির্মাণকালে এতদঞ্চলের প্রধান ইঞ্জিনীয়ার মিঃ উইলসন্-এর দ্বারা নির্মিত হয়। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বোলপুর ছিল নগণ্য গ্রাম, সুরুলই ছিল বর্ধিষ্ণু গণ্ডগ্রাম। লুপলাইন রেল নির্মাণের কাজকর্ম এতদঞ্চলে শেষ হইয়া গেলে এ বাড়ি ও সংলগ্ন জমি রায়পুরের সিংহরা খরিদ করেন। সেই বাড়ি ও বিস্তৃত বাগান কবি কিনিলেন। সুরুলের বাড়ি কিনিবার পরদিন কবি সন্তোষচন্দ্রকে লিখিতেছেন, "রথীকে যে জিনিস নিয়ে আলোচনা করতে হবে তার জন্য ঐ বাড়ি ও বাগানের দরকার।...রথীর জন্য জমি সংগ্রহ করে বাড়ি ও laboratory তৈয়ারি করতে বিস্তর খরচ পড়বে এবং সে খুব সম্ভব আমার সাধ্যাতীত হবে; এই জন্য আমার আর্থিক দুর্গতি সত্ত্বেও এই বাড়ি কিন্‌তে হলো। রথীকে তোমাদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে আমি আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত হব। সেই প্রলোভনেই আমি নিতান্ত দুঃসাহসিকতার সঙ্গে এই একটি কীর্তি করে বসে আছি।" দেখা যাইতেছে শিলাইদহ সম্বন্ধে উৎসাহ পিতা-পুত্রের কমিয়া আসিতেছে।

ইতিমধ্যে কবির 'শরীরটা কিছু বিগড়েছে'। 'অর্শের রক্তপড়া কিছুদিন থেকে বেড়েছে'। এই রোগে বহুকাল হইতে তিনি ভুগিতেছেন— বিলাত আসার অন্যতম কারণ ছিল এই অর্শ চিকিৎসা। "অ্যালোপ্যাথদের মতে এ রোগে অস্ত্রাঘাত ছাড়া অন্য পন্থা নেই। তা হলে আমাকে অন্তত একমাস হাসপাতালে শয্যাগত হয়ে পড়ে থকতে হবে। সেটা আমার ভাল লাগচে না। তাই ঠিক করেচি আপাতত কিছুদিন আমরিকার ডাক্তার ন্যাসের দ্বারা হোমিওপাথিক চিকিৎসা করাব, তাতে যদি ফল না পাই তখন অস্ত্রচিকিৎসা করালেই হবে।"[১]

অতঃপর আমেরিকা যাত্রার সকল আয়োজন প্রস্তুত হইল। কবি লিখিতেছেন, "আমরা সূর্যাস্তের পথ অনুসরণ করতে চললুম। এবার অতলান্তিকের ওপারের ঘাটে পাড়ি দেওয়া যাচ্চে।"[২]

মার্কিনদেশে ছয়মাস

রবীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী ২৮ অক্টোবর (১৯১২॥১২ কার্তিক ১৩১৯) আমেরিকার নিউইয়র্ক মহা-নগরীতে পৌঁছিলেন; বিলাতে রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে দুইবার আসিয়াছিলেন— কিন্তু আমেরিকায় এই প্রথম পদার্পণ। সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশ, তাঁহারা হোটেলে উঠিলেন। এবার সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতা পূর্বপূর্ব বারের অভিজ্ঞতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি নিউইয়র্ক হইতে অজিতকুমারকে লিখিতেছেন, "সমুদ্র প্রথম কয়দিন যেরকম অশান্ত ছিল এমন আর কখনো আমি দেখিনি। এই দেহ-পাত্রের মধ্যে যেটুকু জীবন ছিল তাকে ঝাঁকানি দিয়ে দিয়ে তার অর্ধেকটা প্রায় বের করে ফেল্‌লে— যেটুকু বাকি ছিল তাতে কেবলমাত্র বেঁচে থাকা চলে, তার অতিরিক্ত আর কোনো কাজই চলে না। অন্ধকার ছোট্ট ক্যাবিনের খাঁচার মধ্যে অনাহারে পড়ে পড়ে কেবল ভাবছিলুম বরুণদেব করুণ হবেন কবে। মনে মনে মহাসমুদ্রকে একটা চতুর্দশপদী মানৎ করেছিলুম।"

পরদিন জগদানন্দ রায়কে লিখিতেছেন, "ডাঙায় নেমে এখনো শরীরটা ক্লান্ত হয়ে আছে। দিন রাত্রি নাড়া খেয়ে প্রাণটা যেন শরীর থেকে আল্‌গা হয়ে নড়্‌নড়্ করচে। সমুদ্র আমাকে যেন তার ঝুমঝুমি পেয়েছিল— দুহাতে ক'রে ডাইনে বাঁয়ে নাড়া দিয়েছিল, ভেবেছিল কবির পেটের মধ্যে ত্রিপদী চতুষ্পদী যা-কিছু আছে সমস্তয় মিলে একটা

১ পত্র।

২ পত্র। ২রা কার্তিক ১৩১৯। প্রবাসী ১৩৪১ চৈত্র, পৃ ৭৫২।

হট্টগোল বাধিয়ে তুলবে— কিন্তু উলটে পালটে খানাতল্লাসি ক'রে জঠরের মধ্য থেকে ছন্দোবন্ধের কোনো সন্ধানই যখন পাওয়া গেল না তখন মহাসমুদ্র আমাকে নিষ্কৃতি দিলেন।"[১] মীরাকে লিখিতেছেন, "যাক্ শেষকালে কাল (২৮ অক্টোবর) কূলে এসে পৌঁছন গেছে। ইংলণ্ডে বিদেশীদের সুবিধা এই যে, জাহাজ থেকে নামবার সময় কোনো উৎপাত নেই। এখানে মাশুল যাচাইয়ের ঘরে দুটি ঘণ্টা বন্দীর মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভারি কষ্ট গিয়েছে। এখন ত হোটেলে এসে আশ্রয় নিয়েছি।"[২]

বাহিরের জগৎ যেমনই অশান্ত হউক কবির অন্তরের জগৎ সেই ক্ষুব্ধতার মধ্যে আশ্চর্যরূপে শান্ত। মনের সেই নিগূঢ় অবস্থাটির কথা কবি একখানি পত্র মধ্যে লিখিয়াছিলেন, "একটা বড় আশ্চর্য জিনিস দেখলুম— শরীরে যখন কোথাও কিছুমাত্র আরাম নেই এবং চারি দিক যখন সঙ্কীর্ণরূপে বদ্ধ— তখন নিজের অন্তরতম শক্তি সেই সঙ্কীর্ণতার কোন একটুখানি ছিদ্রপথ দিয়ে অমৃত উৎস উৎসারিত করে দিয়েছিল।"[৩]

নিউইয়র্কে কয়েকদিন থাকিয়া তাঁহারা আর্বানা (ইলিনয়) যাত্রা করিলেন। রথীন্দ্রনাথ সন্তোষচন্দ্র ও নগেন্দ্রনাথ ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র; সেই সময়ে সেখানে শান্তিনিকেতনের বঙ্কিমচন্দ্র রায় ও সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণ নূতন ছাত্র হইয়া আসিয়াছেন। দেশে থাকিতে কবির সঙ্গে পত্রযোগে দুই-একজন অধ্যাপকের পরিচয় হইয়াছিল। আর্বানা ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কেন্দ্র; ইহার কয়েকটি বিষয় শিকাগোতেও পড়ানো হয়। আর্বানা ক্ষুদ্র শহর; বাসা পাইবার পূর্বে কয়েকদিন কবি থাকিলেন অধ্যাপক ব্রুকসের বাটিতে, রথীন্দ্র ও প্রতিমা দেবী উঠিলেন অধ্যাপক সীমুরের বাসায়। পরে যে বাড়িটি পাইলেন সেটি "বেশ ছোট খাটো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নিভৃত নিরালা।" আমেরিকায় দাসদাসী পাওয়া কঠিন; অনেক সময়ে কলেজের ছাত্ররা গৃহস্থের ঘরে কাজ করিয়া আহার ও অর্থের সংস্থান করে; তা ছাড়া ঘরে বিজলি গ্যাস জল প্রভৃতির সুব্যবস্থা থাকায় গৃহস্থালি কাজের ঝঞ্ঝাট অনেকখানি কম। ইহার উপর আমেরিকায় টিনেবদ্ধ খাদ্যদ্রব্য সবই প্রায় পাওয়া যায়, তজ্জন্য রন্ধনসমস্যাও খুব হালকা। এইসব কারণে প্রতিমা দেবীকে গৃহস্থালি করিতে হয়, অবকাশমত রথীন্দ্রনাথও এসব কাজে যোগ দেন। মোটকথা আর্বানায় কবির মন বেশ বসিয়াছে। "কোথাও কোনো গোলমাল নেই— আকাশ খোলা, আলো অপর্যাপ্ত, অবকাশ অব্যাহত। মাঝে মাঝে একেবারে ভুলে যাই যে আমেরিকায় এসেছি— ঠিক মনে হয় যেন দেশে আছি।" প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বিরোধ দৃষ্টিগোচর নয়। সেইজন্য এখানে এসে খুব একটা শান্তি উপভোগ করিতেছেন। আর ভাবিতেছেন, "কিছুদিন সবরকম লেখা থেকে ছুটি নিয়ে আরামে কেবল কষে বই" পড়িবেন।[৪]

কিন্তু আরামে বই পড়া হইল না। কয়েক দিনের মধ্যে বক্তৃতামঞ্চে উঠিতে হইল। স্থানীয় Unitarian বা একেশ্বরবাদীদের এক পাদরী (Mr. Vail)[৫] রবীন্দ্রনাথকে তাঁহাদের Unity clubএ উপনিষদ সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ লইয়া আসিলেন। উক্ত ক্লাবে 'প্রতি রবিবারে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় ও ধর্মগুরুদের সম্বন্ধে বক্তৃতা ও আলোচনা হইয়া থাকে'। সৌভাগ্যক্রমে কবির কাছে "বিশ্ববোধ" শীর্ষক ভাষণের অধ্যাপক সতীশচন্দ্র রায়[৬] কৃত

১ প্রবাসী ১৩২০ শ্রাবণ, পৃ ৪৬৭। পথের সঞ্চয়, পরিশিষ্ট, প্রথম সংস্করণ, পত্র, ১৩ কার্তিক ১৩১৯।

২ চিঠিপত্র ৪। পত্র ১২।২৯ অক্টোবর ১৯১২।

৩ পত্র। তুলনীয়— যাত্রী, পৃ ১২৯-১৩১। পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫। ক্রাকোভিয়া।

৪ পথের সঞ্চয় প্রথম সংস্করণ. পরিশিষ্ট, পৃ ৭৭ সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত। W. High Street, Urbana, Ilinois. U.S.A.

৫ Albert R. Vail and Emily M. Vail, *Heroic Lives in Universal Religion*, a maunal for religious instruction in junior grades.—The Beacon Press, 25 Beacon street Boston. Mass. এই গ্রন্থের ২২শ পরিচ্ছেদ হইতেছে A saint and a poet from India (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবন্ধ)।

৬ অধ্যাপক সতীশচন্দ্র রায় পরে আসামের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর হন এবং ইনি পরে বৈষ্ণব হইয়া যান। দ্র কবিপ্রণাম।

অনুবাদ ছিল ; সেই লেখাটাই পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া ক্লাবে পাঠ করিলেন, শ্রোতাদের মধ্যে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কয়েকজনও ছিলেন। লেখাটা তাঁহাদের ভালো লাগে— ফলে কবিকে পুনরায় পরবর্তী রবিবারে (১৭ নভেম্বর ১৯১২) তাহাদের গীর্জাঘরে বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। এবার বিষয় ছিল "আত্মবোধ"। কবি বড় দুঃখেই লিখিতেছেন, "ইংরেজি লিখতে আমার বিলম্ব হয়, কষ্ট হয়— তবু প্রতিদিন অল্প অল্প করে লিখে ফেলেছি।"

ইতিমধ্যে 'Wisconsin ও Iowa থেকে' তাঁহার আহ্বান আসিয়াছিল ; তাই লিখিতেছেন, "যদি যাই তারা নিশ্চয়ই আমাকে বক্তৃতা করতে বলবে— কারণ, আমেরিকানরা বক্তৃতা বর্ষণের চাতকপক্ষী। এই প্রবন্ধ দুটো ব্যবহার করতে পারব।" অজিতকুমারের নিকট হইতে 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালার কয়েকটি ভাষণের অনুবাদ পাইয়া কবি আশ্বস্ত হইলেন।

য়ুনিটেরিয়ানদের ক্লাবে এইভাবে চারটি বক্তৃতা দেওয়া হইল— বিশ্ববোধ (১০ নভেম্বর ১৯১২), আত্মবোধ (১৭ই), ব্রহ্মসাধন (২৪শে) ও কর্মযোগ (১ ডিসেম্বর)।[১] নূতন কাজের বোঝা তাঁহার খুব অপ্রীতিকর হয় নাই। তিনি আবিষ্কার করিলেন যে, বিলাতে তাঁহার সময় গিয়াছিল পদ্য ও নাট্যসাহিত্য তর্জমায়। আর আমেরিকায় দিন যাইতেছে গদ্যসাহিত্য রচনায়। আশ্চর্যের বিষয়, আমেরিকায় যে দীর্ঘ ছয় মাস ছিলেন তাহার মধ্যে একটি মাত্র কবিতা লেখেন।

আমরা বরাবর দেখিয়াছি যে, কাজ না হইলেও কবি থাকিতে পারেন না, আবার কাজ পড়িলেই তাহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য মন অস্থির হইয়া উঠে। একখানি পত্রে (২৩ নভেম্বর) লিখিতেছেন, "এখনও নিজের কর্মসৃষ্টি থেকে নিজে পালাবার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে বেড়ায়।...কবে এবং কোন্‌খানে গিয়ে যে থামতে পারব কিছুই ভেবে পাচ্ছিনে। মনে হচ্ছে এই আর-একটা আবর্তের সৃষ্টি হল, আমেরিকায় এইটের ঘূর্ণিই ঘুরপাক খাওয়াবে। আর আমার ছুটি নেই— অথচ আমার মন চায় ছুটি। আমার কোন্ মন যে কাজ করে এবং কোন্ মন যে ছুটি খোঁজে আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারিনি।...এমনতর আত্মবিরোধ জগতে খুব কম লোকের মধ্যে দেখা যায়।"[২]

আর্বানায় কবি ইংলণ্ড হইতে ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রকাশিত 'গীতাঞ্জলি' পাইলেন ও রোটেন্স্টাইনের পত্র হইতে জানিতে পারিলেন যে তিনি ম্যাকমিলান কোম্পানির স্বত্বাধিকারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গীতাঞ্জলি ও কবির অন্যান্য বই প্রকাশের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন।[৩] এই সংবাদ পাইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেশ হইতে খবর পাইলেন 'পাঠসঞ্চয়' নামে তাঁহার যে একখানি সঞ্চয়ন গ্রন্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট প্রবেশিকার অন্যতম বাংলা পাঠ্যরূপে নির্বাচনের জন্য পেশ করা হইয়াছিল, তাহা নামঞ্জুর হইয়াছে। বিলাতে গীতাঞ্জলি সমাদৃত হইয়াছে জানিতে পারিয়া রোটেনস্টাইনকে লিখিতেছেন (১৯ নভেম্বর)—

১ বিশ্ববোধ, শান্তিনিকেতন ১০, রবীন্দ্র রচনাবলী ১৪। আত্মবোধ, শান্তিনিকেতন ১৩, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬। কবি অজিতকুমারকে ৮ই অগ্রহায়ণ এই প্রসঙ্গে লিখিতেছেন, "যেটা বাংলায় আছে তারই তর্জমা নয়—সেই বিষয়টাই নূতন ক'রে লিখেছি।" ব্রহ্মসাধন সম্বন্ধে লিখিতেছেন, " আর একটা লিখেছি, তার বিষয়টা 'ব্রহ্মসাধন' সেটা কাল পড়ব।" কর্মযোগ, শান্তিনিকেতন ১৩, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬।

২ অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত, ৮ অগ্রহায়ণ ১৩১৯। আর্বানা হইতে। (প্রবাসী ১৩৪২ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ১৬০) পথের সঞ্চয়, প্রথম সংস্করণ. পরিশিষ্ট, পৃ ৮২।

৩ "Since only a limited edition of *Gitanjali* had been printed, I wrote to George Macmillan, with a view to his publishing a popular edition of *Gitanjali*, as well as other translations which Tagore had made ; Macmillans, ..finally published all Tagore's books, to his profit, and their own." *Men and Memories*, p 268.

"I am so glad to learn from your letter that my book has been favourably criticised in *The Times Literary Supplement* [7 Nov]. My happiness is all the more great because I know such appreciation will bring joy to your heart. In fact, I feel that the success of my book is your own success. But for your assurance I never could have dreamt that my translations were worth anything, and up to the last moment I was fearful lest you should be mistaken in your estimation of them and all the pains you have taken over them should be thrown away. I am extremely glad that your choice has been vindicated and you will have the right to take pride in your friend, supported by the best judges in your literature."

পাঠ্যসঞ্চয় না-মঞ্জুর হওয়ায় জগদানন্দ রায়কে লিখিলেন, "আমার বই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মঞ্জুর হল না এতে তোমরা রাগ করচ কেন? যারই বই না-মঞ্জুর হত সেই তো বেজার হত এবং মনে করত অবিচার করা হয়েছে। যাঁরা বিচারক তাঁরা ঠিকই বিচার করেছেন বলে ধরে নিলে ফল সমানই থেকে যায় অথচ মনের আক্ষেপটা বেঁচে যায়, সেটা তো কম লাভ নয়। হয়তো আমার বইয়ের ভাষা প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের প্রবেশগম্য নয়…"।

এই বই ছাপাইতে যে সামান্য ব্যয় (১৬৫৲) হয়, তাহা তখন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের পক্ষে বহন করা কষ্টকর ছিল। বিদ্যালয়ের দুর্ভাবনা বিদেশেও পৌঁছিয়াছে। আর্বানা বাসকালে কবি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বপ্নও নানাভাবে দেখেন। আমেরিকায় আসিয়াই তিনি রথীন্দ্রনাথকে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিবার জন্য ভর্তি করিয়া দিয়াছেন, উদ্দেশ্য রথীন্দ্রনাথ ইলিনয়ে Botany ও Zoologyটার গোড়াপত্তন করিয়া লইয়া পরে কেম্ব্রিজে গিয়া অধ্যয়ন করেন; সেখানে বৎসর-দুই রিসার্চ করিয়া দেশে ফিরিবেন ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া রীতিমত ভাবে ল্যাবরেটরি খুলিয়া রিসার্চ করেন। ছাত্রদের অনেকে এন্ট্রান্স দিয়া অন্যত্র না গিয়া তাঁহার সঙ্গে কাজে লাগিতে পারে।[১] পূর্বে কবির ইচ্ছা ছিল শিলাইদহই রথীন্দ্রনাথের কর্মকেন্দ্র হইবে— এখন সে ভাবের পরিবর্তন হইয়াছে, এখন বিদ্যালয়ের মধ্যে রিসার্চ বা গবেষণা লইয়া থাকেন ইহাই তাঁহার প্রধান কাম্য। আসলে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল-ইচ্ছা মনের পুরোভাগে নিরন্তর রহিয়াছে।

এই বিদ্যালয় তাঁহার অন্তরের কতখানি জুড়িয়া আছে তাহা অজিতকুমারকে ৭ই পৌষের দিন লিখিত পত্র হইতে জানিতে পারা যায়। "আজ ৭ই পৌষ। কাল সন্ধ্যার সময় যখন একলা আমার শোবার ঘরে আলো জ্বালিয়ে বসলুম আমার বুকের মধ্যে এমন একটা বেদনা বোধ হতে লাগল সে আমি বলতে পারিনে। বেদনা শরীরের কী মনের তা জানিনে কিন্তু আমাকে ব্যাকুল করে তুললে। তখন আমার মনে পড়ল ঠিক সেই সময়ে তোমাদের ভোরের বেলার উৎসব আরম্ভ হয়েছে। কেননা এখানকার সঙ্গে তোমাদের সময়ের প্রায় বারো ঘণ্টা তফাত। তোমাদের সমস্ত উৎসব আমার হৃদয়কে বোধ হয় আকর্ষণ করেছিল। কাল রাত্রে ঘুম থেকে প্রায় মাঝে মাঝে জেগে উঠে ব্যথা বোধ করেছিলুম। স্বপ্ন দেখলুম, তোমাদের সকাল বেলাকার উৎসব আরম্ভ হয়েছে— আমি যেন এখান থেকে সেখানে গিয়ে পৌঁচেছি— কিন্তু কেউ জানে না। তুমি যখন গান গাচ্ছ, 'জাগো সকলে অমৃতের অধিকারী' আমি মন্দিরের উত্তরের বারান্দা দিয়ে আস্তে আস্তে ছায়ার মতো যাচ্চি— তোমাদের পিছনে গিয়ে বসব— তোমরা কেউ কেউ টের পেয়ে আশ্চর্য হয়ে উঠেছ। এমনতর সুস্পষ্ট স্বপ্ন আমি অনেক দিন দেখিনি। জেগে উঠে ঐ গানটা আমার মনে বাজতে লাগল।

"পাঁচটা বাজল, এখানে আমাদের উৎসবের সময় হল। আমার শোবার ঘরের একপ্রান্তে একখানা কম্বল পেতে

১ দ্র. পত্রাবলী। সন্তোষচন্দ্রকে লিখিত। বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৪৯ ভাদ্র পৃ ৮৬-৮৭।

আমরা পাঁচজনে বসলুম। তোমাদের ওখানে তখন সন্ধ্যার উৎসব আরম্ভ হয়েছে। ৭ই পৌষের শুভদিন কি আমাকে একেবারে ঠেলে যেতে পারবে? আমার জীবনের মাঝখানে যে তার আসন পাতা হয়ে গিয়েছে। এই দিনটিকে যে আমি স্পর্শমণির মত আমাদের আশ্রম থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি।" দুইদিন পরে কবি খ্রীষ্টের আবির্ভাব-দিনটিকে স্মরণ করিলেন। শ্রীহেমলতা দেবীকে কবি লিখিতেছেন, 'সত্যের পথে যাবার পক্ষে মানুষই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো বাধা, তেমনি মানুষই মানুষের পক্ষে পরম সহায়— সেই মানুষটি আজ জন্মেছিলেন, তিনিই আজ আমাদের জীবনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করুন— নিষ্কলঙ্ক শুভ্র শিশুটি হয়ে। একেবারে নিরুপায় পিতার সন্তানটি হয়ে, একেবারে নিঃসম্বল নিষ্কিঞ্চন হয়ে।... আজ সকালে তাঁর দরবারে দাঁড়িয়েছি। সমস্ত মানুষের হয়ে মানুষের বড়ো ভাই এই প্রার্থনা করে গিয়েছেন— Thy Kingdom come! আমাদের ঋষিরাও সেই কথাই আর-এক ভাষায় বলেছিলেন— আবিরাবীর্ম এধি।"[১]

কয়েকদিন পরে (২৪ পৌষ ১৩১৯) সন্তোষচন্দ্রকে লিখিতেছেন, "আমি দূরে এসে আমাদের বিদ্যালয়ের আনন্দচ্ছবি আরো যেন নিবিড় করে দেখতে পাচ্চি।" মনের যে অবস্থা হইতে শান্তিনিকেতনের আদর্শ ও রূপকে মোহন করিয়া দেখিতেছিলেন, অকস্মাৎ তাহা রূঢ়ভাবে আঘাত পাইল; তিনি সন্তোষচন্দ্রের পত্র হইতে জানিতে পারিলেন যে স্কুলের বাড়ির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, ঐ জীর্ণ অট্টালিকার জন্য যে আট হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে তাহা লোকসান। রবীন্দ্রনাথ তাহার উত্তরে লিখিলেন, "লোকসান জিনিসটাকে মর্মের মধ্যে বিঁধিয়ে রক্ত বিষাক্ত করে তোলবার দরকার নেই— যা গেছে তাকে যেতে দাও, যা এসেছে তাকে নিয়ে নাও এবং যতটুকু তার কাছ থেকে আদায় করে নিতে পার সেইটুকুই আদায় করে নাও।... জীবনের অন্তরতর প্রসন্নতা স্কুলের ভাঙাবাড়ির চেয়ে ঢের বড়।"[২] সেই দিনই কবি একটি কবিতা লেখেন 'কে নিবি গো কিনে আমায়, কে নিবি গো কিনে? পসরা মোর হেঁকে হেঁকে বেড়াই রাতে দিনে'।—গীতিমাল্য ৩১। কবি লিখিতেছেন, "লেখা হয়ে গেলে তারপরে চেতনা হল এটা আমারই জীবনের ইতিহাস— আমার জীবনদেবতা হাস্যমুখে সেইটে লিপিবদ্ধ করেছেন। জীবনে কি রকম লাভের ব্যবসাটা যে আমি ফেঁদেছি তিনি বিষয়ী লোকের কাছে সেইটে প্রকাশ করে দিয়েছেন। তোমরা ত দেখতেই পাচ্চ ..।" আমেরিকা বাসকালে এই একটি মাত্র কবিতা লেখা হয়।

জানুয়ারির (১৯১৩) শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথ আর্বানা ত্যাগ করিয়া শিকাগোয় আসিলেন। তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের Ideals of the ancient civilisation of India সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন; প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভেদটা কোন্‌খানে সেইটাই ছিল প্রবন্ধের মূল কথা। এ ছাড়া য়ুনিটেরিয়ানদের হলে The Problems of Evil নামে একটি রচনা পাঠ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ লিউইস (Lewes) বলিয়াছিলেন যে বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে তাঁহার মনে হইতেছিল তিনি যেন এমার্সনের বক্তৃতা শুনিতেছেন; বোধ হয় তাহার কারণ, লেখাটাতে অনেক epigram ছিল। কবি তাঁহার *Creative Unity* গ্রন্থখানি লিউইস্‌কে উৎসর্গ করেন (১৯২২)। ১৯১২ ডিসেম্বর মাসে শিকাগো হইতে প্রকাশিত হ্যরিয়েট মন্‌রো (১৮৬১-১৯৩৬) সম্পাদিত Poetry নামে পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির ৬টি কবিতা মুদ্রিত হয়। এগুলি সংগ্রহ করিয়া এজরা পাউন্ড হ্যারিয়েটকে লেখেন, Very beautiful English with mastery of cadence। শিকাগো ট্রিবিউন নামে বিখ্যাত দৈনিক পোএট্রি-সংখ্যায় প্রকাশিত কবিতা সম্বন্ধে সম্পাদকীয় বীথিতে মন্তব্য করেন। আমেরিকার পাঠকগণ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই প্রথম জানিতে পারে।[৩]

১ শ্রীহেমলতা দেবীকে পত্র।

২ পত্রাবলী। বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৪৯ ভাদ্র পৃ ৯১।

৩ দ্র Harriet Monroe, Tagore in Chicago, The Golden Book of Tagore, p 169

শিকাগোতে বেশিদিন থাকা হয় নাই, কারণ রচেস্টারে (Rochester, New York) উদার ধর্মমতিদের এক সম্মিলনসভায় কবির নিমন্ত্রণ হইয়াছে। রচেস্টার নিউয়র্ক স্টেটের শহর ; এখানকার থিওলজিক্যাল কলেজ খুটি প্রাচীন— বহু জাতির ও বহু ধর্মসম্প্রদায়ের বাস এখানে। ২৯ জানুয়ারি কবি রচেস্টারে পৌঁছান। এই সম্মিলনে পৃথিবীর নানাস্থান হইতে মনীষীরা আসিয়াছেন। ইহাদের অন্যতম জার্মান-দার্শনিক-পণ্ডিত রুডলফ অয়কেন[১] (১৮৪৬-১৯২৬) জারমেনির য়েনা (Jena) বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-অধ্যাপক—বহু গ্রন্থের লেখক, আদর্শবাদী বলিয়া দেশবিদেশে খ্যাত। অয়কেন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক কথা অজিতকুমারের নিকট হইতে পত্রযোগে জানিতে পারেন—উভয়ের মধ্যে বহু পত্রের আদান-প্রদান হইয়াছিল। রচেস্টারে আসিবার পূর্বে কবি অয়কেনের নিকট হইতে গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে অতি সুন্দর একখানি নাতিদীর্ঘ পত্র পাইয়াছিলেন।

এক ভোজসভায় অয়কেনের সহিত কবির সাক্ষাৎ হইলে বৃদ্ধ "দুই হাতে আমার হাত ধরে আমাকে খুব সমাদর ক'রে গ্রহণ করলেন— বললেন ইণ্ডিয়া ও জার্মানি আমরা এক রাস্তায় চলছি। এই বৃদ্ধ···কতকটা বড়দাদার ধরণের মানুষটি, খুব সরল এবং যেন জীবনোৎসাহে পূর্ণ।[২]

৩০শে জানুয়ারি সম্মিলন-সভায় রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা হইল। বক্তৃতার বিষয় Race conflict— সময় মাত্র ২০ মিনিট। Christian Registrar নামক কাগজ বলিলেন যে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতায় মহাসভার সমস্ত সুর উচ্চগ্রামে উঠিয়া পড়িয়াছিল। পত্রিকার মতে সভামঞ্চে তাঁহার অপেক্ষা অধিক সাহিত্যখ্যাতিসম্পন্ন বা অধিকতর গূঢ়ভাবপূর্ণ কথা বলিতে সক্ষম ব্যক্তি আর কেহ ছিল না।[৩]

এই উদার ধর্মমতিদের সভায় রবীন্দ্রনাথ জাতিসংঘাত সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন তাহার মর্ম নিম্নে উদ্‌ধৃত হইল। কবি বলেন, "মানব-ইতিহাসে জাতিসংঘাতের সমস্যা চিরকালই বিদ্যমান রহিয়াছে। সকল বড়ো সভ্যতার মূলে এই সংঘাত লক্ষ্যগোচর হয়।"···এইরূপ জাতিগত বৈষম্যগুলিকে যখন গণ্য করিতেই হয় এবং ইহাদের পাশ কাটাইয়া চলিবার যখন কোনো উপায় থাকে না, তখন বাধ্য হইয়া মানুষকে এমন-একটি ঐক্যসূত্রকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় যাহা সকল বিচিত্রতাকে এক করিয়া গাঁথিতে পারিবে। সেই অন্বেষণই সত্যের অন্বেষণ— বহুর মধ্যে একের অন্বেষণ, ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টির অন্বেষণ।" পূর্বকালে নানা প্রাকৃতিক বাধা, খাদ্যের অভাব, অনুকূল স্থানের অভাব মানুষকে স্বভাবতই সন্দিগ্ধ স্বার্থপর করিয়া তুলিয়াছে। সেইজন্য প্রাচীন ইতিহাস অত্যন্ত 'ঘোরো' রকমের ; স্বাতন্ত্র্যই তাহার মুখ্য প্রেরণা। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে দেখাইলেন, কিভাবে ভারতবর্ষ এই জাতিসমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিয়াছিল। ভারতবর্ষের ন্যায় বিরাট মহাদেশ তাহার বিপুল বৈচিত্র্যকে সামঞ্জস্যে বাঁধিতে গিয়া এখানকার চিরন্তন আদর্শ ও অভিপ্রায় লইয়া যুগে যুগে কিভাবে ভাঙাগড়া সংকোচ ও প্রসারণের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার আভাস তিনি এই প্রবন্ধে দেন। তিনি বলিলেন, "আজ যে সুসভ্য মানুষের সম্মুখে এই জাতিসংঘাতের সমস্যা উপস্থাপিত হইয়াছে, ইহাতে আমাদের আনন্দিত ও উৎসাহিত হইবার কথা। বিশ্বমানবের চেতনার মধ্যে মানুষ যে নবজন্ম লাভ করিয়াছে, ইহাই এ যুগের

১ Rudolph Christopher Eucken (1846-1926) German philosopher. Professor, Jena University 1908-20. received Nobel Prize 1908: Exchange Prof. at Harvard 1912-13: author of several books on his own philosophy of ethical activism, a metaphysical-idealistic philosophy of life.

২ রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী। প্রবাসী ১৩৪২ আষাঢ়, পৃ ৩০৫।

৩ জাতিসংঘাত (নিউইয়র্ক-রচেস্টারে আহূত উদার ধর্মমতাবলম্বীগণের মহাসভায় কবি কর্তৃক পঠিত। মডার্ন রিভিউ ১৯১৩ এপ্রিলে প্রকাশিত প্রবন্ধের অজিতকুমার চক্রবর্তী কর্তৃক অনূদিত। প্রবাসী ১৩২০ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ১৯৬-২০১। প্রিয়ম্বদা দেবী কৃত অনুবাদ 'জাতিবিরোধ' ; ভারতী ১৩২০ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

সকলের চেয়ে গর্ব করিবার বিষয়...মনুষ্যত্বের মহা আহ্বান যখন সমুচ্চ কণ্ঠে ধ্বনিত, তখন মনুষ্যত্বের উচ্চতর প্রকৃতি কি তাহাতে সাড়া না দিয়া থাকিতে পারে! জানি, শক্তি ও জাতীয় গর্বের মদোন্মত্ত উন্মাদনার উৎসবনিশীথে মানুষ সেই আহ্বানকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে পারে, তাহাকে শূন্য ভাবুকতা ও দুর্বলতার পরিচায়ক বলিয়া ঠেলিয়া দিতে পারে। কিন্তু সেই মত্ততার মধ্যেই তাহার সমস্ত প্রকৃতি যখন প্রতিকূল, তাহার প্রবল আক্রমণ যখন বিচারমূঢ় ও ন্যায়ঘাতী— সেই সময়েই, এই কথাই তাহার মানসপটে সহসা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে যে নিজের অন্তর্নিহিত সর্বোচ্চ সত্যকে আঘাত করা আত্মঘাতের চরমতম রূপ। যখন ব্যূহবদ্ধ জাতীয় স্বাতন্ত্র্যপরতা, পরজাতিবিদ্বেষ এবং বাণিজ্যের স্বার্থান্বেষণ অত্যন্ত অনাবৃতভাবে তাহার বীভৎসতম রূপ প্রকাশ করে তখনি মানুষের জানিবার সময় উপস্থিত হয় যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে বা ব্যাপকতর বাণিজ্যের আয়োজনে, কিংবা সামাজিক কোনো যন্ত্রবদ্ধ নূতন ব্যবস্থায় মানুষের মুক্তি নাই। জীবনের গভীরতর রূপান্তর সাধনে, চৈতন্যকে সর্ব বাধা হইতে প্রেমের মধ্যে মুক্তিদানে এবং নরের মধ্যে নারায়ণের সম্পূর্ণ উপলব্ধিতেই মানুষের যথার্থ মুক্তি।"

রচেস্টার হইতে কবি বস্টন চলিলেন[১]; বস্টন পূর্ব-আমেরিকার বিশিষ্ট শহর, বুনিয়াদী আমেরিকানদের বাসভূমি। বস্টনের নিকটেই কেম্‌ব্রিজ নামে শহর হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্র। হার্ভাড মার্কিন দেশের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়, জ্ঞানগরিমায় অতুলনীয়, ঐশ্বর্যেও অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান। সেইখানে কবির বক্তৃতার নিমন্ত্রণ; এমার্সন হলে তাঁহার প্রথম বক্তৃতা হইল (১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩)। কবির হাতে পাঁচটা প্রবন্ধ আছে, হার্ভাডে এবং য়ুনিভার্সিটির অন্তর্গত দুটি ক্লাবে আরো তিনটি বক্তৃতা দিতে হয়। হার্ভাডে প্রবন্ধ পাঠ সম্বন্ধে কবির মনে প্রথম দিকে বেশ একটু দ্বিধা ছিল, বিশেষত ইংরেজি গদ্যের ভাষা সম্বন্ধে কবি এখনো নিঃসন্দেহে কিছু বলিতে সাহসী হন নাই; তবে ক্রমেই সংকোচ কাটিয়া যাইতেছে। হার্ভাডে এইসময়ে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী কেহই ছিলেন না; যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষার ভার লইয়া আছেন, তাঁহারা ঘোরতর বিজ্ঞানী; এই সময়ে আমেরিকার প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাব অত্যন্ত সংকীর্ণ, প্রাগ্‌মাটিজ্‌মের হাওয়া খুব প্রবল বেগে প্রবাহিত— যদিচ সে-হাওয়া বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ অনুকূল নয়; তবুও তাতে Idealismকে খুব আঘাত করিয়াছে। কবির মত এই যে "দেশের মধ্যে যে-ভাবটা অত্যন্ত বেশি প্রবল তাহারই অনুকূল হাওয়াটা সেখানে স্বাস্থ্যকর নহে। আমেরিকানরা প্রখরভাবে 'কেজো' বলেই আইডিয়ালিজম ইহাদের নিতান্তই আবশ্যক, নহিলে ইহাদের কাজের ভিতরকার অর্থ ইহারা খুঁজিয়া পাইবে না।"

বস্টন হইতে কবি নিউইয়র্কে আসিয়া কয়দিন থাকেন। শিকাগোর শ্রীমতী মুডি[২]র একখানি বাড়ি ছিল নিউইয়র্কে। এইখানে কবির সহিত অজিতকুমারের ইংরেজ বন্ধু র‍্যাট্রের সাক্ষাৎ হইল। হার্ভাডের বক্তৃতাগুলি শেষ করিবার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ নিউইয়র্ক ত্যাগ করিয়া শিকাগো চলিয়া গেলেন, কারণ নিউইয়র্কের হট্টগোল তাঁহার ভালো লাগিতেছিল না; কিন্তু শিকাগোতে গোলমাল কম নয়। তাই সেখান হইতে আর্বানায় ফিরিয়া গেলেন (১০ মার্চ)। প্রায় ছয় মাস ইংলণ্ড ছাড়া। গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হইবার পর সেখানে কী প্রতিক্রিয়া হইতেছে তাহার ক্ষীণাভাস আমেরিকান পত্রিকা মারফত পাইতেছেন বটে, তবে তাহা সম্পূর্ণ নহে। আর্বানায় এক মাস থাকিলেন, কিন্তু

১ ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩ নিউইয়র্ক হইতে লিখিতেছেন, "শিকাগো য়ুনিভার্সিটিতে বক্তৃতা দিয়ে বস্টনে হার্ভাড য়ুনিভার্সিটিতে বতক্তৃার জন্যে চলেছি।" চিঠিপত্র ৫, পৃ ১৪।

২ Moody William Vaughn (1869-1910). অধ্যাপক মুডি ছিলেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক। কবি ও নাট্যকার হিসাবে তিনি অল্প বয়সেই খ্যাত হন। মাত্র ৪১ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৯১০ সালে শ্রীমতী মুডি স্বামীর মৃত্যুর দুই বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত হন এবং সেই হইতে কবিকে শিকাগো ও নিউইয়র্কে প্রয়োজন মত আতিথ্যদান ও সেবার দ্বারা আপ্যায়িত করেন; সমসাময়িক বহু পত্রে শ্রীমতী মুডির সেবাযত্নের কথা আছে। *Chitra* নাট্যকাব্যখানি কবি ইঁহার নামে উৎসর্গ করেন।

বিলাতে ফিরিবার জন্য মন অত্যন্ত চঞ্চল। সন্তোষচন্দ্রকে লিখিতেছেন, "এখানে ধীরে ধীরে লোকের দৃষ্টিগোচর হয়ে পড়বার সম্ভাবনা ঘনিয়ে আসচে। অতএব নিশ্চয়ই এখান থেকে আমার পালাবার দিন নিকটবর্তী হচ্চে।" এ দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রথীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-বিষয়ে গবেষণার পর্ব আর কয়েকমাসের মধ্যেই শেষ হইবে, কিন্তু তাহা আর হইল না, অধ্যয়ন অসমাপ্ত রাখিয়া পিতাকে লইয়া ইংলণ্ডে ফিরিতে হইল।

পাশ্চাত্য দেশে আসিয়া অবধি রবীন্দ্রনাথ সেখানকার শিক্ষাবিধি পর্যালোচনা করিতেছেন। য়ুরোমেরিকার শিক্ষার উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও সফলতার দৃষ্টান্ত দেখিয়া কবির মনে শিক্ষার মূলগত আদর্শ সম্বন্ধে নানা চিন্তার উদয় হইতেছে। ইংলণ্ডে থাকিতে কয়েকটি প্রবন্ধ ও পত্র মধ্যে শিক্ষার কথা আলোচনা করিয়াছিলেন। আমেরিকায় আসিয়াও বিদ্যালয় সম্বন্ধে ভাবিতেছেন।

আর্বানা হইতে বাহির হইয়া দুই-চারিজন আদর্শবাদী আমেরিকানের সঙ্গে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় সম্বন্ধে কথাবার্তা হওয়ায় কবির মনে অল্প অল্প আশা হইতেছে যে হয়তো আমেরিকায় চেষ্টা করিলে বিদ্যালয়ের জন্য অর্থের জোগাড় হইতে পারে। বিদ্যালয়ের জন্য বিদেশে অর্থলাভের কথা বোধ হয় এই প্রথম মনে হইল; যেমন সে-কথা মনে উদয় হওয়া, অমনি সেই কল্পিত টাকা কিভাবে ব্যয়িত হইবে তাহারও ফর্দ করিয়া ফেলিলেন। জগদানন্দবাবুকে লিখিতেছেন, "ওখানে (শান্তিনিকেতনে) একটা টেকনিক্যাল বিভাগ স্থাপন করা, দুই-একটি ল্যাবরেটরির পত্তন করা, পাকশালার সংস্কার এবং হাসপাতালের প্রসারসাধন খুব দরকার বলে মনে করি।" প্রায় দশ বৎসর পরে যে বিশ্বভারতীর পত্তন হয়, তাহারই আভাস পাই এই সময়ে। তিনি লিখিতেছেন, "আমার ইচ্ছা ওখানে দুই একজন যোগ্য লোক এক-একটি ল্যাবরেটরি নিয়ে যদি নিজের মনে পরীক্ষার কাজে প্রবৃত্ত হন তাহলে ক্রমশ আপনিই বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হবে। এখানে কয়েকজন খুব ভাল বাঙালি ছাত্র বিজ্ঞান ও দর্শন অধ্যয়ন করচেন।[১]...আমি যদি এঁদের মত লোক দিয়ে ওখানে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বালোচনার একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারি তাহলে সেটা ক্রমশ খুব বড়ো হয়ে উঠতে পারে। এইটেই আমার অনেক দিনের সংকল্প— জ্ঞানানুশীলনের একটা হাওয়া বইয়ে দেওয়া চাই— সেই হাওয়া নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে করতে ছাত্রদের মন আপনিই অলক্ষিতভাবে বিকাশলাভ করতে পারবে।" পত্রশেষে বলিতেছেন "এটা আমার আশা মাত্র— যদি সফল হয় ত ভালই, যদি না হয় তা হলে মায়াবিনীকে বিসর্জন দিতে কোনো খরচ নেই।"[২] যাহা হউক, ধনাগমের আশা ক্ষণিকের জন্য উদয় হইয়াই অস্তমিত হইল; কারণ প্রথমবার আমেরিকায় ধনের আশায় যান নাই। রামানন্দবাবুকে লিখিতেছেন, "কেবল মুশকিল এই যে, দশজনের কাছে প্রচার করিয়া এবং ভিক্ষা করিয়া বেড়ানো আমার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসাধ্য। নিজের দেশের কাজের জন্য এ দেশের লোকের মুখাপেক্ষী হইতে এত লজ্জা বোধ হয় যে আমি মুখ ফুটিয়া স্পষ্ট করিয়া অভাব জানাইতে পারি না। আমি যদি আর-একটু মুখর ও প্রখর হইতে পারিতাম তবে এখান হইতে সকল অভাব মোচন করিয়া ফিরিতে পারিতাম। কিন্তু আমার দ্বারা সে বোধ হয় ঘটিয়া উঠিবে না। আমি আমার 'পুরস্কার' কবিতার কবির মতো শুধু বোধ করি মালা হাতে করিয়াই ফিরিব— যদিও নেপালবাবু আমার স্কন্ধে মোহরের থলি দেখিবার জন্য পথ তাকাইয়া বসিয়া আছেন।"[৩]

১ ন্যাশনাল কাউন্সিল অব্ এডুকেশন (জাতীয় শিক্ষা পরিষদ) হইতে যেসব ছাত্রদের পাঠানো হইয়াছিল, তাহাদের কয়েকজন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, যেমন নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত দর্শনের ছাত্র; পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র যতীন্দ্রনাথ শেঠ, ও ব্যবহারিক রসায়নের ছাত্র শ্রীহীরালাল রায়। ইঁহাদের সহিত কবির সাক্ষাৎ হয়।

২ পত্র। Felton Hall, Cambridge. Mass হইতে জগদানন্দ রায়কে লিখিত।

৩ রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত, Felton Hall, Cambridge, Mass. ফাল্গুন ১৩১৯। প্রবাসী ১৩৪৮ বৈশাখ, পৃ ৫৮-৫৯।

কয়েকদিন পরেই সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে লিখিতেছেন, "তোমাদের বিদ্যালয়ের ভিত তোমরা টাকা দিয়ে গেঁথে তুলতে চাও। কিন্তু বিশ্বের সঙ্গে নাড়ির যোগ রাখতে পারলে তবেই সত্যকার জীবনে একে বাঁচাতে পারবে…টাকার যোগ নয়।. তোমরা সেই গরীবের ধন সেই সহজ আনন্দের পুষ্পমধুতে তোমাদের বিদ্যালয়টিকে ভর্তি করে রাখ। তোমাদের কার্পেট আর নেই। আমাদের 'শান্তিনিকেতনে'র যে কুঠরিতে সম্পত্তির দলিল এবং টাকার থলি আছে[১] সেইখানেই আমাদের শান্তিঘটে ছিদ্র হয়েছে— সেইখান থেকেই আনন্দসঞ্চয় শূন্য হয়ে যাচ্ছে।…ধনের কালিমা শান্তিনিকেতনের আশ্রমকে অশুচি করেছে। আমাদের বিদ্যালয়ের কাজ হবে তাকে ধুয়ে শুভ্র করে ফেলা—আমরা সেই সেবকের পদ গ্রহণ করব বলেই আশ্রমে এসেছি— অতএব টাকার চিন্তা ত্যাগ করে পুণ্যতীর্থজলের আয়োজন কর।" এই পত্র লেখেন ১৯১৩ সালের গোড়ায়, তারপর অনেক পরিবর্তন হইয়াছে।

এইভাব থেকেই আর-একখানি পত্রে রথীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "যেমন করেই হোক কেবলমাত্র বিষয়ের জালে তাকে (রথীন্দ্রনাথকে) জড়িয়ে পড়তে দেব না। এমন কোনো একটা বড় আইডিয়ার কাছে তাকে আত্মনিবেদন করতে হবে যার সংস্রবে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ এবং ধনসম্পদের মোহ তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যাবে। অহরহ টাকার থলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গেলে মানুষ আপনার মাহাত্ম্য ভুলে যায়।…রথীকে তার থেকে বাঁচাবার জন্যেই আমি এইসমস্ত ব্যবস্থা করেছিলুম।"

মন হাজার কাজের মধ্যে লিপ্ত থাকিলেও শান্তিনিকেতনের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের কথা সর্বদাই মনে জাগে। বিদ্যালয়ের জন্য এক বাক্স বিলাতী বই পাঠাইয়া জগদানন্দবাবুকে লিখিতেছেন, "তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক বই অনেক আছে।' আমার ইচ্ছা এইগুলো অবলম্বন ক'রে তোমরা ছেলেদের বক্তৃতা দাও।"[২] ছাত্রদের শিক্ষা ও শাসন কোন্ আদর্শে চালিত হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধে তাঁহার ভাবনার শেষ নাই। তিনি জগদানন্দ রায়কে লিখিতেছেন (১০ই আশ্বিন ১৩১৯), "আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্ররা একটা বড় জিনিস লাভ করছে যেটা ক্লাসের জিনিস নয়— সেটা হচ্ছে বিশ্বের মধ্যে আনন্দ-প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তার যোগ। সেটাতে যদিও পরীক্ষার সহায়তা করে না, কিন্তু জীবনকে সার্থক করে।…আমরা হতভাগ্যরা বিদ্যাসাধ্য খ্যাতিমান টাকাকড়ি যত সহজে পাই জগৎকে তত সহজে পাই নে— আমরা যার দ্বারা বেষ্টিত হয়ে রয়েছি তাকেই হারিয়ে বসেছি...এই অসাড়তার খোলস ভেঙে ফেলে ছেলেদের মন যাতে মুক্তজগতের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এখানকার মাটিতে জলেতে আলোতে অবাধে সঞ্চরণ করবার অধিকার লাভ করে এইটে আমি একান্ত কামনা করি।…বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এবং শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রদের হৃদয়ের প্রত্যহ অব্যবহিত যোগই আমাদের বিদ্যালয়ের সকলের চেয়ে বড় বিশেষত্ব।" বিদ্যালয়ের ছেলেদের প্রতি কবির স্নেহ পিতৃস্নেহতুল্য। তিনি লিখিতেছেন, "ছেলেদের…কথা আমার সর্বদাই মনে হয় এবং মনে হলেই শরীরটাসুদ্ধ তদভিমুখে চঞ্চল হয়ে ওঠে।"[৩] তাহাদের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাদানই তাঁহার শিক্ষাদর্শ। তাই তিনি অজিতকুমারকে লিখিতেছেন, "আমাদের বিদ্যালয়ে আজকাল গানের চর্চাটা বোধ হয় কমে এসেছে; সেটা ঠিক হবে না; ওটাকে জাগিয়ে রেখো। আমাদের বিদ্যালয়ের সাধনার নিঃসন্দেহ ওটা প্রধান অঙ্গ। শান্তিনিকেতনে বাইরের প্রান্তরশ্রী যেমন অগোচরে ছেলেদের মনকে তৈরি ক'রে তোলে তেমনি গানও জীবনকে সুন্দর ক'রে গড়ে তোলবার একটা প্রধান উপাদান।…ওরা যে সকলে গাইয়ে হয়ে উঠবে তা নয়, কিন্তু ওদের আনন্দের একটা শক্তি বেড়ে যাবে, সেটাতে মানুষের কম লাভ নয়।"[৪]

১ দ্বিপেন্দ্রনাথ 'শান্তিনিকেতন'-বাড়িতে থাকিতেন এবং তিনি শান্তিনিকেতনের ট্রাস্টি ও বিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ।
২ রবীন্দ্রনাথের পত্র। ২ আশ্বিন ১৩১৯। প্রবাসী ১৩৪১ কার্তিক। পৃ ৪।
৩ [লণ্ডন] ১৮ এপ্রেল ১৯১৩। প্রবাসী ১৩৪১ পৌষ, পৃ ৩৩৬।
৪ পত্র। ২৬ ভাদ্র ১৩১৯। প্রবাসী ১৩৪১ পৌষ।

আমেরিকা হইতেও কবি কয়েকখানি পত্রে শিক্ষাসমস্যা ও শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেন। তথা হইতে প্রেরিত একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "আমাদের বিদ্যালয়ের এই একটি বিশেষত্ব আছে যে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে অখণ্ড যোগে আমরা ছেলেদের মানুষ করতে চাই, কতকগুলি বিশেষ শক্তির উগ্র বিকাশ নয়, কিন্তু চারি দিকের সঙ্গে চিত্তের মিলনের দ্বারা প্রকৃতির পূর্ণতা সাধন আমাদের উদ্দেশ্য। এখানে মানুষের শক্তির মূর্তি যে পরিমাণে দেখি পূর্ণতার মূর্তি সে পরিমাণে দেখতে পাই নে।...মানুষের শক্তি নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে অতিশয় মাত্রায় স্বপ্রধান হয়ে উঠেছে, প্রত্যেকে আপনার সীমার মধ্যে যোগ্যতা লাভ করবার জন্য উদ্যোগী, সীমা অতিক্রম করে যোগ লাভ করবার কোনো সাধনা নেই।...মানুষের মুশকিল এই দেখি নিজের সফলতার চেয়ে নিজের অভ্যাসকে বেশি ভালবাসতে শেখে...। মানুষের শক্তির যতদূর বাড় হবার তা হয়েছে, এখন সময় এসেছে যখন যোগের জন্যে সাধনা করতে হবে। আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা কি সেই যুগসাধনার প্রবর্তন করতে পারব না? মনুষ্যত্বকে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত করে তার আদর্শ কি আমরা পৃথিবীর সামনে ধরব না? এদেশে তার অভাব— এরা অনুভব করতে আরম্ভ করেছে, সেই অভাব মোচন করবার জন্যে এরা হাতড়ে বেড়াচ্ছে—এদের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে উদারতা আনবার জন্যে এদের দৃষ্টি পড়েছে, কিন্তু এদের দোষ হচ্ছে এই যে এরা প্রণালী জিনিসটাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করে...। মানুষের চিত্তের গভীর কেন্দ্রস্থলে সহজজীবনের যে অমৃত-উৎস আছে এরা তাকে এখনো আমল দিতে জানে না— এইজন্যে এদের চেষ্টা কেবলি বিপুল এবং আসবাব কেবলি স্তূপাকার হয়ে উঠচে। এরা লাভকে সহজ করবার জন্যে প্রণালীকে কেবলই কঠিন করে তুলচে। তাতে একদিকে মানুষের শক্তির চর্চা খুবই প্রবল হচ্চে সন্দেহ নেই, এবং সে জিনিসটাকে অবজ্ঞা করতে চাই নে— কিন্তু মানুষের শক্তি আছে অথচ উপলব্ধি নেই— এও যেমন আর ডালপালায় গাছ খুব বেড়ে উঠেছে— অথচ তার ফল নেই এও তেমনি।"[১] কবির স্বপ্ন শান্তিনিকেতনে সেই সাধনা হইবে— বহুকাল পরে বিশ্বভারতীর যে পরিকল্পনা দান করেন, তাহার কাজ অন্তরের মধ্যে এখন হইতেই চলিতেছে।

শিক্ষা-আদর্শের সন্ধান করিতেছেন বলিয়া শিক্ষার ব্যবহারিক বা প্রয়োগপদ্ধতি সম্বন্ধে কবি আদৌ উদাসীন নহেন। তাঁহার পর্যবেক্ষণী মন সামান্য জিনিসকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখে। আমেরিকার বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার প্রণালী আলোচনা করিয়া কবি জগদানন্দ রায়কে বিলাত হইতে লিখিতেছেন— "আমার মনে হয়েচে এই যে আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা বই পড়াবার দিকে একটু ঢিল দিয়েছি। আমরা একদিকে যেমন ইংরেজি-সোপান, সংস্কৃতপ্রবেশ প্রভৃতি অবলম্বন করে ধীরে ধীরে থাকে থাকে ভাষা শেখাবার চেষ্টা করি তেমনি সেই সঙ্গে উচিত অনেকগুলি ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্যগ্রন্থ...একেবারে বেশি তন্ন তন্ন করে পড়াবার একেবারেই দরকার নেই— তাড়াতাড়ি কোনোমতে কেবলমাত্র মানে করে এবং আবৃত্তি করে পড়ে যাওয়া মাত্র। এ রকম করে পড়ে গেলে সব যে ছেলেদের মনে থাকে তা নয়, কিন্তু নিজের অলক্ষ্যে অগোচরে ভাষার পরিচয়টা মনের ভিতরে ভিতরে গড়ে উঠতে থাকে। যতদিন একজন ছেলে আমাদের ইস্কুলে আছে ততদিনে সে যদি অন্তত কুড়ি-পঁচিশখানা বই যেমন করে হোক পড়ে যাবার সুযোগ পায় তা হলে ভাষার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা না ঘটে থাকতে পারে না।"...এই পত্রে কবি পরীক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধেও তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন।..."যাই হোক তোমাদের সংস্কৃত ও ইংরেজি অধ্যাপনার মধ্যে এখন থেকে সাহিত্যগ্রন্থ পাঠকে খুব বড় স্থান দিতে হবে— বছরের মধ্যে অন্তত দুখানা বই পড়ে শেষ করা চাই—সে পড়া যে খুব পাকা গোছের পড়া হবে না একথাও মনের মধ্যে জেনে রাখতে হবে— তাতে দুঃখ পেলে বা হতাশ হলে চলবে না— এই রকম অনুশীলনের ফলটা তিন চার বৎসর চেষ্টার পরে তোমরা জানতে পারবে।"[২]...

১ পত্র। 2970 Groveland Avenue, Chicago, 3 March 1913; দ্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৫ (১৩২০) বৈশাখ।

২ পত্রাবলী। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ অগ্রহায়ণ, পৃ ২৯৫-২৯৬।

ইংরেজি গীতাঞ্জলি

রবীন্দ্রনাথ যখন আমেরিকায় সেই সময়ে লণ্ডনে ইণ্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক ইংরেজি গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হইল। ম্যাকমিলান কোম্পানি উহা প্রকাশের ভার গ্রহণ করে। এই গীতাঞ্জলি বা Song-offerings[১] বাংলা গীতাঞ্জলির অনুবাদ নহে। ইহার মধ্যে গীতাঞ্জলির ৫১, গীতিমাল্যর ১৮, নৈবেদ্যর ১৬, খেয়ার ১১, শিশুর ১৩ ও চৈতালি স্মরণ কল্পনা উৎসর্গ অচলায়তন হইতে একটি করিয়া মোট ১০৩টি কবিতা আছে। রবীন্দ্রনাথের মতে তাঁহার আধ্যাত্মিক কবিতা ও গানের যেগুলি শ্রেষ্ঠ সেইগুলি ইহার মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছিল।

গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হইবামাত্র ইংলণ্ডে ও ইংরেজি ভাষাভাষী দেশের সাহিত্যিক মহলে একটি অভাবনীয় চাঞ্চল্য দেখা দিল। সাহিত্যের ইতিহাসে ইতিপূর্বে বিদেশীভাষা হইতে রূপান্তরিত কোনো একখানি বই এমনভাবে মানুষের চিত্তকে মথিত করিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় নাই। ইহা যে কেবল আধ্যাত্মিক কাব্য বলিয়া লোকের ভালো লাগিয়াছিল তাহা নহে, বিশুদ্ধ কাব্য হিসাবে উহার সমাদর কম হয় নাই। মোটকথা সমসাময়িক শিক্ষিত সম্প্রদায় ও বিশেষভাবে সাহিত্যিকগণ এই বিদেশী কবির রচনা পড়িয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন।

গীতাঞ্জলি নভেম্বর (১৯১২) মাসের গোড়ায় ইংলণ্ডে প্রকাশিত হইলে সমসাময়িক প্রায় সকল পত্রিকা ও সংবাদ-পত্র উহাকে অভিনন্দিত করে। গীতাঞ্জলির সর্বপ্রথম (৭ নভেম্বর ১৯১২) উল্লেখযোগ্য সমালোচনা বাহির হইল 'টাইমস' পত্রিকার সাপ্তাহিক সাহিত্য-ক্রোড়পত্রে। ইংরেজি সাহিত্যশাস্ত্রের বুনিয়াদি ধারার বাহক হইতেছে এই কাগজখানি। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বন্ধু য়েট্‌সের কাছে শুনিয়াছিলেন যে সাহিত্যশাস্ত্রী এডমণ্ড গস্‌ (E. Gosse 1849-1928) টাইমসের অন্যতম সাহিত্য-সমালোচক ছিলেন।[২]

টাইমস পত্রিকায় দেশবিদেশের প্রধান ঘটনাগুলি বৎসরের শেষ দিন কাগজে প্রকাশিত হয়; উহার সাহিত্য-বিভাগে কবিতা সম্বন্ধে লেখা হইয়াছিল, "কবিতায় এ বৎসরে অনেকেই ভারতীয় কবি (mystic) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার স্বকৃত অনুবাদগুলিকেই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন।"[৩]

টাইমস পত্রিকা যেমন ইংরেজের বুনিয়াদি কাগজ অপেক্ষাকৃত সনাতনী সুরে বাঁধা, তেমনি Poetry[৪]...হইতেছে তরুণ আমেরিকান কবিদের নবীনতম পত্রিকা। তরুণ লেখক এজরা পাউণ্ড[৫] (বয়স ২৬) গীতাঞ্জলির যে সংক্ষিপ্ত

১ *Gitanjali* (song offerings) by Rabindranath Tagore. A collection of prose translations made by the author from the original Bengali with an introduction by W. B. Yeats, London, printed at the Cheswick Press for the India Society, XVI+64. 10 S. 6d.

২ পত্র ১৭। ৮ অগ্রহায়ণ ১৩১৯। আর্বানা, ২৩ নভেম্বর ১৯১২।

৩ "In poetry many will have found the richest of the year's sheaves to be the introduction, through his own translations, of the poems of the Indian mystic, Mr. Rabindranath Tagore."

৪ Poetry : a Magazine of Verse (1912) founded at Chicago by Harriet Monroe. The best magazine devoted exclusively to poetry, and the precursor of many other little magazines, Poetry has had an extremely stimulating influence on American literature.—Oxford Companion to American Literature. p. 592.

৫ "Ezra Pound (1885) Idaho-born poet and critic, after study at the University of Pennsylvania and Hamilton College, taught briefly at Wabash College, from which he was dismissed because of his impatience with formal academic methods, despite his ability as a teacher and individualistic amateure of scholarship. He went to Italy (1908), where his first book, *A Lume Spento* (1908) was published. He has since lived in London (1909-20), in Paris (1920-24), and at Rapallo on the Riviera. In 1909 he published two volumes of verse *Personal* and *Exultations*. *Proven ca*(1910), *Canzaxi* (1911), and *Ripostes* (1012) further extended the paths he had marked for himself."... "Among the artists he has championed are T. S. Eliot James Joyce, Tagore, the musician George Antheil and the sculptor Gaudier-Urzeska."—Oxford Companion of American Literature p. 599-600

সমালোচনা লিখিলেন, তাহাই বোধ হয় গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে আমেরিকার প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা। পাউণ্ড লিখিয়াছিলেন যে "ইংরেজি কাব্যে এমন-কি পৃথিবীর কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির প্রবেশ একটি বিশেষ ঘটনা। আন্তরিক গভীর বিশ্বাসের সহিতই আমি এই কথা বলিতেছি যে রবীন্দ্রনাথের লণ্ডনে আগমনহেতু পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে সখ্য নিকটতর হইয়া আসিল।"[১]

রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়া ইংলণ্ডে অনেকেরই এই ধারণা জন্মে যে বাংলা দেশে একটি আশ্চর্য সাহিত্যের অভ্যুদয় হইয়াছে। এই আলোচনাটার কথা উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্রনাথ একখানি পত্রে অজিতকুমারকে লিখিতেছেন, "এ কথাটা ঠিক কি না-ঠিক আমাদের পক্ষে বোঝা শক্ত— যেমন নিকটের থেকে অনেক জিনিসকে চেনা যায় না, তেমনি দূরের থেকেও অনেক জিনিসকে বড়ো ক'রে দেখা অসম্ভব নয়।" কিন্তু তিনি স্বীকার করিলেন যে বাঙালির জীবনপ্রবাহ চারি দিক থেকে প্রতিহত হইয়াছে বলিয়া হয়তো তাঁহার চিত্ত সমগ্রভাবে সাহিত্যের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য একটা বেগ অনুভব করিয়াছে। বাঙালির সাহিত্যপ্রীতি সম্বন্ধে তিনি আরও কারণ দর্শাইলেন "আমাদের মনের চারি দিকে অত্যন্ত বেশি ঘেঁদাঘেঁসি নেই বলেই, বিরলে আমাদের আসন পড়েছে বলেই, হয়ত আমাদের মানসদৃষ্টি অব্যাহত হতে পারবে। তাছাড়া দুঃখের যে পরম শক্তি আছে। আমরা সংসারে নানা প্রকারে বঞ্চিত।"[২]

সমসাময়িক পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির যেসব সমালোচনা বাহির হইয়াছিল, তাহা একত্র করিলে একখানি গ্রন্থ হয়; সেরূপ সঞ্চয়ন আমাদের কর্তব্যের বাহিরে। তবে সকল শ্রেণীর পত্রিকাই যে একই দৃষ্টিতে কাব্যকে দেখিতে পারে তাহা ভাবিবার কারণ নাই। হীরককে হীরক বলিয়া বুঝিবার জহুরী কম, হীরককে কাঁচ বা কাঁচকে হীরক বলিয়া ধারণা করিবার লোকই জগতে বেশি। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হইলে বিরোধী সমালোচনা তেমন মুখর হয় নাই, যেমন হইয়াছিল নোবেল পুরস্কার লাভের পর। তখন কাব্যকে বিশুদ্ধ কাব্য হইতে দেখিবার অনেকখানি প্রেরণা নানা কারণে অদৃশ্য হইয়াছিল। তবে সমসাময়িক দুই-একখানি পত্রিকার কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত Nation পত্রিকার কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি; এই পত্রিকায় গীতাঞ্জলির সমালোচনা লেখেন ইভলিন আন্ডারহিল[৩]। শ্রীমতী আন্ডারহিল Mysticism ও তজ্জাতীয় গ্রন্থের লেখিকা বলিয়া বিশেষ খ্যাতিমান। সমালোচনা প্রকাশের পর তিনি রোটেনস্টাইনকে লিখিয়াছিলেন, "I am delighted that my review of Mr. Tagore's poems did not displease you and that you even think he may like it. Myself, I felt it to be horribly inadequate although I tried my best. It was deliberately made as detached

১ "The appearance of 'the Poems of Rabindranath Tagore,' translated by himself from Bengali into English, is an event in the history of English poetry and of world poetry....I speak with all gravity when I say that world fellowship in nearer for the visit of Rabindranath Tagore to London." এ. পাউণ্ড Poetryতে যে সমালোচনা লেখেন, তাহা ক্ষুদ্র পত্রিকার উপযুক্ত। *Fortnightly Review* 1913 March সংখ্যার জন্য তিনি এক দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন। Reprinted. Visvabharati Quarterly, Tagore Birthday Number 1941. p293-304. এজরা পাউণ্ড শেষজীবনে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অত্যন্ত ক্রিটিকাল হইয়া উঠেন। তবে য়েট্‌সের ন্যায় দুর্বলতা প্রকাশ করেন নাই। অধ্যাপক বিষ্ণু দে ইংরেজিতে 'রবীন্দ্রনাথ ও এজরা পাউণ্ড' প্রবন্ধে (দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৬৩, পৃ ৮৭...) আলোচনা করিয়াছেন। ১৯১৩ সালে প্রকাশিত পাউণ্ডের প্রবন্ধের অনেকখানি অনুবাদ দিয়াছেন।

২ পত্র। ২৯ অগ্রহায়ণ ১৩১৯। প্রবাসী ১৩৪২ আষাঢ়, পৃ ৩০৭।

৩ Underhill, Evelyn (1875-1941) English poet and writer on mysticism. M. Hubert S. Moore, barrister.

as possible, partly because it seemed to me that the personal note was much overdone in the Introduction and partly because he is too big to sentimentalize over. And I hoped by being objective to hold those out of touch with these thoughts to understand his poems. The book itself I look on as a priceless possession and I am always turning to it."[১]

ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান ইংলণ্ডের আর-একখানি বিশিষ্ট পত্রিকা; উহাতে গীতাঞ্জলির সমালোচনা লেখেন লাসেল আবেরক্রোম্বি (১৮৮১-১৯৩৮); যদিও অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়— তবুও সেই সময়ের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যে তাঁহার সুস্পষ্ট স্থান রাখিয়া গিয়াছেন। গীতাঞ্জলির সমালোচনার মধ্যে বিদুষী ঔপন্যাসিক মে সিনক্লেয়ার নিউইয়র্কের ইভনিং পোস্ট-এ (২৪মে ১৯১৩) দৈনিক গ্রন্থপ্রকাশের সাত মাস পরে পরে যে সমালোচনা লেখেন, তাহাতে সমসাময়িকদের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখা যায় না। তিনি হ্যাম্পস্টেড হীথে রোদেনস্টাইনের বাড়িতে য়েট্‌স্ যে সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করেন, সেদিন উপস্থিত ছিলেন। সেদিনকার কথা স্মরণ করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন, রোদেনস্টাইনের বৈঠকখানাটি সেদিন মন্দিরে পরিণত হইয়াছিল। সুইনবার্নের কবিতার সহিত তুলনা করিয়া লেখিকা বলিলেন রবীন্দ্রনাথের কাব্য সুইনবার্ন হইতেও অধিক মিষ্ট, শেলীর intensity ও subjectivity এবং দার্শনিকত্ব হইতে ইহা গভীর। তাঁহার মতে কোনো পাশ্চাত্য কবিকে রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনা করা যায় না। মিলটন্ মানুষের হৃদয়ের পক্ষে অত্যন্ত গুরুগম্ভীর; এমন-কি ওয়ার্ডসওয়ার্থও নয়, কারণ তিনিও জটিল ও ponderous। লেখিকা উচ্ছ্বসিত আবেগে ঘোষণা করিলেন যে ইংলণ্ডের কোনো মরমিয়া কবির সহিত রবীন্দ্রনাথের তুলনা হয় না।

ইংরেজ বা আমেরিকান নহেন, অথচ ইংরেজি পড়িয়া তাহার সৌন্দর্যরস গ্রহণ করিতে পারেন এমন লোকেরও দুই-একজনের সহিত কবির সাক্ষাৎ হইতেছে। গীতাঞ্জলির প্রুফ পাঠ করিয়া ফ্রান্সের একজন লেখক উচ্ছ্বসিত হইয়া কবিকে বলিয়া উঠিয়াছিলেন যে ফ্রান্স তাঁহারই মত কবির প্রতীক্ষায় আছে। কিন্তু কবি না হইলেও জার্মান দার্শনিক অয়কেন্ গীতাঞ্জলি পড়িয়া তাঁহার ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কবিকে যে পত্রখানি দেন, তাহা উদ্ধৃত হওয়া উচিত। "It was a great joy for me to receive your kind letter and your admirable book. I have read it with greatest interest, and I am delighted through its beauty and profoundity. It is wonderful, how you give from the all-embracing unity a vivid aspect of nature and human life as well religious and artistic; we have nothing in our modern literature that could be compared with your songs... Now I am glad to see you very soon in Rochester, and I hope that we both will consider together the great problems which are common to mankind and for which no people has worked more than the Hindus and Germans..."[২]

আমেরিকায় বাসকালে কবি গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে বহু পত্র পান। বিলাত হইতে রোদেনস্টাইন এক পত্রে কবিকে লিখিতেছেন, "People have felt your worth more than ever I dared to hope and more than you yourself will readily believe. A friend sent the book as a gift to Mrs. Watts, the wife of G. F. Watts[৩] the painter, and she wrote that your book has brought her closer to her

১ পত্রাবলী। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ ভাদ্র, পৃ ৮৮।
২ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র বস্টন হইতে। ১ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩। দ্র প্রবাসী ১৩৪৮ বৈশাখ পৃ ৫৭-৫৮। দ্র. পত্রাবলী। সন্তোষ মজুমদারকে লিখিত। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ ভাদ্র, পৃ. ৮৯-৯০।
৩ পত্রাবলী, ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩১৯। বিশ্বভারতী পত্রিকা।

great husband (dead now some dozen years) than ever since she lost him."[১]

য়ুরোমেরিকায় গীতাঞ্জলি কিভাবে সমাদৃত হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস সমসাময়িক পত্রিকাদি অনুসন্ধান করিলে জানা যায়।[২] বাংলাদেশে সমসাময়িক প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইতেছে তাহাও আমাদের জানা দরকার, সে সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র আলোচনা করিব।

গীতাঞ্জলি ইংরেজি প্রকাশিত হইলে বিদেশ হইতে এদেশের লোকের বিস্ময় হইয়াছিল বেশি। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি লিখিবার খ্যাতি এদেশে ছিল না, কারণ কখনও তাঁহাকে ঐ ভাষায় সাহিত্যের কিছু লিখিতে হয় নাই। তাই অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে বোধ হয় য়েটস ও এনড্রুজের সহায়তায় কবি গীতাঞ্জলির তর্জমা করেন। রবীন্দ্রনাথ কাহার নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছিলেন তাহা নিম্নোদ্ধৃত পত্র পাঠ করিলে বুঝা যাইবে। য়েট্‌স্ তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন সত্য, সেটি কতখানি, রোদেনস্টাইনের আত্মজীবনী হইতে জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন,—"I knew that it was said in India that the success of *Gitanjali* was largely owing to Yeats's re-writing of Tagore's English. That this is false can easily be proved. The original Mss. of *Gitanjali* in English and in Bengali is in my possession. Yeats did here and there suggest slight changes, but the main text was printed as it came from Tagore's hands."[৩]

আমেরিকা হইতে চৈত্র (১৩১৯) মাসের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথ পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন; এবারেও অতলান্তিক মহাসাগর অশান্ত ছিল, তবে জাহাজ বড়ো থাকায় সমুদ্রপীড়ায় তেমন কষ্ট পান নাই। মহাসমুদ্রের উপর নববর্ষের (১ বৈশাখ ১৩২০।১৪ এপ্রিল ১৯১৩) প্রথম দিন কাটিল। কবি অজিতকুমারকে লিখিতেছেন, "প্রত্যেকবার আমার চিরপরিচিত পরিবেষ্টনের মাঝখানে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে নববর্ষের প্রণাম নিবেদন করেছি— কিন্তু এবার আমার পথিকের নববর্ষ, পারে যাবার নববর্ষ।"[৪] এই দীর্ঘপত্রে কবির গভীর মনের নানা মণিকোঠার সন্ধান পাই।

লণ্ডনে ফিরিয়া কবি তাঁহাদের একটা পুরাতন পরিচিত বাসা লইলেন। কয়েকদিন পূর্বে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর লণ্ডনে আসিয়াছিলেন; তিনি হোটেলে থাকেন, প্রায় প্রত্যহই খুল্লতাতের সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। লণ্ডনে আসিয়া কবি জানিতে পারিলেন যে ম্যাকমিলানরা গীতাঞ্জলির যে সংস্করণ ছাপাইয়াছিলেন তাহা নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে; তজ্জন্য তাঁহারা বেশ উৎসাহিত। এদিকে কবির হাতে অনেক তর্জমা জমিয়াছে; সেগুলির ছাপানো সম্বন্ধে কথাবার্তা চলিতে লাগিল। আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসার খবর বন্ধুমহলে রাষ্ট্র না হওয়ায় কয়েকটা দিন (বৈশাখ ১৩২০) চুপচাপ ভাবে চলিয়াছিল; কিন্তু ক্রমে ভিড়ের লক্ষণ দেখা দিলে কবি যুগপৎ শঙ্কিত ও উৎসাহিত হইতেছেন।[৫] এবারে ইংলণ্ডে ফিরিবার পর কবির অনূদিত নাটকগুলি ইংরেজ বিদগ্ধসমাজ সম্বন্ধে সংস্থাপিত করা হইল। প্রথমে কবি একদিন তাঁহার 'চিত্রা' (চিত্রাঙ্গদার অনুবাদ) পড়িয়া শুনাইলেন। জগদীশচন্দ্র বসুকে কবি লিখিতেছেন 'শ্রোতাদের ভালো লাগিয়াছে।'—চিঠিপত্র ৬, পত্র ২৬। সমসাময়িক দৈনিক ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেট লিখিতেছেন: "The reading was received with enthusiasm by the audience; and the poet a quiet, almost

১ George Frederick Watts (1817-1904).

২ ১৯১৪ মে-জুন মাস পর্যন্ত গীতাঞ্জলি (ইং) ৮ লক্ষ খণ্ড বিক্রীত হয়। প্রবাসী শ্রাবণ ১৩২১, পৃ. ৩৯৫।

৩ Men and Memories 1900-1922 vol II p 301.

৪ ১৭ই এপ্রিল ১৯১৩। [হ্যাম্পস্টেড হীথ্ রোদেনস্টাইনের বাড়ি]।

৫ চিঠিপত্র ৫, পৃ ২১। ৬ মে ১৯১৩। ২২শে বৈশাখ ১৩২০।

a shy man—was overwhelmed with compliments by the many admirers who crowded round him before he could escape from the room." এইটি ইণ্ডিয়া সোসাইটির গৃহে পঠিত হয়। এই সোসাইটি 'চিত্রা' প্রথম প্রকাশ করিল।

এ ছাড়া আইরিশ থিয়েটারে (১৯১৩ মে ১০) কবির ডাকঘরের তর্জমা Post Officeএর অভিনয় হয়; ইহাই বিদেশে কবির প্রথম নাট্যাভিনয়। সেন্ট এন্‌ডা'স কলেজের গৃহনির্মাণ ফান্‌ড উঠাইবার জন্য যে দুটি নাটকের অভিনয় হয়, তার একটি পোস্ট অফিস।—চিঠিপত্র ৬, পৃ. ২২৮। Little Theatreএ রাজা (The King of the Dark Chamber) অভিনীত হইয়াছিল।

অজিতকুমারকে কয়েকদিন পরে যে পত্রখানি লেখেন তাহাতে অতি পরিষ্কার আত্মবিশ্লেষণ আছে। কবি লিখিতেছেন, "চারি দিকে আমার নিজের নামের এই যে ঢেউতোলা এ আমার কিছুতেই ভাল লাগছে না। এই নিয়ে আমার নিজের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলছে।··· আমার মনের ভিতরে কেবলি বলছে এসমস্ত বন্ধন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে কোনো উপায়ে কোথাও পালাতে হবে। অথচ বাইরের দিক থেকে যে মোহ কেটে গেছে তা নয়— দরজার কাছে যে পেটমোটা লোভী বসে আছে, পথিকদের কাছ থেকে হাত পাততে অভ্যাস সে এখনো ছাড়তে পারে নি; এমনি করে এই দ্বারীটা তার অন্তরনিকেতনের ধনীকে নিজের লুব্ধ দারিদ্র্যের দ্বারা প্রত্যহ অপমানিত করছে— এ লোকটাকে বরখাস্ত করতে না পারলে তো উপায় দেখি নে।"[১]···

কবির এই সংগ্রাম চিরদিনের— সম্মানের বোঝায় চিত্ত পীড়িত ক্ষুব্ধ হয়; কিন্তু কোনোদিন তাহার পীড়ন হইতে আত্মরক্ষার-চেষ্টায় সফলকামও হইতে পারেন নাই।

যাহাই হউক, ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তনের অল্পকাল মধ্যে বন্ধুবান্ধবগণ আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির সন্ধান পাইলেন। Quest নামে বিখ্যাত তত্ত্বজ্ঞানের পত্রিকার সম্পাদক রেভারেণ্ড জি. আর. এস. মীড. তাঁহাদের সমিতির তত্ত্বাবধানে কবির বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করিলেন। ছয় সপ্তাহে ছয়টি প্রবন্ধ ক্যাক্স্টন হলে পঠিত হইল; পরে সেগুলি 'সাধনা' (*Sadhana*—The Realisation of Life) নামে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়।[২] আমেরিকা বাসকালে বক্তৃতাগুলি মুদ্রণের প্রস্তাব আসিয়াছিল। কিন্তু কবি ইংলণ্ডের ভাবুকসমাজের মতামত সংগ্রহ না করিয়া গ্রন্থ প্রকাশে রাজি হন নাই। কবি প্রাচীন ভারতের ধর্মসাধনার মূল তত্ত্বটি বক্তৃতার মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে চাহিলেন। সাধনার ভাষণগুলি মৌলিক নহে, ধর্ম ও শান্তিনিকেতন উপদেশমালা অবলম্বনে পাশ্চাত্য শ্রোতার উপযোগী করিয়া লিখিত।[৩]

কবির বহুদিনকার স্বপ্ন পশ্চিমে ভারতের ভাবাত্মক আদর্শবাদের প্রচার। বিংশশতকের গোড়ায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ইংলণ্ডে ভারতীয় দর্শন প্রচারকল্পে চেষ্টা করিলে কবি যে কত সুখী হইয়াছিলেন, জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত একখানি পত্র হইতে তাহার আভাস পাই। কিছুদিন হইতে অক্সফোর্ড বা অন্য কোনো বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে বসানো যায় কিনা সেকথা কবির মনে উদিত হয়। বলা বাহুল্য, রাজনৈতিক কারণই এইসব প্রয়াসের প্রধান অন্তরায়। তাই কবি এইবার পশ্চিমে আসিয়া ভারতের ভাবাত্মক সাধনার কথা ব্যাখ্যানে স্বয়ং প্রবৃত্ত হইলেন।

১ পত্র। অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত (২৩ জুন ১৯১৩)।

২ *Sadhana*, First Published October 1913. Macmillan & Co., Ltd., London.

৩ কয়েকটি অনুবাদ অধ্যাপক অজিতকুমার চক্রবর্তী কৃত। কবি প্রয়োজনমত অদলবদল করিয়া লন। 'কর্মযোগ' সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত অনুবাদ।

ক্যাক্স্টন হলে কবির প্রথম বক্তৃতা হইল ১৯ মে ১৯১৩। ইহার পর প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া বক্তৃতা হইয়াছিল। বক্তৃতার বিষয়গুলি—১. The Relation of the Individual to the Universe (ব্যষ্টি ও সমষ্টি সম্বন্ধে)। ২. Soul Consciousness (আত্মবোধ) ৩. The Problem of Evil (পাপবোধ) ৪. The Problem of Self (আত্মসমস্যা) ৫. Realisation in Love (ভক্তিযোগ] ৬. Realisation in Action (কর্মযোগ) ৭. The Realisation of Beauty (সৌন্দর্যবোধ)। ৮. The Realisation of the Infinite (বিশ্ববোধ)।

সাধনার বক্তৃতাগুলির উপনিষদের ঋষিদের বাণীর ব্যাখ্যা বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। তবে এ ব্যাখ্যান কবির নিজস্ব-- প্রাচীনের পুনরুক্তি নহে। যে সংস্কৃতি ও সাধনার ধারা বহু সহস্র বৎসর ভারতের চিত্তকে প্লাবিত করিতেছে, তাহারই উৎসমুখ হইতে সংগৃহীত ভাবাত্মক বাণী কবিকণ্ঠে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। 'সাধনা'র ভূমিকায় কবি লিখিলেন, "The meaning of the living words that come out of the experiences of great hearts can never be exhausted by any one system of logical interpretations They have to be endlessly explained by the commentaries of individual lives, and they gain an added mystery in each revelation." তিনি আরও বলিলেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা ভারতের ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন সত্য; তবে তাঁহাদের ঔৎসুক্য বিজ্ঞানীর কৌতূহলমাত্র; তাঁহারা ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বর দিক হইতে যাহা আলোচনা করিয়াছেন তাহা আমাদের সাধনার সামগ্রী। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদকে পশ্চিমের নিকট সেই দিক হইতে প্রচার করিলেন।

ক্যাক্সটন হলের বক্তৃতাগুলিতে শিক্ষিত সমাজের উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল, তাহার আভাস পাই কবির প্রথম-চরিতকার আর্নেস্ট রীহ্‌সের গ্রন্থ হইতে (১৯১৬)। তিনি লিখিতেছেন—

"...They had a profound effect on their hearers, Rabindranath Tagore has that unexplainable grace as a speaker which holds an audience without effort, and his voice has curiously impressive, penetrative tones in it when he exerts it at moments of eloquence. Something foreign and precise in the turn of an occasional word there may be; and there are certain high vibrant notes which you never hear from an English speaker. But these differences, when for instance, he spoke of 'Ravana's city where we live in exile', or of Brahma, or when he paraphrased a text of the Upanishads, only helped to remind us in the Westminister Lectures that here was a speaker who was a new conductor of the old wisdom of the east, and who, by some art of his own, had turned a London hall into a place where the sensation, the hubbub and actuality of the Western world were put under a spell." p. 116-117.

আর্নেস্ট রীহ্‌স Everyman Libray-র সম্পাদকরূপে ইংরেজি-জানা শিক্ষিত লোকের নিকট সুপরিচিত; রবীন্দ্রনাথের প্রথম চরিতকার হিসাবেও তিনি অমর হইয়াছেন। কবির সহিত ইঁহার পরিচয়ের ইতিহাসটি এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। রবীন্দ্রনাথকে তিনি সর্বপ্রথম দেখেন আল্‌বার্ট হলে Little Theatre-এ য়েট্‌সের উদ্যোগে 'রাজা' (*The King of the Dark Chamber*) অভিনয়ের সময়ে। এই প্রথম দর্শন সম্বন্ধে রীহ্‌স লিখিয়াছেন, 'a fleeting glimpse, but I carried away a vivid impression." ইহার কয়েকদিন পরে একদল বাঙালি ছাত্র কবিকে লইয়া রীহ্‌সের বাড়িতে যান। রীহ্‌স লিখিতেছেন, "So unusual, so unlike any ordinary

guest he looked, but so like my idea of an old Hebrew prophet, that I felt almost afraid of him as he entered, But he proved to be the most gracious and natural of guests and the most easy to entertain." (*Letters from Limbo*, p 170)

'সাধনা'র বক্তৃতা প্রদানের অল্প কয়দিনের মধ্যে জুন মাসের শেষদিকে কবি Duchess Nursing Home হাসপাতালে আশ্রয় লইলেন। পাঠকের স্মরণ আছে রবীন্দ্রনাথ অর্শরোগে বহুকাল ভুগিতেছিলেন; আমেরিকায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করান, বিশেষ ফল দর্শায় নাই। লণ্ডনে আসিয়া তিনি বহুব্যয়সাধ্য অস্ত্র চিকিৎসা করাইতে রাজি হন নাই; অবশেষে রোদেনস্টাইনের মধ্যস্থতায় ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ শল্যচিকিৎসক রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার কথা শুনিয়া নামে মাত্র ফী লইয়া অস্ত্রোপচার করিলেন। তাঁহাকে প্রায় একমাস হাসপাতালে থাকিতে হইয়াছিল। হাসপাতালে বৈকাল বেলায় অতিথি ও দর্শকে তাঁহার ক্ষুদ্র প্রকোষ্টটি ভরিয়া যাইত— ফুলের মালায়, তোড়ায় তাঁহার আসন আচ্ছন্ন হইয়া যাইত। রবীন্দ্রনাথকে নিকট হইতে জানিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছিল, তাঁহারা জানেন তিনি অন্যের সেবা গ্রহণ করিতে কিরূপ কুণ্ঠা বোধ করিতেন। সাধ্যপক্ষে নিজের কষ্টকে অন্যের বোঝা করিয়া তুলিতেন না।

জুলাই এর শেষভাগে কবি হাসপাতাল হইতে বাহির হইলেন; কল্পনা করিতেছেন অগস্টের আরম্ভেই জর্মেনিতে যাইবেন; ভাবিতেছেন ব্ল্যাক ফরেস্ট-এর কাছাকাছি কোথাও আড্ডা করিবেন। জরমেনিতে যাইবার ইচ্ছা হওয়া মাত্রই কবি কাইসারলিংকে পত্র লিখিয়া ঐ সংবাদ দেন ও তাঁহাকে তথাকার কয়েকজন বিশিষ্ট লোকের নিকট পত্র দিবার জন্য অনুরোধ করেন। কাইসারলিং পত্র পাইয়াই জারমানির কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মনীষী ভাবুকের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জারমানিতে যাওয়া হইল না, কারণ দেশে ফিরিবার জন্য মন উতলা হইতেছে।

কবি মীরা দেবীকে পত্রে লিখিতেছেন, "দেশে যাবার জন্যে মনটা উতলা হয়ে উঠেছে। এখানকার লোকসমাজের টানাটানিতে আমার মনের ভিতরটাতে অত্যন্ত ক্লান্তি এসেছে। আমাদের দেশের জনশূন্য নিভৃত কোণটির মধ্যে কিছুদিন চুপচাপ করে বসে থাকতে পারি তা হলে হাড়গুলো জিরয়। কিন্তু আবার ভাবি সেখানে গিয়ে নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়্‌তে হবে— তা ছাড়া এবার ফিরে গেলে সেখানে মানুষের ধাক্কা পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে যাবে— তার থেকে নিজেকে বাঁচানো আমার পক্ষে ভারি শক্ত হবে— এর উপর আবার আমার সমালোচক বন্ধুদের দল আছে— তাদের কণ্ঠস্বর নিশ্চয়ই পূর্ব্বের চেয়ে আরো অনেক উচ্চতর সপ্তকে চড়বে। মানুষকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলবার উপকরণ সেখানে যে কিছু কম আছে তা বলতে পারি নে। তাহোক তবু সমস্ত স্বীকার করে নিতে হবে— নিজের বাসা ছেড়ে কোথায় বা ঘুরে বেড়াব।"[১]

কয়েকমাস পূর্বে আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কুয়াশাচ্ছন্ন লণ্ডনে বাসকালে বাংলাদেশের আলোর জন্য হৃদয় পিপাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু দেশে ফিরিবার কল্পনাতেই মন যে আজ কিরূপ বিব্রত, তাহা একখানি পত্র সাক্ষ্য দিতেছে। তিনি ইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন, "যখন ভেবে দেখি দেশে ফিরে গিয়ে চারি দিক থেকে কত ছোটো কথাই শুনতে হবে, কত বিরোধ বিদ্বেষ, কত নিন্দাগ্লানি,— তখন মনে মনে ভাবি আরো কিছু দিন থাক্, যতদিন পারি এই সমস্ত কাকলী থেকে দূরে থাকি। কিন্তু অপ্রিয়তাকে পাশ কাটিয়ে চলা চলে না, তাকে ঠেলে চলাই হচ্ছে প্রকৃষ্ট পন্থা···যা ভালো লাগে না তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে ডরিয়ে ডরিয়ে চলব না।"[২]

নার্সিং হোম হইতে বাহিরে আসিবার অল্পকাল পরে, কবি Cheyne Walk -এর বাসাবাটিতে আছেন—

১ চিঠিপত্র ৪, পৃ ৫৮-৫৯। লণ্ডন অগস্ট (?) ১৯১৩।

২ চিঠিপত্র ৫, পৃ ২৬। লণ্ডন। ৬ মে ১৯১৩।

বহুকাল পরে গীতশ্রীর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন ; এইসময়ে যে গান-কয়টি লেখেন সেগুলি গীতিমাল্যের সুপরিচিত সংগীত— 'তোমারই নাম বলব' 'অসীম ধন তো আছে' 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে' (২৪ আগস্ট), 'ভোরের বেলায় কখন এসে' 'প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে' (২৫শে), 'জীবন যখন ছিল ফুলের মতন' (২৭শে)। শেষ গানটি লেখেন Far Oakridge-এ রোটেনস্টাইনের নূতন বাড়িতে।[১] দেশে ফিরিবার পথে দুই দিনের জন্য তিনি রোটেনস্টাইনের নূতন বাড়িতে বাস করিয়া যান। কিন্তু বন্ধুর গৃহে বেশিদিন থাকা হইল না,— দেশে ফিরিবার সময় নিকটেই।

রবীন্দ্রনাথ ও কালীমোহন ঘোষ লিভারপুল হইতে City of Lahore নামে জাহাজে উঠিলেন (৪ সেপ্টেম্বর। ১৯ ভাদ্র ১৩২০)। কালীমোহন শান্তিনিকেতনের শিক্ষক ; রবীন্দ্রনাথের বিলাত যাইবার পূর্বে তিনি নানা দুঃখের মধ্য দিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিলাত যান— শিক্ষাসম্বন্ধে ও বিশেষভাবে শিশুশিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। বৎসর দেড় লণ্ডনে থাকিয়া তিনি কবির সহিত ফিরিলেন। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, কবি তাঁহার জমিদারিতে গ্রামোন্নয়নকল্পে যে-কয়জন যুবকের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের অন্যতম হইতেছেন কালীমোহন। পরবর্তী যুগে এই কালীমোহন রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতন গ্রামসেবা ও সংস্কার বিভাগের প্রতীকস্বরূপ হইয়া খ্যাতিমান হন। যথাস্থানে তাঁহার কথা আলোচিত হইবে। রথীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার পত্নী প্রতিমা দেবী কবিকে জাহাজে উঠাইয়া দিয়া য়ুরোপ ভ্রমণে চলিয়া গেলেন। অতঃপর তাঁহারা নেপলসে কবির সঙ্গে পুনরায় মিলিত হন।

লিভারপুলে জাহাজে উঠিবার পূর্বে ১৪ই আগস্ট (১৯১৩) তারিখের একখানি 'বেঙ্গলি' দৈনিক কবির হস্তগত হইল ; সেই কাগজ হইতে কবি জানিতে পারিলেন যে বর্ধমানে প্রলয়ংকরী বন্যা হইয়া গিয়াছে। বিদায়কালে যেসব সাংবাদিকের দল কবির নিকট হইতে বাণী গ্রহণের জন্য উপস্থিত হন, তাহাদের নিকট তিনি অত্যন্ত তীব্রভাবে বলেন যে বাংলাদেশের এতবড়ো একটি মর্মন্তুদ ঘটনা বিলাতের কোনো কাগজে প্রকাশমাত্র হয় নাই অথচ তিনি জানিতে পারিয়াছেন বন্যার বিস্তারিত সংবাদ জার্মান কাগজে যথাসময়ে বাহির হইয়া গিয়াছিল। ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া মন্তব্য করিলেন, "we do not deserve his Gitanjali if we do not care about the people to whom he first made those songs in the affecting Bengali Rythm."

'সিটি অব লাহোর' জাহাজ লিভারপুল ছাড়িয়া জিব্রালটার ঘুরিয়া চলিল ; কবি ইচ্ছা করিয়া এই দীর্ঘপথের জাহাজে আরোহণ করেন। জাহাজে ভিড় নাই —'চেইনি ওয়াকে' থাকিতে গানের যে সুরধারা অন্তরে বহুকাল পরে নামিয়াছিল, জাহাজে উঠিয়া তাহাকে আবার ফিরিয়া পাইলেন। এই গানের ধারা মাঝে মাঝে অবরুদ্ধ হইলেও— বহুকাল চলে, ও গীতিমাল্যের অন্তে আসিয়া থামে। জাহাজে বসিয়া রবীন্দ্রনাথ এই কয়টি গান রচনা করেন—

'ভেলার মতো বুকে টানি', [১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৩]। মধ্যধরণীসাগর। গীতিমাল্য ৩৮

'বাজাও আমারে বাজাও', ১৪ সেপ্টেম্বর [২৯ ভাদ্র ১৩২০] মধ্যধরণীসাগর। গীতিমাল্য ৩৯

'জানি গো দিন যাবে। এ দিন যাবে', [১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৩] (৩ আশ্বিন) রোহিতসাগর। গীতিমাল্য ৪০

'নয় এ মধুর খেলা', [১৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৩]। (৩ আশ্বিন) রোহিতসাগর। গীতিমাল্য ৪১

জাহাজে করিয়া দেশে ফিরিতে পুরা একমাস লাগিল ; ৪ অক্টোবর (১৮ আশ্বিন) জাহাজ বোম্বাই বন্দরে পৌঁছিল। জাহাজে তাঁহার সঙ্গী ছিলেন শিশু সাহিত্যিক ৺সুকুমার রায়। তাহার দুই দিন পরে কবি কলিকাতায় ফিরিলেন। বাংলাদেশ হইতে মোট প্রবাসকাল ১ বৎসর ৪ মাস ১২ দিন [২৪ মে ১৯১২ হইতে ৬ অক্টোবর ১৯১৩। ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ হইতে ২০ আশ্বিন ১৩২০।]।

১ *Letters to a Friend*, p 88। তারিখ 16th আছে: উহা ভুল 26th August 1913 হইবে। ২৬শে অগস্ট তারিখ তিনি এণ্ড্রুসকে শান্তিনিকেতনে লিখিতেছেন যে তিনি মোটরযোগে রোটেনস্টাইনের গ্রামাবাসে যাইতেছেন।

১৯১২ সালের নভেম্বর মাসে লণ্ডনে ইণ্ডিয়া সোসাইটির আনুকূল্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক (৭৫০ কপি) গীতাঞ্জলি মুদ্রিত হয়। প্রধানত সোসাইটির সদস্যদের মধ্যে বিতরিত হইবার জন্যই ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। অতঃপর ১৯১৩ সালের মার্চ মাসে ম্যাকমিলান কোম্পানি উহার প্রকাশ ও প্রচারের ভার গ্রহণ করেন; এই বৎসরের নভেম্বর মাসে গীতাঞ্জলির জন্য রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কার প্রদত্ত হয়। রয়টারের তারযোগে এই সংবাদ পৃথিবীময় রাষ্ট্র হইলে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া যুগপৎ দেখা দিল— ভালো মন্দ ভালোয় মন্দয় মিশানো নানারূপ মতামত। ক্ষুদ্র একখানি কবিতার বই, তাহাও আবার অনুবাদ— কী করিয়া জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার পাইবার উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইল— তাহারই গবেষণা শুরু হইল সর্বদেশে। সমসাময়িক একখানি কাগজও ছিল না, যাহাতে বাঙালি কবির এই কৃতিত্বের সংবাদটি ও তৎসঙ্গে কিছু-না কিছু মন্তব্য প্রকাশ না হইয়াছিল।

গত একবৎসর গীতাঞ্জলির ভালো মন্দ নানারূপ সমালোচনা হইয়াছিল; সাহিত্যের দিক দিয়া সে বিচার। কিন্তু নোবেল পুরস্কার ঘোষণার পর হইতে সমালোচনা চলিল কবিকে লইয়া, কবিতা লইয়া নয়। কারণ বহুদেশ নানা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণ হইতে নিজ নিজ দেশের বিশেষ লেখকের জন্য এই সম্মান লাভের আশায় ছিল। ব্যর্থকাম হওয়ায় তাহারা সকলেই কবিকে, কবির কবিতাকে, সুইডিস অ্যাকাডেমিকে আক্রমণ শুরু করিল। একদলের আপত্তির কারণ, রবীন্দ্রনাথ ককেশীয় শ্বেতাঙ্গ নহেন, তিনি প্রাচ্যদেশীয়, তাঁহার নামই উচ্চারণ করা যায় না! তাঁহাকে এই পুরস্কার! ইংরেজের অভিযোগ, টমাস হার্ডি থাকিতে বৃটিশ-ভারতের এক কবিকে জগতের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রদত্ত হইল কেন! ফ্রান্সের অভিযোগ, আনাতোল ফ্রান্সের ন্যায় জগতবরেণ্য ঔপন্যাসিককে সম্মানিত না করিয়া একজন এশিয়াটিককে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্মান দান করা হইল কেন! জারমানরা Rosegger নামে একজন সাহিত্যিকের জন্য বহুকাল হইতে প্রচারকার্য করিতেছিল, তাহাদের মুখপত্র একখানি জারমান কাগজ ঘোষণা করিল, "the protest of all European nations will be raised against Rabindranath Tagore"।[১] কেবলমাত্র ঈর্ষা প্রকাশ করিয়াই ক্ষুব্ধ জাতিসমূহ ক্ষান্ত হইল না; তাহারা ইহার মধ্যে গূঢ় অভিপ্রায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। ভিয়েনার একখানি জারমান কাগজ (Neue Freic Presse) লিখিল, "This will remain the secret of the judges in Stockholm."[২] আর একখানি ইংরেজি বিখ্যাত দৈনিক বলিলেন যে, সুইডিশ অ্যাকাডেমির সদস্যগণ প্রাচীনপন্থী (a conservative body), তাঁহাদের পক্ষে আনাতোল ফ্রান্সের scepticism ও হার্ডির pessimism বরদাস্ত করা কঠিন।[৩] আর একজন সম্পাদক ক্রুদ্ধ হইয়া লিখিলেন যে ঐরূপ কবিতা যে-কেহ লিখিতে পারিত! (*New Age*, 20. 11. 13)। ভারতবর্ষেও যে লোকে বিস্মিত হয় নাই, তাহা নহে; অনেক লেখক নিজ নিজ রচনা ইংরেজিতে অনুবাদ করাইয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করিলেন; অনেকেই ভাবিয়াছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের ঐ সরল গীতাঞ্জলি যদি পুরস্কারের উপযুক্ত হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদের রচনাই বা হইবে না কেন।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি নোবেল পুরস্কার পাইবার উপযুক্ত লোকনির্বাচনের ভার আছে সুইডিশ অ্যাকাডেমির উপর। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' ছাড়া আর কোনো গ্রন্থ অ্যাকাডেমির সদস্যদের হস্তগত হয় নাই, কারণ 'গার্ডনার'

১ দ্র-Empire 1914, January 30.

২ *Letters to a Friend*, p 39-40.

৩ শনিবারের চিঠি, ১৩৪৮ আশ্বিন। নলিনীকান্ত ভট্টশালী, ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ। দ্র, প্রবাসী ১৩১২ চৈত্র, পৃ ৫৫৯। সভা হয় ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪। ১২ই ফাল্গুন।

৪ Basler Anzeiger, Basel, 15 Nov. 1913, quoted from Aranson, p. 8.

৫ Aranson, *Rabindranath through Western Eyes*, p. 6.

প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালে নভেম্বর মাসে— পুরস্কার ঘোষণার সময়ে উহার বিচার হয় নাই। সুতরাং এই একখানি কাব্য বিচার করিয়া তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কোনো কোনো ইংরেজি পত্রিকার ধারণা ছিল যে সুইডদের মধ্যে কেহ কেহ রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার কথা পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন। ১৯১১ সালে জারমেনির যুবরাজ (শেষ কাইজার উইলহেলমের জ্যেষ্ঠ পুত্র বা ক্রাউনপ্রিন্স) ভারত-ভ্রমণে আসেন; তিনি এ দেশ সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান। অতঃপর আসেন সুইডেনের রাজকুমার উইলিয়াম; তিনি জোড়াসাঁকোয় অবনীন্দ্রনাথের চিত্রশালা দেখিতে আসেন এবং রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত হন; তিনি তাঁহার ভ্রমণকাহিনী 'যেখানে সূর্য আলো দেয়' গ্রন্থে লেখেন, "In all my life, I never spent moments so poignant as at the house of the Hindu poet Rabindranath Tagore."[১] যে রাজকুমার রাজসিংহাসন না পাইবার সম্ভাবনায় দেশত্যাগী হইয়া বিশ্বভ্রমণে বাহির হইয়া পড়েন, তাঁহার সহিত রবীন্দ্রনাথের সামান্য পরিচয় কতখানি এই পুরস্কার লাভের সহায়তা করিয়াছিল সে সম্বন্ধে কিছুই জোর করিয়া বলা যায় না।

মোটকথা, রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রতিভা সম্বন্ধে বৃটিশ গভর্মেণ্ট এতাবৎকাল যে কোনো কথা বলেন নাই— তাহাতেই য়ুরোপের বিস্ময়। ইংরেজ-পাবলিক ভারত-প্রত্যাগত ইংরেজের নিকট হইতে কখনো রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোনো কথা শুনে নাই। কিছুকাল পূর্বে ভারতীয় সংগীত-বিশারদ মিঃ ফক্সস্ট্রাংওয়েজ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রবীন্দ্রনাথকে সম্মানসূচক ডিগ্রী দানের প্রস্তাব লর্ড কর্জনের নিকট উত্থাপন করেন। কর্জন প্রশ্নকারীকে বলেন যে ভারতে রবীন্দ্রনাথ হইতে অধিক শক্তিসম্পন্ন লেখক অনেক আছেন। রোটেনস্টাইন যিনি এই কাহিনীটি বিবৃত করিয়াছেন, তিনি অবাক হইয়া লিখিতেছেন, 'সে-ভাগ্যবান কাহারা যাঁহারা রবীন্দ্রনাথ হইতে প্রতিভাবান্। আমার দুঃখ ইংলণ্ড রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার যথাযোগ্য সমাদর প্রদর্শন করিতে পারিল না। অবশেষে রবীন্দ্রনাথের কবিযশের প্রথম অভিনন্দন হইল একটি অ-বৃটিশ দেশ হইতে।[২] রোটেনস্টাইনের আরও অবাক লাগিতেছে যে, তিনি এতাবৎ কাল যেসব ইংরেজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার কথা তাঁহাকে কখনো বলেন নাই। তিনি অভিযোগ করিয়াছেন যে সার্ জন উড্‌রফ যিনি ভারতের ধর্মশাস্ত্র ও হিন্দুসংস্কৃতি লইয়া অনেক গবেষণা করিয়াছেন, তিনি কখনো রবীন্দ্রনাথের নাম তাঁহার কাছে করেন নাই। রোটেনস্টাইনের আশ্চর্য হইবারই কথা; কিন্তু আমরা হই না। সাধারণ ভারতপ্রবাসী ইংরেজ যে-শ্রেণীর রাজনীতি ও বাণিজ্যরীতি লইয়া ব্যাপৃত থাকেন তাহাতে তাঁহাদের পক্ষে বাংলাশিক্ষা করা বা বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে সংবাদ রাখা অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার। উড্‌রফ অবশ্যই সে-শ্রেণীর লোক নহেন; তবে তিনি যেসব তন্ত্রমন্ত্রাদি লইয়া আলোচনা করিতেন, সেসব বিষয়ের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোনো শ্রদ্ধা ছিল না এবং সেই মনোভাব কখনো অব্যক্ত রাখিবার চেষ্টাও তিনি করেন নাই। ফলে উড্‌রফের নিকট রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্বের কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না।

য়ুরোপে যাঁহারা প্রাচ্য বা বিশেষভাবে ভারতীয় প্রাচীন ধর্ম লইয়া আলোচনা করিতেন, আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহাদের বোধ অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিল। প্রাচ্য বা Oriental কাব্য বলিতে পশ্চিম দেশীয় সাধারণ শিক্ষিত লোকের একটি অদ্ভুত ধারণা ছিল; রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি সে-শ্রেণীর প্রাচীন ও প্রাচ্য exotic রচনা নহে, সেজন্য গীতাঞ্জলির কোনো বৈশিষ্ট্য প্রত্নতাত্ত্বিক প্রাচ্য পণ্ডিতদের চোখে পড়ে নাই। কাব্য-যে কাব্য এবং সে-কাব্য সকল দেশের কাব্যরসিককে অপূর্ব আনন্দ দান করিতে পারে এই ধারণা তাঁহাদের ছিল না। এই শ্রেণীর ক্রিটিকরা

১ The Noble Committee is a conservative body, and the scepticism of Anatole France and the pessimism of Hardy are too Unorthodox to find favour." *Daily News and Leader*, London, 24 Nov. 1913. See Aranson, p. 10.

২ Quoted from Aranson, p 7 দ্র, *Truth*, London, 24 Nov. 1913.

৩ I regretted that England had left it to a foreign country to make the first emphatic acknowledgement of his contribution to literature.—Rothenstein, *Men and Memories* II p. 266.

বলেন যে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল এবং তজ্জন্য তাঁহার রচনায় যথার্থ 'প্রাচ্য' গৌরব পাওয়া যায় না; সুতরাং তিনি যে সমাদর ও সম্মান লাভ করিয়াছেন তাহা যথোচিত হয় নাই। এই শ্রেণীর সমালোচক হইতেছেন পণ্ডিত orientalistগণ।

মোটকথা, নোবেল পুরস্কার ঘোষণা মাত্রই য়ুরোপের রাজনীতি-নিয়ন্তা ধনিকশ্রেণী পরিচালিত পত্রিকাসমূহের সুর বদলাইয়া গেল। ১৯১২ সালের নভেম্বর মাসে গীতাঞ্জলি প্রকাশের সময় হইতে ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে নোবেল প্রাইজ ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও দর্শন সম্বন্ধে যেসব সমালোচনা বাহির হইয়াছিল তাহার মধ্যে আর যাহাই থাকুক, রাজনীতির কূটপ্রশ্ন ছিল না। ঐ পর্বে ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ গীতাঞ্জলির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন— এডমণ্ড গস্, ল্যাসলে অ্যাবারকম্বি, আরনেস্ট রীহস, স্টপফোর্ড ব্রুক, লোয়েস ডিকিন্‌সন স্টার্জমুর, ও তরুণ সাহিত্যিক এজ্‌রা পাউণ্ড, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ প্রভৃতি। কিন্তু ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে নোবেল পুরস্কার ঘোষাণর পর হইতে কাব্য ছাড়িয়া লোকে কবিকে লইয়া পড়িল; কবির দেশ কবির জাতি প্রভৃতি অনেক প্রশ্ন যুগপৎ তাহাদের মনে হইল। এই শ্রেণীর পত্রিকাওয়ালাদের সমালোচনাকে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না; ইহাদের সমালোচনা উদ্দেশ্যমূলক, প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠত্ব তাহারা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত, কারণ প্রাচ্য-প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলে প্রাচ্য দেশের উপর আধিপত্য করিবার অজুহাত অনেকখানি দুর্বল হইয়া পড়ে। সেইজন্যই সুইডিস অ্যাকাডেমির পুরস্কার ঘোষণার ব্যাপারটাকে লইয়া তাহারা এমন আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল।

গীতাঞ্জলি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইবার বহু পূর্বে ট্রোকাডেরো হোটেলের সম্বর্ধনার পর টাইমস্ পত্রিকা সেই সপ্তাহে যে সমালোচনা করিয়াছিল, তাহাকে আমরা উদ্দেশ্যহীন সাহিত্যিক সমালোচনার নমুনারূপে গ্রহণ করিতে পারি। টাইম্‌সের প্রধান প্রবন্ধের নাম ছিল The triumph of art over circumstance। বাক্যটি অর্থবোধক; ভারতের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক অবস্থায় যখন যাহাই থাক্, সে যে আর্টের ক্ষেত্রে আপনাকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করিয়া সমস্ত প্রতিকূলতার উপরে উঠিযাছে ইহাই ছিল লেখকের বক্তব্য। এই সমালোচনাকেই আমরা বুনিয়াদি-ইংরেজ-সাহিত্যরসিকের প্রমাণ-সমালোচনা বলিয়া গ্রহণ করিব। লেখক বলিয়াছিলেন—

"The inner human likeness is far more essential than any outward dissimilarity and true great art assures us that in all ages and countries the hearts of men are indeed one.

"A good translation must rob a great poem of many beauties, but it will keep the essence for those readers who know how to find it; and Mr. Tagore has won the admiration of English poets by his own translations of his works. To them he is not a Bengali but a brother poet and they enjoy his works, not because they are different from their own amusing for their local colour, but because being poetry, they are of the same nature as all other poetry, Eastern or Western."[১]

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর, তাই কবির কাব্য ছাড়িয়া কবির সমালোচনায় যাঁহারা প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহারা 'রাজনৈতিক' সমাজবাদী— ইংরেজ আর্টিস্ট, সাহিত্যিক বা ভাবুকসমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নহেন।

কিন্তু এইখানে সমালোচনার ছেদ পড়িল না। ১৯১৩ নভেম্বর মাসে নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হইবার ছয় মাসের মধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধ য়ুরোপকে গ্রাস করিল। দুই বৎসর পরে বিবদমান সকল জাতিকে তীব্রভাবে কবি আক্রমণ করিলেন *Nationalism* গ্রন্থে। সে বক্তৃতাগুলি কাহারও ভালো লাগে নাই; সকলেরই আশঙ্কা পাছে নবযৌবনের দলের হঠাৎ আত্মচেতনা হয় ও তাহারা এই মহাজাতীয় বহ্নি-উৎসবে পরস্পর পরস্পরকে নিক্ষেপ না করে। সমস্ত

১ Quoted from Modern Review 1912 September, p 318.

য়ুরোপ কবির উপর বিরক্ত। সেই সঙ্গে কবির রচনার উপরও তাহাদের আক্রোশ গিয়া পড়িল।

যুদ্ধান্তে ভারতের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর কবির 'নাইট' উপাধি ত্যাগের (১৯১৯ জুন) প্রতিক্রিয়ায় ইংলণ্ড, তাহার মিত্র রাজ্য ও বিশেষভাবে মার্কিনমুলুক মুখর হইয়া উঠিল। মিত্র রাজ্যসমূহের মধ্যে কবির সম্মান যতখানি কমিল, পরাভূত মধ্য-য়ুরোপে কবির প্রতি ততখানি শ্রদ্ধাঞ্জলি বাড়িল (১৯২০-২১)। ইহার পর প্রতিক্রিয়ায় অ্যাংলো-আমেরিকান বিদ্বেষ চরমে উঠিল। সমসাময়িক পত্র তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। কবি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যথার্থ স্বার্থবুদ্ধিহীন সমালোচনার পর্ব হইতেছে ১৯১২ নভেম্বর হইতে ১৯১৩ অক্টোবর পর্যন্ত পর্বটি।

বিদেশে বাসকালে কবির গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হইয়াছিল, এ ছাড়া কবি অনেকগুলি বইয়ের তর্জমা ছাপাইবার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিলেন। 'গার্ডনার' তো অনেক আগেই মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল; কিন্তু মুদ্রিত হইল ১৯১৩ সালের অক্টোবর মাসে। এই কাব্যখণ্ড উৎসর্গ করেন কবি য়েট্‌স্‌কে। 'গার্ডনার' কবির পাঁচমিশালি লিরিকের সংগ্রহ; গীতাঞ্জলি পাঠ করিয়া লোকের মনে হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথ বুঝি একজন প্রাচ্যদেশীয় মিস্টিক। পাছে লোকের এই ভুল ধারণা বদ্ধমূল হয়, সেইজন্য তিনি তাহাদিগকে জানাইয়া দিলেন যে তিনি 'কবি'। 'গার্ডনারে'র প্রথম কবিতা হইতেছে 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর'। এই কাব্যখণ্ডের মধ্যে ক্ষণিকার 'মাতাল' প্রভৃতি কবিতা আছে। রবীন্দ্রনাথ এইসব কবিতা বাছিয়া বাছিয়া দিয়াছিলেন। কয়েকখানি পত্রে তিনি বারংবার করিয়া লিখিয়াছিলেন যে তিনি গুরু নহেন— তিনি কবি; তাঁহার এই কবিখ্যাতি প্রমাণ করিবার জন্য 'গার্ডনার' রচনা।[১]

সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের কাব্য *The Crescent Moon*,— শিশু কাব্যখণ্ডের কয়েকটি কবিতার তর্জমা— প্রকাশিত হইল ১৯১৩ সালে নভেম্বর মাসে। এই কাব্য উৎসর্গ করেন ইংরেজ কবি ও সাহিত্যিক স্টার্জ মূরকে[২]। স্টার্জ মুর রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-কুন্তী-সংবাদের ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বন করিয়া The Foundling Hero নামে কাব্যখণ্ড রচনা করেন। ঐ কাব্য মূরের গ্রন্থাবলীতে আছে (*Collected Works* 1931)।

কাব্য ছাড়া কয়েকখানি নাটকের অনুবাদ হয়। 'চিত্রাঙ্গদা' *Chitra* নামে নিজেই তর্জমা করেন; উহা উপহার দেন আমেরিকার Mrs. W. Vaughn Moodyকে। *Post office*-এর মুখবন্ধ বা Preface লেখেন য়েট্‌স্‌; এই নাটিকা তাঁহারই চেষ্টায় প্রথম অভিনীত হয় তাঁহাদের থিয়েটারে ও মুদ্রিত হয় তাঁহারই ব্যবস্থায়।[৩] চিত্রার ভূমিকায় কবি মহাভারতের মধ্যে আখ্যানটি কিভাবে আছে তাহা দিতে চান; এ বিষয়ে তিনি রামানন্দবাবুর নিকট সহায়তা পান।

'ডাকঘর' ও 'রাজা'র অনুবাদ কবির নিজের নয়। 'ডাকঘর' *Post office* নামে অনুবাদ করেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিছাত্র দেবব্রত মুখোপাধ্যায়[৫]। 'রাজা' *The King of the Dark Chamber* নামে অনুবাদ করেন ক্ষিতীশচন্দ্র সেন; ইনি আই. সি. এস. পাস করিয়া বোম্বাই গবর্মেণ্টে চাকুরি গ্রহণ করেন। এই নাটক

১ গার্ডনার ছাপা হইয়া গেলে কবি রামানন্দবাবুকে লিখিলেন, "Ernest Rhys ও Andrews সাহেবের কাছ হইতে *The Gardener* সম্বন্ধে যে পত্র পাইয়াছি তাহাতে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিতেছি। এই তর্জমাগুলি সম্বন্ধে আমার মনে কিছু ভয় ছিল। গীতাঞ্জলির তর্জমায় ছন্দের অভাব তত বেশি গুরুতর নহে কিন্তু ক্ষণিকা সোনার তরী জাতীয় কবিতাগুলি নিছক পদ্য, পাশ্চাত্য পাঠকদের কাছে কেমন শোনাইবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছিলাম না— এখন ভরসা হইতেছে ভালো লাগিতে পারে।" —দ্র. প্রবাসী ১৩৪৮ অগ্রহায়ণ, পৃ ২৩২।

২ Thomas Sturge Moore (1870-1944) English writer and wood-engraver.

৩ Cuala Press, Dundrum 1914.

৪ পত্র। প্রবাসী ১৩৪৮ অগ্রহায়ণ, পৃ ২৩২।

৫ দেবব্রত ছিলেন মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা ও বরোদার রাজরত্ন সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতা। এই প্রতিভাবান যুবক দেশে ফিরিবার পর পুলিশের সন্দেহ ও উপদ্রবে বিকৃত-মস্তিষ্ক হইয়া যান। এই প্রতিভার অকালমৃত্যুর কথা রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে ও কবিতায় উল্লেখ করিয়াছিলেন।

দুইখানি ১৯১৪ সালে মুদ্রিত হইলে য়ুরোপের সমস্ত দেশেই সমাদৃত হইয়াছিল।

আমেরিকা ও লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি *Sadhana* নামে গ্রন্থাকারে ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি কবি উৎসর্গ করেন সাহিত্যিক আর্নেস্ট রীহ্‌সকে (Ernest Rhys)। রীহ্‌স[১] রবীন্দ্রনাথ হইতে বয়সে দুই বৎসরের বড়। রীহ্‌স্ এই ভারতীয় কবিকে কী শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, তাহা আমরা ইতিপূর্বেই তাহার *Letters from Limbo* হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। তাঁহার রচিত Biography রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম ইংরেজ-লিখিত জীবনী।

য়ুরোপ আধুনিক ভারতের চিন্তধারার সন্ধান পাইল রবীন্দ্রনাথের কাব্য হইতে; প্রাচীন ভারতের ধর্মের কথা শুনিল তাঁহার 'সাধনা'র বক্তৃতা হইতে; এবং উভয়কে যোগযুক্ত করিয়াছে যে মধ্যযুগীয় সন্তরা তাহাদেরও কথা প্রকাশ হইল *One hundred poems of Kabir* হইতে। অর্থাৎ ভারতের অতীত মধ্য ও আধুনিক জগতের মনের কথা রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করিলেন (১৯১৫) এইভাবে। ভারতের অখণ্ড সাধনার ধারা তাঁহার দ্বারা প্রচারিত হইল।

কিছুকাল পূর্বে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন কবীর সাহেবের দোহা সঞ্চয়ন ও সম্পাদন করিয়া বাংলায় অনুবাদ করেন। সেই গ্রন্থ অবলম্বনে অজিতকুমার চক্রবর্তী শতাধিক সর্বোৎকৃষ্ট দোহা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন ও কবীরের ধর্মসাধনা সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া মিস্টিসিজম্ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ লেখিকা শ্রীমতী এভেলিন আন্ডারহিলের নিকট পাঠাইয়া দেন। রবীন্দ্রনাথ সেই অনুবাদগুলি বাছিয়া ও প্রয়োজনমত অদল বদল করিয়া প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করেন; এই গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন শ্রীমতী আন্ডারহিল্। তিনি ভূমিকায় অজিতকুমারের রচনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে অজিতকুমারকে লিখিয়াছিলেন, "রোটেনস্টাইন বলেন আমার তর্জ্জমার নীচেই তোমার তর্জ্জমা তাঁর সব চেয়ে ভাল লাগে! ইংরেজি তর্জ্জমায় তোমাকে ছাড়াবার অভিপ্রায় আমার কোনো দিন ছিল না— এবং ছাড়িয়েছি বলে কোনো দিন কল্পনাও করিনি— গ্রহের চক্রান্তে গোলমালে কোন্ দিন কেমন করে ঘটে গেছে তা জানিনে— অতএব এতে আমার কোনো দোষ নেই।" [১৯১২ সেপ্টেম্বর?]

রবীন্দ্রনাথ-কৃত কবীরের ইংরেজি অনুবাদ যথাসময়ে অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় য়ুরোপীয় ভাষাসমূহে অনূদিত হয়। সকল দেশই প্রসন্নচিত্তে এই অনুবাদ গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু এ দেশে যাঁহারা কবীর সম্বন্ধে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল তাঁহারা এই অনুবাদ পড়িয়া সুখী হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের মতে কবীর হইতে কবির ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে বেশি করিয়া; মূল কবীরকে কবির অনুবাদ হইতে পাওয়া যায় না।[২]

১ Ernest Rhys (1859-1946) প্রথমে *camelot series* 1886-91 প্রকাশ করেন। পরে Everyman's Library-র সম্পাদকের কার্য গ্রহণ করেন ১৯০৪ সালে। এই সিরিজে প্রায় এক সহস্র বই এ পর্যন্ত Dent কোম্পানি প্রকাশ করিয়াছে। রীহ্‌সের আত্মজীবনী *Everyman remembers* (1931) ও *Letters from Limbo* দ্রষ্টব্য।

২ Dr. Keay লিখিতেছেন, "The Rev. Ahmad Shah has made a careful examination of this translation, and finds that it is really based not on the Hindi text but upon the Bengali translation, which is far from accurate. Mr. Kshitimohan Sen's collection is in four volumes and contains 341 poems. The hundred poems translated are taken from the first three volumes, which contain only 264. Of these hundred there are, according to Mr. Ahmad Shah, only five which in a mutilated form can be safely attributed to Kabir. ... Mr. Ahmad Shah considers that in the whole collection of Mr. Kshitimohan Sen there are only 18 poems and 39 sakhis which bear any resemblance to the poems in the *Bijak*. In some of the poems there are lines or phrases here and there which come from the Bijak, but the remainder of the collection is, he thinks, by some author or authors unknown, of times more modern than Kabir. The poems indeed are very beautiful, and as we might expect from the skilled hand of Rabindranath Tagore are very fine also in their English dress: but he (Ahmad Shah) maintains that they cannot be regarded, except in fragments—here and there, as the genuine work of Kabir."

এই সংস্করণের ভাষা সম্বন্ধে লেখকের মত the Hindi is comparetively smooth and clear as compared with the obscurity of much of Kabir's verse, and seems to belong to a latter period...the ideas are often different from those which are generally found in Kabir.' F. E. Keay, *Kabir and his followers*. p 61-62.—The Religious Life of India Series, Y. M. C. A. publishing 1931.

দ্র হাজারিপ্রসাদ দ্বিবেদী কৃত কবীর (হিন্দী)।

সমসাময়িক কথা

ইংলণ্ড ও আমেরিকা ঘুরিয়া প্রায় দেড় বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে ফিরিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন দেশ হইতে বাহির হন তখন দেশের মধ্যে কী কী আন্দোলন চলিতেছিল, তাঁহার প্রবাসকালে কী কী পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে এবং তিনি ফিরিয়া কী কী সমস্যার সম্মুখীন হইলেন তাহার একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইলে রবীন্দ্রনাথের মনের চারি দিকের আবহাওয়াটার একটা খবর পাওয়া যাইবে।

রবীন্দ্রনাথ যখন মে মাসের শেষাশেষি কলিকাতা ত্যাগ করেন, তখন বঙ্গচ্ছেদ রদ হইয়া খণ্ডিত বঙ্গ একাঙ্গ হইয়াছে। ১৯১২ সালের ১লা এপ্রিল হইতে আসাম পূর্বের ন্যায় পৃথক প্রদেশে পরিণত হইয়াছিল; রাজশাহী ঢাকা চট্টগ্রাম প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান বিভাগ লইয়া হইল নূতন বঙ্গদেশ; আর বিহার-উড়িষ্যা যুগ্মভাবে হইল নূতন প্রদেশ এবং তথাকার প্রথম গভর্নর হইলেন লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ। কলিকাতার স্থলে দিল্লী হইল ভারতের রাজধানী। বাংলাদেশের শাসক-প্রধানের উপাধি ছিল লেফটেনেণ্ট-গভর্নর, এবার হইল গভর্নর, তাঁহার মান ও বেতন যুগপৎ বৃদ্ধি পাইল। প্রথম গভর্নর হইলেন লর্ড কারমাইকেল।

বঙ্গচ্ছেদ-রদাদির ঘোষণা হইয়াছিল গত ডিসেম্বর মাসে যখন দিল্লিতে পঞ্চম জর্জের অভিষেক হয় (১২ই ডিসেম্বর ১৯১১)। ১৯০৫ সালের ১৫ই অক্টোবর বঙ্গদেশ বিখণ্ডিত হয়, সাত বৎসর পরে ১৯১২ সালের ১লা এপ্রিলে আবার অখণ্ড বঙ্গকে নূতনভাবে গড়া হইল।[১]

দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরের প্রস্তাব হওয়ার মুহূর্ত হইতে নানাবিধ প্রশ্ন ও সমস্যার আলোচনা শুরু হয়, মহানগরীর ভাবী স্থাপত্যরীতি তাহাদের অন্যতম। হ্যাভেল, কুমারস্বামী, রোটেনস্টাইন প্রভৃতি কতিপয় শিল্পশাস্ত্রী ভাবী রাজধানীর জন্য ভারতীয় স্থপতি-রীতি অনুসরণ করিবার পক্ষপাতী; অপর পক্ষে ইংলণ্ডের সেরা শিল্পী ল্যুটনেস (Sir Edwin Lutyens, 1869-1944) ইঙ্গভারতীয় রাজকর্মচারীর দল ভারত-ভক্তদের প্রস্তাব নাকচ করিবার জন্যই বদ্ধপরিকর। অবশেষে রাজনৈতিক কারণে ভারতীয় রীতি অনুমোদিত হইল না। যাহা হইল তাহা না ইঙ্গ না ভারতীয় না ইসলামিক না হিন্দু— কোনো রীতিপারম্পর্যই অনুসৃত হইল না, নূতন সৃষ্টিও কেহ করিল না।

১৯১২ সালের ২৩ ডিসেম্বর বড়লাট লর্ড হার্ডিংজ মহাসমারোহে শোভাযাত্রা করিয়া নূতন দিল্লিতে (অস্থায়ী) প্রবেশ করিলেন। সেইদিন রাজপথে বড়লাটের উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হইল। তাঁহার প্রাণ নষ্ট হইল না বটে, তবে সেদিন এই কথাটি জগৎময় স্পষ্ট হইয়া গেল যে ভারতে ইংরেজের পূর্ব মহিমা আর নাই; সে তাহার সম্ভ্রম হারাইয়াছে। লোকের শ্রদ্ধা প্রীতি এমন-কি যে-ভীতির উপর বৃটিশ রাজ্যশাসন প্রতিষ্ঠিত সেই ভয় পর্যন্ত আর বাঙালির নাই, কারণ বড়লাট হত্যার ষড়যন্ত্রের পিছনে ছিল বাঙালি বিপ্লবীদের মস্তিষ্ক। এই যে এত-সব ঘটনা ঘটিয়া যাইতেছে তাহার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি কবির কাছে বিদেশে পৌঁছাইতেছে কিনা জানি না, কারণ তাহার কোনো প্রতিক্রিয়া কোনো রচনার মধ্যে দেখি না। তিনি এখন আপন রচনার অনুবাদ মুদ্রণ প্রভৃতি লইয়া আপনার মধ্যে আত্মস্থ।

এই সময়ে বিলাত হইতে রয়েল পাবলিক সার্বিস কমিশন এ দেশে আসিয়াছেন; কমিশনের সভাপতি লর্ড ইস্লিংটন ও সদস্যদের মধ্যে ছিলেন র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড— পার্লামেণ্টের প্রথম শ্রমিকসদস্য। কিছুকাল পরে ম্যাকডোনাল্ড রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয় দেখিবার জন্য শান্তিনিকেতনে আসেন।

১ ১৯১১ সালে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কনগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাহাতে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের প্রথম শ্রমিক-সদস্য র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড সভাপতি হইবার কথা ছিল; তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হেতু তিনি ভারতবর্ষে আসিতে পারেন নাই; পণ্ডিত বিষণনারায়ণ ধর সভাপতির কাজ করেন। এই সভায় কবির 'জনগণমন' সংগীতটি প্রথম গীত হয়।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী-প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অবস্থা সরজমিন দেখিবার জন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও কন্‌গ্রেসের বিশিষ্ট কর্মী মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে তথায় যান। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই পর্বে গোখলের অবৈতনিক আবশ্যিক শিক্ষাবিস্তারবিল ও ভূপেন্দ্রনাথ বসুর হিন্দুদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহসিদ্ধ বিষয়ক বিল দুইটির আলোচনা চলিতেছিল। ভারতীয় ও সরকারী সদস্যদের প্রতিরোধহেতু কোনো বিলই আইনে পরিণত হইতে পারে নাই।

সমসাময়িক ভারতের রাজনীতি বা সমাজনীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে কোনো মতামত প্রকাশ করিতেছেন না, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। রাজনীতিক মতামত সম্বন্ধে তখন এ দেশে সকলেই প্রায় তূষ্ণীব্রতী, সুতরাং একা রবীন্দ্রনাথকেই নীরবতার জন্য দায়ী করা যায় না।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে বাংলার একশ্রেণীর সাহিত্যিকদের অক্লান্ত বিরোধিতা পূর্ববৎই মুখর ও রূঢ়। বিলাত যাইবার চারিমাস পূর্বে কলিকাতার টাউনহলে যে বিরাট কবি-সম্বর্ধনা হয় (১৩১৮ মাঘ) তাহাতে তাঁহার মিত্র-অমিত্র ভাগ্য হরণপূরণে সমান সমান না হইয়া অবশেষে ভাগ্যদোষে অমিত্রাংশই ঝুঁকিয়া পড়িল। কবির রচনাবলী লইয়া সমালোচনা তো বরাবরই চলিয়া আসিতেছে কিন্তু এবারে কবির আদর্শবাদ ধর্মমত প্রভৃতি লইয়াও আলোচনা শুরু হইল। লেখক-গোষ্ঠীতে প্রবেশ করিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, আর বসুমতীর সম্পাদকসংঘের শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (মৃ. ১৯৪৭)। শশিভূষণ কবির ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে যে ধারাবহিক রচনা সাহিত্যে প্রকাশ করেন তাহার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকা তো বহুকাল হইতেই রবীন্দ্রনাথের উপর বিমুখ। রবীন্দ্রনাথের প্রায় রচনা— তাহা কবিতাই হউক, প্রবন্ধই হউক, গল্পই হউক— অথবা ধর্মোপদেশ হউক প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই কিছু-না-কিছু না বলিয়া তিনি কখনো ছাড়িতেন না। এমন-কি যেসব হতভাগ্য তরুণ সাহিত্যিক রবীন্দ্রপ্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া কবির সপক্ষে কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেন, তাঁহাদের উপর সমাজপতির শাসনলেখনী কিছু নির্দয়ভাবে ব্যবহৃত হইত।

কিছুকাল হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নানাভাবে রবীন্দ্রনাথের রচনার ও ব্যক্তিত্বের ত্রুটি আবিষ্কারে সবিশেষ যত্নশীল হইয়াছিলেন; আমরা 'রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল' পরিচ্ছেদে সে-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। আমাদের এই আলোচ্যপর্বে গীতাঞ্জলি লইয়া যখন য়ুরোপ ও আমেরিকার শিক্ষিত সমাজ অত্যন্ত মুগ্ধ, ঠিক সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিবার জন্য স্টার থিয়েটারে 'আনন্দবিদায়'[১] নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে আর্বানায় আছেন, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ও হার্ভার্ডে বক্তৃতার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

রবীন্দ্রনাথের রুচি ও নীতি ও ব্যক্তিত্ব হীন প্রমাণের জন্য দ্বিজেন্দ্রলালের প্রচেষ্টা বহু বৎসরের। কিন্তু বিপিনচন্দ্র পালের ন্যায় মনীষী যখন তাঁহার বিরুদ্ধে লেখনী গ্রহণ করিলেন তখন সকলেই একটু অবাক হইয়াছিলেন। বিপিনচন্দ্রের রচনায় পণ্ডিতম্মন্যতার যে আড়ম্বর ছিল তাহা সাধারণ পাঠকের সহজ বুদ্ধিকে অল্পতেই অভিভূত করিত। বিপিনচন্দ্র রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের অল্পকাল পরেই 'চরিত-চিত্র'[২] শীর্ষক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া বঙ্গদর্শনে পাঠাইয়া দেন। তখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার; তিনি রবীন্দ্র-বিরোধী প্রবন্ধ ছাপিবেন কিনা ভাবিতেছিলেন; রবীন্দ্রনাথ সে কথা জানিতে পারিয়া শৈলেশচন্দ্রকে ঐ প্রবন্ধ প্রকাশের জন্যই পত্র দিলেন। এটি ঘটে কবির বিলাতযাত্রার দুই মাস পূর্বে।

১ আনন্দবিদায় অভিনয়, ১ পৌষ ১৩১৯ : ১৬ ডিসেম্বর ১৯১২।

২ চরিত-চিত্র, বঙ্গদর্শন ১৩১৮ চৈত্র, পৃ ৬৮১-৬৯৩।

বিপিনচন্দ্র এই প্রবন্ধে ইহাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য, ধর্মবোধ, স্বদেশসেবা প্রভৃতি সমস্তই বস্তুতন্ত্রহীন অর্থাৎ বাংলা ভাষায় বলিতে হয় আজগুবি ও ফাঁকিবাজি। বিপিনচন্দ্র কিভাবে বাক্চাতুর্য দ্বারা মহৎ বিষয় ও বস্তুকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিযাছেন এই রচনা তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

বিপিনচন্দ্র সাহিত্যের দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথকে দেখেন নাই, তিনি তাঁহার জীবনকে ও সাহিত্যকে মিলাইয়া পড়িতে গিযাছিলেন এবং জীবনের এমন সকল ভাগ, এমন সকল ঘটনার দিক দিযা বিচারে প্রবৃত্ত হন, যাহার সঙ্গে সাহিত্যের কোনো যোগ নাই। বিপিনচন্দ্র রবীন্দ্রসাহিত্যকে বস্তুতন্ত্রতাহীন বলিতে চাহেন, তাহার একমাত্র কারণ ও প্রমাণ হইতেছে রবীন্দ্রনাথের ধনাভিজাত্য— তিনি ধনীর সন্তান। তিনি জমিদার, অতএব বাংলাদেশের পল্লীর মধ্যে ঘুরিযাও পল্লীপ্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। তিনি অধ্যাত্ম সত্যের অন্বেষী, কিন্তু তিনি গুরুকরণ করেন নাই বলিযা অধ্যাত্ম সত্য তাঁহার অনায়ত্ত থাকিযা যাইতে বাধ্য।

বিপিনচন্দ্রের 'চরিত-চিত্র' হইতে কযেকটি অংশ উদ্ধৃত করিলেই বুঝা যাইবে যে তাঁহার আলোচনা নিরপেক্ষ সাহিত্য-রসিকের সমালোচনা নহে। তিনি সাধারণভাবে কবি সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের উপর তাহার প্রযোগ করিযা ঠিক বিপরীত কথাই বলিলেন। তিনি বলিতেছেন— "প্রকৃত কবি তর্ক করেন না, যুক্তি করেন না, বিচার করেন না, আলোচনা করেন না, কেবল আপনার অন্তশ্চক্ষুতে সত্য ও সৌন্দর্য্য দেখেন, আর এইরূপে যাহা দেখেন, তাহাই ভাষার তুলিকায আঁকিয়া লোকসমক্ষে ধারণ করেন। এই অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিই কবির প্রাণ। এইজন্য ঋষিদিগের ন্যায কবিও দ্রষ্টা কিন্তু দার্শনিক নহেন, জ্ঞাতা কিন্তু বৈজ্ঞানিক নহেন। দার্শনিক সম্যক বিচারের উপরে আপনার সিদ্ধান্তকে স্থাপন করেন, কবি শুদ্ধ আত্মানুভূতির উপরে সত্য প্রতিষ্ঠা করেন।" কবিপ্রকৃতির আদর্শ সম্বন্ধে বহু বিচার করিযা উহা যখন বিশেষ কবির আলোচনায আসিয়া পৌঁছাইল, তখন বিপিনচন্দ্রের উদার দৃষ্টি অত্যন্ত আচ্ছন্ন। তিনি তখন বলিতেছেন, "রবীন্দ্রনাথের অনেক সৃষ্টিই মাযিক। উর্ণনাভ যেমন আপনার ভিতর হইতে তন্তু বাহির করিযা অদ্ভুত জাল বিস্তার করে, রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ আপনার অন্তর হইতেই অনেক সময় ভাবের ও রসের তন্তুসকল বাহির করিযা, আপনার অদ্ভুত কাব্যসকল রচনা করিযাছেন। তাঁর কাব্য যেমন কচিৎ বস্তুতন্ত্র হইযাছে, তাঁহার চিত্রিত লোকচরিত্রেও অনেক সময এই বস্তুতন্ত্রতার অভাব দেখিতে পাওযা যায়। রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষুদ্র গল্প লিখিযাছেন, দুচারখানি বৃহদাকারের উপন্যাসও রচনা করিযাছেন, কিন্তু তাঁর চিত্রিত চরিত্রের প্রতিরূপ বাস্তবজীবনে কচিৎ খুঁজিযা পাওযা যায কিনা সন্দেহ।"

বিপিনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টিকেই শুধু বস্তুতন্ত্রবিহীন বলিয়া অবজ্ঞা করিলেন তাহা নহে, তিনি লিখিলেন, "যেমন তাঁর কাব্যে ও গল্পে এই মাযার প্রভাব বেশী, সেইরূপ তাঁর সমাজসংস্কারের প্রয়াস ও ধর্মের শিক্ষাও বহু পরিমাণে বস্তুতন্ত্রতাহীন হইযাছে। তিনি একটা কল্পিত স্বদেশ রচনা করিযা, তাহারই উপরে একটা সত্য স্বদেশী সমাজ গড়িযা তুলিতে গিযাছিলেন। সে মাযার সৃষ্টি কিছুদিন পরে আপনাতে আপনিই মিলাইয়া গিয়াছে।··· আর আজ তিনি যে এক বিশাল 'বিশ্বমানব' কল্পনা করিযা তাহারই উদার প্রেমে আত্মসমর্পণ করিতেছেন,— তাহারও প্রতিষ্ঠা প্রত্যক্ষেও নয, আগমেও নয, কিন্তু তাঁর অলৌকিক কবিপ্রতিভার অঘটন-ঘটনপটিযসী মাযাশক্তিতে।" এই শ্রেণীর সমালোচনায মুগ্ধ হইয়া সুরেশচন্দ্র সমাজপতি 'সাহিত্যে' লিখিলেন, "যেসকল বাঙালি লেখক রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সমস্ত রচনার মোসাহেবী করেন এই প্রবন্ধ পাঠে তাঁহারা বিশেষ উপকৃত হইবেন।"[১] বিপিনচন্দ্রের প্রবন্ধের প্রত্যুত্তর দেন অজিতকুমার। 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দেশচর্যা কি বস্তুতন্ত্রতাহীন' এই প্রশ্ন তুলিয়া তিনি বিপিনচন্দ্রের

১ সাহিত্য, ১৩১৯ আষাঢ়, পৃ ২৭০। দ্র সমসাময়িক 'নায়ক' ও 'বসুমতী'।

যে সমালোচনা করেন, তাহা যুক্তিপ্রমাণ ও রচনাকৌশলে অতুলনীয়; বিপিনচন্দ্রের প্রত্যেকটি মতকে তিনি খণ্ডন করেন।[১]

দ্বিজেন্দ্রলাল বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি তৎকালীন লেখকদের উদ্দেশ্য সাহিত্য-সমালোচনা ছিল না— উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথের উপর বিরক্ত হইবার অনেক কারণ। রবীন্দ্রনাথ এখন ব্যর্থ রাজনীতির উচ্ছ্বাস-মার্গ ত্যাগ করিয়া সংগঠনপন্থী, বর্ণাশ্রমের জয়গান না গাহিয়া বৃহত্তর মনুষ্যত্বের বাণী প্রচারক, স্বাজাত্যের মিথ্যা গৌরব রটনায় লেখনী তাঁহার পরাঙ্মুখ; লৌকিক হিন্দুধর্মকে প্রবন্ধ-নাটকাদি রচনার দ্বারা কঠোরভাবে আঘাত করেন, এখন তিনি সংস্কারহীন; হিন্দুসমাজের সবই সত্য, হিন্দুধর্মের সবই তত্ত্ব— বলিয়া লোকসাধারণকে মোহাচ্ছন্ন করিতে তিনি একেবারেই নারাজ। এইসব কারণের সমবায়ে তাঁহার বিরোধী দলের উদ্ভব।

বিলাত প্রবাসকালে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সকলপ্রকার সংবাদ এ দেশে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করিতেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ পত্রিকাদ্বয় মারফত। মডার্ন রিভিউ এ (১৯১২ অগস্ট) এণ্ড্রুস সাহেব লিখিত 'রবীন্দ্র সকাশে এক সন্ধ্যা' প্রবন্ধই হইতেছে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এ দেশে ইংরেজের লেখনী-নিঃসৃত সর্বপ্রথম রচনা। তখন কবি সম্বন্ধে বাংলার বাহিরে কেহই বিশেষ কিছু জানিত না,— জীবনস্মৃতির ইংরেজি তর্জমা তখনো হয় নাই। কবি সম্বন্ধে কোনো বই প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং নানা কারণে এই প্রবন্ধটিতে সময়োপযোগী রচনা বলিতে হইবে। লণ্ডনে রোটেনস্টাইনের বাটীতে কবির সহিত এণ্ড্রুসের প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তার পরেও হয় কয়েকবারই; ইহার সম্বন্ধে কবি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (১৩১৮ পৌষ) লেখেন যে, "ইনি পাদ্রির চেয়ে খৃস্টান বেশি···এমন মানুষকে কেহ মনে করিতে পারে না যে ইনি আমাদের পক্ষের লোক নহেন, ইনি অন্য দলের।"[২]

১৯১৩ সালের গোড়াতেই এণ্ড্রুস ভারতবর্ষে ফিরিয়া রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রম দেখিবার জন্য বোলপুরে আসেন[৩] (৭ ফাল্গুন ১৩১৯)। ইঁহার আসিবার কয়েকমাস পূর্বে দিল্লি হইতে আর-একজন ইংরেজ আসেন বোলপুরে। তিনি হইতেছেন উইলিয়ম উইন্স্টন পিয়ার্সন।

এই আদর্শবাদী তরুণ ইংরেজ শিক্ষাব্রতী কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতায় লণ্ডন মিশনারী কলেজের উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের অধ্যাপকরূপে বাংলাদেশে আসেন। কিন্তু তিনি আপনাকে কলেজি কাজের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না রাখিতে পারিয়া কলিকাতার যুবসমাজের নানা আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত জড়িত হইয়া পড়েন। তিনি ছিলেন আশাবাদী বিপ্লবী; কলিকাতায় বাসকালে Mazzini-র *The duties of man* নামক গ্রন্থখানি ভূমিকাসহ প্রকাশ করেন। ইহা হইতে তাঁহার মনের ভাবধারা কোন্ দিকে বহিত, তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। গভীর অভিনিবেশ সহকারে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। পিয়ার্সন ছিলেন ইংলণ্ডের বুনিয়াদি হুগোনট পরিবারের লোক; সুতরাং ফরাসীদের ভাবুকতা ও প্রোটেস্টেণ্ট্ খ্রীষ্টানদের নৈতিকতা আশ্চর্যরূপে তাঁহাতে সমন্বিত হইয়াছিল। তিনি অক্স্ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন ও কেমব্রিজে বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন।

কলিকাতায় কাজ করিতে করিতে মিশনারি সমাজের কর্তৃপক্ষের খ্রীষ্টানী অখ্রীষ্টানী ভেদাভেদ তাঁহাকে পীড়িত করিয়া তোলে; অবশেষে কলেজের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া কাজই ছাড়িয়া দিলেন। পিয়ার্সন এণ্ড্রুসের বন্ধু— তাই তাঁহার মধ্যস্থতায় অনতিকালের মধ্যে দিল্লিতে সুলতান সিংহ নামে এক ধনীর গৃহে তদীয় সন্তানের অভিভাবক-শিক্ষকপদে নিযুক্ত হইলেন। আমাদের আলোচ্যপর্বে পিয়ার্সন দিল্লিপ্রবাসী, ধনীর গৃহশিক্ষক।

১ প্রবাসী ১৩১৯ আষাঢ়, পৃ ৩০৩-৩১২।

২ পথের সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ ৫৪১।

৩ ৭ ফাল্গুন ১৩১৯ (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩)। দ্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৪ (১৩১৯), পৃ ২৯৩।

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও শিক্ষাদর্শ পিয়ার্সনকে এতই মোহিত করে যে, তাঁহার মনে হইল এতদিনে যাহা খুঁজিতেছিলেন তাহাই যেন এইখানে পাইবেন। তিনি দিল্লির কার্য ছাড়িয়া আশ্রমে আসিবার কথা ভাবিতেছেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই বোলপুরে আসিয়া কয়েকদিন থাকিয়া গেলেন। কী আধ্যাত্মিক আকুলতা কী রসানুভূতি এই শান্ত সাধকের মধ্যে দেখিয়াছিলাম। মনে আছে অজিতকুমার অতিথিশালার দ্বিতলে গীতাঞ্জলির গান একটির পর একটি গাহিয়া যাইতেছেন— পিয়ার্সন শুনিতেছেন, কি, ধ্যানমগ্ন আছেন বুঝা যাইতেছে না। বিশেষভাবে 'জীবনে যত পূজা হল না সারা' গানটি যখন অজিতবাবু গাহিলেন, তখন দেখি তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া নীরবে জল পড়িতেছে।

পিয়ার্সনের মনের ইচ্ছা কবি জানিতে পারিয়া আমেরিকা হইতে অজিতকুমারকে লিখিয়াছিলেন, "পিয়ার্সন যে শান্তিনিকেতনে জীবন সমর্পণ করবেন সে সম্বন্ধে আমার মনে লেশমাত্র সন্দেহ হয় নাই— কারণ এঁদের চিত্তের সঙ্গে চরিত্রের যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।"[১] ইহারই কিছুকাল পরে পিয়ার্সন স্বয়ং কবিকে তাঁহার সংকল্প জ্ঞাপন করিয়া পত্র লেখেন। কবি তখন আমেরিকা ঘুরিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়াছেন। লণ্ডন হইতে তিনি পত্রোত্তরে পিয়ার্সনকে দিল্লিতে লিখিতেছেন, "আপনি শান্তিনিকেতন আশ্রমে গিয়া আমাদের কাজে যোগ দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এ প্রস্তাবে আমার সম্মতির অপেক্ষা রাখিবেন না। যিনি আপনার হৃদয়ে শুভ ইচ্ছা প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার সম্মতির উপরে আমি কি কথা কহিতে পারি? আমাদের সাধনার ক্ষেত্রে আপনাকে আমরা পাইব এবং আপনার সঙ্গে একাসনে বসিতে পারিব ইহাতে আমি নিজেকে কৃতার্থবোধ করিতেছি। আমি একান্ত শ্রদ্ধার সহিত প্রণাম করিয়া আপনাকে আমাদের মধ্যে গ্রহণ করিলাম।"[২]

এদিকে এণ্ড্রুস নানাভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রচারে মাতিয়া উঠিয়াছেন; গীতাঞ্জলির দীর্ঘ সমালোচনা লিখিলেন উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিখ্যাত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকা Civil and Military Gazette কাগজে। অতঃপর ভারতীয় ইংরেজ রাজকর্মচারীদিগের নিকট রবীন্দ্রনাথকে পরিচিত করিবার জন্য সিমলায় কবি সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন; এই সভায় বড়লাট লর্ড হার্ডিংজ (২৬ মে ১৯১৩) সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথকে The poet-laureate of Asia বলিয়া অভিনন্দিত করেন। এণ্ড্রুস যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহা মডার্ন রিভিউ-এ (১৯১৩ সালে জুন ও জুলাই মাসে) খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রকাশ করেন। বিলাতে থাকিতে কবির জীবনস্মৃতি একখণ্ড সংগ্রহ করিয়া এক বাঙালি ছাত্রের সাহায্যে কিছু কিছু তথ্য উহা হইতে তিনি লিখিয়া লইয়াছিলেন; জীবনস্মৃতি তখনো অনূদিত হয় নাই, সুতরাং বিদেশীর কাছে বাঙালি কবির সব কথাই তখন অজ্ঞাত।

সিমলায় রাজপুরুষদের সমক্ষে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ মোটেই আশ্বস্ত হইতেছেন না; তিনি একখানি পত্রে অজিতকুমারকে লিখিতেছেন (২৩ জুন ১৯১৩), "এণ্ড্রুস সাহেব সিমলাতে একটা বক্তৃতা দিয়েছেন শুনেছি, কিন্তু কি বলেছেন জানিনে। কিন্তু চারি দিকে আমার নিজের নামের এই যে ঢেউতোলা এ আমার কিছুতেই ভাল লাগছে না। এই নিয়ে আমার নিজের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলচে।...আমার মনের ভিতর কেবলি বলচে এ সমস্ত বন্ধন ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়ে কোনো উপায়ে কোথাও পালাতে হবে। অথচ বাইরের দিক থেকে যে মোহ কেটে গেছে তা নয়।"

ইহার অল্পকাল পরে কবি বিলাতে সংবাদ পাইলেন যে এণ্ড্রুস শান্তিনিকেতনে আসিয়াছেন। কবি তাঁহাকে লিখিতেছেন (১৬ অগস্ট ১৯১৩), "I am so glad to know that you are now in Santiniketan. It is impossible to describe to you my longing to join you there. The time has come at last when I must leave England; for I find that my work here in the West is getting the

১ ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩। কেমব্রিজ, বস্টন।

২ লণ্ডন, ৬ অগস্ট ১৯১৩। ২১ শ্রাবণ ১৩২০।

better of me. It is taking too much of my attention and assuming more importance than it actually possesses. Therefore, I must, without delay, go back to that obscurity where all living seeds find their true soil for germination."[১]

কবি এতদ্‌বিষয়ে অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায়কে লিখিতেছেন যে, "এণ্ড্রুস যাহাতে সমস্ত শক্তি দিয়ে কাজ করতে পারেন কোনো বাধা না পান সে দিকে দৃষ্টি রাখবেন।" ইতিমধ্যে তিনি মডার্ন রিভিউ-এ প্রকাশিত এণ্ড্রুসের সিমলায় প্রদত্ত বক্তৃতাটি পাইয়াছিলেন। প্রবন্ধটি পড়িয়া তিনি পূর্বোদ্‌ধৃত পত্রেই লিখিতেছেন, "এণ্ড্রুস সাহেব যখন এ দেশে আমার সঙ্গে দেখা করেন তখন আমাকে আমার নিজের জীবনের ভিতরকার ইতিহাস সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। আমি দুচারটে কথা তাঁকে বলেছিলুম। কিন্তু তার মধ্যে কোনো অহংকারের সুর ছিল বলে আমার মনে পড়ে না। বস্তুত আমার জীবনেতিহাসের মধ্যে যে দীনতা আছে সে আমি কোনোদিনই ভুলিনে।...আমার সাধনা কবিত্বলোকে এসে থেমেছে, তার উপরে যেখানে শব্দহীন জ্যোতির্ময়লোক সেখানে পৌঁছতে পারে নি। এই কারণে জীবনের সাধনা নিয়ে আমি অহঙ্কার করতে পারিনে। কিন্তু এণ্ড্রুস সাহেব বোধ করি তাঁর প্রীতির আবেগে আমার পরিমাণ বাড়িয়ে লোকের কাছে ধরেছেন। এতে আমি বড়ই লজ্জা বোধ করি। য়েট্‌স্ প্রভৃতি সমালোচকেরা আমাকে সাহিত্যের নিক্তিতে ওজন করে যা বলেছেন তা ভুল হোক সত্য হোক তাতে আমার কিছু আসে যায় না, কেননা যে জিনিসটা বাইরে এসে পৌঁছেছে তার বিচার প্রত্যেকে নিজের বিচারশক্তির দ্বারাই সম্পন্ন করবেন এই হচ্ছে প্রথা। কিন্তু আমার ভিতরের কথা আমার অন্তর্যামী জানেন সেখানকার খবর দেবার বেলা খুব সাবধানে কথা কওয়া উচিত। সেখানে সকল প্রকার অত্যুক্তিই সর্বতোভাবে পরিহার্য। বরঞ্চ সেখানে খাটো করে কথা কহা কর্তব্য। আমি যে কবি···এ কথা আমি নিজেই লোককে বলে বেড়িয়েছি— কিন্তু অন্দরে যে আমার বসবার আসন আছে এ কথা উচ্চারণ করবার জো নেই। আমি কবি কিন্তু আমি গুরু নই এ কথা বলে আমি হয়রাণ হলুম। দয়া করে এইটে আপনারা গ্রহণ করবেন এবং এণ্ড্রুস সাহেবকেও আমার পরিচয়টা সমজিয়ে দিবেন।" এই পত্র রবীন্দ্রনাথের অন্তরের কথা, অন্তরঙ্গদের নিকট লিখিত, ইহাতে কবিচরিত্রের একটি অপরূপ দিকের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বিলাতে আছেন ভাবজগতে; কিন্তু মনের মধ্যে অসংখ্য সমস্যা ও সংগ্রাম চলিতেছে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ভাবনা— সহায়তার লোক মেলে না; আদি ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার সাফল্যের যে কোনো আশা নাই তাহা কবি বুঝিতে পারিতেছেন, যদিও এই সময়ে জামাতা নগেন্দ্রনাথ পুরাতন তত্ত্ববোধিনী সভা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এ ছাড়া জোড়াসাঁকোর সাংসারিক সমস্যা জটিল হইতেছে, তখন সেখানে দুই কন্যা ও দুই জামাতাই বাস করেন। জমিদারির অবস্থা আদৌ আশাপ্রদ নহে। বিলাত যাত্রার পূর্বে জমিদারির কাজকর্ম দেখিবার ভার অর্পণ করা হয় প্রমথ চৌধুরীর উপর। এ ছাড়া এই সময়ে শান্তিনিকেতনের অর্থসংকটও অতি ভীষণ। আমাদের মনে আছে বোলপুর বাজারে ধারে খাদ্যদ্রব্য পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছিল, বাজারদেনা প্রায় ১৮০০৲ টাকা। রবীন্দ্রনাথ ক্যাক্সটন হলে বক্তৃতা দিয়া যে টাকা পাইয়াছিলেন সেইটি ও ম্যাকমিলনের কাছ হইতে গীতাঞ্জলির রয়ালটি বাবদ কিছু টাকা আগাম লইয়া মোট ৯০ পাউণ্ড করিয়া তাহা সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মারফত বোলপুরে পাঠাইয়া দিয়েছিলেন। সেই টাকা পৌঁছিলে বিদ্যালয়ের আর্থিক সমস্যা সাময়িকভাবে দূর হইল। মোটকথা ভাবলোক হইতে অনেক দূরের কথা ভাবিতে হইতেছিল ইংলণ্ডে বসিয়া। ইহার উপর যখন দেশবাসীর কাছ হইতে ইঙ্গিতে আভাসে প্রকাশ্যে রঙ্গমঞ্চে গ্লানিকর নিন্দাবাদে পুরস্কৃত হন, তখন তাঁহার স্পর্শচেতন মন যে অবশ হইয়া পড়িবে তাহাতে আর আশ্চর্য কী। বাহিরের আপ্যায়ন ও আঘাত দুইই তাঁহাকে স্পর্শ করে। আমেরিকা হইতে লণ্ডনে ফিরিবার একমাস পরে তিনি প্রবাসীর

১ *Letters to a Friend*, p 37-38.

সহকারী সম্পাদক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে পত্র লেখেন তাহাতে এই আহত চিত্তের পরাভূত ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে।[১]

রবীন্দ্রনাথ বিলাতে থাকিবার সময় পেটাভেল (Cap. J. W. Petavel) নামে একজন অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারি ইঞ্জিনীয়ারের সহিত পরিচিত হন। পেটাভেলের শিক্ষা-উপনিবেশ বা educational colony সম্বন্ধে অনেক আইডিয়া ছিল; কবি তাঁহার আদর্শবাদে মুগ্ধ হইয়া আশ্রমে গিয়া তাঁহার ভাবনাগুলিকে মূর্তি দান করিতে বলেন। পেটাভেল ও তাঁহার পত্নী শান্তিনিকেতনে আসেন কবির এ দেশে ফিরিবার পূর্বেই। তিনি সত্যই সেই শ্রেণীর আইডিয়ালিস্ট, বাস্তবের সহিত ঘনিষ্ঠতার সংযোগ যাঁহার কমই। শেষ পর্যন্ত কার্যত তাঁহার শিক্ষা-উপনিবেশের ভাবকে রূপদান করিতে পারেন নাই।[২]

প্রত্যাবর্তন ও নোবেল প্রাইজ

বৎসরাধিক কাল বিদেশে ঘুরিয়া রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরিয়াছেন; আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব সাহিত্যিক ভক্তবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দিত হইবারই কথা। বহুকাল নিজ পরিজন, ব্রাহ্মসমাজ ও দেশের বাস্তবতা হইতে দূরে ছিলেন; পত্রযোগে সে-সব সংবাদ ও বিবাদাদির কথা জানিতে পারিতেন, তাহাতে মন নিশ্চয়ই ক্ষুব্ধ হইত, কিন্তু মন ভাঙিয়া পড়িত না। কিন্তু দেশে ফিরিয়াই বাস্তবের বিচিত্র সমস্যার সম্মুখীন হইয়া আজ নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হইতেছে। বিদ্যালয়ের অভাব-অভিযোগ নিন্দাবাদ তো শুনিতেই হয়। জোড়াসাঁকোর বাড়ির মধ্যে পারিবারিক অশান্তির কথা, ছোট কথার দীর্ঘ আলোচনায় মন দুই দিনের মধ্যেই ক্লান্ত হইয়া উঠিল। ইহার উপর আছে অভিজাত সমাজের 'সামাজিক' আদর-আপ্যায়ন অভ্যর্থনা-নিমন্ত্রণ। ইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন, "এই দু'দিনের বিষম উপদ্রবে আজ আমার শরীর একেবারে ভেঙে পড়েচে। তাই আজই (২২ আশ্বিন) বিকেলের গাড়িতে [বোলপুর] পালাতে হচ্চে, নইলে বাঁচব না। দেশে ফিরে এসেই পুনর্মূষিকোভব হবার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে।"[৩]

কলিকাতা হইতে দিল্লিতে এণ্ড্রুসকে লিখিত পত্রমধ্যে এই অপ্রসন্ন মনের ভাবটির ছায়া পড়িয়াছে। তিনি লিখিতেছেন, "আমার প্রাণ অত্যন্ত নির্জন লাগিতেছে, চারি দিকের দায়িত্বের বোঝা এতই গুরু যে মনে হয় একজনের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। বিলাতে থাকিতে আমার মন আমার বন্ধুদের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিল, আমার চিত্তের চিন্তাস্রোত সর্বদাই বাহিরের দিকে প্রবাহিত হইত। সুতরাং, দেশে ফিরিয়া আসিয়া আমি অকস্মাৎ যেন মরুভূমির মধ্যে পড়িয়াছি, এখানে মানুষের চিত্তের সহিত চিত্তের তেমন যোগ নাই; এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সহায়হীনভাবে নিজ নিজ সমস্যার সাধনা করিতে হয়। কিছুকাল আমার মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত ছিল; (*Letters to a Friend*, p 38) কিন্তু মনের বল অসাধারণ বলিয়া কবি সাংসারিক সকল আঘাতকে তুচ্ছ করিয়া আনন্দলোকে ফিরিয়া যাইতে পারিলেন।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের পূজার ছুটি চলিতেছে; তৎসত্ত্বেও কবি সেখানে চলিয়া গেলেন। শান্তিনিকেতনে পৌঁছিয়া আশ্রমের প্রাক্তনছাত্র আমেরিকা-প্রবাসী সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণকে লিখিতেছেন, "প্রবাসের পালা শেষ করে আবার সেই আশ্রমে এসে বসেছি। কত আরাম সে আর বলতে পারিনে। দেশবিদেশে সম্মান সম্বর্ধনা তো

১ পত্র, ১৭ মে ১৯১৩। ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২০। দ্র প্রবাসী ১৩৩২ অগ্রহায়ণ, পৃ ১৯৬।

২ আশ্রম ত্যাগ করিয়া পেটাভেল কলিকাতায় যান ও মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অর্থানুকূল্যে পলিটেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন করেন। ইনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা।

৩ চিঠিপত্র ৫, পৃ ২৮। ৮ অক্টোবর ১৯১৩।

অনেক পেয়েছি কিন্তু এখানকার খোলা আকাশের এই নির্মল আলোকে প্রতিদিন যে অভিষেক হয় তার কাছে কিছু লাগে না।"

কবি শান্তিনিকেতনের অতিথিশালার দ্বিতলে আছেন— চারি দিক নিস্তব্ধ, বিদ্যালয়ের ছুটি, পুরাতন পারিপার্শ্বিককে নূতন করিয়া পাইলেন— তাঁহার গানের ধারা যাহা রোহিত সাগর পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, "অনেক দিন চাপা থেকে হঠাৎ এখানে এসেই মনের আনন্দে…গানের উৎসটি খুলে গেছে…।"[১] এণ্ড্রুসকেও লিখিতেছেন, Just now the singing mood is upon me, and I am turning out fresh songs every day. (*Letters to a Friend*, p 39) গীতিমাল্যের গানের পালা চলিতেছে।

কবি একা নির্জন শান্তিনিকেতনে আছেন— প্রথম চৌধুরীরা দার্জিলিঙে— তথায় যাইবার জন্য আমন্ত্রণ আসিল। কবি তাঁহাকে লিখিতেছেন, "বোলপুরে আমার আসনটি এমন জমে গেছে যে এখান থেকে নড়তে আমার সাহস হয় না।…এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে কেবল আমার চোখের দেখার সম্বন্ধ নয়, একে আমার জীবনের সাধনা দিয়ে পেয়েছি— সেইজন্যে এইখানে আমি সকল তীর্থের ফললাভ করি— সেই জন্যে এইখানে পড়ে থাকি এবং পড়ে থেকেই আমার ভ্রমণের কাজ হয়। এখানে আমার অনেক ব্যাঘাত অভাব এবং অসুবিধাও আছে, সে সমস্তই শিরোধার্য করে নিয়েছি।"[২] কবি দার্জিলিং গেলেন না ; মনের এই ভাবটি প্রকাশ পাইতেছে আরনেস্ট রীহ্‌সকে লেখা পত্র হইতেও। ২ নভেম্বর রিহ্‌সের এক পত্র পান— সেই দিনই উত্তর লিখিতেছেন—

"I am writing to you sitting in my room…a swelling sea of foliage is seen through the open doors…, I cannot tell you what a never-ending feast of delight and wonder this is to me— this sight of the love-making of the shadow and light, this exchange of glances and whispers between heaven and earth."[৩]

৯ নভেম্বর ১৯১৩ (২৩ কার্তিক) বিদ্যালয় খুলিল ; বহুকাল পরে কবি ছাত্র-অধ্যাপকগণের সহিত মিলিত হইলেন। ইহাদের সঙ্গ ও সাক্ষাতলাভে কবি আজ বড়ই তৃপ্ত। বিদ্যালয় খুলিবার কয়েকদিন পরে (১৫ নভেম্বর। ২৯ কার্তিক) কবি, রথীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথ মোটরগাড়ি করিয়া চৌপাহাড়ি শালবনে বেড়াইতে যাইতেছিলেন, পথে তাঁহারা টেলিগ্রাম পাইলেন যে, ১৯১৩ সালের সাহিত্যের 'নোবেল' প্রাইজ রবীন্দ্রনাথকে প্রদত্ত হইয়াছে। সন্ধ্যার মুখে আশ্রমে এই সংবাদ প্রচারিত হইলে বালকগণ কী উৎসব-তাণ্ডবই না করিল।

কলিকাতায় এই সংবাদ প্রথম প্রকাশ করে অধুনালুপ্ত Empire (18 Nov) নামে একখানি সান্ধ্য দৈনিক— 'It is the first recognition of the indigenous literature of this Empire as a world force. ; it is the first time that an Asiatic has attained distinction at the hands of the Swedish Academies, and this is the first occasion upon which the £8,000 prize has been awarded to a poet who writes in a language so entirely foreign to the awarding country is to Sweden.'

এখানে নোবেল পুরস্কার সম্বন্ধে কিছু তথ্য বলা দরকার। নোবেলের পুরা নাম আলফ্রেড বার্নহার্ড নোবেল।

১ চিঠিপত্র ৫। পত্র ১৬, পৃ ১৬৭। প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পত্র। যে কয়টি গান লেখেন সেগুলি গীতিমাল্যের অন্তর্গত— ৪২. যদি প্রেম দিলে না প্রাণে (২৮ আশ্বিন ১৩২০), ৪৩. নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে (২৯ আশ্বিন), ৪৪. আমার মুখের কথা তোমার (২ কার্তিক), ৪৫, আমার যে আসে কাছে (১ কার্তিক), ৪৬, কেবল থাকিস সরে সরে (৫ কার্তিক)।

২ চিঠিপত্র ৫। পত্র ১৭, পৃ ১৬৮-১৬৯। ২৬ অক্টোবর ১৯১৩ (১০ কার্তিক ১৩২০)।

৩ Ernest Rhys, *Letters from Limbo*, p 171.

১৮৩৩ সালে সুইডেনের রাজধানী স্টকহলমে ইঁহার জন্ম। রসায়ন শাস্ত্র, পদার্থ বিজ্ঞান ও ইনজিনিয়ারিং বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া তিনি যশস্বী হন; ১৮৬৫-৬৬ সালে তিনি ডিনামাইট আবিষ্কার করেন। ইহার পর আমেরিকায় পেটেন্ট লইয়া ডিনামাইটের কারখানা খোলেন। অল্পকালের মধ্যে য়ুরোপের নানা স্থানে অনুরূপ কারখানা স্থাপন করিয়া অতুল সম্পদের অধিকারী হন। ১৮৯৬ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়; তৎপূর্বে তিনি প্রায় বিশ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি (প্রায় আড়াই কোটি টাকার সম্পত্তি) পাঁচটি পুরস্কার প্রদানের জন্য দান করিয়া যান। এই টাকার সুদ হইতে ১৯০১ সাল হইতে জড়বিজ্ঞান রসায়ন চিকিৎসা সাহিত্য ও বিশ্বশান্তির শ্রেষ্ঠ সাধকদের পুরস্কার প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে। প্রত্যেক পুরস্কারের টাকা ৮০০০ পাউণ্ড। রবীন্দ্রনাথ যখন ঐ টাকা পান তখন একসঙ্গে উহার মূল্য ছিল একলক্ষ বিশ হাজার টাকা।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বারো বৎসর নানা দেশের গুণীরা এই অর্থ ও সম্মান লাভ করেন; এই দীর্ঘকালের মধ্যে সাহিত্যে চারিজন জার্মান, তিনজন ফরাসী, একজন করিয়া সুইড, নরওয়েজিয়ান, পোল্ ও ইংরেজ ইহা পাইয়াছিলেন।[১] মোটকথা য়ুরোপের বাহিরে তখন পর্যন্ত কেহ এই পুরস্কার পান নাই। ইংরেজদের মধ্যে যিনি পাইয়াছিলেন তিনি হইতেছেন রুডিয়ার্ড কিপ্‌লিং—ইঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য ক্রিটিকদের মধ্যেই মতভেদ ছিল।

সুইডিশ অ্যাকাডেমি নভেম্বর মাসের প্রথমভাগে প্রতি বৎসর এই পুরস্কার ঘোষণা করেন। এবার ১৩ই নভেম্বর রবীন্দ্রনাথের পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল। দুই দিন পরে বোলপুরে কবি এই সংবাদ পাইলেন। এই সংবাদ যেদিন পৌঁছায় সেদিন বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান কলেজের ইংরেজি-অধ্যাপক এডোয়ার্ড টমসন (পরে রবীন্দ্রচরিতকার ও কেমব্রিজের বাংলার অধ্যাপক) উপস্থিত ছিলেন।

নোবেল পুরস্কারের সংবাদ পাইয়া কবির প্রথমেই স্মরণে জাগিতেছে রোটেনস্টাইনের কথা। তিনি তিন দিন পরে (১৮ নভেম্বর ১৯১৩) তাঁহাকে লিখিতেছেন, "যে মুহূর্তে নোবেল পুরস্কার দানের সংবাদ পাইলাম, তৎক্ষণেই আমার অন্তর আপনার প্রতি ভালোবাসায় ও কৃতজ্ঞতায় স্বতই বাধিত হইয়াছিল। আমি জানি আমার বন্ধুদের মধ্যে এই সংবাদে আপনার মতো তৃপ্ত আর কেহ হইবেন না। যাহারা আমাদের অতিপ্রিয় তাহারা সুখী হইবে ইহাতেই পরম আনন্দ। কিন্তু এই সম্মান আমার পক্ষে বিষম পরীক্ষার বিষয় হইয়াছে। পাবলিক উত্তেজনার রীতিমত যে ঘূর্ণিবায়ু উঠিয়াছে, তাহা বিভীষিকাময়। একটি কুকুরের লেজে টিন বাঁধিয়া দিলে, বেচারা নড়িলেই যেমন শব্দ হয় এবং চারি দিকে লোকের ভিড় জমে, আমার দশা তদ্রূপ। গত কয়েক দিনের টেলিগ্রাম ও পত্রের চাপে আমার শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে; যে সব লোকের আমার প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নাই, বা যাহারা আমার রচনার একটি ছত্রও পড়ে নাই, তাহারাই তাহাদের আনন্দজ্ঞাপনে সর্বাপেক্ষা অধিক মুখর। এই সব উচ্ছ্বাস আমাকে যে কী পরিমাণ ক্লান্ত করিয়াছে আমি বলিতে পারি না। এই অবাস্তবতার আধিক্য ভয়াবহ। সত্য কথা কি, ইহারা আমি যে সম্মান লাভ করিয়াছি, সেই সম্মানকে সম্মান দেখাইতেছে। আমাকে নহে।"[২]—

১ ১৯০১ সালি-প্রধোন (১৮০৯-১৯০৭) ফ্রান্সের কবি ও লেখক। ১৯০২ থিওডোর মম্‌সেন (১৮১৭-১৯০৩) জারমান ঐতিহাসিক। ১৯০৩ ব্যওর্ণসন (Bjornson) (১৮৩২-১৯১০) নরওয়ের নাট্যকার। ১৯০৪ মিস্ত্রাল Frederic Mistral (১৮৩০-১৯১৪) ফ্রান্সের দক্ষিণস্থ প্রোভেন্সাল ভাষার কবি ও এ'চগারে (Jose Echegaray) (১৮৩২-১৯১৬) স্পেন দেশীয় সাহিত্যিক। ১৯০৫ সিয়েনকিউইজ (Sienkiewicz) (১৮৪৬-১৯১৬) পোলিশ ঔপন্যাসিক। ১৯০৬ কাদু চি (১৮৩৫-১৯০৭) ইতালিয়ান লেখক। ১৯০৭ কিপলিং (১৮৬৫-১৯৩৫) বৃটিশ লেখক। ১৯০৮ রুডোলফ অয়কেন (১৮৪৬-১৯২৬) জারমান দার্শনিক। ১৯০৯ সেল্‌মা লাগেরলফ (১৮৫৮-১৯৪৭) সুইড লেখিকা। ১৯১০ পল হেয়স (Heyse) (১৮৩০-১৯১৪) জারমেন লেখক। ১৯১১ মেটারলিংক (১৮৬২-১৯৩২) বেলজিয়ান নাট্যকার (ফরাসী ভাষার লেখক)। ১৯১২ হাউপ্‌টমান (১৮৬২-১৯৪৬) জারমান লেখক। ১৯১৩ রবীন্দ্রনাথঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। ১৯১৪ যুদ্ধের জন্য কোনো পুরস্কার প্রদত্ত হয় নাই। ১৯১৫ রোমা রোলাঁ (১৮৬৬-১৯৪৪) ফরাসী লেখক।

২ Rothenstein: *Men and Memories*, p 282. Letter, II, 18 Nov 1913.

The very first moment I received the message of the great honour conferred on me by the award of the Nobel prize my heart turned towards you with love and gratitude. I felt certain that of all my freinds none would be more glad at this news than you. Honour's crown of honour is to know that it will rejoice the hearts of those whom we hold the most dear. But, all the same, it is a very great trial for me. The perfect whirlwind of public excitement it has given rise to is frightful. It is almost as bad as tying a tin at a dog's tail making it impossible for him to move without creating noise and collecting crowds all along. I am being smothered with telegrams and letters for the last few days and the people who never had any friendly feeling towards me nor ever read a line of my works, are loudest in their protestations of joy. I cannot tell you how tired I am of all this shouting, the stupendous amount of its unreality being something appalling. Really these people honour the honour in me and not myself.

এদিকে কলিকাতায় নোবেল প্রাইজ ঘোষিত হইলে রবীন্দ্রভক্তেরা কবিকে বিশেষভাবে সম্মানিত করিবার জন্য মাতিয়া উঠিলেন। স্থির হইল কলিকাতা হইতে স্পেশাল ট্রেনে করিয়া নানা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা বোলপুরে গিয়া কবিকে তাঁহার শান্তিনিকেতনেই সম্বর্ধিত করিবেন। তদনুসারে ৭ই অগ্রহায়ণ (২৩শে নভেম্বর) একখানি স্পেশাল ট্রেনযোগে ৫০০ নরনারীর বিপুল সমাবেশ আশ্রমে উপস্থিত হইল। শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে তাঁহাদের অভ্যর্থনা-সভার আয়োজন হয়। এই দলে প্রধানদের মধ্যে ছিলেন জস্টিস আশুতোষ চৌধুরী, অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু, ডা: প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, রেভারেণ্ড মিলবার্ন, মৌলভী আবদুল কাসেম, পূরণচাঁদ নাহার, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ডা: দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রভৃতি।

এখানে একটি কথা বলা দরকার। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন বলিয়া যে কলিকাতাবাসীরা কবিকে সম্বর্ধিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এ কথা ঠিক নহে। বিলাত হইতে ফিরিয়াই কবি শুনিয়াছিলেন যে তাঁহাকে লইয়া টাউনহলে একটা উৎপাত করিবার জন্য আয়োজন চলিতেছে। তিনি শান্তিনিকেতনে আসিয়াই এক পত্রে লিখিতেছেন, 'শুনতে পাচ্ছি ছুটির পর নভেম্বর মাসে টাউনহলে একটা সমারোহ করবার জন্য ষড়যন্ত্র এবং টাকা আদায় চলচে।'[১] সুতরাং বিদেশীর নিকট হইতে সম্মান লাভের পর তাঁহার দেশবাসীরা তাঁহাকে সম্বর্ধিত করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল বলিয়া যে-একটা কথা উঠিয়াছিল— এ কথা বলিলে দেশের লোকের প্রতি অবিচার করা হইবে।

সেদিন শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে বাংলাদেশের বহু গুণী ও জ্ঞানী সমবেত হইয়াছিলেন। নানা প্রতিষ্ঠান, সভা ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিলেন। সে শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্যে বাঙালির কোনো কপটতা ছিল না। বৃটিশপদানত ভারতের এক সুসন্তান য়ুরোপের একটি স্বাধীন দেশ হইতে যে প্রতিভার যথোচিত সম্মান পাইয়াছেন ইহাতেই তাঁহারা কেবল গৌরব বোধ করিতেছেন না— তাঁহারা গর্ব অনুভব করিতেছেন।[২]

অতঃপর কবি প্রতিনিধিদের ভাষণের উত্তরে যে প্রত্যভিভাষণ করিলেন, তাহা অনেকের মতে কালোচিত হয় নাই,

১ সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণকে লিখিত পত্র. ২৩ আশ্বিন ১৩২০। শান্তিনিকেতন। দ্র দেশ ১৩৫৩ বৈশাখ ২১। পৃ ৫৫২। প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পত্র। ৩০ আশ্বিন ১৩২০, চিঠিপত্র ৫। পত্র ১৬। পৃ ১৬৭-৬৮।

২ বিস্তৃত বিবরণ সমসাময়িক সঞ্জীবনী (ডা: দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের সংগ্রহে রক্ষিত)।

আবার কাহারও কাহারও মতে উত্তর যথোপযুক্ত হইয়াছিল। কবি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম নিম্নে উদ্‌ধৃত হইতেছে। তিনি বলিলেন, "আজ আমাকে সমস্ত দেশের নামে আপনারা যে সম্মান দিতে এখানে উপস্থিত হয়েছেন তা অসংকোচে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করি এমন সাধ্য আমার নেই।…যাঁরা জনসাধারণের নেতা, যাঁরা কর্মবীর সর্বসাধারণের সম্মান তাঁদেরই প্রাপ্য এবং জনপরিচালনার কাজে সেই সম্মানে তাঁদের প্রয়োজনও আছে। যাঁরা লক্ষ্মীকে উদ্ধার করবার জন্যে বিধাতার মন্থনদণ্ডস্বরূপ হয়ে মন্দার পর্বতের মতো জনসমুদ্র মন্থন করেন, জনতা-তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে তাঁদের ললাটকে সম্মানধারায় অভিষিক্ত করবে, এইটেই সত্য, এইটেই স্বাভাবিক।

"কিন্তু কবির সে ভাগ্য নয়। মানুষের হৃদয়ক্ষেত্রেই কবির কাজ এবং সেই হৃদয়ের প্রীতিতেই তাঁর কবিত্বের সার্থকতা। কিন্তু এই হৃদয়ের নিয়ম বিচিত্র— সেখানে কোথাও মেঘ, কোথাও রৌদ্র। অতএব প্রীতির ফসলেই যখন কবির দাবি তখন এ কথা তার বলা চলবে না যে, নির্বিশেষে সর্বসাধারণেরই প্রীতি তিনি লাভ করবেন। যাঁরা যজ্ঞের হোমাগ্নি জ্বালাবেন তাঁরা সমস্ত গাছটাকেই ইন্ধনরূপে গ্রহণ করতে পারেন; আর মালা গাঁথার ভার যাঁদের উপরে, তাঁদের অধিকার কেবলমাত্র শাখার প্রান্ত ও পল্লবের অন্তরাল থেকে দুটি চারটি করে ফুল চয়ন করা।

"কবি-বিশেষের কাব্যে কেউ বা আনন্দ পান, কেউ বা উদাসীন থাকেন, কারো বা তাতে আঘাত লাগে এবং তাঁরা আঘাত দেন। আমার কাব্য সম্বন্ধেও এই স্বভাবের নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম হয় নি এ কথা আমার এবং আপনাদের জানা আছে। দেশের লোকের হাত থেকে যে অপযশ ও অপমান আমার ভাগ্যে পৌঁছেছে তার পরিমাণ নিতান্ত অল্প হয় নি এবং এতকাল আমি তা নিঃশব্দে বহন করে এসেছি। এমন সময় কিজন্য যে বিদেশ হতে আমি সম্মান লাভ করলুম তা এখন পর্যন্ত আমি নিজেই ভালো করে উপলব্ধি করতে পারি নি। আমি সমুদ্রের পূর্বতীরে বসে যাঁকে পূজার অঞ্জলি দিয়েছিলেম তিনিই সমুদ্রের পশ্চিমতীরে সেই অর্ঘ্য গ্রহণ করবার জন্য যে তাঁর দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করেছিলেন সে কথা আমি জানতুম না। তাঁর সেই প্রসাদ আমি লাভ করেছি— এই আমার সত্যলাভ।

"যাই হোক্‌, যে কারণেই হোক, আজ য়ুরোপে আমাকে সম্মানের বরমাল্য দান করেছেন। তার যদি কোনো মূল্য থাকে তবে সে কেবল সেখানকার গুণীজনের রসবোধের মধ্যেই আছে। আমাদের দেশের সঙ্গে তার কোনো আন্তরিক সম্বন্ধ নেই। নোবেল প্রাইজের দ্বারা কোনো রচনার গুণ বা রসবৃদ্ধি করিতে পারে না।

"অতএব আজ যখন সমস্তদেশের জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে আপনারা আমাকে সম্মান-উপহার দিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তখন সে সম্মান কেমন করে আমি নির্লজ্জভাবে গ্রহণ করব? এ সম্মান আমি কতদিনই বা রক্ষা করব? আমার আজকের এদিন তো চিরদিন থাকবে না; আবার ভাঁটার বেলা আস্‌বে, তখন পঙ্কতলের সমস্ত দৈন্য আবার তো ধাপে ধাপে প্রকাশ হতে থাকবে।

"তাই আমি আপনাদের কাছে করজোড়ে জানাচ্ছি— যা সত্য তা কঠিন হলেও আমি মাথায় করে নেব, কিন্তু যা সাময়িক উত্তেজনার মায়া, তা আমি স্বীকার করে নিতে অক্ষম। কোনো কোনো দেশে বন্ধু ও অতিথিদের সুরা দিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়। আজ আপনারা আদর করে সম্মানের যে সুরাপাত্র আমার সম্মুখে ধরেছেন তা আমি ওষ্ঠের কাছে পর্যন্ত ঠেকাব, কিন্তু এ মদিরা আমি অন্তরে গ্রহণ করতে পারব না। এর মত্ততা থেকে আমার চিত্তকে আমি দূরে রাখতে চাই। আমার রচনার দ্বারা আপনাদের যাঁদের কাছ থেকে আমি প্রীতি লাভ করেছি, তাঁরা আমাকে অনেক দিন পূর্বেই দুর্লভ ধনে পুরস্কৃত করেছেন, কিন্তু সাধারণের কাছ থেকে নূতন সম্মানলাভের কোনো যোগ্যতা আমি নূতন রূপে প্রকাশ করেছি এ কথা বলা অসংগত হবে।

"যিনি প্রসন্ন হলে অসম্মানের প্রত্যেক কাঁটাটি ফুল হয়ে ফোটে, প্রত্যেক পঙ্কপ্রলেপ চন্দনপঙ্কে পরিণত হয় এবং সমস্ত

কালিমা জ্যোতিষ্মান হয়ে ওঠে, তাঁরি কাছে আজ আমি এই প্রার্থনা জানাচ্ছি— তিনি এই আকস্মিক সম্মানের প্রবল অভিঘাত থেকে তাঁর সুমহান্ বাহুবেষ্টনের দ্বারা আমাকে নিভৃতে রক্ষা করুন।"[১]

রবীন্দ্রনাথের এই বক্তৃতায় অতিথিরা অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং কলিকাতার সংবাদপত্রে বহুকাল ধরিয়া এই লইয়া আলোচনা চলে। বড়ই আশ্চর্য লাগে যে বিপিনচন্দ্র পাল, যিনি দেড় বৎসর পূর্বে 'বঙ্গদর্শনে' রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনা, কল্পনা, সাধনাকে ফাঁকি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন তিনি আজ Hindu Review নামে এক মাসিকে কবির উক্তি সমর্থনে মন্তব্য করিলেন—No man of Rabindranath's position and sensibilities could have been less bitter under similar circumstances। কবি তাঁহার প্রতিভাষণের জন্য জবাবদিহি বা দুঃখপ্রকাশ করিলেন না। তিনি সম্পূর্ণ নীরব ; কয়েকদিন পরে অন্তরের বেদনা ক্ষীণ গীতধারায় ক্ষণিকে দেখা দিল ; তিনি লিখিলেন—'লুকিয়ে আস আঁধার রাতে' (১৪ই অগ্রহায়ণ), 'আমার কণ্ঠ তাঁরে ডাকে' (১৫ই), 'আমার সকল কাঁটা ধন্য করে' (ঐ)। অতঃপর ১৫ই অগ্রহায়ণ তিনি কলিকাতায় গেলেন— বিলাত হইতে ফিরিবার দুইদিনের মধ্যেই শান্তিনিকেতনে চলিয়া আসিয়াছিলেন (২২ আশ্বিন)। তার পর এই ফিরিলেন।

কলিকাতায় যাইবার পূর্বে শান্তিনিকেতনে কবি যে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান করিলেন সেটি উল্লেখযোগ্য। পাঠকের স্মরণ আছে দক্ষিণ-আফ্রিকায় এই সময়ে গান্ধীজি-প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলিতেছিল। এই আন্দোলন স্বচক্ষে দেখিবার জন্য গতবৎসর মহামতি গোখ্‌লে দক্ষিণ-আফ্রিকা গিয়াছিলেন ; এবার এণ্ড্রুস ও পিয়ার্সন আফ্রিকা যাত্রার সংকল্প করিলেন। এণ্ড্রুস দিল্লি হইতে শান্তিনিকেতনে আসিয়া কবির আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন ও পিয়ার্সনকে লইয়া ৩০শে নভেম্বর ১৯১৩ (১৪ অগ্রহায়ণ ১৩২০) বোলপুর ছাড়িলেন। যাত্রার পূর্বে মন্দিরে বিশেষ উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ আচার্যের কার্য করেন। বিদায়কালে ছাত্রদের যে সভা হয় তাহাতে পিয়ার্সন বলিয়াছিলেন, "আমি এবং আমার বন্ধুর [এণ্ড্রুস] পক্ষ হইতে একটি মাত্র কথা তোমাদিগকে বলিতেছি যে এই শান্তিনিকেতন আশ্রম হইতে যে শান্তি আমরা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি তাহা দক্ষিণ-আফ্রিকার কার্যে আমাদিগকে সাহায্য করিবে।"[২]

এই ঘটনাটি সামান্য হইলেও আশ্রমের ইতিহাসের দিক হইতে বিশেষ, কারণ বিদ্যালয় তাহার ক্ষুদ্র দেশীয় গণ্ডি ও আবেষ্টনীর বাহিরে এই প্রথম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। রবীন্দ্রনাথ এণ্ড্রুসকে লিখিয়াছিলেন, "You know our best love was with you, while you were fighting our cause in South Africa along with Mr. Gandhi and others.[৩] গান্ধীজির সম্বন্ধে ইহাই কবির প্রথম উক্তি।

কবি যখন কলিকাতায় তখন পাবলিক সার্বিস কমিশনের (ইসলিংটন) অন্যতম সভ্য পার্লামেণ্টের শ্রমিক-সদস্য র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড[৪] শান্তিনিকতনে আসিলেন ; তিনি বিদ্যালয়ের কাজকর্ম ও বিশেষভাবে ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত সাঁওতাল বিদ্যালয়টি দেখিয়া খুবই তৃপ্ত হইলেন ; তিনি ছাত্রদের কাছে নিজ জীবনের কথা উল্লেখ করিয়া অবশেষে বলিলেন যে, তিনি আশা করেন এই সব অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্য হইতে একদিন প্রতিভার উদ্ভব হইবে।[৫] দেশে ফিরিয়া গিয়া শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় সম্বন্ধে একটি মনোরম প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।[৬] আমাদের মনে

১ সঞ্জীবনী. ২৮ নভেম্বর ১৯১৩ [১২ অগ্রহায়ণ ১৩২০] কলিকাতা ম্যুনিসিপ্যাল গেজেট, রবীন্দ্রস্মৃতি সংখ্যা, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪১, পৃ xxii।

২ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৫ শক, পৃ ১৯১।

৩ *Letters to a Friend*, p 39. Santinketan, 1914 February.

৪ James Ramsay MacDonald (1866-1937) First Labour member of Br. Parliament 1906-18 : again 1922-37. First Labour Ministry. 1924 Jan-Oct 20. Again P. M. 1929-31 P. M. in a coalition ministry 1931-35.

৫ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৫ শক, অগ্রহায়ণ-পৌষ পৃ ১৮৬-৮৯। ১৯১৩ পৌষ।

৬ Daily Chronicle. 1914, Jan 14.

হয় রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয় সম্বন্ধে বিলাতে প্রকাশিত প্রবন্ধ এই প্রথম। আমেরিকায় মারিয়ন ফেল্‌প্‌স্‌ ইতিপূর্বে সংবাদপত্রে আশ্রম সম্বন্ধে লিখিযাছেন (১৯১২)।

পৌষ উৎসবের পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। অর্থাৎ কলিকাতাতে ছিলেন অগ্রহায়ণের শেষ পনেরো দিন ও পৌষের প্রথম কয়টা দিন। এবারকার সাতই পৌষে যে ভাষণ দান করিলেন তাহার মধ্যে বিশেষ একটি বাণী ছিল। ধর্ম এখন তাঁহার কাছে কেবলমাত্র ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম নাই, ইহা এখন মানুষের ধর্ম, বিশ্বধর্ম : তাই তিনি অত্যন্ত জোরের সহিত সেদিন ঘোষণা করিলেন, "এ আশ্রম— এখানে কোনো দল নেই, সম্প্রদায় নেই।··· সত্যকে লাভ করবার দ্বারা আমরা তো কোনো নামকে পাই না।··· যে সত্যের আঘাতে কারাগারের প্রাচীর ভাঙি, তাই দিয়ে তাকে নূতন নাম দিয়ে পুনরায় প্রাচীর গড়ি এবং সেই নামের পুজো শুরু করে দিই।··· আমাদের এই আশ্রম থেকে কেউ নাম নিয়ে যাবে না।·· এখানে আমরা যে ধর্মের দীক্ষা পাব, সে দীক্ষা মানুষের সমস্ত মনুষ্যত্বের দীক্ষা।... এখানে আমরা নামের পুজো থেকে, দলের পুজো থেকে, আপনাদের রক্ষা করে সকলেই আশ্রয় পাব— এইজন্যই তো আশ্রম। যে-কোনো দেশ থাকে যে-কোনো সমাজ থেকে যেই আসুক না কেন, তাঁর পুণ্যজীবনের জ্যোতিতে পরিবৃত হয়ে আমরা সকলেই এই মুক্তির ক্ষেত্রে আহ্বান করব। দেশ-দেশান্তর হতে দূর-দূরান্তর থেকে যে-কোনো ধর্মবিশ্বাসকে অবলম্বন করে যিনিই এখানে আশ্রয় চাইবেন, আমরা যেন কাউকে গ্রহণ করতে কোনো সংস্কারের বাধা বোধ না করি। কোনো সম্প্রদাযের লিপিবদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের মন যেন সংকুচিত না হয়।"[১] এই বাণী যে কতবড়ো সত্যবাণী তাহা এখনো লোকের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, অথচ ইহাই হইতেছে ভবিষ্যৎ জগতের ধর্ম। বিশ্বভারতীর আবির্ভাব অন্তরে হইতেছে।

সেইদিনই সান্ধ্যোৎসবের উপদেশেও কবি এই কথাটি আবও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিলেন। বিলাতে এইবার য়ুনিটেরিয়ান মনীষী ও সাহিত্যিক স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুকের[২] সহিত কবির ধর্ম সম্বন্ধে যে আলোচনা হয় তাহারই উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুক বলেছিলেন যে, ধর্মকে এমন স্থানে দাঁড় করানো দরকার যেখান থেকে সকল দেশের সকল লোকই তাকে আপনার বলে গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ কোনো-একটা বিশেষ স্থানিক বা সাময়িক ধর্মবিশ্বাস বিশেষ দেশের লোকের কাছেই আদর পেতে পারে, কিন্তু সর্বদেশের সর্বলোকের লোককে আকর্ষণ করতে পারে না। আমাদের ধর্মের কোনো 'ডগ্‌মা' নেই শুনে তিনি ভারি খুশি হলেন। বললেন, তোমরা খুব বেঁচে গেছ। ডগ্‌মার কোনো অংশ না টিঁকলে সমস্ত ধর্মবিশ্বাসকে পরিহার করবার চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। সে বড়ো বিপদ। আমাদের উপনিষদের বাণীতে কোনো বিশেষ দেশকালের ছাপ নেই ; তার মধ্যে এমন কিছুই নেই যাতে কোনো দেশের কোনো লোকের কোথাও বাধতে পারে। তাই সেই উপনিষদের প্রেরণায় আমাদের যা কিছু কাব্য বা ধর্ম চিন্তা হয়েছে সেগুলো পশ্চিমদেশের লোকের ভালো লাগবার প্রধান কারণই হচ্ছে, তার মধ্যে বিশেষ দেশের কোনো সংকীর্ণ বিশেষত্বের ছাপ নেই।"[৩]

রবীন্দ্রনাথের অন্তরে সম্প্রদায়ের ধর্ম হইতে বাহিরে আসিবার জন্য যে প্রেরণা আসিযাছে, তাহা আজ য়ুরোপের নানা দেশের নানা মনীষীর মধ্যে দেখা দিয়াছে। "পশ্চিমদেশে যাঁরা মনীষী তাঁরা নিজের ধর্মসংস্কারের সংকীর্ণতার পীড়া পাচ্ছেন এবং ইচ্ছা করছেন যে ধর্মের পথ উদার এবং প্রশস্ত হয়ে যাক।" স্টপ্‌ফোর্ড্‌ ব্রুক রচিত *Onward*

১ ৭ই পৌষ ১৩২০। মুক্তির দীক্ষা। শান্তিনিকেতন ১৮। দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬, পৃ ৪৮১।

২ অগ্রসর হওযার আহ্বান। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬, পৃ ৪৮৭।

৩ ব্রুক্‌ চার্চ অব্‌ ইংলণ্ডের পাদরী ছিলেন (১৮৫৭-৮০) ; ঐ চার্চ ত্যাগ করিযা ইউনিটেরিযান হন। ব্লুমসবেরি ইউনি চার্চে (১৮৭৬-৯৫) প্রায় বিশ বৎসর উপদেশ করেন।

Cry নামে গ্রন্থ পাঠ করিয়া কবির মনে পশ্চিম সম্বন্ধে আশা হইতেছে এবং নিজের মত সম্বন্ধেও ভরসা জাগিতেছে। এই দিন তিনি লেখেন গীতিমাল্যের গান (৫০) 'গাব তোমার সুরে দাও সে বীণাযন্ত্র'। এই গানটির মধ্যে একটি পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম জীবনের আকাঙ্ক্ষা উদ্‌গীত হইয়াছে।

ধর্ম সম্বন্ধে এই বিরাট কল্পনা করিবার বাস্তব কারণ ছিল; প্রথমত পেটাভেল এণ্ড্রুস ও পিয়ার্সন আশ্রমে আসিয়াছেন— তাঁহারা ধর্মে খ্রীষ্টান, জাতিতে ইংরেজ। দ্বিতীয়ত, এই সময়ে একটি মুসলমান ছাত্রের আসিবার কথা হইল। (ছাত্রটি মুসলমান হইলেও ব্রাহ্ম; আগরতলার ডাক্তার কাজি সাহেবের পুত্র রবীন্দ্র কাজি— বাংলা সরকারের শিক্ষা-বিভাগের এককালীন সহকারী ইন্‌সপেক্‌ট্রেস শ্রীমতী সোফিয়া কাজির ভ্রাতা। রবীন্দ্র কাজি এখন মৃত)। ছাত্রাবাসে অহিন্দুদের প্রবেশের সম্ভাবনায় সেদিন অসংখ্য সমস্যা দেখা দিল; ভাবী ছাত্রটি কোথায় খাইবে, পংক্তির সহিত সে খাইবে কি না, পাচকরা তাহাকে পরিবেষণ করিবে কি না ইত্যাদি বহু প্রশ্ন তুলিয়া অধ্যাপকগণ অবশেষে যে মীমাংসায় উপনীত হইলেন, তাহা সমস্যাকে জটিলতর করিয়া তুলিল। কবির আদর্শ তাঁহার কর্মীদের দ্বারাই অস্বীকৃত হইল, অথচ জোর করিয়াও কিছু তিনি করিবেন না।

পৌষ উৎসবের অব্যবহিত পর কবিকে কলিকাতা যাইতে হইল। সেখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (২৬ ডিসেম্বর ১৯১৩।১১ই পৌষ ১৩২০) সেনেটের বিশেষ এক অধিবেশনে লাটভবনে রবীন্দ্রনাথকে ডক্টর অব লিটারেচার (D. Lit. সাহিত্যাচার্য) উপাধিতে ভূষিত করিলেন। এইদিনে বিখ্যাত রুশ জুরিস্ট পল ভিনোগ্রাডোফ, জার্মান পণ্ডিত হারমান জ্যাকোবি ও ফরাসী পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভিকে বিশ্ববিদ্যালয় একই সম্মান দান করেন। এইখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে নোবেল প্রাইজ ঘোষিত হইবার পূর্বেই সেনেট কবিকে এই উপাধি দান করিবেন স্থির করিয়াছিলেন; নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হইবার পর কবিকে সম্মানিত করিবার ব্যবস্থা হয়, এ অভিযোগ ঐতিহাসিক সত্য নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চানসেলর বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ উপস্থিত ছিলেন সভায়। তাঁহার সহিত কবির পরিচয় করিতে উঠিয়া তৎকালীন ভাইস-চানসেলর সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যাহা বলিলেন তাহার কিংয়দংশ পাদটীকায় উদ্ধৃত হইল।[১]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ উৎসবের অব্যবহিত পরেই কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন, নানা কারণে কলিকাতায় থাকিতে ইচ্ছা নাই। শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া এবার কবি একেবারে মাঘোৎসবের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে আছেন। আশ্রমে ফিরিয়া গীতিমাল্যের তিনটি গান রচিত (৫১,৫২,৫৩) দেখি— 'প্রভু, তোমার বীণা যেমনি বাজে' (১৪ই পৌষ), 'তোমায় আমায় মিলন হবে বলে' (১৫ই), 'জীবন-স্রোতে ঢেউয়ের 'পরে' (১৫ই)

মাঘোৎসবের সময় কবি কলিকাতায় যথাবিধি আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্যরূপে উপদেশ দান করিলেন।[২] কিন্তু

১ "Apart, however, from the pre-eminence of Mr. Rabindranath Tagore as a poet, we must not overlook the true significance of the world-wide recognition now accorded for the first time to the writings of an author who has embodied the best products of his genius in an Indian vernacular; this recognition, indeed, has been preceded by a remarkable revolution in what used to be not long ago the current estimate, in academic circles, of the true position of the vernaculars as a subject of study by the students of our University."

In conferring the degree, the Chancellor, Lord Hardinge said, ' Upon the modest brow of the last of these the Nobel Prize has but lately set the laurels of a world-wide recognition, and I can only hope that the retiring disposition of our Bengali Poet will forgive us for thus dragging him into publicity once more and recognise with due recognition that he must endure the penalties of greatness" (Quoted from *Calcutta Municipal Gazette, Tagore Memorial Special Supplement*, September 13, 1941. দ্র. দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৬৩, পৃ. ৬৮-৭৪।)

২ ছোটো ও বড়ো। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৫। ১৩২০ ফাল্গুন। প্রবাসী ১৩২০ ফাল্গুন। শান্তিনিকেতন ১৭। দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬, পৃ ৪৩৮।

এবারের বিশেষ ঘটনা হইতেছে যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবের শেষ দিনে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের মন্দিরে বেদি গ্রহণ করিয়া আচার্যের কার্য করিলেন; ইতিপূর্বে সাধারণ সমাজমন্দিরে বক্তৃতা করিয়াছিলেন কিন্তু উপাসনা এই প্রথম। বিলাত যাইবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন যুবকের উৎসাহে আদি ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারে ব্রতী হন। কিন্তু দুই বৎসরের অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছিলেন যে ঐ মরণোন্মুখ সমাজকে সঞ্জীবিত করিবার সাধ্য কাহারও নাই। অপরদিকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিশীল যুব-সম্প্রদায় কবিকে তাঁহাদের মধ্যে পাইবার জন্য ব্যাকুল। ইহারই অভিঘাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে উপাসনার জন্য তাঁহার আমন্ত্রণ আসিল। কবি তাঁহার অভ্যস্ত আদিব্রাহ্মসমাজীয় পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া উপাসনা করিলেন (১৫ই মাঘ)। শুনিয়াছি সমাজ-বৃদ্ধেরা খুশি হন নাই। সাধারণ সমাজ-মন্দিরে কবি যে উপদেশ দেন তাহার নাম 'একটি মন্ত্র'।[১]

পরদিন (২৯ জানুয়ারি ১৯১৪) ১৬ই মাঘ ১৩২০ কলিকাতার গভর্মেণ্ট হাউসে কবিকে নোবেল পুরস্কারের মানপত্র ও পদকাদি দানের জন্য সভা হয়। তৎকালীন লাটসাহেব লর্ড কারমাইকেল সভায় কবিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আপনি জানেন গত ১০ই ডিসেম্বর (১৯১৩) স্টকহলম নগরীতে মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের প্রতিনিধি আপনার হইয়া সুইডেনের মহামান্য রাজা বাহাদুরের নিকট হইতে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করেন ও আপনার কথামত আপনার বিনীত নমস্কার নিবেদন করেন। সেদিন সান্ধ্যভোজে বৃটিশ প্রতিনিধির নিকট আপনি যে বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা পঠিত হইলে তাঁহারা বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।" রবীন্দ্রনাথ সুইডিশ অ্যাকাডেমির নিকট যে বাণী পাঠাইয়াছিলেন, তাহা এই—"Grateful appreciation of the breadth of understanding which has brought the distant near and made of a stranger a brother."[২]

লাটপ্রাসাদের অনুষ্ঠানের পর কয়েকদিনের মধ্যে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গেলেন, এইসব উত্তেজনা তাঁহাকে ক্লান্ত করিতেছে। এণ্ড্রুসকে তিনি লিখিতেছেন যে, তাঁহার দুঃখের দিনের এখনো অবসান হয় নাই। আসলে, তিনি এখন-পর্যন্ত আপনার কাজের মধ্যে আত্মস্থ হইতে পারেন নাই। প্রতিদিনই বাধা নূতন নূতন মূর্তিতে দেখা দিতেছে। তিনি লিখিতেছেন, "অবশেষে আমি ঠিক করিয়াছি যে, রূঢ়ভাবে সমস্ত নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিব ও পত্রের উত্তর লিখিব না।"[৩] বলা বাহুল্য এ সংকল্প কল্পনার মধ্যেই থাকিল। শান্তিনিকেতনে বেশিদিন ছিলেন না, তাহারই মধ্যে গীতিমাল্যের দুইটি গান রচনা করেন—'বসন্তে আজ ধরার চিত্ত হল উতলা' (২৮ মাঘ ১৩২০), 'কতদিন যে তুমি আমায় ডেকেছ নাম ধরে' (২৯ মাঘ)।

যাহাই হউক, চারি দিকের ও সংসারের নানা প্রকার অশান্তি হইতে খানিকটা মুক্তি পাইবার জন্যই যেন ফাল্গুনের গোড়ায় কবি শিলাইদহে আশ্রয় লইলেন, ভাবিলেন— একাকী কয়দিন বিশ্রাম পাইবেন। কিন্তু সেখানেও নিষ্কৃতি পাইলেন না। পাবনায় উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশন, নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ সভাপতি, কবিকে যাইতেই হইল। সম্মেলনে তিনি বিশিষ্ট অতিথিরূপে অভ্যর্থিত হইলেন (১২ ফাল্গুন ১৩২০)। পাবনায় ছিলেন তথাকার শীতলাইয়ের জমিদার যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়ের পদ্মাতীরের বাটীতে।[৪] শিলাইদহে বাসকালে কবির সুরের ধারা আবার উছলিয়া উঠিল। ১২ই ফাল্গুন হইতে ১৫ই-এর মধ্যে গীতিমাল্যের আটটি গান

১ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৫ (১৩২০) চৈত্র, পৃ ২৫১-৫৬। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬, পৃ ৪৬৮-৪৭৭।

২ দ্র. Empire 1941, Jan 36.

৩ *Letters to a Friend*, p 39-40.

৪ শনিবারের চিঠি ১৩৪৮ আশ্বিন। নলিনীকান্ত ভট্টশালী, ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ। দ্র. প্রবাসী ১৩১০ চৈত্র, পৃ ৫৫৯। সভা হয় ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪। ১২ ফাল্গুন।

(৫৬-৬৩) রচনা করেন। এই গানের স্রোত মাঝে মাঝে থামিয়া (৩রা) আষাঢ় পর্যন্ত চলে— এগুলি গীতিমাল্যের অবশিষ্ট গান (৬৪-১১১ সংখ্যা)।

বিলাত যাইবার পূর্বে কবির সহিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে-সব তরুণ হৃদয়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা হয়, তাহারা ছিলেন সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার রায় (তোতাবাবু), শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, শ্রীঅমল হোম, ডাঃ দ্বিজেন্দ্র মৈত্র প্রভৃতি। দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র তখন মেয়ো হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক, হাসপাতালের তিনতলায় বাসা; সেই হাসপাতালগৃহের খোলা ছাত ছিল সাহিত্যিকদের জমায়েতের স্থান; কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথ থাকিলে এখানে প্রায়ই সভা জমিত। যেদিন নোবেল প্রাইজ পাইবার সংবাদ প্রচারিত হয়, সেইদিন কবি শান্তিনিকেতন হইতে ডাঃ মৈত্রকে লিখিতেছিলেন, "আপনার খোলা ছাত আছে, খোলা প্রাণ আছে, আমরাও আছি, এই তো সভার মত সভা।"

আমাদের আলোচ্যপর্বে মেয়ো হাসপাতালে সত্যজ্ঞান চট্টোপাধ্যায় নামে শান্তিনিকেতনের জনৈক শিক্ষক পীড়িত হইয়া কালাতিপাত করিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ হাসপাতালের উপরতলায় মজলিসে যাওয়া-আসা করিতেন; কিন্তু কোনো দিন সত্যজ্ঞানকে দেখিতে যান নাই বলিয়া হাসপাতালের ইংরেজ অধ্যক্ষ ডাঃ মেনডি দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে খুব ক্ষোভ ও বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ডাঃ মৈত্র এই কথাটি কবিকে জানান। কবি শিলাইদহ হইতে উত্তরে বলেন—

"আমার স্বভাবে একটা গ্রন্থি আছে- একটা কেন, অনেকগুলো, ইহাও তাহার মধ্যে একটি— আমি হাসপাতালের রোগীশালায় যাইতে অত্যন্ত কষ্টবোধ করি।······ আমি একলা রোগীর শুশ্রূষা অনেক করিয়াছি এবং মৃত্যু আমার কাছে সুপরিচিত। কিন্তু যেখানে হাসপাতালঘরে বহু রোগীকে এক ঘরে রাখিয়া দেয় সেখানে সেই দৃশ্য আমার কাছে কতই বেদনাজনক তাহা সহজে কেহ বুঝিবে না। এই কারণেই জেলখানায় আমি দর্শকরূপে যাইতে অত্যন্ত অনিচ্ছা ও ক্লেশ বোধ করি। স্কুলও আমার কাছে অনেকটা এই কারণেই কুৎসিত। মানুষের কষ্টের পশ্চাতে যেখানে আত্মীয়তার background নাই যেখানে কেবলমাত্র একটা ব্যবস্থার ঝাঁকার মধ্যে অনেকগুলো লোক একত্রে আবদ্ধ হইয়া থাকে সেখানকার অস্বাভাবিকতা আমার কাছে অত্যন্ত পীড়াকর।··· আপনাদের ওখানে যখন আমি যাই তখন আমি আপনাদের একতলার বড় ঘরটার আশেপাশে দৃষ্টিপাতমাত্র করিতে পারি না।··· এই দৃশ্যে আমার নিরতিশয় সংকোচ হয়। কারণ ইহার মধ্যে একটি দৈন্য আছে— দায়ে পড়িয়া এটি মানুষকে স্বীকার করিতে হয় কিন্তু এ আমি চোখে দেখতে পারি না। আমার এই সংকোচকে আপনারা কবিত্ব বলিতে পারেন দুর্বলতা বলিতে পারেন কিন্তু ইহা আমার আছে তাহা কবুল করিলাম।"[১]

সবুজ পত্র

১৯১৩ নভেম্বর মাসের শেষদিকে শান্তিনিকেতনে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে কবি-সম্বর্ধনায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাষণের প্রতিক্রিয়ায় যে হলাহল বাংলা সাময়িকসাহিত্যে উছলিয়া উঠে, তাহাতে কবি অন্তরে অন্তরে জর্জরিত হন; এবং স্থির করেন যে সাময়িকপত্রের জন্য কিছু লিখিবেন না। ইতিমধ্যে মণিলাল গাঙ্গুলী ও প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে একখানি নূতন ধরণের পত্রিকা প্রকাশনের আলোচনা চলিতেছিল। শুনিয়াছি কলিকাতা হইতে মণিলাল পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব লইয়া কবির নিকট শিলাইদহে উপস্থিত হন। সমস্ত কথা শুনিয়া কবি প্রমথ চৌধুরীকে

১ বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৫, পৃ ৫৭-৫৮

বলিয়া পাঠান যে প্রমথ যদি পত্রিকা বাহির করেন তবে তিনি লেখা দিবেন। তদুত্তরে প্রমথবাবু জানান রবীন্দ্রনাথ যদি লেখা দেন, তবে পত্রিকা প্রকাশের দায় তিনি গ্রহণ করিবেন।

নূতন পত্রিকা চিরদিনই কবিকে টানে; নূতনের প্রত্যাশায় মন চঞ্চল হইয়া উঠে— আর আপনাকে স্থির রাখিতে পারেন না— প্রমথবাবুকে লিখিতেছেন—"সেই কাগজটার কথা চিন্তা কোরো। যদি সেটা বের করাই স্থির হয় তা হলে শুধু চিন্তা করলে হবে না— কিছু লিখ্‌তে শুরু কোরো। কাগজটার নাম যদি 'কনিষ্ঠ' হয় তো কি রকম হয়। আকারে ছোট— বয়সেও।"[১] বোলপুর ফিরিয়া পত্রিকা সম্বন্ধে পুনরায় প্রমথবাবুকে তাগিদ দিতেছেন। পত্রিকার নাম স্থির হইল—"সবুজ পত্র"। তাই লিখিতেছেন (২১ ফাল্গুন ১৩২০), "সবুজ পত্র উদ্‌গমের সময় হয়েছে, বসন্তের হাওয়ায় সে কথা ছাপা রইল না— অতএব সংবাদটা ছাপিয়ে দিতে দোষ নেই।"[২]

শিলাইদহ হইতে কবি ১৭ই ফাল্গুন শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন সুতরাং পক্ষকালের অধিক সেখানে থাকা হয় নাই। এবার শান্তিনিকেতনে প্রায় বৈশাখের (১৩২১) শেষ পর্যন্ত কাটে, মাঝে কয়েকদিনের জন্য কলিকাতায় যান (চৈত্র ২৫ হইতে ২৯)।

এই সময়ে সবুজ পত্রের জন্য অনেক কিছুই লিখিতেছেন— প্রবন্ধ কবিতা গল্প সমালোচনা— সঙ্গে আছে গীতিমাল্যের গান। সমালোচনা দিয়া লেখনীর জড়িমা কাটিয়া গেল— কিছুকাল হইতে 'মাথাটা বেশ তাজা' ছিল না, একটু ভালো বোধ করিতেই লেখনী ধরিয়াছেন। এ যুগের প্রথম রচনা হইতেছে 'বসন্ত প্রয়াণে'র ভূমিকা। এই গদ্যকাব্যের রচয়িতা হইতেছেন সরযূবালা দাসগুপ্ত— ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কন্যা। সরযূবালার বিবাহ হয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কনিষ্ঠ বসন্তরঞ্জনের সহিত। স্বামীর অকালমৃত্যু স্মরণে 'বসন্ত-প্রয়াণ' গ্রন্থখানি লিখিত; লেখার মধ্যে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় ছিল বলিয়াই যে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন তাহা নহে, ব্রজেন্দ্রনাথের কন্যা বলিয়াও মমতাবশত এটি লেখেন বলিয়া আমাদের সন্দেহ হয় (৮ চৈত্র ১৩২০)। বলা বাহুল্য এই ধরণের ফরমাইশি রচনা প্রায়ই বন্ধুপ্রীতি-প্রণোদিত।

১৫ই বৈশাখ যাহাতে সবুজ পত্র বাহির হয়, সে বিষয়ে কবির খুব উৎসাহ; রচনায় হাত পড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে মন ছুটির জন্য ব্যাকুল হইতেছে। প্রমথ চৌধুরীকে (৯ চৈত্র) লিখিতেছেন—"গাল পাড়বার বেলায় বৈরাগ্যকে রেয়াৎ করিনে কিন্তু হাড়ে হাড়ে সে যেন বাঁশি বাজাতে থাকে... এই বৈরাগ্যের হাওয়াটা যখন হুহু করে বইতে থাকে তখন মাসিক পত্রটত্রগুলো মন থেকে কোথায় উড়ে চলে যায় তার ঠিকানা নেই, তখন দেশের হিতের দিকে খেয়ালও থাকে না।"[৩] পত্রে যাহাই লিখুন, পত্রিকার দায় গ্রহণ করিয়াছেন—সুতরাং লিখিতেই হইবে এবং লিখিবার মত অনেক কথা জমিয়াছেও। চৈত্রের মাঝামাঝি 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গল্পের জন্য তাগিদ আসে সম্পাদকের নিকট হইতে; কিন্তু 'বেশ একটু বৈঠক-জমানো রকমের অবকাশ না পেলে গল্প লেখার সুবিধা' হইতেছে না। সম্পাদকেরা নাছোড়বান্দা— সুতরাং অচিরেই গল্পে হাত দিতে হইল। যথাস্থানে সেসম্বন্ধে আলোচনা হইবে।

সবুজ পত্রের জন্য রচনা লেখা তো রবীন্দ্রজীবনের একাংশমাত্র; এ ছাড়া আছে আপনার অন্তরের সঙ্গে বুঝাপড়া— অন্তর্যামীর সহিত সংলাপ— সেটি রূপ লইতেছে গানে। শিলাইদহ হইতে (১২ ফাল্গুন) গানের ধারা প্রায় অখণ্ডভাবেই চলিতেছে— প্রতিদিনই গান লিখিতেছেন। ৭ই বৈশাখ পর্যন্ত গীতিমাল্যের ৬৪ হইতে ৩০১ সংখ্যক গান এই পর্বের রচনা। ইহারই সঙ্গে আছে শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও অধ্যাপকদের লইয়া 'অচলায়তন' নাটকের

১ চিঠিপত্র ৫, পত্র ১৮। পৃ ১৭১।

২ চিঠিপত্র ৫, পত্র ১৯। ৫ মার্চ ১৯১৪। ২১ ফাল্গুন. ১৩২০। পৃ. ১৭১।

৩ চিঠিপত্র ৫, পত্র ২১। শান্তিনিকেতন ২৩ মার্চ ১৯১৪। ৯ চৈত্র ১৩২০। পৃ ১৭৩।

রিহার্সাল—তার 'কোলাহলে উদ্‌ভ্রান্ত' মন। সমস্তকে লইয়া, সমস্তকে মিলাইয়া তাঁহার সাধনা— সুরে রূপে কর্মে।

এই চৈত্রমাসে (১৭ই) পিয়ার্সন দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আশ্রমের কাজে স্থায়ীভাবে যোগদান করিলেন। তিনি দিল্লির কাজ যখন ছাড়িয়া দেন, তখন তাঁহার মনিব সুলতান সিং বলেন 'আপনি টাকা দিয়া বোলপুরকে সাহায্য করুন।' কিন্তু পিয়ার্সন আশ্রমসেবায় জীবন দান করিবার জন্য উৎসুক। ধনের মোহ ধনীগৃহে তাঁহাকে বাঁধিতে পারিল না। তিনি দিল্লিতে চারি শত টাকা মাসিক বেতন পাইতেন— আশ্রমে আসিলেন মাত্র একশত টাকায়।

ইহার কয়েকদিন পরে এণ্ড্রুস আসিলেন বিলাত হইতে। এবার তিনি তাঁহার সম্প্রদায়ের কাছ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন; স্থির করিয়াছেন দিল্লির অধ্যাপনার কার্য তিনিও ছাড়িবেন। শান্তিনিকেতনে যোগদান করিতে তিনি আজ প্রস্তুত। এণ্ড্রুসের সম্বর্ধনার জন্য সেদিন যে সামান্য একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা পাঠ করেন (৬ বৈশাখ ১৩২১) 'প্রতীচীর তীর্থ হইতে প্রাণরসধার হে বন্ধু এনেছ তুমি, করি নমস্কার।'

এণ্ড্রুস-সম্বর্ধনার ছয় দিন পরে আশ্রমে বেড়াইতে আসেন চিত্রশিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু। নন্দলালের সহিত তখন শান্তিনিকেতনের কোনোপ্রকার সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই, এমন-কি তাঁহার কল্পনাও কোনো পক্ষ হইতে হয় নাই। সেদিন আশ্রমে একজন কবি একজন শিল্পীকে সমাদর করিলেন একটি মাত্র কবিতা উপহার দিয়া (১২ বৈশাখ ১৩২১)—

তোমার তুলিকা রঞ্জিত করে
ভারত-ভারতী চিত্ত
বঙ্গলক্ষ্মী ভাণ্ডারে সে যে
যোগায় নূতন বিত্ত।

এই শুভদিনে নন্দলাল জানিতেনও না যে এই শান্তিনিকেতন তাঁহার শিল্পিজীবনের কেন্দ্র হইবে, রবীন্দ্রনাথও জানিতেন না যে বিশ্বভারতীর প্রধান একটি অঙ্গ নন্দলাল গড়িয়া তুলিবেন।

গীতিমাল্যের গানের ধারা ৭ই বৈশাখ হইতে বন্ধ হইল। এই গানের পালা শেষ হইবার পরই বোধ হয় সবুজ পত্রের গল্প কবিতা আরম্ভ হইল; ১৫ই বৈশাখ লিখিলেন 'সবুজের অভিযান'— বলাকা-কাব্যের প্রথম কবিতা— বাংলা-ভাষায় নূতন কবিতার জন্ম হইল সেদিন।

বিদ্যালয় বন্ধ হইল ২৫শে বৈশাখের পরদিন। জন্মোৎসবের দিন সন্ধ্যায় অচলায়তনের অভিনয় হইল, কবি গুরুর ভূমিকা গ্রহণ করেন।[১] জন্মোৎসবের দুই-একদিনের মধ্যেই কবি সপরিবারে রামগড় পাহাড়ে গ্রীষ্মকাল কাটাইবার জন্য চলিলেন। সমসাময়িক আরও দুই-একটি ঘটনা বলা দরকার।

পাঠকের স্মরণ আছে, রবীন্দ্রনাথ বিলাতে থাকিবার সময় সুরুলের একটি কুঠিবাড়ি ক্রয় করেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া সেই বাড়ির সংস্কারকার্য আরম্ভ হয়। প্রায় বিশ হাজার টাকা ব্যয়ে স্থানটি বাসোপযোগী করা হইল। রথীন্দ্রনাথের জন্য ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি হইল। আমেরিকা হইতে আসিবার পর শিলাইদহে যে ল্যাবরেটরি স্থাপিত হয়, তাহা উঠাইয়া এখানে আনা হইল; বিজলি বাতির জন্য ইঞ্জিন মোটর সব আসিল। মোটকথা, গবেষণা ও অধ্যয়নাদি করিবার সকলপ্রকার সুযোগ ও স্বচ্ছন্দবাসের সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হইল। রথীন্দ্রনাথ যখন আমেরিকায় ছিলেন তখন কবি ভাবিয়াছিলেন শিলাইদহ রথীন্দ্রের কর্মকেন্দ্র হইবে, এখন ভাবিতেছেন শান্তিনিকেতনের সহিত তাঁহাকে যুক্ত করিতে হইবে— সুরুল গবেষণার কেন্দ্র হইবে। ১৩২১ সালের ১লা বৈশাখ মহাসমারোহে গৃহপ্রবেশ-

১ অচলায়তনে যাঁহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম; গুরু—রবীন্দ্রনাথ। মহাপঞ্চক—জগদানন্দ রায়। পঞ্চক—শ্রীজীবনময় রায়। সুভদ্র—সুনীল মজুমদার (ছাত্র)। আচার্য—ক্ষিতিমোহন সেন। উপাধ্যায়—সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। উপাচার্য—অজিতকুমার চক্রবর্তী। শোণপাংশু ও দর্ভক দল—নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি, মিঃ পিয়ার্সন প্রভৃতি আশ্রমবাসীরা। অভিনয় নাট্যঘরে হয়।

অনুষ্ঠানে কবি উপাসনা করিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা রথীন্দ্রনাথ গ্রামের মধ্যে থাকিয়া কাজকর্ম করেন; কিন্তু যে-সব দৈব কারণে উহা ব্যর্থ হইল যথাস্থানে তাহাদের আলোচনা হইবে। বর্তমানে সুরুলের সেই অট্টালিকা বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতন গ্রামোদ্যোগ বিভাগের কেন্দ্র— বিপুলতর ক্ষেত্রে উহা এখন অধিকতর সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

এই ২৫শে বৈশাখ (১৩২১) রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে কলিকাতায় সবুজ পত্র বাহির হইল। প্রমথ চৌধুরী সম্পাদক। প্রমথবাবু বাংলাসাহিত্যে 'বীরবল' নামে ইতিমধ্যেই খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ইনি রবীন্দ্রনাথের যৌবনের বন্ধু; 'ছবি ও গানে'র যুগ হইতে নানা সময়ে কাব্য সাহিত্য সমাজ লইয়া উভয়ের মধ্যে বহু পত্রালাপ হয়, তাহার কয়েকখানি পত্র কালের অনাদর হইতে রক্ষা পাইয়াছে। কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীর সহিত প্রমথনাথের পরিণয় হইলে, পূর্বের বন্ধুত্ব আত্মীয়তায় পরিণত হয়।

প্রমথবাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ইংরেজি সাহিত্যে। পরে বিলাত গিয়া ব্যারিস্টার হইয়া আসেন, কিন্তু প্র্যাকটিসের দিকে মন দেন নাই। সন্তানাদি না থাকায় অর্থ উপার্জনের দিকে ঝোঁক কখনো যায় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে অধ্যাপনা করিয়া যাহা পাইতেন এবং পৈতৃক সম্পত্তি হইতে যাহা-কিছু আসিত, তাহা হইতে সংসার চলিত, আর আয়ের অধিকাংশই ব্যয় হইত গ্রন্থ ক্রয়ে। তিনি ফরাসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন; তাঁহার বিরাট লাইব্রেরি তিনি শান্তিনিকেতনকে দান করিয়াছেন ও ফরাসী গ্রন্থগুলি কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়াছেন। তাঁহার লাইব্রেরি দেখিলে বুঝা যায় তাঁহার মন কত বিষয়ের মধ্যে প্রবেশাধিকার পাইয়াছিল; এই বই-কেনার বাতিক থাকে অনেক ধনিকের, পড়িবার অবকাশ মেলে খুব কমেরই। কিন্তু প্রমথবাবু বই শুধু কিনিতেন না, তিনি বই পড়িতেন ভাবিতেন ও লিখিতেন। তাঁহার লাইব্রেরির বই দেখিলেই তাহা স্পষ্ট হয়। প্রমথ চৌধুরীর রচনার বৈশিষ্ট্য আজ সর্বজনস্বীকৃত। আমাদের মনে হয় ফরাসী ভাষার তাঁহার পাণ্ডিত্য তাঁহার লেখনীকে এমন সুতীব্র সুন্দর করিয়াছিল। ফরাসীরা যাহা-কিছু বলিতে চায় তাহাকেই সাধারণের সমক্ষে সুন্দরভাবে বলে, বাল্যকাল হইতে বিদ্যালয়ে তাহারা এই শিক্ষা পায়। সেখানকার ফরাসী অ্যাকাডেমির মানসূচী বড়ই কঠোর; তাই যেমন-তেমন করিয়া কিছু লেখাকে ফরাসী দেশের কোনো শ্রেণীর লেখকই বরদাস্ত করে না। প্রমথবাবুর বাংলা রচনার বৈশিষ্ট্য আমাদের মতে ফরাসী সাহিত্য অধ্যয়নের ফল। বাংলা রচনারীতিতে বীরবল নূতন পথস্রষ্টা; কথ্য ভাষাকে সাহিত্যে প্রচলন করিয়া তিনি সর্বপ্রথম ভাষাকে সাবলীল করিয়া দেন। এ ছাড়া তিনি সাহিত্যের কোনো ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের অনুকারক ছিলেন না— অথচ রবিচক্রের বাহিরের লেখকও নহেন। প্রমথবাবুর এই ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায় নাই। বিলাত থাকিতে তিনি প্রমথবাবুর 'সনেট-পঞ্চাশৎ' পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া লেখেন, "এর কোনো লাইনটি ব্যর্থ নয়, কোথাও ফাঁকি নেই— এ যেন ইস্পাতের ছুরি, হাতির দাঁতের বাঁটগুলি জহুরির নিপুণ হাতের কাজ করা, ফলাগুলি ওস্তাদের হাতের তৈরি— তীক্ষ্ণধার হাস্যে ঝকঝক করচে, কোথাও অশ্রুর বাষ্পে ঝাপ্‌সা হয় নি— কেবল কোথাও যেন কিছু কিছু রক্তের দাগ লেগেছে। বাংলায় সরস্বতীর বীণায় এ যেন তুমি ইস্পাতের তার চড়িয়ে দিয়েছ।"[১]

দেশে ফিরিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রমথবাবুর গদ্যরচনা সম্বন্ধে এক পত্রে দীর্ঘ আলোচনা করিয়া বলেন, "তোমার কবিতার যে গুণ তোমার গদ্যেও তাই দেখি— কোথাও ফাঁক নেই এবং শৈথিল্য নেই, একেবারে ঠাসবুনানি— এ গুণটি প্রাচ্য নয়।…গদ্যলেখাও যে একটা রচনা সেটা আমরা এখনো স্বীকার করতে শিখি নি।…আমাদের গদ্যলেখা নিতান্তই খবরের কাগজি ছাঁদে হয়েছে।" তাই লিখিতেছেন, "এইবার সাহিত্য-সিংহাসনে তুমি রাজদণ্ড গ্রহণ করে শাসনভার নেবে এ আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি।"[২] প্রমথবাবুর রচনা পড়িয়া কবির মনে হইয়াছিল যে বাংলাসাহিত্যে একদিন

১ চিঠিপত্র ৫। পত্র ১৫। ২২ এপ্রেল ১৯১৩। দ্র. 'সনেট-পঞ্চাশৎ' ও 'পদচারণ'। দেশ সাহিত্য-সংখ্যা ১৩৬৩, পৃ. ২০-২৪।
২ চিঠিপত্র ৫। পত্র ১৭। ২৬ অক্টোবর ১৯১৩।

তিনি বিশেষ স্থান গ্রহণ করিবেন। এ মন্তব্য করেন সবুজ পত্র প্রকাশ পরিকল্পনার বহু পূর্বে। রবীন্দ্রনাথের এই আশা সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছিল।

সবুজ পত্র প্রকাশিত হইল সম্পূর্ণ নিরাভরণ— চিত্র বিজ্ঞাপন পাঁচমেশালী সংবাদ আলোচনা বিবর্জিত পত্রিকা। সুতরাং ব্যবসায়ী কাগজের সহিত প্রতিযোগিতার কোনো কথাই উঠিত না— লেখকদের পয়সা দেওয়া সম্ভব ছিল না। মুখবন্ধে সম্পাদক হিসাবে প্রমথবাবু যাহা লিখিলেন, তাহা পাঠ করিলে এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য —যদি কোনো উদ্দেশ্য থাকিয়া থাকে— প্রকট হইবে। তিনি লিখিয়াছিলেন, "স্বদেশের কিম্বা স্বজাতির কোনও একটি অভাব পূরণ করা, কোনও একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করা সাহিত্যের কর্মও নয়, ধর্মও নয়; সে হচ্ছে কার্যক্ষেত্রের কথা।··· দলবদ্ধ হয়ে আমরা সাহিত্য গড়তে পারিনে, গড়তে পারি শুধু সাহিত্য-সম্মিলন। ···সাহিত্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ।···

"···আমাদের বাঙলা সাহিত্যের ভোরের পাখীরা যদি আমাদের প্রতিষ্ঠিত সবুজপত্রমণ্ডিত নবশাখার উপর এসে অবতীর্ণ হন, তা হলে আমরা বাঙালীজাতির সবচেয়ে যা বড় অভাব তা কতকটা দূর করতে পারব। আমরা যে আমাদের সে অভাব সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি নি তার প্রমাণ এই যে, আমরা নিত্য লেখায় ও বক্তৃতায় দৈন্যকে ঐশ্বর্য ব'লে, জড়তাকে সাত্ত্বিকতা ব'লে, অলসকে ঔদাস্য ব'লে··· উপবাসকে উৎসব ব'লে, নিষ্কর্মাকে নিষ্ক্রিয় ব'লে, প্রমাণ করতে চাই। এর কারণও স্পষ্ট। ছল দুর্বলের বল। যে দুর্বল সে অপরকে প্রতারিত করে আত্মপ্রসাদের জন্য। আত্মপ্রবঞ্চনার মত আত্মঘাতী জিনিস আর নেই। সাহিত্য জাতির খোরপোষের ব্যবস্থা করে দিতে পারে না— কিন্তু আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করতে পারে।

"···বাঙলার মন যাতে আর বেশি ঘুমিয়ে না পড়ে, তার চেষ্টা আমাদের আয়ত্তাধীন। মানুষকে ঝাঁকিয়ে দেবার ক্ষমতা অল্পবিস্তর সকলের হাতেই আছে।"[১]

উপরি উদ্ধৃত অংশের ভাষা প্রমথবাবুর হইলেও ভাব-যে রবীন্দ্রনাথের সে-কথা রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই বুঝিবেন। রবীন্দ্রনাথ চিরনবীন, তাঁহার মনের যৌবন বার্ধক্যেও অটুট; তিনি হইলেন এই সবুজ-সংসদের গুরু। তাই তিনি লিখিলেন 'সবুজের অভিযান'—

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা!
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা!

নূতন পত্রিকার আহ্বানে রবীন্দ্রনাথের লেখনীতেও নূতন সুর ধ্বনিয়া উঠিল গদ্যে পদ্যে গল্পে। চৈত্রমাসের মধ্যে একটি প্রবন্ধ তৈয়ারি হইয়া যায়।[২] রচনাটির নামের মধ্যে নূতনের সুর— 'বিবেচনা ও অবিবেচনা'— অতিবৈষয়িক বিবেচনাশীলতার তীব্র বিশ্লেষণ। কবি লিখিয়াছেন যে কিছুকাল পূর্বে স্বদেশীযুগে বাংলাদেশের মধ্যে যে একটা প্রাণের সাড়া পড়িয়াছিল, তাহা বুদ্ধিবিবেচনার সুসংগত পথ বাহিয়া চলে নাই, প্রাণ জাগিয়াছিল বলিয়া তাহার পরামর্শ না লইয়া সে আপনি চলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সমাজের মধ্যে যে চলার ঝোঁক আসিয়াছিল সেটা কাটিয়া গিয়া আজ বাঁধি বোলের বেড়া বাঁধিবার দিন আসিয়াছে।" রবীন্দ্রনাথ আজ জীবন-পথের পথিক, তাই তিনি লিখিলেন, "চলিতে গেলেই দেখি সকল বিষয়েই পদে পদে কেবলি বাধে। এমন স্থলে হয় বলিতে হয়, খাঁচাটাকে ভাঙো, কারণ ওটা আমাদের ঈশ্বরদত্ত পাখাদুটাকে অসাড় করিয়া দিল; নয় বলিতে হয়, ঈশ্বরদত্ত পাখার চেয়ে খাঁচার লোহার শলাগুলো পবিত্র, কারণ পাখা তো আজ উঠিতেছে আবার কাল পড়িতেছে কিন্তু লোহার

১ সবুজ পত্র ১৩২১ বৈশাখ ২-৫।

২ চিঠিপত্র ৫। পত্র ২২। ৪ এপ্রিল ১৯১৪ [২১ চৈত্র ১৩২০]।

শলাগুলো চিরকাল স্থির আছে। বিধাতার সৃষ্টি পাখী নূতন, আর কামারের সৃষ্টি খাঁচা সনাতন ; অতএব ঐ খাঁচার সীমাটুকুর মধ্যে যতটুকু পাখাঝাপট সম্ভব সেইটুকুই বিধি, তাহাই ধর্ম, আর তার বাহিরে অনন্ত আকাশ-ভরা নিষেধ। খাঁচার মধ্যে যদি নিতান্তই থাকিতে হয় তবে খাঁচার স্তব করিলে নিশ্চয়ই মন ঠাণ্ডা থাকে।[১]

আমাদের সমাজ প্রাণবহুল দুরন্ত ছেলেকে শিশুকাল হইতে নানাপ্রকার শাসনে ঠাণ্ডা করিয়া রাখিয়াছে। সমাজ মানুষগুলোকে লইয়া একান্ত পুতুলবাজির কারখানা খুলিয়াছে। যাঁহারা দেশকে ঠাণ্ডা করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা অনেকদিন আধিপত্য করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিপ্লবী মন বলিতেছে যে, "দেশের নবযৌবনকে তাঁহারা আর নির্বাসিত করিয়া রাখিতে পারিবেন না... তারুণ্যের জয় হউক। তাহার পায়ের তলায় জঙ্গল মরিয়া যাক, জঞ্জাল সরিয়া যাক, কাঁটা দলিয়া যাক, পথ খোলসা হোক, তাহার অবিবেচনার উদ্ধত বেগে অসাধ্যসাধন হইতে থাক্। মনের মধ্যে বিবেচনা অবিবেচনা লইয়া প্রশ্ন যখন আলোড়িত হইতেছে, সেই সময়ে লিখিলেন 'হালদার গোষ্ঠী' গল্প। মাসিকপত্র যখন বাহির হইতেছে তখন তাহার জন্য ছোটগল্প চাই। সম্পাদকের তাগিদের উত্তরে শান্তিনিকেতন হইতে লিখিলেন, (২১ চৈত্র) "গল্পলেখার আয়োজন অনেকদিন ত মনের মধ্যে নেই।" শেষ গল্প 'রাসমণির ছেলে' প্রকাশিত হয় ভারতীতে ১৩১৮ সালের পৌষ মাসে ; দুই বৎসরের মধ্যে ছোটগল্প একটিও লেখেন নাই। তবুও কয়েকদিন পরে প্রমথ বাবুকে ভরসা দিয়া লিখিতেছেন, "আর দুই একদিন পরেই গল্পটাতে হাত দেব —দেরি হবে না।"[২] অতঃপর বারোমাসে বারোটি লিখিয়া গেলেন এবং ইহার পরেও দীর্ঘকাল চলে উপন্যাসের ধারা। 'হালদার গোষ্ঠী' গল্প লেখা হয় 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধ ও 'সবুজের অভিযান' (১৫ই বৈশাখ) কবিতার মধ্যে। তাই অবিবেচনার মূর্তি বনোয়ারিলাল কিছুতেই অতি-বিবেচনাশীল নীলকণ্ঠ ও বুদ্ধিমতী কিরণলেখার শাসনে ও সুব্যবস্থায় গৃহের মধ্যে টিকিতে পারিল না ; পিতার শ্রাদ্ধের পূর্বেই সে চাকুরীর সন্ধানে গৃহত্যাগী হইল— চারি দিকে ধিক্‌ধিক পড়িল। "চলার পদ্ধতির মধ্যে অবিবেচনার বেগও দরকার, বিবেচনার সংযমও আবশ্যক ; কিন্তু, অবিবেচনার বেগও বন্ধ করিব আবার বিবেচনা করিতেও অধিকার দিব না,— মানুষকে বলিব, তুমি শক্তিও চালাইয়ো না, বুদ্ধিও চালাইয়ো না, তুমি কেবলমাত্র ঘানি চালাও, এ বিধান কখনোই চিরদিন চলিবে না।" (বিবেচনা ও অবিবেচনা)। এইটিই হইয়াছিল বনোয়ারিলালের জীবনে।

বনোয়ারিলালের মধ্যে অবিবেচনার সকল দোষই ছিল— সে দুরন্ত জীবন্ত অশান্ত প্রচণ্ড প্রমত্ত ; প্রাচীন আবেষ্টনী হইতে সে প্রমুক্ত হইয়া বাহির হইয়া পড়িল— 'চিরযুবা তুই যে চিরজীবী' এই কথাই সে প্রমাণ করিয়া অতিনিশ্চিত জীবনধারা ত্যাগ করিয়া বিরামহীন অজানিতের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল— পূর্বাপর 'বিবেচনা' করিল না।

এই বিপ্লবী মনোভাব হইতেই লিখিত 'সবুজের অভিযান' (১৫ বৈশাখ ১৩২১)। চিরনবীন কবি সবুজসংসদের গুরু, তাঁহার মনের যৌবন তিপ্পান্ন বৎসর বয়সেও অটুট। তাই তিনি লিখিলেন—

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা!
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা!

এই নবীন প্রাণ নানাভাবে, নানা নামে আহুত হইল— 'আয় দুরন্ত, আয়রে আমার কাঁচা', 'আয় জীবন্ত...', 'আয় অশান্ত...,' 'আয় প্রচণ্ড...,' 'আয় প্রমত্ত...,' 'আয় প্রমুক্ত...,' 'আয় রে অমর, আয় রে আমার কাঁচা!' কবি অবিবেচনার জয়গান করিয়া বলিলেন—

১ বিবেচনা ও অবিবেচনা, সবুজ পত্র ১৩২১ বৈশাখ। কালান্তর ২য় সংস্করণ ১৩৫৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ. ২৫২-৬০।
২ চিঠিপত্র ৫। পত্র ২২-২৩।

আন্‌রে টেনে বাঁধা-পথের শেষে!
বিবাগী কর্ অবাধ-পানে,
পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে।
আপদ আছে, জানি আঘাত আছে,
তাই জেনে ত বক্ষে পরাণ নাচে,
ঘুচিয়ে দে ভাই পুঁথি-পোড়োর কাছে
পথে চলার বিধি-বিধান যাচা',
আয় প্রমুক্ত, আয় রে আমার কাঁচা!

'সবুজের অভিযান' হইতে রবীন্দ্র-কাব্যসাহিত্যে একটি নূতন সুরের পালা শুরু হইল; কবিতার ছন্দ রীতি নীতি নূতন রূপ লইল। মনের এই প্রমুক্ত অবস্থায় তিনি এণ্ড্রুসকে লিখিলেন যে কিছুতেই তাঁহাকে অবকাশের সময়ে কাজ করিতে দিবেন না। ছুটির দিনের জন্য কোনো কিছুই পূর্ব থেকে মতলব আঁটা হইবে না। ছুটিটাকে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করিবার জন্য মনস্থির করা যাক্— যে পর্যন্ত না আলস্য আমাদের কাছে ভারস্বরূপ হইয়া উঠে।[১] অতিরিক্ত প্রয়োজন সাধনের চর্চায় অকৃতার্থতা উৎপন্ন হয়, কারণ আমরা লোভে পড়িয়া বীজ অত্যন্ত ঘন করিয়া রোপণ করি। 'অর্থাৎ কাজের মধ্যে ছেদ না থাকিলে, অবকাশ ও বিরাম না পাইলে অন্তরাত্মা ক্লিষ্ট হয়।'

কবি যৌবনে 'ক্ষণিকা'য় লিখিয়াছিলেন,

'ক্ষণিকের গান গা রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে!'

আজ বার্ধক্যের মুখে আসিয়াও কবি অনুভব করিতেছেন যৌবনের সেই উচ্ছলফেনিল চঞ্চলতা— সেই আবেগমুখর গতিবেগ। তবে বলাকার কবিতায় ক্ষণিকার চঞ্চলতা আছে, আপাত-লঘুতা নাই।

এণ্ড্রুসকে যখন পত্রে লিখিয়াছিলেন যে তিনি প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে কাজ করিবেন না— তখনই দেখি তিনি বিচিত্র কর্মের মধ্যে লিপ্ত। এবং এই কর্ম যখন জীবনে উদগ্র হইয়া উঠিবার চেষ্টা করে, তখনই অন্তর হইতে প্রার্থনা উঠে কর্ম হইতে মুক্তির জন্য— গীতিমাল্যর গানের ফল্গুধারা চলে।

কিন্তু রবীন্দ্রসত্তার সবটাই কাব্য নহে— সংসার আছে, বিষয় আছে, এবং বিষয় থাকিলেই বিষমবাদ আছে। বিলাত যাইবার পূর্বে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ির এজমালি সম্পত্তির তদারক করিতেন। সম্পত্তির মালিক ছিলেন তিনজন— দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ। অন্যেরা মাসহারা পাইতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার অংশ অপর দুইজনের নিকট ইজারা দিয়া দেন, জমিদারি দেখাশুনার দায় হইতে তিনি ও তাঁহার বংশধরগণ নিষ্কৃতি লন। রবীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ যৌথভাবে এজমালির কাজকর্ম দেখিতেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ জীবনবীমা প্রভৃতি কাজে লিপ্ত হওয়ায়, জমিদারির সমস্ত কাজকর্ম ক্রমে রবীন্দ্রনাথের উপর গিয়া বর্তায়। বিলাত যাইবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ এইসব কাজকর্ম দেখিবার জন্য প্রমথ চৌধুরীকে নিযুক্ত করিয়া যান; দেশে ফিরিয়া আসিবার পরও সেই ব্যবস্থা আরও কিছুকাল চালু থাকে।

এবার দেশে ফিরিয়া গত ফাল্গুন মাসে যখন কবি শিলাইদহে যান তখন জমিদারির উন্নতির জন্য নানা

১ I won't let you work during this vacation. We must have no particular plans for our holidays. Let us agree to waste them utterly, until laziness proves to be a burden to us··· The cultivation of usefulness produces an enormous amount of failure, simply because in our avidity we sow seeds too closely. *Letters to a Friend* p 40.

প্ল্যান করিয়া আসেন ও প্রমথবাবুকে সেইসব বিষয়ে উপদেশ দিয়া পত্র দেন। বৈষয়িক ব্যাপারের মধ্যে পতিসর কৃষি ব্যাঙ্কে নোবেল প্রাইজের টাকা রাখিবার কথা ভাবিতেছেন। নোবেল প্রাইজের এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা কবি কোনো নামকরা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত না রাখিয়া এই নগণ্য গ্রাম্য ব্যাঙ্কে রাখিলেন কেন, এ প্রশ্ন করায় তিনি উত্তরে বলেন যে গ্রামের উন্নতির জন্য চাষী কোথায় টাকা পাইবে ; তাঁহার ধনে তাঁহার পরিবারের লোকের যেমন দাবি, তাঁহার প্রজাদের দাবি তাহা হইতে কম নহে। যাহাই হউক, এই ব্যাঙ্ক চালু করিবার জন্য তিনি সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহায়তা পাইবেন আশা করেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের মন এখন জমিদারির কাজকর্ম হইতে ক্রমেই সরিয়া সরিয়া জমিজমা সংক্রান্ত ব্যবসায়ের মধ্যে চলিয়া যাইতেছিল। সেজন্য কবি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত, বহু পত্রমধ্যে তাহার আভাস পাওয়া যায়। কবি দৃষ্টিতে যেন দেখিতে পাইতেছিলেন যে জমিদারির কাজ এভাবে নিয়ন্ত্রিত হইলে সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

রামগড়ে

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিয়া নৈনিতালের নিকট রামগড় নামক স্থানে এক সাহেবের ফলের বাগান ও বাড়ি রথীন্দ্রনাথ হঠাৎ কিনিয়া বসিলেন। কাঠগোদাম হইতে ষোল মাইল উৎরাই পথ ; রথীন্দ্রনাথের ইচ্ছা গ্রীষ্মকালে পিতা মাঝে মাঝে পাহাড়ে গিয়া বাস করেন। বিলাতে বই বিক্রয় হইতে এখন প্রচুর টাকা আসিতেছে তাই ২০।২৫ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া সুরুলের কুঠি মেরামত করা এবং না দেখিয়া পাহাড়ে বাড়ি কেনা সম্ভব হইতেছে।

অচলায়তন অভিনয়ের পরদিন কবি কলিকাতায় যান এবং সেখান হইতে দুই-একদিনের মধ্যেই রামগড় যাত্রা করেন (মে ১৯১৪), সঙ্গে প্রতিমা দেবী ও মীরা দেবী। রথীন্দ্রনাথ তখন বদরিকাশ্রম হইতে ফিরিবার পথে। বিদ্যালয় বন্ধ হইবার কয়েকদিন পূর্বে রথীন্দ্রনাথ, দীনেন্দ্রনাথ, নেপালচন্দ্র রায়, শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী, নেপালীছাত্র নরভূপরাও বদরিকাশ্রম দর্শনে গিয়াছিলেন। ফিরিবার পথে ইঁহারা রামগড় হইয়া আসিলেন। কবির আহ্বানে লক্ষ্ণৌ হইতে ব্যারিস্টার কবি অতুলপ্রসাদ সেন কয়েকদিনের জন্য রামগড়ে থাকিয়া গেলেন। দিল্লি হইতে এণ্ড্রুস আসিতে পারিলেন না ; তিনি গ্রীষ্মাবকাশের পর শান্তিনিকেতনের কার্যে যোগদান করিবেন তাই বোধ হয় সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজের সহিত দীর্ঘ বন্ধনের গ্রন্থিসমূহ সম্পূর্ণরূপে মোচন করিতেছেন। কবি প্রায় প্রতিদিনই এণ্ড্রুসকে একখানি করিয়া পত্র লেখেন, মনের নানা কথা নানা চিন্তা প্রকাশ করেন— যেমন করিয়াছেন তাঁহার অন্য পত্রধারায়।

রামগড়ে পৌঁছিয়া কবির মন বেশ প্রসন্ন, পরম তৃপ্ত ; গীতিমাল্যের গীতধারা পুনরায় দেখা দিল বৈশাখের শেষ দিনে (১৩২১।১৯১৪ মে ১৪)। গান লিখিতেছেন,— এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর, হে সুন্দর (৩১শে বৈশাখ) এই তো তোমার আলোক-ধেনু (১ জ্যৈষ্ঠ), চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে (৩ জ্যৈষ্ঠ), গান গেয়ে কে জানায় আপন বেদনা (৪ জ্যৈষ্ঠ), এরে ভিখারী সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে (৫ জ্যৈষ্ঠ), সন্ধ্যা হল গো— ওমা, সন্ধ্যা হল, বুকে ধরো (৬ জ্যৈষ্ঠ)।

রামগড়ে পৌঁছিয়া এণ্ড্রুসকে (১৪মে) লিখিতেছেন যে, ঠিক যে-জায়গাটি আমার সব থেকে প্রয়োজন সেখানেই আমি আসিয়াছি। পত্রশেষে লিখিলেন, "My life is full. It is no longer broken and fragmentary." পর দিন লিখিতেছেন At last I am supremely happy এখানে আসিয়া তাঁহার মনে হইতেছে এতদিন তিনি যেন অর্ধাশনে ছিলেন (I had been living before on half-rations) ; এখানে আসিয়া মন পরম তৃপ্ত।

৩রা জ্যৈষ্ঠ (১৭মে) মহর্ষির জন্মদিন উপলক্ষে পারিবারিক উপাসনা হইল। কবির মন তখনো বেশ প্রসন্ন ; কিন্তু পত্রে লিখিতেছেন,"I have been experiencing the feeling of a great expectation, although it has

also its elements of very great suffering. To be born naked in the heart of the eternal Truth; to be able to feel with my entire being the life-throb of the universal heart— that is the cry of my soul. "I tell you all this, so that you understand what I am passing through ..." (*Letters to a friend*, 17 May 1914)

মনের মধ্যে কিসের যেন উৎকণ্ঠা, কী যেন অমঙ্গল ঘটিবে বলিয়া আশঙ্কা। সেই মনোভাব হইতে লিখিলেন বলাকার কবিতা 'সর্বনেশে', 'আহ্বান' ও 'শঙ্খ' (৫,৬,১২ জ্যৈষ্ঠ); এণ্ড্রুসকে লিখিতেছেন, "I am struggling on my way through wilderness. My feet is bleeding and I am toiling with panting breath. Wearied I lie down upon the dust and cry and call upon His name. I know that I must pass through death. God knows it is the death pang that is tearing open my heart... The toll of suffering has to be paid in full" (ibid 21 May)। যাহাই হউক, এই মনোভাব অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই; দুইদিন পরে (২৩মে ১৯১৪) এণ্ড্রুসকে লিখিতেছেন, "Now I feel that I am emerging once again into the air and light and am breathing fully...I had been struggling during these last few days, in a world where shadows held sway and right proportions were lost...But this experience of the dark has had a great lesson for me." (ibid, p. 43-44). আরও দুইদিন পরে লিখিলেন, "My wrestlings with the shadows are over." (p. 45)

'সর্বনেশে' (৫ জ্যৈষ্ঠ) কবিতার মধ্যে যে আকুলিত বেদনা, যে ত্যাগের কামনা ছন্দে রূপ লইয়াছে, তাহা সামসাময়িক পত্রধারায় সমর্থিত হইতেছে— বিশেষভাবে রথীন্দ্রনাথকে লিখিত একখানি পত্রের মধ্যে সেই ভাবটি খুবই স্পষ্ট। লিখিয়াছিলেন, "রামগড়ে যখন ছিলুম তখন থেকে আমার Conscience-এ কেবলি ভয়ঙ্কর আঘাত করচে যে বিদ্যালয় জমিদারী সংসার দেশ প্রভৃতি সম্বন্ধে আমার যা কর্ত্তব্য আমি কিছুই করি নি···"(চিঠিপত্র ২, পৃ ২৮)। 'আহ্বান' (৬ জ্যৈষ্ঠ) কবিতায় এই বন্ধন-ছিন্নেরই বাণী, 'শঙ্খে' (১২ জ্যৈষ্ঠ) তাহারই দৃপ্ত উচ্ছ্বাস; ইহাদেরই শমিত রূপ সমকালীন সংগীতে মুখর। মনের ঘোর কাটিয়া যাইবার পর লিখিলেন 'আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে' (৭ই জ্যৈষ্ঠ), 'আজ ফুল ফুটেছে মোর আসনের ডাইনে বাঁয়ে' (১৮ জ্যৈষ্ঠ), 'আমার প্রাণের মাঝে যেমন করে নাচে তোমার প্রাণ' (২৫ জ্যৈষ্ঠ)।[১]

সর্বনেশে, আহ্বান ও শঙ্খ— এই তিনটি কবিতা একটি আকস্মিক গুচ্ছ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহা নহে। কবি বলিয়াছেন যে, তখন তাঁহার প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথা চলিতেছিল এবং পৃথিবীময় একটা ভাঙাচোরার আয়োজন হইতেছিল। গত মহাযুদ্ধের কল্পনাও তখন কেহ করে নাই; কারণ সেবারকার যুদ্ধ বাধে অকস্মাৎ,— সামান্য একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া। 'সর্বনেশে' কবিতা লিখিবার অনেক পরে মহাযুদ্ধের তড়িৎবার্তা আসে। কবি বলেন, "আমার এই অনুভূতি ঠিক যুদ্ধের অনুভূতি নয়। আমার মনে হয়েছিল যে, আমরা মানবের এক বৃহৎ যুগসন্ধিতে এসেছি, এক অতীত রাত্রি অবসান প্রায়। মৃত্যু-দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নব যুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন। সেজন্য মনের মধ্যে অকারণ উদ্বেগ ছিল।"[২]

ক্ষণিকের অবসাদ ও উচ্ছ্বাস চলিয়া গিয়াছে। কবি সবুজ পত্রের জন্য গল্প লিখিলেন হৈমন্তী[৩] (১৩২১ জ্যৈষ্ঠ)।

১ গীতিমাল্য ১০২—১১০ সংখ্যা গান রামগড়ে ৩১ বৈশাখ হইতে ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ মধ্যে রচিত।

২ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২। বলাকা-গ্রন্থপরিচয় পৃ. ৫৯৭।

৩ রামগড়ের বাড়ির নাম দেন 'হৈমন্তী।'

হৈমন্তীর পিতা লেখকের একটি অপরূপ সৃষ্টি ; তিনি সেই সদানন্দ সর্বসহা 'গোরা'র পরেশবাবু, আবার 'জ্যেঠামশায়ে'র অগ্রদূত। "বস্তুত আমার শ্বশুর ব্রাহ্মও নন, খৃস্টানও নন, হয়ত বা নাস্তিকও না হইবেন। দেবার্চনার কথা কোনোদিন তিনি চিন্তাও করেন নাই।···মেয়েকে দেবতা সম্বন্ধে কোনো উপদেশ দেন নাই।" সুতরাং গোঁড়া হিন্দুও যে নন তা আমরা ধরিয়া লইতে পারি। ধর্মকে রবীন্দ্রনাথ কী চক্ষে দেখিতেছেন, তাহারই চিত্র রেখাঙ্কনে ফুটিয়াছে হৈমন্তীর পিতার চরিত্রে। আর শিক্ষিত বাঙালির ধর্মবোধ কিরূপ তাহার কথাও প্রকাশ পাইয়াছে নায়কের আত্মকথাতে। "শিশির আমার চেয়ে কেবল দুই বছরের ছোটো ছিল। অথচ আমার পিতা যে গৌরীদানের পক্ষপাতী ছিলেন না তাহা নহে। তাঁহার পিতা ছিলেন উগ্রভাবে সমাজবিদ্রোহী···। আমার পিতা উগ্রভাবে সমাজের অনুগামী ; মানিতে তাঁহার বাধে এমন জিনিস আমাদের সমাজে সদরে বা অন্দরে দেওড়ি বা খিড়কির পথে খুঁজিয়া পাওয়া দায়, কারণ ইনিও কষিয়া ইংরাজি পড়িয়াছিলেন। পিতামহ এবং পিতা উভয়েরই মতামত বিদ্রোহের দুই বিভিন্ন মূর্তি। কোনোটিই সরল স্বাভাবিক নহে।" (গল্পগুচ্ছ ৩য় পৃ ৯৪৮)। 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার রেশ লেখকের ভিতরে আছে। তাই অত্যন্ত তিক্তভাবে নায়ক বলিতেছে, "স্ত্রীকে লইয়া জোর করিয়া বাহির হইয়া··· গেলাম না কেন ? কেন ! যদি লোকধর্মের কাছে সত্যধর্মকে না ঠেলিব, যদি ঘরের কাছে ঘরের মানুষকে বলি দিতে না পারিব তবে আমার রক্তের মধ্যে বহুযুগের যে শিক্ষা তাহা কী করিতে আছে ?" (পৃ ৯৬১) ইহা বিবেচকের বুদ্ধি !

বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ হইতে এই শ্রেণীর গল্প হিন্দুসমাজের রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াপন্থী তথাকথিত শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্যে অচিরেই তীব্র প্রতিরোধ আহ্বান করিয়া আনিল। রবীন্দ্রনাথও হিন্দুসমাজ হইতে প্রতিরোধ আশঙ্কা করিতেছিলেন। রামগড়ে যাইয়া জ্যৈষ্ঠমাসের 'সবুজপত্র' পাইয়া তিনি খুব খুশি, প্রমথ চৌধুরীর 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধটি পড়িয়া মন বেশ প্রসন্ন। বাক্যটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর বৈশাখ মাসের সবুজপত্রে প্রকাশিত একটি কবিতার চরণাংশ। কবি ২২শে জ্যৈষ্ঠ প্রমথবাবুকে লিখিলেন, "সবুজপত্রের উচিত হবে খুব একচোট গাল খাওয়া। সেইটেই একটা লক্ষণ যে ওর কথাগুলো মর্ম্মস্থানে গিয়ে লাগচে। মিথ্যার গায়ে হাত বুলিয়ে তাকে বাপুবাছা সম্বোধন করে আর চল্‌বে না। আমাদের বর্তমান সাহিত্য মানুষকে গাল দেয় কারণ তাতে পৌরুষ নেই— বরঞ্চ সেটা কাপুরুষেরই কাজ— কিন্তু যেখানে যথার্থ বীর্যের দরকার···সেখানে দেখতে পাই বড় বড় সব সাহিত্যিক পাণ্ডারা কেবল পোষা কুকুরের মত ল্যাজ নাড়ছে আর সেই বৃদ্ধ পাপের পঙ্কিল পা আদর করে চেটে দিচ্ছে।"[১] রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণ যে কত সত্য তাহা অচিরেই দেখা গেল ; 'সবুজ পত্র' ও বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজা রামমোহন রায় ও ব্রাহ্মসমাজের সকলপ্রকার কর্মকে নিন্দিত করিবার জন্য চিত্তরঞ্জন দাশের পৃষ্ঠপোষকতায় ও বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ সাহিত্যিকদের অনুকূলতায় 'নারায়ণ' নামে মাসিক পত্রের (১৩২১ অগ্রহায়ণ মাস হইতে) আবির্ভাব হইল। যথাস্থানে ইহার পুনরালোচনা হইবে।

প্রথম মহাযুদ্ধ

জ্যৈষ্ঠ (১৩২১) মাসের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথ সপরিজন রামগড় পাহাড় ত্যাগ করিলেন। তখনও কবির শরীর শক্ত— কাঠগোদামের ষোলো মাইল পথের অনেকটা হাঁটিয়া নামিলেন। রামগড়ে আসার পর কবির 'ডাক্তার' বলিয়া খ্যাতি পাহাড়ীদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। কবির নামের পূর্বে ডক্টর থাকায় স্থানীয় পোস্ট-মাস্টার সকলকে বলিতে থাকেন বাংলাদেশ থেকে ডাক্তার এসেছেন। বাড়িতে এক পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী প্রায় আসে

১ চিঠিপত্র ৫, পত্র ২৫, রামগড়. ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ (১৯১৪ জুন ৫)।

কবি তাহাকে ঔষধ দিয়া সুস্থ করেন ; ইহার পর কবিখ্যাতি প্রসারিত না হইয়া তাঁহার কবিরাজী খ্যাতি ব্যাপ্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ যে একজন খুব ভালো হোমিওপ্যাথ ছিলেন এ সাক্ষ্য দিবার মত লোক এখনো আছে।

ফিরিবার পথে লখ্‌নৌতে কবি অতুলপ্রসাদ সেনের বাটিতে একদিন কাটাইয়া গেলেন। অতুলপ্রসাদের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ বহু বৎসরের ; কবির পরম গুণগ্রাহী হইয়াও নিজের ব্যক্তিত্বকে অতুলপ্রসাদ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখিয়াছিলেন। কবি এই সংগীতপাগল সাহিত্যসেবীকে কতখানি শ্রদ্ধা করিতেন তাহা 'পরিশেষে'র আশীর্বাদী উৎসর্গপত্রে প্রকাশ পাইয়াছে।

এ দিকে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় খুলিয়াছে ২রা আষাঢ় (১৬ জুন ১৯১৪)। কবির পক্ষে কলিকাতায় আর থাকা সম্ভব নহে ; সেখানে থাকিতে থাকিতে গীতিমাল্যের শেষ গান লিখিলেন · "মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দরবেশে এসেছ" (৩ আষাঢ়)। রামগড়ের গানের রেশ এইখানেই শেষ— একমাস পরে গীতালির গানের ধারা উচ্ছল হইয়া উঠিল। শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া যথারীতি পূর্বের ন্যায় বিচিত্র কর্ম ও সাহিত্যসৃষ্টিতে কবি নিবিষ্টচিত্ত হইলেন। বিদ্যালয়ের মধ্যে নানা পরিবর্তন চলিতেছে ; এবার গ্রীষ্মবকাশের পর আশ্রমের কাজে এণ্ড্রুস সাহেব আসিয়া যোগ দিলেন ; ইতিপূর্বে পিয়ার্সন (১৭ চৈত্র ১৩২০) আসিয়াছেন।

সবুজ পত্রের মাসিক চাহিদা মিটাইবার জন্য অচিরেই কবিকে গল্প রচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। এই সময় হইতে তাঁহার গল্পরীতি নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। একখানি পত্রে প্রমথ চৌধুরীকে লিখিতেছেন, 'কিন্তু লেখার এত ব্যাঘাত যে কি লিখেছি ও কি লিখ্‌তে হবে সেটা বারবার করে ভোলবার জো হয়েছে।' যাই হোক আমার এই লেখাগুলি গল্পপিপাসু পাঠকদের বেশ ঢক্‌ ঢক্‌ করে খাবার মত হচ্চে না— এগুলো গল্প না বল্লেই হয়।[১] এই শ্রেণীর গল্প 'বোষ্টমী' (আষাঢ়) ও 'স্ত্রীর পত্র' (শ্রাবণ)। দেহের কোথায় একটু পঙ্কতিলক লাগিয়া আছে, অন্তরের মধ্যে কোথায় একটু কলুষকণা সুপ্ত আছে, মানুষ তাহা জানে না ; মুহূর্তের অনবধানতায় সুপ্ত পশু সজাগ হয়, সমস্ত শুচিতা সংস্কার চকিতে লুপ্ত করিয়া দেয়, জগতের অনন্ত সৌন্দর্য নিমিষে মলিন হয়। ধর্মের আভরণ, ধর্মের আচরণ মানুষকে ধর্মাত্মা করিতে পারে নাই। 'বোষ্টমী' গল্পে সেই নিদারুণ ট্রাজেডির আভাসমাত্র দিয়া কবি নীরব হইয়াছেন।

বোষ্টমী গল্পটি সত্যঘটনামূলক বলিলে ভুল হইবে— তবে সর্বক্ষেপি[২] নামে এক বৈষ্ণবী, কবি শিলাইদহে আসিলে তাঁহার সহিত মাঝে মাঝে দেখা করিতে আসিত ; তাহার দেশ কোথায় কী তাহার পুরাতন কথা, গ্রামের কেহই তাহা জানিত না ; বোষ্টমী গল্পে কবি যাহা বিবৃত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে সর্বক্ষেপির জীবনেতিহাস লুক্কায়িত আছে কি না, জানি না। এই বোষ্টমীর আধ্যাত্মিক জীবনের কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কয়েকটি রচনা[৩] ও পত্রের মধ্যে বলিয়াছেন।[৪] কবিকে সে 'গৌর' বলিত ও ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা শুনাইত। এইসব সাধারণ মানুষের সামান্য ঘটনাগুলি কবির লেখনীযোগে অসামান্যতা লাভ করিয়া অপরূপ সাহিত্য হইয়াছে।

কিন্তু অনতিকালের মধ্যে সমসাময়িক সাহিত্যে যে-গল্প লইয়া বিশেষ সোরগোল সৃষ্ট হয়, সেটি হইতেছে 'স্ত্রীর পত্র' (সবুজ পত্র ১৩২১ শ্রাবণ) চলিতভাষায় রবীন্দ্রনাথ এই সর্বপ্রথম লিখিলেন, হয়তো পত্র বলিয়া।[৫] পুরাতন জীর্ণ সংস্কার ভাঙিবার যে-সুর 'বলাকা'র প্রথম তিনটি কবিতার মধ্যে ধ্বনিয়াছিল, তাহাই যেন রূপ পাইয়াছে সবুজ পত্রের গল্পধারায়। নারীর যে একটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আছে সে কথা এ দেশে কেহ স্বীকার করিতে চাহে না। সংসারের মান

১ চিঠিপত্র ৫ (২৬ নং) ৮ জুলাই ১৯১৪ (২৪ আষাঢ় ১৩২১) পৃ, ১৭৮-১৭৯।
২ শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ।
৩ যাত্রী, ক্রাকোভিয়া জাহাজ, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫।
৪ চলিত ভাষায় প্রথম গল্পের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শ্রীসুধীর রায় চৌধুরী, হাওড়া।
৫ *Creative Unity* p 79

রক্ষার জন্য, সমাজের নাম রক্ষার জন্য, সকলপ্রকার অসত্যের সহিত আপস-রফা করিয়া থাকাই যে নারীধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, ইহাই প্রথম নির্বাক প্রতিবাদ হইয়াছে হৈমন্তীর জীবনে। বোষ্টমীও সেই প্রতিবাদেরই মূর্তি। কিন্তু 'স্ত্রীর পত্রে' মৃণাল স্পষ্ট করিয়া জানাইয়াছিল "আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে…এ তোমাদের মেজোবউয়ের চিঠি নয়।" তাই সে বলিল "আমার মধ্যে যা কিছু মেজোবউকে ছাড়িয়ে রয়েছে সে তোমরা পছন্দ করনি, চিনতেও পারনি।…তোমরাই যে আপন ইচ্ছামত আপন দস্তুর দিয়ে ওর [বিন্দু] জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে তোমাদের পা এত বড় লম্বা নয়! মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়ো। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান — সেখানে বিন্দু কেবল বাঙালি ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খুড়তুত ভাইয়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়। সেখানে সে অনন্ত।" নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের বিদ্রোহ-ধ্বজা উড়িল সবুজ পত্রের মধ্যে। এই তিনটি গল্পের তিনটি নারীচরিত্রের মধ্যে বেশ একটি মিল পাওয়া যায়। নারীর শুভ্র শঙ্খ দেবতার বাণী ঘোষণার জন্য, ধূলায় পড়িয়া থাকিবার জন্য নহে।

এই পর্ব হইতে রবীন্দ্রনাথের নানা নাট্য, উপন্যাসে বিদ্রোহী নারীর বিচিত্র অনুভূতি ধীরে ধীরে মূর্তি লইয়া উঠিয়াছে; বাংলার নারী-আন্দোলনের ইতিহাস যাঁহারা লিখিবেন, তাঁহারা সাহিত্যের অপরূপ সৃষ্টি 'মৃণাল'কে অবাস্তব বলিয়া অবহেলা করিতে পারিবেন না। আধুনিক সমাজে উদ্ধত কাপুরুষতার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ নারীত্বের প্রতিবাদের দৃষ্টান্ত নিতান্ত কম নহে।[১]

এদিকে 'বলাকা' কাব্যের বিচিত্র উপাদান অন্তরে নানাভাবে সঞ্চিত হইতেছে; শুধু ভাবের উপকরণ নহে,—রূপের ও ছন্দের উপকরণও জমিতেছে। 'আষাঢ়' প্রবন্ধে[২] (সবুজ পত্র, আষাঢ় ১৩২১) কবি বস্তু ও অবস্তু লইয়া আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, বস্তুপিণ্ডকে ঘেরিয়া আছে তথাকথিত অবস্তু বা বায়ুমণ্ডল; "পৃথিবীর সমস্ত সংগীত ঐ শূন্যে,—যেখানে তাহার অপরিচ্ছিন্ন অবকাশ।" তেমনি মানুষের চিত্তের চারি দিকে "তাহার নানারঙের খেয়াল[৩] ভাসিতেছে… সেখানকার ভাষাই সংগীত।" এই প্রবন্ধে কবি ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলেন, "ছন্দের যে অংশটাকে যতি বলে অর্থাৎ যেটা ফাঁকা, অর্থাৎ ছন্দের বস্তুঅংশ যেখানে নাই সেইখানেই ছন্দের প্রাণ।" এই প্রবন্ধের মধ্যে ছন্দ সম্বন্ধে দুই-চারটি কথা বলিলেন, কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা করিলেন আনডারসনকে লিখিত পত্রে (১৮ আষাঢ় ১৩২১)। রামগড় যাইবার পূর্বেও কবি আনডারসনকে ছন্দ সম্বন্ধে একখানি পত্র দেন। মোট কথা কিছুকাল হইতে নানা কারণে কবিকে ছন্দ লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। এইসব আলোড়নের মধ্যে 'বলাকা' কাব্যগুচ্ছের প্রথম স্তবক নূতন ছন্দে মথিত হইয়া উঠিল; 'মানসী'কাব্য যেমন একযুগের ছন্দ-পরীক্ষার দৃষ্টান্তস্থল, আমাদের মনে হয় 'বলাকা'র কাব্যসৃষ্টিতে ছন্দ-পরীক্ষার আর-একটি পালার সূচনা হইয়াছে। ছন্দের সহিত ভাবের ও ভাষার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য; কিন্তু তাই বলিয়া ছন্দের খাতিরে 'বলাকা' রচিত এরূপ কোনো ইঙ্গিত করা আমাদের অভিপ্রায় নহে; তবে এই নবছন্দে কবি রূপ দিলেন নূতন ভাবনাকে। বস্তুর গতিধর্ম ও স্থিতিধর্ম লইয়া বিজ্ঞানে ও দর্শনে যে সংগ্রাম চলিতেছে—

১ তু, ইবসেন রচিত The Doll's House (Et Dukkehjem 1879. W. Archer 2) ইংরেজিতে অনুবাদ করেন ১৮৮৯ অব্দে নাটিকায় আছে:

Torvald : No man sacrifices his honour, even for one he loves.

Nora : Millions of women have done so. Then she walks out and shuts the door.

২ "তোমার চিঠি পাবার পূর্বেই আমি 'আষাঢ়' বলে একটা উড়ো রকমের প্রবন্ধ পাঠিয়েছি নিশ্চয়ই পেয়েছ। তুমি তাতে প্রাচীন ভারতের যে ধরণের মেঘলা ছবি চেয়েছ তা হয়নি কিন্তু ওর মধ্যে পুবে হাওয়াটা আছে।" চিঠিপত্র ৫, (পত্র ২৪)।

৩ দ্র. চিঠিপত্র ৫, পত্র ২৪ (২২ আষাঢ় ১৩২১)। এই পত্রে কবি প্রমথচৌধুরীর 'খেয়ালের জন্ম' (সবুজ পত্র ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ) কবিতার সমালোচনা করেন। আষাঢ়, পরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ, ৫৩১-৫৩৮।

তাহারই সংশ্লেষণী নূতন তত্ত্বকে কবি আপনার ভাষায় নূতন ছন্দে ব্যক্ত করিলেন। আর বোধের সঙ্গে বুদ্ধির বুঝা-পড়ার চেষ্টা চলিল 'আমার জগৎ' প্রবন্ধে; নানা দার্শনিক সামাজিক সাহিত্যিক— এককথায় বিচিত্র মানবীয় সমস্যা ভিড় করিয়েছে মনের উপর; সাহিত্যের উপর তাহাদের ছাপ রাখিয়া দিতেছে।

১৯১৪ সালে পৃথিবীর প্রথম মহাযুদ্ধ (World-War I) হঠাৎ আরম্ভ হইল। পৃথিবী সত্যই এখন একজগৎ, তাই তাহার আঘাত ও প্রতিঘাত সকলকেই কোনো-না-কোনোভাবে স্পর্শ করিল। ৪ঠা অগস্ট ইংলণ্ড যুদ্ধে যোগদান করায় সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য ইহার সঙ্গে বিজড়িত হইয়া পড়িল; ইহার পূর্বে রুশ অষ্ট্রিয়া জার্মান ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ রণাঙ্গনে নামিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে। মন্দিরের সাপ্তাহিক উপাসনায়[১] অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে প্রার্থনা করিলেন, "স্বার্থের বন্ধনে জর্জর হয়ে, রিপুর আঘাতে আহত হয়ে···মরছে মানুষ বাঁচাও তাকে।"···বিশ্ব পাপের যে মূর্তি আজ রক্তবর্ণে দেখা দিয়েছে, সেই বিশ্বপাপকে দূর করো।···বিনাশ থেকে রক্ষা করো।" সভ্য মানুষের সমস্ত অহংকার আজ চূর্ণিত। বহু যুগের বহু মহাত্মার সাধনা বহু মনীষীর ভাবনা, অনেক কবি ও শিল্পীর সৃষ্টি আজ মুষ্টিমেয় শক্তিবাদীর পাদপীঠতলে লুণ্ঠিত। কবি বিষণ্ণ চিত্তে এই আত্মঘাতী মরণযজ্ঞের কারণ কী ভাবিতেছেন। এই প্রলয়ের মূল কোথায়। তিনি বলিলেন, "সমস্ত য়ুরোপে আজ এক মহাযুদ্ধের ঝড় উঠেছে। কতদিন ধরে গোপনে গোপনে এই ঝড়ের আয়োজন চলছিল! অনেক দিন থেকে আপনার মধ্যে আপনাকে যে মানুষ কঠিন করে বদ্ধ করেছে, আপনার জাতীয় অহমিকাকে প্রচণ্ড করে তুলেছে, তার সেই অবরুদ্ধতা আপনাকেই আপনি একদিন বিদীর্ণ করবেই করবে। এক-এক জাতি নিজ নিজ গৌরবে উদ্ধত হয়ে সকলের চেয়ে বলীয়ান হয়ে ওঠবার জন্য চেষ্টা করেছে। বর্মে চর্মে অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অন্যের চেয়ে নিজে বেশি শক্তিশালী হবার জন্য তারা ক্রমাগতই তলোয়ারে শান দিয়েছে। Peace Conference শান্তিস্থাপনের উদ্‌যোগ চলেছে; সেখানে কেবলই নানা উপায় উদ্‌ভাবন করে নানা কৌশলে এই মারকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু কোনো রাজনৈতিক কৌশলে কি এর প্রতিরোধ হতে পারে। এ যে মানুষের পাপ পুঞ্জীভূত আকার ধারণ করেছে; সেই পাপই যে মারবে এবং মেরে আপনার পরিচয় দেবে।" কয়েকদিন পরেও মন্দিরে উপাসনাকালে কবি বলেন, "আজ যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে সে যেন ব্যর্থ না হয়। রক্তের বন্যায় যেন পুঞ্জীভূত পাপ ভাসিয়ে নিয়ে যায়।"[২]

রবীন্দ্রনাথের মনে আজ এই প্রশ্ন উঠিয়াছে— কেন এই পাপের বেদনা। ইহার উত্তরও তিনি পাইয়াছেন— "মানুষের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নাই, সমস্ত মানুষ যে এক। সেইজন্য পিতার পাপ পুত্রকে বহন করতে হয়, বন্ধুর পাপের জন্য বন্ধুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, প্রবলের উৎপীড়ন দুর্বলকে সহ্য করতে হয়। মানুষের সমাজে একজনের পাপের ফলভোগ সকলকেই ভাগ করে নিতে হয়; কারণ, অতীতে ভবিষ্যতে দূরে দূরান্তে হৃদয়ে হৃদয়ে মানুষ যে পরস্পরে গাঁথা হয়ে আছে। মানুষের এই ঐক্যবোধের মধ্যে যে গৌরব আছে তাকে ভুললে চলবে না। এইজন্যই ···সমস্ত মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সকলকেই করতে হবে।" আসল কথা, মানুষের বিশ্বজীবনে যে ছন্দ আছে, তাহা যদি ভ্রংশ হয়, তবে বিপর্যয় সুনিশ্চিত। জীবনের এই ছন্দোভঙ্গ রাষ্ট্রিক, আর্থিক, সামাজিক ব্যাপারে আজ এতই প্রকট যে চিন্তাশীলরা বুঝিতে পারিতেছেন যে মনুষ্যের সভ্যতা স্বচ্ছন্দগতিতে আর চলিবে না।

মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে জার্মানি ভাবিয়াছিল যে সে অতি সহজে শত্রুদের পদানত করিবে; ক্ষুদ্র বেলজিয়াম তাহাকে বাধা দিয়া, আপনার প্রাণ নিঃশেষে দান করিয়া য়ুরোপকে রক্ষা করিল। বেলজিয়াম বাধা দিয়াছিল বলিয়াই

১ মা মা হিংসী ২০শে শ্রাবণ ১৩২১, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৬ [আষাঢ়-কার্তিক]। শান্তিনিকেতন ১৭, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬, পৃ ৪৯০-৪৯৩।

২ পাপের মার্জনা, ৯ ভাদ্র ১৩২১, শান্তিনিকেতন ১৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬, পৃ. ৪৯৪-৪৯৬।

মিত্রশক্তি প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হইবার সামান্য অবসর পাইল। এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া কবি লিখিতেছেন, "বেল্‌জিয়ামের কীর্তি মনে খুব লেগেছে— সেদিন ছেলেদের এই নিয়ে কিছু বলেওছিলুম— হয়তো দেখবে কবিতাও একটা বেরিয়ে যেতে পারে।" কবিতাটি লিখিবেন কি লেখা হইয়াছে অথবা পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে বুঝিলাম না। তবে ছেলেদের কাছে পাপের মার্জনা নামে যে ভাষণ দেন সেটি ৯ই ভাদ্রে কথিত। ইহার পূর্বে ৪ঠা ভাদ্র লেখেন—

বাধা দিলে বাধবে লড়াই,
মরতে হবে;
পথ জুড়ে কী করবি বড়াই?
সরতে হবে।
লুট-করা ধন করে জড়ো
কে হতে চাস সবার বড়ো,
এক নিমেষে পথের ধুলায়,
পড়তে হবে।
নাড়া দিতে গিয়ে তোমায়
নড়তে হবে। ইত্যাদি।[২]

ইহার পরদিন লেখেন 'পাড়ি' কবিতা। কবি স্বয়ং বলিয়াছেন, এই কবিতার মধ্যে যুদ্ধের চিন্তা আছে। তাঁহার মনে হইতেছে, এই মত্ততার মধ্যে হয়তো মঙ্গলময়ের করুণা বর্ষিত হইবে। কলিকাতা হইতে ফিরিয়া যে ভাষণ দান করেন, তাহার মধ্যে সেই ভাবটি খুবই স্পষ্ট। 'পাড়ি'র মধ্যে নেয়ে নৌকা লইয়া আসিতেছে, সে কে? তিনি জীবন-দেবতা জীবনপ্রেরণা প্রেতি মহানায়ক মহারুদ্র সকলপ্রকার ক্ষুব্ধতা মত্ততা বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়া আসিতে-ছেন। কিসের জন্য, কাহার জন্য তাঁহার এই অভিসার? আজ জগতে যাহাদের চরম অসম্মান— দীন নিপতিত— সেই 'অগৌরবা'র দ্বারেই তিনি যাইতেছেন। যে দীন, তাহাকে বস্তুভারে ধনরত্নে পীড়িত তিনি করিবেন না, তাহাকে সৌন্দর্যে মণ্ডিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য— 'একটি ফুলের গুচ্ছ আছে রজনীগন্ধার'। "তোমরা যাহার নাম জান না তাহারি নাম ডাকি ঐ যে আসে নেয়ে।" প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে সত্যই তো 'অগৌরবা' ও নাম-না-জানা মানবসমাজের গলায় বরমাল্য পড়িল।

কবির এই কবিতার মধ্যে 'বলাকা'-গুচ্ছের মূল সুরটির সন্ধান পাওয়া যায়। জীবননায়কের নৌকা-অভিযানের গতি অর্থপূর্ণ এবং অগৌরবা অনামার অপেক্ষা করায় স্থিতিরও সার্থকতা। এই ভাবটির বিপরীত অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছিল একটি গানে, "কবে তুমি আসবে বলে, আমি রইব না বসে, আমি চলব বাহিরে।" তাঁহার কাছে পৌঁছিবার জন্য আমাকেও চেষ্টা করিতে হইবে— 'কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী' এ তিরস্কার যেন না শুনিতে হয়।

আমরা পূর্বেই বলিলাম, শ্রাবণের শেষ হইতে রবীন্দ্রনাথ নূতন গান রচনায় প্রবৃত্ত। রামগড় হইতে জ্যৈষ্ঠের শেষে ফিরিয়া আশ্রমে তিনি আসেন আষাঢ়ের গোড়ায়; ও সেই হইতে দীর্ঘকাল সেখানেই আছেন। মাঝে ৫ই ভাদ্র কলিকাতায় যান— রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পঞ্চাশৎবর্ষপূর্তি উৎসবে। সেইদিন লেখেন 'পাড়ি'। কলিকাতা হইতে দুই দিনের মধ্যেই শান্তিনিকেতন ফিরিলেন। গানের ধারা চলিতেছে অবিরাম।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কথা ইতিপূর্বে বলিয়াছি। আলোচ্যপর্বে তিনি রিপন কলেজের অধ্যক্ষ ও পদার্থবিদ্যার

১ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৩১। ৫, সেপ্টেম্বর ১৯১৪ (১৯ ভাদ্র ১৩২১)। পৃ ১৮৬

২ গীতালি ৩নং, ৪ ভাদ্র ১৩২১, শান্তিনিকেতন।

অধ্যাপক। রামেন্দ্রসুন্দরের পঞ্চাশৎবৎসরপূর্তি উপলক্ষ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ এই জন্মোৎসবের আয়োজন করেন; সাহিত্য-পরিষদ ভবনে সভা হয়; রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দন পাঠ করেন।[১] পাঠকের স্মরণ আছে, তিন বৎসর পূর্বে টাউন-হলে রবীন্দ্রনাথের যে পঞ্চাশৎজন্মোৎসব সম্পন্ন হয়, তাহাতে রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-পরিষদের তরফ হইতে রবীন্দ্রনাথকে প্রদত্ত মানপত্র পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পৃথক্ মত পোষণ করিতেন, তৎসত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে অন্তরের গভীর একটি যোগ ছিল। উভয়ে উভয়কে শ্রদ্ধা করিতেন। কবির মুখে ত্রিবেদী-মহাশয় সম্বন্ধে বহুবার বহু কথা শুনিয়াছি, কখনো কোনো বিরূপ সমালোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে পড়ে না।

কলিকাতা হইতে বোলপুরে ফিরিয়া (৭ ভাদ্র) কবি শান্তিনিকেতনে একদিন থাকিয়া সুরুলের বাড়িতে চলিয়া গেলেন। সুরুলে এই সময়ে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী নূতন সংসার পাতিয়াছেন। কবি সেখান হইতে প্রায় প্রতিদিন অপরাহ্নে শান্তিনিকেতনে আসেন গোরুর গাড়ি করিয়া। শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের মাঝে যে পাকা রাস্তা আজ দেখা যায়, তখন তাহার কিছুই ছিল না। অত্যন্ত ভাঙা মেঠোপথ দিয়া গোরুর গাড়িতে যাওয়া-আসা করিতে হইত। বেণুকুঞ্জের খড়ের ঘরে থাকেন দিনেন্দ্রনাথ, সেখানে সন্ধ্যায় গানের আসর জমে। গীতালির নূতন গান যেদিন যা লেখা হয় কবি সন্ধ্যায় আসিয়া দিনেন্দ্রনাথকে তাহা শিখাইয়া যান। কবি সুর দিতে দিতে গান রচনা করিতেন; সমগ্র গানটির রূপ ও সুর স্পষ্ট হইয়া উঠিলে সেটি কাহাকেও না দিতে পারিলে কবি বিব্রত হইয়া পড়িতেন। দিনেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কেহ কাছে না থাকিলে যাহার কণ্ঠে সামান্য সুর আছে তাহাকেই শিখাইয়া দিতেন।[২]

গীতালির গানের স্রোত চলে প্রায় দুই মাস; ইহার মধ্যে ছেচল্লিশ দিনে ১০৮টি গান রচিত হয়। কবিজীবনে গানের এমন নিবিড় আসঙ্গ খুব কম পর্বেই দেখা গিয়াছে।[৩]

ইতিমধ্যে সুরুলে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী উভয়েই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইলেন— গ্রামসেবার সকল আশা মুকুলেই নষ্ট হইল। কবির মন খুব ক্লান্ত। আধ্যাত্মিক পারিবারিক পারিপার্শ্বিকের বিচিত্র ঘটনাস্রোতকে কোনো একটি বিশেষ অবস্থায় সংহত করিয়া আপনার আদর্শকে রূপায়িত করিতে পারিতেছেন না বলিয়া আত্মগ্লানিতে কবির মন ভারাক্রান্ত,[৪] মনের এই অবসাদ কতদূর তীব্র হইয়াছিল, তাহা কয়েকদিন পরে লেখা রথীন্দ্রনাথকে লিখিত পত্র হইতে অতি স্পষ্ট হয়। তিনি লিখিয়াছিলেন, "দিনরাত্রি মরবার কথা এবং মরবার ইচ্ছা আমাকে তাড়না করেছে। মনে হয়েছে আমার দ্বারা কিছুই হয়নি এবং হবে না, আমার জীবনটা যেন আগাগোড়া ব্যর্থ;—অন্যদের সকলের সম্বন্ধেই নৈরাশ্য এবং অনাস্থা। তার পরে রামগড়ে যখন ছিলুম তখন থেকে আমার conscience-এ কেবলি ভয়ংকর

১ দ্র. আশুতোষ বাজপেয়ী, রামেন্দ্রসুন্দর, ১৩৩০, পৃ ১৬৩।

২ জাপানের পথে মুকুলচন্দ্র দে সঙ্গে ছিলেন বলিয়া 'ঝড়ের রাতে' গান লিখিয়া তাঁহাকে শিখাইলেন।

৩ এই সময়ে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে কবির সমগ্র গ্রন্থাবলী শোভন ভাবে প্রকাশ করিবার এক প্রস্তাব আসিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ ঐতিহাসিক ক্রমে মুদ্রিত হইয়াছিল ১৩০৩ সালে; মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থ' (১৩১০) সম্পূর্ণ নহে. কালানুক্রমেও গ্রথিত নহে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ গ্রন্থাবলীরূপে বহুকাল দুষ্প্রাপ্য ছিল। পাবলিশিং হাউসের সত্ত্বাধিকারী চিন্তামণি ঘোষ মহাশয়ের উৎসাহ ও সাহসে কাব্যগ্রন্থাবলীর বিরাট শোভন সংস্করণ মুদ্রিত হইবার ব্যবস্থা হইল। কবি ১লা আশ্বিন ১৩২১ [১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৪] ইহার জন্য ভূমিকা লিখিয়া দেন। ১লা আশ্বিন ১৩২১ গীতালির এই কয়টি গান রচিত হয়—৪৩. দুঃখ যদি না পাবে তো ৪৪. নাবে নারে, হবে না তোর স্বর্গসাধন ৪৫. তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে

৪ "Struggle often baffled, sore baffled, down as into entire wreck: yet a struggle never ended; ever, with tears, repentance, true unconquerable purpose, begun, anew. Poor human nature! Is not a man's walking in truth always that: 'a succession of falls'? Man can do no other. In this wild element of a Life, he has to struggle onwards, now fallen deep-abased; and ever, with tears, repentance, with bleeding heart, he has to rise again, struggle again still ownwards. That his struggle *be* a faithful unconquerable one! that is the question of questions." Carlyle, On Heroes and Hero-worship—*The Hero as Prophet*, p36.

আঘাত করচে যে বিদ্যালয় জমিদারী সংসার দেশ প্রভৃতি সম্বন্ধে আমার যা কর্তব্য আমি কিছুই করিনি—আমার উচিত ছিল নিঃসঙ্কোচে আমার সমস্ত ত্যাগ করে একেবারে রিক্ত হয়ে যাওয়া, এবং আমার সমস্ত পরিবারের লোককে একেবারে চূড়ান্ত ত্যাগের মধ্যে টেনে আনা; সেইটে যতই হচ্ছিল না ততই নিজের উপর এবং সংসারের উপর আমার গভীর অশ্রদ্ধা ঘনিয়ে আসছিল এবং কেবলি মনে হচ্ছিল যখন এ জীবনে আমার ideal-কে realise করতে পারলুম না তখন মরতে হবে, আবার নূতন জীবন নিয়ে নূতন সাধনায় প্রবৃত্ত হতে হবে।"[১] মনের এই অবস্থা সম্পূর্ণ শারীরিক অসুস্থতা হইতে হইয়া থাকিবে, কারণ হোমিওপ্যাথি ঔষধ ব্যবহারের পর তাহার উপশম হয়। যাহাই হউক, মনের এই অবস্থায় (১৬ আশ্বিন) অকস্মাৎ পুত্র-পুত্রবধূদের উদ্দেশ্যে এক আশীর্বাদী কবিতা লিখিলেন, যাহা গীতালির প্রথমেই মুদ্রিত হইয়াছে।

প্রায় এই সময়ে প্রমথ চৌধুরীকে লিখিতেছেন (১২ আশ্বিন ১৩২১), "মোটের উপর আমি ভাল ছিলুম না—ঠিক কবিতা লিখবার মত মনটা তাজা ছিল না তাই কিছু লেখা হয়নি।"[২] তবে ইতিমধ্যে "একটা গল্প লেখায় হাত"[৩] দিয়াছেন; এই গল্পটির উপর মনের এই মসীঅন্ধকারের প্রলেপ পড়িয়াছে; গল্পটি হইতেছে 'শেষের রাত্রি'। মনের এই ঘোরের কথা এণ্ড্রুসকে লিখিত পত্র হইতেও জানিতে পারি, ২৭ আশ্বিন লিখিতেছেন, "My period of darkness is over once again. It has been a time of very great trial to me (*Letters to a Friend*, 7 Oct 1914.)

'শেষের রাত্রি' গল্পের মধ্যে তীব্র বেদনা ছাড়া কিছু নাই; অত্যন্ত নিষ্ঠুর মিথ্যাকে লইয়া স্নেহাসক্ত মাসি যতীনকে সান্ত্বনা দিতেছে। যতীনের মন ডাকঘরের অমলের ন্যায়— অলীককে সে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে, স্বপ্নকে সে জাগরণ মনে করে। ইহার অব্যবহিত পূর্বে লিখিত 'ভাইফোঁটা' গল্পের কবি যে মনের অন্ধকারের কথা পত্র মধ্যে বারেবারে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সমর্থনলাভের জন্য গীতালির ঐ সময়ের (১৩২১ ভাদ্রর শেষ ও আশ্বিনের আরম্ভ) গান ও কবিতাগুলি ভালো করিয়া দেখিলাম। কিন্তু মনের এমন কোনো ঘোরের সন্ধান তো আমরা পাইলাম না। দুই-একটি গানের মধ্যে দুঃখের কথা যাহা আছে, সে তো অন্য পর্বের গানের মধ্যেও পাই, এ ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া বলিবার কিছু নাই। সুতরাং যে মানুষ আত্মখণ্ডন করিয়া মৃত্যুকামনা করিতেছেন, সমস্তকে অন্ধকার দেখিতেছেন, তিনি যখন সুরের সন্ধান পান, তখন দেখি তাঁহার অন্যপ্রকার রূপ। তাই মনে হয়, গানের রবীন্দ্রনাথ ও ব্যবহারিক রবীন্দ্রনাথ যেন দুই জগৎ হইতে কথা বলিতেছেন, কেহ কাহাকেও যেন চেনেন না। কেন যে এরূপ হয়, তাহার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করিবেন বিজ্ঞানীরা— জীবনীকার নির্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত।

নানাস্থানে ভ্রমণ

সুরুলের বাড়িতে সস্ত্রীক রথীন্দ্রনাথ ম্যালেরিয়া-আক্রান্ত হইলে, ঐ স্থান ত্যাগ করিতে তাঁহারা বাধ্য হইলেন। তাঁহারা বায়ুপরিবর্তনের জন্য গেলেন উড়িষ্যার সমুদ্রতীরে। কবি গেলেন না, সুরুলেই থাকিলেন। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় বন্ধ হইবার কয়েক দিন পরে (৯ আশ্বিন ১৩২১) শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। সুরুলে যে গানের পালা শুরু হইয়াছিল তাহার ধারা এখনো চলিতেছে; ৪ ভাদ্র হইতে ২১ আশ্বিন এই দেড় মাসের মধ্যে ৮৩টি গান ও কবিতা

১ চিঠিপত্র ২, পৃ ২৮।

২ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৩১। ২৯, সেপ্টেম্বর ১৯১৪ [১২ আশ্বিন ১৩২১) পৃ ১৮৮।

৩ সবুজ পত্র, আশ্বিন ১৩২১। 'শেষের রাত্রি'র ইংরেজি হইতেছে 'Mashi'। নাট্যরূপ হইতেছে 'গৃহপ্রবেশ'।

লেখেন। এই সুরের ধারা প্রায় অখণ্ডভাবেই চলল ৩ কার্তিক পর্যন্ত ; এগুলি সবই গীতালির অন্তর্গত। সেইদিনই বলাকার নূতন একটি পর্বের পত্তন হয় এলাহাবাদে।

সুরুল হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়াছেন, কবির মন কোথায়ও যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, অভ্যস্ত পারিপার্শ্বিক হইতে দূরে দূরে থাকিবার জন্য মন উদ্বিগ্ন ; হঠাৎ মনে মনে বুদ্ধগয়ায় যাবার কথা উঠিল। হয়তো ভাবিতেছেন বুদ্ধগয়ায় পৌঁছিলে মনের প্রশান্তি ফিরিবে। খবর পাইলেন কন্যা মীরা ও জামাতা নগেন্দ্রনাথ বুদ্ধগয়া 'যাবার আয়োজন করছে তাই এক সঙ্গেই যাওয়াই ঠিক' করিলেন। তবে কতদিন কোথায় থাকিবেন এখনো ঠিক করেন নাই। হরিদ্বার পর্যন্ত যাওয়ার কথাও কল্পনায় আসিয়াছে।[১]

বুদ্ধগয়ায় রবীন্দ্রনাথ গয়ার মোহান্তর অতিথি ; সেখানে সেই সময়ে ব্যারিস্টার-সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ; তাঁহারা কবিকে বিশেষভাবে সমাদর করিলেন— গানে গল্পে মজলিসে কয়েক দিন বেশ কাটিয়া গেল। মাঝে একদিন বারবরা পাহাড় দেখিবার ব্যাপার লইয়া খুবই কৌতুকপ্রদ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় একজন ভদ্রলোক আসিয়া কবিকে বারবরা পাহাড়ের সৌন্দর্য বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে সেখানে যাইবার জন্য উৎসাহিত করিলেন। কবি যাত্রা করিলেন। বেলা স্টেশনে পৌঁছিলে অনেক কষ্টে একখানি পালকি যোগাড় হইল ; কবিকে উহার মধ্যে ঢুকাইয়া লোকটি মহোৎসাহে চলিয়াছেন। গ্রামের পর গ্রাম, কোথায় আতিথ্য, কোথায় অভ্যর্থনা ! জিজ্ঞাসা করিলেই লোকটি বলে; 'আর একটু আগেই সব ব্যবস্থা আছে।' ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কবি যখন ফিরিবার জন্য জিদ ধরিলেন তখন সে লোকটি অদৃশ্য হইয়াছে।[২]

রবীন্দ্রনাথের গান এই দুঃখেও চলিতেছে ; বেলা স্টেশনে লিখিলেন (২৫ আশ্বিন) 'পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে', (গীতালি ৯৫) ; পালকি-পথে লিখিলেন, 'জীবন আমার যে অমৃত' (৯৬), 'সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি' (৯৭)। বেলা হইতে গয়ায় ফিরিবার রেলপথে লিখিলেন, 'পথের সাথি, নমি বারম্বার, পথিকজনের লহ নমস্কার' (৯৮)। মোট কথা, এত দুঃখেও মন গানের সুরে ভাসিতেছে।

গয়া হইতে আর-সকলকে বিদায় দিয়া চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া কবি এলাহাবাদ রওনা হইলেন ; চারুচন্দ্র পূর্বে বহুকাল এলাহাবাদে ইণ্ডিয়া প্রেসের সহিত যুক্ত থাকায়, কবি তাহাকেই সঙ্গে লইলেন।[৩] এখানে সেই-যে আসেন ১৩০৭ সালের শেষে বলেন্দ্রনাথের স্ত্রী সুষমাকে শিলাইদহ লইয়া যাইতে— তার পর এই চোদ্দ বৎসর পরে আসিলেন। তিনি উঠিলেন তাঁহার ভাগ্নেয় সত্যপ্রসাদের জামাতা প্যারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে— জর্জ টউনে তাঁহার বাসা।

এলাহাবাদে কবি সপ্তাহ-তিন ছিলেন। বাসাটি ছিল নিরালায় ; প্রকাণ্ড বাগানের মধ্যে বাড়ি। সেখানে উপদ্রব করিবার মত জনতা ছিল কম। মাসিকপত্রের জন্য গল্প প্রবন্ধ লিখিবার ও নিজের মনের আনন্দে বা প্রেরণায় গান ও কবিতা রচিবার অনুকূল স্থান বটে। গীতালির গানের ধারা এখানে আসিয়া কয়েক দিন চলে, তবে তেমন পূর্ণবেগে নহে। আসিবার দুই-একদিনের মধ্যেই লেখেন সুপরিচিত গান 'ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়' (নং ১০১, ৩০ আশ্বিন) গীতালির শেষ দুইটি রচনার একটি কবিতা, অপরটি সনেট। শেষ কবিতাটিতে (৩ কার্তিক) কবি যেন তাঁহার আধ্যাত্মিক অনুভূতির অন্তে আসিয়া শেষ কথা বলিতে চাহিতেছেন—

১ চিঠিপত্র ৩, পৃ ১০।

২ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রসঙ্গমে, মানসী ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩২১ মাঘ, পৃ ৬৯৮-৭১৬।

৩ ক্ষিতিমোহন সেন, বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা, পৃ ২৩

এই তীর্থ-দেবতার ধরণীর মন্দির-প্রাঙ্গণে
যে পূজার পুষ্পাঞ্জলি সাজাইনু সযত্ন চয়নে
সায়াহ্নের শেষ আয়োজন ; যে পূর্ণ প্রণামখানি
মোর সারা জীবনের অন্তরের অনির্বাণ বাণী
জ্বালায়ে রাখিয়া গেনু আরতির সন্ধ্যাদীপ-মুখে
সে আমার নিবেদন তোমাদের সবার সম্মুখে
হে মোর অতিথি যত।...
রহিল পূজায় মোর তোমাদের সবার প্রণাম।

গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য ও গীতালি -পর্বে নানা গানে যাহা বলিয়াছেন তাহারই নির্গলিত বাণী হইতেছে এই সনেটটি। যেদিন রচিত হইল গীতালির এই শেষ কবিতা— সেইদিন রাত্রেই লিখিলেন 'বলাকা'র ছবি (৩ কার্তিক ১৩২১) কবিতা। বহুকাল কবি সুরের রাজ্যে বাস করিয়াছেন, যথার্থ ছন্দোময় কাব্যের মধ্যে আপনার চিত্তকে ও কল্পনাকে অবাধ বিচরণের অবসর দিতে পারেন নাই। সুরের মধ্যে, ছন্দের মধ্যে, রূপের মধ্যে, রূপকের মধ্যে আপনার ভাবনারাশিকে মুক্তি না দিতে পারিলে কবির সাহিত্যিক চিত্ত যেন তৃপ্ত হয় না। তাই এতদিন পরে ছন্দের মধ্যে আপনার আনন্দ মূর্তি লইল।

'ছবি' কবিতা লিখিবার কয়েকদিন পরে লেখেন বিখ্যাত কবিতা 'শা-জাহান' (১৪ কার্তিক ১৩২১)। এলাহাবাদে যে দিন-কুড়ি-একুশ ছিলেন তার মধ্যে এই দুইটি মাত্র কবিতা রচিত হয়। গদ্যই বেশি লিখিতেছেন সবুজ পত্রের তাগিদে ; বোধ হয় 'অপরাজিতা', 'জ্যাঠামহাশয়' প্রভৃতি গল্প এখানেই লেখা।

'ছবি' কবিতা কি কাহারও সত্যকার ছবি দেখিয়া লেখা, না 'শা-জাহান' কবিতার ন্যায় আগ্রায় না গিয়াই লেখা— তৎসম্বন্ধে পাঠকদের কৌতূহল স্বাভাবিক। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এই ছবি খুব সম্ভব কবির পত্নীর (রবিরশ্মি, পৃ ১৩৬) প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের মতে[১] ছবিখানি কবির বৌঠান কাদম্বরী দেবীর আলেখ্য। ইহাই সত্য। বহুকালের ব্যবধানে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত পরিবেষ্টনের মধ্যে কোনো গতায়ু প্রিয় ব্যক্তির ছবি দেখিলে কবিচিত্তে ভাবোদয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

এ জীবনে
আমার ভুবনে
কত সত্য ছিলে।
মোর চক্ষে এ নিখিলে
দিকে দিকে তুমিই লিখিলে
রূপের তুলিকা ধরি রসের মুরতি।
সে-প্রভাতে তুমিই তো ছিলে
এ-বিশ্বের বাণী মূর্তিমতী।
একসাথে পথে যেতে যেতে
রজনীর আড়ালেতে
তুমি গেলে থামি।

১ কবিকথা, বিশ্বভারতী পত্রিকা ২য় বর্ষ। ১৩৫০ কার্তিক-পৌষ পৃ. ১৩৯-১৬৩।

'ছবি' ও 'শা-জাহান' কবিতা দুটি একই কথা বিভিন্নভাবে প্রকাশ করিয়াছে। প্রিয় ব্যক্তির ছবি দেখিয়া কবির মনে যে অত্যন্ত ব্যক্তিগত ভাবোদয় হইয়াছে, তাহারই রস শা-জাহানের মধ্যে আরোপ করিয়া আর-একভাবে অনুভব করিতে চাহিয়াছেন— শা-জাহান উপলক্ষ্য মাত্র।

বহুকাল-বিস্মৃত পরম আত্মীয়া যিনি কবি-জীবনের প্রত্যূষে শুকতারার ন্যায় নয়নসমক্ষে বিরাজ করিতেন তাঁহার ছবি দেখিয়া আজ প্রবাসে, পুরাতন পারিপার্শ্বিক হইতে বহু দূরে, কবির মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে—

তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে।
তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে
তাই ভুল।
অন্যমনে চলি পথে, ভুলিনে কি ফুল।
ভুলিনে কি তারা ?...
ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা ;
বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।
নয়নসম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই ;
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।

'শা-জাহান' কবিতায় কবি যেন জোর করিয়া এই সন্দেহকে নিরাকৃত করিবার জন্য বলিতেছেন "ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া ;" কিন্তু এই কথা বলা মাত্র পুনরায় সন্দেহ জাগিতেছে সত্যই কি ভোলেন নাই।

স্মৃতি ও সৌধ— অদৃশ্য ও দৃশ্য— স্মরণের রূপান্তর মাত্র! স্মৃতিমন্দিরে সত্য বন্দী হইয়া নাই। স্মৃতিতে ভাব অদৃশ্য, সেখানে প্রিয় নয়নের মাঝখানে স্থান লয়। সৌধে প্রেমিকের কীর্তি বিঘোষিত ; কিন্তু প্রেমিকের প্রেম তাহার 'কীর্তির চেয়ে মহৎ'। অনুভূতির যথার্থ প্রকাশ সৌধগৌরবে নহে, বাহিরের কোনো রূপ, কোনো প্রতীক প্রেমের পরিপূর্ণ পরিচয় বহন করিতে পারে না। ভাষা ও শিল্প মানবের নিবিড় অনুভূতির কতটুকু প্রকাশ করিতে পারে ? অসীম আবেগকে রূপ দিতে গেলেই সে-তো সীমায়িত ক্ষুদ্র হইয়া যায় ; সেইজন্যই কি কবি বলিলেন প্রেমিকের কীর্তির চেয়ে সে মহৎ— 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ!' তাই 'চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।' কবি বলিতেছেন—

প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ,
রুধিল না সমুদ্র পর্বত।
আজি তার রথ
চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বারপানে।

তাই
স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।

রবীন্দ্রমানসে এই ভাব ও চিন্তাধারা কত সুদূর-প্রসারী, তাহা আমরা ক্ষণে ক্ষণে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে (১২৯২) এই বিস্মৃতিতত্ত্ব সম্বন্ধে কবি যে একটি ক্ষুদ্র রচনা প্রকাশ করেন তাহারই কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,[১]—"জগতের মধ্যে আমাদের এমন 'এক' নাই যাহা আমাদের চিরদিনের অবলম্বনীয়। প্রকৃতি ক্রমাগতই আমাদিগকে 'এক' হইতে একান্তরে লইয়া যাইতেছে— এক কাড়িয়া আর-এক দিতেছে। আমাদের শৈশবের 'এক' যৌবনের 'এক' নহে। যৌবনের 'এক' বার্ধক্যের 'এক' নহে, ইহজন্মের 'এক' পরজন্মের 'এক' নহে। এইরূপ শত-সহস্র একের মধ্য দিয়া প্রকৃতি আমাদিগকে সেই এক মহৎ একের দিকে লইয়া যাইতেছে। সেই দিকেই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, পথের মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিতে আসি নাই।...আমি বৈরাগ্য শিখাইতেছি। অনুরাগ বদ্ধ করিয়া না রাখিলে তাহাকেই বৈরাগ্য বলে ; অর্থাৎ বৃহৎ অনুরাগকেই বৈরাগ্য বলে। প্রকৃতির বৈরাগ্য দেখো। সে সকলকেই ভালোবাসে বলিয়া কাহারও জন্য শোক করে না। তাহার দুই-চারিটা চন্দ্র-সূর্য গুঁড়া হইয়া গেলেও তাহার মুখ অন্ধকার হয় না,···অথচ একটি সামান্য তৃণের অগ্রভাগেও তাহার অসীম হৃদয়ের সমস্ত যত্ন সমস্ত আদর স্থিতি করিতেছে— তাহার অনন্ত শক্তি কাজ করিতেছে।··· প্রেম জাহ্নবীর ন্যায় প্রবাহিত হইবার জন্য হইয়াছে। তাহার প্রবহমান স্রোতের উপরে শিলমোহরের ছাপ মারিয়া 'আমার' বলিয়া কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না। সে জন্ম হইতে জন্মান্তরে প্রবাহিত হইবে।···বিস্মৃতির মধ্য দিয়া বৈচিত্র্য ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া অসীম একের দিকে ক্রমাগত ধাবমান হইতে হইবে, অন্য পথ দেখি না।"

'ছবি' ও 'শা-জাহান'[২] কবিতাদ্বয় রচনার মধ্যে পুরাতন স্মৃতি জাগ্রত হইয়াছে— তাই কবি বলিলেন—

স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।

বিচ্ছেদ ও বিস্মৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ একটি দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ; বহুকাল পূর্বে লিখিত একখানি পুরাতন চিঠিতে এই কথাটি ব্যক্ত হইয়াছিল, "অনেকটা যেন মৃত্যুর মত—তীর থেকে প্রবাহে ভেসে যাওয়া, যারা দাঁড়িয়ে থাকে তারা আবার চোখ মুছে ফিরে যায়, যে ভেসে গেল সে অদৃশ্য হয়ে গেল। জানি, এই গভীর বেদনাটুকু, যারা রইল এবং যারা গেল উভয়েই ভুলে যাবে, হয়তো এতক্ষণে অনেকটা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। বেদনাটুকু ক্ষণিক এবং বিস্মৃতি চিরস্থায়ী ; কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে এই বেদনাটুকুই বাস্তবিক সত্য, বিস্মৃতি সত্য নয়। এক-একটা বিচ্ছেদ এক-একটা মৃত্যুর সময় মানুষ সহসা জানতে পারে এই ব্যথাটা কী ভয়ংকর সত্য ! জানতে পারে যে, মানুষ কেবল ভ্রমক্রমেই নিশ্চিন্ত থাকে। কেউ থাকে না— এবং সেইটে মনে করলে মানুষ আরো ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কেবল যে থাকব না তা নয়, কারও মনেও থাকব না !"[৩]

এলাহাদের নিরালা বাড়িতে বসিয়া যে কবিতা লিখিলেন সে তো নিজের অন্তরের উচ্ছ্বসিত কথা। কিন্তু কেবল নিজের জন্য কবিতা লিখিলে চলে না, 'সবুজ পত্রে'র জন্য গল্প প্রবন্ধও লিখিতে হয়। আমাদের মনে হয়

১ উত্তর প্রত্যুত্তর 'রুদ্ধ গৃহ' সম্বন্ধে। বালক ১২৯২, পৃ ৪২৭-৩০। সোলাপুব হইতে লিখিত পত্র, ২৬ আশ্বিন (১২৯২)। দ্র, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৫, গ্রন্থপরিচয়ে রুদ্ধগৃহ প্রসঙ্গ। পৃ. ৫৬১-৬৪। দ্র. রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড ৩য় সং।

২ দ্র, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্র, প্রবাসী ১৩৪৮ কার্তিক। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২, গ্রন্থপরিচয় পৃ ৫৯১, প্রমথনাথ বিশীকে পত্র (২১ শ্রাবণ ১৩৪৪) ঐ পৃ ৫৯৪।

৩ সাজাদপুর, ১৮৯১ জুলাই ৪। দ্র, ছিন্নপত্র। নং ৩০।

'অপরিচিতা'[১] গল্পটি এই সময়ের রচনা। অত্যন্ত বাস্তব-ঘেঁসা গল্প হইলেও, ইহার মধ্যে যে বেদনার ধারা বহিতেছে সেটি অন্তর্বিষয়ী পর্যায়ে পড়ে। যৌবনের অন্তরে গাঁথা থাকিল একটি কথা— 'জায়গা আছে'। 'ছবি' যেমন অন্তরের মধ্যে অদৃশ্য রূপে ফুটিয়াছে, 'অপরিচিতা'র কণ্ঠেও সেই সুরটি ধ্বনিতেছে। "সেই সুরটি যে আমার হৃদয়ের মধ্যে আজও বাজিতেছে - সে যেন কোন্ ওপারের বাঁশি— আমার সংসারের বাহির হইতে আসিল— সমস্ত সংসারের বাহিরে ডাক দিল। আর সেই যে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে আমার কানে আসিয়াছিল 'জায়গা আছে', সে যে আমার চিরজীবনের গানের ধুয়া হইয়া রহিল। আমার মনে আছে, কেবল সেই একরাত্রির অজানা কণ্ঠের মধুর সুরের আশা— জায়গা আছে। নিশ্চয়ই আছে, নইলে দাঁড়াব কোথায় ?" এখানে সেই কথাই-'স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি'— অন্য রূপ লইয়াছে।

এই গল্পটি সম্বন্ধে আমাদের মনে হয় কবি শেষ দিকটায় আপনার লেখনীর প্রতি অবিচার করিয়াছেন। গল্পটিকে বাস্তব-ঘেঁসা করিবার জন্য অকারণে শেষভাগে ছেলেটিকে কানপুরে লইয়া গেলেন ; কল্যাণীর সহিত পরিচিত হইবার কোনোই প্রয়োজন ছিল না ; শুধু ধ্বনিটুকু রাখিয়া গল্প শেষ করিলে অপরিচিতা নাম সার্থক হইত। শেষ অংশটা যেন প্রক্ষিপ্ত।

নভেম্বরের গোড়ার দিকে কবি এলাহাবাদ হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। পূজাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিয়াছে ;[২] মন্দিরের উপদেশে য়ুরোপের তৎকালীন যুদ্ধ সম্বন্ধে কবি কিছু বলেন। মানুষের ইতিহাসে উগ্র জাতীয়তাবোধ বা ন্যাশনালিজম্ মানুষের কী সর্বনাশ করিতেছে তাহাই ছিল ভাষণের পুরোভাগে। মানুষে মিলন-তপস্যাকে ভঙ্গ করিবার জন্য "শয়তান সেই জাতীয়তাকেই অবলম্বন করে কত বিরোধ কত আঘাত কত ক্ষুদ্রতাকে দিন দিন তার মধ্যে জাগিয়ে তুলছে।…শান্তিনিকেতন-আশ্রমেও…আমরা মানুষের সমস্ত ভেদ জাতিভেদ ভুলব। আমাদের দেশে চারি দিকে ধর্মের নামে যে অধর্ম চলছে, মানুষকে কত ক্ষুদ্র ক'রে সংকীর্ণ ক'রে তার মানবধর্মকে নষ্ট করবার আয়োজন চলছে, আমরা এই আশ্রমে সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হব।" কবির ধর্মমত কিভাবে নূতন পথ লইতেছে, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সংকীর্ণতা ও স্বদেশীযুগের গোঁড়ামি কিভাবে ধীরে ধীরে ত্যাগ করিয়া কবি অগ্রসর হইতেছেন, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

উত্তর-ভারত হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন বটে, কিন্তু মন টিকিল না, দিন দুইএর মধ্যে দার্জিলিং গেলেন— সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী ; তাঁহারা উডল্যাণ্ড হোটেলে উঠিলেন। এই সময়ে সেখানে অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ ও গগেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন। বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল একদিন কবিকে সরকারী প্রাসাদে অনুষ্ঠিত তিব্বতী নাচ দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন, আর-একদিন ভোজে নিমন্ত্রণ করেন লেডি কারমাইকেল। এইসব আদর-আপ্যায়ন ছাড়া আছে হোটেলে লোকসমাগম। এণ্ড্রুসকে লিখিতেছেন, 'আমি চিঠিপত্রের তেপান্তরে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছি'[৩]। ১২ই নভেম্বর দার্জিলিং হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন, সুতরাং সপ্তাহের অধিক কাল ছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু শান্তিনিকেতনে স্থির হইয়া বাস করিতে পারিলেন না, পুনরায় উত্তর-ভারতে রওনা হইলেন ; এলাহাবাদ হইয়া দিল্লি ও আগ্রা ঘুরিয়া পুনরায় এলাহাবাদ আসেন ; এবারও বোধ হয় সপ্তাহ-তিন ঐ স্থানগুলিতে কাটে। এই

১ অপরিচিতা, সবুজ পত্র ১৩২১ কার্তিক। গল্পগুচ্ছ ৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, পৃ ২৯৩-৩০৭।

২ মন্দিরের উপদেশ (পূজাবকাশের পর বিদ্যালয় খোলার পর মন্দিরের উপদেশ) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৬ শক (১৩২১) অগ্র, ১৩৭-১৩৯। সৃষ্টির ক্রিয়া, শান্তিনিকেতন ১৭ খণ্ড। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬শ, পৃ. ৪৯৬-৫০০ (বুধবার ১৮ কার্তিক ১৩২১ (৪ নভেম্বর' ১৯১৪)।

৩ *Letters to a Friend*, p 48

সময়টিতে কবির লেখনী নানা রচনা লিখিতে ব্যস্ত; প্রবন্ধের মধ্যে 'লড়াইয়ের মূল' (সবুজপত্র ১৩২১ পৌষ) লেখেন এলাহাবাদে গিয়া। দিল্লি যাইবার পূর্বে প্রমথ চৌধুরীকে সেটি পাঠাইয়া দেন।[১]

বিদ্যালয় হইতে দূরে দূরে থাকিলেও তথাকার প্রতি সর্বদাই তিনি উদ্যতদৃষ্টি। আগ্রায় বাসকালে ডিসেম্বর মাসের (১৯১৪) মডার্ন রিভিউ পত্রিকা হইতে কবি জানিতে পারিলেন যে শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা পূর্ববঙ্গের দুর্গতদের সাহায্যকল্পে খাদ্যসামগ্রী হইতে চিনি ও ঘৃতাদি বাদ দিয়া বিনিময়ে তাহার মূল্য দুঃস্থদের নিকট প্রেরণ করিবে। ঘটনাটির ইতিহাস এইরূপ: প্রথম মহাযুদ্ধে বাংলাদেশের পাটচাষীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। পূর্ববঙ্গের দুর্গত চাষীদের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া আসেন পিয়ার্সন ও কালীমোহন ঘোষ। তথাকার দুর্দশার কথা শুনিতে পাইয়া ছাত্রসভা হইতে অর্থসাহায্য করিবার প্রস্তাব পেশ হয়। তদনুসারে খাদ্যসামগ্রী হইতে চিনি ও ঘৃত বাদ দিবার কথা হয়।

রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের এই শ্রেণীর ত্যাগের ঘোরতর নিন্দা করিয়া এণ্ড্রুসকে পত্র লিখিলেন (৫ ডিসেম্বর ১৯১৪)— এই শ্রেণীর ত্যাগের আদর্শ ছাত্রদের নিজেদের নহে, উহা ইংরেজি স্কুলের ছাত্রদের অনুকরণ মাত্র। তার পর, ছাত্ররা বিদ্যালয়ে বাস করে, তাহাদের পক্ষে নিজেদের নির্দিষ্ট খাদ্য-অংশ হইতে যে উপকরণগুলি শরীরগঠনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা ত্যাগ করিবার স্বাধীনতা তাহাদিগকে দেওয়া যায় না। তিনি পত্রমধ্যে স্পষ্টই বলিলেন যে ছাত্রদের এই শ্রেণীর আত্মত্যাগের অর্থ নাই। তাহাদের পক্ষে যথার্থ আত্মত্যাগ হইবে অর্থোপার্জনের জন্য কোনো কঠোর শ্রমসাপেক্ষ কর্মগ্রহণ (The best form of self-sacrifice for them would be to do some hard work in order to earn money.—*Letters to a Friend*, p 50), কবির এই ইঙ্গিত পাইয়া ছাত্র ও অধ্যাপকগণ সত্যই মাটি কাটিয়া টাকা তুলিল। এই কর্মের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন সন্তোষচন্দ্র মজুমদার।

এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিয়া কবি যথারীতি সবুজ পত্রের চাহিদা পূরণ করিতেছেন, বিশেষভাবে, গল্প লিখিতেই হইতেছে। দেড় মাস পরে আবার কবিতা লিখিতেছেন; এ পর্বে দুইটি শ্রেষ্ঠ কবিতা এলাহাবাদে রচিত হয়— চঞ্চলা (৩ পৌষ) ও তাজমহল (৫ পৌষ)। এবার তাজমহল সত্যই দেখিয়া আসিয়াছেন; পূর্বে লিখিত 'শা-জাহান' (বলাকা ৭) কবিতা ও গদ্যরচিত 'তাজমহল'-দুইটির সুর ও রূপ বিশেষভাবে তুলনীয়। চঞ্চলার (বলাকা ৮) মধ্যে যেমন নিরাসক্ত গতির কথা প্রকাশ পাইয়াছে, তাজমহলের মধ্যে তেমনি অতীত স্মৃতির কথা বলা হইয়াছে। নদী চঞ্চলা— স্মৃতিসৌধ স্তব্ধ; একটিতে গতি অপরটিতে স্থিতি। কল্পনার গতি সম্মুখে, স্মৃতির গতি পশ্চাতে; চঞ্চলা ও তাজমহল এই দুইটি ভাবেরই প্রতীক। চঞ্চলার মধ্যে যে কথা বলিতে চাহিয়াছেন, তাহাই যেন অন্য ভাষায় সেইদিনেই এণ্ড্রুসকে লিখিত পত্রে ব্যক্ত হইয়াছে।[২]

কিছুকাল হইতে যেসব সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মত রসস্নিগ্ধ হইয়া কবিমানসে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারাই যেন কবিতার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে মুক্তি লাভ করিল। চঞ্চলা ও বলাকার আরও কয়েকটি কবিতার মধ্যে এমন একটি তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল, যাহা ইতিপূর্বে কবির অন্য কোনো কাব্যে স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয় নাই। এই কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে বহুকাল পূর্বে রচিত আর-এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-উচ্ছ্বসিত কবিতার কথা আমাদের স্মরণ হয়, যেমন 'সমুদ্রের প্রতি' 'বসুন্ধরা' 'এবার ফিরাও মোরে' প্রভৃতি রচনাগুলি। সে কবিতার প্রেরণা ছিল সেযুগের বিজ্ঞানে— বিজ্ঞানী, দার্শনিক টমাস হাক্সলি ও হার্বার্ট স্পেন্সারের মতবাদের মধ্যে; তাই সেসব কবিতার মধ্যে নীহারিকাবাদ, অভিব্যক্তিবাদ প্রভৃতি তদ্‌-আধুনিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তসমূহ স্থান পাইয়াছিল।

১ দ্র. চিঠিপত্র ৫। ৪ পৌষ ১৩২১ (১৯ ডিসেম্বর ১৯১৪)।

২ *Letters to a Friend*, Allahabad, 18 December 1914.

আমাদের আলোচ্য পর্বে বলাকার কবিতা ও কয়েকটি গদ্য-প্রবন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানীদের পরমাণুবাদ ও গতিবাদ নূতনভাবে রূপ পাইল।

সমসাময়িক ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁ তাঁহার দর্শনকে এই গতিবাদের উপর আংশিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তত্ত্বের দিক হইতে বের্গসঁর অনন্ত গতিবাদ এককালে ভাবুক চিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তবে কূট দার্শনিক ও নৈয়ায়িকেরা এই ফরাসী ভাবুকের গতিশীল বিবর্তনবাদকে (Creative evolution) তেমন আমল দেন নাই। বার্টরাণ্ড রাসেল তো স্পষ্টভাবে বের্গসঁর মতামত লইয়া ব্যঙ্গই করিয়াছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে দার্শনিকদের কূট বিচারপদ্ধতি জানা সম্ভবও ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না; বের্গসঁর মতের মধ্যে যে ভাবুকতাটুকু প্রচ্ছন্ন আছে তাহার ধ্বনি কবিমানসকে স্পর্শ করিয়াছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বের্গসঁর মতকে দার্শনিক তত্ত্বরূপে গ্রহণ না করিয়াও, অনুভূতির দ্বারা, মননের দ্বারা তাহার যে নির্গলিত রসটুকু কবি বুঝিয়া লইয়াছিলেন তাহাই তাঁহার কাব্য-উপকরণের পক্ষে যথেষ্ট। তবে রবীন্দ্রনাথ জীবনের তত্ত্ব ও তথ্যকে কেবলমাত্র অনন্ত গতিবাদের চঞ্চলতার মধ্যে অনুভব করেন নাই— তিনি শান্তম্‌কেও অন্তরে পাইয়াছেন— ইহা ভারতের উপনিষদের শিক্ষা: পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী-দার্শনিকের ধ্যানের অগম্য এই অনুভূতি। রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "গতি-তত্ত্বও যেমন সত্য, স্থিতি-তত্ত্বও তেমনি সত্য— এবং সেইজন্যেই গতিকেও আমরা স্থিতিরূপে ছাড়া বুঝতেই পারি নে।"[১] গতি-স্থিতির সমবায়ে যে অখণ্ড পরিপূর্ণতার প্রকাশ তাহাই হইতেছে রবীন্দ্রকাব্যের নিগূঢ় অর্থ। উপনিষদের বাণী 'তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে' ইত্যাদি শ্লোক বা আপাত-বিপরীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যের তত্ত্বদ্রষ্টা হইতেছেন রবীন্দ্রনাথ।

বের্গ্‌সঁর মতে জগতের মধ্যে সদাসর্বদাই পরিবর্তন চলিতেছে। অপরিবর্তনশীল কোনোই সত্তা স্বীকার করিতে পারা যায় না, সমস্ত কিছুরই রূপান্তর ঘটিতেছে এবং ঘটিবেই। বের্গ্‌সঁ ইহার নাম দিয়াছেন becoming বা 'হওয়া'। জগতে কিছুই থাকে না, সবই হয়। বস্তুর বিশ্লেষণে আমরা গতি ছাড়া আর কিছুই পাই না; বিজ্ঞানে এই গতির নানা নাম। একটি নদীর ধারার সঙ্গে এই দৃশ্যমান জগতের তুলনা করা যাইতে পারে। এই যে অনাদি অনন্তস্রোত, এই যে জীবনধারা, এই চরম ও পরম শক্তি 'চলন্তী শাশ্বতী'। কিন্তু এই শক্তির গতি যে অবাধ, বাধাবন্ধহীন, তাহা নহে। চলিতে চলিতে হঠাৎ বাধা পাইয়া প্রতিহত হইয়া এই শক্তি ফিরিয়া দাঁড়ায়। চৈতন্যশক্তির এই যে প্রতিঘাত, এই বিপরীত গতি, বের্গ্‌সঁর মতে ইহারই নাম বস্তু। জীবনধারা যেন একটি উৎস, তাহার ধারা কেবলই উপরে উঠিতে চায়। বস্তু গতির একটি অবস্থামাত্র— বুদ্ধির দ্বারা আমরা নিরবচ্ছিন্ন গতিধারাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বস্তুরূপে দেখি মাত্র। বের্গসঁ বলেন, "অতীতের অবিরত প্রবাহ নিরবচ্ছেদে ভবিষ্যতের গর্ভে প্রবেশ করিতেছে, বর্তমান সেই অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে একটি হাইফেন্ মাত্র, বর্তমান বলিয়া কিছুই নাই, কারণ যে মুহূর্তকে আমরা বর্তমান বলি তৎক্ষণাৎ তাহা অতীত হইয়া যাইতেছে, এবং ভবিষ্যৎ আসিয়া সেই বর্তমান নামক কালবিন্দুর স্থান অধিকার করিতেছে।"[২]

বের্গসঁর মতের এই পর্যন্ত বুদ্ধি ও বোধের অধিগম্য; কিন্তু তিনি যখন সেই গতিকে অনন্ত ও সমস্ত প্রকাশকে ভাবময় কাব্যময় ভাষায় ব্যক্ত করেন, তখন তাহা জ্ঞানী ও ধ্যানী কাহারও পক্ষে স্বীকার করা সম্ভব হয় না।

রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত আপাতদৃষ্টিতে বের্গসঁর কাব্যময় দর্শনের একাংশ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, কিন্তু উভয়ের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গি দুই মেরুবিন্দুর ন্যায় বিপরীত। রবীন্দ্রনাথ 'আষাঢ়' নামে প্রবন্ধের (সবুজ পত্র ১৩২১ আষাঢ়) একস্থানে লিখিতেছেন, "নিশ্চলের যে ভয়ংকর চলা তাহার রুদ্রবেগ, যদি দেখিতে চাও

১ পত্র। অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত, দ্র. প্রবাসী ১৩৪১ পৌষ, পৃ. ৩৩৪।

২ দ্র. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিরশ্মি ২য়, পৃ. ১৩৯-১৬৪।

তবে দেখ ঐ নক্ষত্রমণ্ডলীর আবর্তনে, দেখ যুগযুগান্তরের তাণ্ডব নৃত্য। যে নাচিতেছে না তাহারই নাচ এই সকল চঞ্চলতায়।"—পরিচয় পৃ ১৭২। ইহারই আলোকে 'চঞ্চলা' (বলাকা ৮) কবিতাটি পড়া যাক, পাঠক দেখিবেন বের্গসঁর সাথে রবীন্দ্রনাথের মিল কোন্ খানে।

বের্গসঁর গতিবাদের কাব্যময় কল্পনাটুকুকে রবীন্দ্রনাথ আপনার অধ্যাত্মরসে রঙাইয়া কাব্যমধ্যে অপরূপ সৌন্দর্যে প্রকাশ করিলেন। কিন্তু কবি যেখানে কাব্য ছাড়িয়া তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, সেখানে বের্গসঁর মতবাদকে স্বীকার করেন নাই। অনন্তগতি, অনন্ত উন্নতি বিজ্ঞানে সম্ভাব্য ব্যাপার নহে, ধর্মতত্ত্বেও প্রমাণিত নহে; সেইজন্য যাঁহারা বের্গসঁর ও রবীন্দ্রনাথের দর্শন সমধর্মী বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহারা উভয়ের প্রতি অবিচার করিবেন বলিয়াই আমাদের আশঙ্কা।

এইখানে একটি কথা সংক্ষেপে বলিয়া রাখি যে, রবীন্দ্রকাব্যসাহিত্যে চলার সুর অতি পুরাতন; সেই চলার কথা, গতির কথা বহুভাবে তিনি প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। বলাকায় তাহা নূতন রূপ লইয়াছে স্পষ্টতর ভাষায়।—

হে বিরাট নদী
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে;
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে

সমস্ত কবিতাটিতে এই অপরূপ গতিধর্মের ও বস্তুপিণ্ডের জন্ম-বারতার কথা। "the resistance life meets from inert matter, and the explosive force which life bears within itself"[১]

বলাকার একটি পর্ব

পৌষ-উৎসবের পূর্বদিন (৬ পৌষ ১৩২১) রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে ফিরিলেন। এবার উত্তর-ভারত ভ্রমণকালে আশ্রমের ভিতর এমন একটি পরিবর্তন হইয়াছে, যাহার সহিত কবিজীবন বিশেষ সম্পৃক্ত। কবি যখন আগ্রায় সেই সময়ে দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে গান্ধীজির ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ আশ্রমে কয়েক মাস বাস করিবার জন্য আসিল। এই সামান্য ঘটনাটির পিছনে যে ইতিহাসটুকু আছে, তাহা এখানে বিবৃত না করিলে বিষয়টি পাঠকদের নিকট অস্পষ্ট হইবে।

পাঠকের স্মরণ আছে ১৯১৩ সালের প্রথম ভাগে এণ্ড্রুস ও পিয়ার্সন দক্ষিণ-আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য তথায় যান। ইতিপূর্বে এই শ্রেণীর রাজনৈতিক ও বর্ণবৈষম্য সমস্যা সরজমিন তদারক করিবার জন্য কোনো বেসরকারী ইংরেজ অগ্রসর হন নাই। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের আনুপূর্বিক ইতিহাস বর্ণনা এ গ্রন্থের পক্ষে অনাবশ্যক। ইংরেজ-বুয়র শাসক শ্রেণী ভারতীয়দের প্রতি বর্ণবৈষম্যহেতু যেসব আইন প্রচার করেন, তাহা অমান্য করিবার যে আন্দোলন গান্ধীজির নেতৃত্বে চলে, তাহাই সত্যাগ্রহ বা passive resistance movement নামে ইতিহাসখ্যাত। সংগ্রামের অন্তে ১৯১৪ সালের গোড়ায় গান্ধীজির সহিত তথাকার নেতা

১ '*Creative Unity*' quoted by Radhakrishnan, *Contemporary Philosophy*, p 103.

জেনারেল স্মাটসের[১] একটা রফানিষ্পত্তি হয়। অতঃপর গান্ধীজি স্থির করেন যে, যেহেতু ভারতের অধিবাসীগণ ও আফ্রিকার ঔপনিবেশিকগণ একই বৃটিশরাজ্যের অধীন, তখন উভয়ের মধ্যে শান্তিরক্ষার দায় ইংরেজ গবর্মেণ্টেরই; তিনি ইংরেজের ঔপনিবেশিক দপ্তরের সচিবের সহিত বুঝাপড়া করার জন্য বিলাত রওনা হইয়া গেলেন। আফ্রিকা ত্যাগ করিবার পূর্বে তিনি স্থির করিয়া ফেলেন যে ইংলণ্ড হইতে ভারতেই ঘুরিয়া তিনি আসিবেন। কিন্তু তাঁহার Phoenix বিদ্যালয়ের ছাত্রদের লইয়া তাঁহার সমস্যা— তিনি যেপর্যন্ত না দেশে ফেরেন, তাহাদের কোথায় রাখিবেন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে কোনো বিশেষ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করা হইত না; কঠিন কায়িক পরিশ্রমের সহিত ধর্ম ও নীতি শিক্ষা এবং সাধারণ পাঠ্যাভ্যাস ছিল আবশ্যিক। গান্ধীজির পুত্রেরাও ইহার ছাত্র।

ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্র অধ্যাপক প্রায় কুড়ি জন। ভারতে আসিয়া প্রথমে তাহারা হরিদ্বার গুরুকুলে আশ্রয় লাভ করে। অতঃপর এণ্ড্রুসের মধ্যস্থতায় তাহাদের নভেম্বরের (১৯১৪) শেষভাগে শান্তিনিকেতনে আনা হয়। গান্ধীজির বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পঠনপাঠন শিক্ষা-শাসন আহার-বিহার ধরণ-ধারণ সবই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের হইতে পৃথক্, এবং সেই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াই তাহারা এখানে থাকে। পৃথক্‌ভাবে থাকিতে দিতে রবীন্দ্রনাথ কোনো আপত্তি করেন নাই। ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে তামিল ও গুজরাটি বেশি। অধ্যাপকদের মধ্যে স্বর্গীয় মগনলাল গান্ধী ছিলেন গুজরাটি, কোটাল ছিলেন মারাঠি, রাজঙ্গম— তামিল। কিছুকাল পূর্বে মারাঠি কাকা কালেলকর (জন্ম ১৮৮৫) আশ্রমে আসিয়াছিলেন। তিনি ভারতের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইবার জন্য ঘুরিতেছিলেন। আশ্রমে তিনি ছাত্রদের পড়াইতেন। এমন সময়ে গান্ধীজি আসিলে তিনি সমস্ত মন প্রাণ দিয়া তাঁহার ফিনিক্স ছাত্রদের কাজের সহিত জড়িত হইয়া পড়েন। এই বিদ্যার্থীরা ও শিক্ষকগণ আশ্রমে নূতন প্রাণ উদ্রিক্ত করিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই সম্বন্ধে গান্ধীজিকে যে পত্র দেন, তাহা নিম্নে উদ্‌ধৃত হইল; বোধ হয় ইহাই গান্ধীজিকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম পত্র।[২]

Dear Mr Gandhi,

That you could think of my school as the right and the likely place where your Phoenix boys could take shelter when they are in India, has given me real pleasure— and that pleasure has been greatly enhanced when I saw those dear boys in that place. We all feel that their influence will be of great value to our boys and I hope that they in their turn will gain something which will make their stay in Shantiniketan fruitful. I write this letter to thank you for allowing your boys to become our boys as well and thus from a living link in the *Sadhana* of both of our lives.

Very Sincerely Yours
Rabindranath Tagore

পৌষ-উৎসবের পূর্বদিন (৬ পৌষ ১৩২১) কবি এলাহাবাদ হইতে বোলপুর ফিরিলেন ও শান্তিনিকেতন মন্দিরে যথাবিধি প্রাতে-সন্ধ্যায় দুইবার উপাসনা করিলেন। উৎসবের ভাষণের মধ্যে এবারও য়ুরোপীয় মহাসমরের প্রলয়ংকর পরিণামের কথা আলোচনা করেন; কারণ ইতিপূর্বে মানবের সকলপ্রকার মহত্ত্ব এরূপ নিষ্ঠুরভাবে লাঞ্ছিত

১ Smutts, Jan Christian (1870-1950) বুয়র আইন ব্যবসায়ী। বুয়র যুদ্ধের অন্যতম সেনাপতি। যুদ্ধশেষে দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়ন গঠনের অগ্রণী। প্রধানমন্ত্রী ১৯১৯-২৪, ১৯৩৯-৪০। দার্শনিক, *Holism and Evolution* গ্রন্থের লেখক (১৯২৬) ১৯১০-২০ প্রতিরক্ষা-মন্ত্রিত্বকালে গান্ধীজির সহিত আলোচনা হয়।

২ গান্ধী-জয়ন্তী (অক্টোবর ১৯৪৪) উপলক্ষ্যে যে গ্রন্থ *Gandhiji, His life and Work* প্রকাশিত হয় তাহার মধ্যে এই পত্রখানির facsimile কপি আছে (পৃ. ৩৭)।

হয় নাই। সংকীর্ণ জাতীয়তার মোহ য়ুরোপকে যে ভাবে বিভ্রান্ত করিতেছে, তাহাই ছিল কবির মনের পুরোভাগে।[১]

তখনকার দিনে পৌষ-উৎসব ছিল একদিনের ব্যাপার; মেলা বসিত একদিনের জন্য। আটই পৌষ হইত প্রাক্তন ছাত্র-অধ্যাপকদের মিলন-সভা; নয়ই পৌষ আশ্রম-সম্পৃক্ত মৃতাত্মাদের স্মরণদিন; দশই হইত খৃষ্টোৎসব। এবার খৃষ্টোৎসবে মন্দিরে উপাসনায় কবি যাহা বলিলেন, তাহা তাঁহার নূতন ধর্মচেতনার উপলব্ধ বাণী— "সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের হাত থেকে বিষ্ণুকে, সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মের হাত থেকে ব্রহ্মাকে উদ্ধার করে নেবার জন্যে [মানুষকে] বিশেষভাবে সাধন করতে হয়। আমাদের আশ্রমে আমরা সম্প্রদায়ের উপর রাগ করে সত্যের সঙ্গে বিরোধ করব না। আমরা খ্রীষ্টধর্মের মর্মকথা গ্রহণ করবার চেষ্টা করব— খৃষ্টানের জিনিষ ব'লে নয়, মানবের জিনিষ ব'লে।"[২]

এই খৃষ্টোৎসবের দিন হইতে কবির ভাবগঙ্গায় কাব্যের নূতন জোয়ার আসিল, দীর্ঘকাল তাহা প্রবাহিত হয়। খৃষ্টোৎসবের ভাষণ দানের পর উপহার (১০ পৌষ) শীর্ষক কবিতাটি রচিত হয়। এই কবিতাটির মধ্যে কবির সঙ্গহারা নৈর্ব্যক্তিক জীবনের একটি দীর্ঘশ্বাস যেন শোনা যায়। রবীন্দ্রনাথের ভালোবাসা চিরদিনই অনাসক্ত।

কবিতাটিকে সাধারণভাবেই গ্রহণ করা যাইতে পারে, কোনো আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কয়েক দিন পূর্বে কবি এলাহাবাদ হইতে এণ্ড্রুসকে একখানি পত্র লেখেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্‌ধৃত করিলে কবির নৈর্ব্যক্তিক মনোভাবটি স্পষ্ট হইবে। সেই ভাবটিই 'উপহার' কবিতার নিহিতার্থ।

এণ্ড্রুস সাহেব যে ভক্তি উচ্ছ্বাস প্রীতি বলে কবিকে একান্ত করিয়া পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত হইয়াছিলেন এবং প্রতিদানে কবির নিকট হইতে যে পরিমাণ স্নেহ আশা করিতেছিলেন উভয়ই রবীন্দ্রনাথের স্বভাববিরুদ্ধ ধর্ম; কবি-চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য বুঝিতে এণ্ড্রুসের অনেক সময় লাগিয়াছিল। বিশেষ মানুষ যখন একটা idea-রূপে কবির মনে উদিত হইত, তখনই তাহা ভাবে ও ভাষায় মূর্ত হইয়া উঠিত— সামান্যভাবে মানুষ সামান্য ক্ষেত্রেই থাকিত। 'উপহারে'র (বলাকা ১০) একটি স্থানে আছে—

এ-দীপের আলো এ যে নিরালা কোণের,
শুব্ধ ভবনের।
তোমার চলার পথে এরে নিতে চাও জনতায়?
এ যে হায়
পথের বাতাসে নিবে যায়।

রবীন্দ্রনাথ এণ্ড্রুসকে লিখিতেছেন, "My love is bare and reticent. It was gaudily covered in its youthful flowering season, bulging with gifts in its fruitful maturity; but now that its seed-time has come, it has burst its shell and is abroad in the air;...So when you come and shake the bough for it, it will not answer; for it is not there. But if you can believe in its silence, and accept it in silence, you will not be disappointed". —*Letters to a friend*, 18 Dec. 1914.

আমার যা শ্রেষ্ঠধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে,
দেখা দেয়, মিলায় পলকে।...

১ দীক্ষার দিন, আবির্ভাব, অন্তরতর শান্তি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৬ শক মাঘ। শান্তিনিকেতন ১৭শ খণ্ড। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬।

২ খৃষ্টধর্ম, সবুজ পত্র ১৩২১ পৌষ, পৃ ৫৯০-৫৯৫। খৃষ্ট, পৃ ২১-২৭।

বন্ধু, তুমি সেথা হতে আপনি যা পাবে
আপনার ভাবে,
না-চাহিতে না-জানিতে সেই উপহার
সেই তো তোমার।
আমি যাহা দিতে পারি সামান্য সে দান—
হোক ফুল, হোক তাহা গান।

পূর্বোদ্ধৃত পত্র মধ্যে আরও আছে—"I have a strong human sympathy, yet I can never enter into such relations with others as may impede the current of my life, which flows through the darkness of solitude beyond my ken. I can love, but I have not that which is termed by phrenologists "adhesiveness"...I have a force acting in me, jealous of all attachments, a force that ever tries to win me for itself, for its hidden purpose.

মানবপ্রীতি তাঁহার খুবই প্রবল, কিন্তু তিনি কাহারও সহিত এমন সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন না, যাহা তাঁহার জীবন-প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে।

'উপহার' কবিতাটি লিখিবার দুই দিন পরে লেখেন 'বিচার' (১২ পৌষ)। মহাযুদ্ধের নৃশংসতার কথা কিছুতেই মন হইতে মুছিতে পারিতেছেন না; উন্মত্ত মানব আজ নানা মনোমুগ্ধকর নাম লইয়া দেবতাকে অপমান করিতেছে—তাহার গায়ে ধূলি নিক্ষেপ করিতেছে।[১] সেই বেদনা হইতে কবিতাটির উদ্ভব।[২]

তোমারে কাঁদিয়া তবে কহি বারম্বার—
এদের মার্জনা করো, হে রুদ্র আমার।
চেয়ে দেখি মার্জনা যে নামে এসে
প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার বেশে;
সেই ঝড়ে
ধুলায় তাহারা পড়ে;
চুরির প্রকাণ্ড বোঝা খণ্ড খণ্ড হয়ে
সে-বাতাসে কোথা যায় বয়ে।
হে রুদ্র আমার,
মার্জনা তোমার
গর্জমান বজ্রাগ্নিশিখায়,
সূর্যাস্তের প্রলয়লিখায়,
রক্তের বর্ষণে,
অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে।

১ তু. "তোমায় কিছু দেব বলে" ইত্যাদি, (গীতবীথিকা ১৩২৬)। দেখেছিলাম হাটের লোকে তোমাকে দেয় গালি। গায়ে তোমার ছড়ায় ধুলাবালি (গীতবিতান পৃ. ৩০) বিচার (বলাকা ১১) কবিতায় আছে—যখন তোমার গায়। কারা সবে ধুলা দিয়ে যায়। আমার অন্তর করে হায় হায়।

২ বিচার কবিতাটির ইংরেজি তর্জমা (Judgement) করিয়া কবি খৃষ্ট-জন্মদিনের স্মরণলিপি রূপে এণ্ড্রুসকে উপহার পাঠাইয়া দেন। —*Letters to a friend*, p 52.

মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে কবি শান্তিনিকেতন মন্দিরে 'পাপের মার্জনা' নামে যে উপদেশ দেন (৯ ভাদ্র ১৩২১) তাহার মধ্যে এই কবিতার ভাবটি নিহিত ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "আজ এই-যে যুদ্ধের আগুন জ্বলেছে এর ভিতরে সমস্ত মানুষের প্রার্থনাই কেঁদে উঠছে···বিশ্বপাপ মার্জনা করো। আজ যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে সে যেন ব্যর্থ না হয়। রক্তের বন্যায় যেন পুঞ্জীভূত পাপ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যখনই পৃথিবীর পাপ স্তূপাকার হয়ে উঠে তখনই তো তাঁর মার্জনার দিন আসে। আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে দহনযজ্ঞ হচ্ছে তার রুদ্র আলোকে এই প্রার্থনা সত্য হোক: বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব।"[১] মার্জনা শব্দকে কবি দুই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, পাপ দূর হইলে বিধাতার আশীর্বাদ নামে; পাপ দূর করিবার জন্য তিনি অশনি হানেন।

পরদিন 'দেওয়া নেওয়া' (১৩ পৌষ ১৩২১, বলাকা ১২) নামে যে কবিতাটি লিখিলেন, তাহার সুর পূর্বদিনের রচিত কবিতা হইতে পৃথক্ হইলেও তৎপূর্বে রচিত 'উপহার' (দান) কবিতাটির সমসূত্রে উহাকে গাঁথা যাইতে পারে। যে উপহার বা দানের কথা সেদিন মনে হইয়াছিল, সে তো একটি দিকের কথা! সে-দিন প্রশ্ন ছিল 'নিজ হাতে কী তোমারে দিব দান?' কবির হাতে চিরস্থায়ী সম্পদ বলিয়া তো কিছু নাই, তাই এই প্রশ্ন। তাঁহার যে সম্পদ তাহা কোনো এক অজ্ঞাত মুহূর্তে অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিয়া উঠে, আবার মিলাইয়া যায়। তাঁহার অন্তরের গান, তাঁহার অন্তরের আনন্দ অজ্ঞাতসারে প্রিয়কে স্পর্শ করে। সেই তাঁহার উপহার। কিন্তু যখন প্রিয়তমের জন্য দান আছে— তখন প্রিয়তমের নিকট হইতে প্রতিদানও তো আসিবে। 'দেওয়া নেওয়া' সম্পূর্ণ না হইলে তো পরিপূর্ণ মিলন হয় না। তাই যে অভিঘাতে উপহার (দান) কবিতাটি লিখিত হইয়াছিল তাহারই পরিপূর্তি (compliment) রূপ লইল 'দেওয়া-নেওয়া' কবিতায়। সেখানে 'গেল দিন এই কথা নিত্য ভেবে ভেবে'। 'দেবে তুমি মোরে দেবে।' 'বিশ্বজগৎ কেবলই আমাকে অসংখ্য অজস্র দানে অভিভূত করিতেছে; ক্ষণমাত্র ধ্যানস্থ হইয়া যদি ভাবি তখনই দেখিব চারিদিক হইতে, যুগযুগান্ত হইতে আমারই জন্য কত দানের আয়োজন হইয়াছে, মন স্তম্ভিত না হইয়া পারে না।'

'দিলে, তুমি দিলে, শুধু দিলে;
কভু পলে পলে তিলে তিলে
কভু অকস্মাৎ বিপুল প্লাবনে
দানের শ্রাবণে

কিন্তু এইখানে অবসান নহে। মন বলে

লবে তুমি, মোরে তুমি লবে, তুমি লবে,
এ প্রার্থনা পুরাইবে কবে।

কবি-চিত্তের শেষ আকাঙ্ক্ষা,

আমার কণ্ঠের মালা তোমার গলায় প'রে
লবে মোরে লবে মোরে
তোমার দানের স্তূপ হতে
তব রিক্ত আকাশের অন্তহীন নির্মল আলোতে।

যদি কোনো বস্তুগত প্রেরণা হইতে উপহার কবিতাটির জন্ম হইয়া থাকে, তবে তাহা বস্তুতন্ত্রতাকে ছাপাইয়া যেখানে পৌঁছিয়া গিয়াছে সেখানে তাহা বিশুদ্ধসত্ত্ব, চিরসুন্দর, অখণ্ড সৌন্দর্যের প্রতীক। এই ভাবটি গতি পাইয়া নূতন রূপ লইয়াছে দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে যেখানে চাওয়া-পাওয়া এক হইয়াছে— সমস্ত আপাতবিরুদ্ধ সংঘাতের

১ পাপের মার্জনা, ৯ ভাদ্র ১৩২১, শান্তিনিকেতন ১৭শ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬, পৃ ৪৯৪।

মধ্যে। সমস্তের অদৃশ্য ফল্গুস্রোত চলিয়াছে ‘ফাল্গুনী’র দিকে। যেদিন এই কবিতাটি রচিত হয় সেইদিনই লেখেন—

বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা, নিয়ো হে নিয়ো।
হৃদয় বিদারি হয়ে গেল ঢালা, পিয়ো হে পিয়ো।
ভরা সে পাত্র তারে বুকে ক’রে বেড়ানু বহিয়া সারা রাতি ধরে,
লও তুলে লও আজি নিশিভোরে প্রিয় হে প্রিয়॥
বাসনার রঙে লহরে লহরে রঙিন হল।
করুণ তোমার অরুণ অধরে তোলো হে তোলো।
এ রসে মিশাক তব নিশ্বাস নবীন উষার পুষ্পসুবাস—
এরি ’পরে তব আঁখির আভাস দিয়ো হে দিয়ো।[১]

ইহার পর, কয়েকটি দিনের ব্যবধানে নূতন কবিতা-ধারা শুরু হইল। বলাকা ১৩ হইতে ৩৩ সংখ্যক কবিতাগুলি ২৩ পৌষ (১৩২১) হইতে ২৭ মাঘের মধ্যে লিখিত। ইহারই অন্তে পক্ষকালের ব্যবধানে শুরু হইল ‘ফাল্গুনী’র গান।

বলাকার কাব্যধারা নূতন রূপ পরিগ্রহ করিল ‘যৌবনের পত্র’ হইতে।[২] কবি সেদিন লিখিলেন —

পউষের পাতা-ঝরা তপোবনে
আজি কী কারণে
টলিয়া পড়িল আসি বসন্তের মাতাল বাতাস ···
বহু দিনকার
ভুলে-যাওয়া যৌবন আমার
সহসা কী মনে ক’রে
পত্র তার পাঠায়েছে মোরে
উচ্ছৃঙ্খল বসন্তের হাতে
অকস্মাৎ সংগীতের ইঙ্গিতের সাথে
লিখেছে সে —
এস এস চলে এস বয়সের জীর্ণ পথশেষে,
মরণের সিংহদ্বার
হয়ে এসো পার ;
ফেলে এসো ক্লান্ত পুষ্পহার।

জরার মধ্যে যৌবন, শীতের মধ্যে বসন্ত ও মৃত্যুর মধ্যে অমরতা যে সুপ্ত — এই তত্ত্বটি আজ কবির মনে ক্রমেই স্পষ্টভাবে উঁকি মারিতেছে। ‘বলাকা’র অনেকগুলি কবিতার মধ্যে বসন্তের এই আগমন-রহস্য কবি নানাভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। যৌবনের জয়গান— ‘সবুজের অভিযানে’ সূত্রপাত— দুরন্ত আশা বারে বারে কবিচিত্তকে উতলা করে। এবারও দেখি ‘যাত্রা’ (২৯ পৌষ) কবিতায় কবির সেই চলার জয়গান।

১ সবুজ পত্র ১৩২২ আষাঢ়, পৃ ১৬০। এই গানটি ‘শোধবোধ’-এ (১৩৩২) প্রকাশিত হয়। স্বরলিপি, অনাদিকুমার দস্তিদার, প্রবাসী ১৩৩৩ কার্তিক।

২ ২৩ পৌষ ১৩২১ (১৯১৫ জানু ৭) সুরুল। সবুজ পত্র ১৩২২ আষাঢ়, পৃ. ১৬২-৬৩। বলাকা ১৩ নং ‘পউষের পাতা-ঝরা তপোবনে’ ইত্যাদি।

যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি
ততক্ষণ জমাইয়া রাখি
যত কিছু বস্তুভার।...
ততক্ষণ
চারিদিকে নেমে নেমে আসে আবরণ;
দুঃখের বোঝাই শুধু বেড়ে যায় নূতন নূতন;
এ জীবন
সতর্ক বুদ্ধির ভারে নিমেষে নিমেষে
বৃদ্ধ হয় সংশয়ের শীতে পক্ককেশে।
যখন চলিয়া যাই সে-চলার বেগে...
পুণ্য হই সে-চলার স্নানে,
চলার অমৃতপানে
নবীন যৌবন
বিকশিয়া ওঠে প্রতিক্ষণ।
আমি চিরযৌবনেরে পরাইব মালা,
হাতে মোর তারি তো বরণডালা।
ফেলে দিব আর সব ভার,
বার্ধক্যের স্তূপাকার
আয়োজন।

কবির দৃষ্টিতে আপাত-বিপরীত সকল সংজ্ঞা সমন্বিত। কবিতায় কবির মনে এই তত্ত্বই অন্য ভাষায় রূপ পাইয়াছে। অল্পকাল পরে 'ফাল্গুনী' নামে যে অপরূপ নাটক লিখিবেন, তাহারই আয়োজন অবচেতনে চলিতেছে।

রবীন্দ্রদর্শনে বলা হইয়াছে রূপ-অরূপ স্থিতি-গতি বস্তু ভাবনা পৃথক পৃথক সত্তা নহে— একই অখণ্ডতার ভিন্ন রূপ বা সংজ্ঞা মাত্র। এই কবিতাগুলির মধ্যে 'রূপ' (২৭ পৌষ ১৩২১, বলাকা ১৬ নং) কবিতাটি বিশেষভাবে বিচার্য। আমরা একটু পূর্বেই এসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি। গতিবাদ ও স্থিতিতত্ত্বের নানা রূপ কবিতায় মূর্তি লইতেছে। গতিকে যদি idea বা ভাবনা বলা যায় তবে স্থিতিকে বস্তু বলা যাইতে পারে। জগতে দেখা যায় বস্তু স্থির নাই— বিজ্ঞানও সে কথা বলে, ইতিহাসও তাহা সাক্ষ্য দেয়। 'বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি' ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া অণুপরমাণুতে রূপান্তরিত হইতেছে। আবার 'মানুষের লক্ষ লক্ষ অলক্ষ্য ভাবনা, অসংখ্য কামনা' বস্তুর আহ্বানে রূপে মত্ত হইয়া উঠে। রূপ সৃষ্ট হইবার পূর্বে মনে অরূপ ভাবনারাশি ভিড় করে। সেই ভাবনা বস্তুরূপে দৃশ্য হয়। সভ্যতার প্রতীক নগরী মানুষের চিত্তের কঠিন চেষ্টা— বস্তুরূপে স্তূপে স্তূপে প্রস্তরে মর্মরে মূর্ত— ভাবনার মূর্তি তাহারা। আবার বহু যুগের অশ্রুত বাণী নীরব কোলাহলে মানবের চিত্ত মাঝে মুক্তিলাভের জন্য কী প্রয়াস না করিতেছে!—

অতীতের গৃহছাড়া কত যে অশ্রুত বাণী
শূন্যে শূন্যে করে কানাকানি; ...

তাদের নীরব কোলাহলে
অস্ফুট ভাবনা যত দলে দলে ছুটে চলে
মোর চিত্তগুহা ছাড়ি,
দেয় পাড়ি
অদৃশ্য অন্ধ মরু, ব্যগ্র ঊর্ধ্বশ্বাসে
আকারের অসহ্য পিয়াসে।

'জীবনমরণ' কবিতাটি ঐ দিনেই (২৯ পৌষ, বলাকা ১৯ নং) লেখা। স্থিতি ও গতির কথা রূপ লইয়াছে জীবন ও মরণ সংজ্ঞায়— কারণ জীবন স্থিতি, আর মরণেই তো গতি। কবির অন্তরে উভয়েই সমন্বিত। তাই তিনি বলিতেছেন—

এমন একান্ত করে চাওয়া
এও সত্য যত
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেই মতো।
এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল;
নহিলে নিখিল
এতবড়ো নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না।

কবির আসল কথাটিই এই— অনন্ত গতি ও অচল স্থিতি যদি সত্য হইত, তবে তো সৃষ্টির কার্যই স্তব্ধ হইত। ফাল্গুনীর মধ্যে আছে, "এই জায়গাটাতে এসে শুনতে পাচ্ছি জগৎটা কেবল 'পাব' 'পাব' বলছে না— সঙ্গে সঙ্গেই বলছে, 'ছাড়ব, ছাড়ব'। সৃষ্টির গোধূলিলগ্নে 'পাব'-র সঙ্গে 'ছাড়ব'-র বিয়ে হয়ে গেছে রে— তাদের মিল ভাঙলেই সব ভেঙে যাবে।"[১] Whitehead-এর ভাষায় জীবন is a seamless coat।

সেদিনই (২৯ পৌষ) কবি কলিকাতায় চলিয়াছেন; পথে লিখিলেন 'যাত্রাগান' (বলাকা ২০) কবিতা। এটিতে কবিতা হইতে গানের রূপ অধিক স্পষ্ট। যাবার পথে মনের মধ্যে পথের যে ছাপটি আঁকা পড়ে, সেটিই মুক্তিলাভ করে 'অগ্রণী' (৮ মাঘ, বলাকা ২১) কবিতায়। এই কবিতাটির মধ্যে ফাল্গুনীর গানের আভাস কী পরিমাণে সুস্পষ্ট তাহা কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করিলে বুঝা যাইবে—

ওরে তোদের ত্বরা সহে না আর?
এখনো শীত হয় নি অবসান।
পথের ধারে আভাস পেয়ে কার
সবাই মিলে গেয়ে উঠিস গান?
ওরে পাগল চাঁপা, ওরে উন্মত্ত বকুল,
কার তরে সব ছুটে এলি কৌতুকে আকুল।
মরণপথে তোরা প্রথম দল,
ভাবলি নে তো সময় অসময়।

১ ফাল্গুনী, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২, পৃ. ১৩৩।

রবীন্দ্রসাহিত্য-পাঠক এই পংক্তি কয়টিতে কোন্ গানের আভাস আছে তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন।

'অগ্রণী' কবিতা সম্বন্ধে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে একদা তিনি ও কবি রেলপথে কলিকাতায় ফিরিতেছিলেন; রেলগাড়িতে আসিতে আসিতে কবি দেখিলেন যে রেললাইনের দুইধারে বুনো গাছে অসংখ্য ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই ফুলের সমারোহ দেখিয়া কবি তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ, কবে বসন্ত আসিবে তাহার খবর লইয়া এইসব বসন্তের দূত আসিয়া হাজির হইয়াছে। ইহারা দুদিন বাদেই ঝরিয়া মরিয়া যাইবে, ইহাদের সঙ্গে বসন্তের সাক্ষাৎ ঘটিবে না। কিন্তু ইহারা যে বসন্তের আগমনী তাহাদের রূপে গন্ধে মধুতে গাহিয়া যাইতে পারিল এই আনন্দেই তাহারা অকালমরণ বরণ করিয়া লইতেছে হাসিমুখেই। ইহাদের সম্বর্ধনা করিয়া আমার কবিতা লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে।" কয়েকদিন পরে 'অগ্রণী' কবিতাটি লেখেন।[১] এই পর্বের শেষ রচনা এইটি। 'যৌবনের পত্র' দিয়া ইহার শুরু, 'অগ্রণী'তে তার সারা; প্রকৃতির মধ্যে যে সৌন্দর্য যে যাওয়া-আসার নীরব বাণী সদাই ধ্বনিতেছে, তাহাই এই কয়েকটি কবিতার মর্মকথা; ফাল্গুনীর অগ্রদূত ইহারা।

কলিকাতায় দিন সতেরো ছিলেন— ইহার মধ্যে যে একটিমাত্র কবিতা (অগ্রণী, ৮ মাঘ) লেখেন, তাহার কথা এখনি বলিলাম। কলিকাতায় সময় যায় নানা কাজে। এই সময়ের প্রধান কাজ ৬ই মাঘ ও ১১ই মাঘের উপাসনা। কিন্তু মন উদ্‌ভ্রান্ত করিবার মত নানা সংবাদ পান এখানে আসিলেই। তাঁহার ভক্ত সাহিত্যরসিকদের মারফত সাময়িক সাহিত্যে তাঁহার সম্বন্ধে যেসব আলোচনা চলে, তাহার বিস্তৃত ও বিকৃত খবর ও অখবর শুনিতে পান; প্রতিপক্ষীয়েরা কী বলিতেছে না-বলিতেছে তাহার অতিরঞ্জিত বিবৃতিও কানে পৌঁছায়। এই সবের জন্য কবির মন এবার কলিকাতায় কিছুতেই টিকিতেছে না, শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া যাইতেও ভালো লাগিতেছে না; তাই পদ্মাতীরে (১৮ই মাঘ) শিলাইদহ গেলেন। এবার উঠিলেন নৌকায়— কুঠিবাড়িতে নয়। সেইদিন এণ্ড্রুসকে যে পত্র লিখিতেছেন, তাহাতে তাঁহার মনের অবসাদ ও ক্লান্তির কথা অত্যন্ত স্পষ্ট। কলিকাতায় তাঁহার শরীর ভালো ছিল না, ফলে সামান্য আঘাত অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া উঠিতেছিল। সমালোচকদের আক্রমণ ও আঘাত তাঁহাকে যে উদ্‌ভ্রান্ত করে সে কথা খুবই স্পষ্ট করিয়া পত্র মধ্যে বলিয়াছেন। তিনি লিখিলেন যে, পদ্মতীরে আসিয়া তিনি পুনরায় সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন, এবং আরও এক শত বৎসর বাঁচিতে তিনি ইচ্ছুক যদি তাঁহার সমালোচকগণ তাঁহাকে রেহাই দেন। এণ্ড্রুসকে লিখিত পত্রখানি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

You are right. I had been suffering from a time of deep depression and weariness. But I am sane and sound again, and willing to live another hundred years, if critics would spare me. At that time I was physically tired; therefore the least hurt assumed a proportion that was perfectly absurd. However, I am glad that there is still that child in me, who has its weakness for the sweets of human approbation. I must not feel myself too far above my critics. I don't want my sit on the dais; let me sit on the same bench with my own audience and try to listen as they do. I am quite willing to know the healthy feeling of disappointment when they don't approve of my things; and when I say "I don't care!" let nobody believe me.।[২]

শিলাইদহে কবির সঙ্গে এবার আসিয়াছেন তিনজন শিল্পী। নন্দলাল বসু (জন্ম ১৮৮২) মুকুলচন্দ্র দে (জন্ম ১৮৯৫) ও সুরেন্দ্রনাথ কর (জন্ম ১৮৯৩)। নন্দলাল তখনই যশস্বী; মুকুলচন্দ্র শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ছাড়িয়া (১৯১২)

১ রবিরশ্মি, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৯-৭০।

২ *Letters to a Friend*, p. 54 Shileida. February 1st, 1915 (১৮ মাঘ ১৩২১)।

অবনীন্দ্রনাথের নিকট শিক্ষানবিসিতে আছেন। সুরেন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র বাইশ বৎসর— মুকুলের বিশ। কবি এই তরুণ শিল্পীদের পাইয়া বড়ই আনন্দ পাইয়াছেন—"their enthusiasm of enjoyment adds to my joy"।

যাহাই হউক, কবি শিলাইদহে আসিয়া কলিকাতার বেদনা সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে পারেন নাই। কাব্যলক্ষ্মী পদ্মাতীরে দেখা দিলেন পুনরায়— একটির পর একটি কবিতা লিখিয়া চলিলেন— নয় দিনে বারোটি কবিতা লিখিলেন (বলাকা ২২-৩৩)। শিলাইদহে পৌঁছিবার পর দিন লিখিলেন 'মুক্তি' কবিতা (১৯ মাঘ ১৩২১, বলাকা ২২)। মানুষ তাহার কাজের জন্য সমাদরই চায়; পাছে অসাবধানে ভুলচুক হয়— সেজন্য কতই না তার চেষ্টা! কিন্তু দেখা গেল তবুও আঘাত আসে। তাই যেন বলিলেন—

মুক্তি, এবার মুক্তি আজি
উঠল বাজি
অনাদরের কঠিন ঘায়ে,
অপমানের ঢাকে ঢোলে সকল নগর সকল গাঁয়ে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিচারশীল মনে কোনো আঘাতই স্থায়ী হয় না, তাঁহার মন অল্পকালের মধ্যেই বস্তুজগৎ হইতে ভাবলোকে যাত্রা করিয়া চলিল; তাই বলিতেছেন—

এতদিনে আবার মোরে
বিষম জোরে
ডাক দিয়েছে আকাশ পাতাল।
লাঞ্ছিতেরে কে রে থামায়।
ঘর-ছাড়ানো বাতাস আমায়
মুক্তিমদে করল মাতাল।

সমস্তের মধ্যে মানুষের মন যখন জড়াইয়া থাকে তখন সে আপনার স্বরূপটিকে জানিতে পারে না, বাহিরকেও দেখিতে পায় না। যেদিন সেই আবরণ ঘুচিয়া যায়—

গর্ভ ছেড়ে মাটির 'পরে
যখন পড়ে
তখন ছেলে দেখে আপন মাকে।

কোনো বস্তুকে দেখিতে গেলেই বস্তু হইতে বাহিরে দাঁড়াইতে হয়; সুতরাং দ্বৈতভাব ব্যতীত কোনো বিষয় বা বস্তু আমাদের বোধের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। 'উপহার' (দান) 'দেওয়া-নেওয়া' হইতে যে দ্বৈতভাব কবিতার মধ্যে দেখা দিয়াছে, তাহাই যেন ধাপে ধাপে স্পষ্টতর ও বিচিত্রতর হইতেছে। 'দুই নারী' (বলাকা ২৩) কবিতায় সৃষ্টির দুইটি মূর্তি কবিমানসে ভাসিয়া উঠিয়াছে - একটি সুন্দরী, অপরটি কল্যাণী— একটি প্রিয়া রূপী, অপরটি মাতৃরূপী— বহুবৎসর পরে কল্পিত শর্মিলা-উর্মিলা— এখানেও সেই দ্বৈতভাবের রূপায়ণ।

এই দ্বৈতভাব হইতে মানুষের কল্পনা গড়ে তোলে স্বর্গ ও মর্ত্যকে— স্বর্গের উর্বশী ও ধরার প্রিয়াকে। কিন্তু কবির প্রশ্ন— "স্বর্গ কোথায় জানিস কি তা ভাই। ফিরেছি সেই স্বর্গে শূন্যে শূন্যে ফাঁকির ফাঁকা ফানুস।" কবি 'স্বর্গ হইতে বিদায়' চাহিয়াছিলেন, বৈকুণ্ঠের গান শুনিবার জন্য তাঁহার কোনো পিপাসা ছিল না, তাঁহার স্বর্গে—'মাটির প্রদীপখানি জ্বলে মাটির ঘরের কোণে'। তাই তিনি বলাকার এই 'স্বর্গ' (বলাকা ২৪) কবিতায় বলিলেন—

স্বর্গ আমার জন্ম নিল মাটি-মায়ের কোলে
বাতাসে সেই খবর ছোটে আনন্দ-কল্লোলে।

কবির স্বর্গ এই ধরণীর ধুলি দিয়া গড়া বাস্তব, অতিবাস্তব স্বর্গ। এই দ্বৈতভাবটি পরিপূর্ণ রূপকে মূর্তি লইয়াছে 'তুমি আমি' (২৫ মাঘ, বলাকা ২৯) কবিতায়—'যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা আপনাকে তো হয়নি তোমার দেখা।' আর-একদিন একটি গানেও এই কথাটি বলিয়াছিলেন 'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হতো যে মিছে'। আমরা যেমন ভগবানকে চাই, ভগবানও তেমনি মানুষকে চান—এই বৈষ্ণব ভাবটি ভারতের অন্যতম সাধনপন্থা; মহাভিক্ষুরূপে বিধাতা দ্বারে আসেন, এই ভাবটি কবি বহু কবিতায় ও 'শান্তিনিকেতনে'র উপদেশমালায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এখানেও লিখিতেছেন—

আমায় দেখবে ব'লে তোমার অসীম কৌতূহল,
নইলে তো এই সূর্যতারা সকলি নিষ্ফল।

কিন্তু কবি যাহাকে 'তুমি' বলিয়া এমন আত্মীয়ের মত সম্বোধন করিলেন, তাহাকে বলিতেছেন 'অজানা' (বলাকা ৩০)—

তার পরে যেই ফুরিয়ে যাবে বেলা, ভাসিয়ে দেব ভেলা
তার পরে তার খবর কী যে ধারিনে তার ধার গো,
তার পরে সে কেমন আলো, কেমন অন্ধকার গো।

এই সংশয় ও আশ্বাসের দোলায় আধ্যাত্মিক জীবন যথার্থভাবে আগাইয়া চলে। একমাস পূর্বে রচিত জীবন-মরণ (বলাকা ১৯) কবিতাটি ইহারই সহিত পুনরায় আর-একবার পড়িতে অনুরোধ করি। তাই না আশ্বাস দিয়া (পূর্ণের অভাব, ২৭ মাঘ ১৩২১, বলাকা ৩১) বলিতেছেন—

এমনি করেই দিনে দিনে
আমার চোখে লও যে কিনে
তোমার সূর্যোদয়।

এবারকার মত শেষ কবিতা 'প্রেমের বিকাশে' (২৭ মাঘ, বলাকা ৩৩) শেষ কথাটি বলিয়া কবি যেন ক্ষান্ত হইলেন। ভগবান অপেক্ষা করিয়া আছেন আমারই জন্যে—

জানি আমার পায়ের শব্দ রাত্রে দিনে শুনতে তুমি পাও,
খুশি হয়ে পথের পানে চাও।···
তোমার লাজুক স্বর্গ আমার গোপন আকাশে
একটি করে পাপড়ি খোলে প্রেমের বিকাশে।

যে দ্বৈতবোধ 'দেওয়া-নেওয়া'র মধ্যে অনুভূত হইয়াছিল, তাহা নানাভাবে ও নানারূপে মনের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিতেছে— কখনো সংশয়ে, কখনো ভক্তিতে। এই বিচিত্র রসের অনুভূতি কবি ও সাধকের বা কবি-সাধকের পক্ষেই সম্ভব। বলাকার এই পর্বের শেষ কবিতা রচিত হয় ২৭ মাঘ; তার পর মাত্র পনের দিনের ব্যবধানে ফাল্গুনীর (১২ ফাল্গুন) গানের পালা শুরু হইল।

ফাল্গুনীর পর্ব

মাঘোৎসবের পর কবি শিলাইদহে গিয়াছিলেন এবং সেখানে যে কবিতাগুলি লেখেন তাহার কথা পূর্বাধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। মাঘের শেষেই কলিকাতায় ফিরিলেন। ১লা ফাল্গুন (১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫) বঙ্গীয় হিতসাধন-মণ্ডলীর উদ্‌বোধন-সভার অধিবেশন হয়।[১] সভাপতি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। রবীন্দ্রনাথকে এই সভায় উপস্থিত হইতে হয় এবং ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ডাঃ নীলরতন সরকার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তাদের অন্যতম রূপে একটি একটি ভাষণ দান করিতে হয়। এই কথিত বক্তৃতার সারমর্ম সবুজপত্রের (১৩২১ ফাল্গুন) 'কর্মযজ্ঞ'[২]। এই হিতসাধনমণ্ডলী প্রতিষ্ঠানের উদ্‌যোক্তা ছিলেন ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র। ডাক্তার মৈত্রের সহিত কবির বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ডাঃ মৈত্র যখন কলিকাতার মেয়ো হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক, তখন তাঁহার বাসায় যে সাহিত্যচক্র বসিত, তাহাতে কবি বহুবার গিয়াছিলেন। তারপর বিলাতযাত্রার সময় একত্র হইবার কথা ছিল; কবি সেবার যাইতে পারেন নাই। তবে বিলাতে গিয়া তাঁহারা পুনরায় মিলিত হন ও আমেরিকা-যাত্রাপথে ইনি ছিলেন কবির সহযাত্রী। ডাঃ মৈত্র দেশে ফিরিয়া দেখেন জনসেবার যে আদর্শ লোকমধ্যে প্রচারিত ও অনুসৃত হইতেছে তাহা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রতিক্রিয়ামুখী। জনসমাজের হিতসাধনের সংকল্প গ্রহণ করিয়া ডাঃ মৈত্র ১২ই মাঘ (১৩২১) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে প্রথম সভা আহ্বান করেন।

রবীন্দ্রনাথ হিতসাধনমণ্ডলীর প্রথম সভাধিবেশনের দিনে যে কথা কয়টি বলিয়াছিলেন তাহা তাঁহার পুরাতন মতের নূতন আলোচনা মাত্র নহে — তাহার মধ্যে এ যুগের মনোভাবটি প্রকাশ পাইয়াছিল। এই শ্রেণীর লোক-হিতকর প্রচেষ্টা বহুবার নিষ্ফল হইয়াছে বলিয়াই "আমাদের বের করতে হচ্ছে কোন্ জায়গায় আমাদের যথার্থ দুর্বলতা।" তাঁহার বক্তব্য যে অন্য দেশের সহিত তুলনার দ্বারা বা অন্য জাতির কর্মপদ্ধতির অনুকরণের দ্বারা আমাদের কোনো লাভ নাই। "বহিশ্চক্ষু মেলে অন্য দেশের কর্মরূপকে আমরা দেখেছি, কিন্তু কর্তাকে দেখিনি— কেননা নিজের ভিতরকার কর্তৃশক্তিকে আমরা মেলতে পারিনি।" এই শেষ বাক্যটিই রবীন্দ্রনাথের কর্মযজ্ঞের মূল কথা, চিরদিনের কথা — অর্থাৎ লোকের মধ্যে যে সুপ্ত শক্তি রহিয়াছে তাহাকে উদ্‌বোধিত করিবার প্রয়াসই যথার্থ কর্ম, কতক-গুলি লোকহিতকর অনুষ্ঠান মাত্র নহে। য়ুরোপ লোককল্যাণ করিতে গিয়া যেভাবে বৈজ্ঞানিক নিয়মের চাপে মানুষকে পিষিয়া মারিতেছে, তাহার রূপ তো প্রকট— মহাযুদ্ধ তাহার দৃষ্টান্ত। "কিন্তু, আমাদের দেশে আমরা একেবারে উল্টো দিক থেকে মরছি— আমরা শয়তানের কর্তৃত্বকে হঠাৎ প্রবল করতে গিয়ে মরি নি; আমরা মরছি ঔদাসীন্যে, আমরা মরছি জরায়। প্রাণের প্রতি প্রাণের যে সহজ ও প্রবল আকর্ষণ আছে আমরা তা হারিয়েছি,··· তাই আমরা এবার যৌবনকে আহ্বান করছি। ···দেশের যৌবন— যে যৌবন নূতনকে বিশ্বাস করতে পারে, প্রাণকে নিত্য অনুভব করতে পারে" সেই দেশকে বাঁচাইতে পারিবে।···"কর্মের মন্থনদণ্ডের নিয়ততাড়নায় তবেই আমাদের সকলের মধ্যে যে শক্তি ছড়িয়ে আছে তাকে আমরা ব্যক্ত আকারে পাব; তাতেই আমাদের জাতীয় ব্যক্তিত্ব অমর হয়ে উঠবে, আমাদের চিন্তা বাক্য এবং কর্ম সুনির্দিষ্টতা পেতে থাকবে। ··· কাজে লাগলেই তর্ককীটের আক্রমণ ও পাণ্ডিত্যের পণ্ডতা থেকে রক্ষা পাব।" রবীন্দ্রনাথ প্রবল আশাবাদী; তাই তিনি বলিলেন, "দেশে আজ প্রচণ্ড শক্তি শিশুবেশে এসেচে। আমরা তা অন্তরে অনুভব করছি। যদি তা না অনুভব করি তবে বৃথা জন্মেছি এই দেশে,

১ 'উদ্বোধন' নামে একখানি পুস্তিকায় বক্তৃতাগুলি প্রকাশিত হয়। এই সব তথ্যের জন্য আমি ডাঃ দ্বিজেন্দ্র মৈত্রের নিকট ঋণী।

২ কালান্তর (১৩৪৪ বৈশাখ)। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, সংযোজন পৃ. ৩৮৭-৩৯২।

বৃথা জন্মেছি এই কালে। এমন সময়ে এ দেশে জন্মেছি যে-সময়ে আমরা একটা নূতন সৃষ্টির আরম্ভ দেখতে পাব।"[১] রবীন্দ্রনাথ দ্রষ্টা, তাই দেশের পরম দুর্গতির সময়ে ঘোষণা করিলেন, "অরুণলেখা তো পূর্বগগনে দেখা দিয়েচে — ভয় নেই, আমাদের ভয় নেই।"[২]

যৌবনের জয়গানের সুরের রেশ কয়েকদিনের মধ্যেই 'ফাল্গুনী' নাটিকায় নবযৌবনের দলের অভিযানের রূপকে মূর্তি লইল। বলাকার কবিতায় যে যৌবনের উচ্ছল গতিধর্মের কথা ছন্দে গাঁথিয়াছিলেন, তাহারই নূতন রূপ। গদ্যে যাহা বলিবেন দার্শনিক ভাবে ছন্দে তাহা রূপ দিবেন কবিরূপে, কিন্তু সেই ভাবনারাশি সংগীতের মধ্যে মুক্তি না পাইলে যেন পরম তৃপ্তি হয় না। তাই চারিদিকের উদ্‌ভ্রান্তিকর প্রতিকূলতার মধ্যে মন রসের ও রূপকের মধ্যে ডুবিল।

কবি এবার শান্তিনিকেতনে না থাকিয়া সুরুলের নূতন বাড়িতে গিয়া উঠিলেন। বোধ হয় আশ্রমের নানা প্রকার উত্তেজনা তাঁহার ভালো লাগিতেছে না। সুরুলের নির্জনতার মধ্যে বসন্তোৎসব নাটিকাটি লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কবি লিখিতেছেন, "আশ্রমের ছেলেবুড়ো সবাই ধরেছে বসন্ত-উৎসবের উপযোগী একটা ছোটো নাটক রচনা করে দিতে হবে।…গানের সুরগুলো মস্তিষ্কের মৌচাকটার মধ্যে গুন্ গুন্ করতে লেগে গেছে। এমন সময়ে ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ দিল্লী থেকে বারাকপুর আসিলেন বাংলা সফর উপলক্ষ্যে; কবির নিমন্ত্রণ আসিল। কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন, কারণ ফাল্গুনীর গান ঘুরছে মনের মাঝে। ডাঃ মৈত্রকে লিখিলেন, "এক-দিকে আমাকে সরস্বতী তাগিদ করছেন, তার উপরে রাজলক্ষ্মীও পেয়াদা পাঠিয়েছেন— তার উপরে আবার ভারত-লক্ষ্মীও যদি দরজা ঠেলাঠেলি করেন তাহলে আমার আর আশা নেই। অতএব তিনটির মধ্যে প্রথমটিকেই মানতে হচ্ছে, তাকে এড়ানো আমার পক্ষে সোজা নয়। তাই … রইল বারাকপুর, রইল আপনার সভা। কবির অবস্থা এখন এমনতর যে ডাক্তারের আয়ত্তের বাইরে।" উহা শেষ হয় ৪ মার্চ। পরদিন আশ্রমবাসীদের নিকট পড়িয়া শুনাইলেন। উহা তখন 'বসন্তোৎসব' নামেই পঠিত হয়।[৩]

কবির কলিকাতা-যাত্রার দিন দুই পূর্বে গান্ধীজি পুণা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। এই বার দুই মহাপুরুষের প্রথম সাক্ষাৎকার হইল (৬ মার্চ ১৯১৫)। পাঠকদের স্মরণ আছে, গত অগ্রহায়ণ মাসে গান্ধীজির দক্ষিণ-আফ্রিকাস্থ ফিনিক্স

১ সবুজ পত্র ১ম বর্ষ ১৩২১ ফাল্গুন, পৃ ৭৬৭। কালান্তর, রবীন্দ্ররচনাবলী ২৪, সংযোজন পৃ. ৩৮৯-৩৯১।

২ এই পত্রে জানিতে পারা যায় যে অর্জুন শেঠি নামে একটি রাজপুত বালককে আশ্রমে আশ্রয় দান করায় তিনি খুব সুখী হইয়াছেন। বালকটির পিতা প্রতাপ শেঠি রাজনৈতিক আন্দোলন করার অপরাধে জয়পুর দরবার-কর্তৃক কারারুদ্ধ হন। পিতার উপর রাজপুরুষের দৃষ্টি পড়ায় বালকটি নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে এবং এণ্ড্রুসের মধ্যস্থতায় আশ্রমে থাকিবার ব্যবস্থা হয়। এইরূপ নিপীড়িতকে কবি বহুবার আশ্রয় দিয়াছেন। দ্র *Letters to a friend*, Calcutta, 18 February 1915 [৬ ফাল্গুন ১৩২১]।

৩ বসন্তোৎসব [ফাল্গুনী] নাটিকার গানগুলি কবে কবে রচিত তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১২ ফাল্গুন— ওগো দখিন হাওয়া; ছাড়্ গো তোরা ছাড়্ গো

১৩ ফাল্গুন— এবার তো যৌবনের কাছে; আয় রে তবে মাত্ রে সবে আনন্দে

আকাশ আমায় ভরল আলোয়, আমরা খুঁজি খেলার সাথী, আমরা নূতন প্রাণের চর, ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি, বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম

১৪ ফাল্গুন আর নেই যে দেরি

১৫ ফাল্গুন এতদিন যে বসে ছিলেম

২০ ফাল্গুন তোমায় নূতন করেই পাব বলে

২১ ফাল্গুন চোখের আলোয় দেখেছিলেম

দুদিন পরেই কবি কলিকাতা যাত্রা করিলেন; পথে লিখিলেন 'ফাল্গুনী'র আরও দুইটি গান—

২৩ ফাল্গুন ওগো নদী, আপন বেগে; চলি গো, চলি গো, যাই গো চ'লে

বিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকেরা শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন। দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে গান্ধীজি ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন তথাকার ঔপনিবেশিক বিভাগের মন্ত্রীর সহিত ইউনিয়নবাসী ভারতীয়দের অবস্থার আলোচনার জন্য। বোম্বাই পৌঁছিবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি জানিতেন না যে, তাঁহার ছাত্রেরা ও পুত্রগণ শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ে আশ্রয় পাইয়াছে। গান্ধীজি ও কস্তুরাবাঈ ৫ ফাল্গুন (১৩২১) বোলপুর আসিয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথ তখন কলিকাতায়। তাঁহার নির্দেশমত আশ্রমের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ এই পূজ্যপাদ অতিথির যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বাংলাদেশের একটি নিভৃত গ্রামপ্রান্তরে শালবীথিতলে গান্ধীজি যে অনাড়ম্বর সহৃদয় অভিনন্দন পাইয়াছিলেন, তাহার কথা তিনি কোনোদিন বিস্মৃত হন নাই।[১] কিন্তু আশ্রমে দুই দিন থাকিতেই সংবাদ পাইলেন গোখ্‌লের মৃত্যু (১৯ ফেব্রুয়ারি) হইয়াছে। গোখ্‌লেকে গান্ধী গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন; দক্ষিণ-আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় এই মহামতি নেতাই সর্বপ্রথম স্বচক্ষে বিদেশে ভারতীয়দের দুরবস্থা দেখিবার জন্য গিয়াছিলেন। গান্ধীজি যখন বিলাত হইতে ফিরিলেন, তখনই গোখ্‌লে পীড়িত; বোলপুরে আসিবার পূর্বে তিনি তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছিলেন।

পুণা হইতে ২২ ফাল্গুন (৬ মার্চ) গান্ধীজি পুনরায় বোলপুর আসিলেন। আশ্রম পরিদর্শন করিয়া, চারিদিকের অপরিচ্ছন্নতা তাঁহার চোখে পড়িল; পাচক-ভৃত্য-সেবিত ছাত্রদের আত্মশক্তি প্রয়োগচেষ্টার অভাব দেখিয়া গান্ধীজি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিতেছেন, "আমার স্বভাব অনুযায়ী আমি বিদ্যার্থী ও শিক্ষকদিগের সহিত মিলিয়া গিয়াছিলাম। আমি তাঁহাদের সহিত আত্মনির্ভরতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলাম। বেতনভোগী পাচকের পরিবর্তে যদি বিদ্যার্থী ও শিক্ষকেরা নিজেই রান্না করেন তবে ভাল হয়। উহাতে পাকশালার স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষকদিগের হাতে আসে, বিদ্যার্থীরা স্বাবলম্বী হয় এবং নিজে হাতে পাক করিবার ব্যবহারিক শিক্ষাও লাভ করে। এই সকল কথা আমি শিক্ষকদিগকে জানাইলাম। দুই একজন শিক্ষক মাথা নাড়িলেন। কাহারও কাহারও এই পরীক্ষা ভাল মনে হইল। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে জানাইলে তিনি বলিলেন, শিক্ষকেরা যদি অনুকূল হন তবে এ পরীক্ষা তাঁহার নিজের খুব ভাল লাগিবে। তিনি বিদ্যার্থীদিগকে বলিলেন, ইহাতেই স্বরাজের চাবি রহিয়াছে।"[২]

গান্ধীজির কথা ও কাজ বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে আশ্রমবাসীদের অধিকাংশেরই ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইল না। অথচ যে স্বাবলম্বন-শক্তি অধ্যাপকগণের মধ্যে উদ্‌বোধিত করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ এতাবদ্‌কাল চেষ্টান্বিত ছিলেন, এবং যাহাকে আশ্রমবাসীরা প্রসন্নচিত্তে কোনোদিনও জীবনধর্মের অন্তর্গত করিতে পারেন নাই, তাহা আজ উত্তেজনার মুহূর্তে নূতনত্বের মোহে ও অভাবিতের প্রত্যাশায় সকলে কিভাবে অনুমোদন ও গ্রহণ করিলেন, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। ইহার কারণ ছিল; কবি যাহা বাণীর দ্বারা আদর্শরূপে প্রচার করিয়াছিলেন, লোকে তাহাকে গান্ধীজির জীবনে কর্মরূপে বাস্তব মূর্তিতে পাইল, তাই তাহাদের এমন আকর্ষণ। কিন্তু এই স্বাবলম্বন-নীতি আধুনিক সভ্যজীবনে পালন করা কতদূর সম্ভব, তাহা ভাবিবার অবকাশ কাহারও হইল না। রবীন্দ্রনাথ সুরুলে আছেন; কবির সহিত আশ্রম-সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ও তাঁহার অনুমোদন পাইয়া তবে গান্ধীজি আশ্রমবাসীদিগকে এই কর্মে প্রবৃত্ত করিলেন। শান্তিনিকেতনের পাকশালায় ও ভোজনগৃহে তখন পর্যন্ত হিন্দুসমাজের জাতিবিচার মানিয়া চলা হইত। কবির সহিত কথাবার্তায় এই আলোচনাটি উঠে। গান্ধীজি বলেন যে তাঁহার মতে আশ্রমের সকলে সমানভাবে থাকিবে,

১ "The teachers and students overwhelmed me with affection; the reception was a beautiful combination of simplicity, art and love."

২ গান্ধীজির আত্মকথা (বঙ্গানুবাদ) ২য় ভাগ, পৃ ২১২।

আহারে বিহারে অশনে আসনে কোনো প্রকার পার্থক্য থাকা উচিত নহে। তখনকার দিনে ব্রাহ্মণ ছাত্ররা পৃথক্ পংক্তিতে ভোজন করিত, বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা এবিষয়ে ছাত্রদের কখনো কোনো উপদেশ দিতেন না, ছাত্রেরা নিজ নিজ অভিভাবকের নির্দেশানুসারে পংক্তিবিচার করিত। গান্ধীজি বলিলেন, এভাবে পৃথক্ পংক্তি ভোজন করা আশ্রমধর্ম-বিরোধী। রবীন্দ্রনাথ তদুত্তরে বলেন যে, তিনি কোনোদিন ছাত্রদের ধর্ম বা সমাজবিষয়ক মত সম্বন্ধে বল-প্রয়োগ করেন নাই। জোর করিলে আপাতদৃষ্টিতে তাহারা নিয়ম পালন করিবে নিশ্চয়ই, কিন্তু তাহা তাহাদের অন্তরে গাঁথা হইয়া যাইবে না। যে-জিনিস অন্তর হইতে গৃহীত হয় না, তাহা বাহিরের চাপে স্থায়ী ফলপ্রদ হয় না। সেইজন্য তিনি বাহির হইতে নৈতিক চাপের পক্ষপাতী নহেন।

বলা বাহুল্য, গান্ধীজি কবির এই মতবাদকে গ্রহণ করেন নাই। পরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সত্যাগ্রহ আশ্রমে এই নৈষ্ঠিকতা কী রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, গান্ধীজির জীবনী-পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন।

যাহাই হউক, রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন পাইয়া ছাত্ররা (১০ মার্চ ১৯১৫। ২৬ ফাল্গুন ১৩২১) স্বেচ্ছাব্রতী হইয়া আশ্রমের সকল প্রকার কর্ম করিবার দায় গ্রহণ করিল—রান্নাকরা জলতোলা বাসনমাজা ঝাড়ুদেওয়া এমনকি মেথরের কাজ পর্যন্ত। অধ্যাপকদের মধ্যে সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, এণ্ড্রুস, পিয়ার্সন, নেপালচন্দ্র রায়, অসিতকুমার হালদার, অক্ষয়কুমার রায়, প্রমোদারঞ্জন ঘোষ ও লেখক প্রভৃতি অনেকেই সেদিন সহযোগিতা করিয়াছিলেন; করেন নাই এমন লোকও ছিলেন। ১০ই মার্চ দিনটি এখনো 'গান্ধীদিবস' বলিয়া শান্তিনিকেতনে পালিত হয়; সেদিন প্রাতে পাচক চাকর মেথরদের ছুটি দিয়া ছাত্র ও অধ্যাপকেরা সকল প্রকার কাজ আপনাদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লইয়া মহোৎসব করেন।

স্বাবলম্বননীতি প্রবর্তনের পরদিন (১১ মার্চ) গান্ধীজি রেঙ্গুন চলিয়া গেলেন; কুড়ি দিন পরে ফিরিয়া ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্র ও কর্মীদের লইয়া হরিদ্বারে কুম্ভমেলা দেখিতে চলিয়া গেলেন। শান্তিনিকেতনের সহিত গান্ধীজির বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্বন্ধ ছিল প্রায় চারি মাস।[১]

এদিকে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় তাঁহার সদ্যরচিত 'ফাল্গুনী'র নাটিকাখানি সাহিত্যিক বন্ধুমহলে পড়িয়া শোনাইয়া পুনরায় কয়েকদিনের মধ্যেই বোলপুর ফিরিয়া আসিলেন। এবারও সুরুলে গিয়া উঠিলেন। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে গান্ধীজি-প্রবর্তিত স্বকর্মকরণ-নীতি পূর্ণবেগে চলিতেছে। কবি সুরুল হইতে আশ্রমে প্রায়ই আসেন, কিন্তু সেখানকার হট্টগোলের মধ্যে বাস করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

ইতিমধ্যে তৎকালীন বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেলের আশ্রম পরিদর্শনের কথা হইল।[২] ইতিপূর্বে কোনো বিশিষ্ট রাজকর্মচারী শান্তিনিকেতন দেখিতে কখনো আসেন নাই। অধস্তন রাজপুরুষরা রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার বিদ্যালয়কে কী সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন, তাহার দুই-একটি ঘটনা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কবির আন্তর্জাতিক সম্মানলাভের পর হইতে স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে তাঁহার বিদ্যালয় সম্বন্ধে কৌতূহল দেখা দিল। এণ্ড্রুস ও

১ রেঙ্গুনে গান্ধীজি উঠেন মেঠা নামক জনৈক ধনী গুজরাটির বাড়িতে। শ্রীযুক্ত মেঠা ছিলেন ডাক্তার ও ব্যারিস্টার। তাঁহার তিন পুত্র—মগললাল, ছগনলাল ও রতিলাল আশ্রমের ছাত্র ছিলেন; শ্রীযুক্ত রাজঙ্গম ছিলেন তাঁহাদের বিশেষ শিক্ষক।

২ লর্ড কারমাইকেল বাংলাদেশের প্রথম গবর্নর; ১৯১২ সালের এপ্রিল মাসে বঙ্গচ্ছেদ রদ হইয়া গেলে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ জোড়া লাগে; তবে বিহার উড়িষ্যাকে পৃথক করিয়া নূতন প্রদেশ গঠিত হয়। সেই নয়া প্রদেশের প্রথম গবর্নর হন লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ও বঙ্গদেশে হন লর্ড কারমাইকেল। ১৯১৪ সালের জানুয়ারি মাসে কলিকাতার লাট ভবনের দরবারে রবীন্দ্রনাথ ইঁহার নিকট হইতে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। কারমাইকেল ভারতীয় আর্ট ও শিল্পের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

Carmichael : Sir Thomas David Gibson, Baron Carmichael of Skirling : 1859-1926 ; Governor of Victoria, Australia 1908-11 ; Madras 1911-12 ; Bengal 1912-17.

পিয়ার্সনের ন্যায় উচ্চশিক্ষিত দুইজন ইংরেজ আশ্রমের কাজে যোগদান করায় রাজপুরুষরা বুঝিলেন যে কবির বিদ্যালয়টি কোনো প্রকার উগ্র রাজনীতিচর্চার কেন্দ্র নহে।

কারমাইকেলকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য শান্তিনিকেতনে নানাবিধ আয়োজন হইতে লাগিল; প্রথমে আম্রকুঞ্জে একটি বেদি নির্মিত হয়; উহা এখনো 'কারমাইকেল বেদি' নামে পরিচিত। এই সময়ে মন্দিরে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়; মন্দিরের প্রবেশপথে দুইপার্শ্বে ছত্র পাদুকাদি রাখিবার জন্য দুইটি ঘর ছিল; ঘরের সম্মুখে কোরিন্থিয়ান স্টাইলে নির্মিত দুইটি স্তম্ভে 'ব্রাহ্মধর্মের বীজ' খোদিত দুইটি প্রস্তর ফলক ছিল; মন্দির হইতে বাহির হইলে সে দুইটি লেখা চোখে পড়িত। ঘর দুইটি ভাঙিয়া ও স্তম্ভ দুইটি নিশ্চিহ্ন করিয়া প্রস্তর ফলক দুইটি প্রবেশদ্বারের দুই পার্শ্বে স্থাপিত হয়, তদবস্থায় উহা আজও দেখা যায়। ছাতিমতলায় মহর্ষির বেদি বলিয়া যে আসন ছিল তাহার সম্মুখে 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্' খোদিত শ্বেতপাথরের একটি খিলান ছিল, সেটি সেখান হইতে উঠাইয়া কারমাইকেল বেদির সম্মুখে স্থাপিত করা হইল; সেটি এখন নাই।

এইসব ভাঙাভাঙি অনেকেরই ভালো লাগে নাই। তাঁহাদের অভিযোগ মহর্ষির কাজে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। কিন্তু আসলে তাহা সত্য নহে। মহর্ষি মন্দির কখনো চোখে দেখেন নাই, এবং যে ছাতিম গাছের তলায় তিনি উপাসনা করিতেন, সেখানে তিনি কোনো শিলাসন বা বেদি নির্মাণ করেন নাই। আমরা পুরাতন পুস্তকে ছাতিমতলার যে ছবি দেখিতে পাই, তাহাতে মহর্ষি কোনোদিন বসেন নাই। সেই সময়কার ধনীদের রুচি অনুসারে বিলাতী টালি দিয়া স্থানটি বাঁধানো হয়। মহর্ষির সাধনার সহিত শান্তিনিকেতনের মন্দিরের বা ছাতিমতলার টালি-বাঁধানো বেদির কোনো সম্বন্ধ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর পৌত্তলিকতায় কখনো শ্রদ্ধাবান ছিলেন না। কবির মৃত্যুর পর সে-সবই নিশ্চিহ্ন করিয়া নূতন বেদি নির্মিত হইয়াছে।

২০শে মার্চ ১৯১৫ (৬ চৈত্র ১৩২১) লর্ড কারমাইকেল ও তাঁহার পত্নী শান্তিনিকেতন দেখিয়া আসেন। এই সময় হইতে বাংলায় যিনিই গভর্নর হইয়া আসিয়াছেন, তিনিই রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকা কালে একবার-না-একবার শান্তিনিকেতন দেখিয়া গিয়াছিলেন। এমনকি কবির তিরোধানের পরেও এইটি প্রায় একটি সরকারী রীতির ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বোধ হয় সার জন হার্বাট ও বারোজ ছাড়া সকলেই শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

কারমাইকেল চলিয়া যাইবার পরদিন কবি বলাকা পর্বের এবারকার মত শেষ কবিতা— 'খোলা জানালায়' (নং ৩৪) লিখিলেন। ইহার কয়েকদিন পরে তাঁহাকে কলিকাতায় গিয়া 'বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী'র প্রথম অধিবেশনে 'পল্লীর উন্নতি' বিষয়ে এক বক্তৃতা করিতে হয় (২৮ চৈত্র ১৩২১)। কথিত বক্তৃতাটি কবি পরে 'প্রবাসী'র জন্য লিখিয়াছেন।[১]

এই বক্তৃতায় গ্রাম-সংস্কার সম্বন্ধে কবি তাঁহার বহুকালের অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেন এবং যে-কথা 'স্বদেশীসমাজ' হইতে বারে বারে বলিয়া আসিয়াছেন, তাহাই আরও আন্তরিকতার সহিত প্রকাশ করিলেন। স্বদেশীযুগের আরম্ভ ভাগে তিনি একবার তাঁহার জমিদারিতে পল্লীমঙ্গলের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইয়াছিলেন। এইবার পুনরায় সেখানে যে সংস্কারকার্য শুরু করিলেন, যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিব।

এদিকে শান্তিনিকেতনে নানাপ্রকার অব্যবস্থার মধ্যে 'ফাল্গুনী' নাটিকার অভিনয়-আয়োজন চলিতেছে। অধ্যাপক ও ছাত্রেরা ভৃত্য-পাচকহীন আশ্রমে যাবতীয় কর্ম লইয়া ব্যাপৃত। তদুপরি কালবৈশাখী ঝড়ে যে প্রকাণ্ড টিনের চালের ঘরে সকলে আহার করিতেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে উড়িয়া গেল। এত কষ্টের মধ্যেও ছাত্র-অধ্যাপকদের আনন্দের অভাব হয় নাই। সন্ধ্যার সময়ে যথারীতি 'নাট্যঘরে' অথবা দিনেন্দ্রনাথের ঘরে ফাল্গুনীর মহড়া বসিত;

১ পল্লীর উন্নতি, প্রবাসী ১৩২২ বৈশাখ, পৃ ১৫-২০।

দিনেন্দ্রনাথ তখন থাকিতেন হলঘরের (প্রাক্‌কুটির) পশ্চিম প্রান্তস্থিত একখানি ঘরে ; সে ঘর এখন নাই, স্থানটি এখন লাইব্রেরির অন্তর্গত।[১]

ইস্টারের ছুটিতে 'ফাল্গুনী' অভিনয় হইল। চৈত্র মাসের 'সবুজ পত্রে' সমগ্র বইটি মুদ্রিত হইয়াছিল। এই অভিনয় নানা দিক হইতে স্মরণীয়। প্রথমেই ইহার সাজসজ্জার মধ্যে এমন-একটি অকৃত্রিমতা আড়ম্বরশূন্যতা নিরাভরণ সৌন্দর্য ছিল— যাহা অচিরে বাংলাদেশের নাট্যমঞ্চের উপর নীরবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ অন্ধ বাউলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।[২]

সবুজ পত্রে 'ফাল্গুনী' প্রকাশিত (১৩২১ চৈত্র) হইলে সমসাময়িক সাহিত্যে তেমন কোনো চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে নাই— সেটি হয় পর-বৎসর, যখন ইহা নূতন ভূমিকা সহ কলিকাতায় অভিনীত হয় ; গ্রন্থ আকারেও সেই সময়ে উহা প্রকাশিত হয়। ফাল্গুনী নাটিকা রচনার ভূমিকা[৩] কিভাবে কবির মনে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইয়াছিল— তাহার আভাস আমরা দিয়াছি। বলাকার পর্বে উহা রচিত হয় ; সুতরাং ঐ কাব্যগুচ্ছের ভাবধারায় এই নাটিকার পটভূমির সন্ধান মিলিবে। আবার এযুগের সাময়িক সাহিত্যে লোকহিত, সাহিত্যে বাস্তবতা, কাব্যে নীতিপ্রচার, শিল্পে স্বাদেশিকতা প্রভৃতি যেসব বিচিত্র আলোচনা চলিতেছিল, তাহাও এই নাটিকায় রূপ লইয়াছে।

'ফাল্গুনী'র উপাখ্যান ও রূপক অতি সামান্য ও সরল। বসন্তে নবযৌবনের দল প্রাণের আবেগে ঘরছাড়া হইয়া পড়িয়াছে। দলের মধ্যে প্রবীণ 'দাদা' প্রাণের চাঞ্চল্যে শ্রদ্ধাহীন ; দাদার বয়স সব চেয়ে কম। সে সবে চতুষ্পাঠী হইতে উপাধি লইয়া বাহির হইয়াছে। এখনো বাহিরের হাওয়া তাকে বেশ করিয়া লাগে নাই। এইজন্য সে সবচেয়ে প্রবীণ। আশা আছে বয়স যতই বাড়িবে সে অন্যদের মতই কাঁচা হইয়া উঠিবে। বিশ ত্রিশ বৎসর সময় লাগিতে পারে। তিনি উপদেশপূর্ণ চৌপদী রচনা করিয়া তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করেন— লোকের উপকার হইবে, এই তাঁহার ধারণা। নবযৌবনের দল তাহাতে কর্ণপাত করে না। তাহাদের নেতা জীবন-সর্দার। কথাপ্রসঙ্গে স্থির হইল, জগতের চিরকালের যে-বুড়োটা যৌবন-উৎসবের আলোটাকে ফুঁ দিয়া নিবাইয়া অন্ধকার করিয়া দেয়, তাহাকে বন্দী

১ এই সময়ে যাদব নামে একটি তরুণ প্রিয়দর্শন বালক টাইফয়েডে মারা যায়। পিয়ার্সন তাহাকে খুব স্নেহ করিতেন। তাহারই নামে পিয়ার্সন তাঁহার লিখিত Shantiniketan (Macmillan, 1916) উৎসর্গ করেন। এই সময়ে আশ্রমের চিকিৎসক ছিলেন বিনোদবিহারী রায়, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ জামাতা। বিনোদবিহারী সম্বন্ধে কবি একখানি পত্রে লিখেছিলেন যে এতদিন আশ্রমে চিকিৎসক ছিল — কিন্তু এখন আশ্রমে সেবক আসিয়াছে। সত্যই তাঁহার চিকিৎসা ও বিশেষভাবে তাঁহার সেবাযত্নে আরোগ্যশালা রূপান্তরিত হইয়াছিল। যাদবের পীড়ার সময়ে কবির অনুরোধে কলিকাতা হইতে ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য আসিয়া কয়েকদিন আশ্রমে থাকিয়া যান (৩০ মার্চ ১০ এপ্রিল ১৯১৫)। পিয়ার্সনের সেবার কথা মনে আছে : কিন্তু সকল চেষ্টা ও চিকিৎসা ব্যর্থ করিয়া বালকটি মারা গেল (১০ এপ্রিল)। ছাত্র অধ্যাপকগণই পালাক্রমে রোগীর সেবা করিতেন—তাহাই ছিল আশ্রমের সমাজধর্ম। বিনোদবিহারী গ্রীষ্মের ছুটির পর আশ্রমের কাজ ত্যাগ করেন ও খাশিয়া পাহাড়ে খাশিয়াদের মধ্যে সেবাকার্য গ্রহণ করেন। ১৯৩৫ সালে সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি ব্রহ্মসংগীত তিনি খাশিয়া ভাষায় অনুবাদ করেন।

২ ৺জগদানন্দ রায় 'দাদা', ৺ক্ষিতিমোহন সেন 'চন্দ্রহাস', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'সর্দার', ৺শরৎকুমার রায় 'মাঝি', ৺কালিদাস বসু 'কোটাল', সন্তোষ মিত্র 'অনাথ কলু' এবং ৺দিনেন্দ্রনাথ, ৺সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, ৺অজিতকুমার চক্রবর্তী, অসিতকুমার হালদার প্রভৃতি 'ঘরছাড়া নবযৌবনে'র দলে নামেন।

৩ গানের দিক হইতে তথ্য হিসাবে একটি মন্তব্য করিবার আছে। পাঠকের স্মরণে আছে যে 'গীতালি'র গানের ধারা শেষ হইয়াছিল এলাহাবাদে ৩রা কার্তিক (১৩২১) : সেইদিনই শুরু হয় বলাকার পালা, সেই ধারা চলে ২৯শে মাঘ পর্যন্ত। কয়েকটি দিনের ব্যবধানে শুরু হইল ফাল্গুনীর গান : ২৯টি গান ইহাতে আছে, অধিকাংশ রচিত হয় ১২-২০শে ফাল্গুনের মধ্যে। তার পর বলাকার একটি কবিতা (নং ৩৪ খোলা জানালার) ২১শে চৈত্র সুরুলে বাসকালে লেখেন ; ইহার পর সাত মাস বলাকার কোনো কবিতা রচিত হয় নাই।

করিয়া আনিয়া এবার বসন্ত-উৎসবের খেলা খেলিতে হইবে। নবযৌবনের দল যুগে যুগে এই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার দুরাশায় ছুটিয়াছে— গৃহের বন্ধন তাহাদিগকে আগলাইতে পারে নাই ; পিছন হইতে বিবেচক দাদার দল অবিবেচনার প্রতীক এই নও-জোয়ানদের চিরদিনই শাসন করিয়াছে, শাসাইয়াছে, হুঁশিয়ার করিয়াছে।

কবি 'দাদা'কে উপহাসাস্পদ করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাহাকেই সম্মান দান করিলেন, তাহার শেষ চৌপদী নবযৌবনেরই পূর্ণতার কথা—

সূর্য এল পূর্ব দ্বারে তূর্য বাজে তার।
রাত্রি বলে, ব্যর্থ নহে এ মৃত্যু আমার,
এত বলি' পদপ্রান্তে করে নমস্কার।
ভিক্ষাঝুলি স্বর্ণে ভরি গেল অন্ধকার।

নাটিকার মর্মকথা বা জীবনমরণের মূল কথাটুকু এই চৌপদীর মধ্যেই দাদা প্রকাশ করিয়াছেন।

দাদাকে যদি বিশুদ্ধ-জ্ঞানের প্রতীক বলিয়া আমরা মানি, তবে তাহার সহিত তুলনা হইতে পারে অচলায়তনের মহাপঞ্চকের— সেখানেও সে দাদা, তবে একা পঞ্চকের। সেখানে বিপ্লবান্তে আযতন পুনর্গঠনের সময়ে মহাপঞ্চকের স্থান যেমন সুনির্দিষ্ট হইল, এখানে নবযৌবনের বসন্ত-উৎসবে দাদার কণ্ঠেই নবযৌবনের দল মল্লিকার মালা পরাইল। কারণ জগতে নবযৌবনের গতি ও উদ্দাম যেমন সত্য, প্রবীণের স্থিতি ও অচঞ্চলতা তেমনি ধ্রুব ; এবং গতি-স্থিতির সংযোগে যে পরিপূর্ণতা তাহাই হইতেছে বাস্তবতা। সেইজন্য আমরা বলিয়াছিলাম যে ফাল্গুনীর মধ্যে বলাকার সুর ধ্বনিতেছে ; বলাকায় যাহা রূপ, ফাল্গুনীতে তাহা রূপক। বলাকায় যাহা ছন্দ, ফাল্গুনীতে তাহা সংগীত, চতুরঙ্গে তাহাই কাহিনী।

'ফাল্গুনী'নাটিকার মধ্যে কী নিহিতার্থ আছে তদ্বিষয়ে সমালোচকগণ তো গেবেষণা করিয়াছেন, কবি স্বয়ং উহার ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। কলিকাতায় নাটকখানির অভিনয় হইবার পর মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রের এক জবাবে কবি বলেন—

"ফাল্গুনীর ভিতরকার কথাটি এতই সহজ যে ঘটা করে তার অর্থ বোঝাতে সংকোচ বোধ হয়।

"জগৎটার দিকে চেয়ে দেখলে দেখা যায় যে, যদিচ তার উপর দিয়ে যুগ যুগ চলে যাচ্ছে তবু সে জীর্ণ নয়— আকাশের আলো উজ্জ্বল, তার নীলিমা নির্মল। ধরণীর মধ্যে রিক্ততা নেই, তার শ্যামলতা অম্লান— অথচ খণ্ড খণ্ড করে দেখতে গেলে দেখি ফুল ঝরছে, পাতা শুকচ্ছে, ডাল মরছে। জরামৃত্যুর আক্রমণ চারিদিকেই দিনরাত চলেছে, তবুও বিশ্বের চিরনবীনতা নিঃশেষ হল না। Facts-এর দিকে দেখি জরা মৃত্যু, Truth-এর দিকে দেখি অক্ষয় জীবন, যৌবন। শীতের মধ্যে এসে যে-মুহূর্তে বনের সমস্ত ঐশ্বর্য দেউলে হল বলে মনে হল সেই মুহূর্তেই বসন্তের অসীম সমারোহ বনে বনে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। জরাকে মৃত্যুকে ধরে রাখতে গেলেই দেখি, সে আপন ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে প্রাণের জয়পতাকা উড়িয়ে দাঁড়ায়। পিছনদিক থেকে যেটাকে জরা বলে মনে হয়, সামনের দিক থেকে সেইটেকেই দেখি যৌবন। তা যদি না হত তা হলে অনাদিকালের এই জগৎটা আজ শতজীর্ণ হয়ে পড়ত— এর উপরে যেখানে পা দিতুম সেইখানেই ধসে যেত।

"বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রতি ফাল্গুনে চিরপুরাতন এই যে চিরনূতন হয়ে জন্মাচ্ছে, মানুষপ্রকৃতির মধ্যেও পুরাতনের সেই লীলা চলছে। প্রাণশক্তিই মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আপনাকে বারে বারে নূতন করে উপলব্ধি করছে। যা চিরকালই আছে তাকে কালে কালে হারিয়ে হারিয়ে না যদি পাওয়া যায় তবে তার উপলব্ধিই থাকে না।

"ফাল্গুনীর যুবকের দল প্রাণের উদ্দাম বেগে প্রাণকে নিঃশেষ করেই প্রাণকে অধিক করে পাচ্ছে। সর্দার বলছে, ভয় নেই, বুড়োকে আমি বিশ্বাসই করিনে — আচ্ছা দেখ্ যদি তাকে ধরতে পারিস্ তো ধর্। প্রাণের প্রতি গভীর বিশ্বাসের জোরে চন্দ্রহাস মৃত্যুর গুহার মধ্যে প্রবেশ করে সেই প্রাণকেই নূতন করে চিরন্তন করে দেখতে পেলে।

যুবকের দল বুঝতে পারলে জীবনকে যৌবনকে বারে বারে হারাতে হবে, নইলে ফিরে পাবার উৎসব হতে পারবে না। শীত না থাকলে ফাল্গুনের মহোৎসবের মহাসমারোহ তো মারা যেত।"[১]

'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গত ফাল্গুনীর ব্যাখ্যান করিয়াছেন। শারদোৎসব অচলায়তন রাজা ডাকঘর ও ফাল্গুনীতে কবি গান ও কথোপকথনের মধ্য দিয়া খেলা ও কাজকে একই পর্যায়ের অন্তর্গত করিয়াছেন। কবির মতে ইহারই দার্শনিক নাম লীলা; রবীন্দ্রসাহিত্যের সমালোচকদের মধ্যে কেহ কেহ কবির এই দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের অভিযোগ যে, কবি জীবনের সংগ্রামকে দেখিতে পান না, লীলাটুকু মাত্র দেখেন। পাঠক ও সমালোচকদের এই সংশয় নিরাকৃত করিবার জন্য তিনি 'কবির কৈফিয়ত'[২] নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। উহা বস্তুত ফাল্গুনীরই কৈফিয়ত।

এইসব নাটিকা সম্বন্ধে আর-একটি সমালোচনা হইতেছে এই যে, ঘটনা-সমাবেশ ও কথোপকথনের মধ্য দিয়া কবি নাটকীয় রূপ দিতে সমর্থ হন নাই; সেই অভাবাত্মক দিকটা গান দিয়া পূরণ করিয়াছেন। ফলে সবগুলি রচনাই লিরিকধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। নাটক লিরিকধর্মী হইলে তাহার আসল রূপকেই সে হারায়, কারণ action ও ঘটনা স্বভাবতই এ ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়। রবীন্দ্রনাথ পরম্পরাগত নাটকরচনাপদ্ধতি যে অনুকরণ করেন নাই তাহা তো অবিসম্বাদী সত্য, বিশেষত ফাল্গুনী তো গানকে কেন্দ্র করিয়াই রচিত নাটক, বসন্তোৎসবের জন্য রচিত। কথোপকথন এবং নাট্যীয় বিষয় ও বস্তু গানের তুলনায় সামান্য।

চতুরঙ্গ

বলাকার এই পর্বের সমকালীন গল্পসাহিত্য হইতেছে 'চতুরঙ্গে'র গল্পচতুষ্টয়। সুতরাং ঐতিহাসিক ক্রমরক্ষার জন্য ঐ গল্পোপন্যাস আলোচনার এইই স্থান। সবুজ পত্রের প্রথম বর্ষের (১৩২১) অগ্রহায়ণ-পৌষ-মাঘ-ফাল্গুন মাসে যথাক্রমে প্রকাশিত হয় জ্যাঠামশায়, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস। গল্প চারিটি পুস্তকাকারে 'চতুরঙ্গ' নামে মুদ্রিত হয় (১৩২২ বৈশাখ। ১৯১৬)। গল্প চারিটি একটি অখণ্ড আখ্যানের চারিটি অংশ। চারিটি চরিত্রের মধ্যে জগমোহন উপন্যাসের প্রথম ভাগেই মৃত্যুযবনিকার অন্তরালে চলিয়া যায়; অবশিষ্ট তিন জনের আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্ব পরবর্তী তিনটি অংশে বিশ্লিষ্ট হইয়াছে। সমস্ত উপন্যাসের বক্তা শ্রীবিলাস, আপনার ডায়েরিতে সব কথা লিখিয়া রাখিতেছে; সে শচীশের সহপাঠী, অন্তরঙ্গ বন্ধু ও দামিনীর শেষজীবনের স্বামী।

চতুরঙ্গ রচিত হয় সবুজ পত্রের সাতটি[৩] ছোটগল্প ও একটি বৃহৎ উপন্যাস[৪] রচনার মাঝখানে ও ফাল্গুনী নাটিকার অব্যবহিত পূর্বে। ছোটগল্প ও উপন্যাসের মাঝে এটি রচিত বলিয়া ইহার মধ্যে ছোটগল্পের রীতি ও উপন্যাসের গতি দুইই স্পষ্ট। আর বলাকা পর্বে রচিত বলিয়া ঐ কাব্যের দার্শনিকতা উপন্যাসখানির মর্মকথা। চতুরঙ্গের প্রথমাংশ 'জ্যাঠামশাই'কে একটি সম্পূর্ণ ছোটগল্প বলিয়া অনায়াসে স্বীকার করা যায়; রবীন্দ্রনাথ যদি আর তিনটি অংশ না-ও লিখিতেন, তবে উহাকে গল্প হিসাবে অসম্পূর্ণ বলা যাইত না। কিন্তু জগমোহন মৃত্যু-যবনিকার অন্তরালে চলিয়া

১ স্মৃতি। শিলাইদহ, ২০ মাঘ ১৩২২, পৃ. ৮৮-৮৯। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২, গ্রন্থপরিচয় পৃ. ৬০৭-৮।

২ সবুজপত্র ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ, সাহিত্যের পথে, পৃ. ১০২-১০।

৩ হালদার গোষ্ঠী, হৈমন্তী, বোষ্টমী, স্ত্রীর পত্র, ভাই ফোঁটা, শেষের রাত্রি, অপরিচিতা।

৪ ঘরে বাইরে, ১৩২২ বৈশাখ-ফাল্গুন।

গেলেও সমগ্র কাহিনীটির মধ্যে আশ্চর্যভাবে তিনি পরিব্যাপ্ত। সমস্তটি মিলিয়া একটি যেন লিরিক হইয়াছে; সেইজন্য 'চতুরঙ্গ'কে কাব্য-উপন্যাস বলিলে দোষ হইবে না।[১]

আমাদের এই মতবাদ প্রমাণিত হইবার পূর্বে চতুরঙ্গের ভিতরের কথাটি কী তাহা জানানো দরকার। গ্রন্থখানির মূল চরিত্র শচীশ; কারণ তাহাকে কেন্দ্র করিয়া জগমোহনের সমস্ত কিছু কর্মপ্রেরণা আনন্দ; শ্রীবিলাসের বন্ধুপ্রেম অন্ধভাবে শচীশকে ঘিরিয়াই; লীলানন্দের বিজয়োল্লাস তাহাকে পাইয়াই; দামিনীর কামনাবহ্নি শচীশের জন্যই; আবার তাহার অন্তরে শান্তি নামিল শচীশের গুণেই।

বইখানিতে চরিত্রগুলির মধ্যে এমন সব বৈপরীত্যের সমাবেশ হইয়াছে যে, পাঠককে স্বতই তাহারা উদ্‌ভ্রান্ত করে। পাঠকের মনে হইতে পারে চরিত্রগুলি অস্বাভাবিক, অবাস্তব, অসংলগ্ন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে তাহার ভূমিকা করিয়াছেন 'হৈমন্তী' গল্পে। সেখানে হৈমন্তীর শ্বশুর ও শ্বশুরের পিতা সম্বন্ধে মনোবিকারের যে দুই চরম চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহারই বৃহত্তর সংস্করণ পাই জগমোহনের ও লীলানন্দের চরিত্রে। ধর্মের কিছুই না-মানা এবং ধর্মের সব-কিছুকেই নির্বিচারে স্বীকার করার চিত্র। একজন য়ুরোপীয় humanism বা মানবতা ও কর্মকেই ধর্ম বলিয়া জানে, অপর জন নব্যহিন্দুসমাজের কৃত্রিম জীবনের মধ্যে ভাবপ্রবণ তথাকথিত বৈষ্ণবতাকেই সার বলিয়া মানে। দুইটি পন্থাই যে জীবনকে নিষ্ফলতায় লইয়া যায়, সেটি উপন্যাসের ঘটনার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ভাবের সাধক, রসের সাধক, কিন্তু সে ভাব বা রসের সাধনা কঠিন জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, ধ্যানের মধ্যে সমাধিস্থ— তাহাকে কখনো বাহিরে প্রমত্ত হইতে দেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "ভাবরসের জন্যে আমাদের হৃদয়ের একটা লোভ রয়েছে।··· ক্রমে এই ভাবরস ভোগের অভ্যাসটি একটি নেশার মতো হয়ে দাঁড়ায়।" ইহারও পূর্বে 'নৈবেদ্যে'র একটি কবিতায় এই ভাবোন্মত্ততাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কৃত করিয়াছিলেন। অথচ দেখা যায় তিনি বরাবরই ভগবানকে রসস্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই রসের সাধনার অন্য দিকটার কথাও তিনি বলিয়াছেন, "এই রসটি যেখানে শুকিয়ে যায় সেখানে··· নিশ্চল কঠিনতা বেরিয়ে পড়ে।" ধর্মসাধনায় এই কঠিনতা প্রবল হইয়া উঠিলে, মানুষ আপনার সীমার মধ্যে অত্যন্ত উদ্ধত হইয়া বসিয়া থাকে; সে অন্যকে আঘাত করে, নিজের সঙ্গে অন্যের কোনোপ্রকার অনৈক্যকে এই কাঠিন্য ক্ষমা করিতে জানে না। এই কাঠিন্য মাধুর্যকে দুর্বলতা এবং বৈচিত্র্যকে মায়ার ইন্দ্রজাল বলিয়া অবজ্ঞা করে, এবং সমস্তকে সবলে একাকার করিয়া দেওয়াকেই সমন্বয় সাধন বলিয়া মনে করে।[২] কাঠিন্য বা discipline, regimentation -এর দ্বারাও যেমন সমন্বয় ঘটানো যায়, তেমনি ভাবরসের সাগরে ডুবিয়া সমস্ত ভেদকে চক্ষু মুদিয়া অস্বীকার করিয়া মনোলোকে অলীক স্বর্গরাজ্য গড়িয়া সমন্বয় সাধিত হইয়াছে বলিয়া কল্পনা করিতে পারি।

শচীশের সংগ্রাম এই উভয় জগতের অলীকতার বিরুদ্ধে। সে জীবনরসিক, সে সব জানিতে চায়, সে সব হইতে চায়— তাই তাহার এত বেদনা, এত সংশয় এত সংগ্রাম। চতুরঙ্গ পড়িতে পড়িতে পাঠকের সন্দেহ হয় যে শচীশের বুঝি নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব বা ব্যক্তিত্ব নাই। জ্যাঠামশায় যখন ছিলেন, তখন সে ছিল নাস্তিক, জ্যাঠামশায়ের চেলা; তিনি মারা গেলে সে হইল লীলানন্দ স্বামীর শিষ্য। শ্রীবিলাস বন্ধুর দশা দেখিয়া বলিল, "শচীশ, জন্মকাল হতে তুমি মুক্তির মধ্যে মানুষ, আজ তুমি এ কী বন্ধনে নিজেকে জড়ালে? জ্যাঠামশায়ের মৃত্যু কি এতবড়ো মৃত্যু?" বাহিরের লোকের তো দূরের কথা, অন্তরঙ্গ বন্ধুর মনেও আজ প্রশ্ন জাগিযাছে। উত্তরে শচীশ বলিল, "জ্যাঠামশায় যখন বাঁচিয়া ছিলেন তখন তিনি আমাকে জীবনের কাজের ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়েছিলেন, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায়

১ চতুরঙ্গ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৭, পৃ. ৪২৯-৪৯৬।

২ শান্তিনিকেতন ২য় খণ্ড ২য় সং. পৃ ৩৮৬।

খেলার আঙিনায়; জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর তিনি আমাকে মুক্তি দিয়েছেন রসের সমুদ্রে, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় মায়ের কোলে। দিনের বেলাকার সে মুক্তি তো ভোগ করিয়াছি, এখন রাতের বেলাকার এ মুক্তিই বা ছাড়ি কেন? এ দুটো ব্যাপারই আমার সেই এক জ্যাঠামশায়েরই কাণ্ড, এ তুমি নিশ্চয় জেনো।" শ্রীবিলাস বলিল, "যাই বল, এই তামাক-সাজানো পা-টেপানো এ-সমস্ত উপসর্গ জ্যাঠামশায়ের ছিল না— মুক্তির এ চেহারা নয়।" উত্তরে শচীশ বলে, "সে যে ছিল ডাঙার উপরকার মুক্তি, তখন কাজের ক্ষেত্রে জ্যাঠামশায় আমার হাত-পা'কে সচল করিয়া দিয়াছিলেন। আর এ যে রসের সমুদ্র। এখানে নৌকার বাঁধনই যে মুক্তির রাস্তা···"

"বুঝিলাম, শচীশ এমন একটা জগতে আছে আমি যেখানে একেবারেই নাই। মিলনমাত্র যে আমাকে শচীশ বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল সে-আমি শ্রীবিলাস নয়, সে-আমি 'সর্বভূত'; সে-আমি একটা আইডিয়া।"[১] আইডিয়া বা আইডিয়াল লইয়া শচীশের কারবার; সে আদর্শবাদী— সমাজের চক্ষে কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ তাহার বিচার সে কোনোদিন করে নাই। জ্যাঠামশায়ের জীবনে সে দেখিয়াছিল কর্মজীবনের আদর্শ, প্রচণ্ড গতি; কিন্তু সেই গতিতে যখন বাধা পড়িল— যখন তাহার অন্তরে অনেকখানি শূন্য করিয়া দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন, তখনই সে বুঝিতে পারিল কর্ম কখনো মানুষের মনকে পূর্ণ করিতে পারে না। সে ভাবে— মন ভরে রসের সন্ধান পাইলে, মন ভরে সেবার পথে প্রেমের মধ্যে ডুব দিলে। গতির পথ নিশ্চিহ্ন হইলে, স্থিতির পন্থাকে অত্যন্ত নিশ্চিত হইয়া গ্রহণ করা যায়।

শচীশের মন যখন এই ভাবের ঘোরে বিভোর, তখন দেখে দামিনীর অস্তিত্ব তাহার মনকে বিচলিত করিতেছে। দামিনী 'জীবনরসের রসিক'; অথচ ভাবের বন্যায় গা ভাসাইয়া দিবার মত মেয়ে সে নয়। কিন্তু,তাহার বিদ্রোহের কর্কশ আবরণটা হঠাৎ খসিয়া গেল; "দামিনীর সেবা এখন এমন সহজে সুন্দর হইয়া উঠিল যে, তার মাধুর্যে ভক্তদের সাধনার উপর ভক্তবৎসলের যেন বিশেষ একটি বর আসিয়া পৌঁছিল।"—পৃ ৪৫৭। যে মন্ত্রের বলে এই 'অঘটন ঘটিল' তাহার শক্তি শচীশকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। অস্পষ্টভাবে দামিনীর স্বরূপ দেখিয়া মনে মনে সে ভীত হইয়াছিল। তার পর গুহার মধ্যে তাহার এক অদ্ভুত অনুভূতি। কালো কম্বলটার উপর শুইয়া তাহার মনে হইতেছে "সেই আদিম জন্তুটা আমাকে তার লালাসিক্ত কবলের মধ্যে পুরিয়াছে, আমার কোনো দিকে আর বাহির হইবার পথ নাই। এ কেবল একটা কালো ক্ষুধা, এ আমাকে অল্প অল্প করিয়া লেহন করিতে থাকিবে।··· কিসে আমার পা জড়াইয়া ধরিল।··· ভাবিলাম কোনো একটা বুনো জন্তু··· এর রোঁয়া নাই··· সাপের মতো জন্তু, তাহাকে চিনি না।... সে এমন নরম বলিয়াই এমন বীভৎস, সেই ক্ষুধার পুঞ্জ··· আমি পা ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া লাথি মারিলাম।"

উপযাচিকা নারীর স্পর্শে শচীশের সমস্ত দেহমন সংকুচিত। মানসিক সংগ্রামে আত্মপরাভবের আশঙ্কায় সে আজ ভীত। তাই সে গুরুর নিকট "প্রকৃতির নামে নালিশ রুজু করিল।··· সে ভুলিতে পারিল না যে, প্রকৃতি তার সাধনার রাস্তায় দিব্য করিয়া আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছে।" ভয়ে সে প্রকৃতির সংস্রব হইতে দূরে পলাইয়া গেল। কিন্তু ফিরিয়া আসিল কয়েক দিনের মধ্যেই। দামিনীকে বলিল, "তোমাকে চলিয়া যাইতে বলিয়াছিলাম— আমার ভুল হইয়াছিল, আমাকে মাপ করো।··· কিন্তু তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে, সে তোমাকে রাখিতেই হইবে।··· আমাদের সঙ্গে তুমি যোগ দাও, অমন করিয়া তফাত হইয়া থাকিয়ো না।" দামিনীর কী পরিবর্তন, সে বলিল "তাই যোগ দিব।"—পৃ. ৪৭৩। দিলও যোগ। তাহার যে অসহ্য দীপ্তি ছিল তার আলোটুকু রহিল, তাপ রহিল না। পুজায় অর্চনায় সেবায় মাধুর্যে ফুল ফুটিয়া উঠিল।

তার পর নবীনের স্ত্রীর বিষ খাইয়া আত্মহত্যা-ব্যাপারে সকলেরই মনে দিল প্রচণ্ড ধাক্কা। দামিনী সেই সন্ধ্যাবেলা

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী ৭, পৃ. ৪৫১-৫২।

সকলের নীরবতার মাঝখানে হঠাৎ প্রশ্ন করিল, "আমাকে বুঝাইয়া দাও তোমরা দিনরাত যা লইয়া আছ তাহাতে পৃথিবীর কী প্রয়োজন। তোমরা কাকে বাঁচাইতে পারিলে ?... তোমরা দিনরাত রস রস করিতেছ, ও ছাড়া আর কথা নাই। রস যে কী সে তো আজ দেখিলে ? তার না আছে ধর্ম, না আছে কর্ম, না আছে ভাই, না আছে স্ত্রী, না আছে কুলমান; তার দয়া নাই, বিশ্বাস নাই, লজ্জা নাই, শরম নাই। এই নির্লজ্জ নিষ্ঠুর সর্বনেশে রসের রসাতল হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার কী উপায় তোমরা করিয়াছ ?... আমি তোমার গুরুর কাছ হইতে কিছুই পাই নাই। তিনি আমার উতলা মনকে এক মুহূর্ত শান্ত করিতে পারেন নাই। আগুন দিয়া আগুন নেবানো যায় না। তোমার গুরু যে পথে সবাইকে চালাইতেছেন সে পথে ধৈর্য নাই বীর্য নাই শান্তি নাই। ওই যে মেয়েটা মরিল, রসের পথে রসের রাক্ষসীই তো তার বুকের রক্ত খাইয়া তাহাকে মারিল। কী তার কুৎসিত চেহারা সে তো দেখিলে ? প্রভু, জোড়হাত করিয়া বলি ওই রাক্ষসীর কাছে আমাকে বলি দিয়ো না। আমাকে বাঁচাও। যদি কেউ আমাকে বাঁচাইতে পারে তো সে তুমি।"... "আবার একদিন কানাকানি এবং কাগজে কাগজে গালাগালি চলিল যে, ফের শচীশের মতের বদল হইয়াছে। একদিন অতি উচ্চৈঃস্বরে সে না মানিত জাত, না মানিত ধর্ম, তার পর আর-একদিন... কিছুই মানিতে বাকি রাখিল না; তার পরে আর-একদিন এই-সমস্তই মানিয়া-লওয়ার ঝুড়ি ঝুড়ি বোঝা ফেলিয়া দিয়া সে নীরবে শান্ত হইয়া বসিল— কী মানিল আর কী না মানিল তাহা বোঝা গেল না। কেবল ইহাই দেখা গেল আগেকার মতো আবার সে কাজে লাগিয়া গেছে, কিন্তু তার মধ্যে ঝগড়াবিবাদের ঝাঁজ কিছুই নাই।" শ্রীবিলাস ডায়েরিতে লিখিয়াছে, এই এক শচীশের মুখ দিয়ে কতবার যে কত কথা শোনা গেল! বলিল, "এক দিন বুদ্ধির উপর ভর করিলাম, দেখিলাম সেখানে জীবনের সব ভার সয় না। আর-একদিন রসের উপর ভর করিলাম, দেখিলাম সেখানে তলা বলিয়া জিনিসটাই নাই। একটা কিছু আশ্রয় না পাইলে আমি শহরে ফিরিতে সাহস করি না।"

শ্রীবিলাস লিখিতেছে, "যাই বল আমি শচীশের সাধনার ব্যাকুলতা বুঝিতে পারি না। একদিন তো এ জিনিসটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছি, এখন আর যাই হোক হাসি বন্ধ হইয়া গেছে। ...এখন স্থির হইয়া বসিয়াছে, মনটাকে আর চাপিয়া রাখিবার জো নাই। আর ভাবসম্ভোগে তলাইয়া যাওয়া নয়, এখন উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ভিতরে ভিতরে এমন লড়াই চলিতেছে যে তার মুখ দেখিলে ভয় হয়।... একদিন... বলিলাম, দেখো শচীশ, আমার বোধ হয় তোমার এক জন কোনো গুরুর দরকার যার উপরে ভর করিয়া তোমার সাধনা সহজ হইবে। শচীশ বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল,... সহজকে কিসের দরকার। ফাঁকিই সহজ, সত্য কঠিন।... আমার অন্তর্যামী কেবল আমার পথ দিয়াই আনাগোনা করেন— গুরুর পথ গুরুর আঙিনাতেই যাওয়ার পথ... আজ আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্মো ভয়াবহ কথাটার অর্থ কী। আর সব জিনিস পরের হাত হইতে লওয়া যায়, কিন্তু ধর্ম যদি নিজের না হয় তবে তাহা মারে, বাঁচায় না। আমার ভগবান অন্যের হাতের মুষ্টিভিক্ষা নহেন; যদি তাঁকে পাই তো আমিই তাঁকে পাইব, নহিলে নিধনং শ্রেয়ঃ'।"

এই উপলব্ধি শচীশের বাস্তব হইয়া উঠিলে সে একদিন শ্রীবিলাসকে বলিয়াছিল, "তিনি রূপ ভালোবাসেন, তাই কেবলই রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আমরা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়। তিনি মুক্ত, তাই তাঁর লীলা বন্ধনে; আমরা বদ্ধ, সেইজন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে। এ কথাটা বুঝি না বলিয়াই আমাদের যত দুঃখ।"

এই সাধনার স্তরে আর শচীশ পার্থিব কোনো বন্ধনেই ধরা দিতে রাজী নয়। দামিনীকে আবার সে ভয় করিতেছে, পাছে তাহার সাধনায় অন্তরায় হয়। দামিনীকে বলিল, "যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড়ো

দরকার— আর-কিছুতেই আমার দরকার নাই।' দামিনী, তুমি আমাকে দয়া করো, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।" শচীশ আদর্শবাদী— আদর্শ বা আইডিয়াল তাহার কাছে সব চেয়ে বড়ো, মানুষ নহে। আইডিয়ার সঙ্গে যতক্ষণ বিরোধ হয় না, ততক্ষণ মানুষকে সে মানে, আদর্শের উপলব্ধিতে মানুষ যেখানে অন্তরায়, সেখানে তাহার বন্ধনও সে কাটে। দামিনীর কাছে মানুষ বড়ো। শচীশের প্রতি প্রেম তাহাকে সামান্যতা হইতে মহত্ত্বে পৌঁছাইয়া দিল। এই প্রেমের সাধনার মধ্য দিয়াই সে শ্রীবিলাসের প্রেমকে চিনিতে পারিল। দামিনী শ্রীবিলাসকে বলিয়াছিল, "আমার গুরুকে আমি বার বার প্রণাম করি। তিনি আমার স্বপ্নের ঘোর ভাঙাইয়া দিয়াছেন।" "তুমি আমারই দুঃখের দিকে তাকাও, আমাকে বাঁচাইতে গিয়া তিনি যে দুঃখটা পাইয়াছেন সেদিকে বুঝি তোমার দৃষ্টি নাই? সুন্দরকে মারিতে গিয়াছিল তাই অসুন্দরটা বুকে লাথি খাইয়াছে।"

সেবারে গুহা হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে দামিনীর বুকের মধ্যে একটা ব্যথা হইয়াছিল, সেই ব্যথার কথা সে কাহাকেও বলে নাই। যখন বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, "এই ব্যথা আমার গোপন ঐশ্বর্য, এ আমার পরশমণি। এই যৌতুক লইয়া তবে আমি তোমার কাছে আসিতে পারিয়াছি, নইলে আমি কি তোমার যোগ্য?"[১]

চতুরঙ্গের কথা অসম্পূর্ণ হইবে যদি শ্রীবিলাস ও দামিনীর সম্বন্ধের কথা না বলি। দামিনী ও শ্রীবিলাস উভয়েই 'চোখের বালি'র বিনোদিনীর ও বিহারীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। চোখের বালিতে বিনোদিনীর সহিত বিহারীর কোনো সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই; কিন্তু চতুরঙ্গে শ্রীবিলাস দামিনীকে বিবাহ করিয়াছিল; তবে এ বিবাহ সাধারণ ঘরসংসার পাতিবার জন্য বিবাহ নহে— ইহা আইডিয়ালের ভাঙাচোরার গড়া সম্বন্ধ। শ্রীবিলাসের ভাষায় বলি, "আমি তো গৃহী হইবার সময় পাইলাম না; আর সন্ন্যাসী হওয়া আমার ধাতে নাই, সেই আমার রক্ষা। তাই আমি যাকে কাছে পাইলাম সে গৃহিণী হইল না, সে মায়া হইল না, সে সত্য রহিল, সে শেষ পর্যন্ত দামিনী। কার সাধ্য তাকে ছায়া বলে?"

'চতুরঙ্গে'র কাহিনী-অংশ সামান্য, তাহার চুম্বক করা আমাদের অভিপ্রায় নহে। আমরা উপরিউক্ত উদ্ধৃতিগুলি হইতে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট নায়কদের ও একমাত্র নায়িকার মনোবিকাশের ছন্দের একটি রূপ পাইলাম। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি চতুরঙ্গ ফাল্গুনী ও ঘরে-বাইরে বলাকার যুগে রচিত। বলাকার মধ্যে কবির যেসব তত্ত্বকথা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা তাঁহার জীবনদর্শনের মূলগত কথা। তিনি বহুবার বলিয়াছেন যে, জীবনে গতিবাদ ও স্থিতিবাদ— কোনোটিই সত্য নহে এবং উভয়ই সত্যও বটে। কারণ জীবনের মধ্যে গতিস্থিতি মিশিয়া আছে বলিয়া পূর্ণতার মধ্যে উহা সার্থক। এই পূর্ণতাকে বিশ্লিষ্টভাবে দেখিলেই সত্য আচ্ছন্ন হয়; এই পূর্ণতার মধ্যে রূপ-অরূপ উভয়ই সংশ্লিষ্ট— একান্তভাবে একটিকে লইলে উভয়ই মিথ্যা হইয়া যায়। গতিস্থিতি রূপ-অরূপ রাত্রি-দিন আলো-আঁধার প্রভৃতি অসংখ্য বিপরীতের যথার্থ সমবায় ও সমন্বয়ে জীবন অর্থপূর্ণ। শচীশের জীবনে সেই গতি স্থিতি ও পূর্ণতার তিনটি স্তরই কবি ব্যক্ত করিয়াছেন— জ্যাঠামশায়ের শিষ্যরূপে শচীশ জগতের গতিকে, তাহার বাহিরের দৃশ্যমান রূপটিকে দেখিয়াছিল জ্ঞানের মধ্যে; লীলানন্দ স্বামীর শিষ্য হইয়া সে স্থিতির মধ্যে অনুভূতির মধ্যে জগতকে দেখিল; কিন্তু একদিন সে বুঝিল কর্ম যেমন অসত্য, কর্মহীন রসসম্ভোগও তেমনই অবাস্তব। উভয়ের প্রভাব হইতে মুক্ত শচীশ যে সত্যের সন্ধান পাইল তাহা পূর্ণতার রূপ। জ্ঞান হইতে যে-কর্মের উদ্ভব তাহার রূপ— রসোদ্ভূত কর্ম হইতে পৃথক— উহাদের পার্থক্য গুণগত। শচীশ পুনরায় যে কাজে লাগিল সে-কাজে তাপ নাই, দাহ নাই তাহা সেবায় উজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ।[২]

১ এই প্রবন্ধের অধিকাংশই শ্রীসুধাময়ী দেবীর 'চতুরঙ্গ' (বঙ্গলক্ষ্মী, ১৩৩২ কার্তিক, পৃ ৭৫৫-৭৭) হইতে গৃহীত।

২ চতুরঙ্গ নামক গল্পের ফরাসী অনুবাদের ভূমিকা (রোমাঁ রোলাঁ লিখিত) শান্তিনিকেতন ৬ষ্ঠ বর্ষ ১৩৩১ চৈত্র, পৃ ৫৫-৫৬।

সাহিত্যে বাস্তবতা

বিলাত হইতে দেশে ফিরিবার পর প্রায় সাত মাস কাল রবীন্দ্রনাথের লেখনী যেসব কারণে প্রায় স্তব্ধ ছিল, তাহার কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। অতঃপর 'সবুজ পত্র' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্তরের সমস্ত রুদ্ধ কথা নানাভাবে প্রকাশ পাইতে থাকে। প্রথম বৎসরের প্রথম সংখ্যায় তাঁহার প্রবন্ধ 'বিবেচনা ও অবিবেচনা', কবিতা 'সবুজের অভিযান' ও গল্প 'হালদারগোষ্ঠী' যে একই ভাবকে নানাভাবে ব্যক্ত করিয়াছিল সেটি হইতেছে 'চরৈবেতি চরৈবেতি' আগে চল্, আগে চল্ ভাই। রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই হিন্দুসমাজের স্থবির ধর্মকে আঘাত করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। সবুজ পত্রের যুগ হইতে সাহিত্যের বিচিত্র রীতির মধ্য দিয়া এই তাঁহার মনোভাবের তীব্রতা প্রকাশ পাইয়াছিল। অপর দিকে দেশের মধ্যে রবীন্দ্রবিরোধী যে সনাতনী সাহিত্যপন্থী ও সাহিত্য-ব্যবসায়ীর দল ছিল তাহা পুনর্জীবিত হইল। সনাতনীরা তো চিরদিনই কবির প্রতি বিরূপ; কিন্তু সম্প্রতি তথাকথিত আধুনিকদের মধ্যে কয়েকজন নামজাদা লোককে, এমন-কি বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় কৃতিমান ছাত্রকে, এই দলে দেখা গেল। তাঁহারা প্রতিক্রিয়াপন্থীদের মধ্যে ঢুকিয়া নূতন যুক্তিবাদ দিয়া হিন্দুসমাজের জীর্ণতাকে স্থায়িত্ব দানের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

রবীন্দ্রনাথের বিলাতযাত্রার অব্যবহিত পূর্বে বিপিনচন্দ্র পাল কবির যে 'চরিত্র চিত্র' (বঙ্গদর্শন ১৩১৮ চৈত্র) অঙ্কন করেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। বিপিনচন্দ্র উক্ত প্রবন্ধে যেসব তর্ক তুলিয়াছিলেন, কালের ব্যবধানে তাহাদের বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই, বরং বহু পৃষ্ঠপোষকের সহায়তায় ও শক্তিমান লেখকের রচনা-চাতুর্যে তাহা পল্লবিত ও বিস্তারিত হইয়াছিল।

উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের পর প্রায় আড়াই বৎসর গত হইয়াছে; বিপিনচন্দ্রের রাজনীতি-ধর্মনীতির অনেক অদলবদল হইয়াছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাবের বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। বিপিনচন্দ্রের এই প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের আভাস পাই প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের এক পত্র হইতে। উক্তিটি রূঢ় হইতে পারে, কিন্তু সমসাময়িক মনোবৃত্তির বিশ্লেষণ হিসাবে সেটি খাঁটি সত্য। তিনি লিখিতেছেন, "বিপিন পাল এবং বিপিন পালের পালকবর্গ যে তোমার সবুজ পত্রের মাথা মুড়িয়ে খাবার চেষ্টা করবেন সে আমি জানতুম।"[১]

কিছুকাল হইতে বাংলাদেশের শিক্ষিতদের মধ্যে সকল প্রকার উদারনীতি— বিশেষত সামাজিক প্রগতিবাদ ও ধর্মসম্বন্ধীয় স্বাধীন মত প্রচার বিষয়ে— বেশ একটু প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। বঙ্গচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলনের ফলে দেশকে ভালোবাসিবার যে-একটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায় তাহাই যাহাকিছু-ভালোমন্দ তাহাকে নির্বিচারে গৌরবান্বিত করিবার প্রয়াসে রূপ লয়। এই কথা কবি 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করিয়াছিলেন। সমসাময়িক একখানি পত্রেও লিখিতেছেন, "অনেকদিন পর্যন্ত এরা [সনাতনপন্থী] বিনা বাধায় আমাদের দেশের যুবকদের বুদ্ধিকে পঙ্কিল করে তুল্‌ছিল— বিধাতা বরাবর তা সইবেন কেন? দেশের কোনো জায়গা থেকেই কি এরা ধাক্কা পাবে না? সরল মূঢ়তাকে সওয়া যায় কিন্তু বাঁকা বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেওয়া কিছু নয়।"[২]

তার পর সেই বাঁকা বুদ্ধি পণ্ডিতম্মন্যতার আবরণে সাহিত্যসমাজে যখন প্রবেশ করে, তখন সাধারণ লোকে হতবাক্ হইয়া নির্বিচারে সে-সবকে গ্রহণ করে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি বিপিনচন্দ্র পাল রবীন্দ্রসাহিত্য বস্তুতন্ত্রহীন বলিয়া যে-মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা বহু আড়ম্বরে অতি-তরুণ অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 'সার্বজনীন নহে' বলিয়া ঘোষণা করিলেন।[৩] রাধাকমল 'সাহিত্যে সমাজগঠনশক্তি' সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন

১ চিঠিপত্র ৫, পত্র ২৯, ২ অগস্ট ১৯১৪ (১৭ শ্রাবণ ১৩২১)।
২ চিঠিপত্র ৫, পৃ ১৮৪।
৩ লোকশিক্ষক বা জননায়ক, প্রবাসী ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ।

করিয়া বলিলেন, "রবীন্দ্রনাথ যে জগৎ গড়িয়াছেন, তাহা ভাবের রাজ্য, তাহার সহিত বাস্তব জীবনের সামঞ্জস্য নাই।...তাহার সবই সুন্দর, সবই মহৎ, শুধু তাহা সজীব নহে। রবীন্দ্রসাহিত্য বস্তুতন্ত্রহীন।...বস্তুর জগৎ... গড়িতে পারেন নাই; তাঁহার জগৎ স্বপ্নের জগৎ, তাহা তাঁহার কল্পনায় ধারণা হইয়াছে মাত্র, জাতির হৃদয়ে স্থান পায় নাই।"[১]

"কারণ, প্রকৃত জাতি তো কয়েকজন ইংরেজিশিক্ষিত উকিল ব্যারিস্টার মাস্টার কেরানী সম্পাদক লইয়া নহে। বাঙালী জাতিকে চিনিতে হইলে পর্ণকুটীরবাসী অশিক্ষিত কৃষক তাঁতি জোলা মজুর কামার কুমার তেলি ও নাপিতের অভাব ও অভিযোগ, আশা ও আকাঙ্ক্ষা জানিতে হইবে।"[২]

লেখকের অভিযোগ যে রবীন্দ্রনাথ এইসব কারণে অসম্পূর্ণ এবং তাঁহার সাহিত্য বাস্তবতাশূন্য। এ ছাড়া অন্যান্য আধুনিক লেখকগণের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের কাব্য বা গান আপামর সাধারণ গ্রহণ করে নাই; অধ্যাপক মহাশয় শিক্ষিতদের রচিত সাহিত্যকে পোশাকী ও ইংরেজী-না-জানা লেখকদেব রচনাকে আটপৌরে বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহার ধারণা আমাদের সাহিত্য ও শিল্পকলা কারুকার্যনৈপুণ্য ও অলংকারের বোঝায় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। আদর্শ কবিতা কিরূপ হইতে পারে তাহার নমুনাস্বরূপ তিনি মালদহের আদ্যের গম্ভীরার গান, ফিকির চাঁদের গান প্রভৃতি উল্লেখ করেন। তিনি সাহিত্যের মধ্যে বাঙালির বাঙালিত্ব ও হিন্দুর হিন্দুত্বকে লোকসাহিত্যের বাণী বলিয়া দাবি করিলেন। তাঁহার গুরুতর অভিযোগ যে রবীন্দ্রসাহিত্য জনসাধারণের উপযোগী নহে, তাহাতে লোকশিক্ষার কাজ চলিবে না। প্রত্যক্ষত ইহারই প্রত্যুত্তরে ও পরোক্ষে এই শ্রেণীর লেখকদের সাহিত্য-সমালোচনার যোগ্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'বাস্তব'[৩] নামে প্রবন্ধ লেখেন।

সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা বা বাস্তবতা বলিতে কী বুঝায়, সে-প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে সাহিত্যের বস্তু কী সে-বিষয়ে কবি এই প্রবন্ধে আলোচনা উত্থাপন করেন। তাঁহার মতে সাহিত্যে আসল বস্তু যাহা লোকে খোঁজে— সেটি হইতেছে রসবস্তু। রস জিনিসটি রসিকের অপেক্ষা রাখে, কিন্তু সমালোচকের পক্ষে সাহিত্যিক বা রসিক না হইলেও চলে। যাহাই হউক, রসের মধ্যে নিত্যতা আছে, বস্তুর মধ্যে নাই। বাস্তব বিষয়ে কাব্য হইতে পারে, তবে তাহা সাহিত্য-পদবাচ্য হইবে না।[৪] রসবস্তুকে য়ুরোপীয় ক্রিটিকরা বলিয়াছেন good state of mind। আর্টের চরম উদ্দেশ্য এই রসসৃষ্টি— the state of aesthetic contemplation।

টলস্টয়ের মতে আর্টের অভিপ্রায় হইতেছে promoting good actions বা সৎকর্মের প্ররোচনা। এই মত একদল য়ুরোপীয় ক্রিটিক পোষণ করেন না— রবীন্দ্রনাথও আর্টের এই ধর্মে বিশ্বাসী নহেন। আর্টের কোনো অভিপ্রায় থাকিতে পারে না, কারণ অনুভূতিতে তাহার জন্ম— আনন্দে তাহার প্রকাশ; প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য যে-আর্টের সৃষ্টি তাহা কোনো শিল্পশাস্ত্রী বা দার্শনিকের পক্ষে স্বীকার করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথ যে-art for art's sake মতবাদের সমর্থক, তাহার যথার্থ তাৎপর্য হইতেছে এই যে, সৌন্দর্যসৃষ্টির কোনো উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না— মানবের অপর্যাপ্ত অনুভূতির আবেগে উহার জন্ম। Some states of mind appear to be good independently of their consequence" (Clive Bell, *Art*, p 113)। ইতালিয়ান দার্শনিক ও আর্টশাস্ত্রী বেনেদিত্তো ক্রোচে যে কথা

১ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃ ৮০।

২ বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃ ৪০।

৩ সবুজ পত্র ১৩২১ শ্রাবণ, সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩।

৪ রবীন্দ্রনাথের 'বাস্তব' প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে, রাধাকমল তাহার জবাবে লেখেন 'সাহিত্যে বাস্তবতা' (সবুজ পত্র ১৩২১ মাঘ) ও এই বিষয়ে সেই মাসেই আলোচনা করেন প্রমথ চৌধুরী—'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি?' ইহার পর রাধাকমল লেখেন 'সাহিত্য ও স্বদেশ' (সাহিত্য ১৩২২ বৈশাখ)।

বলিয়াছেন তাহা কবিরই মতকে সমর্থন করে।[১]

রাধাকমল 'সাহিত্যে বাস্তবতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'বাস্তব' প্রবন্ধের বিস্তারিত সমালোচনা করেন। তিনি সাহিত্যকে প্রয়োজনসাধনের দিক হইতে দেখিতে অভ্যস্ত, কারণ তিনি অর্থনীতির অধ্যাপক, সমাজনীতির ছাত্র ও শ্রমজীবীদের লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত। সেইজন্যই বোধ হয় তাঁহার ধারণা ছিল যে সাহিত্যস্রষ্টারা হইবেন সমাজের উন্নতির পদপ্রদর্শক, যুগনির্দেষ্টা ভাবুক। এইসব ভাবুকের কাজ হইতেছে যুগধর্ম প্রকাশ অর্থাৎ সমসাময়িক সমস্যা সমাধান হইতেছে তাঁহাদের আদর্শ। সাহিত্যিককে শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী দীন মধ্যবিত্ত লোকসাধারণের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হইবে, নিখিলের সংস্রবে না থাকিলে সাহিত্যে বাস্তবতা আসিবে না। সাহিত্য বাস্তবকে অবলম্বন করিয়াই রসসৃষ্টি করে। রাধাকমলের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, রবীন্দ্রসাহিত্য এই প্রতিজ্ঞা পূরণ করে নাই। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "কাব্য যে গুণে টিকিবে তাহা নিত্যরসের গুণে।" অধ্যাপক তাহার উত্তরে বলেন কাব্য যে স্থায়ী হয়, তাহা নিত্যরস ও নিত্যবস্তুর গুণে। 'নিত্যরস ও নিত্যবস্তুকে প্রকাশ করিতে পারিলে বাস্তবের মধ্যে একটা তুমুল আন্দোলন আসে, বাস্তবের যা কিছু হেয় ঘৃণ্য নগণ্য তাহা ধসিয়া পড়ে। একটা সুন্দর বাস্তব গড়িয়া উঠে।' তিনি আরও বলিলেন যে এইখানেই সাহিত্যের গুরু ও শিক্ষকের কার্যের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "সাহিত্য লোককে শিক্ষা দিবার জন্য কোনো চিন্তাই করে না। কোনো দেশেই সাহিত্য ইস্কুল-মাস্টারির ভার লয় নাই।" অধ্যাপক রাধাকমলের আপশোস যে রবীন্দ্রনাথ কেন এমন সাহিত্য লিখিবেন না, যাহা দ্বারা লোকহিত হয়। রবীন্দ্রনাথের মতে এই শ্রেণীর ফরমাইশি লেখা সাহিত্যিকের ধর্ম নহে; ইহা প্রাসঙ্গিক নহে, আনুষঙ্গিক।

যাহাই হউক, রবীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে 'লোকহিত' (সবুজ পত্র ১৩২১ ভাদ্র) নামক প্রবন্ধে যেসব কথার আলোচনা করেন তাহার মধ্যে উপরিউক্ত কতকগুলি অভিযোগের উত্তর আছে। 'লোকহিত' প্রবন্ধটি যে মাসে সবুজ পত্রে বাহির হইয়াছিল সেই সংখ্যাতেই বাহির হয় 'ভাইফোঁটা' গল্প। গল্পটির মধ্যে কবির অজানতেই কাজের লোকের লোকহিত বাতিকের উপর বেশ একটু ঠেস পড়িয়া গিয়াছে। গল্প গল্প-হিসাবেই সার্থক হইয়াছে সত্য, কিন্তু অতি-ধার্মিক, অতি-নীতিবাগীশের কাজের বাতিকের মধ্যে জীবনের ঠিক সুরটি যে ধরা যায় না, এই কথাটিও ব্যক্ত হইয়াছে। বস্তুসর্বস্ব জ্ঞান ও শিক্ষা এবং রসহীন সাধুতাচর্চা ডিরোজিওর সেরা চেলা সনাতন দত্তের সন্তানকে শেষপর্যন্ত অধঃপাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। রসহীন কর্মমত্ততা ও কর্মহীন রসচর্চা মানুষকে কোথায় লইয়া যায়, তাহার পরোক্ষ আলোচনা হইয়াছে 'চতুরঙ্গে'।

আমরা যে সময়ে কথা বলিতেছি তখন দেশের মধ্যে সাধারণের জন্য বা দরিদ্র-নরনারায়ণের জন্য কাজ করিবার এই শুভ ইচ্ছা শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর যুবকদের মধ্যে দেখা দিয়াছিল। এই ভাবটাকে মনের পটভূমে রাখিয়া কবি লিখিলেন, "লোকসাধারণ বলিয়া একটা পদার্থ আমাদের দেশে আছে এটা আমরা কিছুদিন হইতে আন্দাজ করিতেছি এবং এই লোকসাধারণের জন্য কিছু করা উচিত হঠাৎ এই ভাবনা আমাদের মাথায় চাপিয়াছে।" রবীন্দ্রনাথ তাঁহার তীব্র বিশ্লেষণী মনীষাবলে সমস্ত ব্যাপারটাকে তন্নতন্ন করিয়া যেন দেখিতে চান; তাই তিনি লিখিলেন,

১ "The end attributed to art, of directing the good and inspiring horror of evil, of correcting and ameliorating customs, is a derivation of the moralistic doctrine; and so is the demand addressed to artists to collaborate in the education of the lower classes, in the strengthening of the national or bellicose spirit of a people, in the diffusion of the ideals of a modest and laborious life; and so on. These are all things that art cannot do, any more than geometry, which, however, does not lose anything of its importance on account of its inability to do this; and one does not see why art should do so either." Croce, *The Essence of Aesthetic*. p. 14-15.

"আমরা লোকহিতের জন্য যখন মাতি তখন অনেক স্থলে সেই মত্ততার মূলে একটি আত্মাভিমানের মদ থাকে। আমরা লোকসাধারণের চেয়ে সকল বিষয়ে বড়ো এই কথাটাই রাজকীয় চালে সম্ভোগ করিবার উপায় উহাদের হিত করিবার আয়োজন। এমন স্থলে উহাদেরও অহিত করি, নিজেদেরও হিত করি না।

"হিত করিবার একটিমাত্র ঈশ্বরদত্ত অধিকার, সেটি প্রীতি। প্রীতির দানে কোনো অপমান নাই কিন্তু হিতৈষিতার দানে মানুষ অপমানিত হয়।‥ সেইজন্য, লোকহিত করায় লোকের বিপদ আছে।"[১] স্বদেশী আন্দোলনের যুগে হিন্দু-মুসলমানের প্রীতির চেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক্যোগ হয় নাই, তাহার কারণ তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনোদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই।" লোক-সাধারণকে "সর্বপ্রকারে অপমানিত করা আমাদের চিরদিনের অভ্যাস। যদি নিজেদের হৃদয়ের দিকে তাকাই তবে এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতবর্ষকে আমরা ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ বলিয়াই জানি। ...আমাদের সেই মনের ভাবের কোনো পরিবর্তন হইল না, অথচ এই শ্রেণীর হিতসাধনের কথা আমরা কষিয়া আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি।"

য়ুরোপের জনসাধারণ সত্যই আজ শক্তিমান. তাহার কারণ সেখানে ধনের অত্যাচারে তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ, সেখানে জনসাধারণ ভিক্ষা করে না, দাবি করে। সেইজন্য তাহারা দেশের লোকদিগকে ভাবাইয়া তুলিযাছে। আমাদের লোকহিত সাধনের ধর্মবুদ্ধি হঠাৎ একবার চমক খাইয়া উঠে। অনুগ্রহ করিয়া ভাবিতে গেলে কথায় কথায় অন্যমনস্ক হইতে হয় এবং ভাবনাটা নিজের দিকেই বেশি করিয়া ঝোঁকে।

আমাদের ভদ্রসমাজ আরামে আছে, কেননা আমাদের লোকসাধারণ নিজেকে বোঝে নাই। নিজেকে 'লোক' বলিয়া জানে না, সেইজন্য জানান দিতে পারে না। আমরা তাহাদিগকে ইংরেজি বই পড়িয়া জানিব, সে জানায় তাহারা কোনো জোর পায় না, ফলও পায় না। 'বাস্তব' নামক প্রবন্ধে তিনি লোকসাহিত্য সম্বন্ধে যে-কথার আভাস দিয়াছিলেন, তাহাই 'লোকহিত' প্রবন্ধে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন; তাঁহার মতে লোকসাধারণের জন্য বিশেষভাবে যে লোকসাহিত্য ভদ্রসমাজ সৃষ্টি করিবেন তাহা সাহিত্যপদবাচ্য হইবে না। "চিরদিনই লোকসাহিত্য লোক আপনি সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে।" দয়ার তাগিদে সৃষ্টি হয় না, অহেতুক আনন্দের জোরেই যাহা-কিছু রচনা হইতেছে। যেখানে "অনুগ্রহ আসিয়া সকলের চেয়ে বড় আসনটা লয় সেইখান হইতেই কল্যাণ বিদায় গ্রহণ করে।" প্রবন্ধের শেষে বলিলেন, "আমাদের দেশের জনসাধারণ আজ জমিদারের মহাজনের রাজপুরুষের, মোটের উপর সমস্ত ভদ্রসাধারণের দয়ার অপেক্ষা রাখিতেছে, ইহাতে তাহারা ভদ্রসাধারণকে নামাইয়া দিয়াছে; আমরা ভৃত্যকে অনায়াসে মারিতে পারি, প্রজাকে অনায়াসে অতিষ্ঠ করিতে পারি, গরীব মূর্খকে অনায়াসে ঠকাইতে পারি; নিম্নতনদের সহিত ন্যায়ব্যবহার করা, মানহীনদের সহিত শিষ্টাচার করা নিতান্তই আমাদের ইচ্ছার 'পরে নির্ভর করে, অপর পক্ষের শক্তির 'পরে নহে, এই নিরন্তর সংকট হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্য আমাদের দরকার হইয়াছে নিম্নশ্রেণীয়দের শক্তিশালী করা। সেই শক্তি দিতে গেলেই তাদের হাতে এমন একটা উপায় দিতে হইবে যাহাতে ক্রমে তাহারা পরস্পর সম্মিলিত হইতে পারে— সেই উপায়টিই তাহাদের সকলকেই লিখিতে পড়িতে শেখানো।" শিক্ষার চেয়ে বড় হাতিয়ার নাই।

বাস্তববাদের সমালোচনা করিতে গিয়া আদর্শবাদের সমর্থন হইল বাস্তব ও লোকহিত প্রবন্ধদ্বয়ে। কিন্তু এই শ্রেণীর রচনা লিখিয়া কবির মন তৃপ্ত হয় না। তাই তিনি 'আষাঢ়' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া বিজ্ঞান-দর্শনের এমন স্থানে পৌঁছিলেন যে তাহা অত্যাধুনিক বিজ্ঞানীর পক্ষে নাগালধরা শক্ত। কারণ বিজ্ঞানীর পক্ষে দর্শন যেমন

১ লোকহিত, কালান্তর, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ২৬০-২৬৯।

অনধিগম্য, দার্শনিকের পক্ষে বিজ্ঞান তেমন অবোধগম্য; কেহ কাহারও ভাষা বুঝে না। অথচ দর্শন ক্রমে এতই objective বা বাহ্যবিষয়াশ্রয়ী হইতেছে ও বিজ্ঞান ক্রমে subjective বা আত্মপ্রত্যয়বাদী হইয়া উঠিতেছে যে কেহ কাহাকে স্বীকার না করিয়াই পদস্পরকে মানিয়া লইতেছে। সেই সমন্বয়ের অনুভূতি হয় কবির অন্তরে— যিনি সত্যকে স্বচ্ছভাবে দেখিতে পান। সেই অনুভূতির আলোকে তিনি 'আষাঢ়'[১] প্রবন্ধে লিখিলেন—

"শুনিয়াছি অণুপরমাণুর মধ্যে কেবলি ছিদ্র, আমি নিশ্চয় জানি সেই ছিদ্রগুলির মধ্যেই বিরাটের অবস্থান। ছিদ্রগুলিই মুখ্য, বস্তুগুলিই গৌণ। যাহাকে শূন্য বলি বস্তুগুলি তাহারই অশ্রান্ত লীলা। সেই শূন্যই তাহাদিগকে আকার দিতেছে, গতি দিতেছে, প্রাণ দিতেছে। আকর্ষণ-বিকর্ষণ তো সেই শূন্যেরই কুস্তির প্যাঁচ। জগতের বস্তুব্যাপার সেই শূন্যের, সেই মহাযতির, পরিচয়। এই বিপুল বিচ্ছেদের ভিতর দিয়াই জগতের সমস্ত যোগসাধন হইতেছে— অণুর সঙ্গে অণুর, পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের, নক্ষত্রের সঙ্গে নক্ষত্রের। সেই বিচ্ছেদমহাসমুদ্রের মধ্যে মানুষ ভাসিতেছে বলিয়াই মানুষের শক্তি, মানুষের জ্ঞান, মানুষের প্রেম, মানুষের যতকিছু লীলাখেলা। এই মহাবিচ্ছেদ যদি বস্তুতে নিরেট হইয়া ভরিয়া যায় তবে একেবারে নিবিড় একটানা মৃত্যু।

"মৃত্যু আর কিছু নহে— বস্তু যখন আপনার অবকাশকে হারায় তখন তাহাই মৃত্যু। বস্তু তখন যেটুকু কেবলমাত্র সেটুকুই, তার বেশি নয়। প্রাণ সেই মহা-অবকাশ— যাহাকে অবলম্বন কয়িয়া বস্তু আপনাকে কেবলই আপনি ছাড়াইয়া চলিতে পারে।

"বস্তুবাদীরা মনে করে অবকাশটা নিশ্চল কিন্তু যাহারা অবকাশরসের রসিক তাহারা জানে বস্তুটাই নিশ্চল, অবকাশই তাহাকে গতি দেয়। ...নিশ্চলের যে ভয়ংকর চলা তাহার রুদ্রবেগ যদি দেখিতে চাও তবে দেখো ওই নক্ষত্রমণ্ডলীর আবর্তনে, দেখো যুগযুগান্তরের তাণ্ডব নৃত্যে। যে নাচিতেছে না তাহারই নাচ এই সকল চঞ্চলতায়।"

'আষাঢ়' প্রবন্ধ লিখিবার পর লেখেন 'আমার জগৎ'[২]। এই প্রবন্ধে কবি নববিজ্ঞানীদের 'আপেক্ষিকতত্ত্ব' আপনার মত করিয়া সাহিত্যের ভাষায় আলোচনা করিলেন। স্থান ও কালের যথার্থ রূপ যে আবেষ্টনের উপর নির্ভর করে সেই কথাটা নানা উদাহরণ ও উপমার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কবি বলিতেছেন, "আমি আমার চলাফেরা কথাবার্তায় প্রতি মুহূর্ত নিজেকে প্রকাশ করব— সেই প্রকাশ আমার আপনাকে আপনার সৃষ্টি। কিন্তু সেই প্রকাশের মধ্যে আমি যেমন আছি তেমনি সেই প্রকাশকে বহুগুণে আমি অতিক্রম ক'রে আছি। আমার এক কোটিতে অন্ত, আর-এক কোটিতে অনন্ত। আমার অব্যক্ত-আমি আমার ব্যক্ত-আমির যোগে সত্য।" এই রচনার আর-একটি স্থানে আছে—"আমি সেই মূঢ় যে মানুষ বিচিত্রকে বিশ্বাস করে, বিশ্বকে সন্দেহ করে না। আমি নিজের প্রকৃতির ভিতর থেকেই জানি দূরও সত্য নিকটও সত্য, স্থিতিও সত্য গতিও সত্য।...রূপই আমার কাছে আশ্চর্য, রসই আমার কাছে মনোহর। সকলের চেয়ে এই যে আকারের ফোয়ারা নিরাকারের হৃদয় থেকে নিত্যকাল উৎসারিত হয়ে কিছুতেই ফুরোতে চাচ্ছে না।" এই প্রবন্ধ 'বলাকা' কবিতাগুচ্ছের পর্বের রচনা।

সবুজ পত্রের লেখকগোষ্ঠী ও রবীন্দ্রনাথের সবুজ পত্রে প্রকাশিত রচনাবলীর বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া বাংলার সাময়িক সাহিত্যে দেখা দিয়াছিল, তাহার আভাস আমরা পূর্বেই দিয়াছি। এতদিন যাহা বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্ত হইতেছিল, এই পত্রিকা বাহির হয় (১৩২১ অগ্রহায়ণ)।
এইবার তাহা 'নারায়ণ' নামে এক নূতন মাসিকপত্র মারফত বিশিষ্টভাবে প্রচারিত হইল। সবুজ পত্র প্রকাশিত

১ সবুজ পত্র ১৩২১ আষাঢ়, পৃ ১৫৪-৫৫। দ্র. পরিচয় পৃ ১৬৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ৫৩১-৫৩৮।

২ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৪৮. ১৫ই শ্রাবণ ১৩২১ পৃ ১৮২। "আমি 'আমার জগৎ' নামক একটা লেখা লিখে ভয়ে ভয়ে মণিলালের কাছে পাঠিয়েছি।" দ্র. সবুজ পত্র ১৩২১ আশ্বিন। সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ৪১১-৪১৯।

হইবার আট মাস পরে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথিতনামা ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশের পৃষ্ঠপোষকতায় ও অর্থানুকূল্যে এই পত্রিকা বাহির হয়, (১৩২১ অগ্রহায়ণ)।

চিত্তরঞ্জনের জীবন তখনো মহাত্মাজির স্পর্শে রূপান্তরিত হয় নাই, তাঁহার খ্যাতি তখন আইনজ্ঞরূপে, অতুল ঐশ্বর্যের ভোগবিলাসে তখনো তিনি নিমজ্জিত। আমাদের আলোচ্যপর্বে— চিত্তরঞ্জন বাংলাসাহিত্যে আপনার স্থান করিবার জন্য আগ্রহান্বিত। গত জ্যৈষ্ঠ (১৩২১) মাসে তিনি 'সাগরসংগীত' নামে এক কাব্যখণ্ড প্রকাশ করেন, বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে উহা মুদ্রিত হয়, বাংলাভাষায় এমন রূপ-বাহুল্যে কোনো গ্রন্থ বোধ হয় ইতিপূর্বে মুদ্রিত হয় নাই। শুধু তাহাই নহে; অরবিন্দ ঘোষের দ্বারা তাহার সুললিত অনুবাদ করাইলেন— অরবিন্দ তখনো 'শ্রীঅরবিন্দ' হইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে যান নাই। 'সাগরসংগীত' প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্রনাথ ঐ কাব্য সম্বন্ধে কোনো মতামত প্রকাশ করেন নাই। কবির স্বভাবের কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, যে-গ্রন্থ তাঁহার ভালো লাগিত না, সে সম্বন্ধে তিনি মৌনী থাকিতেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জনের বিরূপতার ইহা অন্যতম কারণ কিনা জানি না।[১]

ধর্মবিশ্বাসে এই সময়ে চিত্তরঞ্জনের জীবনে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল, তাহা রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত পীড়িত করিয়াছিল। চিত্তরঞ্জন ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত; তাঁহার পিতা ভুবনমোহন দাস ছিলেন কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবহারজীবী। যৌবনে হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্মের সকল প্রকার বন্ধনকে রূঢ়ভাবে ছিন্ন করিয়া ভুবনমোহন ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র চিত্তরঞ্জনের সহিত যে কারণেই হউক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্বন্ধ ক্রমশই শিথিল হইয়া আসে এবং আলোচ্য পর্বে তাহা প্রায় প্রকাশ্য বিরোধিতায় আসিয়া দাঁড়ায়। পিতা গোঁড়া ব্রাহ্ম, সমাজ-সংস্কারক ছিলেন বলিয়াই যেন প্রতিক্রিয়াপন্থী পুত্র ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত কিছুকেই বাস্তবতাহীন প্রমাণে উৎসুক। হিন্দুত্ব ও জাতীয়ত্ববোধ মিশিয়া যে হিন্দু জাতীয়ত্ব বাংলাদেশে বঙ্কিমচন্দ্র পত্তন করিয়াছিলেন এবং বিংশশতকের আরম্ভ হইতে ও বিশেষভাবে স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে তাহা নানাভাবে পুষ্ট হইয়াছিল। বহু ব্রাহ্মযুবক নবীন হিন্দু জাতীয়তা-বোধের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র ঘোষ, দেবব্রত বসু, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্তই ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ধর্মসাধনা তাঁহাদের তৃপ্তি দান করে নাই।

নারায়ণ পত্রিকা এই নূতন মনোবিকারের প্রচারপত্র হইল। ব্রাহ্মধর্মের মতবাদ, ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিবাদ -সমালোচনাই হইল এই পত্রিকার প্রধান কার্য: চিত্তরঞ্জন 'নারায়ণ' পত্রিকা বাহির করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার লিখিবার সময় কোথায়? তিনি তো তখন হাইকোর্টের প্রধান ভারতীয় ব্যারিস্টারদের অন্যতম। তাই তিনি অর্থ দিয়া কয়েকজন প্রতিভাশালী লেখককে এই কার্যে নিযুক্ত করিলেন; ইহাদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল স্বনামধন্য। তরুণদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী। এই 'নারায়ণ' পর্ব হইতে তাঁহার সাহিত্যপ্রতিভার বিকাশ। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রাহ্মধর্মের সমালোচনার জন্য তাঁহার খ্যাতি অল্পকালের মধ্যে হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইল। বিপিনচন্দ্র বোধ হয় প্রত্যক্ষভাবে ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজকে আঘাত করিতে পারিলেন না, কারণ তিনি অন্তরে অন্তরে ব্রাহ্ম ছিলেন। তাই তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রগতিবাদকে আক্রমণ করিলেন 'মৃণালের পত্র' (নারায়ণ ১৩২১ অগ্রহায়ণ) লিখিয়া। রবীন্দ্রনাথ সবুজ পত্রে 'স্ত্রীর পত্র' (১৩২১ শ্রাবণ) নামে যে গল্প লেখেন ইহা তাহারই জবাব। ইহার পর 'নারায়ণে' পূর্বোল্লিখিত সমালোচনাগুলি প্রকাশিত হইতে থাকিল।[২]

১ এই কাব্যখণ্ড প্রকাশের অল্পকাল পরেই কবি বুঝিতে পারিলেন যে অচিরেই একটা সংগ্রাম আসিতেছে। চিঠিপত্র ৫, পত্র ২৯, ১৭ শ্রাবণ ১৩২১।

২ সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রহীনতা সম্বন্ধে বাদানুবাদ—

বঙ্গদর্শন ১৩১৮ চৈত্র	বিপিনচন্দ্র পাল : চরিত্রচিত্র-রবীন্দ্রনাথ।
সবুজ পত্র ১৩২১ বৈশাখ	রবীন্দ্রনাথ : বিবেচনা ও অবিবেচনা।
প্রবাসী ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ	রাধাকমল মুখোপাধ্যায় : লোকশিক্ষক বা জননায়ক।

বিচিত্রার পটভূমি

১৩২২ সাল; কবির বয়স ৫৪ বৎসর। সবুজ পত্রের দ্বিতীয় বর্ষ শুরু হইল। কবি শান্তিনিকেতনে আছেন; গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ হইলেও তিনি কোথাও নড়িলেন না, দেহলির ছোটো কুঠরিতেই আরাম করিতেছেন। আশ্রম প্রায় জনশূন্য; কেবল দেহলির সম্মুখে পিয়ার্সনের নূতন বাড়ি[1] তৈয়ারির নানাবিধ শব্দ কানে আসিতেছে, আর সব নিস্তব্ধ, মন বেশ প্রসন্ন। ইতিমধ্যে সবুজ পত্রের জন্য গল্প লিখিবার তাগিদ আসিয়াছে। তাহারই জবাবে (১০ বৈশাখ) প্রমথ চৌধুরীকে লিখিতেছেন, "কোনো ভদ্রলেখকের পক্ষে বারো মাসে বারোটা গল্প লেখা কি সম্ভব, না উচিত? ...এ রকম নিয়ত রচনা করে যাওয়া প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ— ফুল ফোটার এবং ফল ধরার ঋতু আছে— প্রকৃতির সবুজ পত্রে বারোমেসে লিপিকর ক'টা আছে? যাই হোক্, মণিলালের সহিত তক্‌রার করে পেরে উঠব না। একটা গল্প লিখতে লাগব।"[2] এই গল্পই হইতেছে 'ঘরে বাইরে'। কবি আপনমনে সবুজ পত্রের নূতন গল্প রচনায় নিমগ্ন, এমন সময়ে হঠাৎ সেই দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যে (২৭ বৈশাখ) এণ্ড্রুস সাহেব আসিয়া হাজির। সেই রাত্রেই তাঁহার কলেরার মত ব্যাধিলক্ষণ দেখা দিল। তিনি থাকেন 'নূতন বাড়ি'র সামনের ঘরখানিতে, কবি থাকেন দেহলিতে। সংবাদ পাইয়া কবি সারা রাত্রি হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিতে লাগিলেন। অবস্থা খুবই সংকটজনক— অথচ আশ্রমে তেমন লোক নাই; কাছাকাছির মধ্যে ছিলেন কালিদাস দত্ত নামে বরিশালের একটি বয়স্ক ছাত্র, আর সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। ইহারাই এণ্ড্রুসের সেবা করিলেন। পরদিন সিউড়ি ও বর্ধমান হইতে যখন ডাক্তার আসিলেন, তখন সংকট কাটিয়া গিয়াছে। এণ্ড্রুস এই ঘটনাটি তাঁহার What I owe to Christ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন— বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের সেবার কথা।

আশু বিপদ কাটিয়া গেলে এণ্ড্রুস কলিকাতায় চলিয়া গিয়া এক নার্সিংহোমে আশ্রয় লইলেন। রবীন্দ্রনাথও কলিকাতায় গেলেন। রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী তখন সেখানে। সেইসময়ে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে একটি ক্ষুদ্র গৃহবিদ্যালয়ের অঙ্কুরোদ্‌গম হইতেছে, কবির মন সেই অঙ্কুর দেখিয়াই মহীরুহের কল্পনায় উৎসাহিত। ইহাই 'বিচিত্রা' নামে অল্পকালের মধ্যে কলিকাতার অভিজাত সাহিত্যিকদের মিলনকেন্দ্র হয়।

আসলে বিচিত্রার সূত্রপাত হয় অবনীন্দ্রনাথদের বাড়িতে। এইখানে সেই ইতিহাসটুকু সংক্ষেপে বলা দরকার। অবনীন্দ্রনাথ গবর্মেণ্ট আর্টস্কুলের কাজ ছাড়িয়া দিয়া বাড়িতে বসেন ১৯১১ সালের পর। আর্টস্কুল ত্যাগ করিলেও আর্টিস্টরা তাঁহাকে ত্যাগ করিল না। তাঁহার কাছে বহু যুবক শিল্পী আসে আর্টের প্রেরণার জন্য। তাহারা ছবি আঁকে আপন আপন ঘরে, অবনীন্দ্রনাথকে দেখাইয়া যায়, উপদেশ শোনে, ঘরে ফিরিয়া আবার আঁকে। আর্টস্কুলের দীর্ঘ শিক্ষা-

সবুজ পত্র ১৩২১ শ্রাবণ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাস্তব।
ভাদ্র	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লোকহিত।
আশ্বিন	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আমার জগৎ।
মাঘ	রাধাকমল : সাহিত্যে বাস্তবতা।
	প্রমথ চৌধুরী : বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি?
সাহিত্য ১৩২২ বৈশাখ	রাধাকমল : সাহিত্য ও স্বদেশ
সবুজ পত্র ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ	রবীন্দ্রনাথ : কবির কৈফিয়ৎ।

এ ছাড়া 'উপাসনা' প্রভৃতি সাময়িক পত্রেও কয়েকটি প্রবন্ধ বাহির হয়।

১ দেহলির সামনে দ্বিতীয় গৃহখানি এখন 'দ্বারিক' নামে পরিচিত। পিয়ার্সন বাড়িখানির একতলা নির্মাণ করেন নিজ ব্যয়ে। পরে বিশ্বভারতীর ব্যয়ে দোতলা নির্মিত হয়। ঐ বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ১৯১৯ সালে কিছুকাল ছিলেন। পরে যথাক্রমে কলাভবন, শ্রীভবন হয়। পরে কলেজের ছাত্রাবাস। ১৯৫৬ সালে সে বাড়ি সম্পূর্ণরূপে ভাঙিয়া পড়িয়া যায়।

২ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৩৯, পৃ ১৯৫-৯৬।

পদ্ধতির মধ্য দিয়া না-গিয়াও আপনার আনন্দে যে ছবি আঁকা যায়, সেই সংবাদটি অনেককে আর্টের ক্ষেত্রে টানিয়া আনিল। নন্দলাল বসু আর্টস্কুলের শিক্ষা শেষ করিয়াছেন কয়েক বৎসর পূর্বে। অবনীন্দ্রনাথ তাঁহাকে নিজগৃহে ছেলেমেয়েদের চিত্রণবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। তাহাদের সাধারণ বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য পৃথক্ শিক্ষক পূর্ব হইতেই ছিলেন। এইসব কাজকর্ম চলিত অত্যন্ত ঘরোয়াভাবে।

ইতিমধ্যে রথীন্দ্রনাথ স্থরুলের বাস উঠাইয়া কলিকাতায় আসিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি কয়েকজন আত্মীয় যুবকের সহিত মিলিয়া একটি মোটর-কারবার খুলিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনুমতি ও অর্থসাহায্য ইহাতে ছিল।[১] রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে সর্বতোভাবে সুশিক্ষিত করিবার জন্য বিশেষভাবে উৎসুক; তাঁহার শিক্ষার ভার অর্পণ করিলেন অজিতকুমারের উপর; ছবি আঁকা শিক্ষার ব্যবস্থা হইল নন্দলালের সহিত, অবনীন্দ্রনাথের নির্দেশমত এইসব যোগাযোগে কবি 'বিচিত্রা'র সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাটিকে নূতনভাবে পুনর্গঠন করিবার পরামর্শ দান করিলেন। তাঁহাদের দুই ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েরাই তখন অনেকগুলি। তা ছাড়া বাহির হইতেও কয়েকটি শিক্ষিতা মেয়ে বিচিত্রার চিত্রশালায় যোগদান করিলেন। নন্দলালই রহিলেন চিত্রবিদ্যার শিক্ষক। আর ছেলেমেয়েদের সাধারণ শিক্ষার ভার অর্পিত হইল অজিতকুমার ও যতীন্দ্রনাথের উপর, অক্ষয়কুমার পূর্ব হইতেই গৃহশিক্ষক ছিলেন।

অজিতকুমার ও যতীন্দ্রনাথ উভয়েই শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্বদেশীযুগে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের কলেজ বিভাগে পড়িয়া শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করিতে আসেন। কিন্তু কয়েক বৎসর কার্য করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে শিক্ষাবিভাগে থাকিতে হইলে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ডিগ্রী প্রভৃতির শীলমোহরের নিতান্ত প্রয়োজন; সেইজন্যই তিনি আশ্রম ত্যাগ করিয়া যান ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাদি পাস করিয়া চাকুরি গ্রহণ করেন; অথচ তিনি ছিলেন পুরা আদর্শবাদী।

অজিতকুমার দীর্ঘ দশ বৎসর কাল শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ে কাজ করিয়া ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া আসিলেন, এ প্রশ্ন স্বতঃই লোকের মনে উঠিতে পারে এবং সেদিনও যে আলোচিত হয় নাই, তাহা নহে। এবং কবিও ঐ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন। অজিতকুমার আঠারো বৎসর বয়সে বি. এ. পাস করিবার অব্যবহিত পরেই, তাঁহার স্বর্গত বন্ধু সতীশচন্দ্র রায়ের ন্যায়ই পার্থিব জীবনের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়া কবির বিদ্যালয়ে যোগদান করিয়াছিলেন; আজ তাঁহাকে আটাশ বৎসর বয়সে সেই বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া কলিকাতার জনতায় চাকুরির সন্ধানে কেন আসিতে হইল, ইহার কারণ অনুসন্ধান নিরর্থক নহে, কারণ ইহার সহিত কবিজীবনের কিছুটা যোগ আছে। রবীন্দ্রনাথ কবি, ধনী ও জমিদার— সুতরাং এই তিনটির গুণ ও দোষ যে তাঁহাতে বর্তাইবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। কিন্তু সর্বোপরি তিনি-যে কবি, এই কথাটি তাঁহাকে বিচার করিবার সময়ে বারেবারে পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। সাধারণ মানুষ যে-বিষয় ও বস্তুটিকে যেভাবে দেখেন, কবির মনশ্চক্ষে তাহার রূপ সে-ভাবে প্রতিফলিত হয় না। কবির কাছে উহা, হয় তুচ্ছ হয়, না-হয় উচ্ছ্বসিত আবেগে ভাষা পায়। সুতরাং এই বিশ্লেষণটা একটু গোড়া ঘেঁসিয়াই করা যাউক।

কবি আদর্শের দ্রষ্টা ও বাণীর বাহক; তিনি তাঁহার আদর্শকে রূপে দেখিতে চাহিয়াছিলেন, কারণ তিনি স্রষ্টা। কবির বাণীকে এতাবৎকাল রূপ দান করিয়া আসিয়াছেন বিদ্যায়তনের কর্মীরা। কর্মীদের মধ্যে কৃতবিদ্‌গণ নিজ নিজ বিদ্যা বুদ্ধি ও সাধ্য -মত আদর্শকে মূর্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বাণীর বাস্তব মূর্তি গড়া হইতে-না-হইতে

১ দ্র চিঠিপত্র ২, পৃ ৬৪, শিকাগো ১০ই কার্তিক ১৩২৩ [২৮ অক্টোবর ১৯১৬],— 'বঙ্কিম [চন্দ্র রায়] কলকাতায় তোদের মটরকারের কারখানায় যোগ দিতে যাবে আমাকে লিখেচে। বঙ্কিমকে পেলে তোদের কাজের খুব সাহায্য হবে'।

কবির মনে হইত তিনি যে-কথাটি বলিতে চাহিয়াছিলেন, কর্মী যেন সে-সুরটি ধরিতে পারেন নাই— অরূপকে রূপ দিতে গিয়া কুরূপ গড়িয়াছেন। কবির ভাবজগতে রূপ কেবলই রূপান্তরিত হইয়া সরিয়া সরিয়া চলিয়াছে ; নদী-প্রবাহকে কে বাঁধিবে, সুরকে কে গাঁথিবে। সেইজন্য কবির মানস-লোককে কোনো ব্যক্তিই বাহিরের বাস্তবে শেষ পর্যন্ত ফুটাইয়া তুলিতে পারে নাই। কবি সর্বদাই ভাবিতেন, 'নহে নহে হেথা নহে আর কোনো খানে'। অর্থাৎ এই লোক যখন পারিল না, আর ঐ লোক যখন উহার দোষত্রুটি সম্বন্ধে এতই সজাগ তখন ও-ই ব্যক্তি আদর্শকে মূর্তি দিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করুক-না কেন। বিদ্যালয়ের ইতিহাসে বরাবরই দেখা গিয়াছে যে, ক্ষমতালাভের জন্য ও কবির প্রিয়পাত্র হইবার জন্য কর্মীদের মধ্যে যে রেশারেশি চলিত তাহারই ঘাত-প্রতিঘাতে পুরাতনের পতন ও নূতনের অভ্যুদয় হইয়াছে বারেবারে। কবি এই নূতনের মধ্যে তাঁহার বাণীমুর্তির শিল্পীকে খুঁজিতেন ; তাঁহার মনে হইত তাঁহারই বাণীর দ্বারা নূতন লোক উদ্‌বোধিত হইয়াছে! তখন সেই নগণ্যকে লইয়া কবির কত আলোচনা, কত গবেষণাই না চলিত! কত কবিসুলভ কল্পনা করিয়া আনন্দ পাইতেন! মনে করিতেন বিদ্যালয়ের সমস্ত-কিছু তাহার উপর ছাড়িয়া দিলে সে যেন অঘটন ঘটাইবে, তাঁহার বাণীর ও উৎসাহের সে যেন প্রতীক হইবে— যাহা এতদিনে কেহ সফল করিতে পারে নাই— এখন সে-ই তাহা সার্থক করিয়া তুলিবে! তখন পুরাতন দূরে চলিয়া যায়, মন বলে, 'হেথা হতে যাও পুরাতন, হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে'।

অজিতকুমার কবিচরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটুকু খুব ভালো করিয়াই জানিতেন। তিনি কবির রসগ্রাহী সমঝদার ও সমালোচক ছিলেন। আমাদের আলোচ্য পর্বে আমরা দেখিয়াছি এণ্ড্রুস ও পিয়ার্সন কবিমানসে একটি বড় স্থান লাভ করিয়াছিলেন। কবির এই সময়ের পত্রধারা অধিকাংশই লেখা এণ্ড্রুসকে। এণ্ড্রুস কবিকে সর্বতোভাবে আপনার করিয়া পাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এণ্ড্রুসের এই ভক্তি-আতিশয্যকে কিভাবে দেখিতেন তাহা তাঁহার দুই-একখানি পত্র হইতে জানা যায়, আমরা পূর্বেই তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি। অজিতের সহিতও এণ্ড্রুসের খুবই সৌহার্দ্য ছিল। এক সময়ে উভয়ের মধ্যে অসংখ্য পত্রবিনিময় হইয়াছিল। অজিত বন্ধুভাবে এণ্ড্রুসকে কবিচরিত্রের এই নৈর্ব্যক্তিক প্রেমের দিকটির কথা অতি স্পষ্ট করিয়া একখানি পত্রমধ্যে বিবৃত করেন বলিয়া শুনিয়াছি। অজিত অত্যন্ত সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন— এত সরল যে অনেক সময়ে তাঁহার বন্ধুবান্ধবদের পক্ষে তাহা সহ্য করা কঠিন হইত। অজিতের এই পত্র এণ্ড্রুসের ভালো লাগে নাই ; শুনিয়াছি কবিকে তিনি ঐ পত্রখানি দেখান এবং কবি উহা পাঠ করিয়া আদৌ আপ্যায়িত হন নাই।

আমাদের মনে হয় কিছুকাল হইতে অজিত কবি সম্বন্ধে বেশ একটু critical হইতেছিলেন। গত এক বৎসর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনচরিত রচনাব্যাপদেশে অজিতকে কলিকাতায় বেশির ভাগ সময় থাকিতে হয়। কলিকাতার সাহিত্যিক সমাজের সহিত অজিতের ঘনিষ্ঠতা হয় এই সময়ে। এই সাহিত্যিকদের মধ্যে সকলেই রবীন্দ্রভক্ত ছিলেন না, অনেকে বিরোধী না-হইয়াও ক্রিটিক, আবার কেহ কেহ নিছক নিন্দাকারী। মোট কথা, এই ক্রিটিক সমাজের সহিত মেলামেশি ও বাক্‌বিতণ্ডার ফলে অজিত রবীন্দ্রনাথকে ক্রমেই critically বিচার করিতে আরম্ভ করেন। যে একদেশ-দৃষ্টি লইয়া তিনি এতাবৎ কাল আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন ও কবির রচনাকে দেখিয়া আসিয়াছিলেন তাহা বৃহত্তর বহির্জগতের সংস্পর্শে আসিয়া বহুল-পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছিল। কবির নূতন রচনাসমূহ সম্বন্ধে অজিতের পূর্বের সংস্কার অনেকখানি দূর হইয়া যায়। মোটকথা অজিতের মন নানা কারণের যোগে রবীন্দ্রনাথ হইতে সরিয়া আসিতেছিল ; কলিকাতার বৃহত্তর সাহিত্যসমাজের মধ্যে আত্মপ্রকাশের বিস্তৃততর ক্ষেত্র পাইবেন এ আশাও অন্যতম ছিল বলিয়া আমাদের ধারণা।

এইসব জটিল কারণ ব্যতীত বৈষয়িক কারণেও তাঁহার মন শান্তিনিকেতন হইতে বিমুখ হইতেছিল। এই সময়ে

অজিতের অত্যন্ত অর্থসংকট চলিতেছে। যুদ্ধজনিত সাধারণ দুর্মূল্যতার জন্যই তো মধ্যবিত্তের অভাবের একশেষ। তদুপরি অজিতের মধ্যম ভ্রাতা সুজিতকুমার মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত। সুজিত আশ্রমেরই প্রাক্তন ছাত্র; এম. এসসি. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে পাস করিয়া (১৯১৩) পাটনা কলেজে চাকুরি করিতে করিতে অসুস্থ হইয়া পড়েন। সেই অসুস্থ ভ্রাতার সমস্ত ব্যয় অজিতকেই নির্বাহ করিতে হয়; কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাবালক। এ ছাড়া নিজ স্ত্রীকন্যাপুত্র ও বৃদ্ধা জননী আছেন। এই অর্থসংকটে পড়িয়া অজিত বিদ্যালয় হইতে কিছু অধিক অর্থ প্রার্থনা করেন। কিন্তু শান্তিনিকেতনের পক্ষে ঐ টাকার ব্যবস্থা করাও সাধ্যাতীত; কারণ, যুদ্ধের জন্য বিদ্যালয়েও দারুণ অর্থাভাব; এইসকল বিচিত্র কারণের যোগাযোগে অজিতকে আশ্রম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় যাইতে হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ অজিতকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। আশ্রমের প্রতি বিরূপ হইয়া যখন বহির্জগতে প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কলিকাতায় আসিলেন, তখনও কবি তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন না। কলিকাতায় বিচিত্রা-ভবনে যে গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, তাহার মধ্যে তিনি অজিতকে টানিলেন ও বিশেষভাবে প্রতিমা দেবীর সাহিত্যশিক্ষার ভার তাঁহারই উপর অর্পণ করিলেন। কবি জানিতেন সাহিত্য-অধ্যাপনার অসামান্য শক্তি অজিতের ছিল; অজিত সাহিত্যিক ছিলেন, কেবলমাত্র সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন না।

এই ঘটনাটি বিস্তারিত ভাবে বলিবার হেতু অছে। আশ্রমের ইতিহাসে এইভাবে বহু প্রিয় জন কবিকে ত্যাগ করিয়াছেন এবং কবিও বহু কর্মীকে ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার মূলে ছিল আদর্শের দ্বন্দ্ব, নিছক অর্থনৈতিক কারণ নহে।

এইখানে কবির হইয়া একটি কথা বলিবার আছে যে, যাঁহারা আশ্রম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি মনে কোনো ক্ষোভ পোষণ করিতেন না, তাহাদের প্রতি স্নেহের অভাব কোনোদিনই দেখা যায় নাই এবং বাহিরে গিয়া তাহারা যাহাতে সুখে থাকে তজ্জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিতেন— এ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। তবে তিনি বলিতেন যাহারা আশ্রমের মঙ্গলকর্ম উদ্‌যাপনের সহায়, তাহারা টিকিয়া যাইবে, যাহারা যাইবার তাহারা যাইবে। তিনি ভালো করিয়াই জানিতেন যে অর্থদ্বারা কাহাকেও বাঁধিয়া রাখা যায় না, আদর্শের প্রতি আনুগত্যই বাঁধিয়া রাখে।

কলিকাতার বিচিত্রাভবন সম্বন্ধে কবির এখন মহা উৎসাহ, শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে যেন দোমনা।

এইবার কলিকাতা বাসকালে কবি জানিতে পারিলেন যে (৩ জুন ১৯১৫) ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহাকে নাইটহুড্ দান করা হইয়াছে— তিনি Sir Rabindranath হইলেন। সাহিত্যে খ্যাতির জন্য ইতিপূর্বে ভারতে কেহ Sir উপাধি পান নাই; এতাবৎকাল Sir ছিল বিশিষ্ট সরকারী কর্মচারীদের সম্মানসূচক উপাধি।

বাহিরের দিকে টান

সবুজ পত্র বাহির হইলে প্রথম বৎসরে রবীন্দ্রনাথ বারোটি গল্প লেখেন বারো মাসে। নূতন বৎসরে শুরু করিলেম ধারাবাহিক উপন্যাস 'ঘরে বাইরে' (১৩২২ বৈশাখ-ফাল্গুন)। এ ছাড়া সাহিত্য সংগীত ও কলা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতেছেন। 'সোনার কাঠি'তে[১] সাহিত্য ও সংগীত সম্বন্ধে এবং 'ছবির অঙ্গে'[২] ভারতীয় কলা সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। 'বিচিত্রা' গৃহবিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়-জিজ্ঞাসা দ্বিতীয় রচনার উদ্‌বোধক।

১ সোনার কাঠি, সবুজ পত্র ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ। দ্র পরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ৫২১-২৪।

২ ছবির অঙ্গ, সবুজ পত্র ১৩২২ আষাঢ়। দ্র, পরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ. ৫১২-২০।

কবির মতে বিদেশের সোনার কাঠির স্পর্শে আমাদের সাহিত্যে শিল্পে নূতন প্রাণের সাড়া পড়িয়াছে। "বঙ্কিম আনলেন সাতসমুদ্রপারের রাজপুত্রকে আমাদের সাহিত্য-রাজকন্যার পালঙ্কের শিয়রে।" সেই হইতে বাংলা সাহিত্যের মুক্তি।

"বিদেশের সোনার কাঠি যে জিনিষকে মুক্তি দিয়েছে সে ত বিদেশী নয়— সে যে আমাদের আপন প্রাণ। তার ফল হয়েছে এই যে, যে বাংলাভাষাকে ও সাহিত্যকে একদিন আধুনিকের দল ছুঁতে চাইত না এখন তাকে নিয়ে সকলেই ব্যবহার করছে ও গৌরব করছে। অথচ যদি ঠাহর ক'রে দেখি তবে দেখতে পাব গদ্যে পদ্যে সকল জায়গাতেই সাহিত্যের চালচলন সাবেক কালের সঙ্গে সম্পূর্ণ বদলে গেছে।" রবীন্দ্রনাথ যে কেবল সাহিত্যের মধ্যে এই নূতন প্রাণের স্পর্শের কথা বলিলেন তাহা নহে, চিত্রকলার যে নবজীবন লাভের লক্ষণ দেখা গিয়াছে তৎসম্বন্ধে তাঁহার মত এই যে, উহারও মূলে "সেই সাগরপারের রাজপুত্রের সোনার কাঠি আছে"। কবির আক্ষেপ, সংগীতে সে স্পর্শ পৌঁছায় নাই। পাশ্চাত্যসংগীতের আমদানী কেন হইবে না, এ কথা কবির মনে উঠা খুবই স্বাভাবিক। যৌবনের আরম্ভে তিনি বাংলা গানে বিদেশী সুর বসাইয়াছিলেন এবং তাহা চালু হইয়া গিয়াছে। ভারতীয়রা পাশ্চাত্য সাহিত্য; পাশ্চাত্য আর্ট, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-দর্শন সব কিছুই গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু করিতে পারে নাই পাশ্চাত্য সংগীত। কবি লিখিতেছেন, "দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুরের মধ্যে ইংরেজি সুরের স্পর্শ লেগেছে বলে কেউ কেউ তাকে হিন্দু সংগীত থেকে বহিষ্কৃত করতে চান। যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দু সংগীতে বিদেশী সোনার কাঠি ছুঁইয়ে থাকেন তবে সরস্বতী নিশ্চয়ই তাঁকে আশীর্বাদ করবেন।...হিন্দু সংগীতের কোনো ভয় নেই— বিদেশের সংস্রবে সে আপনাকে বড়ো করেই পাবে।"

দেশে নূতন যে গান আসিয়াছে, সে সম্বন্ধে বলিতেছেন, "লোকের ভালো লাগছে, সবাই শুনতে চাচ্ছে, শুনতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে না— এটা কম কথা নয়। অর্থাৎ গানের পঙ্গুতা ঘুচল, চলতে শুরু করল। প্রথম চলাটা সর্বাঙ্গীণ সুন্দর নয়, তার অনেক ভঙ্গি হাস্যকর এবং কুশ্রী— কিন্তু সব চেয়ে আশার কথা যে, চলতে শুরু করেছে— সে বাঁধন মানছে না।" আধুনিক গানের এত বড় সমর্থন সে সময়ে আর কেহই করেন নাই।

সোনার কাঠির স্পর্শ আর্টেও লাগিয়াছে; সেই কথা তুলিয়া কবি লিখিলেন 'ছবির অঙ্গ'।

রবীন্দ্রনাথের 'ছবির অঙ্গ' রচিত হইবার পূর্বে অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্রকলার ষড়ঙ্গ[১] বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন 'ভারতী' পত্রিকায় (১৩২১)। রূপভেদ প্রমাণ ভাব লাবণ্যযোজনা সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গ— এই ছয়টি অঙ্গ রহিয়াছে চিত্রকলার মূলে। অবনীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বটির সম্যক্ আলোচনা করেন। সেই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কবির মনে যেসব প্রশ্ন উদিত হয় তাহাই 'ছবির অঙ্গ' প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করিলেন। এই প্রবন্ধে আর্ট কী তাহার আভাস সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে। সীমার কল্পনাতেই রূপের সৃষ্টি— একের মধ্যে ভেদ ঘটিলেই রূপের জন্ম। এই ভেদের দ্বারা বহুর যেমন জন্ম হয়— মিলের দ্বারা তেমনি বহু রক্ষা পায়। বহু যখন এলোমেলো হইয়া ভিড় করে, তখন আমরা "বহুকেই দেখি, একেকে দেখিতে পাই না, অর্থাৎ তখন সীমাকেই দেখি ভূমাকে দেখি না— অথচ এই ভূমার রূপই কল্যাণরূপ, আনন্দরূপ।...মানুষ তার বিজ্ঞানে বহুর মধ্যে যখন একেকে পায় তখন নিয়মকে পায়, দর্শনে বহুর মধ্যে যখন একেকে পায় তখন তত্ত্বকে পায়, সাহিত্যে শিল্পে বহুর মধ্যে যখন একেকে পায় তখন সৌন্দর্যকে পায়, সমাজে বহুর মধ্যে যখন একেকে পায় তখন কল্যাণকে পায়। এমনি করিয়া মানুষ বহুকে লইয়া তপস্যা করিতেছে একেকে পাইবার জন্য।" এই কয়েকটি পংক্তিতে কবির জীবন-দর্শনের মূল তত্ত্বটি প্রকাশ পাইয়াছে— কবি আর্টকে এই দৃষ্টিতে বিচার করিয়াছেন।

১ ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ৬১, বিশ্বভারতী ১৩৫৪ বৈশাখ।

গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিল আষাঢ়ের প্রথম দিবসে, কবি আশ্রমে ফিরিলেন ৮ই আষাঢ় (১৩২২)। মহাযুদ্ধের জন্য বিদ্যালয়ের সম্মুখে নানা সমস্যা আসন্ন। যুদ্ধের ফলে প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য যেভাবে বাড়িতেছে, তাহাতে দেশের মধ্যে অভাব ও দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা সকলেই করিতেছেন। ছাত্রসংখ্যাও হ্রাস পাইতে আরম্ভ হইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, নানা কারণে কবির মন শান্তিনিকেতনের কর্মে বসিতেছে না; সে যেন খোলা পথের পথিক। এণ্ড্রুসকে লিখিলেন যে, 'যাযাবরের মন তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে, (I am in a nomadic mood)। বিদ্যালয়ের বন্ধন হইতে আপনাকে ছিন্ন করিতে অপারগ বলিয়া অন্তরে কেন যে বেদনা বোধ করিতেছেন, বুঝিতে পারি না। এণ্ড্রুসকে লিখিতেছেন যে, তিনি নিজের ভিতর একটা অজানা আবির্ভাবের আশঙ্কা করিতেছেন— যেন পুনরায় একটা নব প্রেরণা সম্মুখবর্তী। একটি তথ্য তাঁহার কাছে ক্রমশই স্ফুটতর হইতেছে যে, কবিরা কখনো কোনো বিশেষ কাজে নিজেদের বাঁধিয়া রাখিবে না। আসলে বিদ্যালয়ের পাঁচ রকমের কাজ ও কমিটি আর ভালো লাগিতেছে না— তাঁহার সন্দেহ তাঁহার আদর্শ কিছুতেই বিদ্যালয়ে দানা বাঁধিতেছে না। তাই সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া তাঁহার মন দায়িত্বহীন উন্মুক্ততার প্রান্তরে যাইবার জন্য ব্যাকুল (my life is emerging once again upon the open heath of irresponsibility)।[১]

শান্তিনিকেতনে দিন দশ-বারো থাকিয়া জুলাইএর গোড়ায় কলিকাতায় চলিয়া গেলেন; তথা হইতে এণ্ড্রুসকে লিখিতেছেন যে বৈরাগ্য তাঁহার ধর্ম নহে, এক বন্ধন হইতে অন্য বন্ধন গ্রহণ করিবার স্বাধীনতাই তাঁহার কাম্য। তাঁহার মন নূতনের মাঝে বারেবারে আপনার মুক্তি খুঁজিয়াছে। কোনো ভাবকে একবার মূর্তি দিয়া তাহার মধ্যে আবদ্ধ থাকা কবির ধর্ম নহে।[২] My mind must realise itself anew. Once I give form to my thought I must free myself from it. তাঁহার মতে রূপ হইতেছে মূঢ় মূক বস্তুরাশি, স্তব্ধ থাকিবার জন্যই তাহাদের প্রয়াস, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহারা আপনিই ভাঙিয়া চুরিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়। কবির এই ধরণের উক্তির কারণ ধীরে ধীরে জমিতেছিল শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয় লইয়া।

পিয়ার্সন যে আদর্শবাদ লইয়া সমস্ত ত্যাগ করিয়া শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন, আশ্রমের যে আদর্শমূর্তি তাঁহার কল্পলোকে ছিল— রবীন্দ্রনাথের সহিত পত্রালাপ ও বাক্যালাপ করিয়া তিনি শিক্ষাদর্শন সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়াছিলেন, আজ বাস্তবের সহিত তাহার পার্থক্য দেখিয়া, তিনি মনে গভীর দুঃখ পাইলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিকলি-আঁটা স্কুলকে তিনি সেবা করিতে আসেন নাই, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীদের ইংরেজি শিখাইয়া ত্রাণ করাইবার জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত বিসর্জন দেন নাই। রবীন্দ্রনাথ ইহা জানিতেন; কিন্তু ব্যাবহারিক দিক হইতে ম্যাট্রিকুলেশনের জন্য ছাত্র প্রস্তুত না করিলেও নয় তাহাও বুঝিতেন। সেইজন্য আশ্রমের মধ্যে বিদ্যালয় গড়িয়া তুলিলেন, বর্তমানের প্রয়োজনকে অবহেলা করিয়া অবাস্তবতাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় জীবনশিল্পীর পক্ষে সম্ভব নহে। কবি অন্তর হইতে বহুবার চাহিয়াছেন— বিদ্যালয়কে বাহিরের বন্ধন হইতে মুক্ত করিবেন; কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার প্রধান অন্তরায় ছিলেন সহকর্মীরা ও অভিভাবকগণ। অথচ কর্মী ও অভিভাবকগণের পূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া তাঁহার পক্ষে বিদ্যালয় পরিচালনা করাও সম্ভব ছিল না। ফলে অনেকটা অসহায়ভাবে আপনার আদর্শ সম্বন্ধে বাহিরের ঘটনাস্রোতের সহিত আপস করিতে বাধ্য হইতেন। ব্যাবহারিকতার দিক হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগ যুগপৎ নানাভাবে তাহাদের শাসনজাল বিস্তার করিয়া বিদ্যালয়কে গ্রাস করিতেছে— সেদিকে কাহারও

১ ***Letters to a Friend*, p 59-60 : Santiniketan, 30 June 1915.**

২ ***Letters to a Friend*, Calcutta, July 7, 1915.**

বিশ্লেষণী দৃষ্টি যাইতেছিল না। পিয়ার্সনের পক্ষে তাঁহার অন্তরের আদর্শবাদের সহিত বিদ্যালয়ের ব্যাবহারিক বাস্তবতার আপস করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথের মন পিয়ার্সনের চিন্তাধারার সহিত সম্পূর্ণ সায় দেয়। তিনি একখানি পত্রে লিখিতেছেন, 'In Santiniketan, some of my thoughts have become clogged by accumulations of dead matter'। আদর্শের সহিত বাস্তবকে মিলাইতে পারিতেছেন না, অথচ মিলাইবার জন্য জোরও করিবেন না। তাঁহার বিশ্বাস বক্তৃতায় কিছু কাজ হয় না, জবরদস্তিতে কাজ নিষ্ফল হয়। "I do not believe in lecturing, or in compelling fellow-workers in coercion; for all true ideas must work themselves out through freedom. Only a moral tyrant can think that he has the dreadful power to make his thoughts prevail by means of subjection. It is absurd to imagine that you must create slaves in order to make your ideas free. I would rather see them perish than leave them in the charge of slaves to be nourished. There are men who make idols of their Ideas and sacrifice humanity before their altars. But in my worship of the idea I am not a worshipper of Kali.

So the only course left open to me, when my fellow workers fall in love with the form and cease to have complete faith in the idea, is to go away and give my idea a new birth and create new possibilities for it. This may not be a practical method, but possibly it is the right one."[১]

কবির এই উক্তিকে চরম বলিয়া গ্রহণ করিবার কারণ নাই; কারণ ইহা মনের একটি বিশেষ অবস্থার প্রতিক্রিয়া। যখন তাঁহার মনের এই নিষ্ক্রিয় দুর্বল (passive)-ভাব কাটিয়া যায়, তখন তিনি তাঁহার ideaকে মুক্তি দিবার জন্য কর্মীরূপ ধারণ করেন। এণ্ড্রুসকে লিখিত পত্রমধ্যে যে হতাশ্বাসের আভাস পাইতেছি তাহার কারণ তাঁহার সহকর্মীরা তাঁহার আদর্শ বা আইডিয়াকে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না, বাস্তব বা form-এর উপর তাঁহাদের সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রিত। সেইজন্য তাঁহার পক্ষে সবচেয়ে ভালো পন্থা হইতেছে শান্তিনিকেতন হইতে দূরে থাকা।

যাহাই হউক, কলিকাতায় আসিয়াও আরাম পাইলেন না; তখন শিলাইদহে চলিলেন। তৎপূর্বে এণ্ড্রুসকে লিখিতেছেন, "I am a born nomad···and my work has to be fluid, if it is to be my work."— আমি জন্মভবঘুরে; আমার কাজ যদি আমারই হইতে হয় তবে তাহাকে চলিষ্ণু রাখা চাই। সেইজন্য আমার কর্তব্য হইতেছে কাজ আরম্ভ করা এবং তার পর তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া। আমার সৃষ্টিকে যদি আমি না ত্যাগ করি ও দূরে না রাখি, তবে তাহাদের আদর্শ অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব হয় না।[২]

শিলাইদহে যাইবার পূর্বে কবির ভবঘুরে মন জাপানের দিকে একবার ঝুঁকিয়াছিল। শিলাইদহে পৌঁছিয়া[৩] এণ্ড্রুসকে ১৬ই জুলাই লিখিতেছেন, "I wrote to you in a railway train, informing you of my proposed visit to Japan". জাপানে যাইবার কল্পনা অনেক দিন হইতে মনে মনে আছে। শান্তিনিকেতন হইতে ৪ঠা এপ্রিল (১৯১৫) রোটেনস্টাইনকে লিখিত পত্রে তাহার আভাস পাই। কিন্তু নানা কারণের জন্য সে সংকল্প ত্যাগ করিতে হয়; তিনি লেখেন, "I give up Japan at least for the present. Not for any sudden failure

১ *Letters to a Friend*, p 60-61.

২ ibid, p 61, Calcutta, 11, July 1915.

৩ ibid, p 63, 16 July 1915.

of courage or enthusiasm but for the same blessed reason that brings a modern war to its halt. My finance is hopeless, mainly owing to the European complication".[১] দুই দিন পরে রথীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন, "আমার পক্ষে কোনো অপরিচিত সুন্দর দেশের শান্তি হয়তো নিরতিশয় আবশ্যক বলেই এই জাপান প্রভৃতিতে যাওয়ার প্রস্তাব এত বারম্বার নানা বাধাসত্ত্বেও ঘুরে ঘুরে আস্‌চে।" শান্তিনিকেতন হইতে চলিয়া আসিয়া কবি যেন তৃপ্ত ; রথীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন, "অনেকদিনের পরে জলের ধারা ও সবুজ মাঠের সংস্রব ও নির্জন পেয়ে আমি যেন নিজের সত্যকে আবার ফিরে পেয়েছি— এইখানেই সুদীর্ঘ কাল পড়ে থাকতে ইচ্ছা করচে।"[২]

এখন কবিতা ও গান কিছুরই প্রেরণা নাই— তাই বই পড়িতে ইচ্ছা। কী কী বই কিনিতে দিলেন তাহার তালিকা দিলেই পাঠক দেখিবেন কবির মন কী সর্বগ্রাহী। বইগুলির নাম— Haldane's এর *The Pathway to Reality* (2 vols. Gifford Lectures). Soddy's *Interpretation of Radium.* Locke's *Recent advances in the study of variation heredity and evolution.* কিন্তু জমিদারি সেরেস্তায় অনেক কাজ জমিয়াছে। তজ্জন্য ভাবিতেছেন, তাঁহাকে কিছুকাল তথায় থাকিতে হইবে। প্রজাদের মধ্যে আসিয়া কবি বেশ বুঝিতেছেন যে তিনি শান্তিনিকেতনের মোহে ইহাদের অবহেলা করিয়া অন্যায় করিয়াছেন। "I must confess that I have been neglecting these people, while I was away from them in Santiniketan ; and I am glad that I am now with them once more, so that I may be more actively be mindful of them."[৩] বোধ হয় সেইজন্য কবির মনে পুনরায় পল্লী-উন্নতির কথা জাগিতেছে। কলিকাতায় হিতসাধন মণ্ডলীর উদ্বোধন সভায় পল্লীর উন্নতি সম্বন্ধে যাহা কথায় বলিয়া আসিয়াছেন, তাহাকে কাজে পরিণত করার দায়িত্বও তাঁহার আছে। চাষীদের কঠিন পরিশ্রমের ফলে যে ফসল পাওয়া যায় তাহা বিপুল হইলেও সামান্য কেন, সে প্রশ্ন কবিকে ভাবিত করিয়া তুলিতেছে। তাঁহার আশা ও বিশ্বাস আছে যে, একদিন বিজ্ঞান চাষীদের সহায় হইবে। "We all hope that here,···Science in the end will help man. She will make the necessities of life easily accesible to every man, so that humanity will be freed from the tyranny of matter which now humiliates her. This struggling mass of men is great in its pathos, in its latency of infinite power." (ibid, p 64)। কবির এই ভাবনা যে কত সত্য, তাহা অচিরকালের মধ্যে রুশের জাগ্রত জনশক্তির মধ্য দিয়া প্রমাণিত হইল ; এ দেশেও সেই সুপ্তসিংহের জাগরণ-লক্ষণ দেখা দিয়াছে। জাগ্রত রুশ আজ তাহার পূজার বেদিতে বিজ্ঞানেশ্বরকে বসাইয়া চিত্তের সমস্ত শক্তি দিয়া তাহাকে সেবা করিতেছে।

জুলাই মাসের শেষাশেষি কবি শিলাইদহ হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন— নদীতীরে 'সুদীর্ঘ কাল পড়ে থাকতে ইচ্ছা' কার্যকরী হইল না, কারণ ভিতরে ভিতরে খোলাপথের আহ্বান তাঁহাকে চঞ্চল করিতেছে— এক জায়গায় তাই স্থির থাকা অসম্ভব। দিন-বারো মাত্র শিলাইদহে ছিলেন (১৬-২৮ জুলাই)। কলিকাতায় দিন-দশ থাকিয়া ৯ই অগস্ট শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। কিন্তু ১৯শে অগস্ট পুনরায় কলিকাতায় গেলেন এবং তথা হইতে পুনরায় উত্তর-বঙ্গে জমিদারি তদারকের জন্য যাত্রা করিলেন।[৪]

১ *Men and Memories* 1900-1922, p 300.
২ চিঠিপত্র ২, ১৮ জুলাই ১৯১৫, পৃ. ৩৪।
৩ *Letters to a friend*, p 64. Shilieda. 23 July, 1915.
৪ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৪০, ৪১।

তথা হইতে (২৩ ভাদ্র ১৩২২) প্রমথ চৌধুরীকে লিখিতেছেন, "কালিগ্রাম ও বিরহামপুরে যাতে বিভাগের কাজে কোনো ত্রুটির সম্ভাবনা না থাকে আমি সেইজন্যে বিশেষভাবে লেগেছি।...আমি এবার কালিগ্রামে প্রত্যেক বিভাগে ঘুরেচি...কালিগ্রামে সাধারণ-বৃত্তি বৎসরে এগারো হাজার টাকা ওঠে।...বিভাগে এর যে রকম হিসাব রাখা চলছিল সে দেখে আমি ভারি বিরক্ত হয়ে এসেচি। তার আমি পাকা নিয়ম করে দিয়েছি। · আমি এ যাত্রায় এখানে এসে কিছুমাত্র ছুটি পাইনি— দিনরাত টোটোঁ এবং বক্‌বক্‌ করতে হয়েছে।" এইটি জমিদার-রবীন্দ্রনাথের কথা। এই পত্রেই লিখিতেছেন যে, ভাদ্র কিস্তির 'ঘরে বাইরে' পাঠাইয়া দিয়াছেন, সেটা সাহিত্যিক-রবীন্দ্রনাথের কথা।

শিলাইদহ হইতে ১০ সেপ্টেম্বর কবি কলিকাতায় ফিরিলেন[১] ও দুই-একদিনের মধ্যেই শান্তিনিকেতনে আসিলেন। এণ্ড্রুস ও পিয়ার্সন তখন ফিজি দ্বীপে যাইবার আয়োজনে ব্যস্ত। ১৭ই তাঁহারা কলিকাতা যাত্রা করিলেন ও এক সপ্তাহের মধ্যে সমুদ্রপাড়ি দিলেন।[২]

পিয়ার্সনরা কলিকাতায় চলিয়া যাইতেই কবির মন দেশের বাহিরে যাইবার জন্য আবার ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এণ্ড্রুসকে কলিকাতায় লিখিলেন (২৩ সেপ্টেম্বর), "You and Pearson are the first of our brood who have left their nest for the passage across the seas ; and I can hardly control my wings." বাহিরে যাইবার জন্য মন চঞ্চল হইলেও শান্তিনিকেতনের বালকদের লইয়া 'শারদোৎসব' নাটক অভিনয় করিতে ভালো লাগিতেছে। "I rather like it. For it gives me opportunity to come close to the little boys, who are a perpetual source of pleasure to me" (ibid, p 67)। অথচ ঠিক দুই মাস পূর্বে (২৩ জুলাই) লিখিয়াছিলেন, "I am afraid my life at the Asram was at last making me into a teacher, which was unsatisfactory to me, because unnatural." (ibid, p 64)। কবির কাছে সবই সত্য, যখন যেটি সম্মুখে আসে, তখন তাহাকেই একান্ত করিয়া দেখেন— "এই-যে এসব ছোটোখাটো, পাইনি এদের কুলকিনারা"। বহুদিন পূর্বে লেখা একখানি পত্রে কবি এই কথাটিই বলিয়াছিলেন, তাহা পাঠকদের স্মরণে আছে আশা করি।

সেপ্টেম্বরের শেষভাগে কবিকে পুনরায় কলিকাতায় যাইতে হইল, রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুবার্ষিকী-সভায় (২৭ সেপ্টেম্বর) বক্তৃতার জন্য। কবি সভায় কোনো লিখিত ভাষণ দান করেন নাই।[৩] আমরা পূর্বেই বলিয়াছি এই সময়ে কবির সাহিত্যসৃষ্টি অত্যন্ত মন্দগতি। তবে মাঝে-মাঝে বাহিরের অভিঘাতে কবিকে লেখনী ধারণ করিতে হয়। তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত হইতেছে 'স্ত্রীশিক্ষা'[৪] প্রবন্ধটি।

শ্রীমতী লীলা মিত্র কবিকে স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখিয়া কবির অভিমত জানিতে চাহেন ; কবি তাহারই উত্তরে প্রবন্ধটি লেখেন। ছেলেদের ও মেয়েদের শিক্ষা একই রূপ হইবে, না পৃথক পৃথক হইবে— এই প্রশ্ন যতদিন নারীশিক্ষা-আন্দোলনের উদ্‌ভব, ততদিনের পুরাতন কথা। রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, "বিদ্যার দুটো বিভাগ আছে। একটা বিশুদ্ধ জ্ঞানের, একটা ব্যবহারের। যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান সেখানে মেয়ে-পুরুষের পার্থক্য নাই, কিন্তু যেখানে ব্যবহার সেখানে পার্থক্য আছেই। মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের

১ চিঠিপত্র ৪, পত্র নং ২০, ২৩ ভাদ্র ১৩২২ (৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৫)। "কাল কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি। সেখানে দুই একদিন থেকেই বোলপুর যাব— বোলপুরে এবার শারদোৎসব হবার কথা আছে।"

২ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৪২, শান্তিনিকেতন ৩০ ভাদ্র ১৩২২ (১৬ সেপ্টেম্বর ১৯১৫)। "এখানে এসে অবধি এণ্ড্রুজের হাতে পড়েচি, কাল সে চলে যাবে।"

৩ প্রবাসী ১৩২২ কার্তিক। বক্তৃতার মর্ম 'সঞ্জীবনী' হইতে গৃহীত। দ্র. ভারতপথিক রামমোহন, ১৩১৯।

৪ স্ত্রীশিক্ষা, সবুজ পত্র ১৩২২ ভাদ্র-আশ্বিন। শিক্ষা, ১৩৫১ চৈত্র সংস্করণ।

শিক্ষা চাই, কিন্তু তার উপরে মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য··· ব্যাবহারিক শিক্ষা" দানের একটা বিশেষত্ব আছে। সেই ব্যাবহারিক শিক্ষা কী রূপ গ্রহণ করিবে সে-বিষয়ে কবি বিস্তারিত আলোচনা করেন নাই; তবে আধুনিক সভ্য জগতে মেয়েরা দায়ে পড়িয়া পুরুষের অনুগত হইয়াছে বলিয়া যে ধুয়া তুলিয়াছে, কবি তাহার নিন্দা করিয়া বলিলেন যে স্ত্রী-হওয়া মা-হওয়া মেয়েদের স্বভাব, দাসী-হওয়া নয়। মেয়েরা স্বামীগৃহে দাসীপনা করে বলিয়া যে কথাটা প্রায় শুনা যায় তদ্‌সম্বন্ধে কবি বলেন 'স্বজাতির বিরুদ্ধে এই-যে অপবাদ ঘোষণা' তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। মেয়েদের মধ্যে স্নেহ প্রেম আছে বলিয়াই তাহারা সংসার-বন্ধন স্বীকার করে, তাহাকে দায় বলিলে বিধাতার সমস্ত সৃষ্টিরহস্যকে অপমান করা হয়। "স্নেহ আছে বলিয়াই মা সন্তানের সেবা করে, তার মধ্যে দায় নাই; প্রেম আছে বলিয়াই স্ত্রী স্বামীর সেবা করে, তার মধ্যে দায় নাই।···

"মেয়েদের ভালোবাসার উপরই সমাজ ঝোঁক দিয়াছে, এইজন্য মেয়েদের দায় ভালোবাসার দায়; পুরুষের শক্তির উপর সমাজ ঝোঁক দিয়াছে, এইজন্য পুরুষের দায় শক্তির দায়।" কবি প্রবন্ধশেষে নারীর আদর্শ সম্বন্ধে লেখিকার কয়েকটি পংক্তি উদ্‌ধৃত করিয়াছেন— 'সংকটে সহায়, দুরূহ চিন্তায় অংশী এবং সুখে দুঃখে সহচরী হইয়া সংসারে তাহার প্রকৃত সহযাত্রী হইবেন।'

খুচরা প্রবন্ধ ও নিয়মিত 'ঘরে বাইরে' লেখা ছাড়া কবিতা ও গান এ সময়ে খুবই কম চোখে পড়ে। তবে মাঝে মাঝে গান না লিখিয়া থাকিতে পারেন না, কারণ সেটা তাঁহার কবিধর্ম। আমাদের মনে হয় নিম্নলিখিত গানগুলি এই বর্ষা-শরত কালের রচনা— 'কান্নাহাসির দোল-দোলানো' 'কোন্ খেপা শ্রাবণ ছুটে এল আশ্বিনেরই আঙিনায়' 'তোমার নয়ন আমায় বারে বারে' 'আমার নিশীথ রাতের বাদলধারা' 'কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে'।[১]

কাশ্মীর-ভ্রমণ ও পরে

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় বন্ধ হইলে আশ্বিনের শেষভাগে কবি কাশ্মীর যাত্রা করিলেন। সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ, তাঁহার পত্নী প্রতিমা দেবী, তদীয়া ভগ্নী কমলাদেবী ও তাঁহার স্বামী হেমচন্দ্র মজুমদার। পরিবার ও পরিজন ছাড়া সঙ্গে ছিলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। সেবার কাশ্মীরে আরও অনেকে গিয়েছিলেন— বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সত্যরঞ্জন দাশ (S. R. Das) ও জ্যোতিষরঞ্জন দাশের (J. R. Das রেঙ্গুনের) পরিবার। সকলেই কবির পরিচিত।

কাশ্মীরের তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী পণ্ডিত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিছুকাল পূর্বে শান্তিনিকেতনে আসেন; তিনিই কবিকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। শ্রীনগরের পাদমূলে বিতস্তানদীবক্ষে টিকারীর মহারাজার 'পরীস্থান' নামক গৃহনৌকাখানি কবির জন্য নির্দিষ্ট হয়।

শ্রীনগরে পৌঁছিয়া কবি লিখিতেছেন, 'অভিনন্দন অভ্যর্থনা চলিতেছে, এখনও কাশ্মীরে পৌঁছাই নাই।' "I am technically in Kashmir, but still have not entered its gate. I am passing through the purgatory of public receptions and friendly solicitations; but paradise is in sight"[২] শ্রীনগরে মহীদল কলেজের অভ্যর্থনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তথাকার আয়োজনকারীদের অন্যতম ছিলেন অধ্যাপক মুকুন্দলাল চক্রবর্তী।

১ এই গান কয়টি প্রবাসী ১৩২২ কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। দ্র গীতলিপি ও গীতিপঞ্চাশিকা, গীতবিতান।

২ *Letters to a Friend*, p 70. Srinagar, 12 Oct, 1915 (২৫ আশ্বিন ১৩২২)।

শ্রীনগর বাসকালে একটি কৌতুকজনক ঘটনা ঘটে। বৃটিশ রেসিডেণ্ট শ্রীনগরের সর্বময় কর্তা। বিশিষ্ট আগন্তুকরা রাজধানীতে আসিয়া তাঁহার গৃহে গিয়া কার্ড রাখিয়া আসিতেন; অতঃপর তিনি তাঁহাদের কাহাকেও লাঞ্চে, কাহাকেও বা ডিনারে যথাযোগ্যমতে আহ্বান করিতেন। রবীন্দ্রনাথ নূতন Sir হইয়াছেন, সকলেই মনে করিয়াছিল কবি বৃটিশ আমলাতন্ত্রের আদবকায়দা মত রেসিডেণ্টের বাড়িতে গিয়া কার্ড রাখিয়া আসিবেন। কিন্তু তিনি তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলেন না। রেসিডেণ্ট দূর হইতে একদিন কবিকে দেখেন; এবং তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার ইচ্ছা এখানে-সেখানে প্রকাশ করেন। কিন্তু কবি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই; রেসিডেণ্ট বৃটিশ শাসনের আদব-কায়দা ভাঙিতে পারিলেন না।[১]

রবীন্দ্রনাথ শ্রীনগরের বাহিরে বড় কোথাও যান নাই। একদিন কাশ্মীরের বিখ্যাত মার্তণ্ড মন্দিরের ভগ্নস্তূপ দেখিবার জন্য যান; এ ছাড়া ঐ দেশের বিখ্যাত দ্রাক্ষাক্ষেত গন্ধর্বলে বেড়াইতে যান। তাঁহার নৌকা-বাসে সকলেই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিত।

শ্রীনগর বাসকালে কবিকে দুইটি কবিতা লিখিতে দেখি 'মানসী' (৭ কার্তিক) ও 'বলাকা'। এ ছাড়া সমসাময়িক কয়েকজন বাঙালি কবির কবিতা অনুবাদ করিতে দেখা যায়।[২] 'বলাকা'[৩] কবিতা হইতে রবীন্দ্রনাথের এই যুগের কবিতাগুচ্ছের নামকরণ করা হয়। এই 'বলাকা' কবিতার সহিত তুলনা হইতে পারে 'রূপ'[৪] কবিতার। আমাদের মতে দুইটি কবিতা পাশাপাশি পড়িলে একটিকে আর-একটির পরিপূরক মনে হইবে এবং দুইটিতে মিলিয়া যে-একটি অখণ্ড তত্ত্বপ্রকাশ করিয়াছে তাহা পাঠকদের নিকট অস্পষ্ট রহিবে না।

কাশ্মীর-ভ্রমণে দিন পনেরো মাত্র যায়। কলিকাতায় আসিয়া মারা দেবীকে (১৯ কার্তিক) লিখিতেছেন, "কাশ্মীর ঘুরে এলুম। আমার ত কিছুমাত্র ভাল লাগল না— যেখানেই যাই কেবলি গোলমাল— লোকজনের উৎপাত…। শ্রীনগরে নৌকোয় ছিলুম— কিন্তু একটুও শান্তি বা আনন্দ পাই নি বলে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলুম।"[৫]…প্রমথ চৌধুরীকে (২০ কার্তিক) লিখিতেছেন, "কাশ্মীরে খুব আরামে ছিলুম তা নয়। একেবারে পেট ভরে ক্লান্ত হয়ে ফিরেচি।"[৬]

কলিকাতা বাসকালে একটিমাত্র কবিতা লেখেন— 'ঝড়ের খেয়া'[৭]। য়ুরোপে যে মহাযুদ্ধ চলিতেছে, তাহারই বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে প্রতি ছত্রে— আর তাহারই মধ্যে জাগিয়াছে কবিমনের অন্তহীন আশা। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা-নিচয়ের অন্যতম এটি। কবি বড় আশায়, বড় বেদনায় বলিয়াছিলেন—

> বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
> এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা।
> স্বর্গ কি হবে না কেনা।…
> নিদারুণ দুঃখরাতে
> মৃত্যুঘাতে
> মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
> তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?

১ এই তথ্যগুলি চক্রবর্তী চাটার্জি কোম্পানীর অন্যতম মালিক অধ্যাপক মুকুন্দলাল চক্রবর্তীর নিকট হইতে শোনা। ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮।
২ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৪৩, ২৪ অক্টোবর ১৯১৫ [৭ কার্তিক ১৩২২]।
৩ 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি'— সবুজ পত্র ১৩২২ কার্তিক। বলাকা ৩৬, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২।
৪ ২৭ পৌষ ১৩২১, সুরুল। সবুজ পত্র ১৩২২ ফাল্গুন। বলাকা ১৬, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২।
৫ চিঠিপত্র ৪, পত্র ২১।
৬ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৪৪। [২০ কার্তিক ১৩২২]।
৭ ঝড়ের খেয়া, ২৩ কার্তিক ১৩২২ [৯ নভেম্বর ১৯১৫ কলিকাতা]। বলাকা ৩৭, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২। দ্র, রবিরশ্মি ২, পৃ ১৫৬।

হায় রে আশাবাদী কবির আশা!

কলিকাতায় কয়েকদিন থাকিয়া কবি শিলাইদহ চলিয়া গেলেন। কাশ্মীর ভালো লাগে নাই; তাই লিখিতেছেন— "আসলে আমার পদ্মার বালির চরে বোটের কাছে কেউ লাগে না···। কেবল ওখানে বিষয়কর্মের যে গন্ধ আছে সেইটেতে আমাকে তাড়া দেয়— নইলে সেই জলের ধারে চুপচাপ করে পড়ে থাকতুম।"[১] কিন্তু শিলাইদহ যাইবার আরও কারণ আছে— সবুজ পত্রের লেখা হয় নাই; সেখানে না গেলে "লেখাও হবে না, শ্রান্তিও শরীর-মনে জড়িয়ে থাকবে।"[২]

অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত জমিদারিতে কাটিল। এই সময়ের মধ্যে সবুজ পত্রের জন্য লেখা ছাড়া দুইটি কবিতা লেখেন— 'নূতন বসন' ও 'শেক্‌সপীয়র' (বলাকা ৩৮, ৩৯)। শেষোক্ত কবিতাটি লেখেন শেকসপীয়র-ত্রিশত-বার্ষিকী উৎসব-কমিটির অনুরোধে। ১৯১৫ সালে শেক্‌সপীয়র সোসাইটি একটি ত্রিশতবার্ষিক জয়ন্তী খণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ করেন; উহাতে পৃথিবীর প্রায় সকল শ্রেষ্ঠভাষার খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের রচনা সংগৃহীত হয়। রবীন্দ্রনাথ একটি সনেট লিখিয়া দেন (১৩ অগ্রহায়ণ ১৩২২)।

এইসব খুচরা রচনা ছাড়া বড় কিছু লেখেন নাই অনেক দিন। এবার পল্লীর উন্নয়ন বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী। এ বিষয়ে আমরা আরও একটু পরে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। কবি শিলাইদহ থাকিতে একদিন খবরের কাগজে দেখেন যে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় পত্তন করিতে গিয়া ছোটলাট নাকি সুবৃহৎ অট্টালিকাদি বিদ্যাদানের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়[৩] বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এ দেশে শিক্ষাকে দুর্মূল্য দুর্লভ করিয়া তুলিবার যে আয়োজন চলিতেছে, রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই তাহার বিরোধী। যে দেশ দুর্গতিগ্রস্ত সেখানে বিদ্যার বল কমাইয়া, বিদ্যার কায়দাটাকে বড় করিলে দেশের কী দশা হইবে, তাহা তিনি ভালো করিয়াই জানিতেন। এইসব কথা মনে উঠাতেই তিনি 'শিক্ষার বাহন' নামে প্রবন্ধটি লিখিলেন। শিলাইদহ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া ২৪ অগ্রহায়ণ (১০ ডিসেম্বর) রামমোহন লাইব্রেরিতে 'শিক্ষার বাহন'[৪] প্রবন্ধ পাঠ করেন।

এই প্রবন্ধে যে নূতন ভাব বেশি ছিল, তাহা নহে; চব্বিশ বৎসর পূর্বে 'শিক্ষার হের-ফের' প্রবন্ধে দেশীয় ভাষার মাধ্যমে সকলপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচলিত হইবার জন্য যেসব যুক্তি দিয়াছিলেন, এই প্রবন্ধে তাহা আরও যুক্তিযুক্ত পটভূমে ব্যাখ্যাত হইল। কবি স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন যে বাংলাভাষার মধ্য দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আশু প্রয়োজনীয় হইয়াছে। আমাদের উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষাও বাংলার মাধ্যমেই হওয়ার কথা জোর দিয়া বলিলেন; জাপানের দৃষ্টান্ত দিয়া লিখিলেন, "জাপান জোর করিয়া বলিল য়ুরোপের বিদ্যাকে নিজের বাণীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিব। যেমন বলা তেমনি করা, তেমনি তার ফললাভ। আমরা ভরসা করিয়া এ পর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলাভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায়, এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।"[৫]

বিদ্যালয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব এই যে, জ্ঞান বিতরণ ব্যাপারে সনাতনী প্রথার সঙ্গে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিশ্বের জ্ঞানরাজিও পরিবেশন করা হউক। "বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গাযমুনার মত মিলিয়া যায় তবে বাঙালি শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে। দুই স্রোতের সাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে কিন্তু তারা এক সঙ্গে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে।"

১ চিঠিপত্র ৪, পৃ. ৬২ ২ চিঠিপত্র ৫, পৃ. ২০৪

৩ তু. স্বাধীন ভারতে বিদ্যালয়ের অট্টালিকাদি নির্মাণে প্রভূত ব্যয় হইতেছে।

৪ শিক্ষার বাহন, সবুজ পত্র ১৩২২ পৌষ। দ্র, পরিচয় ১৯১৬। শিক্ষা, বিশ্বভারতী সংস্করণ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ৪৯৭-৫১২।

৫ শিক্ষা, পৃ ১৯৮

কবির মতে ইস্কুল বিভাগে ম্যাট্রিকের প্রেপারেটরি ক্লাস হইতে ইংরেজি ও বাংলার দুইটি পথ খোলা রাখা দরকার; ইংরেজি রাস্তাটার দিকেই বেশি ছাত্র ঝুঁকিবে সত্য, তবুও অন্যপথ থাকিলে ভিড় কমিবে। তিনি আরও বলেন যে, সম্প্রতি কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশ হইতে নানা জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচারের জন্য পণ্ডিত আনিতেছেন, তাহার 'এক-কোণে বাংলার একটা আসন পাতিলে' ভালো হয়। কবির বিশ্বাস বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতম শিক্ষাও বাংলার মধ্য দিয়া দিতে আরম্ভ করিলেই গ্রন্থ লিখিত ও প্রকাশিত হইবে।

'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধ পাঠের পর কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন পৌষের গোড়ায়। যথানিয়মে উৎসব সম্পন্ন হইল; উৎসবের বক্তৃতা লিখিতাকারে পাই না। শান্তিনিকেতনে আসিয়া কবি কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে 'সংগীত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অঙ্গ কি না' এই সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার আহ্বান পাইলেন। কবি তথাকার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।[১] কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাইতে পারেন নাই।

ইতিমধ্যে কলিকাতায় 'ফাল্গুনী' নাটিকার অভিনয়ের কথা উঠিয়াছে। বাঁকুড়ায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ, তজ্জন্য অর্থের প্রয়োজন। স্থির হইল অভিনয়ের প্রবেশপত্র (টিকিট) বিক্রয় করিয়া যে অর্থ উঠিবে তাহা দুর্ভিক্ষ-তহবিলে দান করা হইবে। ইতিপূর্বে কলিকাতায় সর্বসাধারণের সমক্ষে শান্তিনিকেতনের ছাত্র-অধ্যাপকগণ কখনো অভিনয় করিতে আসেন নাই। সেদিক হইতে এই ঘটনাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। স্থির হইল— প্রতিবারের ন্যায় এবারও মাঘোৎসবের সময় গানের জন্য শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা কলিকাতায় যখন যাইবে, সেই সময়ের কাছাকাছি ফাল্গুনী অভিনয় হইবে। এবং তদনুযায়ী আয়োজন অনুষ্ঠান শুরু হইল।[২] অভিনয় করাই যখন স্থির হইল তখন কবির মনে সন্দেহ হইল যে "ফাল্গুনীটা এতই ছোটো যে যাঁরা দশ টাকা দিয়ে আসবে তারা দুঃখিত হবে।" তাই প্রস্তাব হইল, "ওর সঙ্গে একটা ফাউ" দিতে হইবে। প্রথমে ভাবিলেন 'বশীকরণ' নাটিকাটি জুড়িয়া দিলে ভালো হয়। তজ্জন্য উহার বেশকিছু অদল-বদলও করা হইল। তার পর ভাবিলেন 'বৈকুণ্ঠের খাতা'টা[৩] জুড়িয়া দিলে মন্দ হয় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনোটিই পছন্দ হইল না। মাঘোৎসবের সময়ে কলিকাতায় বসিয়া 'বৈরাগ্যসাধন' নামে নাট্য-ভূমিকা লিখিয়া ফেলিলেন ও তাহাকেই 'ফাল্গুনী'র গোড়ায় জুড়িয়া দিলেন। 'বৈরাগ্যসাধন' ফাল্গুনী নাটকের ভূমিকাও বটে, টীকাও বটে। লোকে তাঁহার সাহিত্য বোঝে না এইরূপ একটা ধুয়া তাঁহার সাহিত্যচক্রের অন্তরঙ্গ সদস্যরা প্রায়ই কবিকে শুনাইতেন। তাই স্রষ্টা ও আর্টিস্ট রূপে তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে ক্রিটিকরূপে ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। ফাল্গুনীতে বাস্তববাদী 'দাদা'র চরিত্রে যেটুকু সরলতার আবরণ ছিল, বৈরাগ্যসাধনে শ্রুতিভূষণের ক্ষেত্রে তাহা নগ্নভাবে ব্যাখ্যাত হইল। অথচ সেরূপ স্পষ্টতার কোনোই প্রয়োজন ছিল না। এই বৈরাগ্যসাধন 'ফাল্গুনী'র ভূমিকারূপে যুক্ত হওয়ায় মূল ফাল্গুনীর সৌন্দর্য বাড়িয়াছে কি না তাহা বিচার্য। ইতিপূর্বেই 'ফাল্গুনী'র 'কবির কৈফিয়ত' সবুজ পত্রে বাহির হইয়া গিয়াছিল, তাহাই যথেষ্ট ছিল।

ফাল্গুনীর অভিনয় হইল জোড়াসাঁকোর বাড়ির উঠানে। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও কথাশিল্পী রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ ও সহযোগিতায় যে রঙ্গমঞ্চ রচিত হইল, তাহা যে সৌন্দর্যে অপরূপ হইবে তাহা বলা বাহুল্য। ফাল্গুনীর স্টেজ-সজ্জা পরযুগে বাংলাদেশের স্টেজকে কতখানি প্রভাবান্বিত করিয়াছিল তাহা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস-লেখকদের বিশেষ গবেষণার বিষয় হইবে।

১ চিঠিপত্র ৪, পত্র ২৪।

২ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২, গ্রন্থপরিচয় পৃ ৬০২। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত পত্রের অংশ।

৩ চিঠিপত্র ২, পত্র ৮, পৃ ২৪।

রবীন্দ্রনাথ একাধারে বৈরাগ্যসাধনের তরুণ কবিশেখরের ভূমিকায় ও ফাল্গুনীতে বৃদ্ধ অন্ধ বাউলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। অভিনয়ের পূর্বে তিনি স্বয়ং তাঁহার শয়নকক্ষ হইতে সাজিয়া নামিয়া আসিলেন; মনে আছে সাজঘরের কাছে তাঁহাকে দেখিয়া চমকিয়া গিয়াছিলাম, রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলে দর্শকদের কী জয়োচ্ছ্বাস। ত্রিশ বৎসর পূর্বের যুবক রবীন্দ্রনাথ যেন নব কলেবরে সেখানে উপস্থিত। সে কী চঞ্চল জীবন্ত মূর্তি। তার পর আসিলেন বৃদ্ধ অন্ধ বাউলের রূপে। তখন সে আবার কী শান্ত সমাহিত মূর্তি। 'ধীরে বন্ধু ধীরে' এই গানটি কবির কণ্ঠে সেদিন যাঁহারা শুনিয়াছিলেন, আমৃত্যু তাঁহাদের কর্ণে সেটি ধ্বনিত হইবে।

সমসাময়িকদের চোখে ফাল্গুনীর অভিনয় বিচিত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। এই অভিনয়ে বাঁকুড়া কলেজের অধ্যাপক এডোয়ার্ড টমসন উপস্থিত ছিলেন; তিনি রবীন্দ্রনাথের জীবনীতে এই অভিনয়ের দীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে তাঁহার ব্যক্তিগত অনুভূতির কথাও প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি লিখিতেছেন, The play...was acted by the Bolpur students and staff and the poet's family. The result was a cast which no other theatre in Bengal could have commanded, of actors who were amateurs but consummate in their art. The poet had composed his own music and arranged the staging and had trained little boys to sing the wild spring lyrics...The songs were of ravishing beauty, and far more important than the words of the dialogue. There were boys, almost babies, rocking in leafy swings under shining branches, 'bundle of shimmering green', a score of Ariels incarnate..." রবীন্দ্রনাথের অভিনয় সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, "But the star performance of the evening was Rabindranath's own rendering of double parts, of Chandrasekhar and, later, in the mask proper, of Baul the blind bard. Both parts were greatly sustained, but the interpretation of Baul reached a height of tragic sublimity which could hardly be endured. Not often can men have seen a stage part so piercing in its combination of fervid acting with personal significance. It was almost as if Milton had acted his own Samson Agonistes. Knowing through what storms the Poet's mind was passing, and what forebodings were with him. I felt as if the acting might easily be precursor of reality."[১]

ফাল্গুনী অভিনীত হইলে নানা কাগজে নানা মন্তব্য বাহির হইল; শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার অনবদ্য ভাষায় ও ভঙ্গিমায় নাটিকার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করিলেন।[২] আর দর্শনাচার্য সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বহু বিস্তারে উহার তত্ত্বকথা প্রকাশ করিলেন।[৩] প্রবাসী-সম্পাদক যাহা লিখিলেন তাহাকে সমসাময়িক মতধারার ভাবাত্মক দিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়।

ফাল্গুনী ১৩২২, ১৫ই ফাল্গুন প্রকাশিত হইল। নাটিকাটি উৎসর্গ করেন শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। উৎসর্গে কবি লেখেন "যাহারা ফাল্গুনীর ফল্গুনদীটিকে বৃদ্ধকবির চিত্তমরুর তলদেশ হইতে উপরে টানিয়া আনিয়াছে তাহাদের এবং সেই সঙ্গে সেই বালকদলের সকল নাটের কাণ্ডারী আমার সকল গানের ভাণ্ডারী শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথের হস্তে

১ E. J. Thomson : Rabindranath Tagore (1926), p 253-254.

২ প্রবাসী ১৩২২ ফাল্গুন, পৃ ৫৩১।

৩ প্রবাসী ১৩২২ চৈত্র, পৃ ৫৯১-৪৯৭।

এই নাট্যকাব্যটি কবি-বাউলের একতারার মত সমর্পণ করিলাম।[১]

ফাল্গুনী অভিনয়ের অব্যবহিত পরেই কবি উত্তরবঙ্গে চলিয়া গেলেন। পাঠকের স্মরণে আছে কিছুকাল হইতে কবির মন পুনরায় গ্রামোদ্যোগে গিয়াছে; তদুদ্দেশ্যে গত ভাদ্র ও অগ্রহায়ণ মাসে তিনি জমিদারির পরগণায় ঘুরিয়াছিলেন। পরগণায় ১৯০৭-৮ সালে একবার পল্লীমঙ্গলের চেষ্টা করিয়া কিভাবে ব্যর্থ হন তাহার কথা আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এবারও পল্লী-উন্নতির জন্য মন নাড়া দিতেছে। বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর আয়োজনে 'কর্মযজ্ঞ' ও 'পল্লীর উন্নতি' নামে দুইটি বক্তৃতা দিবার পর বোধ হয় এ বিষয়ে পুনরায় কবির মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই সময়ে কয়েকজন যুবক কবির এই গ্রামোদ্যোগের পরিকল্পনাকে কর্মে রূপ দিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিলেন। তাঁহারা সকলেই বিষয়জ্ঞানশূন্য আদর্শবাদী উৎসাহী। ইহাদের পাইয়া কবি ভাবিলেন গ্রামের আমূল সংস্কার হইবে। 'স্বদেশী সমাজে' প্রায় বারো বৎসর পূর্বে যে কর্মসূচী তিনি দিয়াছিলেন, এবার তাহাই স্পষ্টতরভাবে বিবৃত করিয়া যেসব পত্র ও পরিকল্পনা কর্মীদের নিকট পাঠাইয়াছিলেন তাহা কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত হইয়াছে।

এবারকার পল্লীসংস্কারের পরিকল্পনায় পাঁচটি অঙ্গ ছিল— চিকিৎসা বিধান, প্রাথমিক শিক্ষাদান, পূর্তবিভাগ স্থাপন বা কূপাদি খনন, রাস্তাঘাট প্রস্তুত ও মেরামতি, জঙ্গল সাফ প্রভৃতি সর্বজনমঙ্গলকর্ম সমাধান, ঋণদায় হইতে দরিদ্র চাষীকে রক্ষার জন্য সমবায় সমিতি স্থাপন ও সর্বনাশা মামলাসমূহ নিষ্পত্তির জন্য সালিশী গঠন। মোট কথা, গ্রাম-স্বরাজের পরিপূর্ণ পরিকল্পনা।

মাঘোৎসবের পর ফাল্গুনী অভিনয় লইয়া কবি যখন খুবই বিব্রত সেই সময়ে লিখিত (১৩ মাঘ) একখানি পত্রমধ্যে আছে— "পতিসরে আমি কিছুকাল হইতে পল্লীসমাজ গড়িবার চেষ্টা করিতেছি, যাহাতে দরিদ্র চাষী প্রজারা নিজেরা একত্র মিলিয়া নিজেদের দারিদ্র্য অস্বাস্থ্য ও অজ্ঞান দূর করিতে পারে, নিজের চেষ্টায় রাস্তাঘাট নির্মাণ করে এই আমার অভিপ্রায়। প্রায় ৬০০ পল্লী লইয়া কাজ ফাঁদিয়াছি— আমরা যে টাকা দিই ও প্রজারা যে টাকা উঠায় তাহাতে আমাদের ১১০০০৲ টাকার আয় দাঁড়াইয়াছে। এই টাকা ইহারা নিজে কমিটি করিয়া ব্যয় করে। ইহারা ইতিমধ্যে অনেক কাজ করিয়াছে। কিন্তু অপব্যয় ও উচ্ছৃঙ্খলতা যথেষ্ট আছে। এইজন্য কিছুদিন হইল আমি নিজে গিয়া সকলকে ডাকিয়া নূতন নিয়ম বাঁধিয়া দিয়া আসিয়াছি।"

গত ভাদ্র মাসে প্রমথ চৌধুরীর নিকট এক পত্রে কবি কালীগ্রাম পরগণার সাধারণ বৃত্তি এগারো হাজার টাকা সম্বন্ধে অভিযোগ করেন যে ঐ 'বড মোটা টাকা ন দেবায় ন ধর্মায় নষ্ট' হইতেছে।[২]

এইবার মাঘোৎসবের সময়ে জমিদারির কোনো কোনো অঞ্চলে কলেরা দেখা দিয়াছিল। তিনি ১৩ই মাঘ অর্থাৎ অভিনয়ের তিনদিন পূর্বে লিখিতেছেন, 'গ্রামে ওলাউঠা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে— আমি স্বয়ং উপস্থিত হইলে তাহার ভালরূপ প্রতিকার হইতে পারিবে।' দুই দিন পূর্বে (১১ই মাঘ) পরগণায় লিখিয়াছিলেন, 'আমি কয়েকটি ওলাউঠার ওষুধের বাক্স শীঘ্র পাঠাইতেছি এবং যদি হোমিয়োপ্যাথি ডাক্তার পাঠাইতে পারি চেষ্টা দেখিব।'[৩] এইসব কাজের ঝুঁকি মাথায় লইয়া ফাল্গুনী অভিনয়ের কয়েকদিনের মধ্যেই কবি উত্তরবঙ্গ যাত্রা করিলেন। এই সময়ে তাঁহাকে বাঁকুড়া লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা হইতেছিল— কারণ বাঁকুড়া-দুর্ভিক্ষের জন্যই 'ফাল্গুনী' অভিনয়ের আয় প্রদত্ত হইয়াছিল, তাই তথাকার কাহারও কাহারও মনে হইয়াও থাকিতে পারে যে কবি স্বচক্ষে যদি দেশের অবস্থা দেখিতে পারেন তো ভালোই, কিন্তু কবির মনে উত্তরবঙ্গের কথা জাগিতেছে বলিয়া মনোরঞ্জনকে স্পষ্ট করিয়া লিখিলেন

১ রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ, শ্রীজীবনময় রায় লিখিত স্মৃতিকথা। দেশ সাহিত্য-সংখ্যা ১৩৬৩, পৃ. ১৪৫...।

২ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৪১, বুধবার, ২৩ ভাদ্র ১৩২২। ৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৫।

৩ শনিবারের চিঠি, ১৩৪৮ আশ্বিন, পৃ ৯১৭।

"এমন অবস্থায় আমি কাহারও খাতিরে একদিনও যদি বিলম্ব করি তবে অপরাধ হইবে।…আমি বিশ্রাম করিতে পারিলে বাঁচিতাম— যে কাজের মধ্যে যাইতেছি তাহা আরামের নহে, কিন্তু তাহা অত্যাবশ্যক…। সে জায়গা মনোরম নয়, স্বাস্থ্যকর নয়, নির্জন নয়, সেইজন্যই মন সহজেই সেখানে না যাইবার ছুতা খোঁজে।…যেটুকু… কাজের ভার আছে, সে-কাজ আমাকে নির্বাহ করিতে হইবে।"

ফাল্গুনী অভিনয় হইল ১৮ই মাঘ— কবি উত্তরবঙ্গে চলিয়া গেলেন ১৯শে মাঘ। কথা ছিল, পতিসর যাইবেন কিন্তু 'অত্যন্ত শ্রান্ত বলে পতিসরে না গিয়ে শিলাইদহে' গেলেন।[১] টমসন লিখিতেছেন, "I saw him next day, when he was to return with me to Bankura. But his nervous energy was drained. When the mood holds him, he has daemonic vigour ; but it ebbs suddenly and completely. Press notices had begun, and he was discouraged by the play's mixed reception ; two days after, he was on the edge of collapse. He cancelled his arrangements and fled from Calcutta to the wild ducks and reedbeds of Shileida, where he rested।" কিন্তু এ কথা যে সত্য নয়, তাহা সমসাময়িক পত্র হইতে প্রকাশিত হয়।

কিন্তু অন্যান্য বারে যেমন শিলাইদহে আসিবামাত্র কবির লেখার বাঁধ আপনি উছলিয়া যায় এবার তাহা হইল না ; 'ঘরে বাইরে' শেষ করিয়া তিনি লিখিতেছেন, 'জড়তার ভারে নির্জীব হয়ে পড়ে আছি' ; তবে 'সাহিত্যের শাখায় ভালো করে বসন্তের মুকুল' না ধরিলেও কাব্যলক্ষ্মী একেবারে ফাঁকি দিলেন না। 'বলাকা'র কয়েকটি কবিতা শিলাইদহে থাকিতেই লিখিলেন।[২]

পতিসর হইতে প্রমথ চৌধুরীকে লিখিলেন, "পতিসরের সেই পল্লীসংস্কারের কাজটা আমাকে ভূতের মত পেয়ে বসেচে, অন্তত তাকে একটা পিণ্ডি না দিয়ে ফিরতে পারচিনে।"[৩] কয়েক দিন পরে আত্রাই হইতে অতুলচন্দ্র সেনকে এই পল্লীসংস্কার সম্বন্ধে কবি যে পত্র[৪] দেন, তাহা হইতে তাঁহার দেশসেবা সম্বন্ধে কার্যকরী প্রস্তাবগুলি জানিতে পারি। কালীগ্রামে অতুল সেন প্রমুখ কয়েকজন যুবক কবির কর্মকে রূপ দান করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে পল্লীসংস্কার কল্পে পাঁচটি অঙ্গ স্থিরীকৃত হয় ; ১. চিকিৎসা বিধান, ২. প্রাথমিক শিক্ষাবিধান, ৩. পূর্তকার্য বা কূপ খনন, রাস্তা প্রস্তুত ও মেরামতি, জঙ্গলসাফ ও ব্যবচ্ছেদ , ৪. ঋণদায় হইতে চাষীদের রক্ষার ব্যবস্থা ও ৫. সালিশীবিচারে গ্রাম্য বিবাদের নিষ্পত্তি। চিকিৎসাদির জন্য কালীগ্রাম পরগণার তিনটি গ্রাম পতিসর কামতা ও রাতোয়াল বাছিয়া লওয়া হয়। হাসপাতালে ডাক্তার নিযুক্ত হয় এবং দুই-একটি রোগীকে রাখিবার মত ব্যবস্থাও করা হয়। জমিদার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ খাজনার টাকা-পিছু এক আনা সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া দেন ; গ্রামে সামাজিক শাসনে প্রায়ই অপরাধীর বিচার হয়, সেই জরিমানার টাকা 'জাতে'র লোকের ভোজে ব্যয়িত হইত ; কবি ব্যবস্থা দিলেন যে ভবিষ্যতে ঐ জরিমানা কেন্দ্রে জমা দিতে হইবে।

দুই শতাধিক অবৈতনিক নিম্ন প্রাথমিক পাঠশালা স্থাপন করিয়া নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ আরম্ভ করাইয়া

১ "মঙ্গলবার দিনে পতিসরে চলিয়া যাইব।"—মনোরঞ্জন চৌধুরীকে লিখিত পত্র।

২ পথের প্রেম—'ভাবনা নিয়ে মরিস কেন খেপে,' ২৯শে ফাল্গুন ১৩২৩, শান্তিনিকেতন, ভারতী ১৩২৩ বৈশাখ। বলাকা ৪৩, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২। যৌবন—'যৌবন রে, তুই কি রবি সুখের খাঁচাতে', ৪ঠা চৈত্র ১৩২২ শান্তিনিকেতন, প্রবাসী ১৩২৩ বৈশাখ, বলাকা ৪৪, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২। চেয়ে দেখা—'এই ক্ষণে মোর হৃদয়ের প্রান্তে,' ৭ই ফাল্গুন ১৩২২, শিলাইদহ [১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬] সবুজ পত্র ১৩২২ ফাল্গুন। বলাকা ৪০, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২। 'যে-কথা বলিতে চাই', ৮ই ফাল্গুন ১৩২২, পদ্মা। [২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬]—সবুজ পত্র ১৩২২ চৈত্র। বলাকা ৪১, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২।

৩ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৪৭, বুধবার [১১ ফাল্গুন ১৩২২। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬]।

৪ আত্রাই ১৬ ফাল্গুন ১৩২২। শনিবারের চিঠি ১৩৪৮ আশ্বিন, পৃ ৯১৯।

দেন; রাত্রিতে বয়স্কদের শিক্ষার জন্য স্কুল বসে। নিরক্ষরতা দূর করার কাজ শেষ হইলেই পড়া, লেখা ও পাটীগণিত শিক্ষার কাজে হাত দেওয়া হইত। মুখে মুখে ইতিহাস ভূগোল স্বাস্থ্যকথা আকস্মিক বিপদাদি হইতে রক্ষার উপায় প্রভৃতি বলা হইত। কৃষিকার্যের সুবন্দোবস্ত, অগ্নিনির্বাপণ, বন্যার সময় কর্তব্যাদি সম্পর্কেও তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত।

পূর্তকার্য ব্যয়সাধ্য বলিয়া অর্থের বদলে শ্রমদান ব্যবস্থা করা হয়; সাত-আট মাসের মধ্যে পরগণায় বহু সহস্র টাকার কাজ করা সম্ভব হইয়াছিল। ঋণজাল হইতে প্রজাদের রক্ষা কালীগ্রামে সম্ভব হইয়াছিল; রবীন্দ্রনাথ যে ব্যবস্থা করেন, তাহার কদর্থ করিয়া লোকে বলিত প্রজার ফসল জমিদারের ঘরে উঠিত। আসলে ব্যাপারটা এই: প্রজারা অধিকাংশই নিঃস্ব, এক বৎসরের ফসল পর বৎসর পর্যন্ত তাহাদের চলে না; তাহারা ঋণ গ্রহণ করে কাবুলী বা তদ্‌জাতীয় সুদখোর লোকের কাছে। কালে সুদের দায়ে ফসল যায়, আসল শোধ হয় না— গরীব চাষী মরে। রবীন্দ্রনাথ ব্যবস্থা করিলেন যে এস্টেট হইতে প্রজাদের প্রয়োজনমত টাকা শতকরা সাড়ে নয় টাকা সুদে দেওয়া হইত। কাহার কত টাকার প্রয়োজন তাহা তদন্ত করিতেন অতুল সেন ও তাঁহার কর্মীসংঘ। ঋণ লইয়া চাষী চাষ করে; তার পর ফসল উঠিলে সমস্তই জমিদারের কাছারীতে আসে— তখন প্রজার তিন টাকা সুদ মকুপ করা হইত; ফসলের দাম হিসাব করিয়া ধারের টাকা সুদে-আসলে কাটিয়া ফসল চাষীকে দেওয়া হইত; যদি টান পড়িত, তখন ছয় টাকা সুদও বাদ দেওয়া হইত।

এই ব্যবস্থার ফলে কালীগ্রাম পরগণার প্রজারা বহু দিনের দুঃসহ ঋণের বোঝা হইতে ধীরে ধীরে মুক্তি পাইতে-ছিল। রবীন্দ্রনাথের অত্যাচারী জমিদার বলিয়া যে অপবাদ উঠিয়াছিল, তাহা জমিদারীর কাছারী-বাড়িতে ফসল উঠানো লইয়া।

গ্রামের সর্বনাশের আর-একটি কারণ কলহ ও মামলা। রবীন্দ্রনাথ এবার সালেশীর দ্বারা কলহের নিষ্পত্তির জন্য বলিলেন; ইতিপূর্বে তাঁহাদের এস্টেটে অল্পবিস্তর এই রীতি চালু ছিল; এবার অতুল সেন এই কার্যেও মনোনিবেশ করিলেন; ইঁহারা যে কয়মাস করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে পরগণা হইতে একটি মামলাও আদালতে যায় নাই। ১৯১৫-১৬ সালের সরকারী কাগজপত্র হইতে এসব তথ্য প্রমাণিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের আরব্ধ কার্য অধিক কাল চলিতে পারিল না; কারণ বৎসরকালের মধ্যে অতুল সেন সহ কর্মীরা ইংরেজ সরকারের রোষে পতিত হইয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য অন্তরায়িত ও নজরবন্দী হইলেন।[১]

কবি উত্তরবঙ্গ হইতে ফাল্গুনের শেষ দিকে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়াছেন। জমিদার-রবীন্দ্রনাথ প্রজাহিতের জন্য যাহাই করুন, সাহিত্যিক-রবীন্দ্রনাথকে সম্পাদকের তাগিদে কলম পিষিতেই হয়। ইহারই ফাঁকে ফাঁকে দেখা পান কাব্যশ্রীর। তিনি যাহাই কেন করুন না, দেশের কোনো সমস্যা আসিলে তাঁহার সমগ্র মানবসত্তা জাগিয়া উঠে। দেশব্যাপী সমস্যার সম্মুখে তাঁহার লেখনী নীরব থাকিতে পারিত না। এই সময়ে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি অত্যন্ত কুশ্রী ঘটনা ঘটিল। তথাকার জনৈক ইংরেজ অধ্যাপক ছাত্রদের ক্লাসে ভারতীয়দের সভ্যতা সম্বন্ধে কোনো অপমানসূচক কথা বলেন; ছাত্রেরা তাঁহার কথায় প্রতিবাদ করে ও তাঁহাকে ঐ উক্তি প্রত্যাহার করিবার জন্য বলে। অধ্যাপক মহাশয় তাহা না করায় সিঁড়ির পথে নামিবার সময় কয়েকজন ছাত্র মিলিয়া তাঁহাকে প্রহার করে। এই লইয়া কলিকাতায় বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ বহু বৎসর বিদ্যায়তনের সহিত যুক্ত, বাংলার হৃদয়কে তিনি জানেন, কেন তাহারা এইরূপ কাপুরুষোচিত কার্য করিল তদ্বিষয়ে তিনি চিন্তা করিয়া 'ছাত্রশাসনতন্ত্র'[২] নামে প্রবন্ধ লিখিলেন। এই প্রবন্ধের ইংরেজি করাইয়া মডার্ন রিভিউ

১ রবীন্দ্র-জীবনীর নূতন উপকরণ, শনিবারের চিঠি, ১৩৪৮ আশ্বিন।

২ ছাত্রশাসনতন্ত্র, সবুজ পত্র ১৩২২ চৈত্র, পৃ ৭৪৩-৬১। শিক্ষা, ১৩৬৪ অগ্রহায়ণ, পৃ ১৫৮-১৭০।

পত্রিকায় প্রকাশ করিলেন ও উহার এক খণ্ড বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেলের নিকট পাঠাইয়া দিলেন; কবির আশা কারমাইকেল চানসেলার হিসাবে যদি অপরাধী ছাত্রদের সম্বন্ধে বিচার করিবার পূর্বে সমস্ত বিষয়টি ভালো করিয়া দেখিবার সুযোগ পান। ছাত্রদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্নেহ যে কী অকৃত্রিম ছিল, তাহা যাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাঁহারাই সাক্ষ্য দিবেন।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল যে, "ছেলেরা যে বয়সে কলেজে পড়ে সেটা একটা বয়ঃসন্ধিকাল। তখন শাসনের সীমানা হইতে স্বাধীনতার এলাকায় সে প্রথম পা বাড়াইয়াছে...মনোরাজ্যেও সে ভাষার খাঁচা ছাড়িয়া ভাবের আকাশে ডানা মেলিতে শুরু করিয়াছে।...এই সময়েই অল্পমাত্র অপমান মর্মে গিয়া বিঁধিয়া থাকে এবং আভাসমাত্র প্রীতি জীবনকে সুধাময় করিয়া তোলে।...

"এই বয়ঃসন্ধির কালে ছাত্ররা মাঝে মাঝে এক-একটা হাঙ্গামা বাধাইয়া বসে।...বিধাতার নিয়মানুসারে বাঙালি ছাত্রদেরও এই বয়ঃসন্ধির কাল আসে, তখন তাহাদের মনোবৃত্তি যেমন এক দিকে আত্মশক্তির অভিমুখে মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতে চায় তেমনি আর-এক দিকে যেখানে তারা কোনো মহত্ত্ব দেখে, যেখান হইতে তারা শ্রদ্ধা পায়, জ্ঞান পায়, দরদ পায়, প্রাণের প্রেরণা পায়, সেখানে নিজেকে উৎসর্গ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে।...

"অতএব যাদের উচিত ছিল, জেলের দারোগা বা ড্রিলসার্জেণ্ট বা ভূতের ওঝা হওয়া তাদের কোনোমতেই উচিত হয় না ছাত্রদিগকে মানুষ করিবার ভার লওয়া। ছাত্রদের ভার তাঁরাই লইবার অধিকারী যাঁরা নিজের চেয়ে বয়সে অল্প, জ্ঞানে অপ্রবীণ ও ক্ষমতায় দুর্বলকেও সহজেই শ্রদ্ধা করিতে পারেন, যাঁরা জানেন, শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা, যাঁরা ছাত্রকেও মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না।...

"অপর পক্ষ বলিবেন, তবে কি ছেলেরা যা খুশি তাই করিবে আর সমস্তই সহিয়া লইতে হইবে?" রবীন্দ্রনাথের মত যে তাহারা ঠিক পথেই চলিবে যদি তাহাদের সঙ্গে ঠিকমত ব্যবহার করা হয়। যদি ছাত্রেরা প্রতিনিয়ত বিদেশী অধ্যাপকের কাছ হইতে দেশের জাতির ধর্মের অপমানের কথা শোনে, "তবে ক্ষণে ক্ষণে তারা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবেই, যদি না করে তবে আমরা সেটাকে লজ্জা এবং দুঃখের বিষয় বলিয়া মনে করিব।"

ইংরেজ অধ্যাপক কেবল ছাত্রদের ছাত্র বলিয়া জানেন না, তিনি জানেন তাহাকে 'প্রজা' বলিয়া। নিজেও তিনি কেবলমাত্র অধ্যাপক নহেন, তিনি ইংরেজের রাজশক্তি বহন করিতেছেন— তিনি ইম্পীরিএল সার্ভিসের লোক।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে ইংরেজ ও বাঙালির মধ্যে যে বিরোধ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে সে সম্বন্ধে কথাটা তুলিয়াছিলেন। তিনি বলেন ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর্য দ্রাবিড় তুর্কী মুসলমানী যেমন করিয়া গাঁথিয়া গিয়াছে তেমনি করিয়া ইংরেজ আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে। তাহাকে স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদের ইতিহাস কোনো এক-জাতির ইতিহাস নহে— উহা 'একটা মানব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ইতিহাস...ইংরেজকে আমাদের দেশের পক্ষে আপন করিয়া' লইতেই হইবে। তবে 'ইংরেজের শাসন যতক্ষণ আমাদের পক্ষে কলের শাসন থাকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সম্বন্ধ মানবসম্বন্ধ না হইবে, ততক্ষণ আমাদিগকে শান্তি দিবে, জীবন দিবে না।'

মোট কথা রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের দ্বারা গুরু-প্রহারকে সমর্থন করেন নাই, কিন্তু উপদ্রুত হইয়া ছাত্রেরা যে কাণ্ডটা করিয়াছিল— তাহাকে নিন্দা করিয়াও— তাহাদের পক্ষে ইহা অস্বাভাবিক এ কথা বলিতে পারিলেন না। অপমানকে সহ্য করিবার জন্য তিনি কোনোদিন বাঙালির ছেলেকে উপদেশ দেন নাই।[1]

আমাদের মনে হয় এই যুদ্ধপর্বে বাঙালি যুবমনের মধ্যে যে সংগ্রাম চলিতেছিল, তাহারই ভাষা কবি দান করিলেন

১ প্রেসিডেন্সি কলেজ ব্যাপার বিষয়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসীতে (১৩২২ চৈত্র, পৃ ৫৪৫-৪৮) বিবিধ প্রসঙ্গ অংশে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা অনুসন্ধিৎসুরা পাঠ করিতে পারেন।

'যৌবন' কবিতায় (৪ চৈত্র। বলাকা ৪৪); 'যৌবন রে, তুই কি রবি সুখের খাঁচাতে' 'যৌবন রে, তুই কি কাঙাল, আয়ুর ভিখারি' 'যৌবন রে, বন্দী কি তুই আপন গণ্ডীতে' 'যৌবন রে, তুই কি হবি ধুলায় লুণ্ঠিত। আবর্জনার বোঝা মাথায় আপন গ্লানিভারে রইবি কুণ্ঠিত ?' 'প্রভাতে যে তার সোনার মুকুটখানি তোমার তরে প্রত্যুষে দেয় আনি…।'

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবি, তাঁহাকে কোনো বন্ধনই বাঁধিতে পারে না। গ্রাম-উন্নতির সুবিস্তারিত পরিকল্পনাই করুন, বিচিত্রার গৃহবিদ্যালয় স্থাপন করুন— তাঁহার মন সর্বদাই বাহিরে চলিবার জন্য ভিতরে ভিতরে গুমরাইতেছে। তাই 'পথের প্রেম' (২৯ ফাল্গুন) কবিতায় লিখিলেন মনের কথাটি।

এমন সময় হঠাৎ আমেরিকা হইতে একটি বক্তৃতা-কোম্পানির দালালের নিকট হইতে টেলিগ্রাম পাইলেন যে তাঁহাকে আমেরিকায় বক্তৃতার জন্য ১২ হাজার ডলার দিতে তাঁহারা প্রস্তুত। রবীন্দ্রনাথ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন ও যাওয়াই স্থির করিলেন, কারণ প্যাসিফিক দিয়া 'জাপানের রাস্তাই সস্তা ও সহজ'।[১] যে জাপানে যাইবার জন্য বৎসরাধিক কাল মন চাহিতেছিল, সেই সুযোগ মিলিল। বর্ষশেষের দিন প্রমথ চৌধুরীকে এক পত্রে লিখিতেছেন, "আমি সমুদ্র পারের আয়োজন করছি। কিছুদিন থেকে মনটা একদিকে ক্লান্ত অন্যদিকে চঞ্চল— বোধ হয় একবার পারাপার করে এলে আবার কিছুকাল স্থির হয়ে বসতে পারব।"[২]

নববর্ষের দিন (১৩২৩) মীরা দেবীকে লিখিতেছেন, "কোথাও যাব যাব করছিলুম। গতবার বিলেত যাবার আগে যেমন একটা ছটফটানিতে আমাকে পেয়েছিল এবারেও কতকটা সেই রকম চঞ্চলতা আমাকে দোলাচ্ছিল। কিন্তু যুদ্ধের উপদ্রবে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ ছিল। এমন সময়ে আমেরিকা থেকে যেই টেলিগ্রাম এল অমনি আমার মনে হল বড় পৃথিবীর নিমন্ত্রণ এসেচে। আমি বার বার পরীক্ষা করে এবং চেষ্টা করে শেষকালে স্পষ্ট বুঝেছি আমাকে বিধাতা গৃহস্থ ঘরের জন্যে তৈরি করেন নি। বোধ হয় সেই জন্যেই ছেলেবেলা থেকেই কেবল ঘুরে বেড়াচ্চি— কোনো জায়গায় ঘরকন্না ফাঁদতে পারি নি। বিশ্ব আমাকে বরণ করে নিয়েচে, আমিও তাকে বরণ করে নেব।"[৩]

নিজ জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে কবির এই বিশ্লেষণ অতি সত্য। চিরদিন কেবলই স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়াছেন, এই এক বৎসরের মধ্যে কত জায়গাই না হইল। নববর্ষের পরদিন[৪] কলিকাতায় গেলেন। সেখানে 'নববর্ষের আশীর্বাদ' নামে বিখ্যাত কবিতাটি রচনা করিলেন (৯ বৈশাখ ১৩২৩)। বলাকা পর্বের ইহাই শেষ কবিতা। এই কবিতাটির মধ্যে কবির নিজের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে— নিজ জীবনের গতি ও প্রকৃতিরই মর্মকথা— জগতমাঝে জয়যাত্রার উৎসবসংগীত, মনের সমস্ত আকুলিত আকাঙ্ক্ষার নির্গলিত বাণী।—

ওরে যাত্রী,
ধূসর পথের ধুলা সেই তোর ধাত্রী ;
চলার অঞ্চলে তোরে ঘূর্ণিপাকে বক্ষেতে আবরি
ধরার বন্ধন হতে নিয়ে যাক্‌ হরি'
দিগন্তের পারে দিগন্তরে।

১ চিঠিপত্র ২, পত্র ১২, পৃ ৩৫।

২ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৪৯, শান্তিনিকেতন (১২ এপ্রিল, ১৯১৬) ৩০ চৈত্র ১৩২২।

৩ চিঠিপত্র ৪, পত্র ২৫, শান্তিনিকেতন, ১ বৈশাখ ১৩২৩।

৪ "পয়লা বৈশাখের পরদিনেই আমি এখান [শান্তিনিকেতন] থেকে ছাড়ব।" চিঠিপত্র ২, পত্র ১২।

ঘরের মঙ্গল-শঙ্খ নহে তোর তরে,
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক ;
নহে প্রেয়সীর অশ্রু-চোখ।
পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ,
শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ।

'বলাকা' পর্বের কবিতা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। 'পথের প্রেম' লেখেন ২৯ ফাল্গুন, ও ৪ঠা চৈত্র লেখেন 'যৌবন' ; তার পরেই গান নামিয়াছে অন্তরে ; 'গীতপঞ্চাশিকা'র কয়েকটি গান এই সময়ের রচনা। প্রায় সব-ক'টা গানই চলার গান।[১]

আমাদের মনে হয়, গীতপঞ্চাশিকার আরও অনেকগুলি গান এই সময়ের রচনা ; রচনার তারিখ না পাওয়াতে জোর করিয়া কিছু বলা যায় না ; আভ্যন্তরীণ প্রমাণ গ্রহণ বা সুরের ও রূপের বিশ্লেষণ যদি কখনো নিপুণভাবে করা যায়, তবে হয়তো এই গীতপঞ্চাশিকার কয়েকটি গান ৪ঠা চৈত্রের পর রচিত বলিয়া বুঝা যাইবে।

এই গীতগুচ্ছের দুইটি গান বিশেষভাবে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কবি যে অনন্ত জীবনধারা বিশ্বাস করেন, তাহারই সমর্থন পাই একটি গানে, আর এই জগতের সমস্তকে ভালোবাসিয়াছেন— সেই অনুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন দ্বিতীয়টিতে। একটিতে বলিলেন—

তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করব খেলা এই আমি—
নতুন নামে ডাকবে মোরে, বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে,
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি।

ইহাকে জন্মান্তরবাদবিশ্বাস বলিলে ভুল হইবে ; 'বসুন্ধরা' প্রভৃতি কবিতায় যে (cosmic) বিশ্বাত্মবোধের কথা বলিয়াছিলেন, এ-ও সেই বৈজ্ঞানিক সত্য তথা দার্শনিক তত্ত্ব। অপর গানটি এই ধরণীরই কথা, এই জীবনে যাহা পাইয়াছেন, তাহারই কথা—

এই-যে এ-সব ছোটোখাটো পাইনি এদের কূল-কিনারা
তুচ্ছ দিনের গানের পালা আজো আমার হয়নি সারা।

দুই বৎসর পূর্বে কবির নূতন কবিতার জন্ম হয় 'সবুজের অভিযানে' (১৫ বৈশাখ ১৩২১)। এইবার তাহা একটি চক্র পূর্ণ করিয়া সমে আসিয়া স্তব্ধ হইল 'যৌবন'এর প্রতি 'নববর্ষের আশীর্বাদে'। 'বলাকা' নামের সার্থক করিয়া তিনি 'যৌবন'কে বলিলেন—

তুই পথহীন সাগরপারের পান্থ,
তোর ডানা যে অশান্ত অক্লান্ত,
অজানা তোর বাসার সন্ধানে রে

১ তরীতে পা দিই নি আমি (২০ চৈত্র ১৩২২)। আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি (২১ চৈত্র)। যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন (২৫ চৈত্র)। এই তো ভালো লেগেছিল (২৬ চৈত্র)। তোমার হল শুরু আমার হল সারা (২৭ চৈত্র)। গানের সুরের আসনখানি (২৮ চৈত্র)। আমারে বাঁধবি তোরা (২৮ চৈত্র)। ঐ সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে (২৯ চৈত্র)। না হয় তোমার যা হয়েছে (২৯ চৈত্র)। ওরে আমার হৃদয় আমার (৩০ চৈত্র)। এমনি করেই যায় যদি দিন (৩১ চৈত্র)।

অবাধ যে তোর ধাওয়া ;
ঝড়ের থেকে বজ্রকে নেয় কেড়ে
তোর যে দাবি দাওয়া।

এই কবিতাটির প্রত্যেকটি পদে গতির যে বাণী ঝংকৃত, তাহা পাঠককে স্পষ্ট করিয়া বলাই নিষ্প্রয়োজন। এই সুরেই 'নববর্ষের আশীর্বাদ' বর্ষিত হইল—

ক্ষতি এনে দিবে পদে অমূল্য অদৃশ্য উপহার।
চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার—
সে তো নহে সুখ, ওরে সে নহে বিশ্রাম,
নহে শান্তি, নহে সে আরাম।

কবিতার ও বলাকা-কাব্যগুচ্ছের শেষ স্তবক হইতেছে—

পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল, ওরে যাত্রী!
এসেছে নিষ্ঠুর,
হোক্ রে দ্বারের বন্ধ দূর,
হোক্ রে মদের পাত্র চুর!
নাই বুঝি, নাই চিনি, নাই তারে জানি,
ধর তার পাণি ;
ধ্বনিয়া উঠুক তব হৃৎকম্পনে তার দীপ্ত বাণী!
ওরে যাত্রী
গেছে কেটে, যাক্ কেটে পুরাতন রাত্রি।

এই দুই বৎসর ধরিয়া কবি সবুজ পত্রের মধ্য দিয়া নানাভাবে গল্পে উপন্যাসে কবিতায় প্রবন্ধে— এই কথাই বলিয়াছিলেন যে পুরাতনের জীর্ণক্লান্ত অবসাদ ঘুচাইয়া চলিতে হইবে। কিন্তু এই চলার যে দুইটি মূর্তি তাহা বারেবারে বলিয়াছেন— 'নদী আপন বেগে পাগল পারা' চলে, আর 'স্তব্ধ চাঁপা'র গোপন চলা দেখা যায় না। জগতে নূতন কিছুই নহে, অথচ প্রতিনিয়ত নূতনকেই দেখিতেছি। গভীরভাবে চিন্তা করিলে ইহা অনুভব করা যায় যে, 'পুরাতনের হৃদয়' হইতে নূতনের জন্ম। কিন্তু পুরাতনকেই যাহারা মানে— ও নূতনকে অস্বীকার করে এবং নূতনকে মানিয়া যাহারা পুরাতনকে অস্বীকার করে, উভয়েই সত্যকে বা পূর্ণতাকে দেখিতে পায় না।

মনের মধ্যে এই কথাগুলি নানাভাবে আন্দোলিত হইতেছে। জাপান যাইবার প্রাক্‌কালে সবুজ পত্রের সম্পাদককে কবি যে একখানি খোলা চিঠি লেখেন (১৩২৩ বৈশাখ) তাহাতে নূতনের জয়গানই চড়া-সুরে ধ্বনিত হইয়াছে। পত্র-মধ্যে আছে "এমন-কি, যুবকেরা পর্যন্ত স্থবির হয়ে উঠেচে। তারা মনে করেচে, যা-কিছু আছে তাকে মেনে চলাটাই দেশ-ভক্তি। এ কথা একেবারে ভুলে গেছে যে, দেশ যুবকের কাছ থেকে তার যৌবনের দানই চেয়েছে। নতুন করে ভাবব, বুঝব, প্রশ্ন করব, সন্দেহ করব, নেড়ে চেড়ে উল্টে পাল্টে দেখব ; কেবলমাত্র শাস্ত্রের পরে নয়, মনুষ্যত্বের পরে শ্রদ্ধা রাখব, চিন্তা ও চেষ্টার সকল বিভাগেই দুঃসাহসের জয়পতাকা সগর্বে তুলে ধরে দুর্গম পথে যাত্রা করব, দেশের কোথাও কিছুকে বদ্ধ হয়ে থাকতে দেব না, যৌবনের চাঞ্চল্যে সমস্তকে নাড়া দিয়ে প্রাণশক্তিকে সকল দিকেই তরঙ্গিত মুখরিত করে তুলব— দেশের যুবকের কাছ থেকে দেশ যে সেই অস্থির প্রাণ, সেই অস্থির বুদ্ধির অর্ঘ্যই চেয়েছিল। যা

সনাতন এবং যা চরম, তার ভার যে নিতে চায় নিক্, কিন্তু দেশের আবালবৃদ্ধ সকলে মিলে তাকেই অহোরাত্র কোলে কোলে দোলা দিয়ে বেড়াবে— এ হ'লে সত্যের প্রতি দুর্বলের মত ব্যবহার করে সমস্ত দেশ দুর্বল হয়ে যাবে। যা নূতন, যা চঞ্চল, যা ক্রমশ ব্যক্ত হতে থাকে, যাকে সংশোধন করতে করতে পরিবর্তন করতে করতে নিজের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি করে তুলতে হবে— তাকে বুড়োদের নকল করে আজকের দিনের যুবকেরাও ব্যঙ্গ করতে শিখেছে, এতেই আমাদের দেশ তার মর্মে আঘাত পাচ্চে। এই জন্যেই সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে কেউ সৃষ্টি করবার বর চাচ্চে না, সকলেই কেবলি আবৃত্তি পুনরাবৃত্তি করতে করতে ভালো ছেলের মত সামাজিক এগ্‌জামিনে ছাত্রবৃত্তি পাবার চেষ্টা করচে। কিন্তু আমাদের বৃত্তিটা কি কেবলি ছাত্রবৃত্তি?"

এই পত্রখানি লিখিবার কারণ ছিল। সবুজ পত্রের মধ্য দিয়া সবুজসংসদের লেখকগণ যে গতির বাণী প্রচার করিতেছেন, তাহার প্রয়োজন আর আছে কিনা— এইটাই ছিল প্রশ্ন। তাই কবি লিখিলেন, "দেখতে পাচ্চি সবুজ পত্র আজও কেবল ঘা দিচ্চে, ঘা পাচ্চে। সেইটেই প্রমাণ যে ওর কাজ শেষ হয় নি।·· নিন্দার বরমাল্য যতক্ষণ না শুকিয়ে ঝরে যায় ততক্ষণ আসর ছেড়ে তার উঠবার হুকুম নেই।···সবুজ পত্র···পাঠকদের কাছ থেকে বিদ্বেষের অভ্যর্থনা লাভ করেচে— এই তার সত্য অভ্যর্থনা। জড়ত্বের প্রথম জাগরণ এই বিরোধে বিদ্বেষে। এই বিদ্বেষের তীব্রতা যতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে ততক্ষণ বোঝা যাবে সবুজপত্রের যাবার সময় হয় নি।" পত্রের শেষে সম্পাদককে বলিলেন, "তোমার কাগজ লোকের মনোরঞ্জন করে লোকপ্রিয় হবে— এই জীবন্মৃতের দুর্ভাগ্য হ'তে তোমার সৃষ্টিকে বিধাতা রক্ষা করুন।"[১] আর একখানি পত্রে কয়েকদিন পূর্বে কবি আর-একটি বড় সত্য কথা লিখিয়াছিলেন, "আমাদের দেশের···যার যা ক্ষমতা আছে সেটাকে আমরা অভ্যর্থনা করে নিতে জানিনে— যেখানেই শক্তির প্রকাশ দেখি সেখানেই শক্তিশেল হানবার জন্যে আমাদের হাত নিস্‌পিস্ করে। এই বিরুদ্ধতায় বিশেষ ক্ষতি হত না যদি অনুকূলতাও সমাজের মধ্যে থাকত। সেটা কোথাও নেই।"[২]

ঘরে-বাইরে

'ঘরে-বাইরে' সবুজ পত্রে ১৩২২ সালের বৈশাখ হইতে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়; গ্রন্থরূপে বাহির হয় ১৩২৩ সালের গোড়ায় কবি যখন জাপানে। তবে বিদেশে যাইবার পূর্বে কবি উপন্যাসটির অনেক অংশ বাদ দিয়া গ্রন্থাকারে মুদ্রণের ব্যবস্থা করিয়া যান। মাসে মাসে লিখিয়া মাসিকপত্রে উপন্যাস ছাপাইলে তাহার মধ্যে যে নানারূপ অসংগতি অতিব্যাপ্তি প্রভৃতি দোষ থাকিয়া যায়, সে-সম্বন্ধে কবির শিল্পীমন অত্যন্ত সজাগ; সেইজন্য উপন্যাসখানির বহু অবান্তর অংশ বাদ দিয়া বইখানিকে বেশ ঝরঝরে করিয়া দেন।[৩]

রবীন্দ্রনাথের যেসব গ্রন্থ লইয়া রসিক ও অরসিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক আলোচনা হইয়াছে, সে বোধ হয় 'ঘরে-বাইরে'। কারণ, এই উপন্যাসের আখ্যানাংশে সমাজের এমন-সব বিষয়ের আলোচনা আছে, যাহা ইতিপূর্বে কোনো লেখক করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য উপন্যাসের ন্যায় এ গ্রন্থেও পাত্রপাত্রীর সংখ্যা কম। লোকের ভিড় নাই একেবারেই। ঘরে-বাইরে উপন্যাসে তিনজন মাত্র পাত্রপাত্রী, চতুরঙ্গের ন্যায়ই। চতুরঙ্গের গল্পবক্তা একা

১ সবুজ পত্র ১৩২৩ বৈশাখ, পৃ ৪-৯।

২ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৪৮।

৩ পরবর্তী একটি সংস্করণে এইসকল বর্জিত অংশ পুনরায় গৃহীত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে ঘরে-বাইরে সবুজ পত্রের সহিত মিলাইয়া ছাপা হইয়াছে। দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ৮, পৃ. ৫৩০।

শ্রীবিলাস— 'ঘরে-বাইরে'তে নিখিলেশ, সন্দীপ ও বিমলা নিজ নিজ ডায়ারির লেখক; এই তিনটি মাত্র মনের ঘাতপ্রতিঘাত ইহাতে বিবৃত হইয়াছে; মেজো বৌঠান, চন্দ্রনাথ বসু, অমূল্য প্রাসঙ্গিক মাত্র।

এই উপন্যাস যখন মাসে মাসে পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছিল, তখন হইতে গল্পের ভয়ানক পরিণতি ও বিমলার দুর্গতি আশঙ্কা করিয়া পাঠক ও সমালোচক -শ্রেণী উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন। এই সময়ে জনৈকা পাঠিকা কবিকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া পাঠান। পূর্বে হইলে কবি হয়তো তাহার কোনো জবাবই দিতেন না; কিন্তু কিছুকাল হইতে কবির মধ্যে কৈফিয়ত দিবার যে একটি আগ্রহ দেখা দিয়াছে, সে তো আমরা 'ফাল্গুনী' রচনা হইতেই দেখিতে পাইয়াছি। তাই দেখি, ১৩২২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের সবুজপত্রের 'টিকা-টিপ্পনী'তে কবি সেই অপরিচিতা মহিলার ঠিকানাহীন পত্রের দীর্ঘ উত্তর দিয়াছিলেন।[১]

প্রথমেই এই উপন্যাস লেখার উদ্দেশ্য কী তৎসম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে কবি বলিলেন যে, কেবলমাত্র 'খুশি'মতো লিখিয়াছেন এ কথা বলিলে উদ্দেশ্য বলা হয় না। উপমা দিয়া বলিলেন— হরিণের গায়ে দাগ আছে, তার উদ্দেশ্য লোকে বলে "এ-সমস্ত চিহ্নের দ্বারা বনের আলোছায়ার সঙ্গে সে বেমালুম" মিশিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে হরিণ কিছুই জানে না। তেমনি লেখক সম্বন্ধে সে কথা খাটে। "যে কালে লেখক জন্মগ্রহণ করেছে সেই কালটি লেখকের ভিতর দিয়ে হয়তো আপন উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলেছে। ...লেখকের কাল লেখকের চিত্তের মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করছে।" আমাদের দেশের আধুনিক কাল গোপনে লেখকের মনে যেসব রেখাপাত করিয়াছে, এই উপন্যাসে তাহার ছাপ সুস্পষ্ট। কিন্তু কবির মতে এই ছাপের কাজ শিল্পকাজ— শিক্ষাদানের কাজ নয়।

"এর ভিতর থেকে যদি কোনো সুশিক্ষা বা কুশিক্ষা আদায় করবার থাকে সেটা লেখকের উদ্দেশ্যের অঙ্গ নয়।... ঘরে-বাইরে গল্প যখন লেখা যাচ্ছে তখন তার সঙ্গে সঙ্গে লেখকের সাময়িক অভিজ্ঞতা জড়িত হয়ে পড়েছে এবং লেখকের ভালোমন্দলাগাটাও বোনা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেই রঙিন সুতোগুলো শিল্পেরই উপকরণ। তাকে যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা যায় তবে সে উদ্দেশ্য লেখকের নয়, পাঠকের।" লেখিকার আর-একটি প্রশ্ন ছিল যে এই উপন্যাসের আখ্যায়িকা কবি-কল্পনাপ্রসূত না বাস্তবতামূলক। বাস্তব হইলে তাহা কি 'পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানী বিলাসী সম্প্রদায়ে না প্রাচীন হিন্দু পরিবারের ঘটনা'।

এই প্রশ্নের উত্তরে কবি বলেন যে, "দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে অধিকাংশ সমালোচকের হাতে সাহিত্যবিচার স্মৃতিশাস্ত্র বিচারের অঙ্গ হয়ে উঠেছে।" কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যে আমরা ভালোমন্দ চরিত্র দুই-ই পাই, তজ্জন্য প্রাচীন ভারত লজ্জিত হয় নাই। প্রাচীন সংস্কৃত উদ্‌ভট কবিতায় যথেষ্ট স্ত্রীনিন্দা আছে; সেগুলি স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে মিথ্যা, কিন্তু স্ত্রীবিশেষ সম্বন্ধে যদি সত্য না হইবে তো কবিতাগুলির উদ্‌ভব হইল কেমন করিয়া। প্রাচীন সাহিত্যে নায়ক-নায়িকার চরিত্রানুযায়ী বিচিত্র শ্রেণী-করণে চেষ্টা হইয়াছিল; সেগুলি মনুপরাশরের সঙ্গে মিলাইয়া করা হয় নাই। কবির মতে এই শ্রেণীকরণ কৃত্রিম; তবে যদি শ্রেণীকরণ করিতেই হয় "তাহলে ধর্মশাস্ত্রনির্দিষ্ট হিন্দু ও অহিন্দু এই দুই শ্রেণী না ধ'রে যথাসম্ভব মানবস্বভাবের বৈচিত্র্য অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করা কর্তব্য।" কিন্তু ভারতের আলংকারিক বা সাহিত্যিকগণ তাহা করেন নাই।

কিন্তু বাংলাসাহিত্য-সমালোচনায় অনেক লেখকের দৃষ্টি বিষয়বিচারের সময় হিন্দু-অহিন্দু এদেশী-বিদেশী প্রভৃতি প্রশ্নের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। 'ঘরে-বাইরে' সম্বন্ধে সেইসব প্রশ্ন নিরন্তর চলিতে লাগিল। কিছুকাল পরে কথা উঠিল রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে সীতার প্রতি অসম্মান প্রকাশ করিয়াছেন। 'ঘরে-বাইরে' প্রকাশ হইবার প্রায় তিন বৎসর পর পর্যন্ত এই শ্রেণীর আলোচনা সাময়িক-পত্রিকায় চলিয়াছিল এবং এইসব আলোচনায় বাংলাদেশের অনেক খ্যাত-

১ দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ৮, পৃ. ৫২১-৫২৬।

নামা লেখক অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, এই শ্রেণীর সমালোচনারও জবাব কবিকে দিতে হয়।[১] তিনি লিখিলেন, "জানি আমাকে প্রশ্ন করা হইবে, সন্দীপ যত বড়ো মন্দ লোকই হউক তাহাকে দিয়া সীতাকে অপমান কেন? আমি কৈফিয়ত-স্বরূপ বাল্মীকির দোহাই মানিব, তিনি কেন রাবণকে দিয়া সীতার অপমান ঘটাইলেন?... বেদব্যাস কেন দুঃশাসনকে দিয়া জয়দ্রথকে দিয়া দ্রৌপদীকে অপমানিত করিয়াছেন? রাবণ রাবণের যোগ্যই কাজ করিয়াছে; দুঃশাসন-জয়দ্রথ যাহা করিয়াছে তাহা তাহাদিগকেই সাজে। তেমনি আমার মতে সন্দীপ সীতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে তাহা সন্দীপেরই যোগ্য, অতএব সে কথা অন্যায় কথা বলিয়াই তাহা সংগত হইয়াছে এবং সেই সংগতি সাহিত্যে নিন্দার বিষয় নহে।"

লেখক প্রবন্ধ-শেষে বলিলেন, "আমি অন্যদেশের কবি ও লেখকের গ্রন্থ হইতে কোনো দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম না। কেননা এমন কথা আমাদের দেশে প্রচলিত যে, অন্য দেশের সহিত ভারতবর্ষের কোনো অংশে মিল নাই, সেই অমিলটাকেই প্রাণপণে আঁকড়াইয়া থাকা আমাদের ন্যাশনাল সাহিত্যের লক্ষণ— অর্থাৎ, ন্যাশনাল সাহিত্য কূপমণ্ডুকের সাহিত্য।"

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস লিখিবার উদ্দেশ্য কিছুই নাই— গল্প বলিবার জন্যই এ গল্পের সৃষ্টি— এ কথা খুবই সত্য। কিন্তু লেখকের কাল লেখকের চিত্তের মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করে বলিয়া গল্পাংশে সাময়িক সমস্যার অবতারণা আপনি আসিয়া গিয়াছে। দেশের কতকগুলি সমস্যা যাহা কবিচিত্তকে কিছুকাল হইতে উদ্বেলিত করিতেছিল, তাহা তাঁহার গোচরেই হউক আর অগোচরেই হউক উপন্যাসমধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

কিছুকাল হইতে বাংলার সাময়িক পত্রিকায় সাহিত্যে 'বস্তুতন্ত্রতা' লইয়া বিচিত্র আলোচনা চলিতেছিল। তাহার উপলক্ষ্য ছিল প্রধানত রবীন্দ্রনাথেরই রচনা। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে বাস্তবতার মধ্যে অলীকতা কোথায় তাহা কয়েকটি রচনায় দেখাইলেন বটে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এইসব সমালোচনার সবটাই উপেক্ষণীয় বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায় না।

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে যেমন দেখাইলেন বাস্তবতার নগ্নমূর্তিটিকে, তেমনি ফুটাইলেন আদর্শতার চরম ত্যাগকে। এই উপন্যাসখানি, চতুরঙ্গের ন্যায়,— তিনটি মাত্র নরনারীর মধ্যে অহরহ দ্বন্দ্বের ইতিহাস। দামিনী সত্যই নিজের নামকে সার্থক করিয়া গল্পের প্রথমভাগে শচীশ ও শ্রীবিলাসকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল; অবশেষে সেই দামিনী হইল স্থির-বিদ্যুতের ন্যায় অচঞ্চল, যাহার দীপ্তি থাকিল কিন্তু তাপ নিভিয়া গেল। শেষ পর্যন্ত নিজ নামকে সার্থক করিয়া সে জীবনের অন্তরালে চলিয়া গেল। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে বিমলাও তাহার নাম সার্থক করিয়াছিল— সতীত্বের গৌরব ও গর্ব ছিল তাহার অন্তরবাহিরের ঐশ্বর্য। নারীজীবনের পক্ষে যাহা কঠোরতম পরীক্ষা তাহার মধ্য দিয়া বিমলাকে যাইতে হইল— অপযশের পসরা মাথায় করিয়া অবশেষে তাহাকে নিরাভরণ বিধবা রূপে নিষ্ঠুর জগতে একাকী দাঁড়াইতে হইল। নিঃসন্তান জীবনের একমাত্র সম্বল থাকিল আদর্শনিষ্ঠ স্বামীর স্মৃতি।

'চতুরঙ্গে'র জ্যাঠামশায় জগমোহনের মতই ঘরে-বাইরের নিখিলেশ— চরম আদর্শবাদী— সংসারধর্ম সম্বন্ধে কাণ্ড-জ্ঞানশূন্য— এমন-কি বিষয়বুদ্ধিহীন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তাহার জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে আসমান-জমিনের বিচ্ছেদ ছিল না; যাহাকে সে জ্ঞানের দ্বারা বুঝিত, তাহাকে সে অন্তর দিয়া বিশ্বাস করিত— এবং যাহাকে যে বিশ্বাস করিত তাহাকে সে কর্মে রূপ দিতে দ্বিধামাত্র করিত না। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপেই দেখিত— কেবলমাত্র সমাজের একটি সজীব অঙ্গরূপে নহে। অর্থাৎ individual যেখানে বিশেষ— সেই বিশিষ্ট রূপকে দেখা— সেই বিশিষ্ট রূপের পরিপূর্ণ বিকাশ করাই নিখিলেশের ধর্ম। এই বিশ্বাস হইতে সে জীবনের সবকিছুকেই দেখিয়াছে, ছাড়িয়াছে। বিমলা তাহার স্ত্রী বটে; কিন্তু সে কোনোদিন পত্নীকে মন্ত্রবন্ধনের অধিকারে বাঁধিতে চাহে নাই।

১ সাহিত্য-বিচার, প্রবাসী ১৩২৬ চৈত্র, পৃ ৫২৪-৫২৬। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৮, গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৫২৭-৫৩০।

'রাজা' নাটকের রাজা সুদর্শনকে বলিয়াছিল— বাহিরে তুমি চিনিয়া লইবে। নিখিলেশ বিমলাকে বলিয়াছিল, "তাই তো আমার ইচ্ছে, আমি কথাও কইব না চুপও করব না, তুমি একবার বিশ্বের মাঝখানে এসে সমস্ত আপনি বুঝে নাও। এই ঘরগড়া ফাঁকির মধ্যে কেবলমাত্র ঘরকরনাটুকু করে যাওয়ার জন্যে তুমিও হও নি, আমিও হই নি। সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালোবাসা সার্থক হবে।"[১] সুদর্শনার বাহিরের চোখ যেমন সুবর্ণের বর্ণচ্ছটায় ভুলিয়া মিথ্যার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিল, বিমলার মনও তেমনি সন্দীপের দীপ্ত বাণীর দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া নিখিলের পরিপূর্ণতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। বিমলা একদেশদর্শী আপাতসুন্দর সত্যকেই চরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া সুদর্শনার ন্যায়ই অগ্নিজালে বেষ্টিত হইয়া অন্তরে বাহিরে পুড়িয়া মরিতেছিল। জাতিপ্রেম বিশ্বপ্রেমের ঊর্ধ্বে, অবচ্ছিন্ন দেশপ্রীতি নিখিল মানবপ্রীতির ঊর্ধ্বে— এইসব বাণী বিমলার অন্তরকে এমনি আচ্ছন্ন করিয়াছিল যে, সে দেশের নামে দেশবাসীর প্রতি অত্যাচার করাকে দেশপ্রেম বলিয়া গণ্য করিল ; দেশের নামে অপহরণ করাকেও সে গর্হিত কর্ম বলিয়া মনে করিল না। 'ঘরে-বাইরে যে সময় লিখিত হইতেছিল, তাহার কিছুকাল পূর্ব হইতেই দেশমধ্যে দেশের নামে ডাকাতি করা তথাকথিত একশ্রেণী দেশসেবকের ধর্ম হইয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভেও পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে জমিদাররা দেশসেবার নামে গরীব গ্রামবাসীগণের উপর যেসব অন্যায় উৎপীড়ন করেন তাহার কথা রবীন্দ্রনাথের জানা ছিল। তিনি নেতির দিক দিয়া দেশসেবায় নামেন নাই ; বিলাতী কাপড় 'বয়কট' করিলেই দেশী কাপড় পাওয়া যায় না ; তাই তিনি জমিদারিতে বয়নবিদ্যালয় খুলিয়াছিলেন। 'স্বদেশী সমাজে'র মধ্যে তিনি যেসব গঠনমূলক কর্মের পরিকল্পনা দিয়াছিলেন, নিজেই তাহার পরীক্ষা শুরু করেন। নিখিলেশ সেই আদর্শবাদী জীবনশিল্পী। দেশ সম্বন্ধে কবির অনেক স্বপ্নই নিখিলেশের মধ্যে রূপ পাইয়াছে— কতকগুলি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ব্যর্থ জীবন হইতেও গৃহীত।

সন্দীপ কবির একটি অপরূপ সৃষ্টি। অধ্যাপক সুকুমার সেনের মতে রবীন্দ্রনাথের কোনো উপন্যাসে যথার্থ villain বা পাষণ্ড নাই— এই সন্দীপ ছাড়া। সে-যে শুধু পাষণ্ড, তাহা নহে, সে কাপুরুষও বটে। কিন্তু তাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথ তাহাকে আদৌ দুর্বল-ভাবে গড়েন নাই। সে রঘুপতির ন্যায় নিষ্ঠুর, সে গোরার ন্যায় তার্কিক। লোকধর্ম ও দেশধর্মকে শাশ্বত মানবধর্মের উপর স্থান দান করিতে যাহাদের ধর্মজ্ঞানে বাধে না সন্দীপ তাহাদের প্রতীক। সন্দীপের যুক্তি রঘুপতি ও গোরার যুক্তির ন্যায়ই sophisticated, তাহাদের মধ্যে সত্যের আন্তরিকতার অভাব, তাহাদের হৃদয় সংস্কারের আত্মম্ভরিতায় পূর্ণ। গোবিন্দমাণিক্যের সত্যধর্মবোধের সহিত রানী গুণবতীর লৌকিক ধর্মের বিরোধ, পরেশবাবুর সত্যধর্মবোধের সহিত ব্রাহ্মসমাজের সমাজধর্মবোধের বিরোধ ও নিখিলেশের মানবধর্মবোধের সহিত বিমলার দেশধর্মবোধের বিরোধ— একই পর্যায়ের বস্তু। রিলিজন্ বাস্তবধর্মী— আধ্যাত্মিকতা আদর্শাশ্রয়ী মহত্তের ধর্ম। জাতিপ্রেম অনেকের কাছেই বাস্তব সত্য, কিন্তু আদর্শবাদীর কাছে মানবধর্মই ধর্ম। তাই দেখি, 'ঘরে-বাইরে'র মধ্যে যেসব সমস্যার আলোচনা হইয়াছে, তাহা যথার্থত ভারতের যুবহৃদয়ের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব হইতেছে idealএর সংঘাত (clash of ideals বা value) প্রাচীন্ ভারত ও নবীন য়ুরোপ বর্তমান ভারতকে টানিতেছে যুগপৎ— কেহ পিছনে কেহ সামনে। এই টানাটানির মধ্যে পড়িয়া লোকে প্রাচীন ভারতকে মানে ভয়ে এবং সংস্কারে ও নবীন য়ুরোপকে মানে মোহে এবং লোভে। ফলে সে না পায় অন্তরে প্রাচীন ভারতের নিষ্ঠাযোগ ও ধ্যানশক্তি, না পায় কর্মে য়ুরোপের সাহস ও সংঘশক্তি। তাই দেখি নিখিলেশের দেশপ্রীতি পাদরিদের 'লোকহিত' নহে বা দেশনায়কদের 'পরোপকার' নহে। নিখিলেশের ধর্মশাস্ত্র অনুসারে মানুষের সুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করাই দেশসেবকদের একমাত্র কর্তব্য— তাহাই ধর্মবিজয়। সেই সুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করিবার জন্য সে বিমলাকে বলিল 'নিজেকে জানো'। সে দেশসেবকদের বলিল 'দেশকে জানো'। সমস্ত সাধনা জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত— সমস্ত সিদ্ধি প্রেমে অধিষ্ঠিত।

১ ঘরে-বাইরে, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৮, পৃ ১৫০।

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের মধ্যে সাময়িক ও স্থানিক সমস্যার আলোচনা হইলেও, নিখিলেশের জীবনে ও বাণীতে এমন-একটি বৃহতের সুর শোনা যায়, যাহা ইতিপূর্বে আর-কোনো উপন্যাসে পাওয়া যায় নাই; সেইজন্য বোধ হয় এই গ্রন্থের এত সমাদর ও এত অনাদর। ইহা যেন ভুবনেশ্বরের মন্দির— বাহিরে অগণ্য মূর্তি— সুন্দর ও কুৎসিত— ভিতরে মূর্তির কোনো চিহ্ন নাই। রূপ ও অরূপ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, বাস্তবতা ও আদর্শতা অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত। নিখিলেশের বাহিরের জীবনে অসংখ্য ক্ষুদ্রতা থাকিলেও অন্তরে তাহার সত্য মূর্তি প্রতিষ্ঠিত।

'ঘরে-বাইরে'তে কয়েকটি চরিত্র স্বল্প পরিসরের মধ্যেও আশ্চর্যরূপে জীবন্ত হইয়াছে— মেজরানী, অমূল্য ও চন্দ্রনাথবাবু। মেজরানীর ব্যর্থ জীবনের মধ্যে বহুপ্রকার স্বাভাবিক ক্ষুদ্রতা ও লঘুতা থাকা সত্ত্বেও দেবরের প্রতি তাহার অকৃত্রিম স্নেহ তাহার সমস্ত নগ্নাত্মতাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। অমূল্য রুদ্রযুগের বাঙালি যুবকের প্রতীক— হেলায় জীবন দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই। চন্দ্রনাথবাবুকে আমরা কবির অন্যান্য নাটকে ও উপন্যাসে নানারূপে নানা নামে দেখিয়াছি। রাজর্ষির বিল্বন হইতে চতুরঙ্গের জ্যাঠামশায়ের মধ্যে ও রূপক-নাট্যগুলির ঠাকুরদা দাদাঠাকুর প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের একটি আদর্শ মানব-চরিত্র বারেবারে দেখা দিয়াছে— এ যেন তাঁহার কাব্যজীবনের একটি পালার ন্যায়ই ক্রমেই বিচিত্র হইতে বিচিত্রতর হইয়া, দুরূহ হইতে দুরূহতর সমস্যার ভিতর-দিয়া বৃহত্তর পরিণামের মধ্যে চলিয়াছে, পর্বে পর্বে সৃষ্টির চক্রটা বৃহত্তর পরিধিকে পাইতেছে, "প্রত্যেক পাককে হঠাৎ পৃথক বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু খুঁজিয়া দেখিলে দেখা যায় কেন্দ্রটা একই।"

জাপানের পথে

১৩২৩ সালের ২০ বৈশাখ (১৯১৬ মে ৩) রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে জাপানী জাহাজ 'তোসামারু' যোগে জাপানের পথে আমেরিকা যাত্রা করিলেন[১]; তাঁহার সঙ্গে আছেন এণ্ড্রুস, পিয়ার্সন ও মুকুল দে। 'তোসামারু' মালবাহী জাহাজ, উহাতে ক্যাবিন কম ও ক্যাবিনের যাত্রী আরও কম। বেশির ভাগই ডেকের যাত্রী, অনেকেরই গম্যস্থল বর্মা।

বঙ্গোপসাগর দিয়া সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতা কবির এই প্রথম। জাহাজে উঠিয়া তিনি প্রতিবারের ন্যায় পত্র লিখিতে বসিলেন। এই শ্রেণীর রচনা সম্বন্ধে কবির মত যে 'এগুলি ধারাবাহিক চিঠিও না, প্রবন্ধও না। যা যখন মনে আসচে লিখে যাচ্চি একবার revise করবারও চেষ্টা করিনি।'[২] সুতরাং পত্রগুলি কবি-কর্তৃক সংশোধিত, সম্পাদিত ও পুনর্লিখিত না হওয়ায় লেখকের তৎকালীন মানসমূর্তিটি স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এই পত্রধারা জাপান পৌঁছানো পর্যন্ত নিয়মিত এবং তার পরে কিছুকাল অনিয়মিতভাবে চলে। সেগুলি 'সবুজ পত্রে' (১৩২৩) প্রকাশিত ও পরে 'জাপানযাত্রী' নামে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় (১৩২৬ শ্রাবণ)। গ্রন্থখানি 'শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শ্রদ্ধাস্পদেষু'কে উৎসর্গ করেন।

জাপানযাত্রীর প্রথম রচনাটির কিয়দংশ হার্বার-মাস্টারের হাত দিয়া ও অবশিষ্টাংশ সমুদ্রের মোহনায় পাইলট

১ রবীন্দ্রনাথের জাপানযাত্রার সহিত বাংলা তথা ভারতের একটি বিশেষ ঘটনা যুক্ত। উত্তরভারতে বিদ্রোহাগ্নি জ্বালাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইলে রাসবিহারী বসু কলিকাতা হইতে এক জাপানী জাহাজে P. N. Tagore নাম লইয়া জাপান যাত্রা করেন। তিনি পাসপোর্ট লইবার সময়ে ঘোষণা করেন যে তিনি রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়, কবি জাপান যাইতেছেন, তৎপূর্বে জাপান গিয়া কবির অভ্যর্থনাদির আয়োজন করিবেন। কলিকাতার বন্দর হইতেই তিনি জাহাজে চড়েন। প্রবর্তক মাসিক পত্রে এই কাহিনীটি কয়েক বৎসর পূর্বে বিবৃত হয়।

২ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৫০, পৃ ২১৩; ২১ বৈশাখ ১৩২৩।

নামিয়া যাইবার সময় তাহার মারফত পাঠাইয়া দেন; সুতরাং প্রথম রচনাটি জাহাজে উঠিয়াই লেখা।[১] জাহাজের ডেকযাত্রীরা সকলেই প্রায় রেঙ্গুনে নামিবে, অধিকাংশই মাদ্রাজ প্রদেশের 'কৌরঙ্গী'। জাপানি জাহাজের ভাণ্ডার হইতে একখানি করিয়া ছবিআঁকা কাগজের পাখা পাইয়া তাহারা ভারি খুশি। এই যাত্রীদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দুইই আছে। কবি উভয় শ্রেণীর মধ্যে নীতি ও রুচিগত পার্থক্যটুকু সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া লিখিতেছেন যে "হিন্দুদের মধ্যে শুচিতা রক্ষার দিকে যতটা চেষ্টা, পরিচ্ছন্নতার দিকে ততটাই কম। আচারকে শক্ত করে তুললে বিচারকে ঢিলে করতেই হয়— ইহারই দৃষ্টান্ত হইতেছে হিন্দুযাত্রীরা। আর মুসলমান যাত্রীরা পরিষ্কার হওয়া সম্বন্ধে ...যে বিশেষ সতর্ক তা নয়, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে তাদের ভারি সতর্কতা।...বোঝা যায়, তারা বাইরের সংসারটাকে মানে।"[২] কবি এই রচনায় হিন্দু ও মুসলমানের আদবকায়দা সম্বন্ধে অতি বিস্তারিত ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যাহারা কেবল 'জাতে'র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ, তাহাদের কাছে বাহিরের জগৎ অত্যন্ত অস্পষ্ট। তাহাদের সমস্ত বাঁধাবাঁধি জাতরক্ষার বন্ধন। মুসলমান 'জাতে' বাঁধা নয় বলিয়া বাহিরের সংসারের সঙ্গে তাহার ব্যবহারের বাঁধাবাঁধি আছে। "এইজন্য আদবকায়দা মুসলমানের। আদবকায়দা হচ্চে সমস্ত মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের সাধারণ নিয়ম।" এইভাবে কবির মনের উপর দিয়া অসংখ্য প্রশ্ন, সমস্যা ও ভাবনা চলিয়া যাইতেছে।

এমন সময় বঙ্গোপসাগরে কাল-বৈশাখীর আবির্ভাব হইল; কবি এই রুদ্রলীলার বিস্তারিত বর্ণনা পত্রমধ্যে দিয়াছেন: এ তাঁহার সম্পূর্ণ নূতন অভিজ্ঞতা। চতুর্থ দিন অপরাহ্নে জাহাজ রেঙ্গুন পৌঁছিল। সেইদিন প্রাতে (৭ মে) কবি 'উইলি পিয়ার্সন বন্ধুবরেষু' বলাকা কাব্যখণ্ড উৎসর্গ করিয়া একটি ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়া দেন। এই আটটি পংক্তিতে পিয়ার্সনের যথার্থ চরিত্রচিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবিতাটি 'বলাকা'র উৎসর্গ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। ইংরেজি মতে ৭ই মে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন; বোধ হয় সেই দিনটি স্মরণে রাখিয়া কাব্যখণ্ড বন্ধুবরকে উৎসর্গ করেন। ২৪শে বৈশাখ (১৩২৩) অপরাহ্নে তোসামারু রেঙ্গুন বন্দরে পৌঁছিল। জাহাজ আসিবার বহু পূর্বে ঘাটে বিপুল জনতার ভিড়। কবি জাপানের পথে রেঙ্গুনে নামিবেন, এ সংবাদ পাইয়া তথাকার ভারতীয়রা মিলিত হইয়া তাড়াতাড়ি একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কবি লিখিতেছেন, "নদীর ঘাটে দেখি লোকারণ্য। আমাদের গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে বন্দেমাতরম্, জয় রবীন্দ্রনাথকি জয় চেঁচাতে চেঁচাতে তিন মাইল রাস্তা তারা ছুটে এল, শহরের দুধারে দোকানে বাজারে সকল লোকে অবাক্, আমি লজ্জায় মরি।"[৩]

কবি উঠিলেন গিয়া পি. সি. সেনের বাড়িতে।[৪] ইঁহার পুত্রবধূ সুজাতা দেবী কেশবচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠা কন্যা, কবি ইঁহাদের কলিকাতায় ভালো করিয়া জানিতেন। সুতরাং এইস্থানে বিশ্রাম লাভ করিতে পাইয়া কবির মন বেশ তৃপ্ত।

পরদিন প্রাতে বন্ধুরা কবিকে লইয়া রেঙ্গুন শহর ও বিশেষভাবে তথাকার বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দির শোয়েডেগঙ প্যাগোডা দেখাইয়া আনিলেন। পত্রধারার একস্থলে কবি লিখিতেছেন, "রাস্তাগুলি সোজা চওড়া পরিষ্কার, বাড়িগুলি তক্‌তক্ করছে, রাস্তায় ঘাটে মাদ্রাজি পাঞ্জাবি গুজরাটি ঘুরে বেড়াচ্ছে; তার মধ্যে হঠাৎ কোথাও যখন রঙীন রেশমের কাপড়পরা ব্রহ্মদেশের পুরুষ বা মেয়ে দেখতে পাই তখন মনে হয় এরাই বুঝি বিদেশী... রেঙ্গুন

১ জাপানযাত্রী, পৃ ১০। দ্র চিঠিপত্র ৫, পত্র ৫০, পৃ ২১৩।

২ জাপানযাত্রী, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ৩০১।

৩ চিঠিপত্র ৪, পত্র ২৬। দ্র প্রবাসী ১৩২৩ আষাঢ়, পৃ ২১৫-১৬ বিবিধ প্রসঙ্গ, রেঙ্গুনে রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা।

৪ তিনি সেখানকার বড় ব্যারিস্টার, পরে রেঙ্গুন হাইকোর্টের জজ ও শেষকালে অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটর-জেনারল হইয়া কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

শহরটা··· ব্রহ্মদেশের শহর নয়, ওটা যেন সমস্ত দেশের প্রতিবাদের মতো।" কবির এই মন্তব্য যে কত সত্য তাহা বর্মার পরবর্তী ইতিহাস সাক্ষ্য দিয়াছে। ভারতীয়রা বর্মায় গিয়াছিল শ্রমিক ধনিক বণিক ও চাকুরে রূপে— তাহারা বর্মাকে আপনার দেশ বলিয়া গ্রহণ করে নাই; প্রবাসীর ন্যায় বাস করিয়া ব্যবসায়ীর ন্যায় শোষণ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসে। তাই কবির মতে— 'এ শহর দেশের মাটির থেকে গাছের মতো ওঠেনি, এ শহর কালের স্রোতে ফেনার মত ভেসেছে।" তাই লিখিতেছেন, "রেঙ্গুন তো দেখলুম কিন্তু সে কেবল চোখের দেখা, সে দেখার মধ্যে [বর্মার] কোনো পরিচয় নেই।" সেইজন্য শহরটা তাঁহার কাছে 'অব্‌স্ট্রাকশন, একটা অবচ্ছিন্ন পদার্থে'র মত লাগিতেছে।

কিন্তু শোয়েডেগঙ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মনে হইল উহার মধ্যে বর্মার "নিজেরই একটা বিশেষ চেহারা আছে।" এতক্ষণে তিনি যেন যথার্থ বর্মার রূপ দেখিলেন। কিন্তু মন্দিরের শিল্পকলা কবির মনকে আদৌ তৃপ্ত করিল না। সংসারের সঙ্গে মন্দিরের সঙ্গে ভেদমাত্র নাই, একেবারে মাখামাখি। "চারি দিকে নিরালা নয়, অথচ নিভৃত; স্তব্ধ নয়, শান্ত।··· মন্দিরে গাম্ভীর্য নেই, কারুকার্যের ঠেসাঠেসি ভিড়, সমস্ত যেন ছেলেমানুষের খেলনার মতো; এমন অদ্ভুত পাঁচমিশালি ব্যাপার আর কোথাও দেখা যায় না— এ যেন ছেলেভুলানো ছড়ার মতো।··· ভাবের অসংগতি বলে যে কোনো পদার্থ আছে, এরা তা যেন একেবারে জানেই না।··· এদের যেন বিচার করবার, গম্ভীর হবার বয়স হয় নি।"[১]

সেইদিনই অপরাহ্ণে জুবিলি হলে রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা। আবদুল করিম জামাল সভাপতি; জামাল ছিলেন সে যুগের প্রবাসী ভারতীয়দের অন্যতম ধনীশ্রেষ্ঠ। বর্মীদের পক্ষ হইতে মানপত্র পাঠ করিলেন ব্যারিস্টার উ-ব-থিয়েন। বাঙালিদের পক্ষের মানপত্র[২] পড়িলেন ব্যারিস্টার নির্মলচন্দ্র সেন, কবি নবীনচন্দ্রসেনের পুত্র। মানপত্র দুইখানি প্রদত্ত হয় বর্মার বিখ্যাত কারিগরদের নির্মিত রৌপ্যাধারে। তৎকালীন গবর্নর সার্ হারকোর্ট বাট্‌লার কবিকে পত্রদ্বারা তাঁহার অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

দুইদিন রেঙ্গুনে থাকিবার পর ৯ই মে বৈকালে কবি সদলে পুনরায় তোসামারুতে ফিরিলেন। এবার জাহাজের গম্যস্থল পিনাঙ বন্দর। কবি জাহাজে বসিয়া নানা প্রকার লেখাপড়া করিতেছেন, পত্রধারা লিখিতেছেন, আমেরিকার বক্তৃতার খসড়া ও নিজ তর্জমার কাটছাঁট করিতেছেন। রথীন্দ্রনাথকে পত্র লিখিতে গিয়া মনের কতই না কল্পনা প্রকাশ পাইতেছে। একবার মনে হইতেছে, "আর কোথাও না ঘুরে বেড়িয়ে [বর্মার] পাড়াগাঁয়ে কোনো একটা বৌদ্ধমঠের কাছে গিয়ে চুপচাপ থাকতে পারলে বেশ আরাম" পাবেন। আবার জাহাজে দুইজন নরোয়েবাসীর সহিত পরিচয় হওয়ায় সাইবেরিয়ান রেলপথ দিয়া য়ুরোপে যাইবার কথা ভাবিতেছেন। হায় রে, কবির মন! 'সবার যাহে তৃপ্তি হলো, তোমার তাহে হলো না।'

রেঙ্গুন ছাড়া অবধি প্রায় তিন দিন পথে খুব বৃষ্টি-বাদল। পিনাঙে পৌঁছিবার দিন সকাল হইতে আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল।[৩] কবি লিখিতেছেন, "সূর্য যখন অস্ত যাচ্ছে তখন পিনাঙের বন্দরে জাহাজ এসে পৌঁছল। মনে হল, বড়ো সুন্দর এই পৃথিবী।" কিন্তু "জাহাজ যখন আস্তে আস্তে বন্দরের গা ঘেঁষে এল, যখন প্রকৃতির চেয়ে মানুষের দুশ্চেষ্টা বড় হয়ে দেখা দিল,···তখন দেখতে পেলুম মানুষের রিপু জগতে কী কুশ্রীতাই সৃষ্টি করছে। সমুদ্রের

১ জাপানযাত্রী, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ৩০৬-৯।

২ মানপত্রখানি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বলিয়া শোনা যায় (ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র)। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রেঙ্গুন পৌঁছিবার (৭ মে) পূর্বে ১১ এপ্রিল (১৯১৬) শরৎচন্দ্র বর্মা ত্যাগ করেন (শরৎ-পরিচয় পৃ ৩৪)।

৩ চিঠিপত্র ২, পত্র ১৩, ১৮ বৈশাখ ১৩২৩ (১২ মে ১৯১৬)।

তীরে তীরে, বন্দরে বন্দরে, মানুষের লোভ কদর্য ভঙ্গিতে স্বর্গকে ব্যঙ্গ করছে— এমনি করেই নিজেকে স্বর্গ থেকে নির্বাসিত করে দিচ্ছে।"[১] কবির এই শ্রেণীর বিলাপ নূতন নহে, পুরাতন গঙ্গাতীরের শোভার জন্য আক্ষেপ বরাবরই করিয়াছেন; কিন্তু যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহাকে বিলাপ বা বিক্ষোভের দ্বারা প্রতিহত কে করিবে।

পিনাঙে মালপত্র বেশি না থাকাতে পরদিন সন্ধ্যায় জাহাজ বন্দর ত্যাগ করিল। পরবর্তী বন্দর সিঙাপুরে জাহাজ ভিড়িল ১৫ই মে (২ জ্যৈষ্ঠ)। পিয়ার্সন ও মুকুল সিঙাপুর দেখিতে বাহির হইলেন, এণ্ড্রুস ও কবি জাহাজে থাকিয়া গেলেন। সর্বপ্রথম এইখানে নাছোড়বান্দা জাপানী সংবাদিকদের সহিত কবির পরিচয় হয়। আমেরিকান্ জার্নালিজম্ জাপানকে কতখানি আধুনিক করিয়াছিল, তাহার পরিচয় অচিরেই কবি ভালো করিয়া পাইবেন— এইখানে তাহার আভাস পাইলেন। ভাবিয়াছিলেন সিঙাপুরে নামিবেন না; কিন্তু শেষ পর্যন্ত একজন জাপানী মহিলার অনুরোধে জাহাজ ছাড়িয়া মোটরযোগে সিঙাপুরের বিখ্যাত রবার-ক্ষেত্র ও গ্রাম-অঞ্চল দেখিয়া আসিলেন।

সিঙাপুর ছাড়িয়া চীনসাগরে জাহাজ প্রকাণ্ড এক তাইফুন্ বা ঝড়ের মুখে পড়িল। কবি লিখিতেছেন, "আমি পারৎপক্ষে ক্যাবিনে শুইনে···। কাল রাত্রে এম্‌নি বৃষ্টি এল যে কোথায় একটু আড়াল পাওয়া যাবে খুঁজে পাওয়া গেল না, অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিছানাটাকে এধার থেকে ওধার এপাশ থেকে ওপাশ টানাটানি করে ফিরলুম— তার পরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে রাত যখন দেড়টা হল, তখন অন্য উপায় না দেখে ক্যাবিনে এসে শুলুম।'[২] কবিজীবনের কত না অভিজ্ঞতা হইতেছে। দিনেন্দ্রনাথকে লিখিত পত্র হইতে জানি যে সেই রাত্রে 'তোমার ভুবনজোড়া আসনখানি' গানটি রচনা করেন (৮ জ্যৈষ্ঠ)।[৩]

এই কয়দিনে জাপানী জাহাজে বাস করিয়া জাপানীদের সম্বন্ধে তাঁহার অনেক অভিজ্ঞতা হইয়াছে। জাপানযাত্রীর পত্রধারায় তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। জাপানী কাপ্তেন ও কর্মচারিদের ভদ্রতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার সমাবেশ তাঁহাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল। মুকুল তখন বালকমাত্র, ডেকযাত্রী; সেই বালকের অনেক কৌতূহলী প্রশ্নের জাপানী কর্মচারিগণ কী ধৈর্যের সঙ্গে উত্তর দিতেছিল, তাহা দেখিয়া কবি অবাক; তিনি জানিতেন কোনো য়ুরোপীয় জাহাজে এইটি সম্ভব হইত না।

হংকং চীনের প্রধান বন্দর; বন্দরে জাহাজ আসিলে কাপ্তেন বলিলেন যে সাঙ্ঘাইবন্দরে এই জাহাজের থামিবার কথা ছিল; কিন্তু "জাপানবাসীরা আপনাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে, তাই আমাদের সদর আপিস থেকে টেলিগ্রামে আদেশ এসেছে, অন্য বন্দরে বিলম্ব না করে চলে যেতে। সাঙ্ঘাইয়ের সমস্ত মাল আমরা এইখানেই নামিয়ে দেব, অন্য জাহাজে করে সেখানে যাবে।"[৪]

হংকঙে জাহাজ দুইদিন থামিল; কবি নামিলেন না। জাহাজের ডেকে বসিয়া কর্মব্যস্ত চীনামজুরদের কাজ দেখিতে লাগিলেন। "জাহাজের ঘাটে মাল তোলা-নামার কাজ দেখতে যে এত আনন্দ হবে, এ কথা আমি পূর্বে মনে করতে পারতুম না। পূর্ণ শক্তির কাজ বড় সুন্দর;··· কাজের শক্তি, কাজের নৈপুণ্য এবং কাজের আনন্দকে এমন পুঞ্জীভূতভাবে একত্র দেখতে পেয়ে আমি মনে মনে বুঝতে পারলুম, এই বৃহৎ জাতির মধ্যে কতখানি ক্ষমতা সমস্ত দেশ জুড়ে সঞ্চিত হচ্চে।··· এই এতবড়ো একটা শক্তি যখন আপনার আধুনিক কালের বাহনকে পাবে,

১ জাপানযাত্রী পৃ ৩৩, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ৩১২।

২ চিঠিপত্র ২, ৯ জ্যেষ্ঠ ১৩২৩। দ্র. জাপানযাত্রী, পৃ ৬৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ৩২৯।

৩ গীতপঞ্চাশিকা। দ্র গীতবিতান, পৃ. ১৪৬।

৪ জাপানযাত্রী পৃ ৬৭, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ৩৩০।

অর্থাৎ যখন বিজ্ঞান তার আয়ত্ত হবে, তখন পৃথিবীতে তাকে বাধা দিতে পারে এমন কোনো শক্তি আছে?··· এখন যে-সব জাতি পৃথিবীর সম্পদ ভোগ করছে, তারা চীনের সেই অভ্যুত্থানকে ভয় করে, সেই দিনকে তারা ঠেকিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু যে জাতির যেদিকে যতখানি বড়ো হবার শক্তি আছে, সেদিকে তাকে ততখানি বড়ো হয়ে উঠতে দিতে বাধা দেওয়া যে-স্বজাতিপূজা থেকে জন্মেছে তার মতো এমন সর্বনেশে পূজা জগতে আর কিছুই নেই।" বন্দরে বন্দরে বাণিজ্যের বীভৎস মূর্তি দেখিয়া কবির মন অত্যন্ত আতঙ্কিত। তিনি বলিতেছেন, "বাণিজ্যদানব যদি মানুষের ঘরকরনা স্বাধীনতা সমস্তই গ্রাস ক'রে চলতে থাকে, এবং বৃহৎ এক দাসসম্প্রদায়কে সৃষ্টি করে তুলে তারই সাহায্যে অল্প কয়জনের আরাম এবং স্বার্থ সাধন করতে থাকে, তাহলে পৃথিবী রসাতলে যাবে।" কবির এই মন্তব্য যে দৈববাণীর ন্যায় ইতিহাসে মূর্তি লইয়াছে তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্দেশের প্রয়োজন নাই।

তোসামারু ২৯ মে (১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩) জাপানের বন্দর কোবেতে পৌঁছিল। বন্দরে পৌঁছিবামাত্র "খবরের কাগজের চর তাদের প্রশ্ন এবং তাদের ক্যামেরা নিয়ে" কবিকে আচ্ছন্ন করিল। বন্দরঘাটে কবিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অনেক ভারতবাসী উপস্থিত। জাপানিদের মধ্যে ছিলেন টাইক্কন, কাট্‌সূটা, সানো, কাওয়াগুচি প্রভৃতি। টাইক্কন ছিলেন বিখ্যাত চিত্রকর; চিত্রকর কাট্‌সূটা একসময়ে কলিকাতায় গিয়া ঠাকুরবাড়ির অতিথি হন; সানো একসময়ে শান্তিনিকেতনে জুজুৎসু শিখাইতেন, কাওয়াগুচি বিখ্যাত পর্যটক। কবি হংকং হইতে ভারতীয়দের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া গুজরাটি বণিক মোরারজির বাড়িতে উঠিলেন।

জাপানে বাসকালে কবির সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা প্রায়-স্তব্ধ। তবে দর্শনপ্রার্থী আগন্তুকগণের অনুরোধে তাহাদের হাতপাখায় বা রুমালে কিছু-না-কিছু বাণী লিখিয়া দিতে হয়। এই সব ক্ষুদ্র রচনা আমেরিকায় গিয়া একত্র করিয়া মুদ্রিত হয় *Stray Birds* নামে।[১] বইখানি অতিথিবৎসল হারা সান্‌কে উৎসর্গ করেন। এই বই-এর অনেকগুলিই হইতেছে 'কণিকা'র দ্বিপদী, চতুষ্পদীর ভাবানুবাদ; কতকগুলি নূতন রচনা। পরযুগে রচিত *Fireflies* (১৯২৮), লেখন, স্ফুলিঙ্গ এই *Stray Birds* এর সমপর্যায়ভুক্ত সাহিত্য।

জাপানে তিনমাস

কবি জাপানে আসিলেন— বহুকালের ইচ্ছা। ১৯১৫ সালে একবার জাপানযাত্রার আয়োজন হইয়াছিল— কাওয়াগুচির সঙ্গে পত্রবিনিময়ও হয়। কিন্তু নানা কারণে তাহা সফল হয় নাই।[২]

জাপানে 'কোবে' বন্দর ও শিল্পনগরী অনেকটা ইংলণ্ডের লিভারপুলের ন্যায়। নিকটেই ওসাকা, বিলাতের ম্যানচেস্টার। কবি লিখিতেছেন, "আমার এই জানলায় বসে কোবে শহরের দিকে তাকিয়ে এই যা দেখছি এ তো লোহার জাপান, এ তো রক্তমাংসের নয়। একদিকে জানলা, আর-একদিকে সমুদ্র, এর মাঝখানে···শহর। চীনেরা যে-রকম বিকটমূর্তি ড্র্যাগন আঁকে— সেইরকম। আঁকাবাঁকা বিপুল দেহ নিয়ে সে যেন সবুজ পৃথিবীটাকে খেয়ে ফেলছে। গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি লোহার চালগুলো ঠিক যেন তারি পিঠের আঁসের মতো রৌদ্রে ঝক্‌ঝক্ করচে। বড় কঠিন, বড় কুৎসিত এই দরকার-নামক দৈত্যটা।···মানুষের দরকার আছে, এই কথাটাই ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে, হাঁ করতে করতে, পৃথিবীর অধিকাংশকে গ্রাস করে ফেলেছে। প্রকৃতিও কেবল দরকারের সামগ্রী, মানুষও কেবল দরকারের মানুষ হয়ে আসছে।[৩]

১ *Stray Birds* (1916): Epigrams. Macmillan Co., New York; Frontispiece in colour by Willy Pogany.

২ জাপানযাত্রী পৃ ৭৮, রবীন্দ্র-রচনাবলী, পৃ ২৩৬-৩৭।

৩ চিঠিপত্র ৫, ৬ ভাদ্র ১৩২৩, পৃ ৫০।

"জাপানে শহরের চেহারায় জাপানিত্ব বিশেষ নেই, মানুষের সাজসজ্জা থেকেও জাপান ক্রমশ বিদায় নিচ্ছে।" তার কারণ জাপানের ঘরবাড়ি, আপিস-আসবাব, জাপানীর পোশাকপরিচ্ছদ, সমস্তই পাশ্চাত্য ছন্দ-অনুবর্তী। "মেয়েরাই জাপানের বেশে জাপানের সম্মানরক্ষার ভার নিয়েছে। ওরা দরকারকেই সকলের চেয়ে বড়ো করে খাতির করে নি, সেইজন্যেই ওরা নয়নমনের আনন্দ।" জাপানি চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য কবিকে খুবই মুগ্ধ করিয়াছে— সেটি হইতেছে ইহাদের সংযম। "রাস্তায় লোকের ভিড় আছে, কিন্তু গোলমাল একেবারে নাই।...জাপানি বাজে চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি করে নিজের বলক্ষয় করে না।...শরীর-মনের এই শান্তি ও সহিষ্ণুতা ওদের স্বজাতীয় সাধনার একটা অঙ্গ। শোকে দুঃখে আঘাতে উত্তেজনায় ওরা নিজেকে সংযত করতে জানে। সেইজন্য বিদেশের লোকেরা প্রায় বলে, জাপানিকে বোঝা যায় না, ওরা অত্যন্ত বেশি গূঢ়।" (পৃ ৩৩৮)। কবি বলেন জাপানীদের সাহিত্যেও এই সংযম দেখা যায়; সেইজন্য ওদের তিন-পংক্তির কবিতা "কবি ও পাঠক, উভয়ের পক্ষেই যথেষ্ট।... এদের অন্তরের সমস্ত প্রকাশ সৌন্দর্যবোধে। সৌন্দর্যবোধ জিনিসটা স্বার্থনিরপেক্ষ। ফুল পাখি চাঁদ, এদের নিয়ে আমাদের কাঁদাকাটা নেই।" (পৃ ৩৩৯)। "হৃদয়োচ্ছ্বাস...এখানে চোখে পড়ে না।" উহাদের সৌন্দর্য-অনুভূতি যে কী পরিমাণ সত্য, তাহা আমাদের উপলব্ধির অতীত। "এদের চোখের ক্ষুধা এদের পেটের ক্ষুধার চেয়ে কম নয়।" সেইজন্য জাপানাদের আর্ট এত উন্নতি লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ জাপানের গৃহস্থালী সম্বন্ধে বিস্তারিত-ভাবে জানিবার বিশেষ সুযোগ পান। জাপানে আসবাবহীন ঘরের সৌন্দর্য কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। "যে জিনিস যথার্থ সুন্দর তার চারিদিকে মস্ত একটি বিরলতার অবকাশ থাকা চাই।"

এই পত্রধারায় কবি জাপানী নারীদের সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বলিয়াছেন। তথাকার দাসীদের কর্মদক্ষতা কবিকে প্রথম দিনেই মুগ্ধ করিয়াছিল। "এখানে মেয়ে-পুরুষের সামীপ্যের মধ্যে কোনো গ্লানি দেখতে পাই নে। অন্যত্র মেয়ে-পুরুষের মাঝখানে যে একটা লজ্জা-সঙ্কোচের আবিলতা আছে, এখানে তা নেই।" (পৃ ৩৪৩)। কারুইজাওয়া নামক স্থানে একটি মেয়ে-স্কুল দেখিয়া আসিয়া তিনি রথীন্দ্রনাথকে পত্রমধ্যে লেখেন, "জাপানী মেয়েদের উপর আমার ভক্তি বেড়ে গিয়েচে। আমি ত এদের মত এমন মেয়ে কোথাও দেখি নি।"[১] কবির এই উক্তিকে চরম বলিয়া গ্রহণ করিবার কোনো কারণ নাই। কারণ, নূতন ও অভিনব চিরদিনই কবিকে মুগ্ধ করিয়াছিল। একদিন কবি জাপানি নাচ দেখিতে যান। এই নৃত্যকে তিনি দেহভঙ্গীর সংগীত বলিয়াছেন। এই সংগীত আমাদের দেশের বীণার আলাপ। অর্থাৎ, পদে পদে মীড়। ভঙ্গীবৈচিত্র্যের পরস্পরের মাঝখানে কোনো ফাঁক নেই কিম্বা কোথাও জোড়ের চিহ্ন দেখা যায় না; সমস্ত দেহ পুষ্পিত লতার মতো একসঙ্গে দুলতে দুলতে সৌন্দর্যের পুষ্পবৃষ্টি করছে। খাঁটি য়ুরোপীয় নাচ...আধখানা ব্যায়াম, আধখানা নাচ;...জাপানী নাচ একেবারে পরিপূর্ণ নাচ। তার সজ্জার মধ্যেও লেশমাত্র উলঙ্গতা নেই। অন্য দেশের নাচে দেহের সৌন্দর্যলীলার সঙ্গে দেহের লালসা মিশ্রিত। এখানে নাচের কোনো ভঙ্গীর মধ্যে লালসার ইশারামাত্র নাই।" (পৃ ৩৪৭)।

জাপানী সংগীত যে উৎকর্ষ লাভ করে নাই তাহা কবি সহজেই ধরিতে পারিলেন। তাঁহার সন্দেহ "চোখ আর কান, এই দুইয়ের উৎকর্ষ একসঙ্গে ঘটে না।" জাপানি রূপরাজ্যের সমস্ত দখল করিয়াছে। অপরিসীম সৌন্দর্যের চর্চা করিয়া অপরিসীম বীর্যের সাধনাও তাহাদের ছিল। অনেকের ধারণা শুষ্কতাই বুঝি পৌরুষ; কিন্তু জাপানিদের

১ রথীন্দ্রনাথকে পত্র—শিলাইদহ হইতে ১৮ জুলাই ১৯১৫ (২ শ্রাবণ ১৩২২)—চিঠিপত্র ২, পৃ ৩৩।

এণ্ড্রুস তাঁহার *Letters to a Friend*-এর ৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন: He had very nearly made up his mind to start in August (1915) and had actually taken his passage on a Japanese steamer, when a series of circumstances intervened, which made the journey impossible.

জীবনে গভীর সৌন্দর্য অনুভূতির সহিত অসীম শৌর্যের উদ্বাহ হইয়াছে।

জাপানের চিত্রকলা খুব ভালোভাবেই দেখিবার সুযোগ কবি লাভ করেন। সে-সম্বন্ধে আমরা পৃথকভাবে আলোচনা করিব। কোবে হইতে কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা একদিন মোটর যোগে যান ওসাকায়। ওসাকার বিখ্যাত দৈনিক 'ওসাকা আসাশী সিম্‌বুম'এর স্বত্বাধিকারী মুরায়াম সান নিমন্ত্রণকারী। এইখানে জাপানের বিখ্যাত চা-উৎসব কবির জন্য বিশেষভাবে সম্পন্ন করা হয়। কবি ঐ অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বর্ণনা জাপানযাত্রীতে দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, সেদিন এই অনুষ্ঠান দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, জাপানীর পক্ষে এটা ধর্মানুষ্ঠানের তুল্য। এ ওদের একটা জাতীয় সাধনা।

চা-উৎসবের পারিপাট্য, সৌন্দর্যসাধনা পরযুগে শান্তিনিকেতনের উৎসবসমূহকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল কিনা সে বিষয়ে কেহ যদি আলোচনা করেন, তবে তাহা নিষ্ফল হইবে না বলিয়া আমাদের মনে হয়।

ওসাকাতে জাপানী প্রেস-অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক বিরাট সভায় কবির সম্বর্ধনা হয়; সেই সভায় যে বক্তৃতা করিতে হয়, তাহাই বোধ হয় জাপানে আসিবার পর প্রথম পাবলিক বক্তৃতা। জাপানের পথে ও জাপানে নামিয়া কবি খবরের কাগজের চরদের দ্বারা কিভাবে আক্রান্ত হন, তাহার কথা পত্রধারায় বলিয়াছেন; কিন্তু ওসাকায় এই পত্রিকাওয়ালাদের সুবিস্তৃত জালের মধ্যে আটকা পড়িয়া কবি অত্যন্ত বিব্রত হন। যাহাই হউক, ওসাকায় দুই দিন থাকিয়া কবি কোবেতে ফিরিয়া যান ও তথা হইতে টোকিও যাত্রা করেন। টোকিওতে কবির অভাবনীয় সম্বর্ধনা হইয়াছিল। কবি লিখিতেছেন, "এখানে এসেই আদর-অভ্যর্থনার সাইক্লোনের মধ্যে পড়ে গেছি; সেই সঙ্গে খবরের কাগজের চরেরা চারিদিকে তুফান লাগিয়ে দিয়েছে।" (পৃ ৩২৪)। টোকিও শহরে কবি তাঁহাদের বন্ধু চিত্রকর য়োকোয়াম টাইকানের বাড়িতে আশ্রয় লইলেন (৫ জুন)।

টোকিও রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির প্রথম অভিভাষণ (১২ই জুন) ও পরদিন তথাকার বিখ্যাত উয়েনো পার্কে কবির প্রথম সম্বর্ধনা হয়। প্রায় দুই শত বিশিষ্ট নাগরিক উপস্থিত হন; তন্মধ্যে ছিলেন কাউণ্ট ওকুমা[১]—জাপানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষাসচিব ডাঃ তাকাটা, কৃষি-বাণিজ্য সচিব মিঃ কোনো, রাজকীয় বিশ্ববিদ্যলয়ের অধ্যক্ষ ডাঃ ব্যরন য়ামাকওয়া, টোকিওর মেয়র ডাঃ ওকুদা। উৎসবের কর্তা ছিলেন বৌদ্ধ— জেন (ধ্যান) সম্প্রদায়ের সোতো শাখার মঠাচার্য। কানাইজি বৌদ্ধ মন্দির এই সম্বর্ধনা-উৎসবের জন্য বিশেষভাবে সজ্জিত হয়। সম্বর্ধনা হইলে কবি উত্তরে বলেন যে তিনি জাপানি ভাষা জানেন না এবং বিদেশীর ধারকরা ভাষায় উত্তর দিতে অনিচ্ছুক; সেইজন্য তাঁহার বক্তব্য বলিলেন বাংলায়। কবির বক্তৃতা হইলে তাহা অধ্যাপক কিমুরা জাপানিতে ভাষান্তরিত করিয়া দিলেন। কিমুরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের বৌদ্ধশাস্ত্রের অধ্যাপক, এই সময়ে জাপানে ছিলেন ছুটিতে। তিনি ভালো বাংলা জানিতেন। কবি বলিয়াছিলেন যে তিনি কোবে বন্দরে পৌঁছিয়া চারি দিকে যাহাই দেখেন তাহাই পাশ্চাত্যের অনুকরণ মাত্র। শিজুওকা পৌঁছিলে একজন জাপানী শ্রমণ যখন অঞ্জলিবদ্ধভাবে তাঁহাকে সমাদর করিল তখনই তিনি অনুভব করিলেন যে এতক্ষণে জাপানের অন্তরকে দেখা গেল।

কাউণ্ট ওকুমা ভাবিয়াছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন; সে-কথা বলায় শ্রোতাদের মধ্যে বেশ একটু কৌতুকের সৃষ্টি হয়। ওকুমা বলিলেন যে ভারতীয় ঋষি জাপানকে সময়োচিত উপদেশ দিয়াছেন, কারণ জাপান তাহার অন্তরজীবনের সংগ্রামের সম্মুখীন হইয়াছে, অর্থাৎ সে তাহার প্রাচীন 'বুশিদো'কে হারাইতেছে এবং নবীন য়ুরোপকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ্ তাকাকুসুও ভারতীয় কবির

১ ওকুমা শিগেনোবু (১৮৩৮-১৯২২)। জাপানের প্রধানমন্ত্রী ১৯১৪-১৬ অক্টোবর। জাপানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনীতিক; বাসেদা (Waseda) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ১৮৮২। ইংরেজিতে *Fifty years of Japan* নামে সুবৃহৎ গ্রন্থ সম্পাদন করেন। অথচ তিনি ইংরেজি জানিতেন না।

প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখাইলেন। ভোজসভায় বিহারের ছাত্রগণ পরিবেশন করিয়া অতিথির প্রতি জাপানী-আদর্শের শ্রেষ্ঠ সৌজন্য প্রকাশ করিল।

টোকিওতে থাকিতে থাকিতে নানাস্থান হইতে কবির আহ্বান আসিল। য়োকোহামার হারা সান একজন বিখ্যাত ধনী বণিক।[১] সদল রবীন্দ্রনাথকে তিনি তাঁহার পল্লী-আবাস হাকানে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। কবি লিখিতেছেন, "আমরা যাঁর আশ্রয়ে আছি, সেই হারা সান গুণী এবং গুণজ্ঞ। তিনি রসে হাস্যে ঔদার্যে পরিপূর্ণ। সমুদ্রের ধারে, পাহাড়ের গায়ে, তাঁর এই পরমসুন্দর বাগানটি সর্বসাধারণের জন্যে নিত্যই উদ্‌ঘাটিত।" বাগানটি নন্দনবনের মতো। হারা সানের মধ্যে কৃপণতাও নেই, আড়ম্বরও নেই, অথচ তাঁর চারি দিকে সমারোহ আছে। মূঢ় ধনাভিমানীর মতো তিনি মূল্যবান জিনিসকে কেবলমাত্র সংগ্রহ করে রাখেন না ; তার মূল্য তিনি বোঝেন, তার মূল্য তিনি দেন এবং তার কাছে তিনি সম্ভ্রমে আপনাকে নত করতে জানেন।" (পৃ ৩৫২)। একপত্রে লিখিতেছেন, "রাজার মত যত্ন পাচ্ছি। এমন সুন্দর জায়গা আর কোথাও পাব বলে মনে হয় না।" (চিঠিপত্র ২, পৃ ৪৪)।

আমেরিকা-যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত কবি প্রায় হাকানেই থাকিয়া যান ; এখান হইতে টোকিওতে বক্তৃতা দিতে যান। মাঝে কয়েকদিনের জন্য গিয়াছিলেন কারুইজাওয়ার নারী-বিদ্যালয়ে তথাকার অতিথিরূপে। এ ছাড়া গিয়াছিলেন ওকাকুরার বাড়িতে ; ওকাকুরা কয়েক বৎসর পূর্বে গতায়ু হইয়াছেন, তাঁহার পুত্রই অতিথিপরিচর্যা করিলেন।

হাকানে বাসকালে কবি আমেরিকার বক্তৃতার কয়েকটি অংশ লেখেন ; এইখানে জানিতে পারিলেন যে আমেরিকায় চল্লিশটি বক্তৃতা দিতে হইবে। বলা বাহুল্য পৃথক্ পৃথক্ বক্তৃতা নহে ; যে কয়টা লিখিলেন তাহাদেরই "একটা-না-একটা শহরে শহরে বারবার আউড়ে যেতে হবে। The nation বলে যেটা লিখচি সেইটেই সবচেয়ে বেশি বার পড়ব— তা ছাড়া নাটক এবং গল্পের reading দিতে পারব।"[১] জাপানে তিনি যেসব বক্তৃতা[২] করেন, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে The Nation ও The Spirit of Japan। রবীন্দ্রনাথ কবি হইয়া কেন জাপানকে তাহাদের রাজনীতি লইয়া এই দুই বক্তৃতায় তিরস্কৃত করিলেন এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। সেই কথাটুকু বুঝাইবার জন্য সংক্ষেপে সমসাময়িক ইতিহাসের দুই-চারিটা ঘটনা এখানে বলা প্রয়োজন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন পৃথিবীব্যাপী প্রথম-মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসর পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। জাপান মিত্রপক্ষ (ইংরেজ-ফরাসী-ইতালি-রুশ) অবলম্বন করিয়া চীন হইতে জারমানদের তাড়াইয়া সিংটাও অধিকার করিয়াছে। চীন মাত্র চারি বৎসর পূর্বে (১৯১২) রিপাব্‌লিক স্থাপন করিয়াছে ; অব্যবস্থা চারি দিকে। জাপান-জারমান যুদ্ধের পর চীন জাপানকে জারমানদের অধিকৃত রাজ্যের বাহিরে জাপানী সৈন্য সরাইয়া লইবার অনুরোধ জ্ঞাপন করে। জাপান য়ুরোপের যুদ্ধ-পরিস্থিতির অজুহাতে চীনের এই ন্যায্য দাবিতে কর্ণপাত করিল না, বরং ১৯১৫ সালের গোড়ায় চীনে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট য়ুন-শি-কাইয়ের নিকট ২১ দফা দাবি পেশ করিল। এই দাবিগুলি মানিয়া লইলে চীনের স্বাধীনতা প্রায় লুপ্ত হয় ; অথচ জাপান বেয়নটের মুখে সকল দাবিই চীন সরকারের নিকট হইতে আদায় করিবার ব্যবস্থা করিল। য়ুন-শি-কাইএর প্রতি জাপানের বিরূপ হইবার কারণ ছিল ; য়ুন ১৯১৩ (অক্টোবর ৬) সালে চীন রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়া অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত চীনের মধ্যে শান্তি ও সুব্যবস্থা আনিতে ছিলেন। কিন্তু য়ুন প্রেসিডেন্ট থাকিয়া সুখী হইতে পারিলেন না, তিনি নেপোলিয়নের ন্যায় সকল ক্ষমতা হস্তগত করিয়া আপনাকে সম্রাটরূপে ঘোষণার আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। জাপান

১ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত পত্র—পাণ্ডুলিপি, ১১ ভাদ্র।

২ টোকিও-র Keio-gi juku নামে বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৮৬৫ সালে বিখ্যাত ফুকুজ -বা কর্তৃক স্থাপিত হয় ও ১৮৯০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়রূপে পরিগণিত হয়। এটি জাপানের বুনিয়াদি প্রতিষ্ঠানের অন্যতম।

জানিত য়ুনের ন্যায় শক্তিমান পুরুষ যদি চীনের একচ্ছত্র অধিকার লাভ করেন, তবে জাপানের দুর্দিন। য়ুনও জানিতেন যে একান্ত শক্তি ব্যতীত চীনকে মিলিত করা অসম্ভব, রিপাবলিক শাসন টেঁকা কঠিন। এমন সময়ে ১৯১৬ (জুন ৬) য়ুনের মৃত্যু হওয়ায় যেমন সম্রাটের একাধিপত্যের সমস্যা দূর হইল, তেমনি অন্যদিক হইতে যে অসংখ্য সমস্যা দেখা দিল— তাহার অবসান বেশিদিন হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ জাপান পৌঁছিবার কয়েকদিনের মধ্যে য়ুন-শি-কাই এর মৃত্যু হয়; কবি গিয়াই দেখিলেন যে জাপানের সর্বত্র চীনকে লাঞ্ছিত করিবার বিপুল আয়োজন চলিতেছে। হাকানে বাস কালে নানা শ্রেণীর লোক কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে। জাপানের উগ্র সাম্রাজ্য-লিপ্সা, কোরিয়ার প্রতি তাহার অকথ্য অত্যাচার-কাহিনী, চীনের প্রতি অপমানকর শর্তাদির বিস্তৃত বিবরণ সবই জানিতে পারিলেন। জাপান 'সভ্য' হইয়া পশ্চিমের আগ্নেয়াস্ত্র ও কূটনীতি আয়ত্ত করিয়া তাহার প্রথম পরীক্ষা করিয়াছিল (১৮৯৬) দুর্বল চীনের উপর। সেই হইতে জাপানের চীনকে অপমানিত ভূলুণ্ঠিত করিবার আকাঙ্ক্ষা। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "চীনের সঙ্গে যুদ্ধে নৌযুদ্ধে জাপান জয়লাভ করেছিল— সেই জয়ের চিহ্নগুলিকে কাঁটার মতো দেশের চারিদিকে পুঁতে রাখা যে বর্বরতা সেটা যে অসুন্দর, সে-কথা জাপানের বোঝা উচিত ছিল।" (পৃ ৩৪৯)।

স্পর্শকাতর কবিচিত্ত জাপানের রণকণ্ডূয়নের ও সাম্রাজ্যস্ফীতির লক্ষণসমূহ দেখিয়া স্বভাবতই উত্তেজিত হইয়াছিল। ইহারই প্রতিক্রিয়ায় কবি লিখিলেন The Spirit of Japan ও The Nation। কবি বক্তৃতায় কী বলিয়াছিলেন ও তাহার প্রতিক্রিয়া জাপানে কী হইয়াছিল, তাহার আলোচনা অন্যত্র করিয়াছি। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, ন্যাশনালিজমের বিরুদ্ধে কবির উক্তি জাপানী শাসকবর্গের ভালো লাগে নাই; তবে জাপানের যুবমন সকল দেশের যুবমনের ন্যায়ই মহতের আহ্বানে চঞ্চল হইয়াছিল; কিন্তু মুখর হওয়া তাহাদের স্বভাববিরুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "জাপানে একরকম আসর জমেচে মন্দ নয়। এদের সঙ্গে ব্যবহারে মনে একটা খুব আনন্দ হয় যে এরা অন্তরের সঙ্গে আমার কাছে আসে। এদের সত্যি দরকার আছে বলে এরা চায়, সেইজন্যে আমার যা-কিছু সত্যি আছে সেটা এদের সামনে এনে দেওয়া আমার পক্ষে খুব সহজ হয়। য়ুরোপেও তাই। আইডিয়া তাদের জীবনের খোরাক। তারা গভীর প্রয়োজন থেকে আইডিয়াকে চায়, এইজন্য গভীর উৎস থেকে আইডিয়া তাদের জন্য উৎসারিত হয়।"[১] ইহার মধ্যে কবির কল্পনা আছে; সামান্য বিষয় ও বস্তুকে অপরিসীম সৌন্দর্যের মধ্যে দেখিবার অসাধারণ শক্তিবলে তিনি কয়েকজন আদর্শবাদীর সহিত কথাবার্তা বলিয়া মনে করিতেছেন জাপানিরা আইডিয়ার কাঙাল।

তবে জাপানে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার যথার্থ প্রতিক্রিয়া হয় আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর। আমেরিকায় তিনি জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে যে অভিযান করেন, তাহা কোনো দেশের রাষ্ট্রনীতিকদেরই ভালো লাগে নাই, জাপানেরও ভালো লাগিবার কথা নহে। উগ্র জাতীয়তাবাদের নেশায় তখন সে মত্ত— তাহার পক্ষে বিদেশীর হিতবচন শোনা অসম্ভব। জাপানে আসিবার সময় যাঁহাকে সমগ্র জাতি অভ্যর্থনা করিয়াছিল তাঁহাকে বিদায় দিবার ক্ষণে জাহাজ-ঘাটে কোনো জনতার ভিড় হয় নাই— একমাত্র হারা সান তাঁহার অতিথিকে বিদায় দিবার জন্য উপস্থিত হন। জাপান-সরকারের অন্তর-টিপুনিতে সমস্ত দেশ কবির প্রতি বিমুখ হইয়াছিল।[২]

১ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৫১ (২০ জুন ১৯১৬)।

২ রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে জাপানী কবি য়োন নোগুচির সমসাময়িক মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত হইল—

...The large audience who were listening to him distinctly divided into two opinions; while some adherents of the so-called western civilization in Japan, called Sir Rabindranath, merely a propagandist of negativism or wilful dreamer who, in spite of himself will surely fail to realise the fullness of his own nature, the others, delightfuly awakened into the so-called Japanism or orientalism endorsed by the exposed weakness of the present European war, thought that Sir Rabindranath agreed with their first

ভারত ও জাপান

ভারত ও এশিয়ার মিলনযজ্ঞে রবীন্দ্রনাথের স্থানটি কোথায়, তাহার সম্যক্ ঐতিহাসিক আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন। পাঠকের স্মরণ আছে, বিংশ শতকের প্রারম্ভভাগে জাগ্রত জাপানের তরুণ আদর্শবাদী শিল্পশাস্ত্রী ওকাকুরা Asia is one-এর স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। শিল্প ও ধর্মসাধনার দিক হইতে সমগ্র পূর্ব-এশিয়ার যে একটি সাধারণ যোগসূত্র আছে, তাহারই তত্ত্বটি আবিষ্কারের জন্য তাঁহার এ দেশে আসা। জাপানের ও ভারতের চিত্তের যোগবন্ধনের আশায় তিনি আসেন স্বামী বিবেকানন্দকে জাপানে লইয়া যাইবার জন্য। তাঁহার ইচ্ছা ছিল ভারতের এই ত্যাগমূর্তি নরোত্তম সন্ন্যাসী জাপানের নবচেতনা স্বচক্ষে দেখিয়া আসেন; স্বামীজি তখন ভগ্নস্বাস্থ্য— জাপানে তাঁহার যাওয়া হইল না।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখনো রুশ-জাপানের যুদ্ধ সুদূরে— জাপানের শিল্পের মোহে তখনো বাঙালি ছাত্রের দল জাপানে যাইবার জন্য মাতিয়া উঠে নাই। তখন জাপান হইতে দুই-একটি বিদ্যার্থী আসিতেছেন। ওকাকুরার ব্যবস্থায় নব-প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আসেন হোরি সান সংস্কৃত পড়িতে; কলিকাতায় তাইক্কান ও হিসিদহা আসিলেন ভারতীয় শিল্পকলা বুঝিতে। নূতন জাগ্রত জাপান বৌদ্ধধর্মকে রাষ্ট্রধর্মরূপে গ্রহণ করে নাই, অথচ উহাই ছিল জাতির অন্তরের ধর্ম। বৌদ্ধধর্মকে তাহারা পাইয়াছিল চীনা ভাষার মধ্য দিয়া; মূল সংস্কৃত ও পালি হইতে জানিবার সুযোগ তাহার বহু শতাব্দী হয় নাই। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে নব্য জাপানের একদল যুবক বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন মানসে য়ুরোপের বিদ্যাকেন্দ্রে যান। ভারতবর্ষের কথা তাঁহাদের মনে হয় নাই এবং এ দেশে সে অনুকূল স্থানও তখন ছিল না। বিংশ শতকের মুখে কিছুটা সিংহলদেশীয় অনাগারিক ধর্মপালের নিখিল বৌদ্ধ আন্দোলনের ফলে, কিছুটা ভারতের প্রতি আকর্ষণ-হেতু— জাপানীদের দৃষ্টি গেল ভারতের বৌদ্ধ তীর্থে— মন গেল সংস্কৃত অধ্যয়নের দিকে। শান্তিনিকেতনে যে জাপানী ছাত্র আসিলেন— হোরি সান— সম্ভ্রান্ত সামুরাই বংশে তাঁহার জন্ম, ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রথম বিদেশী ছাত্র তিনি। হোরি না জানিতেন ইংরেজি, না জানিতেন অন্য কোনো ভারতীয় ভাষা। কিন্তু কী নিষ্ঠার সহিত জ্ঞানার্জন শুরু করেন। অকালে

principle in encouraging the individualism to assert the inner development of the nation. The Japanese chauvinists (I admit that we have a great number of them here) were pleased to hear the Indian poet saying that the political civilization which had sprang from the soil of Europe and was over-running the whole world like some prolific weed, was based upon exclusiveness; he declared, 'This spirit of extermination is showing its fangs in another manner— in California, in Canada, in Australia— by inhospitably shutting out aliens through those who themselves were aliens in the land they now occupy." What Sir Rabindranath brought to the well-balanced intellectual Japanese minds was this: How can we properly check the western invasion? Again, how can we keep our own beauty and strength grown from the soil a thousand years old and let them realize the fullness of their nature, not curtailing all that is best and true in them at the threatened encroachment of foreign elements? After all, he only presents this great momentous question; and like any other prophet, he does not answer the question. Only pointing the way by his inspired hand unseen but sure; it is our work to solve.—Modern Review 1916 Nov, p 529-30.

Modern Review for August 1916. p 230-35 Notes— Sir Rabindranath Tagore in Japan [Sir Rabindranath addressing a meeting at Osaka, picture, Japan]; Press dinner at Osaka. Rabindranath's Bengali speech in Japan. A Japanese on Rabindranath. The Gratitude of Asia to Japan. Japan both old and new. Japan's teaching. Japan no imitator. Modern Review Sep 1916. Notes— A Japanese appreciation of Sir Rabindranath Tagore, p 342-43, Sir Rabindranath interviewed (by correspondent, Manchester Guardian) p 344.

পঞ্জাবভ্রমণে গিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। ঘটনাটি অতি সামান্য— এত সামান্য যে উল্লেখযোগ্য নহে; কিন্তু ভারতের ও পূর্ব-এশিয়ার বিস্মৃত আধ্যাত্মিক যোগকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার দিকে জাপানের ইহাই প্রথম প্রয়াস।

ওকাকুরা জাপানের শিল্পাত্মার মধ্যে জাপানের সমগ্র সাধনাকে দেখিয়াছিলেন; তাঁহার বিশ্বাস ছিল ভারতের শিল্পচিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলে ভারতের সমগ্র অন্তরটি আপনা হইতে জাগ্রত হইবে। বাংলাদেশে আর্ট-আন্দোলনের সূত্রপাত তখন হইতেছে, অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় পদ্ধতিতে ছবি আঁকিতেছেন; কিন্তু ভারতের শিল্পাত্মার পরিপূর্ণ সন্ধান তখনো তিনি পান নাই। ওকাকুরা জাপানে ফিরিয়া গিয়া যেমন পাঠাইয়া দেন হোরি সানকে, তেমনি পাঠান দুইজন আর্টিস্টকে। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে সেই শিল্পীরা 'এ দেশ দেখবে, নিজেরা ছবি এঁকে যাবে', এ দেশের শিল্পীরা 'দেখতে পাবে তাদের কাজ— তাদেরও উপকার হবে'— ভারতীয় শিল্পীদেরও কাজে লাগবে।[১]

ওকাকুরা পাঠাইলেন টাইক্কান ও হিসিদাকে। টাইক্কানের বয়স তখন ৩৪ বৎসর (জন্ম ১৮৬৮), হিসিদার বয়স খুবই কম। এই আর্টিস্টদ্বয় থাকিতেন বালিগঞ্জে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে— ওকাকুরাও সেখানে থাকিতেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় নীরব আদর্শবাদীর জীবনকথা বাংলার বিচিত্র কাহিনীর মধ্যে আজ বিস্মৃত; কিন্তু তাঁহাকে স্মরণে না-রাখা নানা কারণে বাঙালির পক্ষে অকৃতজ্ঞতা হইবে। ওকাকুরার সংস্পর্শে আসিয়া দেশের যে নানা-কাজের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ লিপ্ত হন— আর্ট তাহার অন্যতম। তিনি চিত্রশিল্পী ছিলেন না, তিনি ছিলেন সমঝদার জীবনরসিক— বিরাট এশিয়ার পটভূমিতে শিল্প অর্থনীতি ও রাজনীতিকে দেখিতেন। তাইকান ও হিসিদা সুরেন্দ্র-নাথের বাড়িতে থাকেন— আপন মনে ছবি আঁকেন— মাস ছয়েক তাঁহারা ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "টাইকান আমায় লাইন ড্রইং শেখাত, কি করে তুলি টানতে হয়।...তার কাছেই শিখলুম একটি লাইন কত ধীরে ধীরে টানে তারা। আমার কাছেও শিখত মোগল ছবির নানান টেকনিক।"[২]

ওকাকুরা শিল্পশাস্ত্রী ছিলেন— শিল্পী নহেন; এই নূতন আন্দোলনের প্রধান আচার্য ছিলেন হাসিমতো গোহো— টাইকান, হিসিদা প্রভৃতি তরুণ শিল্পীরা সকলেই হাসিমতোর শিষ্য। কয়েকবৎসর পর কাটসুটা যখন ফিরিয়া যান, তখন হাসিমতোর জন্য অবনীন্দ্রনাথ 'বুদ্ধের নির্বাণ' ছবিখানি উপঢৌকন পাঠান।[৩]

অবনীন্দ্রনাথের তখন চিত্রকলার নানারূপ পরীক্ষা চলিতেছে। হ্যাভেল গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হইয়া আসিয়াছেন— মধ্যযুগীয় চিত্রকলা ও স্থাপত্যভাস্কর্যের সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ: অবনীন্দ্রনাথকে সেই রহস্যলোকে লইয়া যাইতেছেন। হ্যাভেলের সমস্ত মনীষা ভারতের প্রাচীন শিল্পকলার পুনরভ্যুত্থানের জন্য নিয়োজিত; অবনীন্দ্র-নাথও রাজপুত মোগল-কাংড়া চিত্রণরীতি অনুসরণে ব্যস্ত। জাপানী চিত্রকরদের সহায়তায় তাঁহার রীতির বেশ পরিবর্তন হইল। "The Japanese influence changed Abanindranath's technical process altogether."।

আমরা পূর্বে একস্থানে বলিয়াছি যে বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনকে কেবলমাত্র Political agitation রূপে দেখিলে বিষয়টিকে অত্যন্ত লঘু করিয়া দেখা হইবে। জাতির অন্তরে বিপ্লবের যে সাড়া পড়িয়াছিল তাহাই ধর্মে সাহিত্যে শিল্পে আর্টে যুগপৎ প্রকাশ পাইতেছিল। এই সময়েই হ্যাভেল, নিবেদিতা, উড্রফ, অবনীন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পশাস্ত্রী ও শিল্পীদের উদ্যোগে কলিকাতার Indian Art Society স্থাপিত হইল (১৯০৫)। কলিকাতার গবর্নমেণ্ট আর্ট স্কুল তো বহুকালের প্রতিষ্ঠান; সেখানে বিলাতী রীতিতেই শিক্ষাদীক্ষা হইত— দেশীয়

১ জোড়াসাঁকোর ধারে, চৈত্র ১৩৬২, পৃ ১০৬।

২ জোড়াসাঁকোর ধারে, চৈত্র ১৩৬২, পৃ ১০৮।

৩ **Visva-Bharati Quarterly, Abanindranath Number 1942 May, p 125.** হিসিদা ১৯১১ সালে জাপানে মারা যান।

চিত্রবিদ্যার স্থান সেখানে তখনো হয় নাই; এই নব আর্ট-আন্দোলনের পূর্বে ভারতে কারুশিল্পকে কুটিরের মধ্যে সঞ্জীবিত করিবার যে চেষ্টা হইয়াছিল— সে ক্ষেত্রে হ্যাভেলই ছিলেন অগ্রণী।

স্বদেশী আন্দোলনের সমকালীন এই নূতন আর্ট আন্দোলনের সময়েই জোড়াসাঁকোয় আসিলেন জাপানী চিত্রশিল্পী কাটসুটা ও শান্তিনিকেতনে আসিলেন জুজুৎসু বীর ও বর্ধকী সানো সান। অর্থাৎ জাপানের পাঁচ আঙুলের খেলায় যেখানে অশেষ সৌন্দর্য মথিত হইতেছে— আর তাহার সর্বাবয়বের লীলাকৌশলে যেখানে অসীম শক্তি সৃজিত হইতেছে— এই দুই বিদ্যাকে বাংলাদেশ আহ্বান করিয়া আনিলেন। এই দুই বিদ্যাই বিনা ভাষায় শিখানো যায়— সুতরাং জুজুৎসুকে আমরা আর্ট রূপেই দেখিব।[১]

কাটসুটা জোড়াসাঁকোয় প্রায় তিন বৎসর ছিলেন। সানো শান্তিনিকেতনে অত দিন থাকেন নাই। এইসব ঘটনাকে দেশের পটভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে তাহারা অত্যন্ত তুচ্ছ— কিন্তু আমরা ভারত ও জাপানে তথা পূর্ব-এশিয়ার সহিত যোগসূত্রে এগুলিকে দেখিতেছি। কাটসুটা অসংখ্য ছবি আঁকেন— সে-সবের নমুনা এ দেশে প্রায় নাই কারণ পরযুগে জাপান গভর্নমেন্ট মহার্ঘ্য মূল্যে সেসব কিনিয়া নিজ দেশে হইয়া যায়; তাহাদের আর্টিস্টের হস্তে অঙ্কিত ছবি বিদেশে থাকিবে— ইহা তাহারা জাতির অগৌরব মনে করিত।

কাটসুটা ফিরিয়া যান ১৯০৮ সালে। এই সময়ে আসেন পরিব্রাজক কাওয়াগুচি। ইহারও সহিত অবনীন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা হয়। ১৯১১ সালে আসিলেন ওকাকুরা— ইহাই তাঁহার শেষ আসা— তখন তাঁহার শরীর জীর্ণ। প্রায়ই তিনি জোড়াসাঁকোর চিত্রশালায় যান— তখন অবনীন্দ্রনাথকে ঘিরিয়া চিত্রশিল্পীর দল গড়িয়া উঠিয়াছে। এইবার আসিয়া ওকাকুরা দেখিলেন ভারতীয় চিত্রকরেরা ভারতের শিল্পাত্মাকে যেন পাইতেছে, শুধু তাহার দেহকে নহে; অর্থাৎ মধ্যযুগীয় চিত্রের অনুকরণ ও প্রাচীনের পথ অনুসরণ করিয়া তাহারা আর তৃপ্ত নহে— তাহারা ভারতের নব আর্ট-আন্দোলনের সূচনা করিতেছে, নূতন শিল্পসৃষ্টিতে তাহারা তদ্‌গত। ওকাকুরা দেশে ফিরিবার সময় বলিয়াছিলেন, "দশ বছর আগে [১৯০১] যখন আমি এসেছিলাম তখন তোমাদের আজকালকার আর্ট বলে কিছুই দেখি নি। এবারে দেখছি তোমাদের আর্ট হবার দিকে যাচ্ছে।"[২] ইণ্ডিয়ান আর্ট সোসাইটি স্থাপিত হইবার পর অবনীন্দ্রনাথকে ঘিরিয়া যে শিল্পীচক্র গড়িয়া উঠে তাহার মধ্যে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের অনেকেই নামজাদা শিল্পী— নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি, সামি উজমান, ক্ষিতীন্দ্র মজুমদার, হাকিম খাঁ, শৈলেন্দ্র দে, দুর্গেশ সিংহ, বেংকটাপ্পা, সুরেন্দ্রনাথ কর প্রভৃতি। মুকুল দে অবনীন্দ্রনাথের কাছে আসেন ১৯১২ সালে— ওকাকুরা ফিরিয়া যাইবার পরের বৎসর।

ওকাকুরা এই শিল্পীচক্র দেখিয়া আনন্দিত হইয়া পূর্বোক্ত মন্তব্য করিয়াছিলেন। তাহারা যে বৃটিশ গভর্নমেন্টের ফরমাইশি পাশ্চাত্য শিল্পকলার অনুকরণ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া ভারতীয় চিত্রকলার দিকে দৃষ্টি দিয়াছে— আসবাবাদির আবর্জনা বিসর্জন দিয়া অত্যন্ত সরলভাবে শিল্পসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে— ইহাই ওকাকুরার বিশেষ করিয়া ভালো লাগিয়াছে। ইতিমধ্যে অবনীন্দ্রনাথ গৃহাভ্যন্তরে সজ্জারও যুগান্তর আনিয়াছেন। উনবিংশ শতকের ইংরেজি আসবাবদ্বারা ঘরগুলিকে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত করিয়া তোলাই ছিল ধনীদের শৌখীনতা ও আভিজাত্যের পরিচায়ক— সুরুচি ও সৌন্দর্যের চর্চা কমই চোখে পড়িত।

ওকাকুরার পূর্বোক্ত মন্তব্যের গভীরতর কারণ ছিল; জাপানে তাঁহাকেও বহু বৎসর ধরিয়া পাশ্চাত্যের স্রোত

১ রবীন্দ্রনাথ বোলপুর হইতে লিখিতেছেন—"এখানে জাপান হইতে জুজুৎসু শিক্ষক আসিয়াছেন, তাঁহার কাণ্ডকারখানা দেখিবার যোগ্য।" (১৯০৫) স্মৃতি পৃ ৩৩।

২ জোড়াসাঁকোর ধারে, ১৩৬২, পৃ ১১১।

ও প্রাচীনের বদ্ধতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল— তিনি জানিতেন, শিল্পের মধ্যে আপনাকে পাওয়া ও প্রকাশ করা খুবই কঠিন অথচ সেইটিই হইতেছে শিল্পীর স্বধর্ম। জাপানের শিল্পকলা একদিন পশ্চিমের মোহে আপনাকে বিসর্জন দিতে বসিয়াছিল; য়ুরোপীয় চিত্রীদের অনুকরণে জাপানী চিত্রকররা নিজদেশেই যশস্বী হইলেন— যাহারা প্রাচীন পন্থা ছাড়িল না তাহারা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা হইতে বঞ্চিত হইয়া মরিতে বসিল। জাপানের এই য়ুরোপীয়তার বিরুদ্ধে বিদেশী অধ্যাপক ফেনোলোসা কিভাবে সর্বপ্রথম জাপানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন সে কথা ইতিহাস-বেত্তাদের নিকট সুপরিচিত। গভর্নমেণ্ট এতকাল পাশ্চাত্য চিত্রকলার অন্ধ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন— এখন হইতে হইলেন প্রাচীন খাস জাপানী চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক। আর্ট পাশ্চাত্যের অনুকরণ হইতে প্রাচীনের অনুবর্তনের ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইল। ওকাকুরা জাপানের আর্টকে এই উভয় প্রভাব হইতে মুক্তি দিবার জন্য যে আন্দোলন করেন— তাহা বাংলাদেশের নূতন শিল্প-আন্দোলনের অনুরূপ। ওকাকুরা জাপানী আর্টিস্টকে নূতন সৃষ্টি রচিবার জন্য আহ্বান করিলেন— পশ্চিমের অনুকরণের পথে নহে, প্রাচীনের অনুবর্তনের পথেও নহে। ইহাতে জাপানী আর্টের মুক্তি হইল। কিন্তু শিন্টো-ধর্মী জাপান, পাশ্চাত্য মোহ-আবিষ্ট জাপান, এই নূতন আর্ট-আন্দোলনকে স্বীকার করে নাই। তাহারা এ দিকে থাকিতে চায় অতীতের মূঢ়তার মধ্যে, আর অপর দিকে বড় হইতে চাহে অনুকরণ করিয়া।

১৯১১ সালে ওকাকুরা যখন বাংলাদেশে আসিলেন— তখন দেখেন বাংলার তরুণ শিল্পীদের মধ্যে মুক্তির হাওয়া বহিতেছে— রাজপুত বাংলা মুগল পারসিক চিত্রের মোহ-জাল সম্পূর্ণ ছিন্ন না হইলেও তাহার সম্ভাবনা তিনি অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বুঝিলেন, শিল্পের মুক্তিতেই চিত্তের মুক্তি আনিবে— কারণ এই ভাষাহীন শব্দহীন নীরব সৃষ্টির বাঁশি সর্বমানবের অন্তরে প্রবেশ করিবে— এই আর্টের ক্ষেত্রেই নিখিলের মিলন সার্থক হইবে।

ওকাকুরা ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকায় যান— সেখানে কবির সঙ্গে তাঁহার শেষ সাক্ষাৎ হয় ১৯১২ সালে— পর বৎসর তাঁহার মৃত্যু হয় জাপানে। কবি এইবার (১৯১৬) জাপানে বাসকালে ওকাকুরার বাড়িতে গিয়াছিলেন, সে জায়গাটা তাঁহার খুব ভালো লাগে। কিন্তু কবি জাপানে গিয়া এইটি বুঝিলেন যে, জাপানীরা ওকাকুরাকে চিনিতে পারে নাই। তিনি সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিতেছেন, "অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে দেখলুম— ওকাকুরার মত কারো প্রতিভা দেখিতে পাই না। বুদ্ধির দিকে এরা খুবই কাঁচা, এদের হাতের মধ্যেই সমস্ত মগজ।"[১]

ব্যক্তিগত পত্রে ১৯১৬ সালে কবি জাপানীদের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা সত্য কিনা— কাল তাহা প্রমাণ করিয়াছে। ওকাকুরা চীনের সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করিতেন— চীনের প্রতি জাপানের অবজ্ঞা ও অত্যাচার তিনি কোনো দিন সমর্থন করিতে পারেন নাই; জাপানের পাশ্চাত্য অনুকরণপ্রিয়তা ও বহির্মুখীনতাও তাঁহার অনুমোদন পায় নাই। এইসব কারণে জাপানের ভাগ্যনিয়ন্তারা এই আদর্শবাদী পুরুষটির প্রতি কখনো শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নাই। যাহাই হউক, জাপান-বাসকালে জাপানী আর্টের অসংখ্য নিদর্শন দেখিবার সুযোগ কবি লাভ করেন; ওকাকুরা যে আর্ট সমিতি স্থাপন করেন (১৮৯৬) তাহার ছাত্রবা এ সময়ে জাপানের সেরা শিল্পীরূপে খ্যাত। কবি জাপানের অন্যতম ধনী হারা সানের পল্লী-আবাসে যখন বাস করিতেছেন, তখন হারার নিকট শুনিতে পান যে, টাইক্কান ও খানজান শিমোমুরা আধুনিক জাপানের দুই সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী। টাইক্কানকে কবি কলিকাতায় দেখিয়াছিলেন তেরো বৎসর পূর্বে। তিনি যে আজ এত বড় শিল্পী হইয়াছেন তাহা কবি জানিতেন না। তিনি লিখিতেছেন, "ছেলে-মানুষের মত তাঁর (তাইক্কানের) সরলতা; তাঁর হাসি, তাঁর চারি দিককে হাসিয়ে রেখে দিয়েছে।...যতদিন (টোকিওতে) তাঁর বাড়িতে ছিলুম, আমি জানতেই পারি নি তিনি কত বড়ো শিল্পী।"[২]

১ জাপানযাত্রী, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ ৩৫০-৫১।

২ টাইকান (মৃত্যু ১৯৫৮) নব্বই বৎসর বয়সে মারা যান। (পত্র, পাণ্ডুলিপি ১১ ভাদ্র ১৩২৩)।

নূতন আর্ট আন্দোলনের এই দুই সেরা শিল্পী আধুনিক য়ুরোপের নকল করেন না, প্রাচীন জাপানেরও না। তাঁহারা প্রথার বন্ধন হইতে জাপানের শিল্পকে মুক্তি দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে ইঁহাদের সম্বন্ধে লিখিতেছেন (৬ ভাদ্র ১৩১২), ইহাদের "ছবি একদিকে খুব বড় আয়তনের, আর একদিকে খুব সুস্পষ্ট। কিছুমাত্র আশেপাশের বাজে জিনিস নেই। চিত্রকরের মাথায় যে আইডিয়াটা সকলের চেয়ে পরিস্ফুট কেবলমাত্র সেইটেকেই খুব জোরের সঙ্গে পটের উপর ফলিয়ে তোলা। সমস্ত মন দিয়ে এ ছবি না দেখে থাকবার জো নেই; কোথাও কিছুমাত্র লুকোচুরি কিম্বা পাঁচমিশেলি রংচং দেখা যায় না। ধবধবে প্রকাণ্ড সাদা পটের উপর অনেকখানি ফাঁকা, তার মধ্যে ছবিটি ভারি জোরের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকে।[১] "তাতে না আছে বাহুল্য, না আছে...শৌখিনতা, তাতে যেমন একটা জোর আছে তেমনি সংযম।"

জাপানের চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য দেখিয়া কবি মুগ্ধ। জাপানী জাতির স্বভাবসিদ্ধ সৌন্দর্যপ্রিয়তার সহিত তুলনায় নিজ দেশবাসীর দৈন্য স্বতঃই মনে উদিত হইতেছে। অবনীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন, "এরা সমস্ত জাত এই আর্টের কোলে মানুষ— এদের সমস্ত জীবনটা এই আর্টের মধ্য দিয়ে কথা কচ্ছে।" (৮ ভাদ্র ১৩২৩)।

ভারতীয় আর্টের সঙ্গে জাপানের আর্টের তুলনা করিয়া তিনি বড় শক্ত কথা অবনীন্দ্রনাথকে লিখিলেন, "এখানে এসে আমি প্রথম বুঝতে পারলুম যে, তোমাদের আর্ট ষোলো আনা সত্য হয় নি। আমাদের দেশের আর্টের পুনর্জীবন সঞ্চারের জন্য এখানকার সজীব আর্টের সংস্রব যে দরকার সে তোমরা বুঝতে পারবে না। আমাদের দেশের আর্টের হাওয়া বয় না, সমাজের জীবনের সঙ্গে আর্টের কোনো নাড়ির যোগ নেই— ওটা একটা উপরি জিনিস, হলেও হয়, না হলেও হয়, সেইজন্যে ওখানকার মাটি থেকে কখনোই তোমরা পুরো খোরাক পেতে পারবে না।" (পত্র ৮ ভাদ্র)... "আর্টকে জাপানীরা জীবনে স্বীকার করিয়াছে; জীবনটা সকল রকমে এরা সুন্দর করে তুলেচে— নিতান্ত ছোটো-খাটো বিষয়েও এদের লেশমাত্র অনাদর নেই— আমাদের সঙ্গে এইখানেই এদের সবচেয়ে তফাত।"[২] কোন্ পথে বাংলার চিত্রকলা যাইবে তাহাও যেন তিনি দেখিতে পাইয়া ইঙ্গিত করিতেছেন। "আমাদের নববঙ্গের চিত্রকলায় আর-একটু জোর, সাহস এবং বৃহত্ত্ব দরকার আছে এই কথা বরাবর আমার মনে হয়েচে। আমরা অত্যন্ত বেশি ছোটখাটোর দিকে ঝোঁক দিয়েছি।[৩]

কবির ইচ্ছা ভারতীয় চিত্রশিল্পীরা জাপানে আসিয়া সেখানকার জীবন্ত আর্টকে দেখেন, নহিলে তাঁহার আশঙ্কা ভারতীয় আর্ট কুনো রকমের হইবে। তিনি জাপানযাত্রীর পত্র-প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "বাংলাদেশে আজ শিল্পকলার নূতন অভ্যুদয় হয়েছে, আমি সেই শিল্পীদের জাপানে আহ্বান করছি।" (পৃ ৩৫০)..."আমি যত দেখলুম জাপানের ছবি...আমার ততই দৃঢ় বিশ্বাস হয়েচে আমাদের বাংলা দেশে যে চিত্রকলার বিকাশ হচ্ছে তার একটা বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। এ যদি নিজের পথে পুরো উদ্যমে চল্‌তে পারে তাহলে পৃথিবীর মধ্যে আপনার একটা খুব বড় জায়গা পাবে। দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙালীর প্রতিভা যথেষ্ট আছে কিন্তু উদ্যম ও চরিত্রবল কিছুই নেই।...জাপানে আধুনিক শিল্পীদের জন্যে ওকাকুরা যে স্কুল করে গেছে তাতে কত কাজ চল্‌ছে তার ঠিক নেই।...কেবলমাত্র শৌখিন-ভাবে কুণোভাবে কাজ চল্‌চে না।... আশা করেছিলুম বিচিত্রা থেকে আমাদের দেশে চিত্রকলার একটা ধারা প্রবাহিত হয়ে সমস্ত দেশেয় চিত্তকে অভিষিক্ত করবে, কিন্তু এর জন্যে কেউ যে নিজেকে সত্যভাবে নিবেদন করতে পারলেনা। আমার যেটুকু সাধ্য ছিল আমি ত করতে প্রস্তুত হলুম কিন্তু কোথাও ত প্রাণ জাগল না। চিত্রবিদ্যা ত আমার

১ চিঠিপত্র ২, পত্র ১৭, পৃ ৪৭।

২ গগনেন্দ্রনাথকে লিখিত পত্র (৮ ভাদ্র ১৩২৩)।

৩ চিঠিপত্র ২, ৬ ভাদ্র ১৩২৩।

বিদ্যা নয়, যদি তা হত তাহলে একবার দেখাতুম আমি কি করতে পারতুম। যা হোক্, আর কোনো সময়ে আর কেউ উঠ্‌বে— এবং দেশের মধ্যে চিত্রকলার যে শক্তি বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েচে তাকে বিপুল বেগে চলবার জন্য পথ করে দেবে।"[১]

কিন্তু কবি ও আদর্শবাদী হইলেও রবীন্দ্রনাথ জানেন যে তাঁহার এই আহ্বানে সাড়া দিতে পারার মধ্যে শিল্পীদের কত বাধা। তাই শেষকালে অনেক ভেবেচিন্তে টাইক্কানের পরামর্শে আরাই নামক একটি আর্টিস্টকে কলিকাতায় বিচিত্রার স্কুলে পাঠানো স্থির করিলেন। গগনেন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন, "বাইরে থেকে একটা নূতন আঘাত পেলে আমাদের চেতনা বিশেষভাবে জেগে ওঠে। এই আর্টিস্টের সংসর্গে অন্তত তোমাদের সেই উপকার হবে।··· জাপানী তুলি টানার বিদ্যেয় তোমাদের ছেলেদের হাত পাকানো দরকার।" রথীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন, "নন্দলালরা যদি এঁর কাছ থেকে খুব বড় আয়তনের পটের উপর জাপানী তুলির কাজ শিখে নিতে পারে তাহলে আমাদের আর্ট অনেকখানি বেড়ে উঠবে···।"[২] নন্দলাল বসু তখন বিচিত্রার সহিত যুক্ত।

রবীন্দ্রনাথ আরাইকে বিচিত্রায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শিমোমুরা ও টাইকানের দুইখানি খুব প্রকাণ্ড ছবি কপি করাইয়া পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন; কপি করাইতে ১৫০০৲ ব্যয় হয়, তাহা কবি দেন। আরাই জোড়াসাঁকোয় তিন বৎসর ছিলেন, সুতরাং ভাবের আদানপ্রদান দীর্ঘকাল ধরিয়াই চলে এবং তাহার প্রভাবকে অস্বীকার করিতে পারা যাইবে না।

জাপানের আর্ট সম্বন্ধে কবি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি ঐ আর্টের অভাব কোন্‌খানে তাহাও বিশ্লেষণ করিতেছেন। তিনি সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এক পত্রে লিখিতেছেন, "জাপানটা ভালো করেই দেখেচি। তার কারণ এরা আমাকে এদের ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়েছে। হঠাৎ বাইরের লোকের এতটা সুবিধে ঘটে না। এদের অনেক ভাল জিনিস দেখেচি। সবচেয়ে এদের সত্য এবং দেশব্যাপী হচ্ছে এদের আর্ট। সে আর্ট একটা দিকে চূড়ান্ত সীমায় গেছে। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে, এদের আর্টের একটা অভাব আছে। এরা মানবহৃদয়ের গভীরতাকে স্পর্শ করে নি— এরা প্রকৃতিকে নিয়ে চূড়ান্ত করেছে। তোমাদের আর্টের ভিতর দিয়ে হৃদয়ের একটা আকৃতি প্রকাশ পায়, সেই জন্যে তাকে লাইনের স্পষ্টতার চেয়ে রঙের আভাসের দিকে বেশি ঝোঁক দিতে হয়েচে। আমি ভেবে দেখেচি এইটাই ভারতবর্ষের দিক। ভারতবর্ষ রঙের গমক ভালোবাসে— জাপানের আর্টে কালো-গোরার মিলনই প্রধান— এদের কাপড়-চোপড়েও তাই। ভারতবর্ষের আর্ট যদি পুরো জোরে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে এগোতে পারে তাহলে গভীরতার এবং ভাব-ব্যঞ্জনায় তার কাছে কেউ লাগবে না। কিন্তু দরকার হচ্ছে ওর মধ্যে জীবনের জোর পৌঁছানো— যাতে ও খুব ফলাও হয়ে উঠতে পারে। এখন যেন কেয়ারী-করা ছোট ছোট ফুল গাছের বাগানের মত ওর চেহারা— বনস্পতির অরণ্য চাই যেখানে ক্ষণে ক্ষণে ঝড়ের রুদ্র বীণা বাজে। আমার বোধ হয় আয়তন নিতান্ত ছোট করলে ভাবের পরিমাণও ছোট হয়ে আসে। যাই হোক, জাপানী আর্টের যতই বাহাদুরী থাক্ ওর পূর্ণতার সীমায় এসে ও পৌঁচেছে। কিন্তু আমাদের আর্টিস্টের তুলির সামনে অসীম ক্ষেত্র দেখতে পাচ্ছি। সরস্বতী চীন-জাপানের কাছে উদ্যানের দরজা খুলে দিয়েছেন, আমাদের কাছে তাঁর অন্তঃপুরের দরজা খুলবে— এখানে রসের ভোজ। কিন্তু আমাদের এই রংমহলের কারখানা জাপানীরা একেবারেই বুঝতেই পারে না— অথচ আমরা ওদের শিল্পকলার ভিতরকার মাহাত্ম্য বেশ বুঝতে পারি। এর থেকেই মনে হচ্ছে জাপানী

১ চিঠিপত্র ৪, পত্র ২৯, সানফ্রান্সিস্‌কো। ১৭ আশ্বিন ১৩২৩ [৩ অক্টোবর]। স্বাধীন ভারতে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার জন্য কলাকেন্দ্র বা আর্ট আকাদেমী স্থাপিত হইয়াছে।

২ চিঠিপত্র ২. পৃ ৪৮।

চিত্রকলার অতিপরিণতিই ওর পক্ষে বোঝা হয়ে উঠেছে— এখন ও আর চলবে না। পথের পাশে বসে পুনরাবৃত্তি করবে কিংবা বিলিতি ছবির নকল করতে লাগবে।"[১]

রবীন্দ্রনাথ ত্রিশ বৎসর পূর্বে বাংলা দেশের আর্ট সম্বন্ধে যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, বাঙালি শিল্পীরা সে বিপদকে পাশ কাটাইয়া আসিয়াছে; তাহারা পশ্চিমের অনুকরণ বা প্রাচীনের অনুবর্তন -পথ গ্রহণ করে নাই। রংমহলের কারখানায় তাহারাই বিপ্লব আনিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যস্রষ্টা হইলেও রূপদ্রষ্টা। তিনি জানিতেন আপনাকে যথার্থভাবে প্রকাশের মধ্যেই সাহিত্যিকের সাধনা ও সিদ্ধি। শিল্পের মধ্যেও সেই নীতি। শুধু পাঁচ আঙুলের কৌশলে শিল্প সৃষ্ট হয় না, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সর্বদ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ করিবার সহজ সাধনা মনের আয়ত্তাধীন হইলেই শিল্পসাধকের সিদ্ধি নিশ্চিত। রবীন্দ্রনাথ রূপসাধক, তিনি শিল্পের সাধনচক্র গড়িয়াছেন বারে বারে। কলিকাতার বিচিত্রায় শিল্পকলার স্থানকে তিনি তাই এত বড় করিয়া ধরিয়াছিলেন; পরে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হইলে কলাভবনে তিনি শিল্পসাধকদের সাধনপীঠ স্থাপন করেন। স্বাধীনতা হইল এই সাধনার মন্ত্র। সেই স্বাধীনতার মধ্যে শান্তিনিকেতনের কলাভবনের শিল্পীরা আপনাদের শিল্পাত্মাকে উপলব্ধি করিয়াছে। যে মুহূর্তে শিল্পীরা আপনাকে পায় সেই মুহূর্তে তাহারা নিখিলের সংস্কৃতির সহিত যুক্ত হয়— তাহার শিল্পমানসের মুক্তি হয়। শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা গুরুকে অনুসরণ বা অনুকরণ করে না, স্বাধীনভাবে পথ উন্মোচনের শিক্ষা পাইয়া সাহসভরে আগাইয়া তাহারা নব নব সৃষ্টি রচনা করে।

আমেরিকায় বক্তৃতা

জাপানে তিন মাস কাটাইয়া রবীন্দ্রনাথ আমেরিকাযাত্রা করিলেন। জাপানে থাকিবার সময় পল্ রিশার (Paul Richard) নামে এক ফরাসী ভাবুকের সহিত কবির পরিচয় হয় পিয়ার্সনের মধ্যস্থতায়। পিয়ার্সন্ ইঁহার প্রতি খুবই অনুরক্ত হইয়া পড়েন এবং গুরুর মতন ইঁহাকে হঠাৎ মানিতে শুরু করেন। পিয়ার্সন ছিলেন খুব ভাবপ্রবণ প্রকৃতির লোক; অতি সহজেই রিশারের আধ্যাত্মিক ভাবুকতায় মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। আসলে রিশারের সাধনা আদৌ গভীরে পৌঁছায় নাই, তাহা পরে প্রমাণিত হয়। পল রিশার ও তাঁহার পত্নী মীরা রিশার উভয়েই এক সময়ে অরবিন্দের সহিত পণ্ডিচেরিতে বাস করেন— এবং Arya পত্রিকা সম্পাদনে নিযুক্ত ছিলেন। পরে রিশার পণ্ডিচেরি ত্যাগ করেন ও তাঁহার পত্নী Mira Richard অরবিন্দের আশ্রমে থাকিয়া যান; তিনি এখন তথাকার Mother নামে পরিচিতা। কবি পল্ রিশারের এক গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দেন।

কবির আমেরিকায় যাওয়া যখন স্থির হইল, পিয়ার্সন প্রস্তাব করিলেন মুকুল জাপানে থাকিয়া আর্টচর্চা করিবে; কারণ টাইকান মুকুলের ছবি দেখিয়া খুব খুশি হইয়াছিলেন। তিনি কবিকে বলেন, "মুকুল যদি দু বছর জাপানে থাকে তাহলে ও খুব একজন বিখ্যাত আর্টিস্ট হয়ে উঠতে পারবে।"[২] কিন্তু কবি তাহাকে একাকী জাপানে রাখিয়া যাইতে রাজি হইলেন না। কবি প্রথমে ভাবিয়াছিলেন মুকুলকে এণ্ড্রুসের সঙ্গে দেশে ফেরত পাঠাইবেন; পরে ভাবিলেন— সে "পৃথিবীটা দেখে নিক্ তাহলে মানুষের মত হয়ে উঠবে··· আমার সঙ্গে থাকৃতে থাকৃতে ও তৈরি হয়ে উঠতে পারবে।" অবশেষে সকলে মিলিয়াই আমেরিকা যাত্রা করা স্থির হইল। এণ্ড্রুস দেশে ফিরিলেন।

রবীন্দ্রনাথ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যাইতেছেন এই সংবাদ পাইয়া কানাডা হইতে একটি প্রতিষ্ঠান তাঁহাকে

১ এই পত্রগুলি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এগুলি তথা হইতে আনিয়া দেন।

২ চিঠিপত্র ২, পত্র ১৭ [২২ অগস্ট ১৯১৬]।

ভাংকুভারে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ পাঠাইল। কবি নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, যতদিন তাঁহার স্বদেশবাসীকে কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া অপমান ও নির্যাতন করিবে ততদিন তিনি তাহাদের দেশের মাটি মাড়াইবেন না। কবির এই কথা লইয়া বৃটিশ ও আমেরিকার সংবাদপত্রে বেশ একটু বিদ্রূপ হইয়াছিল। কবি কী দুঃখে এই কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বুঝিবার শক্তি পর্যন্ত তাহাদের ছিল না।[১] আমাদের আলোচ্য পর্বে ভারতীয়দের কানাডা প্রবেশের বিস্তর বাধা ছিল; তৎসত্ত্বেও বহু সহস্র শিখ ও পাঞ্জাবী শ্রমিক প্রশান্ত-মহাসাগর-তীরস্থ শহরে শহরে ও বিশেষভাবে ভাংকুভারে গিয়া পয়সা রোজগার করিতেছিল। শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তাহারা যে অর্থ উপার্জন করিতেছে ইহা কর্তৃপক্ষের সহ্য হইল না: অথচ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অধিবাসীদিগকে হঠাৎ নিষেধাত্মক আইন করিয়া প্রবেশাধিকার বন্ধ করাও কঠিন। বিশেষত মহাযুদ্ধের সময় সকলেই বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য য়ুরোপে বা অন্যান্য স্থানে প্রাণপণ লড়িতেছে। কিছুকাল পূর্বে কানাডা গবর্নমেণ্ট নিয়ম করিয়াছিলেন যে, যদি কোনো জাহাজ কোনো বিদেশের বন্দর হইতে সোজাসুজি ভাংকুভারে পৌঁছায়, তবে সেই জাহাজে করিয়া শ্রমিকগণ কানাডায় আসিতে পারিবে, নতুবা নহে। কানাডায় যাইবার মধ্যে ছিল চীনা জাপানি ও ভারতীয় শ্রমিকের দল। রাজনৈতিক শর্তানুসারে প্রতি বৎসর কয়েক শত করিয়া জাপানি কানাডায় প্রবেশ করিতে পারিত; চীনাদিগকে ৫০-ডলার মাথাপিছু কর দিয়া ভাংকুভারে নামিতে হইত। তা ছাড়া চীন ও জাপান হইতে জাহাজ সোজাসুজি কানাডায় যাইত বলিয়া শ্রমিকদের যাওয়ার কোনো আইনসংগত বাধাও ছিল না। কেবল ভারতবর্ষের নিজস্ব জাহাজ না থাকায় কোনো জাহাজই ভারতের বন্দর হইতে সোজাসুজি কানাডায় পৌঁছাইত না: ভারতবাসীকে হংকঙে নামিয়া পুনরায় জাহাজে চড়িয়া যাইতে হইত। সুতরাং স্পষ্টত নিষেধ না করিলেও কার্যত তাহা নিষেধেরই সমতুল্য ছিল। কানাডাবাসীদের এই ভণ্ডামি পরখ করার জন্য ও সুবিধা হইলে কানাডায় গিয়া বাস করিবার সুযোগ লইবার জন্য ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে 'কোমোগাটা মারু' নামে একখানি জাপানী জাহাজ ভাড়া (charter) করিয়া পঞ্জাবীদের দল গুরুদিৎ সিংহের নেতৃত্বে কানাডা রওনা হয়। এইবার কানাডা সরকারের মুখোশ খসিয়া গেল। ভারতীয়দিগকে জাহাজ হইতে নামিতে দেওয়া হইল না এবং একপ্রকার জোর করিয়া তাহাদিগকে দেশে ফিরিতে বাধ্য করা হইল। কোমোগাটা মারু কলিকাতার বজবজ ঘাটে পৌঁছিলে (১৯১৪ সেপ্টেম্বর) শিখদের প্রতি ভারতীয় ইংরেজ সরকার যে অত্যাচার করেন, তাহার বর্ণনা আমাদের আলোচনা-বহির্ভূত বিষয়। রবীন্দ্রনাথ এইসব ঘটনা ভালো করিয়া জানিতেন, তাই তাঁহার পক্ষে আজ সেই কানাডায় বরেণ্য অতিথি রূপে যাওয়া অসম্ভব।

১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বরের (৭ই) গোড়াতে রবীন্দ্রনাথ পিয়ার্সন ও মুকুলকে লইয়া জাপানি 'কানাডা মারু' জাহাজে প্রশান্ত-মহাসাগর পাড়ি দিলেন; এই মহাসাগরের সহিত কবির এই প্রথম পরিচয়; আমেরিকায় জাহাজ পৌঁছিতে প্রায় দশ দিন লাগে। জাহাজ সিআটলে পৌঁছিলে (১৮ই) দেখা গেল, মিঃ পন্ড কবিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বন্দরে উপস্থিত। সিআটল প্রশান্ত-মহাসাগর-তীরের ওয়াশিংটন স্টেটের বৃহত্তম নগরী।

মিঃ পন্ড রবীন্দ্রনাথকে আমেরিকায় বক্তৃতার জন্য আহ্বান করেন; এইখানে মিঃ পন্ডের কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। আমেরিকায় লোকে বক্তৃতা শুনিবার জন্য পয়সা দেয় এবং সেইসব বক্তৃতা ব্যবস্থা করিবার জন্যও প্রতিষ্ঠান আছে। মিঃ পন্ড সেইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের (Pond Lyceum) মালিক। রবীন্দ্রনাথের সহিত চুক্তি হয় যে তিনি সেপ্টেম্বর মাস হইতে এপ্রিল (১৯১৭) পর্যন্ত আমেরিকার নানা শহরে বক্তৃতা করিবেন এবং তজ্জন্য তিনি পারিশ্রমিক পাইবেন। মিঃ পন্ডের পিতা জেমস্ বার্টন পন্ড (১৮৩৮-১৯০৩) ১৮৭৯ সালে নিউইয়র্কে 'আমেরিকান লেকচার বুরো' নামে আপিস খোলেন এবং তাঁহার তত্ত্বাবধানে স্ট্যানলি, এমার্সন, ম্যাথু আর্নলড, মার্ক টোয়েন,

১ Toronto Daily Star-এ V. Jameson লিখিত সংবাদ হইতে। দ্র প্রবাসী ১৩২৩ অগ্রহায়ণ, পৃ ১২০।

কোনান্ ডয়েল প্রভৃতি অনেকে বক্তৃতা করেন। অতঃপর তাঁহার পুত্র এই কার্য চালাইতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত চুক্তি হয় যে প্রত্যেক বক্তৃতার জন্য ৫০০ ডলার (প্রায় দেড় হাজার টাকা) করিয়া তিনি পাইবেন। ৪০টি বক্তৃতা দিবার কথা হয়।

কবি যখন আমেরিকায় পৌঁছিলেন, তখনো আমেরিকানরা য়ুরোপের যুদ্ধে যোগদান করে নাই, এমন-কি যোগদান যে করিবে তাহারও কোনো প্রত্যক্ষ আয়োজনের আভাস পাওয়া যায় নাই। প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন (প্রে. ১৯১৩) বহুকাল যুদ্ধকে ঠেকাইয়া রাখেন। জার্মেনির সহিত মার্কিনীদের যুদ্ধ ঘোষণা হয় ১৯১৭ সালের ৬ই এপ্রিল, কবির দেশে ফিরিবার কয়েক দিন পরে; তবে উক্ত দেশে থাকিতেই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এই বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন জাতি নির্লিপ্ত রহিবে না।[১]

প্রশান্ত-মহাসাগর-তীরস্থ ওয়াশিংটন স্টেটের বৃহত্তম নগর সিয়াটলে পৌঁছিয়া কবি নিউ ওয়াশিংটন হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পন্ডকে বলিলেন, "তুমি আমার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করো, তুমি যত বক্তৃতার ব্যবস্থা করিবে, আমি দিব। আমার নিজের কোনো প্ল্যান নাই; যতই বক্তৃতা হইবে ততই আমার বিদ্যালয়ের জন্য টাকা হইবে।"[২]

সিয়াটলে পৌঁছিবার পরদিন (১৯ সেপ্টেম্বর) কবির প্রথম সম্বর্ধনা হইল সান্সেট ক্লাবের মহিলা মজলিসে। কবি তাহাদিগকে বলেন যে, তিনি আমেরিকার দ্বারে আসিয়া নারীদের নিকট হইতে প্রথম শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য পাইলেন; ভারতবর্ষে নারীরাই অতিথির সমাদর করেন— পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব দূর করিবার এই অতিথি-সৎকারই হইতেছে পথ।

পন্ড লিসিয়ামের চুক্তি ও ব্যবস্থানুযায়ী প্রথম বক্তৃতা হইল (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৬) এই সানসেট ক্লাবের হলে। বক্তৃতা শুনিবার চাহিদা এত অধিক হয় যে সমস্ত টিকিট বিক্রয় হইয়া যায় এবং কবিকে একই দিনে দুইবার বক্তৃতা পাঠ করিতে হয়। বক্তৃতার বিষয় ছিল The Cult of Nationalism।

বক্তৃতার পরদিন সমসাময়িক বিখ্যাত সাংবাদিক ইউজেন ব্যাংকস্ সিআটল পোস্ট ইনটেলিজেন্স (Post Intelligence) দৈনিকে লিখিলেন, "Those who dwell in the belief that the Hindu thinker is a suppressed soul who is content to voice the misty dreams, will be well disillusioned if they hear this vigorous logician, seer, prophet. He strikes hard and strikes home in attacking the crass civilization of a goodly position of the earth today. But he is not a pessimist. His vision is of the moral man, not the intellectual giant, and what he sees of the man, he sees of the nations. The crust of materialism must finally be crushed by its own weight and the great-souled man— the great-souled nation— come forth to live in sanity and beauty."

রবীন্দ্রনাথ ন্যাশনালিজমের বিরুদ্ধে বক্তৃতাগুলি কেন লেখেন— তাহার কারণ ছিল। ভারতবর্ষ হইতে যখন তিনি জাপানের পথে আমেরিকা যাত্রা করেন, তখন জাহাজে বসিয়া যে প্রবন্ধগুলি লেখেন সেগুলি এখন *Personality*র অন্তর্গত। কিন্তু জাপানে তিন মাস বাস করিয়া তথাকার উদগ্র ন্যাশনালিজমের যে কদাকার রূপটি

১ অনেকের ধারণা ছিল যে আমেরিকান জাহাজ লুসিটেনিয়া টর্পেডো করার পর আমেরিকা জারমেনির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। লুসিটেনিয়া নিমজ্জিত হয় ১৯১৫ সালে ৭ই মে (১৩২২ বৈশাখ ২৪)। এই ঘটনার দুই বৎসর পর ১৯১৭ সালের ৬ই মে (২৪ বৈশাখ ১৩২৪) যুদ্ধ ঘোষণা হয়।

২ Los Angeles Times, 18 September 1916.

দেখিলেন তাহারই অভিঘাতে *Nationalism* গ্রন্থের ভাষণগুলি লিখিত হয়— The Cult of Nationalism তাহার অন্যতম। জাপানে থাকিতে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি এণ্ড্রুস সাহেবকে পড়িয়া শুনাইলে তিনি কবিকে বলেন, 'তুমি nation ও stateএ গোল করিতেছ'। রবীন্দ্রনাথ দৃঢ়তার সহিত বলেন তিনি ভুল করেন নাই— তিনি ন্যাশনালিজমকে আক্রমণ করিয়াছেন এবং ভালো করিয়া জানিয়াই করিয়াছেন। য়ুরোপে তখন প্রলয়ংকর যুদ্ধ চলিতেছে— নেশনে নেশনে আত্মঘাতী মরণযজ্ঞ। য়ুরোপের যুদ্ধবিরোধী মনীষীরা রণোন্মত্ত গবর্নমেন্টের ভ্রূকুটি-কটাক্ষে নীরব— কেহ বা নির্বাসিত, কেহ বা কারাগারে নিক্ষিপ্ত। রবীন্দ্রনাথ সেদিন আমেরিকায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন, 'ন্যাশনালিজম্ অপদেবতা, ইহার সমক্ষে নরবলি দিয়ো না'। এত বড়ো কথা বলিবার সাহস সেদিন কাহারও ছিল না। রবীন্দ্রনাথ স্থির করিয়াছিলেন জাপানে ও আমেরিকায় বক্তৃতা শেষ করিয়া মহাযুদ্ধের অবস্থা যদি চলাফেরার পক্ষে অনুকূল হয়— তবে ইংলণ্ডে গিয়া তাঁহার বক্তৃতাগুলি পড়িবেন।[১] কিন্তু সে সুযোগ হইল না। কবির ন্যাশনালিজম্-বিরোধী বক্তৃতাগুলি লইয়া জাপানে আমেরিকায় ও য়ুরোপে যেরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছিল, বোধ হয় তাঁহার আর-কোনো গ্রন্থ সম্বন্ধে তাহা হয় নাই। 'ন্যাশনালিজম্' গ্রন্থ ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয়, ফরাসীদেশে ইহার অনুবাদ হয় অনেক পরে। শোনা যায়, যুদ্ধের মধ্যে ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে টাইপকরা কপি সৈনিকদের মধ্যে চালাচালি হইত। Max Plowman নামে একজন তেজস্বী ইংরেজ যুবক ১৯১৪ সালে যুদ্ধে যোগদান করেন, কিন্তু ১৯১৭ সালে 'ন্যাশনালিজম্' পাঠ করিয়া তাঁহার জীবনের আমূল পরিবর্তন হয়। তিনি যুদ্ধ করিবেন না স্থির করায় সমরবিভাগীয় শাস্তি তাঁহাকে ভোগ করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা পাঠ করিয়া তাঁহার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন, "What to do when the personal application of such words came home to me, I did not know, but what not to do was plain as a pikestaff, and in the moment of that recognition I had ceased from organised war for ever".[২]

ড্রামা লীগে বক্তৃতা হইল; কবি লিখিতেছেন "আমার agent (Pond)-তুই পুরুষে এই কাজে নিযুক্ত— সে বলে, এত লোককে দিয়ে তারা বক্তৃতা করিয়েছে কিন্তু কখনো এমন লোকের ভিড় ওরা দেখে নি। জায়গার অভাবে লোক ফিরে ফিরে যাচ্ছে। আমার বোধ হচ্ছে ঠিক সময়েই বিধাতা আমাকে এখানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। বিশেষত ছাত্রদের মধ্যে আমার আইডিয়া গভীর ভাবে কাজ করবে বলে বোধ হচ্ছে। তাদের উৎসাহ দেখলে আমার আনন্দ হয়।"[৩]

ওয়াশিংটন স্টেটের দক্ষিণে অরিগন স্টেট পোর্টল্যাণ্ড সেখানকার বৃহত্তম নগরী; ২৬এ কবি পোর্টল্যাণ্ডে পৌঁছান। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব মনোরম; কাসকেড পর্বতের মধ্যে প্রাচীন অরণ্য ও বিশেষভাবে 'ওয়াশিংটন পার্ক' ভ্রমণকারীদের উপযুক্ত স্থান। পোর্টল্যাণ্ডের বিশিষ্ট লোকেরা রবীন্দ্রনাথকে বক্তৃতার পরদিন তাহাদের স্টেটের সৌন্দর্য দেখাইয়া আনেন। পার্কে Sacajawea নামে বিরাট লালমানুষের মূর্তি এবং তার পাশে 'শ্বেতমানুষে'র আগমনের যে প্রস্তরমূর্তি খোদিত আছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ভালো লাগিল। এইখানে প্রেসের জনৈক রিপোর্টার তাঁহাকে আমেরিকা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। আমেরিকায় যে-লোক এক সপ্তাহ মাত্র আসিয়াছেন তাঁহার কাছ হইতে তাহারা মত চায়! রবীন্দ্রনাথ মত দেন নাই, তবে বলেন, "আমি যতটুকু দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে মনে হয় তোমরা সর্বদাই পরীক্ষায় ব্যস্ত এবং আশা করিতেছ কলীয়তার দ্বারা সত্যের পথ আবিষ্কার করিবে। কোনো কোনো জিনিস

১ চিঠিপত্র ২, পত্র ২০।

২ The Aryan Path, 1931 April, p. 248.

৩ চিঠিপত্র ২, পত্র ১৯, ১১ অক্টোবর ১৯১৬।

কলের দ্বারা ভালো তৈয়ারি হয়, কিন্তু যখন জীবনের সম্মুখীন হওয়া যায় তখন কলের কোনো স্থান দেখা যায় না। দিন আসিবে যখন আমেরিকানরা মানবের চরম আদর্শের জন্য তৃষিত হইবে।" (Portland Telegram, 26 Sep. 1916)।

এখান হইতে কবির আমেরিকার সফর যথার্থভাবে শুরু হইল— ট্রেন হইতে হোটেলে, হোটেল হইতে বক্তৃতামঞ্চে এবং পুনরায় ট্রেনে ইহারই পুনরাবৃত্তি হইয়া চলিল। পরবর্তী গম্যস্থল সানফ্রানসিসকো কালিফোর্নিয়া স্টেটের প্রধান শহর ও প্রশান্ত-মহাসাগরের প্রধানতম বন্দর; এখানে শ্বেতাঙ্গ ব্যতীত জাপানী চীনা ও বহুসহস্র পঞ্জাবী শ্রমিক ও ছাত্র বাস করে। সেখানে বক্তৃতার পূর্বে তিনি একজন দর্শনপ্রার্থীকে বলেন, "Here in the United States you have a great material empire but my idea of a nation is that it should have ideals beyond material ends. You have a worship of organization. Capital organizes, labour organizes, religion organizes— all of your institutions organize. It all makes for endless strife. If there would be more of the fundamental idea of brotherhood and less of organization, I think occidental civilization would be immeasurably the gainer."।

সাধারণ আমেরিকানরা ভারতীয়ের নিকট হইতে এরূপ কথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত নয়, তাই একখানি কাগজ ঠাট্টার সুরে বলিলেন, দেখা যাক্ কবি-দার্শনিক চীন ও ভারতের দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও কিভাবে তাঁহার মতকে ব্যাখ্যা করেন।[১] মোট কথা তাঁহার বিরোধিতা তাঁহার বক্তৃতাদানের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হইয়াছিল।

সানফ্রানসিসকোয় কলোনিয়েল বলরুমে বক্তৃতা হইল; রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার মধ্যে বৃটিশ শাসনের সমালোচনা হইয়াছিল বলিয়া অনেক আমেরিকান পত্রিকাব্যবসায়ী বিরক্ত হইয়াছিল। সাধারণ লোকেরও সকল কথা ভালো লাগে নাই— কিন্তু বক্তৃতার পর সভায় বহুক্ষণ শ্রোতারা নীরবে বসিয়াছিলেন, যেন তখনো সম্মোহন কাটে নাই। একজন সমালোচক লিখিয়াছিলেন, শ্রোতারা যাহাই চিন্তা করুন-না কেন সকলেই বিশেষ মনোযোগের সহিত সব শুনিয়াছিলেন— Their criticism was never the criticism of indifference.।

একদিন (৩ অক্টোবর) আমেরিকাপ্রবাসী জাপানীদের একটি বিশেষ সভা হইতে কবির আমন্ত্রণ আসিল, আরেক-দিন তাঁহার সম্বর্ধনা হইল বিখ্যাত বোহিমিয়ান ক্লাবে। সেখানে নগরীর বিখ্যাত আর্টিস্টরা সমস্ত ঘরটিকে অপরূপ সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়াছিলেন। শেষ দিনে তিনি কলম্বিয়া থিয়েটারে তাঁহার একটি গল্প (Vision) ও 'রাজা'র অনুবাদ পাঠ করিয়া শোনান। এই সময়ে সেখানে বিখ্যাত বেহালাবাদক Paderewski-র কনসার্ট চলিতেছিল। রবীন্দ্রনাথ উহা শুনিতে যান ও কনসার্টের পর দুইজনে বসিয়া বহুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করেন। এই সংগীতস্রষ্টার কথা বহুকাল পরেও রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনিয়াছি— সেই আর্টিস্টের শক্তির কথা বলিতে তিনি বেশ উৎসাহ বোধ করিতেন। পাদেরিয়স্কি (জন্ম ১৮৬০) পোলিশ পিয়ানিস্ট ও সরকারি কর্মচারী। ১৮৯১এ সর্বপ্রথম আমেরিকায় আসেন; ১৯০২ সালে আসেন দ্বিতীয় বার। আমেরিকার পাবলিক তাঁহাকে জানিত, তাই মহাযুদ্ধের সময় দুর্গত পোলদের কথা আমেরিকাকে শুনাইবার জন্য ইনি প্রেরিত হন। এই উপলক্ষে আমেরিকাবাস-কালে তাঁহার সহিত রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়।[২] লিটল রিভিউ নামে পত্রিকার সম্পাদিকা (যিনি জেম্স জয়েসের ইউলিসিস ধারাবাহিক পত্রিকায় প্রকাশ করেন বলিয়া জেলে যান) টেগোর ও পেদারিয়স্কি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন শ্রীঅমল দত্ত উহা ক্রান্তিতে (১৩৬২ বৈশাখ) প্রকাশ করেন।

১ Sanfrancisco Examiner, 2 October 1916.

২ Jgnace Paderewski 1860-1941.

সানফ্রানসিসকোতে থাকিবার সময় রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করিয়া এমন-একটা কুৎসিত জিনিস গড়িয়া উঠিল যাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া দরকার, কারণ তাহার জের চলে বহু বৎসর।

কালিফোর্নিয়ায় তখন বহু পঞ্জাবী ও শিখ বিপ্লবী ছিল। ইহাদিগকে বলিত 'গদর' বা 'বিদ্রোহী'। য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে পঞ্জাবের সৈন্যদের মধ্যে কিভাবে বিদ্রোহ জাগাইবার চেষ্টা হয়, কী করিয়া ভারতের বাহির হইতে সাহায্য আনিবার চেষ্টা হয়— তাহার ইতিহাস জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস পাঠকমাত্রই জানেন। এইসব ব্যাপারে কালিফোর্নিয়ার কতকগুলি ভারতীয় লিপ্ত ছিল। এইসব লোকদের অধিকাংশের বিদ্যাবুদ্ধি ছিল সামান্য। মোটামুটি ভাবে তাহারা ধরিয়া লইয়াছিল যে 'ন্যাশনালিজমে'র বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা দেশকল্যাণের পরিপন্থী। ১৯১৫ সালে বৃটিশরাজের নিকট হইতে 'সার্' উপাধি গ্রহণ করিয়া তিনি নিজেকে বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন এই ছিল তাহাদের ধারণা। 'হিন্দুস্থান গদর' নামে এক পত্রিকায় রামচন্দ্র নামে এক লেখক রবীন্দ্রনাথের ন্যাশনালিজম্ সম্বন্ধে বক্তৃতার এখান-সেখান হইতে বাক্য তুলিয়া তাহার কদর্থ করিয়া তীব্রভাষায় মতামত প্রকাশ করেন।

চারি দিকে গুজব ছড়াইল (৫ই) যে গদর-দল রবীন্দ্রনাথকে হত্যা করিবে। এই কথা শোনামাত্র স্থানীয় পুলিস ও ডিটেক্‌টিভ রবীন্দ্রনাথের হোটেল ও কলম্বিয়া থিয়েটারে তাঁহার বক্তৃতার স্থান বিশেষভাবে রক্ষা করিতে লাগিল। বহুশত হিন্দুকে সভায় তাহারা প্রবেশ করিতে দিল না। ইণ্টারন্যাশন'ল ডিটেক্‌টিভ এজেন্সির লোকেরা কবিকে সভার পর বাহির করিয়া লইয়া যায় ও হোটেলেও পিছনকার দরজা দিয়া তাঁহার ঘরে পৌঁছাইয়া দেয়।

এইসব ব্যাপারের মূলে ছিল সামান্য একটা ঘটনা। স্টকটন নামে একটি শহর হইতে বিষম সিং গণ্ডু নামে একজন লোক রবীন্দ্রনাথকে সেই শহরে লইয়া যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতে আসিতেছিল; হোটেলের কাছে রামচন্দ্রের দলের দুইজন লোকে বিষম সিংকে বাধা দেয়; তাহারা চায় না রবীন্দ্রনাথ স্টকটনে যান। এই মারামারির পর রবীন্দ্রনাথকে হত্যার গুজব রাষ্ট্র হয়।

রামচন্দ্র ছিল গদর-দলের অন্যতম প্রধান পাণ্ডা; ১৯১৫ সালে মার্কিন-জার্মানদের সাহায্যে ভারতে অস্ত্র আমদানির ষড়যন্ত্রে ইনি ছিলেন প্রধান। রামচন্দ্র ইহার জবাবে লেখেন, 'আমাদের দলের এইরূপ কোনো অভিসন্ধি নাই। প্রথমত রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ, তাঁহার কাজ কাব্য, রাষ্ট্রনীতি নহে। সেইজন্য তাঁহাকে আমরা বিশেষ গ্রাহ্য করি না। তাঁহার ক্ষতি করিলে আমেরিকায় আমাদেরই সর্বনাশ, সে কথা আমরা জানি। পথে মারামারির কারণ এই যে, আমরা চাই নাই যে লোকটি এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমাদের একমাত্র আপত্তি এই যে, বৃটিশের সম্মান তাঁহাকে কিনিয়া ফেলিয়াছে; তিনি বৃটিশ নাইট হইয়া আজ পৃথিবীর কাছে দেখাইতে চান যে বৃটিশ শাসন ভারতের কত মঙ্গল করিয়াছে; কিন্তু এই আন্তর্জাতিক মহিমা পাইবার পূর্বে তিনি বিদেশীদের বিরুদ্ধে নাটখানি বই লিখিয়াছিলেন।' (Portland Telegram, 21 Oct 1916)।

এইসব ঘটনার পরদিনই কবি Santa Barbara শহরে যান। এটি সমুদ্রতীরস্থ আবাসিক নগর। ইহার অন্তঃপাতী একটি শহরতলীর অভিজাত সম্প্রদায়ের একটি ক্লাবে 'ন্যাশনালিজম্' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি সাংবাদিক ডগলাস টুর্নি (Tourney)কে মোলাকাতে বলেন যে, 'সানফ্রানসিসকো কাগজে আমাকে হত্যা লইয়া একটা খবর প্রকাশ পায়; আমি তাহার সমস্ত পড়ি নাই।' কাগজে বাহির হয় যে তিনি তাঁহার engagement ভঙ্গ করিয়া চলিয়া যান। ইহা তিনি অস্বীকার করেন এবং বলেন তাঁহার প্রোগ্রামের কোনো পরিবর্তন করা হয় নাই। 'হত্যাসম্বন্ধে যে গুজব উঠিয়াছে সে-সম্বন্ধে আমার দেশবাসীর বুদ্ধির প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, এবং আমি আমার সমস্ত কাজ পুলিসের সহায়তা ব্যতীতই করিব। আমি এখানে স্পষ্ট বলিতেছি যে আমাকে হত্যা করিবার

কোনো ষড়যন্ত্র হইয়াছিল— তাহা আমি বিশ্বাস করি না।[১] রবীন্দ্রনাথ বিদেশে দেশবাসীদের কোনোরূপে হেয় প্রমাণ করিতে চাহিলেন না।

পরদিন রাত্রে লস্ এঞ্জেলিস শহরে রবীন্দ্রনাথ পৌঁছিলেন[২]; পৌঁছানোর মুহূর্ত হইতে তিনি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি সাংবাদিকগণকে বলেন, 'আমেরিকায় আসিয়া আমি কোনো মৌলিক রচনা লিখিতে পারিতেছি না। পাশ্চাত্যরা এই আবহাওয়ায় সাহিত্যসৃষ্টি করিতে পারে। তাহাতে তাহারা অভ্যস্ত। কিন্তু এই গোলমালে আমি আমার নিজেরই কণ্ঠস্বর শুনিতে পাই না।' মহানগরীগুলি সম্বন্ধে বলেন যে সেগুলি মানুষের ভুলের সৃষ্টি, এবং এমন সময় আসিবে যখন মানুষ শহর হইতে অব্যাহতি লইবে। শহর হইবে অফিসের জন্য; মানুষ প্রকৃতির মাঝে দূরে দূরে বাস করিবে। বর্তমান যানবাহন দূরত্ব দূর করিবে। শহর ব্যবসার খাতিরে মানবজীবনকে পেষণ করিতেছে। কিন্তু মানুষ তো আর কেবল ব্যবসায়ীই নহে; তারা মানুষ।'

লস্ এঞ্জেলিসের Cumnock School of Expressionএর তত্ত্বাবধানে Trinity auditoriumএ ৯ই মে বক্তৃতা হয়। তথায় রাজসম্মানে রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দিত হইলেন[৩]। Pasadena নামে একটি শহর লস্ এঞ্জেলিসের কাছে; সেখানে কয়েক সপ্তাহ হইতে রবীন্দ্রনাথকে সমাদর করিবার জন্য শিক্ষিত সমাজ প্রস্তুত হইতেছিল। সাধারণ পাঠাগার ও বইএর দোকানে কয়েকদিন কবির বইএর অসম্ভব চাহিদা দেখা দিয়াছিল। লস্ এঞ্জেলিস হইতে পাসাদেনায় আসিয়া তিনি বক্তৃতা করিয়া পুনরায় ফিরিয়া যান। পরদিন কবির নিজ রচনা হইতে কিছু আবৃত্তি করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ আসায় তিনি ট্রিনিটি অডিটোরিয়ামে তাহা পাঠ করেন।[৪] লোকে চিত্রার্পিতের ন্যায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাঠ শ্রবণ করে; L. A. Times তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে বলেন, "And the speaker's exquisite English was worth going across the continent to hear"। স্টেটের দক্ষিণে মেক্সিকো রাষ্ট্রের সীমান্তের নিকট San Diego শহরে এই সময়ে পাখির প্রদর্শনী হইতেছিল, কবি সেখানে একদিন উপস্থিত হন।

পশ্চিম আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শেষ হইল; সর্বত্র সমাদর যত্ন লাভ করা সত্ত্বেও একটি বিরোধী মত যে তাঁহার পাশেপাশেই আক্রমণ করিয়া ফিরিতেছিল— তাহা উপেক্ষণীয় নহে: Sanfrancisco Call লিখিল "রবীন্দ্রনাথের এই দর্শন ভারতের জন্য কী করিয়াছে! আর আমাদের কী দশা হইত যদি আমরা সেই তত্ত্ব জীবনে গ্রহণ করিতাম? বৃদ্ধ ভারত কুব্জ, অর্ধভুক্ত, ছিন্নকন্থা-পরিহিত— বোধিদ্রুম তলে বসিয়া আছে, আর অনন্তের চিন্তা করিতেছে! আত্মসমর্পণ খুব বড়ো গুণ, তা সে খ্রীষ্টানের মধ্যেই হউক আর পৌত্তলিকের কাছেই হউক। ভারতবর্ষ আত্মসমর্পণ মন্ত্র প্রচার করুন— আমরা আমেরিকানরা দৃঢ় সংকল্পকে ভালো করিয়া সাধন করি।"

Los Angeles Express আরও বিদ্রূপ করিয়া লিখিল (১৭ অক্টোবর), "যাই হউক অর্থ রোজগার হিসেবেও আমেরিকানদের প্রয়োজন আছে দেখিতেছি। ঠাকুরমহাশয় তাহাদিগকে তাহাদের ধনের জন্য সমালোচনা করিতেছেন— কিন্তু সেখানে আসিয়াছেন তো তাহাদের উপার্জিত ধনের কিছু অংশ গ্রহণ করিতে। ...ধন খুবই হীন পদার্থ, ধনোপার্জন-বৃত্তি অত্যন্ত গর্হিত...কিন্তু আমাদের এই সান্ত্বনা যে আমাদের এই তুচ্ছ ধন— যাহা তিনি এতই ঘৃণা করেন

১ Los Angeles Examiner, 7 Oct 1916.

২ লস্ এঞ্জেলিস কালিফোর্নিয়া স্টেটের বৃহত্তম নগর, সমুদ্র হইতে ১৫ মাইল ভিতরে অবস্থিত হইলেও শহরের একাংশ-প্রশান্ত মহাসাগর-তীরেই অবস্থিত।

৩ Los Angeles Times, 10 Oct. 1916

৪ Los Angeles Herald, 11 October 1916.

তাহাই তাঁহাকে এতদূর টানিয়া আনিয়াছে। তিনি যাহা নিন্দা করেন, তাহাই পাইবার জন্য আসিয়াছেন, এবং এখানে আসিয়া সেই কাজই নিজে করিতেছেন যার জন্য এত নিন্দাবাদ।" এইভাবের সমালোচনাও যথেষ্ট হইয়াছিল।

সান ডিএগো হইতে কবি পশ্চিম-আমেরিকা ত্যাগ করিয়া মধ্য দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন ও সল্ট লেক সিটিতে আসিলেন (১৪ই অক্টোবর)। এই শহরটি উটা (Uttah) স্টেটের প্রধান নগরী। এই নগরী মরমন (Mormon) নামে এক সম্প্রদায় কর্তৃক গঠিত। তাহাদের ধর্মমত সম্পূর্ণ পৃথক হইলেও নানা সৎকর্মে ও সৎচিন্তায় তাহাদের উৎসাহ আছে। এখানেও তিনি ন্যাশনালিজম্ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন; কিন্তু লোকে বোধ হয় তাঁহার কাছ হইতে হিন্দুরা জীবন সম্বন্ধে কী দার্শনিক মনোভাব পোষণ করে— সে-সম্বন্ধে শুনিতে পাইলে খুশি হইত। এ প্রবন্ধে তিনি যাহা দিয়াছিলেন তাহাতেও তাহারা কম প্রীত হয় নাই। কিন্তু এখানেও তাঁহার মত সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ দৈনিক কাগজে প্রকাশিত হইল।

Salt Lake Tribune লিখিল, "পাশ্চাত্যজাতি ভাবিতেও পারে না যে নৈতিক বা আধ্যাত্মিক দিক হইতে তাহারা প্রাচ্য সভ্যতা গ্রহণ করিতে পারে। বাস্তব মনে হয় পশ্চিমের অশান্তি অপেক্ষা অলস প্রাচ্যের শান্তি শ্রেয়।" ভারতবর্ষ, তিব্বত, চীনের বর্তমান অবস্থা বা প্রাচীন ইতিহাসের কথা তুলিয়া লেখক বেশ ব্যঙ্গ করিয়া বলেন যে, ভারতের জাতিভেদ কি ভ্রাতৃস্নেহের উপর প্রতিষ্ঠিত? "সার্ রবীন্দ্রনাথ আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে কেবল দোষ দেখেন নাই, আমাদের রাজনীতি সম্বন্ধেও দোষ দেখিয়াছেন। কিন্তু এসব কথার আলোচনায় পৃথিবীর বড়ো বড়ো সমস্যার প্রশ্ন উঠিবে, রবীন্দ্রনাথের ন্যায় দার্শনিকেরই এইসব আলোচনার সময় ও অবসর আছে।" এই বলিয়া সমালোচক তাঁহার বক্তৃতাকে তুচ্ছ করিতে চেষ্টা করেন।

সল্ট লেক সিটি হইতে কবি সদলে শিকাগো আসেন; শিকাগো মধ্য-মার্কিন রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র, ইলিনয় স্টেটের প্রধান শহর। তিন বৎসর পূর্বে কবি এইখানে আসিয়া অনেকদিন ছিলেন; এবারেও তিনি শ্রীমতী মুডির অতিথি হইলেন; শিকাগোকে কেন্দ্র করিয়া কবি কয়েকটি শহর ঘুরিলেন। ২৪ অক্টোবর শিকাগোর অরচেষ্ট্রা হলে বক্তৃতা হয়।

বিদেশে ঘুরিলেও দেশের সমস্যা ও ব্যক্তিগত জীবনের ও সংসারের সমস্যা তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। কবির আর্থিক অবস্থা মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইতেই মন্দ— কারণ য়ুরোপীয় দেশের বই বিক্রয়ের টাকা প্রায় বন্ধ। ইহার উপর ছিল পূর্বকৃত ঋণের বোঝা। তারক পালিতের নিকট— কুষ্টিয়ার ব্যবসায়ের দায় মিটাইবার জন্য যে ধার করেন, এ-যাবৎ-কাল তাহার সুদ শতকরা আট টাকা হারে দিয়া আসিতেছেন কিন্তু আসল কমিতেছে না। কিছুকাল পূর্বে তারক পালিত তাঁহার সম্পত্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে আদায় করিবার বরাত দেন। লস্ এঞ্জেলিস হইতে রথীন্দ্রনাথকে কবি লিখিতেছেন, "খরচ বাদে ত্রিশ হাজার টাকা আমার হাতে জমলেই আমি তোকে পাঠিয়ে দেব। তারকবাবুর যে টাকাটা ধারি, এখন যে দেনাটা কলকাতা য়ুনিভারসিটির হাতে গিয়ে পৌঁচেছে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তার মেয়াদ ফুরোবে— অতএব আগামী বৎসরেই এই টাকাটা শোধ করে দিয়ে মাসিক সুদের হাত থেকে নিষ্কৃতি নিস। এই দেনা বাদে যা কিছু টাকা জমবে বিদ্যালয়ের কাজে দিতে হবে। সেখানে একটি ভালোরকমের হাসপাতাল এবং টেকনিকাল বিভাগ খোলবার ইচ্ছা আছে।..."[১] টাকা হাতে আসিলে খড়ের ঘরগুলিকে পাকা চাল করা দরকার সে কথাও লিখিলেন, কারণ অগ্নিভয় আছে।

বিদেশে ঘুরিতে ঘুরিতে কবির মনে "শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র" করিয়া

১ চিঠিপত্র ২, পত্র ১৯, ১১ অক্টোবর ১৯১৬।

তুলিবার কথা উদিত হইতেছে। তিনি লিখিলেন, “ঐখানে সার্বজাতিক মনুষ্যত্ব-চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে— স্বাজাতিক সঙ্কীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আস্‌চে, ভবিষ্যতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামিলনযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে। ঐ যায়গাটিকে সমস্ত জাতিগত ভূগোলবৃত্তান্তের অতীত করে তুলব এই আমার মনে আছে— সর্বমানবের প্রথম জয়ধ্বজা ঐখানে রোপণ হবে। পৃথিবী থেকে স্বাদেশিক অভিমানের নাগপাশ বন্ধন ছিন্ন করাই আমার শেষবয়সের কাজ।”[১]

কয়েকদিন পরে আর-একখানি পত্রে লিখিতেছেন— “বাংলাদেশের চিত্ত সর্বকালে সর্বদেশে প্রসারিত হোক্‌, বাংলাদেশের বাণী সর্বজাতি সর্বমানবের বাণী হোক্‌। আমাদের বন্দেমাতরম্‌ মন্ত্র বাংলাদেশের বন্দনার মন্ত্র নয়— এ হচ্চে বিশ্বমাতার বন্দনা— সেই বন্দনার গান আজ যদি আমরা প্রথম উচ্চারণ করি তবে আগামী ভাবী যুগে একে একে সমস্ত দেশে এই মন্ত্র ধ্বনিত হয়ে উঠবে।...আমরা মানববিধাতার রাজপথে মহামানবের গান গেয়ে বেড়াব।... মহাবিশ্বের পথকেই আমরা দেশ বলে গ্রহণ করব।”[২] কবির ভারতীয় পত্র সরকারী সেন্সর কোথায় আটকাইয়া দেরি করিয়া দিতেছিল; সেই সংবাদ পাইয়া কবি ঐ পত্রে লেখেন, “সেন্সরের হাতে এই অন্যায় বাধা পেয়ে আমি ঠিক করলুম এখন থেকে আমার যা-কিছু বলবার কথা সে এই পশ্চিমের লোকের কাছে। আমার বাণীর পথ রোধ করবে এমন সাধ্য কারো নেই।” (পৃ ৫৮) শিকাগো হইতে আর-একখানি পত্রে কয়েকদিন পূর্বে লিখিয়াছিলেন, “দেশের গণ্ডী আমার ঘুচে গেছে, সকল দেশকেই আমার হৃদয়মধ্যে এক দেশ করে তুলে তবে আমি ছুটি পাব। ...আমাকে যিনি কাজে লাগাবার জন্যে এতদিন ধরে নানা সুখে দুঃখে গড়ে তুলেচেন তিনিই আমাকে নিজে চালনা করে কাজে খাটাবেন। আমার দেশের কাজ নয়— তাঁর জগতের কাজ।”

বিশ্বভারতী পরিকল্পনা অকস্মাৎ কবির মনে উদিত হয় নাই, বহুকাল হইতে ধীরে ধীরে তাহা মনের উপর জমাট বাঁধিতেছিল— অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহা রূপ পরিগ্রহ করিল।

শিকাগো হইতে কবি Iowa স্টেট্‌ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিমন্ত্রিত হন। অধ্যাপক ডাঃ সুধীন্দ্রনাথ বসু তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসেন। ডাঃ সুধীন্দ্রনাথ কবিকে পূর্বে দেখেন নাই; কবি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ও মনোভাব তিনি একটি প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন[৩]। ট্রেনে তিনি দেখেন কবি George Russell[৪]এর সদ্য-প্রকাশিত *Imagination and Reveries* (1915) গ্রন্থখানি পাঠ করিতেছেন। ডাঃ বসু লিখিয়াছেন যে তিন বৎসর পূর্বে যখন কবি এ দেশে আসেন, তখন কবির কয়েকজন বন্ধু তাঁহার বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ-সংগ্রহের প্রস্তাব করেন; কবি তখন তাহাতে রাজি হন নাই—“He was too patriotic, too proud to take help outside of India.”। কিন্তু তাঁহার সে মত পরিবর্তিত হইয়াছিল। এবার আমেরিকায় আসিবার উদ্দেশ্য অর্থসংগ্রহ। ডাঃ সুধীন্দ্রনাথকে কবি একখানি পত্র লেখেন, “In our country the man who devotes himself to realize his spiritual oneness with all does not shrink to claim his help from all men; because it amounts to a tacit avowal that he belongs to mankind at large. My institution at Bolpur will accept food from all men and thus renounce the caste for good.”।

আইওয়া হইতে শিকাগোতে ফিরিয়াছেন; ইতিমধ্যে বিসকনসিন স্টেটের প্রধান শহর মিলবৌকি (Milwaukee)-তে

১ চিঠিপত্র ২, পত্র ১৯, (লস্‌ এঞ্জেলিস) ১১ অক্টোবর ১৯১৬।

২ চিঠিপত্র ২, পত্র ২০, Chicago, ২৮ অক্টোবব ১৯১৬।

৩ Modern Review, 1917 February.

৪ George Russel (Æ) 1867-1935) আইরিশ লেখক। তাঁহার *National Being* (1917) কবির প্রিয় গ্রন্থ ছিল।

কবিকে সম্বর্ধনার বিপুল আয়োজন চলিতেছে। সেখান হইতে Little Theatreএর ডিরেক্টর মিসেস এডিথ আডামস্ আসিলেন কবিকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য। শহরে কী উৎসাহ— অন্য শহরে কবিকে যেভাবে অভ্যর্থনা করা হইয়াছে তাহা হইতে যেন সমাদর কম না হয় (Mil. Sentinal 21 Oct' 16)। ৪ঠা নভেম্বর মিলবৌকির বৃহৎ Pabet থিয়েটারে কবির বক্তৃতা হইল— "one of the biggest lecture crowds that has been brought together in Milwaukee for several seasons."।

মিলবৌকি হইতে কবি কেন্টাকি স্টেটের প্রধান শহর Louisvilleএ যান ও বক্তৃতা করেন; সেখান হইতে টেনেসি স্টেটের ন্যাশভিলে উপস্থিত হইয়া Vendome Theatreএ বক্তৃতা করিলেন; পরে তাঁহার হোটেলে নগরীর বহু খ্যাত লোক সমবেত হইয়া কবির নিকট হইতে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় সম্বন্ধে তাঁহার কথা শোনেন।

দক্ষিণে ন্যাশভিলই শেষ সীমানা। এইবার উত্তর দিকে চলিলেন; Detroit মিচিগানের প্রধান শহর, শিল্পের প্রকাণ্ড কেন্দ্র। ডেট্রইট্ বণিক ও ব্যবসায়ীদের আড্ডা; সেখানে তাঁহার ন্যাশনালিজম সম্বন্ধে বক্তৃতা খুব কম লোকেই শ্রদ্ধার সহিত শুনিল। কাগজেও অত্যন্ত তীব্রভাবে কবির মতকে আক্রমণ করিতে লাগিল। একজন লেখক লেখেন, "such sickly saccherine mental poison with which that Tagore would corrupt the minds of the youth of our great United State," আর-একটি কাগজ লিখিল রবীন্দ্রনাথের বাণী "utterly opposed to all modern conception." (Detroit Journal 14 Nov. 16). সেই কাগজ আরও লিখিল, "জাতীয়তার প্রশ্ন বিবেচনা করিতে গিয়া আমেরিকানরা যেন কখনো ভুলিয়া না যায় যে পৃথিবীতে জাতীয় ভাব উদ্দীপনার জন্য তাহাদের কার্য অন্য সকল জাতি হইতে পৃথক্। আমেরিকান বিপ্লবে আমরা দেখিতে পাই যে, একটি জাতি জাতীয়তা-বোধ হইতে যুদ্ধ করিতেছে— পৃথিবীতে আর-সব যুদ্ধ tribeএর সঙ্গে tribeএর, স্থানীয় বা রাজবংশের সহিত রাজবংশের; স্বাধীনতার জন্য আমেরিকান সংগ্রাম সমগ্র জাতির আকাঙ্ক্ষার পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথের কথা শুনিতে ভালো, কিন্তু কাজের নয়।" As an abstract theory the message has much that is attractive and engaging. As a suggestion for practical application it obviously is unsuited for mankind as we know it.।

কিন্তু অন্য একদল বেশ ভালোভাবেই রবীন্দ্রনাথের বাণীকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। Detroit Timesএর সম্পাদকীয় লেখক লেখেন যে মার্কিন রাজ্যের লোকেরা বুঝিতে আরম্ভ করিতেছে যে তাহাদের বাহিরেও একটা বৃহত্তর পৃথিবী আছে; অন্যান্য দেশেও লোকসমাজে তাহাদের মতই ন্যায় ও সত্যের বোধ আছে; দুর্বল প্রতিবেশীর উপর চড়াও করিয়া তাহাকে লুট করার চেয়েও মানুষের সাধু বৃত্তি আছে; আমরা কেবল জন্তু নই যে বাঁচিবার জন্য কেবলই সংগ্রাম করিতেছি; আমরা moral beings with human responsibilities; মোট কথা স্বাদেশিকতার সংকীর্ণ আদর্শ ছাড়াও প্রেম বলিয়া একটা জিনিস মহামানবের আছে।[১]

১৫ই নভেম্বর কবি ক্লেভল্যাণ্ডে আসিয়াছেন। Twentieth Century Club একেবারে ধনীদের প্রাইভেট ক্লাব। কবির নিমন্ত্রণ সেখানে। এই ধনীদের মধ্যে বসিয়া তিনি বেশ জোর দিয়া বলিলেন যে মার্কিনরা যথেষ্ট মানবীয় নহে; তাহাদের দেশ লজিং হাউসের দেশ, লোকে সর্বদাই ব্যস্ততা ও গোলমাল লইয়া ব্যস্ত, আর তাহাদের একমাত্র চিন্তা অর্থ-উপার্জন। তাহারা সর্বদাই বিনোদনের জন্য লালায়িত এবং সে বিনোদন বেশ মুখরোচক হওয়া চাই। অবসর

১ Patriotism is a narrow ideal compared with the love of human kind. [Quoted by Prof. A Seymour, Hindusthani Student, Dec. 1916; also in Modern Review 1917 April].

মুহূর্তগুলি কেবল আমোদের সন্ধানেই ঘুরিতে ঘুরিতে যায়; লোকেরা সর্বদাই আপনাদিগকে চতুর ও কার্যতৎপর দেখাইবার জন্য ব্যগ্র (smart and clever); ফলে তাহারা উচ্চ আদর্শ ও আধ্যাত্মিক বিষয়কে লঘুভাবে দেখে। এইসব বলিয়া তিনি বলিলেন, 'তথাচ আমি বিশ্বাস করি যে আমেরিকার ভবিষ্যৎ ইতিহাস উজ্জ্বল— এই দেশ পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনভূমি হইবে। কারণ তোমাদের ইতিহাস য়ুরোপের ইতিহাস হইতে অনেক পবিত্র।' (N. Y. City Mail, 16 Nov. '16)।

সিয়াটেলে নামিবার ঠিক দুই মাস পরে পথে পথে ঘুরিয়া অবশেষে ১৮ নভেম্বর কবি নিউইয়র্কে পৌঁছাইলেন। সেখানে আসিয়া প্রেস-রিপোর্টারদের বলেন, 'ন্যাশনালিজমের দৌরাত্ম্য পৃথিবীতে বিশেষ অনিষ্ট করিতেছে। আমার মনে হয় তোমরা এখানে সেটি অনুভব কর না; কারণ ইহার সবগুলি উপকার তোমরা পাইতেছ। কিন্তু কোনো জাতিকে বিচার করিতে হইলে সে তাহার organisation হইতে কী লাভ করিতেছে সেদিক হইতে দেখা উচিত নহে, বরং দেখা উচিত যাহারা সঙ্ঘবদ্ধ না হইয়া কোনো উপকার লাভ করিতেছে না, তাহাদের উপর তোমাদের ব্যবহার কিরূপ, তাহার বিচার করিয়া।' এশিয়াটিকদের মার্কিনমুলুকে প্রবেশাধিকার লইয়া কথা উঠে। কবি বলেন, 'এশিয়াবাসীদের প্রতি তোমাদের ব্যবহার তোমাদের জাতীয় জীবনের কলঙ্ক।' "Your treatment of Asiatics is one of the darkest sides of your national life."। জাপানে কবি কতকগুলি জাহাজ-কোম্পানির মালিককে জিজ্ঞাসা করেন যে তাহারা টাকা থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় যাত্রীদের আমেরিকায় পৌঁছাইয়া দিতে আপত্তি করে কেন। তাহার জবাবে তাহারা কবিকে বলিয়াছিল বৃটিশ শাসকদের ও কালিফোর্নিয়া গবর্মেণ্টের চাপে তাহারা সাহস করিয়া এ কাজ করিতে পারে না। বৃটিশ গবর্মেণ্ট খোলাখুলিভাবে কোনো আইন করিতে পারেন না, কারণ সেটা বড়ই কুৎসিত দেখায়। (N. Y. City Mail, 21 Nov. 16)।

নিউইয়র্কে ২১ নভেম্বর কার্নেগী হলে কবির প্রথম ভাষণ প্রদত্ত হইল। সাময়িক কাগজে লিখিয়াছিল, এই বক্তৃতাটি a memorable day for the city,...all New York proclaimed that the lecture was one of the most remarkable one, from many standpoints, ever heard in New York. (New Haven Courier, 2 Dec 1916)।

পরদিন কবিকে Philadelphia যাইতে হয়; সেখানে সন্ধ্যার পর বালিকাদের Ogonty Schoolএ তাঁহার অনুবাদ হইতে কিছু পাঠ করিয়া শোনাইলেন। সেই রাত্রেই নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসেন ও প্রাতে (২৩শে) League of Political Educationএ The World of Personality নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন। ব্রুকলিন শহরে তিনি ন্যাশনালিজম্ সম্বন্ধে বক্তৃতা পাঠ করেন। তাঁহার মতামতের বিরুদ্ধে তখন কঠোর সমালোচনা চলিতেছে, অথচ লোকের শ্রদ্ধা বা সম্ভ্রম কিছুমাত্র কমে নাই।

নভেম্বরের শেষাশেষি কবি বস্টনে আসিয়াছেন। সেখানে মহিলাদের বিদ্যায়তন Wellesly Collegeএ বক্তৃতা করিলেন; এখানে তিনি নিজ বিদ্যালয় সম্বন্ধে বলেন। ৪ঠা ডিসেম্বর Mount Holyoak Collegeএ আর্ট সম্বন্ধে বলিলেন। পরদিন জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে বলেন Tremont Templeএ। সেখানে প্রায় তিন হাজার শ্রোতা কবিকে যে অভিনন্দন দেন, তাহা কখনো কোনো বক্তা বস্টনে পান নাই ("one of the warmest welcomes ever accorded to a lecturer in Boston"—Boston Herald, 6 Dec. 16)।

বস্টন হইতে রবীন্দ্রনাথ Yale বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আহূত হইলেন। সেখানে বিরাট সভার সমক্ষে কবি তাঁহার 'শিশু'র কবিতাগুলি আবৃত্তি করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট Hadley কবিকে অভ্যর্থনা করিয়া বলেন, 'We welcome you as one of the seekers of light and truth'; তিনি কবিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধ শতাব্দী-

জয়ন্তীর পদক উপহার দিয়া বলেন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সময় প্রথম দান[১] আসে ভারতবর্ষ হইতে। (Bridgeport Post, 7 Dec. 16)

রাত্রে এলিজাবেথিয়ান্ ক্লাবে ইয়েল সদস্যদের ডিনারে কবিকে তাঁহারা সম্মানিত করেন; সংস্কৃতের অধ্যাপক হপকিন্স কবিকে সংস্কৃত ভাষায় অভিনন্দিত করিলেন। পরদিন প্রাতে কবি নর্দম্‌টনে যান ও স্মিথ কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকের সমক্ষে শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ১২ই ডিসেম্বর Buffalo শহরে The World of Personality সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন।

দুই মাসের উপর পেশাদার কোম্পানীর হাতের বক্তৃতার কলের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া কবির মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তিনি এইখানে আসিয়া সমস্ত বক্তৃতার কড়ার ইস্তফা দিয়া বলিলেন যে তিনি দেশে ফিরিবেন। তিনি Pond Lyceumএর নিকট কড়ার-বদ্ধ— এখন সে কড়ার বা contract ভাঙিলে তাঁহাকে বিস্তর ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে— কিন্তু কবির মন যখন একবার বিকল হয়, তখন তাহাকে আর কে নিবৃত্ত করিবে। নিউইয়র্ক হইতে বিদায়ের পূর্বে তিনি ১২ই ডিসেম্বর আমস্টার্‌ডেম থিয়েটারে বক্তৃতা করিলেন— প্রায় সহস্রাধিক লোক স্থানাভাবে ফিরিয়া গেল। (N. Y. Times, 13 Dec, 16)।

পশ্চিমদিকে যাত্রা করিয়া পথে পেনসিলভেনিয়া স্টেটের প্রধান শহর—Pittsburghএ ন্যাশনালিজম্ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। ক্লেভল্যাণ্ডে তাঁহাকে একবার নামিতে হইল; সেখানে Shakespeare Gardenএ কবিকে নিজ হাতে একটি বৃক্ষ রোপণ করিতে হয়; বক্তৃতাও করিতে হইয়াছিল। ফিরিবার পথে শিকাগোতে কয়েকদিন পুনরায় থাকিলেন। সেখানে একদিন তাঁহার কবিতা হইতে তিনি আবৃত্তি করিয়া শ্রোতাদের তৃপ্তি দান করিলেন।

কোলোরেডোর (Colorado) প্রাকৃতিক সৌন্দর্য জগৎবিখ্যাত, তা ছাড়া সেখানকার ঝরনাগুলি সুপরিচিত। কবি ডেনভার হইয়া সেসব স্থান দেখিয়া গেলেন। ফিরিবার পথে Seatleএ গেলেন না, তিনি গেলেন সানফ্রানসিসকোতে। সেখান হইতে কবি পিয়ার্সন ও মুকুলচন্দ্র ২১ জানুয়ারি (১৯১৭) জাপান যাত্রা করিলেন।

সানফ্রানসিসকোতে তিনি Paul Richard-এর *To the Nations* নামে একখানি বইএর ভূমিকা লিখিয়া দেন। পূর্বে বলিয়াছি Richard-এর সঙ্গে কবিকে পিয়ার্সন পরিচয় করিয়া দেন। Pond এই বই-এর প্রকাশক হন; অনেকটা পিয়ার্সনের অনুরাধে পড়িয়া কবি ভূমিকাটি লেখেন।

প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থিত Hawii দ্বীপের হনলুলুতে তিনি একদিন ছিলেন ও সেখানে বক্তৃতাও করেন। কারণ বেশিদিন থাকা হইল না, পিয়ার্সন জাপানে ফিরিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত।

জানুয়ারির শেষে কবি জাপানে আসিয়া পৌঁছিলেন। পিয়ার্সন বলিলেন তিনি পরে যাইবেন। পল রিশার তখন জাপানে। কবি মুকুলচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া আসিলেন। কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন মার্চ মাসে।

পিয়ার্সন জাপানে থাকিয়া গেলেন; সেইখানে থাকিবার সময় তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা লেখেন; তাহার ভূমিকা লেখেন পল রিশার। বইখানি পরে ভারত-গবর্মেণ্ট কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। ১৯১৭ সালের শেষদিকে বৃটিশ গবর্মেণ্ট তাঁহাকে সিঙ্গাপুর হইতে বন্দী করিয়া ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া অন্তরীণাবদ্ধ করেন, যথাস্থানে সে-আলোচনা হইবে।

১ Elihu Yale (1649-1721). English official in India : born in Boston. In employment of East India Co. 1671-92. Resident in England from 1699. Made gift of books and goods to the collegiate school at Saybrook, Connecticut; and the school took his name perpetuated in the Yale college (1745).

'ন্যাশনালিজম্' ও 'পার্সন্যালিটি'

১

জাপানে ও আমেরিকায় ১৯১৬ সালে কবি যে বক্তৃতাগুলি করেন, তাহা পার্সন্যালিটি (১৯১৭ মে) ও ন্যাশনালিজ্‌ম্ (১৯১৭) গ্রন্থদ্বয়ে প্রকাশিত হয়। উভয় গ্রন্থই উৎসর্গ করেন C F. Andrewsকে। দুইখানি গ্রন্থের বক্তৃতা প্রায় একই কালে লিখিত, কিন্তু উভয়ের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ পৃথক্। পার্সন্যালিটি প্রবন্ধগুলিতে জীবনশিল্পী কবি-রবীন্দ্রনাথের পরিপূর্ণ জীবনের আদর্শ ব্যক্ত হইয়াছে; এক হিসাবে বলা যাইতে পারে ইংরেজি 'সাধনা'র বক্তৃতার অনুক্রমণ ব্যাপকতরভাবে এখানে ব্যাখ্যাত। আর ১৯১৩ সালে রচেস্টারে রেস কন্‌ফ্লিক্ট নামে যে ভাষণ দান করেন তাহারই বৃহত্তর প্রয়োগ হইয়াছে ন্যাশনালিজ্‌ম্-এর বক্তৃতাগুলিতে। ১৯১২ সাল ও ১৯১৬ সালের ব্যবধান চারি বৎসরের মাত্র; কিন্তু ১৯১৪ সালে যে মহাযুদ্ধ য়ুরোপে অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় পতিত হয়, তাহাতে সভ্য মানুষের অনেক পুরাতন মত ও আদর্শ ধূলিসাৎ হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ আমেরিকার বক্তৃতাগুলিতে জগতের এই ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে তাঁহার মত অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ও স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করেন।

দুইখানি গ্রন্থে যথাক্রমে ব্যক্তি ও সমষ্টির পরস্পরের সম্বন্ধ আলোচিত হইয়াছে; individual বা ব্যক্তির সহিত সমষ্টির বিরোধ চিরন্তন— অর্থাৎ বিরোধ পার্সন্যালিটির সহিত ন্যাশনালিটির তত্ত্বের। পার্সন্যালিটি ও ইণ্ডিভিডুয়ালিটি যে এক জিনিস নয় তাহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের অহংবোধ স্বীকৃত। পার্থক্যের মধ্যে ইণ্ডিভিডুয়ালিটির ক্ষেত্রে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, তাহার স্বার্থবোধ, তাহার বৃহত্ত্ববোধ উৎকটভাবে প্রবল— আর পার্সন্যালিটিতে তাহার মহত্তর প্রকৃতি, তাহার আত্মবোধ ও বিশ্ববোধ সুন্দরভাবে প্রকাশিত। প্রথম ক্ষেত্রে ব্যক্তি বস্তুজগতের প্রভু হইবার জন্য ব্যস্ত; শেষ ক্ষেত্রে সে জগতকে মিথ্যা বা মায়া না বলিয়া এই ধরিত্রীকে ভালোবাসিবার জন্য আকুলিত— জগতের ও জগত-পরিব্যাপ্ত আত্মার মধ্যে আপনাকে পাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব। ইণ্ডিভিডুয়ালিটির পরিণাম সকল বিষয়ে ও সকল ব্যাপারে lasse faire বা স্বার্থান্ধ সংগ্রহবাদ বা গৃধ্নুতা, যাহাকে বলা হইয়াছে acquisitiveness। ইহা হইতেছে পুঁজিপতিদের দর্শন। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দানা বাঁধিয়া নেশনতন্ত্র হইয়াছে; আর পার্সন্যালিটির বিকাশে মানুষ ত্যাগের মধ্যে আপনার সার্থকতা পাইয়াছে। একটিতে মানুষের কনস্ট্রাকশন ও অপরটিতে ক্রিয়েশন-এর মূর্তি ফুটিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তৃতায় মানুষের এই দুইটি দিকের কথা আলোচনা করিয়াছেন; পার্সন্যালিটি গ্রন্থের মধ্যে মানুষ কিভাবে তাহার মহত্তর আত্মবোধকে পরিপূর্ণ জীবনদর্শনের মধ্যে দেখিতে পায়, তাহারই কথা আছে। এই আত্মবোধ বা বিশ্ববোধের বিপরীত বা অ্যান্টিথিসিস হইতেছে নেশন-বোধ বা ন্যাশনালিজ্‌ম্— যেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ বা ইণ্ডিভিডুয়ালিজ্‌ম্ নেশনরূপে বৃহদায়তন দানবমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া জগতকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। আত্মার বিকাশে মানবের মহত্ত্ব ও দেহের প্রসারে তাহার বৃহত্ত্ব বা স্থূলত্ব প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সমাজ সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিলেন তাহা তাহাদের জীবনের দুই কোটিকে স্পর্শ করিয়াছে; একটি হইতেছে তাহার ভাবাত্মক জীবনের আদর্শের কথা, অপরটি হইতেছে তাহার নঙাত্মক জীবনের ব্যর্থতার কথা। 'পার্সন্যালিটি' গ্রন্থের ভাষণগুলি এই ভাবাত্মক জীবনের গভীর বাণী— আর ন্যাশনালিজ্‌ম্ বক্তৃতাগুলি নৈর্ব্যক্তিক নেশনতন্ত্রের নিষ্পেষণ হইতে ব্যক্তি-আত্মাকে রক্ষার জন্য সতর্কবাণী। সেইজন্য দুইখানি গ্রন্থকে পরস্পরের পরিপূরক বলা যাইতে পারে।

ন্যাশনালিজম্ গ্রন্থে তিনটি মাত্র প্রবন্ধ আছে— 'ন্যাশনালিজ্‌ম্ ইন্ ওয়েস্ট', 'ন্যাশনালিজ্‌ম্ ইন্ জাপান', 'ন্যাশনালিজ্‌ম্ ইন্ ইণ্ডিয়া'; এ ছাড়া 'নৈবেদ্য' হইতে কবিতার অনুবাদ— 'দি সান্‌সেট অব দি সেনচুরি'। ইহার

মধ্যে 'ন্যাশনালিজ্‌ম্‌ ইন্‌ জাপান' প্রবন্ধটি জাপানে প্রদত্ত দুইটি ভাষণ— 'দি স্পিরিট অব জাপান' ও 'দি মেসেজ অব ইণ্ডিয়া'র পুনর্লিখিত রূপ।

কবি প্রথমে পশ্চিমের 'নেশন' লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। কারণ 'নেশন'তত্ত্ব পশ্চিমের আবিষ্কার। এশিয়ায় জাপানই সর্বপ্রথম য়ুরোমেরিকার ন্যাশনালিজ্‌ম্‌ মন্ত্র গ্রহণ ও তাহার পরীক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সমকক্ষ হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় রত হয়; আজ ভারতবর্ষ বহু জাতি উপজাতি, বহু ভাষাভাষী অধিবাসীর বাসভূমি; নেশন-এর কল্পনা সে কখনো করে নাই— ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যে মানুষ বাস করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ ভারতও নেশন হইবার জন্য উৎকট চেষ্টা করিতেছে। কবি তিনটি প্রবন্ধে নেশনের তিনটি রূপ দেখাইলেন; পশ্চিমের নেশন-দানবের নৃশংস মূর্তি কিভাবে য়ুরোপকে ছারেখারে দিতেছে এবং জাপান নেশনের নূতন অস্ত্র পাইয়া কিভাবে চীনের উপর তাঁহার ধার পরীক্ষা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে— আর ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক ঐক্যের বাণী প্রচার করিয়া শেষ পর্যন্ত সামাজিক ভেদকে কি ভাবে চিরন্তন করিয়াছিল ইহাই হইল ভাষণত্রয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়।

ন্যাশনালিজম পশ্চিমে কী আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার আলোচনা করিতে গিয়া স্বতঃই কবির মনে ভারতের কথা উদিত হইয়াছে।...ভারতে ইতিহাসের প্রারম্ভকাল হইতে জাতি-সমস্যা দেখা দিয়াছিল। ভারতের মনীষীগণ তাহাকে সামাজিক ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন; বিরুদ্ধতাকে নির্মমভাবে নিশ্চিহ্ন করেন নাই; তাঁহারা মানুষকে মহত্তর আধ্যাত্মিক ঐক্যের মধ্যে নিখিল মানবসমাজকে দেখিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু সমাজে সাময়িক সমস্যা সমূহকে নিরাকৃত করিতে গিয়া তাঁহারা মানুষে মানুষের মধ্যে যেসব বিধিনিষেধের প্রাচীর গড়িয়াছিলেন, তাহাকে চিরস্থায়ী করিতে গিয়াই তাঁহাদের ভুল হয়। কিন্তু তাহারই সঙ্গে মানুষের মধ্যে অখণ্ড ঐক্যের বোধকে জাগ্রত রাখিবার চেষ্টা থাকায় সেখানে আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়ার নিদারুণ জাতিসংঘাত দেখা দেয় নাই। ভারতের ইতিহাসে মানুষের এই জাতিসংঘাতের কথা চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবার কোনো চেষ্টা হয় নাই— রাজ্য ও রাজ্যের ইতিহাস আমাদের কোনোদিনই আকর্ষণের বিষয় ছিল না। আমাদের ইতিহাস হইতেছে মানবসমাজের ইতিহাস— অধ্যাত্ম আদর্শকে অনুভব করিবার ইতিহাস। কিন্তু পাশ্চাত্য জাতি যখন ভারতের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন সমস্যার সম্পূর্ণ নূতন মূর্তি; ভারতের মধ্যে বিদেশী বারে বারে যোদ্ধবেশে প্রবেশ করিয়াছে— তাহাদের ভালো মন্দ, ন্যায় অন্যায়, সমস্তই সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে— তাহাদের ভাষা ও আমাদের ভাষা মিলিয়া নূতন ভাষা হইয়াছে— যাহা উভয়েরই বোধগম্য। তাহাদের সংস্কৃতি ও আমাদের সংস্কৃতি মিলিয়া নূতন সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে, যাহা উভয়েরই শ্রদ্ধার জিনিস। কিন্তু শেষকালে যাহারা আসিল তাহারা 'নেশন'— ব্যক্তি নয়— যোদ্ধ নয়— তাহারা আসিয়া পড়িল এমন জাতির উপরে— যাহাদের কাছে 'নেশন' শব্দ অজ্ঞাত— 'We, who are no nation ourselves'।[১]

নেশন কী— এ কথার আলোচনা ঊনবিংশ শতকে বহু মনীষী করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে যখন ন্যাশনাল ও নেশন শব্দের আমদানি হয়, তখন দেশেও ব্যাখ্যানের বিস্তর চেষ্টা চলে— রবীন্দ্রনাথও সে আলোচনায় বহুবার যোগদান করেন। নেশন শব্দের দ্বারা আজ যে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সংঘ বুঝাইতেছে তাহা যন্ত্রীয়তার উদ্দেশ্যেই গঠিত— তাহাকে যন্ত্রযান বলা যাইতে পারে— "Which a whole population assumes when organized for a mechanical purpose" (p 9)। কিন্তু সমাজের (society) সেরূপ কোনো উদ্দেশ্য নাই; সমাজ সমাজের লোকেরই জন্য। সেখানে লোকের সঙ্গে লোকের সম্বন্ধ স্বাভাবিক, পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক, কেহ কাহারও অপহারক নহে।

সমাজের উদ্দেশ্য আত্মরক্ষার, নেশনের উদ্দেশ্য নৈর্ব্যক্তিক সংঘশক্তির সম্প্রসারণ। একটিতে self-preservation

১ *Nationalism*, p 8.

অপরটিতে self-agrandisement ও self-assertion। বিজ্ঞান ও ব্যবস্থার (organization) কল্যাণে নেশনের আজ আপনার মধ্যে নিবিষ্ট থাকা অসম্ভব; প্রতিবেশী সমাজ ও দেশসমূহকে ঐহিক সুখের জন্য উত্তেজিত করিয়া পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষানল জ্বালাইয়া তোলাই হইতেছে পাশ্চাত্য নেশনের ধর্ম। চারি দিকেই সমাজের স্বাভাবিক বন্ধনের মধ্যে শিথিলতার লক্ষণ সুস্পষ্ট ও তাহার স্থলে যন্ত্রীয় ব্যবস্থাবিধান প্রবর্তিত হইতেছে। এই যন্ত্রীয়তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইতেছে পাশ্চাত্য দেশে নরনারীর প্রকৃতিগত সম্বন্ধের মধ্যে বিরোধ। প্রকৃতি যেখানে নরনারীর মধ্যে সহকারিতা চায়, সভ্যতা সেখানে প্রতিযোগিতা আনিয়াছে। নরনারীর মনস্তত্ত্বের মধ্যে আজ যে পরিবর্তন দেখা দিয়াছে — তাহা আদিম বিবদমান যুগের মনস্তত্ত্ব— পরস্পরের প্রতি আত্মসমর্পণের দ্বারা পরিপূর্ণতা লাভই যে মানবতার চরম সার্থকতা— তাহা আজ সভ্যমানব ভুলিয়াছে।

নরনারীর সম্বন্ধে যেমন বিপ্লব ও বিরোধ দেখা দিয়াছে— সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ভাঙনের লক্ষণ কম সুস্পষ্ট নহে। আজ একদল লোক সুশৃঙ্খলিত শাসনকে অস্বীকার করিয়া আপনাদিগকে অ্যানার্কিস্ট ঘোষণা করিতেছে— তাহার কারণ ইণ্ডিভিডুয়াল বা ব্যক্তি আজ সমষ্টির নিকট অপমানিত— তাই এই প্রতিক্রিয়া। অর্থনীতিক্ষেত্রে ধর্মঘট বা স্ট্রাইক্ এই মনোভাবেরই প্রকাশ। এই যন্ত্রীয় ব্যবস্থা-বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতিসর্বস্ব সমাজকে কবি 'নেশন' বলিয়াছেন। যন্ত্রের একমাত্র সার্থকতা সফলতায়— কিন্তু মানুষের চরম সার্থকতা মঙ্গল-বিধানে। যখন এই যন্ত্রদানব বৃহদাকার ধারণ করে তখন যন্ত্রী যন্ত্রের অংশমাত্র হইয়া যায়, মানুষকে তখন আর দেখা যায় না— যন্ত্রের মানবাংশগুলি যন্ত্রের ন্যায় নির্মমভাবে পরস্পরকে দলন করিয়া চলিতে থাকে— কোথাও কাহারও মনে নীতি ধর্ম মানবতার প্রশ্ন উঠে না।

এক অবচ্ছিন্ন নেশন ইংরেজরূপে ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছে। কিন্তু মানুষ তো আর abstraction বা নিরবয়ব অবচ্ছিন্নভাবমাত্র নহে; প্রত্যেকটি মানুষই একটি ব্যক্তি— ইণ্ডিভিডুয়াল। বিদেশী গভর্নমেণ্ট শাসন ব্যাপারে নির্বিকার অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্‌শন, সেইজন্য ব্যক্তিবিশেষের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করা তাহার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন— ভারতবাসী তাহাদের কাছে অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্‌শন মাত্র।

আজ ইতিহাস এমন স্থানে আসিয়া স্তব্ধ হইয়াছে, যেখানে মানুষের মনের সকল প্রকার উদার ভাবনা, মানবতার অখণ্ডতাবোধ ধর্মনীতিবোধ তাহার অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া যাইতেছে; সকলের মনই অর্থ ও শক্তির জন্য উৎসুক। তাই তিনি বলিলেন, আজ প্রাচ্য দেশসমূহ তাহাদের জীবনের মূলে পশ্চিমের হৃদয়হীন ব্যবস্থার লৌহ কবলের স্পর্শকে অনুভব করিতেছে; সেইজন্য মনুষ্যত্বকে রক্ষার জন্য তাহাকে ঋজুমস্তকে জগতসমক্ষে এই কথাই ঘোষণা করিতে হইবে যে জাতীয়তা পাপের নিষ্ঠুর মারীমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া মানুষের জগতে বিচরণ করিতেছে ও তাহার নৈতিক প্রাণশক্তিকে নিঃশেষে রিক্ত করিতেছে, সুতরাং সকলেই সাবধান।— "We have felt its (soulless organization) iron grip at the root of our life, and for the sake of humanity we must stand up and give warning to all, that this nationalism is a cruel epidemic of evil that is sweeping over the human world of the present age, and eating into its moral vitality." —p 16

রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য জাতি বা নেশনসমূহের কার্যাবলীর মধ্যে পার্থক্য দেখাইতেছেন। ভারতবর্ষের বিচিত্র জাতি ও ধর্মের মধ্যে যে ঐক্যানুভূতি আজ হইতেছে, তাহার কারণ পাশ্চাত্য জাতির উপস্থিতি নহে, তাহা পশ্চিমের spirit বা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ফল; আমরা বলিব ওয়েস্টার্ণ কালচার— সিভিলিজেশন নহে। জাপান কেবলমাত্র পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে নহে, পাশ্চাত্য নেশনত্বের সকল প্রকার উপকরণ আয়ত্ত করিয়াছিল; চীন পুরাপুরি পাশ্চাত্য হইতে পারে নাই— সে পশ্চিমের বিদ্যা ও বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করিয়া ফেলিলে শ্বেতাঙ্গ-জগতের পক্ষে যে সে কী

হইয়া উঠিবে তাহারই কল্পনায় একদল ইংরেজ লেখক এককালে খুব আতঙ্কিত হইয়াছিলেন— ইহার নাম দেন তাঁহারা 'ইয়েলো পেরিল'। সেই পীতাতঙ্ক হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আজ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরও আংলো-আমেরিকান ষড়যন্ত্র নগ্নমূর্তিতে এশিয়ায় দেখা দিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, ভারত পশ্চিমের 'স্পিরিট' বা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য নেশনের স্পিরিট বা সভ্যতার মধ্যে কোন্‌টিকে বরণ করিবে তাহারই সংগ্রাম চলিতেছে। দুই শত বৎসর ইংরেজের শাসনাধীনে থাকিয়া ভারতবর্ষ কোনোরূপ অগ্রসর হইতে পারে নাই বলিয়া শাসকরাই আমাদের বিদ্রূপ করেন। অথচ জাপান স্বাধীন দেশ বলিয়া পাশ্চাত্যবিদ্যা অতি অল্পকালের মধ্যে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল; তজ্জন্যও য়ুরোমেরিকার কম শিরঃপীড়া ছিল না। ভারতীয়দের চিত্ত যে সৃষ্টিবিষয়ে জাপানীদের হইতে নিকৃষ্ট এ কথা কবি স্বীকার করেন না; ভারত স্বাধীন নহে বলিয়া সে স্বাধীনভাবে পাশ্চাত্য জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারে নাই— কারণ পদে পদে ছিল রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বাধা— যে বাধা দূর করিবার সাধ্য ছিল না ভারতীয়দের।— we cannot accept even from them whom it is dangerous for us to contradict." (p 21)।

আসল কথা, পাশ্চাত্য জাতীয়তার মূলে ও কেন্দ্রে আছে বিরোধ ও বিজয়। অন্যের সহিত সে সর্বদাই বিরোধ বাধাইবার জন্য উৎসুক— সেই বিরোধের সুড়ঙ্গ হইতেছে তাহার বিজয়-সেনার যাত্রাপথ। সমাজের মধ্যে স্বাভাবিক সহযোগনীতি তাহাদের দ্বারা উপেক্ষিত—আধ্যাত্মিক আদর্শবাদ তাহাদের কাছে বিদ্রূপিত। সেইজন্য, যেসব দেশে নেশনের বোধ জাগে নাই সেখানে পাশ্চাত্য নেশনরা পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রচার করিতে অত্যন্ত কৃপণ। পরাধীন জাতির মধ্যে নেশন-বোধও তাহার স্বার্থের পরিপন্থী; কারণ, পাশ্চাত্য নেশনের সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত শক্তির উপর— সেই জন্য যেসব দেশ পাশ্চাত্য জাতির শোষণক্ষেত্র সেখানে এই শক্তিভাণ্ডারের সন্ধান তাহারা উন্মুক্ত করিতে অনিচ্ছুক। প্রসঙ্গক্রমে বলিতে পারি ভারতবর্ষ অসংখ্য জাতি ও ভাষার দ্বারা বিচ্ছিন্ন, তাদের মধ্যে মিলনের কোনো সমক্ষেত্র নাই— এই কথাটাই তাঁহারা অবিশ্রাম প্রচার করিয়া একটা তত্ত্বে পরিণত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নৈতিক বিধানে বিশ্বাসী। তাই তিনি বারে বারে বলিয়াছেন যে, দাসশ্রমের দৌলতে যাহারা বৃহৎ হয় তাহারা আপনার ভারেই ধ্বংসের পথে যাইবে। যেসব নেশন দুর্বলকে বঞ্চিত করিতেছে তাহারা এই ধ্বংসপথের যাত্রী। "Whenever Power removes all checks from its path to make its career easy, it triumphantly rides into its ultimate crash of death." (p 22)।

পাশ্চাত্য নেশন যেসব দেশে গিয়া বসিয়াছে সেখানে তাহারা law and order, শান্তি ও শৃঙ্খলা আনিয়াছে সত্য। কিন্তু এই শান্তি নঙাত্মক— স্টীম-রোলারের চাপে সমস্ত সমান হইয়া যাওয়ার মত— বন্ধুরতার চিহ্ন থাকে না সত্য— কিন্তু সেই সঙ্গে জমির উর্বরতাও লোপ পায়। প্রাক্‌বৃটিশ যুগে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ভালো ছিল না, কিন্তু আজকের বৃটিশের ভালো ভয়াবহরূপে ভালো— কারণ তাহা অত্যন্ত কড়া। প্রাচীন যুগে মানুষ জানিত অন্যায়ের প্রতিকার তাহারই হাতে; অসম্ভবের আশা কখনোই মানুষ ত্যাগ করিত না; কিন্তু আজ no-nationএর দেশে প্রত্যেকটি ব্যক্তি একটি প্রকাণ্ড নেশনের মুষ্টির মধ্যে নিষ্পিষ্ট হইতেছে। বিরাট শাসনযন্ত্রের অসংখ্য চক্ষুর কুৎসিত দৃষ্টি হইতে সে মুহূর্ত মাত্র মুক্ত নহে। এই অমানুষিক যন্ত্রের চাপে মানুষের কণ্ঠ আজ আর্তনাদ করিতেও শঙ্কিত। নিপীড়িত মানুষ আজ ত্রাসে মূক ও অসাড়; "And this terror is the parent of all that is base in man's nature." (p 29)। আজ নেশনও অমানুষ হইতে লজ্জা বোধ করে না, চতুর মিথ্যা কথাকে সে নিজের বুদ্ধিমত্তা বলিয়া গর্ব করে। ধর্মের নামে যে অঙ্গীকার সে করে তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া সে উড়াইয়া দেয়।

"The Nation, with all its paraphernalia of power and prosperity, its flags and pious

hymns, its blasphemous prayers in the Churches, and the literary mock thunders of its patriotic bragging, cannot hide the fact that the *Nation is the greatest evil for the Nation*, that all its precautions are against it, and any new birth of its fellow in the world is always followed in its mind by the dread of a new peril". (p. 29-30)।

আজ সভ্য নেশনসমূহ 'অসভ্য' জাতি-সমূহকে 'নেশন' হইবার উপদেশ দিবেন; কিন্তু সে কি যথার্থ মানুষের মত উপদেশ। যন্ত্রের বিরুদ্ধে যন্ত্র খাড়া করিতে থাকিলে কোথায় তাহার শেষ? "That machine must be pitted against machine, and nation against nation, in an endless bull-fight of politics?" (p. 31)।

রাষ্ট্রনীতিকদের বিশ্বাস যে, নেশনসমূহ পরস্পরের আত্মরক্ষার জন্য একটা মীমাংসায় উপনীত হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিবে। ১৯১৬র এই লেখা; তার পর প্রথম-যুদ্ধ শেষ হইল, কত সভা-সমিতি বসিল, লীগ অব্ নেশনস্ গঠিত হইল। কিন্তু কী তাহার পরিণাম হইল। মিথ্যার দ্বারা কি মিথ্যাকে রোধ করা গেল। হিংসার দ্বারা কি হিংসা প্রতিহত হইল। লীগ গেল, UNO কোনো শান্তি আনিতে পারিল?

দুর্বলের চিরন্তন প্রশ্ন— যে হতভাগ্য 'অসভ্য' নো-নেশন জগতে থাকিবে তাহাদের কে রক্ষা করিবে? নেশনসমূহ ক্রমে একত্র হইয়া যখন সর্বগ্রাসী লোভের মূর্তিরূপে বিশালকায় হইবে তখন যেসব জাতি শান্তভাবে নম্রভাবে দিন কাটাইয়াছে তাহাদের কী হইবে। পশ্চিম তাহার উত্তর দিয়াছে— সে বলে, অযোগ্যদের স্থান জগতে নাই, তাহারা মরিবেই।

রবীন্দ্রনাথ বলেন যে পশ্চিমের মুক্তির জন্যই এই দীনতমেরা বাঁচিয়া থাকিবে— এই হইতেছে সত্য। তিনি বলিলেন, আমি জোর করিয়াই বলিতেছি যে মানুষের জগৎ ধর্মনীতির জগৎ— ইহাকে উপেক্ষা করিলে সমাজ ধ্বংস পাইবে। পশ্চিম ব্যক্তিগত মানুষের জীবনকে শুকাইয়া দিয়া পেশাগত জীবটিকেই বড় করিয়াছে— The West "has all along been starving the life of the personal man into that of the professional". (p 33)।

কবির এই উক্তিটি গভীরভাবে চিন্তনীয়। য়ুরোপের মহাযুদ্ধে আমেরিকা তখনো যোগদান করে নাই— কবি য়ুরোপের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, আজ জগৎ বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিতেছে— এই বৈভব, এই সভ্যতার মধ্যে এ কী নিদারুণ মৃত্যুলীলা। ইহার উত্তরে কবি বলিলেন— য়ুরোপের রাষ্ট্রনীতি মানুষের— মর‍্যাল নেচার— নীতিবোধ একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া, কর্মকুশলতার বিরাট অবচ্ছিন্নতাকে তাহার স্থানে বসাইয়াছে। ইহা তাহারই মূর্তি। মানুষের এই দক্ষতা বা কর্মকুশলতার অন্তরালে আছে তাহার বুদ্ধি (Intellect); আমাদের জীবন, আমাদের অন্তঃকরণ আমাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ; কিন্তু আমাদের মন সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকভাবে ভাবিতে ও চলিতে পারে। বুদ্ধিযোগে বিজ্ঞান হয়, ভাবযোগে আর্ট হয়। বুদ্ধির দ্বারা সাহিত্যের ভাষা আয়ত্ত করা যায়। কিন্তু হৃদয় দিয়া সাহিত্যের ভাব অনুভব করিতে হয়। আজ মানুষ সেই বুদ্ধির দ্বারা বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করিয়া অসীম শক্তির অধীশ্বর। মানুষের নৈতিক বল আজ তাহার অশেষ বস্তুভারের চাপে নিষ্পিষ্ট। পাশ্চাত্য জগতের নেশনসমূহ, ধর্মনীতির অভাবে পৃথিবীময় যে অনাচার ঘটিতেছে, সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। বস্তুজগতের বৃহত্ত্ব তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে, নীতিজগতের মহত্ত্বের দিকে ফিরিবার অবকাশ তাহার নাই। ধনৈশ্বর্যের তলদেশে নৈতিক জগতের পরিপূর্ণ আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিপ্লবের ধূম্রাগ্নি জমিতেছে। মানুষের সার্থকতা শক্তিতে নহে— পূর্ণতায়; —"Man in his fullness is not powerful, but perfect". (p 36)।

সেই পরিপূর্ণ মানুষ কখনোই প্রতিবেশীর কণ্ঠচ্ছেদ করিতে পারে না। অথচ জগৎময় বাণিজ্যে ও রাষ্ট্রনীতিতে

মানুষকে অমানুষ করিবারই আয়োজন। ইহাই হইতেছে পশ্চিম দেশের 'নেশন'; মানুষে মানুষে অবিশ্বাস ও পরস্পরের প্রতি সন্দেহ হইতেছে ইহার মূলের কথা।

জাপান তো পশ্চিমের অনুকরণে 'নেশন' হইয়া উঠিয়াছে। সে 'নেশন' ছিল না বলিয়াই তো বিদেশীর নিকট একদিন লাঞ্ছিত হইয়াছিল। কিন্তু আজ যখন সে পরিপূর্ণ নেশনরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে তখন পশ্চিমের খুশিই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু জাপানের শক্তিমত্তায় আজ পশ্চিমের জাতি-সমূহের কী বিরক্তি, কী আতঙ্ক। জাপান বারবার ঘোষণা করিয়াছিল যে, সে আমেরিকার নিকট তাহার আধুনিক উন্নতির জন্য ঋণী— তাহার ক্ষাত্রধর্ম বা বুশিদো সে ত্যাগ করিতে পারে না— সে আমেরিকার প্রতি কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিবে না। কিন্তু আমেরিকা তো তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। কারণ আধুনিক নেশনধর্মে পরস্পরকে সন্দেহ করাই হইতেছে রাষ্ট্রনীতির মূল কথা। "Nation can only trust Nation where their interests coalesce, or at least do not conflict". (p 40)।

রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যতের রাজনীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া বলিলেন, "Do you believe that evil can be permanently kept in check by competition with evil, and that conference of prudence can keep the devil chained in the makeshift cage of mutual agreement?" (p 43)।

অধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত শক্তি কখনোই স্থায়ী হইতে পারে না; য়ুরোপের মহাযুদ্ধে নেশন-মানুষের স্বরূপটি দেখা দিয়াছে। ছিন্নভিন্ন খণ্ডিত মনুষ্যত্বের উপর 'নেশনে'র পাদপীঠ। বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ আজ নেশন-যন্ত্রের পুতুল— কেহ বা রাষ্ট্রনীতিক, কেহ বা সৈনিক, কেহ বা ব্যবসায়ী, কেহ বা বুরোক্রেটিক আমলা। সকলেই নেশন-যন্ত্রের পুতুলনাচের খেলনা। নেশন-তন্ত্রের শিক্ষায় ও শাসনে যে লোভ ও ঘৃণা, ভয় ও ভাণ্ডামি, সন্দেহ ও অত্যাচারমথিত দানব সৃষ্ট হইয়াছে তাহা দেখিতে বৃহৎ— কিন্তু কোথাও তাহার সৌন্দর্যের সুষমা নাই। কবির ভরসা যে ঐ মহাযুদ্ধই নেশনদানবের শেষকৃত্য করিবে, মানবের নবজন্ম হইবে—"that man will have his new birth, in the freedom of his individuality, from the enveloping vagueness of abstraction". (p 45)।

কবির স্বপ্ন সফল হয় রুশের নবজন্মে। অবশ্য তখন সে কথা কেহই কল্পনা করে নাই। কবির বিশ্বাস যে একদিন নো-নেশনের দল ইতিহাসকে পবিত্র করিবে— নেশনের পদক্ষেপে রক্তাক্ত ধরণীর দেহ পবিত্রোদকে পরিচ্ছন্ন করিবে।

জাপান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা এই বক্তৃতায় প্রকাশ হইয়া পড়ে। তিনি বলেন—'জাপান পশ্চিম হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, কিন্তু জীবনীশক্তি সে সেখান হইতে আনে নাই। জাপান পশ্চিম হইতে বিজ্ঞানের যে-সব উপকরণ আহরণ করিয়া আনিয়াছে, তাহার মধ্যে নিজেকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া সে নিজেকে একটা ধারকরা যন্ত্রে পরিণত করিতে পারিবে না।' কবির ভরসা যে জাপানের একটা আত্মা আছে এবং তাঁহার আশা যে সেই আত্মা তাহাকে সকল প্রয়োজনের উপর জয়ী করিবে। কবি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, 'আমাদের ঐকান্তিক আশা এই যে, জাপান যেন কদাচ তাহার বাহিরের সঞ্চয়ের জন্য নিজের আত্মাকে না হারাইয়া ফেলে। এইরূপ গর্ব বস্তুতঃই হেয়। এই হীনতা মানুষকে দারিদ্র্য ও দুর্বলতার মধ্যে লইয়া যায়।'

বর্তমান সভ্যতার হাত হইতে জাপান যে সুবিধা এবং দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে, তাহা লইয়া সে কী করিবে তাহাই দেখিবার জন্য সমস্ত জগৎ উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। যদি তাহা পশ্চিমের অনুকরণ মাত্রেই পর্যবসিত হয়, তবে তার সম্বন্ধে বিশ্বমানব যে আশা করিয়া আছে তাহা ব্যর্থ হইবে। পশ্চিম বিশ্বের সম্মুখে অনেক গুরুতর সমস্যা উপস্থিত

করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে পারে নাই। ব্যক্তির সহিত সমাজের, ধনীর সহিত শ্রমিকের, পুরুষের সহিত নারীর সংঘর্ষ সেখানে দিন দিন তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। সেখানে ঐহিক সুখলালসার সহিত আধ্যাত্মিক জীবনের, জাতিগত স্বার্থপরতার সহিত মনুষ্যত্বের উচ্চতর আদর্শের, রাজ্য ও বাণিজ্যের বিপুল ব্যবস্থার কার্যজটিলতার-সহিত মানুষের অন্তরাত্মার আকাঙ্ক্ষিত সরলতা সুষমা এবং অবকাশপ্রবণতার যে বিরোধ বাধিয়াছে, তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানই এখন বিশ্বের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই জাপানের কাছ হইতে এই সমস্যার মীমাংসা প্রত্যাশা করিতেছে।

এই পশ্চিমের সভ্যতার অপরিমেয় সঞ্চয়ের ভারে আজ যে তাহার নিজেরই শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহার লক্ষণ সেখানে ফুটিয়া উঠিতেছে।··· অতএব এই পশ্চিমের সভ্যতাকে নির্বিচারে একেবারে লঘুভাবে গ্রহণ করা কোনোমতেই শ্রেয় হইতে পারে না। ইহার উদ্দেশ্য, ইহার উপায় এবং ইহার উপকরণকে আজ যদি আমরা অপরিহার্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, তাহা হইলে বস্তুতই সাংঘাতিক ভুল করা হইবে।

যে রাজনৈতিক সভ্যতা য়ুরোপের মাটি হইতে উঠিয়া আজ সমস্ত বিশ্বকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, বর্জন ও সংহারই তাহার ভিত্তি। সে সকলকে দূরে রাখিতে অথবা নির্মূল করিতে উদ্যত। ইহা পরস্বাপহরণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। যাহারা দুর্বল তাহাদিগকে দুর্বলতার মধ্যে চিরদিনের জন্য বদ্ধ করিয়া রাখিতে চায়। আজ যেন একটা প্রকাণ্ড হিংসা সমস্ত পৃথিবীকে লণ্ডভণ্ড করিবার জন্য তাহার জঘন্য নখদন্তকে বিস্তার করিতেছে। ইহা স্বার্থের জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করিতে বা মিথ্যার জাল বুনিতে লজ্জাবোধ করে না; ইহা লোভকে দেবতার আসনে বসাইয়া দেশভক্তির অঞ্জলি দিয়া তাহাকে পূজা করে। যাহাই হউক, ইহা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এরূপ ব্যাপার বরাবর চলিতেই পারে না।[১]

এই দুইটি বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ জাপান সম্বন্ধে তাঁহার আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা খুবই স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। অন্যত্র তাহার আলোচনা হইয়াছে।

২

১৯১২-১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে যে বক্তৃতাগুলি দেন, তাহা *Sadhana* নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সালে। সেই প্রবন্ধগুলির মূল হইতেছে প্রধানত শান্তিনিকেতন-উপদেশমালা। কিন্তু এবারকার বক্তৃতায়— যাহা *Personality* গ্রন্থে প্রকাশিত হইল (১৯১৭ মে)— তাহা একহিসাবে কবির আত্মধর্মবোধের কথাই। বলা যাইতে পারে, এই রচনাগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বরূপের যথার্থ রূপটি ফুটিয়াছে— এককথায় কবি ও মনীষীর যুগ্মমূর্তি একাধারে পাই। মানুষ যখন তাহার অখণ্ড ব্যক্তিসত্তার মধ্যে সংশ্লিষ্ট সত্যের সন্ধান পায়, তখন সে বস্তু ও অবস্তু, বিষয় ও বিষয়ী, appearence and reality-র মধ্যে যথাযথ সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতে পারে। বাণী ও ব্যবহারের দুর্লঙ্ঘ্য ভেদের মধ্যে সেতু নির্মাণ করিয়া সে তাহার দ্বৈত জীবনকে অদ্বৈতরূপে দেখিতে পারে। কবির *Personality*-র প্রবন্ধগুলি সেই ভাবরাজি-দ্যোতক। পার্সন্যালিটি শব্দের দার্শনিক অর্থ কী তাহা এক কথায় বলা যায় না। ব্যক্তিসত্তা ব্যক্তিস্বরূপ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা উহার অনুবাদ করা গেলেও অর্থ পরিষ্কারে বিশেষ সহায়তা পাওয়া যায় না। ভারতীয় শাস্ত্রমতে উহাকে জীবাত্মা বলা যায় কি না, তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "the reality of the world belongs to the personality of man and not to reasoning, which, useful and great

১ জাপানের জাতীয়তা (রবীন্দ্রনাথের Nationalism in Japan শীর্ষক প্রবন্ধের অনুবাদ)-অনুবাদক শ্রীঅমূল্যরতন প্রামাণিক। সবুজ পত্র ৮ম বর্ষ ১৩২৮-২৯ চৈত্র-বৈশাখ সংখ্যা, পৃ ৪৭৩-৮৯।

though it be, is not the man himself" (*Personality*, p 52)। বিশ্বের নিগূঢ়তত্ত্ব মানুষের কেবলমাত্র যুক্তি-বুদ্ধির নিকট প্রতিভাত হয় না, তাহা প্রকট হয় তাহার অনুভূতির কাছে ; ইহাকেও কবি পার্সন্যালিটি বলিয়াছেন।[১]

এই গ্রন্থে কবি আলোচনা করিয়াছেন 1. What is Art? 2. The World of Personality, 3. The Second Birth, 4. My School, 5. Meditation, 6. Woman। এখন দেখা যাক এই প্রবন্ধগুলি কোনো যোগসূত্রে বাঁধা পড়িয়াছে কি না। রবীন্দ্রনাথ কবি ও শিল্পী বা ভাবুক ও কর্মী। তিনি বিশ্বাস করেন life is art and art is life অর্থাৎ জীবনটা হইতেছে সু-সম ছন্দবদ্ধ গতি ; গতির তালে সৃষ্টি জাগে। ছন্দ ভাঙিলেই অনা-সৃষ্টি। সেইজন্য তিনি প্রথমেই আর্ট কী তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কারণ আর্ট হইতেছে ভাব ও রূপের সমবায়ের সৃষ্টি— ভাবনার এক রূপ হইতেছে সাহিত্য, আর-এক রূপ হইতেছে কলা বা বস্তুসৃষ্টি। কবির ভাষায় বলি—

মানুষের লক্ষ লক্ষ অলক্ষ্য ভাবনা,
অসংখ্য কামনা,
রূপে মত্ত বস্তুর আহ্বানে উঠে মাতি
তাদের খেলায় হতে সাথী।
স্বপ্ন যত অব্যক্ত আকুল
খুঁজে মরে কূল :···
চিত্তের কঠিন চেষ্টা বস্তুরূপে
স্তূপে স্তূপে
উঠিতেছে ভরি—
সেই তো নগরী।...
অস্ফুট ভাবনা যত···দেয় পাড়ি···
...ব্যগ্র ঊর্ধ্বশ্বাসে
আকারের অসহ্য পিয়াসে।[২]

দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের বা রূপ ও অরূপ বিশ্ববোধের সেতু হইতেছে আমার অহংবোধ বা Personality। এই অহং-এর অনুভূতি ও প্রকাশ হইতেছে আর্ট। অহং-এর স্বরূপটি আর্টের মধ্যে মুক্তিলাভ করিয়াছে, উহার দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইয়াছে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় তৃতীয় ও পঞ্চম প্রবন্ধে। এই ব্যক্তিস্বরূপের বিকাশের মুখে শিক্ষালয়, ইহার প্রয়োগক্ষেত্র সমাজ ; তাই My School ও Woman প্রবন্ধদ্বয় উহাতে স্থান পাইয়াছে। ভারতীয় আদর্শে ব্রহ্মচর্যে যাহার আরম্ভ, সংসারাশ্রমে তাহার পরিণতি। তাই কবি বিদ্যাশ্রম ও নারী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এই একই গ্রন্থে। *Personality*র প্রথম প্রবন্ধ What is art নানাদিক হইতে বিশেষভাবে বিচার্য। কবি আর্ট সম্বন্ধে টুকরা টুকরা মন্তব্য বহুস্থানে করিয়াছেন ; কিন্তু আমাদের আলোচ্য পর্ব পর্যন্ত (১৯১৭) আর্ট সম্বন্ধে তাঁহার মতামত কোনো বিশেষ প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করেন নাই। জাপানযাত্রার পূর্বে 'ছবির অঙ্গ' (সবুজ পত্র ১৩২২ বৈশাখ) শীর্ষক যে একটি প্রবন্ধ লেখেন, তাহাকে আর্টের আলোচনা বলা যাইতে পারে না ; কারণ চিত্রবিদ্যা হইতে আর্ট

১ Shipley পার্সন্যালিটি সম্বন্ধে বলিতেছেন— The unique sum of the characteristics of an individual, manifest in the work whether 'objective' or 'subjective'.

২ বলাকা ১৬, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২, পৃ ৩৫-৩৬।

বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বহু বৎসর পূর্বে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের আহ্বানে যে কয়টি বক্তৃতা করেন (দ্র. সাহিত্য) তাহাতে সৌন্দর্যতত্ত্ব (Aesthetics) সম্বন্ধে আলোচনা পাই বটে, কিন্তু এস্‌থেটিকসও আর্টের অংশমাত্র।

সৌন্দর্য চিরদিনই সাহিত্যিক কবিদের বোধের ও সৌন্দর্যতত্ত্ব চিরকালই তত্ত্বজ্ঞানী দার্শনিকদের বিচারের বিষয় হইয়া আসিয়াছে। পাশ্চাত্যদেশে কবিদের মধ্যে শেলি, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, গ্যেটে, শিলার, লেসিং প্রভৃতি অনেকেই, এবং দার্শনিকদের মধ্যে প্লাতো-প্রমুখ প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর ইহার আলোচনায় যোগ দিয়াছেন। তবে আধুনিকযুগে জারমান দার্শনিক ইমান্থয়েল কাণ্টই উহাকে দর্শনোপযোগী করিয়া বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ কবি ও জীবনশিল্পী ; তাঁহার ভাষণের নির্গলিত বাণী life is art and art is life, অর্থাৎ জীবন একটি সুসম সৃষ্টি, এবং সুসমতাই কলা। কবির কাছে তাঁহার জগতের সর্বাপেক্ষা বড় প্রকাশ হইতেছে এই জীবনশিল্প।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে 'আর্ট কী' তাহার সংজ্ঞা (definition) নিরূপণের চেষ্টা করেন নাই। What is Art -এর প্রশ্ন যুগযুগান্তের মানব-জিজ্ঞাসা। বর্তমান কালে টলস্টয় এই প্রশ্ন তুলিয়া প্রথম গ্রন্থ লেখেন গত শতাব্দীর শেষাংশে। ১৯১২ সালে আমেরিকার Rice institute উন্মোচন কল্পে যে সভা আহূত হয়, তাহাতে ইতালীয় দার্শনিক বেনেদিত্তো ক্রোচে (Croce) ঐ প্রশ্নই উপাপন করেন। (দ্র, The Essence of Aesthetics)। ক্রোচের মতে উহা অনুভূতি-অন্তর্দৃষ্টি (intuition-expression)। গ্রন্থে প্রশ্ন তুলিয়াছেন বটে, কিন্তু শেষ উত্তর দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। আর্টের সংজ্ঞা দান করা যায় না, কারণ,ক্রোচে বলিলেন, "the question as to what is art, I will say at once, in the simplest manner, that art is vision or intuition." বলা বাহুল্য ইহা সংজ্ঞানির্ণয় নহে। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'আর্ট জীবনের ন্যায় আপনার বেগে গড়িয়া উঠিতেছে, মানুষ আর্টে আনন্দ পায়, অথচ সে জানে না উহা কী।' "Art, like life itself, has grown by its own impulse, and man has taken his pleasure in it without definitely knowing what it is. ...Therefore, I shall not define Art." (*Personality* p. 5, 7)।

কবি আর্টের সংজ্ঞাদান করিবেন না, কারণ তাহা হইলে আর্টের রাজ্যে conscious purpose বা ইচ্ছাকৃত উদ্দেশ্য আসিয়া পড়িবে। তখন হইতে উহা আর vision বা intuition অথবা অন্তর্দৃষ্টি বা স্বতঃবোধসঞ্জাত সত্য থাকিবে না, উদ্দেশ্য পদে পদে সৃষ্টিকে প্রতিহত করিবে— শিল্পরচনা উদ্দেশ্যমূলক হইবে ; এবং যে-মুহূর্তে রচনার মধ্যে উদ্দেশ্য প্রবেশ করিবে তখনই তাহাকে স্পষ্ট ও বাস্তব করিবার দিকে কবি বা শিল্পীর সমস্ত মন উদগ্র হইয়া উঠিবে। তখন উহা creation হইবে না, construction হইবে।

কিন্তু সত্যপ্রকাশের জন্য স্পষ্টতা যে অনিবার্য এ কথা যথার্থ নহে— "clearness is not necessarily the only, or the most important, aspect of truth". (p 6)। কবির এই উক্তির সমর্থন পাই এডমান্ড বার্কের লেখায়— তিনি বলেন, ' a clear idea is another name for a little idea'।[১] বৃটিশ শিল্পী ও মনীষী জোশুয়া রেনল্ডস -এর মতে 'obscurity is one sort of the sublime,'[২] আর্ট রাহস্যিক, অস্পষ্ট হইবেই কারণ সেখানে ব্যক্তিগত

১ Quoted from Carritt, *Philosophies of Beauty*, p. 90-97.

২ The whole theory of beauty had to assume a new shape. Beauty in the traditional sense of the term is by no means the only aim of art ; it is in fact but a secondary and derivative feature.—Ernst Cassirer, ***An essay on man***, p. 140.

"They try to make you believe that the fine arts arose from our supposed inclination to beauty the world around us. That is not true."—Goethe quoted by Cassirer।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা জগতের মনীষীদের চিন্তাপদ্ধতির সহিত সমপথাশ্রয়ী।

অনুভূতি আত্মমুক্ত। শিল্পে ও সাহিত্যে এই অস্পষ্টতার (obscurity) মূর্তি হইতেছে রহস্যবাদ (mysticism) ও রূপকবাদ (symbolism)। রূপ রূপকে পরিণত হইলে প্রকাশ-ভঙ্গির চরমতা— এ মত নূতনও যেমন, পুরাতনও তেমনি।

আর্টের সংজ্ঞা নিরূপণ করা গেল না, কিন্তু উহার উদ্দেশ্য (object) কী সে-সম্বন্ধে প্রশ্ন করা যাইতে পারে। কবি বলিতেছেন আর্টের উদ্দেশ্য expression of personality (p 19) অর্থাৎ ব্যক্তিস্বরূপের প্রকাশ। জগৎকে অবচ্ছিন্নভাবে দেখাও যেমন ব্যর্থ, জগতকে বিশ্লিষ্টভাবে দেখার চেষ্টাও তেমনি নিষ্ফল। একদল দার্শনিকের অবচ্ছিন্ন দৃষ্টিও যেমন অলীক, বিজ্ঞানীদলের বস্তুবিশ্লেষণও তেমনি মায়িক। দর্শন ও বিজ্ঞানের সেতু হইতেছে আর্ট। ছন্দে সুরে রূপে ব্যক্তে অব্যক্তে রূপকে মিশিয়া গিয়া আপনাকে প্রকাশ করাই হইতেছে আর্টের উদ্দেশ্য— কোনো ব্যাবহারিক প্রয়োজনসিদ্ধি নহে।

প্রাচীনকাল হইতে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত য়ুরোপে আর্টের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সৌন্দর্যসৃষ্টি। আমাদের দেশেও চিত্র স্থাপত্য এমন-কি সাহিত্যের নায়ক-নায়িকারা পর্যন্ত বিশেষ ছাঁচে-ঢালা ভাবের প্রতীক। কি শিল্পশাস্ত্র কি অলংকারশাস্ত্র ইহাদের সকলকেই বিশেষ বিশেষ category বা শ্রেণীর মধ্যে ফেলিয়া নামাঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। এইসব শাস্ত্রসম্মত সৃষ্টিকে আমরা বলি সনাতন সৃষ্টি বা classical art। য়ুরোপে রুশো (Rousseau) আর্টের সনাতনী শৈলীর বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করেন— তিনি বলেন characteristic artএর কথা। তখন হইতে সৌন্দর্য-প্রকাশই যে আর্টের একমাত্র উদ্দেশ্য এই ধারণার পরিবর্তন শুরু হইল। রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন আর্টের উদ্দেশ্যই সৌন্দর্যসৃষ্টি, এই লইয়া আমাদের মনে ভারি একটা গণ্ডগোল আছে। "This has led to a confusion in our thought that the object of art is the production of beauty; whereas beauty in art has been the mere instrument and not its complete and ultimate significance." (*Personality*, p. 19)।

আর্টের উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি না হইতে পারে কিন্তু আর্টের উদ্‌ভব কেন হইল সে প্রশ্নের উত্তর তো চাই। রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষের আছে 'a fund of emotional energy'। এই অতিরিক্ত (surplus) 'seeks its outlet in the creation of Art, for man's civilization is built upon his surplus' (p. 11)। মানুষের ভাবনারাশি আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যথিত ; এই বেদনা অহেতুকী—বাহিরের ধনমান-নিরপেক্ষ। বাহিরের আঘাত ও অভিঘাতে শিল্পীর মানসলোকে এই বেদনা আবেগময়ী হইয়া সৃষ্টির মাঝে সার্থক হয়। কিন্তু যে মুহূর্তে muse বা কলালক্ষ্মী আবির্ভূতা হন, প্রয়োজনের তাগিদে-যে কবি শিল্পসৃষ্টিতে ব্রতী হইয়াছেন অথবা আঘাতের অভিমানে লেখনী গ্রহণ করিয়াছেন, এই বাস্তব তথ্য তৎক্ষণাৎ মনের অন্তরালে চলিয়া যায়। অবচেতনে থাকিয়া তাহারা শিল্পীকে চালনা করিতে পারে, কিন্তু শিল্পী তাহাদের আর দেখিতে পান না। তখন ব্যাবহারিকতার মিতাচার আমরা ভুলিয়া যাই, তখন আমাদের সমস্ত সত্তা সুরে ধ্বনিয়া উঠে, মন্দিরের চূড়া আকাশকে স্পর্শিবার জন্য ঊর্ধ্বগামী হয়।' (*Personality*, p. 17)[১]। যে উদ্‌বৃত্ত আবেগ হইতে আর্টের জন্ম তাহাকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলিয়াছেন 'The spontaneous overflow of powerful feelings— emotional forces-এর এই উদ্‌ভব্ কেন্দ্র সম্বন্ধে' কবি বলিতেছেন—"the region where both our faculties of creation and enjoyment have been spontaneous and half-conscious" (p 5)। ক্রোচে ইহাকেই বলিয়াছেন intuition, vision।

১ "Life is perpetually creative because it contains in itself that surplus which overflows the bounderies of immediate time and space, restlessly pursuing its adventures of expression, in the varied forms of self-realisation."—Rabindranath Tagore, The meaning of Art (Dacca University Lecture, 1925).

প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রাচুর্যেই আর্টের জন্ম এ তত্ত্ব অধিকাংশ কলাশাস্ত্রী ও দার্শনিকদের দ্বারা স্বীকৃত। কিন্তু একদল বলেন প্রয়োজনের চাহিদা পূরণ করিতে না পারিলে আর্ট নিষ্ফল। দার্শনিক প্লাতো (Plato) বহু শতাব্দী পূর্বে বলিয়াছিলেন 'the useful is the art'। ঠিক উলটা কথা বলেন আর্টসর্বস্ববাদী বা art for art's sake -মতবাদের পূজারীরা। এই মতের পৃষ্ঠপোষকদের অন্যতম অস্কার ওয়াইলড বলিয়াছেন all art is useless।

রবীন্দ্রনাথের পুরাতন বহু রচনা 'আর্টের খাতিরে আর্ট'-মতবাদের সমর্থনে রচিত বলিয়া প্রমাণ করা যায়— এমনকি তাঁহার পত্রাদি হইতে এই মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু তথাকথিত শিল্পী-সাহিত্যিকদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের ঔদ্ধত্য তাঁহার দ্বারা সমর্থিত হয় নাই; কারণ তাঁহার সৌন্দর্যবোধে তাহা বাধিত। রবীন্দ্রনাথের আর্টধর্ম কিভাবে সত্যম্ শিবম্ ও সুন্দরমে মিলিত হইয়া সাহিত্যের নবতর সম্পদরূপে কল্যাণরূপে প্রকাশিত হইল, তাহার আলোচনা পূর্বে হইয়া গিয়াছে। জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধগুলি তাহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। What is Art প্রবন্ধে কবি বহু-নিন্দিত art for art's sake মতবাদের নবতম ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। আধুনিক লেখকদের মধ্যে টলস্টয় এই আর্টসর্বস্ব মতবাদের তীব্র প্রতিবাদী। রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর লেখকদের মতবাদকে সমালোচনা করিয়া বলিলেন যে য়ুরোপে puritanic যুগের সন্ন্যাসাদর্শ নূতনভাবে এ যুগে দেখা দিতেছে (recurrence of the ascetic ideal of the puritanic age)। কবির মতে এই শুচিতাবাদ (puritanism) হইতেছে প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। তাঁহার মতে মানুষ যখন জীবনের সহিত স্বাভাবিক সংযোগ হারায় তখনই সে ভালোমন্দ লইয়া খুঁৎখুতানি করিতে শুরু করে। তখন সে কৃচ্ছ্রতাকে বৃহৎ করিয়া দেখে এবং সুখ ও আনন্দকে মায়ার ফাঁদ বলিয়া প্রচার করে।[১] অস্কার ওয়াইলডের মতে আর্টের মূলকথা the clearance of all moral consideration, অর্থাৎ আর্ট সুনীতিও নয় দুর্নীতিও নয়— আর্টিস্ট সুন্দরভাবে যাহা প্রকাশ করিবেন তাহাই আর্ট।

ক্রোচে টলস্টয়ের সহিত অনেক বিষয়েই মেলেন না; কিন্তু আর্টসর্বস্ববাদীদের ভর্ৎসনায় তিনিও অকরুণ হইয়াছেন। "the basis of all poetry is human personality and since human personality finds its completion in morality, the basis of all poetry is the moral consciousness."[২] রবীন্দ্রনাথ তো আজন্ম এই কথাই বলিয়া আসিয়াছেন; আর্টের অহেতুকী প্রেরণাকে স্বীকার করিয়া ধর্ম ও নীতিকে বজায় রাখাই যথার্থ আর্টিস্টের কাজ। আর্টের মধ্যে যে কঠোর সংযম প্রয়োজন, এ কথা রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের প্রবন্ধগুলিতে বারে বারে বলিয়াছেন। "যদি সৌন্দর্যভোগ করিতে চাও, তবে ভোগবিলাসকে দমন করিয়া শুচি হইয়া শান্ত হও।"[৩] 'প্রবৃত্তির ঘূর্ণিনৃত্যের প্রলয়োৎসবে' য়ুরোপের সাহিত্যেও কলার কী দুর্গতি হইয়াছে তাহা টলস্টয় অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। তাঁহার মতে যে-আর্টের নিকট ধর্ম ও নীতি লাঞ্ছিত তাহা সত্য আর্ট নহে। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "উত্তেজনাকেই আনন্দ ও বিকৃতিকেই সৌন্দর্য বলিয়া" ভুল করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক; কিন্তু "সৌন্দর্যবোধকে পূর্ণভাবে লাভ করিতে হইলে চিত্তের শান্তি চাই।"[৪]

১ "When enjoyment loses its direct touch with life, growing fastidious and fantastic in its world of elaborate conventions, then comes the call for renunciation which rejects happiness itself as a snare."—*Personality*, p 8.

২ Aesthetics— *Encyclopaedia Britanica*, 14th ed.

৩ তুঃ সতীশচন্দ্র রায়ের গুরুদক্ষিণা গল্পের কথা।

৪ সাহিত্য, পৃ ৩৪। প্রথম প্রকাশ ১৩১৪; সৌন্দর্যবোধ, সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৮, পৃ. ৩৬২।

আর্টে শুচিতাবাদ সম্বন্ধে যে বিরূপ মন্তব্য কবি এখানে করিতেছেন, তাহার সহিত জাতীয় শিক্ষাপরিষদে তাঁহার সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতায় শুচিতা সম্বন্ধে মতের সামঞ্জস্য করা যায় কি না সন্দেহ; রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে conventional বা স্থাবরপন্থী না হইয়া বরং প্রচণ্ডভাবে 'আধুনিক' প্রগতিপন্থী হইয়া উঠিয়াছিলেন— যাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ

চিত্তের শান্তি বা মনের আনন্দ-অবস্থা কখন হয়— এ প্রশ্ন আর্টের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। সুর ও রূপে রসসৃষ্টির জন্য একটি বস্তুবিরল রিক্ততার প্রয়োজন; ইহাই কবির অবকাশতত্ত্বের কথা। কবি একদিনের ডায়েরিতে লিখিয়াছেন, "আজকালকার দিনে সেই অবকাশ নেই, তাই এখনকার লোকে সাহিত্য বা কলাসৃষ্টির সম্পূর্ণতা থেকে বঞ্চিত। তারা রস চায় না, মদ চায়; আনন্দ চায় না, আমোদ চায়। চিত্তের জাগরণটা তাদের কাছে শূন্য, তারা চায় চমকলাগা।"[১] সরলতা স্বচ্ছতা যে আর্টের যথার্থ আভরণ, তা লোকে প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে; তাই আর্ট চমক লাগাইবার কাজে মত্ত, কসরৎ দেখাইবার প্রলোভনে মজিয়াছে। কবির মতে আর্ট চীৎকার নয়, "তার গভীরতম পরিচয় হচ্ছে তার আত্মসংবরণে।"

টলস্টয় ও ক্রোচে 'আর্টের খাতিরে আর্ট'-এর সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে ঐ মতবাদের আদৌ সমর্থন করা যায় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে। তিনি বলিলেন, "I believe in a spiritual world— not as anything separate from this world— but as its innermost truth।" এই মতবাদ কবি বহুস্থানে প্রকাশ করিয়াছেন (My School); আর্টিস্টরা জীবনের স্বাভাবিকতাকে অস্বীকার করিয়া আপনাদিগকে অলীক আর্ট-জগতের জীব বলিয়া কল্পনা করেন, তাহা আদৌ সমর্থনযোগ্য নহে; কবি বরাবরই ঐ শ্রেণীর আর্টিস্ট, যাহাদের সম্বন্ধে Croce বলিয়াছেন, who close their hearts to the troubles of life and the cares of thought— তাহাদের সমালোচনা করিয়াছেন। ধর্ম ও নীতিকে বিসর্জন দিয়া অ-সম জীবনে সু-সম শিল্প সৃষ্ট হয় না। রবীন্দ্রনাথ স্বীয় জীবনে অহেতুকী আর্টের সেবা করিয়া বাস্তব জীবনকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। জগৎকে পাশ কাটাইয়া, জীবনকে অবচ্ছিন্ন সৌন্দর্যলোকের তুরীয়তার মধ্যে অতিবাহিত করিবার কোনো সুযোগ তাঁহার ছিল না। জগতের যথাযথ স্থানে যথাযথ বস্তু বা বিষয়ে যথাযথ সময়ে সন্নিবেশই হইতেছে সু-সমতা বা সৌন্দর্য— সেখানে প্রয়োজন ও সৌন্দর্য মিলিত। এই শুভ সুন্দর অখণ্ড দৃষ্টি হইতেছে রবীন্দ্রজীবনের দর্শনতত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথ আর্টিস্ট— এই একটি শব্দের মধ্যে জীবনের সমগ্র রূপটি ফুটিয়া ওঠে।

Art is expression— এইটাই হইতেছে আর্টের যথার্থ সংজ্ঞা, অর্থাৎ আমাদের নয়ন-সমক্ষে যে রূপের জগৎ প্রতিভাত হইতেছে— তাহা যতক্ষণ আমার ব্যক্তিগত অনুভূতির মধ্যে থাকে, ততক্ষণ তাহাকে আর্ট বলা যায় না, প্রকাশেই আর্ট। "অন্তরের অহেতুক আনন্দকে বাহিরে প্রত্যক্ষগোচর করার দ্বারা তাকে পর্যাপ্তি দান করবার যে চেষ্টা" তাকে কবি লীলা আখ্যা দিয়াছেন।[২] কবি বলিতেছেন, "আমি আমার সৌন্দর্য-উজ্জ্বল আনন্দের মুহূর্তগুলিকে ভাষার দ্বারা বারম্বার স্থায়িভাবে মূর্তিমান করাতেই ক্রমশই আমার অন্তর্জীবনের পথ সুগম হয়ে এসেছে।" …"আত্মপ্রকাশের পূর্ণতাতেই মুক্তি।"…"সৃষ্টি মোর সৃষ্টি সাথে মেলে যেথা সেথা পাই ছাড়া"।

শিল্প ও সাহিত্যের সাধনায় 'মানুষের চিত্ত আপনাকে বাহিরে রূপ দিয়া সেই রূপের ভিতর হইতে পুনশ্চ আপনাকে

'ল্যাবরেটরি' গল্প— যেখানে শুচিতাবাদ জীবন হইতে বিশেষভাবেই বাদ পড়িয়াছে; কিন্তু সমস্ত গল্পটি যে একটি আর্ট-সৃষ্টি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কবির মর্মগত শুচিতাবাদ, যাহা ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত— তাহা তাঁহার লেখনীকে কখনো উচ্ছৃঙ্খল হইতে দেয় নাই। কবির মতে আর্টের গভীরতম পরিচয় হইতেছে তাহার আত্মসংবরণে। অতি শুচিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা— উভয়কেই দূরে রাখিয়া যে মধ্যপথ অবলম্বন করিতেন তাহাই ছিল তাঁহার আর্টিস্ট জীবনের আদর্শ পথ— আত্মসংবরণে যাহার ভিত্তি। শুচিতাবাদ জীবনের আঙ্গিক হইলেও, জীবনকে তিনি উচ্ছৃঙ্খল riotous করিতে পারেন নাই; সেখানেই তাঁহার রুচিতে বাধে।

১ যাত্রী ১৩৩৬, পৃ ৫৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ. ৩৯৪।

২ তথ্য ও সত্য, সাহিত্যের পথে, আশ্বিন ১৩৪৩, পৃ ৩৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, পৃ. ৩৮৩।

ফিরাইয়া দেখিতেছে।' —রূপ ও অরূপ। সেইজন্য কবি বলিলেন, ' in Art, man reveals himself and not his objects'— *Personality*, p 12।

বাহিরের বিচিত্র রূপরাশি ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া নিত্য প্রবেশ করিতেছেন— এই অগণিত বস্তুরাশির মধ্য হইতে যাহা গ্রাহ্য তাহা মন গ্রহণ করিতেছে, যাহা বর্জনীয় তাহা ত্যাগ করিতেছে। গ্রহণ ও বর্জন করে মনের রুচিবোধ (taste); 'কেন ভালো লাগিল'— ইহার উত্তর দেওয়া কঠিন; আমার যাহা ভালো লাগিল, অন্যের তাহা ভালো লাগিল না। সুতরাং এই রুচি হইতেছে আর্টের একটি বড় রকম জিজ্ঞাসা। সমগ্র সৃষ্টি ও কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে এই রুচির কথাই সর্বাগ্রে মনকে স্পর্শ করে। পারিবারিক পারিপার্শ্বিক শিক্ষাদীক্ষা প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বরূপে বিকশিত হইবার পক্ষে সহায়তা করে এবং সেই সমষ্টিগত রূপটি হইতেছে তাহার personality। সেইজন্য আর্টকে মানুষের চরম আত্মপ্রকাশ বলা যাইতে পারে।

"বিশ্বের যেখানে প্রকাশের ধারা, প্রকাশের লীলা, সেখানে যদি মনটাকে সম্পূর্ণ করে ধরা দিতে পার তা হলেই অন্তরের মধ্যে প্রকাশের বেগ সঞ্চারিত হয়— আলো থেকেই আলো জ্বলে। দেখতে-পাওয়া মানে হচ্ছে প্রকাশকে পাওয়া।···বিশ্বের প্রকাশকে মন দিয়ে গ্রহণ করাই হচ্ছে আর্টিস্টের সাধনা।"[১]

৩

রবীন্দ্রনাথের ১৯১২ সালের য়ুরোমেরিকা ভ্রমণ ও ১৯১৬ সালে জাপান-মার্কিন মুল্লুক ভ্রমণের মধ্যে একটি নিগূঢ় কথা আছে। উহার সুন্দর বিশ্লেষণ করেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল; ১৩২৪ সালের শ্রাবণ মাসে (১৯১৭) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে কবির যে সম্বর্ধনা হয়, তাহাতে ব্রজেন্দ্রনাথ এই ভ্রমণদ্বয়ের এক ব্যাখ্যা করেন— আমরা সেই ভাষণ হইতে কিয়দংশ উদ্‌ধৃত করিতেছি।[২]

"এইবারের পূর্ববারে রবীন্দ্রনাথ যখন ইউরোপে গিয়াছিলেন, তখন···তিনি 'তীর্থযাত্রী'র মত গিয়াছিলেন এবং সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন 'গীতাঞ্জলি' এবং গীতাঞ্জলি বলিতে যে বস্তু বুঝায়। ভগবানের সহিত আত্মার লীলার যে একটি দিক্ আছে, প্রকৃতিতে জীবনে এবং সামাজিক নানা সম্বন্ধের ভিতর দিয়া যে লীলার বিচিত্র প্রকাশ এবং যে লীলাতত্ত্ব ভারতবর্ষের অনেক কালের সাধনার ফল— সেবারে সেই বস্তুটিকে তিনি 'গীতাঞ্জলি'র ভিতর দিয়া পশ্চিমে লইয়া গেলেন। ইউরোপের সমস্যা-প্রপীড়িত ব্যস্ততাসংকুল ব্যক্তি-জীবনে যে শান্তিরসের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, তিনি সেখানে তাহারি উৎস উৎসারিত করিয়া দিলেন। কিন্তু সেখান হইতে তিনি লইয়া আসিলেন কি? সেখান হইতে তিনি লইয়া আসিলেন একটা বড় অশান্তি, একটা ঝঞ্ঝাবাত, একটা storm and stress (strüm und drang), যাহা আজ প্রাচ্যে ব্যক্তিজীবনের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। যে-সকল অর্থহীন সামাজিক নিগড় ব্যক্তিকে ক্রমাগত সংকুচিত করিয়া বিশ্বমানবের দিকে তাহার বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করিতেছে, সতেজে সংগ্রাম করিয়া সে-সমস্ত ভাঙিয়া-চুরিয়া ব্যক্তিকে মুক্তির পথে বাহির হইতে হইবে; সেই উন্মুক্ত মার্গের সন্দেশ তিনি সমুদ্রপথে বহিয়া আনিয়াছেন। এ ভাব পূর্বে তাঁহার রচনায় সৌন্দর্যানুভূতি ও রসানুভূতির দিক্ দিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল বটে। কিন্তু সম্প্রতি, যে-ক্ষেত্রে ব্যক্তির সহিত সমাজের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, সেই ক্ষেত্রে এই ভাবটিকে অবতরণ করাইয়া এবং তাহাকে রক্তমাংসে সজীব করিয়া, জীবনের সঙ্গে গ্রথিত করিয়া, আমাদের সম্মুখে তিনি উপস্থিত করিয়াছেন। পূর্বের সহিত বর্তমানের এইখানে পার্থক্য।

১ যাত্রী, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৫, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৯, পৃ. ৪৫১।

২ প্রবাসী ১৩২৪ ভাদ্র, পৃ ৪৩৩-৪৩৪।

"তারপরে এবার যে তিনি জাপানে ও আমেরিকায় গেলেন, এবারেও তিনি ভারতবর্ষ হইতে পশ্চিমের জন্য একটা বড় message লইয়া গেলেন। পশ্চিম-মহাদেশে সমাজের যত-কিছু সমস্যা জমিয়া উঠিয়াছে, যথা Capital and Labour problem (ধন ও শ্রম সমস্যা), State and Individual problem (রাষ্ট্র ও ব্যক্তি সমস্যা), International problem (আন্তর্জাতিক সমস্যা), ইত্যাদি— সে সমস্যা ঘনীভূতরূপ (concentrated form) লাভ করিয়াছে তাঁহার এবারকার বাণীটিতে। যে সকল প্রচণ্ড সমস্যার আঘাতে ইউরোপীয় সমাজ আজ একেবারে বিধ্বস্ত ও অশান্তিময় হইয়া পড়িয়াছে, ভারতবর্ষের সাধনজীবন ও কালচারের আদর্শ হইতে তাহার জন্য তিনি শান্তিবাণী লইয়া গেলেন। Cult of Nationalism প্রবন্ধে সর্বাবরণমুক্ত মানবের যে vision বা আদর্শ তিনি ইউরোপের সম্মুখে ধরিয়াছেন, আমি তাহারই কথা বলিতেছি। অবশ্য ন্যাশন্যালিজমের যে একটা বড় দিক্ আছে, তাহা পূর্বে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে তিনি তাঁহার বহু রচনায় সুন্দররূপেই দেখাইয়াছিলেন। প্রতি নেশনের যে একটা বিশিষ্ট ছবি ও ছাঁদ আছে, তাহা তিনি খুবই মানেন, কিন্তু দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া ও ন্যাশন্যালিজ্‌মের নানা আধুনিক বিকৃতি দেখিয়া তিনি বোধ হয় ব্যক্তিত্বের দিকে বেশি ঝোঁক দিয়াছেন এবং ইহা একরূপ স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি বোধ হয় ন্যাশন্যালিজ্‌মের ন্যায্য স্থান ও অধিকার অস্বীকার করিবেন না— কেননা মানব-ইতিহাসের ধারা একটা বিরাট ভ্রম নহে। তবে ন্যাশন্যালিজ্‌মের যে দিকটা commercialism (বণিকবৃত্তি), militarism (সৈনিকবৃত্তি) প্রভৃতির দ্বারা ব্যক্তিকে মারিয়া বৃদ্ধিলাভ করিতেছে, সেই ন্যাশন্যালিজ্‌ম্ ব্যাধির ঔষধ কি তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। দুই দিক্ হইতে ইহা হইতে মুক্তিলাভ করিবার উপায় তিনি বিবৃত করিয়াছেন:— ১. ব্যক্তির যে ব্যক্তিহিসাবে একটা অসীম মূল্য আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে, ২. Nationalism যদি Internationalism বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হইতে যায় তবে উহার বিশ্বমূল্য (cosmic value) নির্ধারণ ও নিরূপণ করিতে হইবে।

"সেবার 'গীতাঞ্জলি'তে তিনি ওধারকার ব্যক্তিগত জীবনের unrest বা অশান্তি নিবারণার্থে এক শান্তিমন্ত্র লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি গাহিলেন ভগবানের সহিত আত্মার লীলাতেই সেই শান্তি। আর এবার ওধারকার সামাজিক জীবনের unrest বা অশান্তি নিবারণার্থে ভারতবর্ষের চিরসাধিত শান্তি ও মৈত্রীর রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিলেন। সেবার ব্যক্তির নিত্য-সহচর ভগবানকে দেখাইলেন আর এবার সমাজ-জীবনের নিত্যসহচর the Eternal individual বা চিরন্তন ব্যক্তির মহিমা ঘোষণা করিলেন।"

দেশে প্রত্যাবর্তন

জাপান ও আমেরিকা ঘুরিয়া কবি দেশে ফিরিলেন চৈত্র মাসের গোড়ায়; এবার দেশের বাহিরে ছিলেন প্রায় দশ মাস— ১৩২৩ বৈশাখের ২০ হইতে চৈত্র মাসের ৪ঠা পর্যন্ত (১৯১৬ মে ৩ - ১৯১৭ মার্চ ১৭)। কলিকাতায় ফিরিয়া দেখেন গৃহবিদ্যালয় 'বিচিত্রা' একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিয়াছে। রথীন্দ্রনাথের সমস্ত মন এখন এইটিতে নিবিষ্ট। দুই বৎসর পূর্বে যেটি সামান্য গৃহ-বিদ্যালয় রূপে আরম্ভ হয় তাহা এখন একটি ক্লাব ও অ্যাকাডেমিতে পরিণত হইয়াছে। অবনীন্দ্রনাথদের বিরাট গ্রন্থালয় ও রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত গ্রন্থসমূহ মিলাইয়া একটি সুবৃহৎ আধুনিক লাইব্রেরি স্থাপিত হইয়াছে। য়ুরোপীয় সাহিত্যের অধুনাতম গ্রন্থসংগ্রহ ছিল ইহার বৈশিষ্ট্য।

কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের এই মিলন-বৈঠক বা ক্লাবে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা হইল। আর-একদিন সম্বর্ধনা হইল দমদমের এক বাগানে— উদ্যোক্তা ছিলেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও কর্মীরা। অভ্যর্থনা-আপ্যায়ন-সম্বর্ধনার বন্যা স্তব্ধ হইতে না হইতে কবিকে নানা বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল; সংসারের ও শান্তিনিকেতন

বিদ্যালয়ের অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করিলেন। সংসারের দিকে তাকাইয়া দেখেন রথীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গীরা মিলিয়া ওয়েলিংটন মোটর ওয়ার্কস নামে যে বিরাট কারখানা ও কারবার খুলিয়াছিলেন তাহার মধ্যে শনি প্রবেশ করিয়াছে। আমেরিকা হইতে এক পত্রে এই কারবার সম্বন্ধে খুবই আশা পোষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশে আসিয়াই জানিতে পারিলেন ব্যবসায়ের মধ্যে বহু গলদ ঢুকিয়াছে; কবি তখনই রথীন্দ্রনাথকে ঐ প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে বলিলেন। রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম বিষয়বুদ্ধি রথীন্দ্রনাথকে খুব অপ্রীতিকর অবস্থা হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

এই বিষয়বুদ্ধি হইতেই তিনি জমিদারি সম্বন্ধেও আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলেন; ঠাকুর এস্টেটের অপর শরিক সুরেন্দ্রনাথ। তিনি জীবনবীমা ও কলিকাতার জমিজমা ক্রয়-বিক্রয়ের স্পেকুলেশান বা ফট্‌কায় এমন মজিয়া আছেন যে, জমিদারি নষ্ট হইতেছে কি না সে বিষয়ে তাঁহার মন দিবার অবসর নাই; রবীন্দ্রনাথ এখানেও দুর্লক্ষণ দেখিলেন। নানাদিক বিচার করিয়া সুরেন্দ্রনাথের সহিত জমিদারি পার্টিশনের কথা ভাবিতেছেন। ক্লান্ত শরীরে এক-একবার ভাবেন যে একজন সেক্রেটারি রাখিবেন; কিন্তু সেই আমীরিটুকুও হিসাবে কুলয় না, "কেননা রথীর সংসারে অনটন, ইস্কুলেও তাই।"[১]

এই তো গেল ঘরের কথা; বাইরের জগত হইতে কত আঘাত আসে। দেশের কতকগুলি সাময়িকপত্র ও বিশেষ একশ্রেণীর লেখক কবির আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতার সমালোচনায় অত্যন্ত মুখর। রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ ভাষণ 'ন্যাশন্যালিজম্' গ্রন্থে প্রকাশিত হয় পরবৎসরে। মার্কিন সাংবাদিকদের টেলিগ্রাফী রিপোর্ট যাহা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া সকলে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সমালোচনার পুরোভাগে ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ; তখনো তিনি সর্বত্যাগী 'দেশবন্ধু' রূপে দেশপূজ্য হন নাই। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিরূপে তিনি কবির জাতীয়তাবাদের সমালোচনাকে কেন্দ্র করিয়া যে তীব্র মন্তব্য করিলেন তাহারই উত্তর-প্রত্যুত্তরে সাময়িক পত্রিকাসমূহ অচিরকালের মধ্যে মুখরিত হইয়া উঠিল। চিত্তরঞ্জনের অভিভাষণে ('বাঙ্গলার কথা') বলা বাহুল্য অনেক সুচিন্তিত মতামত ছিল; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে বলেন নাই এমন কথা খুব অল্পই ছিল। চিত্তরঞ্জন উহাতেই যদি নিবৃত্ত হইতেন তবে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তিনি কবির আমেরিকার বক্তৃতার অংশবিশেষ উদ্‌ধৃত করিয়া তাঁহার স্বদেশপ্রীতিকে বারে বারে ধিক্‌কৃত করিলেন। এই আক্রমণ অহেতুকী এবং অপ্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্রভক্তেরা চিত্তরঞ্জনের মন্তব্য ও সমালোচনার কঠোর প্রতিবাদ করিলেন। অজিতকুমার চক্রবর্তী এক দীর্ঘ প্রবন্ধে[২] দেখাইলেন যে, চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতার প্রায় সকল ভাবই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী যুগে রচিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে আছে; এমন-কি কবির ভাষাও বক্তার অজ্ঞাতে রচনার মধ্যে বহুস্থানে যে আসিয়া গিয়াছে তাহাও প্রবন্ধকার সূক্ষ্মভাবে দেখাইলেন। প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের চিরসুহৃৎ, তিনিও চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতার তীব্র সমালোচনা করিলেন।[৩]

রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরিয়া সাহিত্যিক সমাজের বিরূপ মনোভাবের আভাস পাইলেন; কিন্তু কোথাও কোনো

১ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৬২।

২ ভারতী ১৩২৪ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ১৭৫-৭; আষাঢ় পৃ ২৯৮-৩০৪।

৩ প্রবাসী ১৩২৪ জ্যৈষ্ঠ। বিবিধ প্রসঙ্গ: 'আসল পণ্ডিত ও নকল পণ্ডিত' অথবা 'সূর্য্য বা বালি', পৃ ১০৫-১০৭। কিছুকাল হইতে চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত ও অর্থপুষ্ট 'নারায়ণ' পত্রিকা ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের নিন্দাবাদে লিপ্ত হয়। ১৩২৩ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় যথাক্রমে রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের অত্যন্ত স্বাভাবিক অভাবাত্মক দিকগুলিকে বড় করিয়া ধরিয়া তাঁহাদিগকে হীন প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে। রামানন্দবাবু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম ছিলেন, তাঁহার পক্ষে ব্রাহ্মধর্মের ও ব্রাহ্মসমাজের পূজ্যপাদ ব্যক্তিদের নিন্দাবাদ নীরবে সহ্য করা কঠিন ছিল।

মতামত প্রকাশ করিলেন না। কলিকাতায় পৌঁছিবার কয়েকদিনের মধ্যে শান্তিনিকেতনে চলিয়া গেলেন। সেখান হইতে প্রমথ চৌধুরীকে লিখিলেন (৩১ চৈত্র ১৩২৩) "প্রমথ, অর্জুনের একটা সময় এসেছিল যখন সে নিজের গাণ্ডীব নিজে আর তুলতে পারে নি। আমার কি গাণ্ডীবের কারবার ছেড়ে দেবার দিন আস্‌বে না, মনে করচ?"[১] বলা বাহুল্য এটি কবিমনের স্বাভাবিক রূপ নহে; যখন বাহির হইতে আঘাত পান, মন অভিমানভরে বলে 'আর না, এবার বিদায়'। মনের সঙ্গে শরীরেরও একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে; শরীরের আধিব্যাধি মনের উপর সময়ে সময়ে গভীর কালোছায়া ফেলে। আলোচ্যপর্বে কবির শরীর ভালো ছিল না; তাঁহার কানের অসুখের সূত্রপাত এই সময় হইতে হয়। এ ছাড়া বার্ধক্যের 'ভয়ানক একটা সঙ্গহীনতা' অনুভব করিতেছেন কিছুকাল হইতে; কেবল অসাধারণ মনের বলে আপনাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন।[২] বাহিরের লোকের আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় আজ মন আশ্রয় খুঁজিতেছে বিদ্যালয়ের মধ্যে। যে-বিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছুকাল পূর্বেও ভাবিয়াছিলেন যে, উহার কার্যকলাপ তাঁহার সমস্ত আইডিয়ার পরিপন্থী, সেই বিদ্যালয়ই আজ তাঁহার সমস্ত মনকে আকর্ষণ করিতেছে। বাহিরের সকলপ্রকার সংস্রব কাটাইবার জন্য মন অত্যন্ত উৎসুক। একখানি পত্রে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "ওদের সেবায় যদি পুরোপুরি লাগি তা হলে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধবয়সের জীর্ণতার সমস্ত ফাঁকগুলো ভরে যাবে অথচ ছাড়াও থাকব।" পুনরায় লিখিতেছেন কয়েকদিন পরে, "মনটা ভারি একলা হয়ে পড়েচে। শুধু কেবল লেখাতে এখন ফাঁক ভরবে বলে মনে হয় না। বিদ্যালয় আমার সঙ্গী।...তাই আর-সমস্ত ছেড়ে এই শিশু-নরনারায়ণের মন্দিরে সেবায়েৎগিরির কাজেই লাগব মনে করেচি। ঐ মন্দিরের পথটা নিষ্কণ্টক।"

বৈশাখের মাঝামাঝি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বন্ধ হইলে কবি কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। বিচিত্রা-ভবনে কবির জন্মোৎসব হইল (১৩২৪)। কথা হইল কয়েকদিনের মধ্যে হিমালয়ে তিনধরিয়া যাওয়া হইবে। কবির মন একজায়গায় দীর্ঘকাল থাকিতে অপারগ। হঠাৎ জাভাদ্বীপে যাইবার ইচ্ছা হইল; কিন্তু যাওয়া 'সম্প্রতি ঘটিল না'। আপাতত পাহাড়ে যাওয়াই ঠিক; 'মাসখানেক বিশ্রাম করিয়া পুনরায় আশ্রমে' ফিরিবেন।[৩]

কিন্তু শেষ মুহূর্তে কবির মত বদলাইয়া গেল। দার্জিলিঙ মেল ছাড়িবার কয়েক ঘণ্টা পূর্বে পাহাড়ে যাইবার সংকল্প ত্যাগ করিয়া এণ্ড্রুসের সহিত বৈশাখের দারুণ গরমে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গেলেন। প্রমথবাবুকে লিখিলেন, "আমার পক্ষে ঠাণ্ডা হাওয়ার তত দরকার নেই যেমন দরকার বোলপুরের রিক্ত মাঠ, মুক্ত আকাশ এবং প্রখর আলো।"[৪] সাহিত্যিক স্বষ্টির প্রেরণা এখন বড়ই মন্দ। কিছুকাল হইতে চলতি ভাষা বনাম সাধু ভাষার প্রয়োগ বিষয়ে মনে তর্ক চলিতেছে। চলতি ভাষায় একটা লম্বা ছন্দের কবিতাও লিখিয়া ফেলিলেন— বোধ হয় জন্মদিনে অথবা জন্মদিন স্মরণে ঐদিনের কাছাকাছি কোনো দিনে। তিনি লিখিলেন, "যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জালিয়ে দিলে আলো"— ইত্যাদি।[৫]

এবার দেশে ফিরিয়া আসিয়া কবি দেখেন বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে চলতি ভাষা ও বিশেষভাবে সবুজ পত্রে প্রমথ চৌধুরীর 'বীরবলী' রীতি লইয়া মৃদুগুঞ্জন চলিতেছে। সে যুগে রবীন্দ্রনাথের কথ্য বা চলিত ভাষা লইয়া আলোচনা চলিতেছিল। ১৯০৪ সালের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ছিন্নপত্র হইতে একটি উদ্ধৃতি chaste and elegant Bengaliতে

১ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৫২।

২ চিঠিপত্র ৫, ৬ বৈশাখ ১৩২৪।

৩ পত্র। মনোরঞ্জন চৌধুরীকে লিখিত, ২৭ বৈশাখ ১৩২৪।

৪ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৫৪।

৫ দ্র চিঠিপত্র ৫, পত্র ৫৫, শান্তিনিকেতন ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪। পূরবী, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪।

পুনরায় লিখিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল![1] ১৯১৬ সালের গোড়ায়, ১৩২২ চৈত্র, বোধহয় এই তথ্যটি জানিতে পারেন (সবুজ পত্র ১৩২২ চৈত্র, পৃ ৭৮৯)। প্রমথ চৌধুরীকে লিখিতেছেন (১৯১৬ মার্চ), "প্রশ্নপত্রের বাংলা নমুনার টুকরোটি কার আমি তাই ভাবছিলুম। অনেক চিন্তা করে শেষকালে ভাবলুম হয়তো বা ছিন্নপত্রের কোনো চিঠির মধ্যে ঐ কটা লাইন লিখেও বা থাকৃব।"[2] সাময়িক এইসব ঘটনা পর্যালোচনা করিয়া 'ভাষার কথা' (সবুজ পত্র ১৩২৩ চৈত্র) নামে যে প্রবন্ধ লেখেন তাহা বীরবলী রীতি ও চলতি ভাষার সমর্থনে লিখিত। বাংলা সাহিত্য রচনায় বোধ হয় চলতি ভাষা প্রয়োগের প্রথম বরমাল্য প্রমথ চৌধুরীরই প্রাপ্য— পূর্বযুগের টেকচাঁদ ঠাকুরের আলালী ভাষার সহিত ইহার তুলনা চলে না।

রবীন্দ্রনাথ এপর্যন্ত খাঁটি সাহিত্য রচনায় চলতি ভাষার ব্যবহার করেন নাই— এমন-কি 'ভাষার কথা' প্রবন্ধটির ক্রিয়াদি সাধু-প্রয়োগ-সিদ্ধ। বহু মাস পরে 'পয়লা নম্বর' (সবুজ পত্র ১৩২৪ আষাঢ়) গল্পে তিনি চলতি ক্রিয়াপদের সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। 'স্ত্রীর পত্র' (সবুজ পত্র ১৩২১ শ্রাবণ) গল্পও কথ্যভাষায় লিখিত; বোধহয় সেটি পত্র বলিয়া কথ্য ভাষার ব্যবস্থা করেন, কারণ পরবর্তী গল্প 'ভাইফোঁটা' সাধুভাষায় লেখা হইয়াছিল। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রসাহিত্যের নাটকে, উপন্যাস ও গল্পের কথোপকথনে, ধর্মোপদেশে, চিঠিপত্রে কথ্যভাষার প্রয়োগ দেখা যায়। কবির আঠারো বৎসর বয়সে লিখিত 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র'ধারা কথ্য ক্রিয়াপদ প্রয়োগের প্রাচীনতম নিদর্শন। শান্তিনিকেতনের উপদেশমালা, ছিন্নপত্র চলতি ভাষায় লিখিত, উপন্যাস ও গল্পের কথোপকথনে দুই প্রকার প্রয়োগই দৃষ্টিগোচর হয়, উপন্যাসের মধ্যে নৌকাডুবি পর্যন্ত গ্রন্থে বাক্যালাপে সাধু ক্রিয়াপদের প্রয়োগই দেখা যায়; অতঃপর গোরার কথাবার্তায় চলতি ভাষার প্রথম ব্যবহার। ছোটোগল্পের কথোপকথনের ভাষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সনাতনপন্থী, কেবল 'নষ্টনীড়ে' চলতি ক্রিয়াপদের প্রয়োগ। রবীন্দ্রনাথ গল্প রচনায় সবুজ পত্র যুগেও সাধু ক্রিয়াপদ অনুসরণ করিয়াছিলেন; এই বৎসর (১৩২৪) 'পয়লা নম্বর' গল্পটি চলতি ভাষায় লেখা।

'ভাষার কথা' প্রবন্ধে কবি বলিলেন যে, আলালীভাষা যখন রচিত হয় তখন কথ্যভাষায় সাহিত্য রচনার সময় হয় নাই, আজ সময় হইয়াছে। "সংস্কৃত ভাষা যে-অংশে বাংলা ভাষার সহায় সে অংশে তাহাকে লইতে হইবে, যে-অংশে বোঝা সে-অংশে তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। যতদিন বাংলা বইয়ের ভাষা চলিত ভাষার ঠাট না গ্রহণ করিবে, ততদিন বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার সত্য সীমানা পাকা হইতে পারিবে না।" প্রায় দশ বৎসর পূর্বে এক নবীন সাহিত্যিককে এই ভাষা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "নিতান্ত কথিত ভাষায় লিখিবেন না— তাহার আর কোনো কারণ নাই, কেবল কথিত ভাষা বাংলাদেশের সকল জেলার ভাষা হইতেই পারে না— ইহাই কারণ। তাই বলিয়া উগ্র বইয়ের ভাষা হইলেও চলিবে না, যাহাতে কথিত ভাষার রসটুকু থাকে অথচ পুঁথির ভাষার সম্ভ্রমটুকু রক্ষা হয় এমন হওয়া চাই।"[3]

যাহাই হউক, পাহাড়ে না গিয়া কবি জিদ করিয়া বোলপুরে ফিরিয়া আসিলেন; আপন মনে লেখাপড়া করিতেছেন। দেহলির বাড়িতে "একলা ছাতের উপর চুপ করে বসে থেকে আমার মনটা বেশ ঠাণ্ডা থাকে" কিন্তু অচিরে বুঝিলেন "শরীরের অবসাদ কিছুতেই ঘুচচে না।...তাই···তিনধরিয়া পরখ করাই" ঠিক করিলেন।[4]

১ প্রবাসী ১৩২০ চৈত্র, পৃ ৫৭৬।

২ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৪৮।

দ্র. ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; দেশ, ১৩৬৩ সাহিত্য সংখ্যা, পৃ ৬৩-৭২।

৩ গিরিডিবাসী হিমাংশুপ্রকাশ রায়কে লিখিত পত্র (১৯০৮ ডিসেম্বর ৬)। রবীন্দ্রসদনে পাণ্ডুলিপির কপি হইতে।

৪ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৫৭।

তবে তিনধরিয়ায় দীর্ঘকাল থাকা হয় নাই। আষাঢ়ের গোড়াতেই কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলা দেবীর ঘুসঘুসে জ্বর হইতেছে, গণনাথ সেন চিকিৎসা করিতেছেন।[১] তাঁহাকে ভালো দেখিয়া বোলপুর যান আষাঢ়ের শেষ দিকে। অল্পকালের মধ্যে কবিকে বৈষয়িক কর্ম-উপলক্ষ্যে শিলাইদহ[২] যাইতে হইল; কিন্তু বেশিদিন সেখানে থাকা হইল না— কলিকাতায় নানা কাজের আহ্বান।

কলিকাতার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে রামমোহন লাইব্রেরি-ভবনে কবির সম্বর্ধনা। এই সভায় আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল যে ভাষণ দান করেন, তাহার কিয়দংশ আমরা পূর্বেই উদ্‌ধৃত করিয়াছি; সমস্ত ভাষণটি রবীন্দ্রসাহিত্যের একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ। এবার কবি জাপান ও আমেরিকা হইতে কী চিন্তাধারা বহন করিয়া আনিয়াছেন তাহারই আলোচনায় অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ বলিলেন—

"শিল্পরসিক জাপান হইতে তাহার সৌন্দর্যবোধ, তাহার rhythm বা ছন্দের সূক্ষ্ম উপলব্ধি প্রভৃতির দ্বারা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে যে-সকল দৈন্য ও কুশ্রীতা আছে তাহাদিগকে কিরূপে সুষমাময় ও সৌষ্ঠবপূর্ণ করা যায়, ইহা রবীন্দ্রনাথ নানা দিক্ হইতে এবারে দেখাইতে পারিবেন এইরূপ আশা করিতে পারি। কিরূপে জাপানের সেই সরল ও নিরলংকার সৌন্দর্যের ভাব আকাশ বাতাসের মতো আমাদের জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ব্যাপারে পরিব্যাপ্ত হইতে থাকিবে, তাহাও তিনি দেখাইবেন এই আশা করিয়া রহিলাম।

"তারপর আমাদের এই বহুকালের প্রাচীন সমাজের নানাপ্রকার জীর্ণ অবস্থার মধ্যে একটা নবযৌবন নবপ্রাণের সঞ্চার কিভাবে হইতে পারে, নবীন আমেরিকা হইতে সেই বার্তা তিনি আনিয়াছেন। প্রাণের বেগে ক্রমাগতই সম্মুখের দিকে চলা— আমেরিকার কবি হুইট্‌ম্যান যে Forward March-এর গান গাহিয়াছেন— আমাদের এই প্রাচীন সমাজের মধ্যে সেই নূতন জীবনের বিজয়যাত্রার আনন্দকে তিনি উদ্বোধিত করিয়া দিবেন, এইরূপ আশা করিতেছি।

"পূর্ব ও পশ্চিমের পরস্পরের এই আদান-প্রদানের দ্বারা কি সাব্যস্ত হইতেছে? ইহাই সাব্যস্ত হইতেছে যে, পশ্চিমের সামাজিক আদর্শের ভিতর যাহা উদার ও উন্নত তাহার সহিত পূর্বদেশীয় হিন্দুর সামাজিক আদর্শের reconciliation বা সৌসামঞ্জস্যের স্থান আছে। Rituals (পদ্ধতি), symbols (প্রতীক), ceremonials (অনুষ্ঠান), myths (পুরাণ) প্রভৃতি ছাড়াও হিন্দুর মধ্যে বরাবর একটা বিশাল মুক্তির ভাব আছে— হিন্দুসভ্যতার তাহা এক আশ্চর্য বিশেষত্ব। সেই মুক্তিতত্ত্বে ও মুক্তিসাধনায় সাম্য-বৈষম্য, সসীম-অসীম, ভোগ ও ত্যাগের এক মহা সম্মিলন, এক মহাশ্চর্য সমাধান দেখিতে পাই। হিন্দুধর্ম কেবলি কর্মকাণ্ড নহে, কেবলি rituals (পদ্ধতি) symbols (প্রতীক) প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন ও ভারাক্রান্ত নহে। এই ভারতবর্ষে নানাজাতির ও ধর্মমতের বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া এই এক বিশাল মুক্তির আদর্শ হিন্দুধর্মের ভিতরে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং এই আদর্শ বিশ্বজগৎকে দান করা সম্বন্ধে হিন্দুর গুরুতর দায়িত্ব আছে। যুগে যুগে হিন্দু-সভ্যতার ইতিহাসে এই আদর্শই নানাভাবে প্রচারিত হইয়াছে, এবং রাজা রামমোহন রায় তাহারি বার্তা বহন করিয়া এই যুগে আসিয়াছিলেন। Symbols, rituals প্রভৃতির বন্ধন হইতে সেই বিশাল মুক্তির তত্ত্বকে মুক্ত করিয়া রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে প্রদান করিতেছেন এবং ইউরোপের সর্বোচ্চ মুক্তির আদর্শের সহিত তাহার সৌসামঞ্জস্য দেখাইতেছেন।

"এই উভয় মুক্তির আদর্শের এক মহাসম্মিলন-ক্ষেত্র প্রস্তুত করা — ইহাই তো ব্রাহ্মসমাজের চিরকালের কার্য। সেই মহাসম্মিলনের বার্তা যিনি পশ্চিমে লইয়া গিয়াছেন, আজ-যে ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার সম্বর্ধনা করিতেছেন, ইহা ব্রাহ্মসমাজেরই পক্ষে আনন্দ ও গৌরবের বিষয়।"[৩]

১ চিঠিপত্র ৪, পত্র ৩০, কলিকাতা, ১৩ আষাঢ় ১৩২৪।
২ *Letters to a Friend*, p 75. Shileida, July 20, 1917 (৪ শ্রাবণ ১৩২৪)।
৩ প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২০, পৃ ৪৩৪-৩৫।

দেশে নূতন পরিস্থিতি

কবি দেশে ফিরিয়াছিলেন চৈত্র মাসে, তাহারই পর-মাসে (১৩২৪ বৈশাখ) সবুজ পত্রের চতুর্থ বৎসর শুরু হয়। সম্পাদক মহাশয় কবির নিকট হইতে কেবল প্রবন্ধাদির তাগিদ করিলেন না, গল্পের জন্য ফরমাইশ করিলেন। তাগিদের ফলে 'তপস্বিনী' (সবুজ পত্র ১৩২৪ জ্যৈষ্ঠ) নামে কবি একটি গল্প লিখিলেন। গল্পটি পড়িয়াই বুঝা যায় নিতান্ত অনুরোধে পড়িয়া লেখা গল্প— গল্পের ভিতর না আছে আবেগ, না আছে গতি। শেষ পর্যন্ত বরদাকান্ত যে 'প্রায়শ্চিত্তে'র (সাধনা ১৩০১ অগ্রহায়ণ) অনাথবন্ধু সরকারের ন্যায় একটা কিছু করিবে তাহা গল্প পড়িতে পড়িতে আন্দাজ করা যায়।

কিন্তু লেখনীর প্রথম জড়তা ভাঙিয়া গেলে কল্পনার রাজ্যে নব নব রূপ সৃষ্টি হইতে লাগিল। কবি লিখিলেন 'পয়লা নম্বর' গল্প (সবুজ পত্র ১৩২৪ আষাঢ়)। 'স্ত্রীর পত্রে'র পর এই গল্পে কবি কথ্য ভাষার প্রথম ব্যবহার করিলেন। যেসব ছোট গল্পের অল্প পরিসর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একটি কঠিন সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছেন ও কোনো সমাধান না দিয়া পাঠককে মর্মন্তুদ ঘটনার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া লেখনীকে স্তব্ধ করিয়াছেন— এই গল্পটি তাহাদের অন্যতম। অনিলার ব্যর্থ জীবন ও যৌবনের সম্মুখে সিতাংশু আসিয়াছিল তাহার দৃপ্ত পৌরুষ লইয়া; অনিলার বাস্তব জীবনের দৈন্য ও ক্ষুণ্ণ নারী-হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে একটি প্রকাণ্ড আত্মখণ্ডন বাধাইয়া লেখক অকস্মাৎ তাহাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে লুপ্ত করিয়া দিলেন; আঘাত রাখিয়া গেল যে বাস্তবকে উপেক্ষা করিয়া তত্ত্বলোকের কুয়াশার মধ্যে আপনার অবাস্তবতাকে চরম বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহার বুকে। আর আঘাত দিয়া গেল তাহারও বুকে যে বাস্তবকে উপেক্ষা করিয়া ভাবলোক হইতে রসের পূজা নিবেদন করিয়াছিল। অনিলাকে লেখক সংসার হইতে বাহির করিয়া লইয়া গেলেন, কিন্তু কোনো বাস্তবতার মধ্যে তাহাকে ফেলিয়া নষ্ট করিলেন না। নারীকে লইয়া নোংরামি না করিতে পারার নাম নাকি অবাস্তবতা। বাংলাদেশে নির্যাতিত নারী যে ফণা তুলিতেছে, তাহার সাহিত্যিক ইন্ধন রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন, সে অভিযোগ হয়তো অস্বীকার করা যায় না; বিশেষভাবে সবুজ পত্র যুগের গল্পগুলি এই বিদ্রোহাগ্নি জ্বালাইবার প্রধান উপকরণ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। সবুজ পত্রের প্রথম দিকের গল্পগুলি ১৯১৩ সালে য়ুরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর লিখিত; আর 'পয়লা নম্বর'[১] আমেরিকা হইতে ফিরিবার পর লেখা।

কবি গল্প লিখিয়া, বিচিত্রা-সভায় মজলিশ করিয়া, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কাজকর্ম দেখিয়া দিন কাটাইতে পারিতেন তো ভালো হইত; কিন্তু তাহা পারিলেন না, দেশের প্রয়োজনে শুদ্ধ লেখনী বারে বারে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এবারেও সেইরূপ এক প্রয়োজনের অভিঘাতে লিখিলেন, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' (১৯ শ্রাবণ ১৩২৪)। কিন্তু কী অভিঘাতে এই প্রবন্ধটির জন্ম, তাহার ইতিহাস বলিতে গেলে আমাদিগকে একটু গোড়া হইতেই বলিতে হইবে।

মহাযুদ্ধের তৃতীয় বৎসর চলিতেছে (১৯১৭)। যুদ্ধের অভিঘাতে পৃথিবীব্যাপী যে অর্থনৈতিক দুর্গতি দেখা দিয়াছে তাহার কম্পনে ভারতবর্ষও পীড়িত। বাংলাদেশের সর্বত্র দারুণ কষ্ট, বিশেষভাবে বস্ত্রাভাব; নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীও মহার্ঘ, ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে জন-আন্দোলনের কোনো চিহ্ন তখনো দেখা দেয় নাই। জাতীয় কন্‌গ্রেসের অস্তিত্ব শিক্ষিত সমাজ জানিত বৎসরান্তে সভার সময়ে। ১৯০৭ সালের সুরাট কন্‌গ্রেসের পর চরমপন্থীরা কন্‌গ্রেস ত্যাগ করিয়া যান। চরমপন্থীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত তরুণের দল রুদ্রপন্থী রূপে কিভাবে দেশকে সশঙ্কিত করিয়া তোলে তাহার ইতিহাস পাঠকদের অবিদিত নহে। ক্রমে ১৯১৫ সালের 'ভারতরক্ষা আইন' পাস হওয়ায় যুবকদিগকে

১ পয়লা নম্বর। পপুলার সিরিজ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। বৈশাখ ১৩২৭ (পয়লা নম্বর, তপস্বিনী, তোতাকাহিনী, কর্তার ভূত)— শিশির পাবলিশিং হাউস, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

সন্দেহের বশে অথবা স্বল্পপ্রমাণে বিনা-বিচারে অন্তরায়িত করিবার ব্যবস্থা হইল। এই আইনের কবলে এক বাংলা দেশেই ১২০০ যুবক হয় জেলে, নয় দুর্গম স্থানে অন্তরায়িত হন। অপর দিকে মহাযুদ্ধে বৃটেন বা মিত্র-পক্ষের হইয়া ভারতীয়রা ধনে-প্রাণে সহায়তা করিতেছে। যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইংরেজের ঘোষণা যে তাহারা ক্ষুদ্র জাতির স্বাধীনতা ও স্বার্থরক্ষার জন্য লড়িতেছে! ভারতের রাজনীতিকদের একদল ইংরেজের এই ভণ্ড-উক্তিতে সত্যসত্যই বিশ্বাস করিয়া ভাবিয়াছিলেন যে, যুদ্ধান্তে ভারতের শাসন-ব্যাপারে অনেক পরিবর্তন হইবে। কিন্তু বৃটিশ রাজনীতি যাঁহারা বুঝিতেন ও যাঁহারা জনসমাজের মধ্যে রাজনীতির কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহারা জানিতেন সংগ্রাম ব্যতীত ইংরেজের কাছ হইতে কিছুই পাওয়া যাইবে না; এবং যাহা পাওয়া যাইবে তাহা না-পাওয়া হইতে ভয়ংকর। রাজনীতির এই নূতন দিক খুলিয়াছিলেন মহারাষ্ট্র-কেশরী বালগঙ্গাধর টিলক। ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরামের ফাঁসির পর ইংরেজশাসনের প্রতিকূলে মন্তব্য প্রকাশের অপরাধে ছয় বৎসরের জন্য তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ১৯১৪ সালে তিনি মুক্তিলাভ করেন। য়ুরোপীয় মহাসমর ঘনাইয়া উঠিলে, সকল শ্রেণীর লোকের মনেই যুদ্ধান্তে দেশের জন্য কিছু পাওয়া যাইবে বলিয়া যখন একটা আশা দেখা দিয়াছিল, সেইসময়ে টিলক তাহাকে জনআন্দোলনরূপে মূর্তি দান করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি বোম্বাইতে ন্যাশনাল লীগ গঠন করেন; প্রায় ঐ একই সময়ে মাদ্রাজে শ্রীমতী আনি বেসান্ত কর্তৃক হোমরুল লীগ স্থাপিত হয়। উভয়েই যুগপৎ রাজনীতিকে জনআন্দোলনরূপে প্রচারে নিরত, কিন্তু ঐক্যবদ্ধভাবে কার্য করিবার অবসর পাইলেন না।

ইতিমধ্যে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার উনিশ জন দেশীয় সদস্য একটা রাষ্ট্রকাঠামো (constitution) খাড়া করিলেন। লখ্‌নৌতে কন্‌গ্রেসের যে অধিবেশন হইল (১৯১৬), তাহা নানাদিক হইতে স্মরণীয়। মুসলীম লীগের অধিবেশনও লখ্‌নৌতে বসিল। কন্‌গ্রেস ও লীগ মিলিয়া একটা রাষ্ট্রকাঠামো রচনা করিলেন। মোট কথা ১৯১৬ সালের শেষাশেষি দেশময় সর্বত্র নূতনের প্রত্যাশায় লোকে চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া বক্তৃতা করিতেছেন। ভারতবর্ষে সেই ন্যাশনাল সত্তা উদ্রিক্ত করিবার জন্যই আন্দোলন চলিতেছে। কবি যখন দেশে ফিরিলেন, তখন টিলক ও বেসান্ত ন্যাশনাল ও হোমরুল লীগ লইয়া ব্যস্ত। এ দিকে বৃটিশ গবর্মেণ্ট ধীরে ধীরে শাসনের প্যাঁচ কষিতে শুরু করিয়াছেন। অপর দিকে নেতারা রাজনৈতিক আন্দোলন চালনা করিবার জন্য স্বদেশীযুগের পদ্ধতিই অনুসরণ করিলেন; অর্থাৎ রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইবার জন্য স্কুল-কলেজের ছাত্ররা আহূত হইল। সঙ্গে সঙ্গেই প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট হইতে সরকারের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সম্পৃক্ত বিদ্যায়তনের ছাত্রদের পক্ষে রাজনৈতিক সভাসমিতিতে যোগদান অপরাধ বলিয়া ঘোষিত হইল। ইহারই ফলে ছাত্রদের জন্য 'জাতীয় বিদ্যালয়' স্থাপনের ব্যবস্থা হইল। শ্রীমতী বেসান্ত মাদ্রাজে ন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটি বা জাতীয় বিদ্যালয় খুলিলেন। শ্রীমতী বেসান্তের এইসব রাজনৈতিক প্রচারকার্য মাদ্রাজ গবর্মেণ্টের বিবেচনায় রাজদ্রোহাত্মক। বোম্বাই গবর্মেণ্ট তাঁহাকে বোম্বাই প্রদেশে প্রবেশের অনুমতি দিলেন না, পাছে তিনি টিলকের সহিত মিলিত হন। অবশেষে ১৯১৭ জুন ১৬ (১৩২৪ আষাঢ় ২) মাদ্রাজ গবর্মেণ্ট শ্রীমতী বেসান্ত ও তাঁহার দুই সহকর্মী— মি. ওয়াদিয়া ও মি. অরুনডেলকে অন্তরীণাবদ্ধ করিলেন।

এই ঘটনায় হিন্দুভারত চঞ্চল হইয়া উঠিল। মাদ্রাজ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজ ও অস্থায়ী চীফজাস্টিস্ সুব্রহ্মণ্য আয়ার ও রঙ্গস্বামী আয়াঙ্গারের ন্যায় লোক বলিলেন যে, বেসান্ত কন্‌গ্রেসের অনুমোদিত কার্য করিতেছেন, কন্‌গ্রেস যদি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত না হয়, তবে বেসান্ত প্রমুখ হোমরুল লীগের সদস্যদের কার্যাবলী রাজদ্রোহাত্মক হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ অন্তরীণের খবর পাইয়া সংবাদপত্রে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিলেন ও বেসান্তের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই সহানুভূতিপূর্ণ পত্র কাগজে পাঠ করিয়া বিলাতের

কোনো বন্ধু কবিকে এক পত্র দেন। কবি তাহার জবাবে একখানি খোলা-চিঠি তৎকালীন বিখ্যাত দৈনিক 'বেঙ্গলি'তে (৭ সেপ্টেম্বর ১৯১৭) প্রকাশ করেন। বাংলার যুবশক্তিকে নিঃশেষ করিবার জন্য ইংরেজের শাসনতন্ত্র যে তাণ্ডবে লিপ্ত— ইহা তাহারই প্রতিবাদ। পত্রখানি নিম্নে উদ্‌ধৃত হইল—

In your letter you seem puzzled at my conduct in sending a message of sympathy to Mrs. Besant, who has been interned for public utterances here. I am afraid compared with yours, our troubles may appear to you too small, but yet sufferings have not lost their keenness for us and moral porblems still remain as the gravest of all problems in all parts of the world. The constant conflict between the growing demand of the educated community of India for a substantial share in the administration of their country, and the spirit of hostility on the part of the Government, has given rise among a considerable number of our young men to methods of violence bred of despair and distrust. This has been met by the Government, by a thorough policy of repression. In Bengal itself hundreds of men are interned without trial— a great number of them in unhealthy surroundings in jails and in solitary cells, in a few cases driving them to insanity or suicide.[১] The misery that is carried into numerous households is deep and widespread, the greatest suffeiers being women with their children who are stricken at heart and rendered helpless.

I do not wish to go into details, but as a general proposition I can safely say that the whole evidence against them the opportunity to defend themselves, we are justified in thinking that a large number of those punished are innocent, many of whom were specially selected as victims by secret spies only because they had made themselves generously conspicuous in some noble mania of self-sacrifice. What I consider to be the worst outcome of this irresponsible policy of panic is the spread of the contagion of hatred against everything western in minds which were free from it. In this crisis the only European who shared our sorrow, incurring the anger and derision of her countrymen, is Mrs. Annie Besant. This was what led me to express my grateful admiration for her noble courage in this present time when it is particularly dangerous to be on the side of humanity against blind expediency. Possibly there is such a thing as political exigency, just as there may be a place for utter ruthlessness in war, but as a man, I pay my homage to those who have faith in ideals and therefore are willing to take all other risks except that of weakening the foundation of moral responsibility.

কলিকাতায় বেসান্তের অন্তরীণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-সভা করিবার জন্য টাউন-হল চাওয়া হইল। বাংলা গবর্মেণ্ট হলের কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দিলেন যে অন্য কোনো প্রাদেশিক সরকারের কাজের প্রতিবাদের জন্য তাঁহারা সরকারী

১ রংপুরের এক উকিলেব পুত্র শচীন্দ্র দাশগুপ্তেব আত্মহত্যাব কথা। —প্রবাসী ১৩২৪ কার্তিক, ১০৯-১০।

বা আধাসরকারী গৃহ দিতে পারেন না।[১] টাউন-হলে জনসভা হইতে পারিল না। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' লিখিয়া প্রথমে 'রামমোহন লাইব্রেরি হলে' (১৯১৭ অগস্ট ৪) পাঠ করেন। কিন্তু বৃহত্তর হলে সভা করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কোনো স্থান পাওয়া গেল না। অবশেষে আলফ্রেড থিয়েটরে মালিক জে. এফ. ম্যাডান বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

এই উত্তেজনার মুহূর্তে কবি লিখিলেন 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরি' গানটি। এই সময়ে বিচিত্রা-ভবনে কী উত্তেজনা দেখিয়াছিলাম। নেতাদের কী আসা-যাওয়া, কত আলোচনা, সলা-পরামর্শ।

'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'[২] প্রবন্ধটির মধ্যে স্বদেশীযুগের রবীন্দ্রনাথের মূর্তিকে যেন আবার দেখিতে পাইলাম। এত বড় রাজনৈতিক (indictment) বিচার বহুকাল লেখেন নাই. জাপানে ও আমেরিকায় জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে যেমন অগ্নিবাণী বর্ষণ করিয়াছিলেন ইহাও সেইরূপ তেজোদৃপ্ত, যুক্তিপূর্ণ নির্ভীক ঘোষণা।

কিন্তু ইহাকে কেবল রাজনৈতিক প্রবন্ধ বলিলে ভুল হইবে; রাজনীতিক ক্ষেত্রে আমরা যে স্বাধীনতা দাবি করিতেছি এবং যেটা পাওয়া ন্যায্য অধিকার বলিয়া মনে করি, সামাজিক ব্যাপারে সেই স্বাধীনতা আমরা লইতেও চাই না, দিতেও চাই না, এটাও ছিল কবির অভিযোগ। তিনি বলিলেন, "মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো কথাটা এই যে, কর্তৃত্বের অধিকারই মনুষ্যত্বের অধিকার।" মানুষ ভুল করিবেই, কিন্তু "ভুল করিবার স্বাধীনতা থাকিলে তবেই সত্যকে পাইবার স্বাধীনতা থাকে।" ভুলচুকের সমস্ত আশঙ্কা মানিয়া লইয়াও আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই। অথচ ঠিক এই কথাটাই যদি আমাদের সমাজকর্তাদের কাছে বলা যায় তাঁহারা চক্ষু রক্তবর্ণ করেন। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ও তীব্র সমালোচনা। তাঁহার বক্তব্য, মূলে মানুষ সত্য হইলে সমাজেও মানুষ সত্য, রাষ্ট্রব্যাপারেও মানুষ সত্য হয়।

ধর্ম ও ধর্মতন্ত্র মানুষের কাছে এক নয়— ধর্মতন্ত্রের কাছে মানুষ ধর্মকে খাটো করিয়া ফেলে, তাই পৃথিবীতে এত অসত্য পুঞ্জীভূত হয়, আমাদের সমাজেও তাই হইয়াছে। "ধর্ম বলে, মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত বা অপমানকারী কারো কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, মানুষকে নির্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখুঁত করিয়া না মান তবে ধর্মভ্রষ্ট হইবে। ধর্ম বলে, জীবকে নিরর্থক কষ্ট যে দেয় সে আত্মাকেই হনন করে। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, যত অসহ্য কষ্টই হ'ক, বিধবা মেয়ের মুখে যে বাপ-মা বিশেষ তিথিতে অন্নজল তুলিয়া দেয় সে পাপকে লালন করে। ধর্ম বলে, অনুশোচনা ও কল্যাণকর্মের দ্বারা অন্তরে বাহিরে পাপের শোধন। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, গ্রহণের দিনে বিশেষ জলে ডুব দিলে, কেবল নিজের নয় চৌদ্দপুরুষের পাপ উদ্ধার।…ধর্ম বলে, যে যথার্থ মানুষ সে যে-ঘরেই জন্মাক পূজনীয়। ধর্মতন্ত্র বলে, যে মানুষ ব্রাহ্মণ সে যতবড়ো অভাজনই হ'ক, মাথায় পা তুলিবার যোগ্য। অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র।"[৩]

এই বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ আগাগোড়া এই কথাই বলিলেন যে রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা যে স্বাধীনতা দাবি করিতেছি, সমাজনীতি ও ধর্মনীতির ক্ষেত্রেও সেই স্বাধীনতা দাও।

এই প্রবন্ধে বৃটিশ রাষ্ট্রনীতির খুবই তীব্র সমালোচনা ও শ্রীমতী বেসান্তের অন্তরীণের প্রতিবাদ আছে। প্রবন্ধটির প্রত্যেক ছত্রের মধ্যে এত তেজ ও খাঁটি সত্য কথা আছে— তাহা কি কর্তৃপক্ষ, কি দেশবাসী কাহারও পক্ষে হজম করা

১ প্রবাসী ১৩২৪ ভাদ্র, বিবিধ প্রসঙ্গ, 'প্রতিবাদের অধিকার', পৃ ৫৬২।

২ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ৫৪৫-৫৬৫।

৩ প্রবাসী ১৩২৪ ভাদ্র, পৃ ৫১৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ৫৫৪-৫৫।

কঠিন। আলফ্রেড থিয়েটারে যখন তিনি এই প্রবন্ধ পাঠ করেন, কী জনতা দেখিয়াছিলাম।[১] রাজনৈতিক সমালোচনাগুলি বেশ গরম গরম ছিল বলিয়া লোকে তাহার তারিফ করিয়াছিল; কিন্তু দেশের কুপ্রথা, মিথ্যা জড়তাকে দূর করিবার প্রস্তাব তাহারা সহজেই উপেক্ষা করিতে পারিল, কারণ রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম, তিনি হিন্দুর আধ্যাত্মিক আচার-বিচারের কী বুঝিবেন। হিন্দুর নিষ্ঠা প্রশংসনীয়। কিন্তু কোনো কোনো বিদেশী এ দেশে আসিয়া যখন এইসব নিষ্ঠা দেখিয়া ধারাবিগলিত হন, তখন আমাদের নিষ্ঠার দম্ভ শতগুণ বাড়িয়া যায়, কারণ সে তখন সাহেবের সার্টিফিকেট পাইয়া আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, এই নিষ্ঠাকে "বাহির হইতে তাঁরা সেই ভাবেই দেখেন, একজন আর্টিস্ট পুরানো ভাঙা বাড়ির চিত্রযোগ্যতা যেমন করিয়া দেখে— তার বাসযোগ্যতার খবর লয় না।" তাই প্রবন্ধশেষে বলিলেন, "সম্মুখে চলিবার প্রবলতম বাধা আমাদের পশ্চাতে; আমাদের অতীত তাহার সম্মোহনবাণ দিয়া আমাদের ভবিষ্যৎকে আক্রমণ করিয়াছে; তাহার ধূলিপুঞ্জে শুষ্কপত্রে সে আজিকার নূতন যুগের প্রভাতসূর্যকে ম্লান করিল, নবনব-অধ্যবসায়শীল আমাদের যৌবনধর্মকে অভিভূত করিয়া দিল, আজ নির্মম বলে আমাদের সেই পিঠের দিকটাকে মুক্তি দিতে হইবে তবেই নিত্যসম্মুখগামী মহৎ মনুষ্যত্বের সহিত যোগ দিয়া আমরা অসীম ব্যর্থতার লজ্জা হইতে বাঁচিব।"

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল যে-সমাজে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'ই চরমনীতি সে-সমাজে প্রতি ব্যক্তির আত্মকর্তৃত্বের কোনো স্থান থাকে না। তাহার মূল কথা ছিল যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা যে আত্মকর্তৃত্ব চাহিতেছি, সামাজিক ব্যাপারে সে অধিকারকে সংকুচিত করিলে চলিবে না। কবির এই মত সকলে স্বীকার করেন নাই। সামাজিক সকল ব্যাধি নিরাকৃত না হইলে, বা সামাজিক স্বাধীনতা না পাইলে রাষ্ট্রস্বাধীনতা পাওয়া যায় না— এ তত্ত্ব ইতিহাস প্রমাণ করে না। কিন্তু যে স্বাধীনতা মানুষের বুদ্ধিকে বোধকে মুক্তি দেয় না, সে-স্বাধীনতার ফল কখনো জাতির প্রতি-ব্যক্তি ভোগ করিতে পারে না— সে-রাজনৈতিক স্বাধীনতার সুবিধা মুষ্টিমেয়ের জন্য, সে-স্বাধীনতা কবির কাম্য নহে।

কবির এই ভাষণের দীর্ঘ সমালোচনা করেন বিপিনচন্দ্র পাল 'বুদ্ধিমানের ধর্ম' নামে প্রবন্ধ লিখিয়া (নারায়ণ ১৩২৪ ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক), তিনি বলেন, যে-শাস্ত্র আধ্যাত্মিক জীবনের অন্তরায় ভারতের সাধকরা সে-শাস্ত্রকে মানেন নাই। রবীন্দ্রনাথ সাধকদের সাধনার কথা আদৌ প্রবন্ধমধ্যে উল্লেখ করেন নাই; যুক্তিকে পঙ্গু করিয়া, বুদ্ধিবিচারকে বিসর্জন দিয়া যে শাস্ত্রানুগত্য বা আচারবশ্যতা ভারতের অগণিত জনসাধারণের মধ্যে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ কেবল তাহারই প্রতিবাদ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের যুক্তিকে এ ভাবে sophistry-র দ্বারা পাশ কাটাইয়া যাওয়া যায় না। "যে মূঢ়তা স্বাভাবিক তার প্রতিকার আছে। কিন্তু যে মূঢ়তা কৃত্রিম— যাহা জোর করিয়া কোমর বাঁধিয়া সর্বত্র তাল ঠুকিয়া বেড়ায় তার সঙ্গে পারিয়া ওঠা দায়।"[২]

'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' বক্তৃতার কয়েক দিনের মধ্যেই (শ্রাবণের শেষে) কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া যান;[৩] কলিকাতার উচ্ছ্বাস আবেগ সমস্তই পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছেন, নগরের উত্তেজনা এখানে কবিকে স্পর্শ করে না;

১ ১১ অগস্ট ১৯১৭ (২৬ শ্রাবণ ১৩২৪) আলফ্রেড থিয়েটারে কলেজ স্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের মোড়ের কাছে যে সভা হয় তাহার সভাপতি হন স্যর্ ভূপেন্দ্রনাথ বসু। নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনারায়ণ পাখোয়াজ বাজান ও 'বিচিত্রা'র দল 'দেশ দেশ নন্দিত' গানটি গাহেন। 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'র জবাবে লেখেন বিপিনচন্দ্র পাল 'বুদ্ধিমানের ধর্ম'; ইহার জবাব দেন বরদাচরণ গুপ্ত 'বুদ্ধিমানের কর্ম না' প্রবন্ধে। সবুজ পত্র ১৩২৪ আশ্বিন-কার্তিক পৃ ৪০৬-১৭। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী লেখেন 'শক্তিমানের ধর্ম' (সবুজ পত্র ১৩২৪ মাঘ, পৃ ৫৪৫-৬৮)।

২ পত্র, জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত। ৬ ভাদ্র ১৩২৪। দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ৫৯১।

৩ ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ১, শান্তিনিকেতন, ৩ ভাদ্র ১৩২৪।

তিনি লিখিতেছেন 'সংগীতের মুক্তি'। প্রবন্ধটি লেখা শেষ হইলে কবি কলিকাতায় যান।[১] নানা কাজের মধ্যে জড়াইয়া পড়িয়া কবি এবার দীর্ঘকাল সেখানে থাকিতে বাধ্য হন।

মুক্তিকামী কবি বিশ্বাস করেন সেই মুক্তিতত্ত্বে যাহা রাজনীতি ধর্মনীতি সমাজনীতি আর্টরীতিতে সমভাবে ও সর্বতোভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে— তাহাই জাতির পক্ষে পরিপূর্ণভাবে কল্যাণকর। ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রেও কবির সেই মুক্তিকামনা। কারণ আর্টের ক্ষেত্রে মুক্তিই হইতেছে চিত্তের মুক্তি— স্বাধীনতার প্রথম সোপান। কয়েক বৎসর পূর্বে 'সোনার কাঠি'[২] (সবুজ পত্র ১৩২২ বৈশাখ) প্রবন্ধে কবি সংগীতে এই মুক্তির দাবি পেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে জাতির ভাবাবেগ কখনো প্রাচীন বন্ধনের মধ্যে নিঃশেষে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। আত্মপ্রকাশের আনন্দই স্বাধীনতা— সেই তো সৃষ্টি। বাংলার ইতিহাস হইতে লেখক দেখাইলেন বাংলাদেশ অমোঘ শাস্ত্রের শাসন মানিয়া চলে নাই বলিয়া সে নব নব সৃষ্টিলীলার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছে। আমাদের সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন চিত্রকলা সবই আজ অচলতার বাঁধন হইতে ছাড়া পাইয়াছে। এখন আমাদের সংগীতও যদি এই বিশ্বযাত্রার তালে তাল রাখিয়া না চলে তবে ওর আর উদ্ধার নাই।

কবি যখন কলিকাতায় আসিলেন তখন নগরময় রাজনীতি লইয়া বিচিত্র আলোচনা গবেষণা আন্দোলন চলিতেছে। ২০ আগস্ট (১৯১৭) বিলাতের পার্লামেন্টের সমক্ষে তৎকালীন ভারত-সচিব মণ্টেগু ভারতের ভাবীশাসনের কিঞ্চিৎ আভাস দেন। ভারতীয়দের হস্তে দায়িত্বপূর্ণ যে শাসনভার দেওয়া হইবে তাহা ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে প্রদত্ত হইবে— মণ্টেগুর ভাষায় by successive stages। এই ঘোষণা প্রকাশিত হইলে দেশময় নানারূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল; মডারেট বা দক্ষিণপন্থীরা ইংরেজের দাক্ষিণ্যে খুশি। বামপন্থীরা সন্দিগ্ধ কৃপণের দান সরাসরি অগ্রাহ্য করিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে কেহই নিবৃত্ত হইলেন না। বামপন্থীর দল বাংলার কন্‌গ্রেসের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে অন্তরীণাবদ্ধ বেসান্তকে (১৯১৭) ডিসেম্বর-কলিকাতার কন্‌গ্রেস অধিবেশনে সভানেত্রী করা হউক। দক্ষিণ-পন্থী বা মডারেটদের আপত্তির কারণ যে, শ্রীমতী বেসান্ত রাজকোপে পড়িয়া অন্তরীণাবদ্ধ। এই শ্রেণীর ব্যক্তিকে কন্‌গ্রেসের সভানেত্রী করিলে ইংরেজ সরকারের সহযোগিতা হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইতে পারেন— এই তাঁহাদের আশঙ্কা।

মোটকথা নানাপ্রকার ওজর ও ওজুহাত তুলিয়া বাংলার প্রদেশিক কন্‌গ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতি বেসান্তের নাম সভানেত্রীরূপে গ্রহণ করিলেন না। ১৯০৭ সালের সুরাট কন্‌গ্রেস ভাঙিয়া যায় এই সভাপতি মনোনয়ন লইয়া।

বাংলাদেশেও অভ্যর্থনা সমিতি ভাঙিয়া গিয়া দুইটি দল হইয়া গেল। এ অবস্থায় বাংলার মান কে রক্ষা করিতে পারে? নেতারা রবীন্দ্রনাথের নিকট আসিলেন। তাঁহাদের অনুরোধ, কবিকেই বাংলার কন্‌গ্রেস অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়া যুব বাংলার মর্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। ৮ই সেপ্টেম্বর (২৩ ভাদ্র ১৩২৪) জোড়াসাঁকোর বাড়িতে উপস্থিত হইলেন অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষ; তাঁহার সঙ্গে ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ফজলুল হক্। দীর্ঘ আলোচনা হইল। দুইদিন পরে ১০ই মতিলাল ঘোষ মহাশয়কে পত্র লিখিয়া কবি জানাইলেন যে যদি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিপদ বিধি-অনুসারে শূন্য হইয়া থাকে, এবং যদি নিখিল কন্‌গ্রেস কমিটি কলিকাতার কন্‌গ্রেসের অধিবেশনে বেসান্তকে সভানেত্রী মনোনীত করেন তবে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করিবেন। নিখিল কন্‌গ্রেস সমিতির অনুমোদন না-আসা পর্যন্ত তাঁহার নাম যেন

১ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৫৮। ২৭ অগস্ট ১৯১৭ (১১ ভাদ্র ১৩২৪) "গানের লেকচারটা লেখা হয়েছে।...দুই তিন দিনের মধ্যেই যাব।" সংগীতের মুক্তি, সবুজ পত্র, ভাদ্র ১৩২৪, পৃ ২৫৫-২৮৬। ছন্দ, প্রথম সংস্করণ ১৩৪৩, পৃ ১৫২-১৯৯।

২ পরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮, পৃ ৫২২-২৪।

ব্যবহার না করা হয়।[১] সুখের বিষয়, এই দলাদলি বেশি দিন চলে নাই ; বাংলার প্রবীণ দল বেসান্তকে সভানেত্রী করিতে রাজী হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিপদ ত্যাগ করিলেন (৩০ সেপ্টেম্বর) ; ৪ঠা অক্টোবর অভ্যর্থনা সমিতির যে অধিবেশন হইল তাহাতে রায়বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেনের (১৮৪২-১৯২৩) সভাপতিত্বে যে অধিবেশন হইল তাহাতে শ্রীমতী বেসান্ত কন্‌গ্রেসের সভানেত্রী নির্বাচিত হইলেন। তরুণ বাংলার জয় হইল।

প্রবাসী পত্রিকা এই উপলক্ষে লিখিয়াছিলেন, "এই দলাদলির মধ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আপনার মান-অপমানের কথা বিন্দুমাত্রও মনে স্থান না দিয়া অতি সহজে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতির পদত্যাগ করিয়া যেরূপ মহানুভবতা দেখাইয়াছেন, তাহাও তাঁহার মত মানবপ্রেমিক ও দেশভক্তের উপযুক্ত হইয়াছে।"

অন্তরীণ হইতে মুক্তিলাভ[২] (৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৭) করিয়া বেসান্ত কলিকাতায় আসেন; তাঁহাকে কলিকাতা যথোপযুক্ত অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিল।[৩] তিনি রবীন্দ্রনাথের সহিত একদিন জোড়াসাঁকোয় আসিয়া দেখা করিয়া যান।

কিন্তু রাজনীতির আলোচনা রবীন্দ্রমানসের সমগ্র মূর্তি নহে। এ কথা মুহূর্তমাত্র ভুলিলে চলিবে না যে, তিনি জীবনশিল্পী, আর্টিস্ট ও কবি। তাই দেখি কলিকাতার এই বিচিত্র কর্ম-আবর্তন ও উত্তেজনার মধ্যে বিচিত্রায় চলিতেছে 'ডাকঘর' নাটিকা অভিনয়ের আয়োজন। অভিনয়ের ব্যবস্থায়, নাটকের মহড়ায়, রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে আলোচনায়, নানা পরিকল্পনা গড়িতে ও ভাঙিতে কবির কী আনন্দ। বিচিত্রার দ্বিতলগৃহে দুইদিন অভিনয়[৪] হয়— একদিন বিচিত্রার সদস্যদের জন্য ও আর-একদিন বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য। শেষদিন দর্শকদের মধ্যে ছিলেন অ্যানি বেসান্ত, লোকমান্য টিলক, মদনমোহন মালব্য ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।[৫]

কলিকাতায় যে মাসাধিক কাল ছিলেন, তখন কবির সময় যে কেবল রাজনীতির উত্তেজনায় কাটিয়াছিল, তাহা যেন পাঠক মনে না করেন। কলিকাতায় থাকিলে নানা কাজের আহ্বান আসে ; ১৫ সেপ্টেম্বর রাজনারায়ণ বসুর স্মৃতি-

১ Amritabazar Patrika, 1917 September 13.

২ মুক্তি দিবার সময় বড়লাট শ্রীমতী বেসান্তের কাছ হইতে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করেন যে ভারত-সচিব মণ্টেগুর আগমনকালে তিনি কোনো প্রকার আন্দোলন করিবেন না। মহম্মদ আলি ও সৌকত আলি ১৯১৫ সাল হইতে আটক। তাঁহারা কোনো প্রকার শর্ত দিতে রাজী না হওয়ায় মুক্তি পাইলেন না।

৩ প্রবাসী ১৩২৪ কার্তিক, পৃ ১১৫।

৪ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর—মাধব, অবনীন্দ্রনাথ—মোড়ল ও কবিরাজ, রবীন্দ্রনাথ—ঠাকুরদা, রথীন্দ্রনাথ—রাজকবিরাজ, অসিত হালদার—দই-ওয়ালার ভূমিকা গ্রহণ করেন। অমলের ভূমিকা গ্রহণ করে আশামুকুল দাশ নামে একটি বালক, আর অবনীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা সুরূপা—সুধা। বিচিত্রায় ডাকঘর অভিনয় হইবার পূর্বে কলিকাতায় ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ে এই নাটিকার একটি অভিনয় হয়— সেইখানে আশামুকুল প্রথম অমলের ভূমিকায় নামে। বালক আশামুকুল যেন কবির রচনার অন্তরে প্রবেশ করিয়া অভিনয় করিয়াছিল। আশামুকুল শিলঙে ডাক্তারি করিতেন, বর্তমানে এলাহাবাদে।

৫ বালগঙ্গাধর টিলক—শ্রীঅমল হোম। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩শ বর্ষ শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬৩ পৃ ৫০। শ্রীঅমল হোম লিখিতেছেন, অভিনয়-কালে তিনি রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে টিলক ও মালবীয়াজীর মাঝখানে বসিয়াছিলেন। তাঁহার উপর ভার ছিল যে অভিনয়প্রসঙ্গে তাঁহারা কিছু জানিতে চাহিলে যেন তাহার উত্তর দেওয়া হয়। পরলোকগত ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়ের উপর ভার ছিল গান্ধীজি ও মিসেস বেসান্ত কিছু প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর দেওয়া। মালবীয়াজী, মনে পড়ে, শেষের দিকে ভাববিগলিত হইয়াছিলেন ; তাঁহার চক্ষু সজল হইয়াছিল। টিলক নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের মতো— দৃষ্টি অভিনয়মঞ্চের উপর স্থিরনিবদ্ধ। মিসেস বেসান্ত অতীব আগ্রহে অভিনয় দেখিয়াছিলেন। শেষ দৃশ্যে সুধা যখন ফুল লইয়া আসিয়া বলিল—'অমলকে বোলো সুধা তাকে ভোলে নি,' তখন মিসেস বেসান্ত ডাক্তার মৈত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "What did she say ?" দ্বিজেন্দ্রবাবু উত্তর দিলে মিসেস বেসান্ত বলিলেন, 'You have exactly the same idea in Browning's "Evelyn Hope."' গান্ধীজি মনোযোগ সহকারে অভিনয় দেখিয়াছিলেন—কোনো কথা বলেন নাই।

সভায় কবিকে বক্তৃতা করিতে হইল।[১] এই মহাত্মাকে কবি যে কত শ্রদ্ধা করিতেন, তাহা 'জীবনস্মৃতি'-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। কয়েকদিন পরে (২৭ সেপ্টেম্বর) রামমোহন রায়ের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কবিকে সভাপতিত্ব করিতে হয়; গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ তর্কভূষণ বক্তৃতা করেন ও অজিতকুমার চক্রবর্তী এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা করেন, তাহার সারমর্ম 'তত্ত্বকৌমুদী' ও 'সঞ্জীবনী'তে প্রকাশিত হয়।[২] কবি বক্তৃতার একাংশে বলিলেন—"পৃথিবীর কোনো জাতি হীনতার মধ্যে চিরকাল থাকিবে না। বাঙালির নিরাশার কারণ নাই; বাঙালির গৃহে রামমোহন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।...বঙ্গের ভবিষ্যৎ গৌরব তখনকার গভীর অন্ধকারের মধ্যেই রামমোহন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তিনি বাঙালিকে বিশ্বের রাজপথ দেখাইয়া গিয়াছেন, বাঙালির কোনো নিরাশার কোনো আশঙ্কার কারণ নাই, বাঙালি বৃহৎ মনুষ্যত্বের পথে যাত্রা করিয়াছে।" বাঙালিকে এই আশার বাণী শুনাইবার বড়ই প্রয়োজন ছিল— কারণ তখন তাহার বড়ই দুঃখের দিন; অতি দুঃখের মধ্যে বাংলার যুবকদের দিন যাইতেছে। এই বক্তৃতাতেই কবি বলিলেন, "পৃথিবীর কোনো জাতি এখন আপনার সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকিতে পারিবে না। উহাতে যে হীন দেশাত্মবোধ জাগাইয়া থাকে তাহা হইতেই হানাহানি মারামারির সৃষ্টি হয়। এখন প্রত্যেক দেশকে আপন গৃহবাতায়ন খুলিয়া দিয়া বিশ্বকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। ছোট হইয়া থাকায় সুখ নাই— ভূমাতেই সুখ।"

ইহারই কয়েকদিন পরে তাঁহাকে শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে সভার সভাপতিত্ব করিতে হইল; এই শ্রমজীবী বিদ্যালয়টি ১৯০৯ সালে স্থাপিত হয়— ২১ অ্যান্টনি বাগান লেনে: ইহার সম্পাদক ছিলেন নববিধান সমাজের তরুণ যুবকরা।[৩] রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার ভাবাংশ 'সঞ্জীবনী' কাগজে বাহির হয়।[৪] বক্তৃতার এক স্থলে তিনি বলেন, "আমাদের দেশের অসংখ্য লোক অশিক্ষিত। তাহাদের উন্নতির জন্য আমাদের চেষ্টা করা কর্তব্য। এই আলোচনা এখন আর নূতন নহে। এ কথা মনে করিয়াও আমার লজ্জা হয় যে, গোখ্‌লে যখন অবৈতনিক নিম্ন শিক্ষা প্রবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তখন এই বঙ্গদেশ হইতেই তাহার প্রতিবাদ উঠিয়াছিল। এই দেশের কোনো কোনো বিশিষ্ট ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন, ছোটলোকেরা যদি বিদ্যাশিক্ষা করে, তাহা হইলে আমরা চাকর পাইব কোথায়? ... পূর্বে আমাদের দেশে ধনী ও দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে এখনকার মত ব্যবধান ছিল না। তখন এমন সকল আয়োজন ছিল যাহার দ্বারা সকল প্রকার জ্ঞানধর্মমূলক কথা আপনি সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত। উহার ফলে, পাশ্চাত্য দেশে ধনী-দরিদ্রের যে প্রভেদ, পণ্ডিতে মূর্খে যে প্রভেদ রহিয়াছে, আমাদের দেশে তেমন প্রভেদ কখনও হইতে পারে নাই। এখন ক্রমশ সেই প্রভেদ বাড়িতেছে।... ইহার কুফল ফলিয়াছে ও ফলিতেছে। পল্লীবাসী কৃষকেরা আমাদিগকে বিশ্বাস করে না।...ইহা এক ভবিষ্যৎ বিপ্লবের সূচনা করে।...বৈষম্য হইতেই বিপ্লবের সৃষ্টি...এই ব্যবধান দূর করিবার উপায় শ্রমজীবীদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।"

কলিকাতার কাজকর্ম চুকাইয়া কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গেলেন।[৫] এতকাল রাজনীতির সমস্যা লইয়া উত্তেজনার মধ্যে অথবা অভিনয়ের সৌন্দর্যকলায় মন নিবিষ্ট ছিল। কিন্তু তাহাই তো আর সমগ্র জীবন-ইতিহাস

১ সঞ্জীবনীতে তাঁহার বক্তৃতার চুম্বক প্রদত্ত হয়। দ্র. প্রবাসী ১৩২৪ কার্তিক, পৃ ১১৬।

২ প্রবাসী ১৩২৪ কার্তিক, পৃ ১১৪-১৫।

৩ ইহাদের অন্যতম ছিলেন জিতেন্দ্রমোহন সেন। পরে Dr. J. M. Sen, Asst. Director of Public Instructions, Bengal ও পরে কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ। এই সময়ে তিনি কেশব অ্যাকাডেমির সহকারী শিক্ষক হইতে হেড্ মাস্টার হইয়াছেন। শেষজীবনে ইনডিয়ান্ স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউট ও বিশ্বভারতীর সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন।

৪ প্রবাসী ১৩২৪ কার্তিক, পৃ ১০৬।

৫ ভানুসিংহের পত্রাবলী, ৬ কার্তিক ১৩২৪।

নহে— সংসার আছে, বিদ্যালয় আছে— এবং আছে তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যা— মনকে পীড়িত করে, কিন্তু নিস্তার নাই।

বাহির হইতে আঘাত পান সাহিত্য ও ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার মতামতের জন্য— অবশ্য সেটি নূতন নহে। তবে যখন আক্রমণটা অত্যন্ত মূঢ় রকমের হয়— তখন উত্তর না দিয়াও পারেন না। আমরা পূর্বে বলিয়াছি 'নারায়ণ' পত্রিকা কিছুকাল হইতে ব্রাহ্মসমাজ ও রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে আঘাত করিতেছে। আষাঢ় মাসে (১৩২৪) 'ধর্মপ্রচারে রবীন্দ্রনাথ' নামে এক প্রবন্ধের লেখক কবির ধর্মমতের সমালোচনা করিয়া বলিলেন, "রবীন্দ্রনাথ যে দিকটি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দেখিতে পাবেন নাই, তাহা হইতেছে শক্তি, বীর্য তেজ যুদ্ধ সংঘর্ষ ধূলি ঘনঘটা ঝঞ্ঝা রুদ্রের বিভূতি।" লেখক বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন যে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে সংঘর্ষ, জাতিতে জাতিতে যে সংঘাত বর্তমান যুগে অত্যুগ্র হইয়া উঠিয়াছে, সেই সমস্ত দ্বন্দ্ব বিরোধ মত্ততা প্রভৃতি "যতই কুৎসিত হউক না কেন, তাহারই মধ্যে রহিয়াছে সজীবতা, জীবনকে জগৎকে তীব্রতরভাবে স্পষ্টতরভাবে আলিঙ্গন করিবার প্রয়াস।" অজিতকুমার 'শক্তির ধর্ম ও আনন্দের ধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধে[১] 'নারায়ণে'র রচনার যে তীব্র সমালোচনা করেন, তাহা পাঠক এখনো পাঠ করিলে খুশি হইবেন।

রবীন্দ্রনাথ এই আলোচনায় প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করিলেন না বটে, তবে তিনি 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধের আরম্ভ করিয়াছেন এই প্রসঙ্গ তুলিয়া। "কথা উঠেছে আমার ধর্ম বাঁশির তানেই মোহিত; তার ঝোঁকটা প্রধানত শান্তির দিকেই, শক্তির দিকে নয়। এই কথাটাকে বিচার করে দেখা আমার নিজের পক্ষে দরকার"।[২]

সাধারণত ধর্ম বলিতে লোকে যাহা বুঝে রবীন্দ্রনাথ সে-অর্থে 'ধর্ম'কে ব্যবহার করেন নাই; তিনি কবি— তাঁহার কবিধর্ম বা অন্তরাত্মা কাব্যের মধ্য দিয়া কিভাবে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, কী প্রেরণায় তাঁহার চিত্তবীণা এতাবৎকাল ঝংকৃত হইয়া উঠিয়াছে— এই প্রবন্ধ তাহারই ব্যাখ্যান। তাঁহাকে বিশেষ কোনো ধর্মাঙ্কিত করিবার যে চেষ্টা হয়— ইহা তাহারই প্রতিবাদে লেখা। বলা যাইতে পারে ১৩১১ সালে 'বঙ্গভাষার লেখকে'র জন্য তিনি যে আত্মজীবনী লেখেন এই প্রবন্ধ সেই ধারায় বাঁধা— অবশ্য বলিবার ভঙ্গি সম্পূর্ণ পৃথক্। কবি আরও কিছুকাল পরে 'মানুষের ধর্ম' বলিয়া যে মত প্রচার করেন এই রচনাটিকে তাহারই কাব্যরূপ প্রকাশ বলা যাইতে পারে।

'আমার ধর্ম' রচনার প্রেরণা যাহাই হউক, এক হিসাবে উহা আত্মানুভূতির objective আলোচনা। সম্পূর্ণ বিভিন্ন অভিঘাতে লিখিলেন 'ছোটো ও বড়ো'[৩] প্রবন্ধ। শান্তিনিকেতন হইতে কবি ২৫ কার্তিক (১১ নভেম্বর) কলিকাতায় যান ও তথায় উহা পাঠ করেন।[৪]

এই প্রবন্ধে ভারতের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা আলোচিত হয়; দেশের মধ্যে যে একদল লোক ভারতসচিবের 'ঘোষণা' পাঠ করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহাদিগকে সাবধান করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিলেন যে, উল্লসিত হইবার বিশেষ কারণ নাই; কারণ ভারতের শাসনকার্যটা চালাইতেছে যে-ইংরেজ তারা বণিক বা আমলাজাতীয়। কোনো প্রকার আইডিয়ালের ধার তারা ধারে না। ভারতসচিব যা দিতে চান তার অনেকখানি এই ছোটো ইংরেজের হাতের মধ্য দিয়া আসিতে গিয়া নষ্ট হইয়া আসিবে। সুতরাং খুব আশান্বিত হইবার কারণ

১ ভারতী ১৩২৪ আশ্বিন, পৃ ৫৮২-৮৪।

২ সবুজ পত্র ১৩২৪ আশ্বিন-কার্তিক। দ্র. আত্মপরিচয়, পৃ ৪৪।

৩ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৬৩, ২৩ কার্তিক ১৩২৪, পত্র ৬৪।

৪ প্রবাসী ১৩২৪ অগ্রহায়ণ, পৃ ১২১-৩৪। দ্র. কালান্তর, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ ২৭২-২৯৩।

নাই। মণ্টেগুর আসিবার কিছু পূর্বে এই সময়ে হিন্দুমুসলমান-বিরোধ অকস্মাৎ বিহারে[১] দেখা দিয়াছিল ; এ ছাড়া অন্তরায়িতদের উপর অত্যাচার-কাহিনী কাগজে-পত্রে প্রায়ই প্রকাশিত হইতেছিল, প্রেস-আইন তখনো এত কড়া হয় নাই। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কেন বাধে ও যুবকরা কেন পথভ্রষ্ট হইতেছে রবীন্দ্রনাথ তাহার সুন্দর বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধে দিয়াছেন। শচীন্দ্র দাশগুপ্তের আত্মহত্যা[২] তাঁহাকে খুবই বিচলিত করিয়াছিল ; প্রবন্ধে একাধিকবার তিনি তাঁহার বেদনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি মানুষের বড় আদর্শকে বিশ্বাস করেন। তাঁহার মতে সে আদর্শ বড় ইংরেজের মধ্যেও আছে, আমাদের মধ্যেও আছে। আমাদের মধ্যে যে বড় সত্য বড় সাধনা বড় ত্যাগ তাহার দ্বারাই আমরা জয়ী হই। কলিকাতায় 'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধটি[৩] সভায় পাঠ করিবার পরও কবিকে দুই একটি সামাজিক কর্তব্য সাধন করিতে হইল ; তাহার অন্যতম হইতেছে 'বসুবিজ্ঞান মন্দির' উদ্বোধন অনুষ্ঠান। ১৪ অগ্রহায়ণ জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মদিন। ঐ দিনই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তজ্জন্য 'মাতৃমন্দির পুণ্যঅঙ্গন কর মহোজ্জ্বল আজ হে' গানটি পুরাতন একটি গান ভাঙিয়া নূতন করিয়া রচিয়া দেন।[৪]

ইহার কয়েকদিনের মধ্যেই কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গেলেন ; কারণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের জন্য যে কমিশন বসিয়াছিল তাহার সভাপতি সার্ মাইকেল স্যাডলার প্রমুখ কয়েকজন সদস্য শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে আসিলেন। স্যাড্‌লার ইংলণ্ডের লীড্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস-চান্‌সেলার, শিক্ষাশাস্ত্রী হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি -সম্পন্ন। রবীন্দ্রনাথের সহিত শিক্ষা সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়, তাহার সারমর্ম কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশিত হয়। আজ চল্লিশ বৎসর পর দেশের লোক যে কথা বলিতেছেন, তাহাই কবি সে দিন বলিলেন। ইংরেজি ভালো করিয়া শিখিতেই হইবে— তবে বিদ্যালয়ে ও কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে সকল জ্ঞানবিজ্ঞান শিখাইতেই হইবে। কমিশনের রিপোর্ট—

It is Sir Rabindranath's conviction that, while English should be skilfully and thoroughly taught as a second language, the chief medium of instruction in schools (and even in colleges up to the stage of the University degree) should be the mother tongue. ... He holds that the essential things in the culture of the West should be conveyed to the whole Bengali people by means of a widely diffused education, but that this can only be done through a wider use of the vernacular in the schools. Education should aim at developing the characteristic gifts of the people, especially its love of recited poetry and of the spoken

১ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ১৯১৭ সেপ্টেম্বর মাসে বিহার প্রদেশে হিন্দুরা মুসলমানদের উপর বকর-ঈদের সময় গো-কোরবানি লইয়া জুলুম করে। ২৮ সেপ্টেম্বর শাহাবাদ জেলায় (আরা) ইহা আরম্ভ হয় ; ২ অক্টোবর জেলার সর্বত্র দাঙ্গা ছড়াইয়া পড়ে, ও ছয় দিন তথায় অরাজকতা চলে ; ৯ই অক্টোবর গয়া জিলায় ত্রিশখানি গ্রাম লুটপাট হয়। প্রায় ১০০০ লোক ধরা পড়িয়া নানাভাবে শাস্তি পায়। ইতিপূর্বে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা এমন ব্যাপকভাবে কখনো হয় নাই। ভারতসচিবের ঘোষণা (২০ অগস্ট) ও নভেম্বরে তাঁহার আগমনের মধ্যে এই ঘটনাটি ঘটে। আধুনিক যুগে এইরূপ বিশেষ ঘটনার মুখে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা কয়েক বারই হইয়াছে।

২ শচীন্দ্রপ্রসাদ দাশগুপ্ত রংপুরের উকিল যোগেশচন্দ্র দাশগুপ্তের পুত্র। গবমেণ্ট তাহাকে পিতৃগৃহে অন্তরায়িত করে ও পুলিসের নজরবন্দী রাখে। এই নিষ্কর্মা অবস্থায় পুলিসের নিরন্তর উপদ্রবে যুবক উদভ্রান্ত হইয়া আত্মহত্যা করে। মৃত্যুবরণ করিবার পূর্বে সে পিতাকে যে পত্র লিখিয়া যায় তাহা প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। (প্রবাসী ১৩২৪ কার্তিক, পৃ ১০৯-১১)

৩ রথীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন (২২ কার্তিক ১৩২৭) "রামানন্দবাবুর তাগিদে একটা বাংলা প্রবন্ধ লিখে ফেলেচি— এটা এখনকার সাময়িক সমস্যা নিয়ে।...দুচার দিনের মধ্যে একবার দুচার দিনের জন্য কলকাতায় যাব।" চিঠিপত্র ২, পত্র ২১।

৪ শান্তিদেব ঘোষ ; রবীন্দ্রসংগীত, পৃ ১৪১-৪২। জগদীশচন্দ্রের ভাষণের পর কবির 'জনগণমন' গীত হইয়াছিল।

tale, its talent for music, its (too neglected) aptitude for expression through the work of the hand, its power of imagination, its quickness of emotional response. At the same time education should endeavour to correct the defects of the national temperament, to supply what is wanting in it to fortify what is weak, and not least to give training in the habit of steady co-operation with others in the alert use of opportunities for social betterment, in the practice of methods of organisation for the collective good.

For these reasons, in his own school at Bolpur, he gives the central place to studies which can best be pursued in the mother tongue ; makes full educational use of music and of dramatic representation, of imagination in narrative and of manual work ; of social service among less fortunate neighbours and of responsible self-government in the life of the school community itself. For the achievement of these aims he feels that, if the right place is found for it, there is strong need for British influence in Indian education. And he speaks with gratitude of the help which he has had from English teachers in his own school, but he would refuse such help at all costs, as being educationally harmful, where lack of sympathy prevented a true human relation between the English teacher and his Bengali pupils. (Calcutta University Commission 1917-19, Report, Vol I. p 226-28)

এদিকে ভারতসচিব মণ্টেগু হঠাৎ এ দেশে আসিয়া পড়িলেন ; তিনি কবে আসিবেন তাহা কেহ জানিত না ; কারণ যুদ্ধের সময়ে এসব সংবাদ প্রকাশ করা হয় না। যাহা হউক, তিনি সকল শ্রেণীর সভাসমিতির প্রতিনিধিদের সহিত মিলিত হইয়া দেশের ভাবী রাষ্ট্রকাঠামো সম্বন্ধে তাঁহাদের মত সংগ্রহ করিলেন। কলিকাতায় আসিবার পর একদিন 'বিচিত্রা' ভবনে তাঁহাকে সংগীতাদির দ্বারা আপ্যায়ন করা হইল (২১ ডিসেম্বর)। শোনা যায় দেশের অবস্থা সম্বন্ধে একখানি দীর্ঘ পত্র কবি মণ্টেগুকে লিখিয়াছিলেন।

পরদিন শান্তিনিকেতনের উৎসব সারিয়া কবি কলিকাতায় পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। কলিকাতায় কন্‌গ্রেস। কন্‌গ্রেসের উদ্‌বোধন-সংগীতের পর কবি তাঁহার বিখ্যাত India's prayer[১] পাঠ করিলেন ; কবির আবৃত্তি বিরাট প্যানডেলের প্রত্যেকটি কোণ হইতে শোনা গিয়াছিল ; তখন 'মাইক' আবিষ্কৃত হয় নাই।

কন্‌গ্রেসের সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত[২] ; তাঁহারই পার্শ্বে বোরখা-পরিহিত বসিয়াছিলেন আলিভ্রাতাদের বৃদ্ধা জননী ; আলিভ্রাতারা তখনো অন্তরায়িত। ১৯১৭ সালের শেষভাগে কন্‌গ্রেস ও লীগ রাজনীতির পৃথক্‌ সুর গাহিতে আরম্ভ করে নাই ; হিন্দুমুসলমানের ওই আপাত-মিলন দেখিয়া আশাবাদীরা স্বাধীনভারতের আকাশকুসুম দেখিয়াছিলেন।

কন্‌গ্রেস-শেষে বেসান্ত কলিকাতা হইতে মাদ্রাজে ফিরিয়া গেলেন ; এবার তিনি রাজনীতি হইতে শিক্ষানীতিতে মনোনিবেশ করিবেন। তিনি আদেরে যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার প্রেসিডেন্ট হন সার্‌ রাসবিহারী ঘোষ ও চানসেলার সার্‌ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীমতী বেসান্তের কল্পনা ছিল যে জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের

১ Modern Review, 1918 January.

২ শ্রীমতী অ্যানি বেসান্তের অভিভাষণের অনুবাদ। সাহিত্য, ১৩২৪ মাঘ, পৃ ৬৭৭-৭৭৯।

টেক্‌নলজিকাল বিভাগ কলিকাতার ন্যাশনাল কাউন্সিল অব্ এডুকেশন বা জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সহিত একযোগে চলিবে, বোম্বাইতে উহার কমার্শিয়াল বা বাণিজ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে, মদনপল্লীতে (মাদ্রাজ) কৃষিবিভাগ এবং কাশীতে নারীবিভাগ খোলা হইবে। এই পরিকল্পনার মধ্যে শান্তিনিকেতন ছিল না। রবীন্দ্রনাথ কখনো শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়কে তাঁহার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতামত ও কার্যাবলীর সহিত অঙ্গীভূত হইতে দেন নাই। কি স্বদেশী যুগের জাতীয় শিক্ষাপরিষদ্ আন্দোলনপর্বে, কি হোমরুল লীগ যুগের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনে ; এমন-কি গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের তীব্র উত্তেজনার মধ্যে— তিনি শান্তিনিকেতনকে বাহিরের উত্তাপ হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এবারকার এই শিক্ষা-আন্দোলনে শেষপর্যন্ত মদনপল্লীতে একটি সাধারণ কলেজ স্থাপন ছাড়া আর কিছুই কার্যকরী হয় নাই। অন্যান্যবারে রাজনৈতিক উত্তেজনার মুখে যেমন জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, তার পর আন্দোলন স্তিমিতগতি হইলে শিক্ষা-আন্দোলনও নীরব হইয়া আসিয়াছে— এবারও তাহাই হইল ; বরং দ্রুতই হইল— কারণ এবার আন্দোলন তেমন তীব্র ও দেশব্যাপী হয় নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই শিক্ষা-আন্দোলন নিষ্ফল হইল না। তিনি ভারতীয় বা জাতীয় শিক্ষা বলিতে কী বুঝায় তাহা ভাবিবার সুযোগ পাইলেন। শান্তিনিকেতনকে জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে কল্পনা কিছুকাল হইতে মনে হইতেছিল তাহা এখন হইতে সংকল্পে পরিণত হইল।

কন্‌গ্রেসের অধিবেশন, মণ্টেগুর অভিনন্দন, স্যাডলার কমিশনের অনুসন্ধান যুগপৎ চলিতেছে। রবীন্দ্রনাথ কখনো শান্তিনিকেতনে কখনো কলিকাতায়। যথার্থ সাহিত্যিক সৃষ্টির অবসর তাঁহার খুবই কম ; মাঝে একটি মাত্র গল্প লিখিলেন 'পাত্র ও পাত্রী' (সবুজ পত্র ১৩২৪ পৌষ)— সবুজ পত্রের শেষগল্প। ইহার পর আট বৎসর কবিকে কোনো গল্প লিখিতে দেখি না। 'তোতাকাহিনী' মাঘ মাসের সংখ্যায় বাহির হয় বটে, তবে তাঁহাকে গল্প বলা যায় না— উহা একটা political satire বা রাজনৈতিক ব্যঙ্গ। ভারতীয় তোতাপাখির প্রাণ কমিশন কমিটি ও তদারকের চোটে শেষ হইয়া গিয়াছে— অবশিষ্ট আছে স্তূপাকার কাগজের রিপোর্ট।[১]

মণ্টেগু আসিলেন— চলিয়া গেলেন। রবীন্দ্রনাথ দ্রষ্টার চক্ষে দেখিলেন যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে রঙিন কল্পনার কোনো কারণ নাই, বিদেশী শাসকের হাতের দানের কোনো মূল্য নাই। 'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ'[২] নামে একটি সময়োপযোগী প্রবন্ধ লিখিয়া তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার সমালোচনা করেন। তিনি বলিলেন, "বাহিরের দিক হইতে স্বাধীনতা পাওয়া যায় এমন ভুল যদি মনে আঁকড়াইয়া ধরি তবে বড়ো দুঃখের মধ্যেই সে ভুল ভাঙিবে। ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি নাই বলিয়াই অন্তরে বাহিরে আমাদের বন্ধন। যে-হাত দিতে পারে সেই-হাতই নিতে পারে। আপনার দেশকে আমরা অতি সামান্যই দিতেছি, সেইজন্যই আপনার দেশকে পাই নাই। বাহিরের একজন আমার দেশকে হাতে তুলিয়া দিলেই তবে তাহাকে পাইব, এ কথা যে বলে সে-লোক দান পাইলেও দান রাখিতে পারিবে না। আপন লোককে দুঃখ দিই, অপমান করি, অবজ্ঞা করি, বঞ্চনা করি, বিশ্বাস করি না— সেইজন্যই আপন পর হইয়াছে, বাহিরের কোনো আকস্মিক কারণ হইতে নয়।"

ইংরেজি নূতন বৎসরের (১৯১৮) গোড়া হইতে কবি প্রায়ই শান্তিনিকেতনে বাস করিতেছেন ; মাঝে দুই-

১ "পাখি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল। রাজা পাখিকে টিপিলেন, সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্‌খস্ গজ্‌গজ্ করিতে লাগিল।" লিপিকা, পৃ ৯৬। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ. ১৩৫।

২ কালান্তর, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, পৃ. ৩৯২-৪০১।

একবার কলিকাতায় যান। অন্য সাহিত্যিক সৃষ্টি নাই বলিলেই চলে।— একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "মনের ভিতরটা এমনি ক্লান্ত হয়ে আছে যে কোনো কাজই করতে ইচ্ছা করে না।"[১] কয়েকদিন পরেও লিখিতেছেন, "আজকাল কলম আর সরতে চায় না···কল বিগ্‌ড়ে গেছে।"[২] তাই মাঝে মাঝে নিজ রচনার ইংরেজি অনুবাদ করেন। মাঝে একবার 'অচলায়তন' ভাঙিয়া অভিনয়-উপযোগী 'গুরু' লিখিলেন।[৩]

এই সময়ের একটি মাত্র কবিতা— 'বিজয়ী'[৪] চোখে পড়ে। কবিতাটির মধ্যে সমসাময়িক মহাযুদ্ধে পৃথিবী-গ্রাসোদ্যত জার্মানদের ব্যর্থতার কথাটি অস্পষ্ট নহে; সত্যই একসময়ে

তারা দৃপ্ত-বেগের বিজয়-রথে
ছুটছিল বীর মত্ত অধীর রক্তধূলির পথ-বিপথে।···
ভাবল তারা,...
অন্ধকারের রুদ্ধ কপাট দীর্ণ করে ছিনিয়ে লবে
নিত্যকালের বিত্তরাশি;
ধরিত্রীকে করবে আপন ভোগের দাসী।

এই কবিতার শেষ দুই স্তবকে কি বলশেভিক রুশের ইঙ্গিত আছে?

শূন্যে নবীন সূর্য জাগে।
ঐ-যে তাহার বিশ্বচেতন কেতন-আগে
জ্বলছে নূতন দীপ্তিরতন তিমির-মথন শুভ্ররাগে;

তাই আশাবাদী কবি গাহিলেন—

আনন্দলোক দ্বার খুলেছে, আকাশ পুলক-ময়—
জয় ভূলোকের, জয় দ্যুলোকের, জয় আলোকের জয়।

পিয়ার্সনকে জাপানে কবি যে একখানি পত্র লেখেন, তাহা এই আশাবাদেরই বাণী।[৫]

চৈত্র মাসের শেষাশেষি কবি শান্তিনিকেতন হইতে কলিকাতায় আসিলেন ও 'ছন্দ' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 'সংগীতের মুক্তি' (১৩২৪ ভাদ্র) প্রবন্ধের শেষ দিকে সুর তাল লয় প্রভৃতি বিষয় উত্থাপন করিতে গিয়া ছন্দের কথা তোলেন; সেই ছন্দতত্ত্ব সম্বন্ধে নিজের মনকে পরিষ্কার করিবার জন্যই ইহার আলোচনা। এই ছন্দ লইয়া কবির মন যখন খুবই ব্যস্ত, সেই সময়ে লেখেন 'বিজয়ী' কবিতাটি অসম ছন্দের পরীক্ষায়।

শান্তিনিকেতন হইতে চৈত্র (১৩২৪) মাসের শেষাশেষি কবি যখন কলিকাতায় আসিলেন, তখন রথীন্দ্রনাথ শিলাইদহে; কবির কাছে আছেন কনিষ্ঠা কন্যা মীরা ও জামাতা নগেন্দ্রনাথ। এণ্ড্রুস সাহেব কয়েকদিন হইল ফিজি

১ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৬৫। ২০ মাঘ ১৩২৪।

২ ২৯ মাঘ ১৩২৪। চিঠিপত্র ৫, পত্র ৬৬।

৩ চিঠিপত্র ২, পত্র ২৩ শান্তিনিকেতন, ফাল্গুন ১৩২৪। "গুরু নাটকটার ছাপা সম্বন্ধে তাগিদ করিস্‌। প্রভাতকে বল্লেই হবে।" জীবনীকার তখন কলিকাতায় থাকেন, কবি তাঁহাকে বইখানি ব্রাহ্মমিশান প্রেসে ছাপাইবার জন্য দেন।

৪ প্রবাসী ১৩২৪ চৈত্র। দ্র. পূরবী ১ম সং পৃ. ৩-৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ. ৪।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে হিট্‌লার তাঁহার 'মাইনকাম্প' (ইং ১৯৩৩) গ্রন্থে বিশ্ববিজয়ের পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ করেন। প্রথম-মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মান সেনাপতি বার্নহার্ডি (Bernhardi 1849-1930) *Germany and the next war* (ইং অনুবাদ ১৯১১) গ্রন্থে অনুরূপ বিশ্বজয়ের পরিকল্পনাই করিয়াছিলেন। কবির মনে কি জারমেনির বিশ্বগ্রাসের কথাই জাগিতেছিল?

৫ দ্র. *Letters to a Friend*, p 76; ১০ মার্চ ১৯১৮।

দ্বীপ হইতে ফিরিয়াছেন— পথে অস্ট্রেলিয়া ঘুরিয়া আসেন। তিনি কবিকে বলেন যে অস্ট্রেলিয়ায় তাঁহাকে একবার যাইতে হইবে, সেখানে লোকে তাঁহাকে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। কবির মন এইসব সামান্য কথায় উত্তেজিত হয়, এবং সত্যসত্যই ক্রমে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করেন যে বিদেশে তাঁহার যাইবার একান্ত প্রয়োজন। বিদেশে যাইবার সমস্ত কথাবার্তা ঠিক করিয়া রথীন্দ্রনাথকে ৬ই এপ্রিল (১৯১৮) শিলাইদহে টেলিগ্রাম করিলেন। রথীন্দ্রনাথ কলিকাতায় পৌঁছিয়া দেখেন বিদেশে যাইবার সকল আয়োজনই সম্পূর্ণ — সঙ্গে নগেন্দ্রনাথ ও এণ্ড্রুস যাইবেন - তাহাও স্থির।

মনের এই উতলা অবস্থাতেও কবি শান্তিনিকেতনের বর্ষশেষ ও নববর্ষ (১৩২৫) উৎসব পালন না করিয়া পারিলেন না; কিন্তু ২রা বৈশাখ কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন। যাবার আগে রাণুকে যে একখানি পত্র লেখেন— তাহা কৌতুকে হাস্যে উজ্জ্বল— কিন্তু মনের মধ্যে যে-কথাটি সবচেয়ে বেশি করিয়া জাগিতেছে— সেটি ভ্রমণস্পৃহা, স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি লিখিতেছেন, "পাখিরা মাঝে মাঝে বাসা ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের ওপারে চলে যায়। আমি হচ্ছি সেই জাতের পাখি। মাঝে মাঝে দূর পার থেকে ডাক আসে, আমার পাখা ধড়ফড় করে ওঠে। আমি এই বৈশাখ মাসের [১৩২৫] শেষ দিকে জাহাজে চড়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দেব বলে আয়োজন করছি।...অস্ট্রেলিয়া, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি ছুটো চারটে জায়গায় নিমন্ত্রণ চট্ করে সেরে নিয়ে তার পরে তোমার ওখানে গিয়ে বেশ আরাম করে বসব।"[১]

লেখনীর মুখে বিদেশযাত্রার কল্পনা যতই বিস্তারলাভ করুক মনের তলায় নূতন সাহিত্য সৃষ্টির যে দখিন হাওয়া বহিতেছে— তাহাও 'পলাতকা'। বোধ হয় কবির অবচেতন মনটি এই নূতন কাব্যধারার নামটি দিল এই 'পলাতকা'[২]। 'পলাতকা' কবিতা গল্পশ্রেণীর রচনা— চৈত্র ও বৈশাখ মাসের মধ্যে লিখিত। তখন বিচিত্রায় সাহিত্য-মজলিস প্রায় প্রত্যহই সরগরম হইয়া বসে। কবি নূতন রচনা পড়িয়া শোনান। বহুকাল কবি গল্পও লেখেন নাই— কবিতাও লেখেন নাই; শেষ গল্প 'পাত্র ও পাত্রী' বাহির হয় পৌষ মাসের সবুজ পত্রে। তাই তাঁহার গল্প বলার মন ও কবিতা লেখার মনে মিলিয়া গিয়া এই গল্প-কবিতা সৃষ্টি করিল। গল্পের মধ্যে কবির অবচেতন মনের রুদ্ধ বাণী হঠাৎ-হঠাৎ প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলা মৃত্যুশয্যায়— তাহার নিঃসন্তান জীবনের ব্যর্থতা ও পরিণাম কবির মনে বহু রেখা টানিয়াছিল— সে আজ পলাতকার পথে; রোগিণীর রুদ্ধমনের কথা তাই কোনো কোনো কবিতায় আপনি উছলিয়া উঠিয়াছে। কবির নিজ মনের কথাটি প্রকাশ পাইয়াছে 'মালা' কবিতায়, বহু বৎসর পূর্বে লেখা বিখ্যাত 'পুরস্কার' কবিতার সহিত এটি তুলনীয়। কবি জীবনে বিজয়মালা পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু অন্তরাত্মা তাহাতে তৃপ্ত নহে,— সে খুঁজিতেছে বরণমালা— সবহারাদের কাছে— 'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে— সবার পিছে, সবার নিচে, সব হারাদের মাঝে।' কবির সাম্প্রতিক জীবনধারা—

ঘূর্ণী ধুলার মতো।
মানুষ শত শত—
ঘিরল আমায় দলে দলে—
কেউ বা কৌতূহলে,
কেউ বা স্তুতিচ্ছলে,
কেউ বা গ্লানির পঙ্ক দিতে গায়।

১ ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৫, ২ বৈশাখ, ১৩২৫ "আজ তিনটের গাড়িতেই রওনা হতে হবে।"

২ পলাতকা ১৩২৫ (১৯১৮) গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩।

হায় রে হায়
এক নিমেষে স্বচ্ছ আকাশ ধূসর হয়ে যায়।...
আমি মনে ভাবি, একি দহনজ্বালা
আমার বিজয়মালা।

কবির নিজ কর্মজীবনের ঝঞ্ঝাট কাটাইতে পারিতেছেন না, তাই অন্তরে অন্তরে এত বেদনা; তাহারই আভাস ব্যক্ত হইয়াছে 'আসল' কবিতাটির কয়েকটি পংক্তিতে—

এখন আমার বয়স হল ষাট,
গুরুতর কাজের ঝঞ্ঝাট।
পাগল করে দিলে পলিটিক্‌সে,
কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা স্বপ্ন আজ্‌কে নাগাদ হয়নি জানা ঠিক সে;
ইতিহাসেব নজির টেনে, সোজা
একটা দেশের ঘাড়ে চাপাই আরেক দেশের কর্মফলের বোঝা,
সমাজ কোথায় পড়ে থাকে, নিয়ে সমাজতত্ত্ব
মাসিকপত্রে প্রবন্ধ উন্মত্ত।
যত লিখ্‌ছি কাব্য
ততই নোংরা সমালোচন হতেছে অশ্রাব্য।
কথায় কেবল কথারি ফল ফলে,
পুঁথির সঙ্গে মিলিয়ে পুঁথি কেবল মাত্র পুঁথিই বেড়ে চলে।

আজ আমার এই ষাট বছরের বয়সকালে
পুঁথির সৃষ্টি জগৎটার এই বন্দীশালে
হাঁপিয়ে উঠলে প্রাণ
পালিয়ে যাবার একটি আছে স্থান।

কবি কলিকাতায় আছেন, বিদেশ যাইবার অনেক সুখস্বপ্ন দেখিতেছেন। এ দিকে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া ক্রমশই ঘোরালো হইয়া আসিতেছে। রুশ মহাযুদ্ধ হইতে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সেখানে নূতন সমাজ গড়িবার নব প্রয়াস দেখা দিয়াছে। আমেরিকা যুদ্ধে যোগদান করায় যুদ্ধের গতি বদলাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারতের নিকট হইতে নানাভাবে সহায়তা লাভের জন্য ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী সকলকে আহ্বান করিলেন। তজ্জন্য দিল্লীতে war conference হইবে (২৩ এপ্রিল ১৯১৮); ব্যোমকেশ চক্রবর্তী কামিনীকুমার চন্দ প্রভৃতি অনেকেই দিল্লীর কনফারেন্সে যাইবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের সহিত নানা বিষয়ে পরামর্শ করিয়া গেলেন; খাপার্দেও আসেন এই সঙ্গে। মোটকথা রবীন্দ্রনাথ কবি বলিয়া তাঁহাকে পাশ কাটাইয়া কেহই যাইত না— প্রয়োজনের সময়ে সকলেই তাঁহার পরামর্শ লইতে আসিত।

'বিচিত্রা'র ক্লাব পুরাদস্তুর চলিতেছে। ২৫ বৈশাখ (৬ মে) কবির ৫৭তম জন্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল। সেইরাত্রে এণ্ড্রুস দিল্লি হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন। কয়েকদিন পরে (৯ই) তিনি বাংলার লাটপ্রাসাদে লাটসাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারি মিঃ গুর্‌লের (Gourlay) সহিত কবির বিদেশযাত্রা লইয়া কথাবার্তা কহিতে

যান। সেই সময়ে কথাপ্রসঙ্গে গুরলে বলেন, সান্‌ফ্রানসিস্‌কোতে বৃটিশ গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে যে কয়জন ভারতীয় যুবকের বিচার হইতেছে, তাহাদের কাগজপত্র হইতে নাকি জানা গিয়াছে যে রবীন্দ্রনাথ উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। গুরলে বলেন, কবির বিরুদ্ধে গুজব যে তিনি ১৯১৬ সালে জাপান হইয়া আমেরিকায় গিয়াছিলেন জারমানদের অর্থানুকূল্যে। এই হইল বৃটিশ সরকারের বক্তব্য; আর আমেরিকায় গদর দলের বক্তব্য যে রবীন্দ্রনাথ বৃটিশের সার্‌ উপাধি পাইয়া আপনাকে তাহাদের কাছে বিকাইয়া দিয়াছেন। আসলে ন্যাশনালিজমের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করায় ভারতীয়রা যে বিরক্ত হয়, তাহার কারণ তাহারা ভারতের মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে। আর বৃটিশ গবর্নমেণ্ট যে তাঁহার উপর সদয় নহে তাহার কারণ কবি যুদ্ধের সময়ে ন্যাশনালিজমের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া পাশ্চাত্য যুবমনকে বিভ্রান্ত করিতেছেন। সুতরাং উভয় পক্ষই কবির নামে কুৎসা রটাইয়া তাঁহাকে বিদেশে যাইতে দিতে চাহে না।

আমেরিকার এইসব মিথ্যা অভিযোগের কথা শুনিয়া কবি অত্যন্ত বিরক্ত। ফলে তথায় যাইবার সংকল্পই পরিত্যক্ত হইল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা গুজবের প্রতিবাদ করিয়া প্রেসিডেণ্ট উইলসনকে এক পত্র দিলেন ও তাহার প্রতিলিপি পাঠাইয়া দিলেন বড়লাটকে। এ ছাড়া স্বয়ং গিয়া আমেরিকান কন্সালের সহিতও সাক্ষাৎ করিলেন; কন্সাল তাঁহাকে বলিলেন যে আমেরিকানরা তাঁহার সম্বন্ধে এই অভিযোগ আদৌ seriously লইবে না। লোকে তাঁহাকে পূর্বের ন্যায়ই সমাদর করিয়া গ্রহণ করিবে— আমেরিকায় যাইতে তাঁহার কোনো বাধা নাই। সুতরাং রহস্য পূর্বের ন্যায়ই জটিল থাকিল।

এই ঘটনার পরদিন (১২ মে) সংবাদ আসিল পিয়ার্সনকে পিকিং-এ ইংরেজ পুলিস বন্দী করিয়াছে। পিয়ার্সন প্রায় দেড় বৎসর হইল জাপানে ও চীনে আছেন; ভারতের স্বাধীনতাবাদী দলের সহিত তাঁহার কোনো প্রত্যক্ষ যোগ ছিল কি না জানি না; তবে তাঁহার জাপান হইতে প্রকাশিত একখানি পুস্তিকা (১৯১৭ জুলাই) ভারত গবর্মেণ্ট ঘোষণার দ্বারা বাজেয়াপ্ত বা proscribe করেন। এণ্ড্রুস সাহেব গুরলের সহিত দেখা করিতে গেলে, পিয়ার্সন যেসব আপত্তিকর প্রবন্ধাদি জাপান ও আমেরিকায় লিখিয়াছিলেন তাহার ফাইল তাঁহাকে দেখান।

পিয়ার্সনের বন্দী হইবার খবর পাইয়া এণ্ড্রুস সিমলায় চলিয়া যান (১২ মে) ও সাতদিনের মধ্যে ফিরিয়া আসেন (১৯ মে)। তিনি রবীন্দ্রনাথকে বলিলেন যে বড়লাট পিয়ার্সনের উপর মোটেই সদয় নহেন; তবে রবীন্দ্রনাথের নাম আমেরিকায় গদর মামলার সহিত কিভাবে যুক্ত হইল তাহার কিছুই তিনি জানেন না। গুরলে সাহেব ও বাংলার গবর্নমেণ্ট কিভাবে কোথা হইতে এই সংবাদ পাইলেন তাহার রহস্য আজও অবিদিত। রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা যাওয়া বন্ধ করিবার জন্য বৃটিশ গবর্নমেণ্টের এটা একটা চাল কি না বলা যায় না।

ইতিমধ্যে কবির জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলার মৃত্যু হইল (২ জ্যৈষ্ঠ। ১৬ মে ১৯১৮)। পাঠকের স্মরণ আছে, কিছু কাল তিনি কঠিন রোগে ভুগিতেছিলেন। ১৯১২ সাল হইতে শরৎচন্দ্র পৃথক্‌ বাসা করিয়া কলিকাতায় থাকিতেন। নানা কারণে ঠাকুরবাড়ির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ খুবই কম ছিল। কন্যাকে দেখিতে কবি প্রায়ই দুপুরে যাইতেন; ২রা জ্যৈষ্ঠ দুপুরে গিয়া শুনিলেন— বেলার মৃত্যু হইয়াছে। কবি মৃতা কন্যাকে না দেখিয়াই ফিরিয়া আসিলেন। বৈকালে 'বিচিত্রা' ভবনে গিয়া দেখি তিনি অন্যদিনের ন্যায়ই স্বাভাবিকভাবে সকলের সঙ্গে গল্পগুজব করিতেছেন। এত বড় শোকের কোনো চিহ্ন বাহিরে নাই। অথচ কবি বেলাকে যে কী ভালোবাসিতেন তাহা তাঁহার পরিবারের লোকদের নিকট শুনিয়াছি। কয়েকদিন পূর্বে তিনি শান্তিনিকেতন হইতে এক পত্রে রথীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন— "জানি, বেলার যাবার সময় হয়েচে। আমি গিয়ে তার মুখের দিকে তাকাতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। এখানে আমি জীবনমৃত্যুর উপরে মনকে রাখতে পারি, কিন্তু কলকাতায় সে আশ্রয় নেই। আমি এইখানে থেকে বেলার জন্যে

যাত্রাকালের কল্যাণ কামনা করচি। জানি আমার আর কিছু করবার নেই।"[১] কন্যার মৃত্যুর পর কোনো শোক প্রকাশ নাই, একটি মাত্র কবিতায় চরম কথাটি বলিয়াছেন—

এই কথা শুনি, সদা "গেছে চলে", "গেছে চলে।"
তবু রাখি ব'লে
বোলো না, "সে নাই।"
সে-কথাটা' মিথ্যা, তাই
কিছুতেই সহে না যে,
মর্মে গিয়া বাজে।
মানুষের কাছে
যাওয়া-আসা ভাগ হয়ে আছে।
তাই তার ভাষা
বহে শুধু আধখানা আশা।
আমি চাই সেইখানে মিলাইতে প্রাণ
যে-সমুদ্রে আছে নাই পূর্ণ হয়ে রয়েছে সমান।

এই 'শেষ প্রতিষ্ঠা' পলাতকা কাব্যের শেষ কবিতা। 'পলাতকা' মুদ্রিত হয় ১৩২৫ আশ্বিন মাসে।

বেলার মৃত্যুর কয়েকদিনের মধ্যেই কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গেলেন। তখন বিদ্যালয় বন্ধ। দারুণ গ্রীষ্মে 'দেহলি'র সেই ক্ষুদ্র গৃহটিতে গিয়া উঠিলেন, চারি দিক নিরালা তবু ভালো লাগিতেছে। এবার কবি শান্তিনিকেতনে চারিমাস একযোগে কাটাইয়া দিলেন— পূজার ছুটি হইলে পর কলিকাতায় যান (৫ অক্টোবর)।

এই পর্বটিতে কবি 'পলাতকা'র কয়েকটি কবিতা লেখেন বটে, কিন্তু আসলে এবার তিনি পুরোপুরি স্কুল-মাস্টার। এই কাজ গ্রহণ করিবার কারণ সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরীকে এক পত্রে লিখিতেছেন (৩ শ্রাবণ ১৩২৫), "মনটা ক্লান্ত হয়ে আছে। বিদ্যালয়ে আজকাল মাস্টারি করে থাকি। তাতে আমার প্রায় সমস্ত দিন কেটে যায়। এতে আর কিছু উপকার যদি নাও হয় তবু আমার মনটা সুস্থ থাকে। নানা কারণে উদ্‌বৃত্ত শক্তিকে যখন কাজে লাগাতে না পারি তখনি মন বিগড়ে যায়। লেখার প্রেরণা সব সময় থাকে না, অথচ মনের কলে দম দেওয়া থাকে বলে সে সব সময়েই চলতে থাকে— এই চলার জাঁতাটা যদি কিছু পেষবার না পায় তাহলে নিজেকে নিজে ক্ষয় করে।" কবির "মনের বেগটা লেখার দিক থেকে অন্য দিকে গবে গেছে।" একখানি পত্রে কবি তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের যে একটি চিত্র দিয়েছেন তাহা কবিরও জীবন বটে, স্কুলমাস্টারেরও জীবন বটে।[২]

"...আমি-যে চুপচাপ করে বসে থাকি তা মনে কোরো না। আমার কাজ চলচে। সকালে...তিন ক্লাসের পড়ানো আছে। তারপরে স্নান করে খেয়ে, যেদিন চিঠি লেখবার থাকে চিঠি লিখি। তারপরে বিকেলে খাবার খবর দেবার আগে পর্যন্ত ছেলেদের যা পড়াতে হয় তাই তৈরি করে রাখি। তারপরে সন্ধ্যার সময় ছাতে চুপচাপ বসে থাকি— কিন্তু এক-একদিন ছেলেরা আমার কাছে কবিতা শুনতে আসে। তারপরে অন্ধকার হয়ে আসে— তারাগুলিতে আকাশ ছেয়ে যায়— দিনুর ঘর (দ্বারিক) থেকে ছেলেদের গলা শুনতে পাই— তারা গান শেখে—তারপরে গান বন্ধ হয়ে যায়। তখন আদ্যবিভাগের ছেলেদের ঘর থেকে হারমনিয়াম্‌ এবং বাঁশির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গানের ধ্বনি উঠতে থাকে। ক্রমে

১ চিঠিপত্র ২, পত্র ২২ [১৯১৮]।

২ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৬৯।

রাত্রি আরো গভীর হয়, তখন ছেলেদের ঘরের গানও বন্ধ হয়ে যায়, আর দূরে গ্রামের রাস্তার ভিতর দিয়ে দুই একটা আলো চলচে দেখতে পাই। তারপরে সে আলোও থাকে না, কেবলমাত্র আকাশজোড়া তারার আলো। তারপরে বসে থাকতে থাকতে ঘুম পেয়ে আসে, তখন আস্তে আস্তে উঠে শুতে যাই। তারপরে কখন এক সময়ে আমার পূর্বদিকের দরজার সম্মুখে আকাশের অন্ধকার অল্প অল্প ফিকে হয়ে আসে, দুটো একটা শালিখপাখি উসখুস করে ওঠে, মেঘের গায়ে গায়ে সোনালি আভা ফোটে, খানিক বাদেই সাড়ে চারটার সময় আশ্রমবিভাগে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজতে থাকে, অমনি আমি উঠে পড়ি। মুখ ধুয়ে এসে আমার সেই পূর্বদিকের বারান্দার পাথরের চৌকির উপর আসন পেতে উপাসনায় বসি। সূর্য ধীরে ধীরে উঠে তার আলোকের স্পর্শে আমাকে আশীর্বাদ করে।"[১]

রবীন্দ্রনাথ কিভাবে এই সময়ে ইংরেজি পড়াইতেন, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনাটা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কবি শিক্ষাকে 'জলো' করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। ছাত্রেরা যাহাতে শক্ত জিনিস ভাঙিতে পারে, বড় কথা বুঝিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। ফলে ছাত্রদের দ্রুত চিন্তা করিতে হইত, মুহূর্ত মাত্র অনবধানতা বা শিথিলতার অবসর থাকিত না। সেইজন্য কবি কঠিন বই লইতে ভয় পাইতেন না। তিনি Ruskinএর Selection হইতে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রদের পড়াইতে শুরু করিলেন। প্রথমে তিনি বাংলায় ছোট ছোট সরল বাক্য দিয়া সেগুলিকে দ্রুত ইংরেজিতে অনুবাদ করাইয়া লইতেন; তার পর আর-একটি বাক্য ঐ ধরণের; এই রকম অনেকগুলি বাক্য ছাত্রদের দ্বারা মুখে মুখে করাইতেন; সঙ্গে সঙ্গে বিশেষণ, ক্রিয়ার বিশেষণ, phrase, clause জুড়িয়া জুড়িয়া সরল বাক্যটিকে কখন্ যে compound, complex বাক্য করাইয়া হইতেছেন, তাহা ছাত্ররা বুঝিতেই পারিত না, অথচ সমস্ত বাক্যটি তাহাদের আয়ত্তে আসিত। শেষকালে বইএর দীর্ঘ বাক্যটি যখন মুখে অনুবাদ করিতে দিলেন, তখন সেটা বালকের কাছে অত্যন্ত সহজ হইয়া গিয়াছে। এই বাক্যটি হইল তাহার text; সেই বাক্যটি সে খাতায় টুকিয়া রাখিল, অন্য সবগুলি মুখেমুখে করাইয়া ও বারেবারে পুনরাবৃত্তি দ্বারা মনের মধ্যে গাঁথিয়া দিয়াছেন। এই পদ্ধতি অনুসরণ করার কারণ এই যে কবি জানিতেন ভাষা জিনিসটা মন দিয়া গ্রহণ ও স্মৃতির মধ্যে ভরিয়া না রাখিতে পারিলে, যথাসময়ে তাহার প্রয়োগ করা যায় না। এই পদ্ধতিতে কবিকে পড়াইতে দেখিয়াছি।[২]

এবার গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যালয়ে অনেকগুলি গুজরাটি ছাত্র আসে; অ-বাঙালিকে কিভাবে বাংলা শিখাইতে হইবে সেসম্বন্ধেও কবি আদর্শ দেখাইতেছেন। ছেলেদের জন্য 'অনুবাদচর্চা' নামে বইটার পত্তন করিলেন এই সময়ে। মোটকথা কবি মনের আনন্দে আছেন, তাঁহার মনে হইতেছে যে আমেরিকায় না গিয়া ভালোই করিয়াছেন; (ভানুসিংহের পত্র)।

১ ১২ই শ্রাবণ ১৩২৫, ভানুসিংহের পত্রাবলী, প্রথম প্রকাশ ১৩৩৬।

২ কবির এই পঠন-পদ্ধতির একটি নমুনা আমরা নিম্নে উদধৃত করিলাম Matthew Arnold-এর Sohrab and Rostum হইতে:

1. Leaving his comfortable bed, he went abroad into the dismal train.

2. Leaving his lessons, he went abroad into the scorching heat of the noon, through the market-place, to the ruined temple by the river.

3. Leaving his hut, he went abroad into the pale mist of the morning, through the sugar-cane fields.

4. Leaving his companions, he went abroad into the dusk of the twilight through the flowering grass, along the river, to the landing place, where the boat was moored.

5. Leaving his cottage he went abroad into the glare of the afternoon sun through the crowds at the fair to the shady mango-grove where the sannyasi sat alone on a tiger-skin.

এইবার আসিল text—Leaving his own tent, he went abroad into the cold wet fog, through the camp to the tent of Peranwisa। এইভাবে Ruskinএর অনেক অংশ এবং Arnoldএর Sohrab and Rostum তৈয়ারি করিয়া তোলেন। তার পর যখন Arnoldএর মূল কবিতাটি পড়াইলেন তখন উহা বুঝিতে ছাত্রদের কোনো প্রকার কষ্ট হইল না।

এই সময়ে কবির নিজস্ব রচনা খুবই কম ; 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র ইংরেজি তর্জমা করিয়াছেন, 'মুকুটে'র অনুবাদ হইয়াছে, এই রকমের কাজ চোখে পড়ে। সবুজ পত্রের তাগিদে আর মন জাগে না,লেখা বাহির হয় না। এমন সময় 'ভাণ্ডার'নামে নূতন একখানি কাগজ (১৩২৫ শ্রাবণ) Bengal Co-operative Organisation Society হইতে প্রকাশিত হইল ; সম্পাদক ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তারকচন্দ্র রায ; কিন্তু বেসরকারী তরফের সুধীরচন্দ্র লাহিড়ী (মৃত্যু : অক্টোবর ১৯৪৭) ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ। ভাণ্ডারের জন্য রবীন্দ্রনাথ 'সমবায়' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান। সমবায় বা সংঘশক্তির উপর কবির চিরনির্ভর ; বাহির হইতে কোনো কাজ হইতে পারে না, গ্রামের উন্নতি গ্রামেরই লোকের সহযোগিতা ভিন্ন হইতে পারে না, এ কথা বহুকাল হইতে তিনি বলিয়া আসিতেছেন এবং তাহার পরীক্ষা করিবারও চেষ্টা করিযাছেন নিজ জমিদারিতে। কবি এই প্রবন্ধে সমবাযের আবশ্যকতা উপযোগিতা ও বর্তমানকালের জীবনযুদ্ধে দরিদ্রের পক্ষে তাহার অপরিহার্যতার কথা সহজ ও সরল ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। "এই কো-অপারেটিভ-প্রণালীতেই আমাদের দেশকে দারিদ্র্য হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়। আমাদের দেশে কেন, পৃথিবীর সকল দেশেই এই প্রণালী একদিন বড়ো হইযা উঠিবে। ধনী আপন টাকার জোরে নির্ধনের শক্তিকে সস্তা দামে কিনিয়া লইতে চায়, ইহাতে করিযা টাকা এবং ক্ষমতা কেবল এক এক জাযগাতেই বড় হইয়া উঠে এবং বাকি জায়গায় সেই বড় টাকার আওতায় ছোট শক্তিগুলি মাথা তুলিতে পারে না। কিন্তু সমবায়-প্রণালীতে চাতুরী কিংবা বিশেষ একটা সুযোগে পরস্পর পরস্পরকে জিতিযা বড হইতে চাহিবে না, মিলিয়া বড হইবে।"[১] পাঠকরা যেন ভুলিয়া না যান— কবি এইটি লেখেন ১৯১৮ সালে, কম্যুনিজমের বুলি তখনো এ দেশে আমদানি হয নাই।

বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা

১৯১৮ অব্দের গ্রীষ্মাবকাশের পর কলিকাতা ও ঝরিয়া-প্রবাসী গুজরাটিদের অনেকগুলি ছেলে আশ্রমে বিদ্যার্থী হইয়া আসে। শান্তিনিকেতন-যে উহার বাঙালিত্বের ক্ষুদ্র সীমানা ভাঙিয়া বাহিরের ছাত্রদের আহ্বান করিতে পারিযাছে— এই ঘটনাটি কবির মনকে খুব নাড়া দিল। পূজাবকাশের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ হইবার পূর্বে তিনি একদিন এণ্ড্রুস ও রথীন্দ্রনাথকে বলিলেন, শান্তিনিকেতনকে ভারতীয়দের শিক্ষাকেন্দ্র করিয়া তুলিতে হইবে ; এখানে ভারতের নানা প্রদেশের ছাত্র আসিবে এবং যথার্থ ভারতীয শিক্ষা তাহারা গ্রহণ করিবে ; বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্ররা নিজ নিজ আচার ব্যবহার নিজেরা পালন করিতে পারিবে, একত্র শিশুকাল হইতে বাস করিয়া ছাত্ররা একটি জাতীয় আদর্শ চর্চা করিতে সক্ষম হইবে। বোলপুরের বিদ্যালয় প্রাদেশিক থাকিবে না— সাম্প্রদায়িক হইবে না।

কবির এ ভাবনা নূতন বা আকস্মিক নহে। ১৯১৬ সালে আমেরিকার শিকাগো হইতে কবি রথীন্দ্রনাথকে যে পত্র লেখেন (২৮ অক্টোবর) তাহাতে এই আদর্শের কথা অতি স্পষ্ট করিযাই বলিয়াছিলেন, "শান্তিনিকেতন বিদ্যালযকে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে— ঐখানে সার্বজাতিক মনুষ্যত্ব চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে— স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসচে— ভবিষ্যতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামিলন -যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্চে তার প্রথম আযোজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে।"[২]

১ সমবায়নীতি। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। শততম সংখ্যা। ১৩৬০।

২ চিঠিপত্র ২, পৃ ৫৫, ৫৬। রথীন্দ্রনাথ তাঁহার ডায়েরিতে লিখিতেছেন, (8 Oct. 1918) "Just before coming down (to Calcutta) while talking with me and Mr. Andrews father got excited over the idea of making the Bolpur Institution a truly representative Indian education colony, where boys from all the provinces of India would come together to get an education and culture that is national and at the same time modern. The different colonies

জাতীয় শিক্ষা লইয়া শ্রীমতী বেসান্ত যে সাম্প্রতিক আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার মধ্যে ইন্‌জিনিয়ারিং কমার্স, কৃষি প্রভৃতি সকল বিষয়েরই স্থান আছে— নাই কেবল সংস্কৃতির স্থান, কারণ প্রত্যেকটি ভাবী প্রতিষ্ঠানের গায়েই তাহার উদ্দেশ্যটা আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ভারতের অখণ্ড জাতীয়তাবোধ উদ্রিক্ত করিতে হইলে এমন-কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা উচিত, যাহা সর্বজাতির, সর্বধর্মের, সর্বভাষাভাষী ভারতীয়ের জ্ঞানালোচনার কেন্দ্র হইতে পারে ; কবির মনে এতদিন যাহা অবচেতনে ছিল, আজ সামান্য অনুকূলতার আভাসে তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

বিদ্যালয় পূজাবকাশের জন্য বন্ধ হইলে[১] রথীন্দ্রনাথ ও এণ্ড্রুসকে লইয়া কবি কলিকাতায় গেলেন (২১শে আশ্বিন)। পরদিন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কলিকাতার অনেকগুলি গুজরাটি ব্যবসায়ী কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন ; কবি তাঁহাদের নিকট সর্বপ্রথম তাঁহার 'বিশ্বভারতী'-পরিকল্পনা প্রকাশ করিলেন। শান্তিনিকেতন ভারতীয় নানা জাতির মিলনভূমি হইবে, এই আদর্শ সকলকেই যেন উৎসাহিত করিল। আপাতত ব্যবসায়ীরা দেখিলেন যে তাঁহাদের ছেলেদের একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষার সুযোগ মিলিবে। রবীন্দ্রনাথ ভাবিলেন সকলেই তাঁহার মহৎ জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছে।

দিন তিন-চার কলিকাতায় থাকিয়া কবি মাদ্রাজ যাত্রা করিলেন (১২ অক্টোবর), সঙ্গে চলিলেন তরুণ শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর ও সঙ্গীত-অধ্যাপক ভীমরাও শাস্ত্রী। কিন্তু মাদ্রাজ পর্যন্ত যাওয়া হইল না, পথের মধ্যে ট্রেন গেল বিগড়াইয়া। বিরক্ত হইয়া কবি মাদ্রাজ যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করিয়া পিঠাপুরমে নামিলেন ; পিঠাপুরমের রাজা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অতি শ্রদ্ধাবান, কবি তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। রাজার বিখ্যাত বীণকর সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রীর বীণবাদন শুনিয়া কবি মুগ্ধ। দক্ষিণী বীণ উত্তরের বীণা হইতে পৃথক্। কবির অনুরোধে মহারাজা ভীমরাওকে এই বীণ শিখিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং কয়েকমাস সঙ্গমেশ্বরকে শান্তিনিকেতনে আসিয়া বাস করিবারও অনুমতি দেন। এবারকার দক্ষিণভারত যাত্রার এইটিই সব থেকে বড় লাভ ; কারণ কবি যে মাদ্রাজে যান নাই— ভালোই হইয়াছিল। শুনিয়াছি সেবার সেখানে কবি সম্বন্ধে লোকে বিশেষ কোনো উৎসাহ বোধ করে নাই ; আসলে মাদ্রাজ কোনোদিনই কবির বাণীতে তেমন একটা সাড়া দেয় নাই— যদিও তাঁহার কাব্য ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে সমঝদারের অভাব হয় নাই। ইহার কারণ কবি যেখানে সমাজ-সংস্কারক সেখানে তিনি তাহাদের মতে প্রচণ্ড বিপ্লবী ; হিন্দুসমাজের বর্ণভেদ-প্রথার মধ্যে সূচ্যগ্র ছিন্নতা তাহারা সহ্য করিতে পারে না। আর সে-সময়ে মাদ্রাজে ব্রাহ্মণদেরই প্রাধান্য ছিল— চল্লিশ বৎসর পর যাহার চিহ্ন প্রায় অবলুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। পিঠাপুরম হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া কবি শান্তিনিকেতনে চলিয়া আসিলেন (২০ অক্টোবর), তখন বিদ্যালয় বন্ধ— খুলিবে নভেম্বরের মাঝামাঝি বা অগ্রহায়ণের গোড়ায়। ছুটির মধ্যে রাণুকে হ্রস্বদীর্ঘ লঘুগুরু পত্র লিখিতেছেন, আর 'অনুবাদচর্চা'র জন্য উপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন। এই কার্যে কবি অনেকেরই সহায়তা লাভ করেন ; সেই সময়ে রামানন্দবাবুর পরিবার শান্তিনিকেতনে থাকিতেন।[২] রামানন্দবাবুর কন্যাদ্বয় শান্তা ও সীতা দেবীকে কবি মাঝে

of boys would keep to their own peculiar customs and manners where they do not conflict with our national ideals, and they would thus get a training from their childhood to respect each other inspite of outward differences. Bolpur Institution should not be sectarian or provincial."

১ ১৮ আশ্বিন ১৩২৫ ॥ ১৯১৮ অক্টোবর ৫।

২ রামানন্দবাবু যে বাড়িতে বাস করিতেন, সেটি এখন নাই। খড়ের একখানি ঘর, উহা শচীন্দ্রমোহন বসু নিজ ব্যয়ে নির্মাণ করেন। শচীন্দ্রমোহন ১৯১১-১৩ সালে আশ্রমে অবৈতনিক শিক্ষকরূপে কাজ করেন। ইনি নাগপুরের বিখ্যাত বিজয়কৃষ্ণ বসুর পুত্র। শচীন্দ্রমোহন বিদ্যালয় হইতে কোনো অর্থ গ্রহণ করিতেন না ; তাঁহার নির্মিত বাড়িখানি বিদ্যালয়কে দিয়া যান। ঐ বাড়িখানি পুড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। বর্তমান কলেজ হোস্টেলের হাতার মধ্যে উহা অবস্থিত ছিল, উহার পাশ দিয়া ছিল আশ্রম-প্রবেশের পথ, আশ্রমের ছেলেরা তাহা তৈয়ারি করে। সে রাস্তাও এখন নাই।

মাঝে অনুবাদচর্চার কাজে লাগাইতেন ; এ ছাড়া শিক্ষকদের অনেকেই ছিলেন। অনুবাদ যাহাতে খুব মূলঘেঁসা হয়— অথচ বাংলাভাষাটা যাহাতে অনুবাদ-গন্ধী না হয়— সেই দিকেই দৃষ্টি ছিল বেশি। 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা' প্রকাশিত হইলে এই অনুবাদরীতি সম্বন্ধে কবি স্বয়ং আলোচনা করেন এবং অন্যের আলোচনাও আহ্বান করেন।

পাঠকের স্মরণ আছে কবির শেষ গানের বহি 'গীতালি' প্রকাশিত হয় ১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ; তার পর ঐ বৎসরের ফাল্গুন মাসে 'ফাল্গুনী'র অনেকগুলি গান লেখেন। ১৩২২ হইতে ১৩২৫-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত চারি বৎসরের মধ্যে যে পঞ্চাশটি গান রচিত হয়, তাহা 'গীতপঞ্চাশিকা'য় (১৩২৫ আশ্বিন) মুদ্রিত হইল। অগ্রহায়ণ মাস হইতে যে গানের পালা শুরু হয় তাহার সংগৃহীত রূপ হইতেছে 'গীতবীথিকা' (১৩২৬ বৈশাখ)। গীতবীথিকায় মাত্র ২০টি গান আছে ; ইহার মধ্যে সমধিক পরিচিত— 'মাটির প্রদীপখানি' 'আকাশ জুড়ে শুনিনু' 'তোমারি ঝরনাতলায' 'গানের ভিতর দিয়ে যখন' প্রভৃতি।

পূজার ছুটির পর বিদ্যালয় খুলিলে ক্লাস আরম্ভ হইল। কবি যথানিয়মে স্কুলমাস্টারি শুরু করিলেন। বহুকাল পরে কবি-কণ্ঠে গানের সুর শোনা যাইতেছে।

সাহিত্যসৃষ্টির দিক হইতে ১৩২৫ সালটি অত্যন্ত দীন ; তবে এই বৎসরের গোড়া হইতে পৌষের মাঝামাঝি পর্যন্ত লিখিত ২৭ খানি পত্র 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' নামে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইযাছে, তাহাকে যথার্থ সাহিত্যই বলা যায়। পত্র রচনা একটি আর্ট, তাহা কবির খুব ভালো করিযা জানা ছিল— সেইজন্য তাঁহার অতি তুচ্ছ পত্রেও সাহিত্যের আনন্দ পাওয়া যায়। 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' কবি লেখেন 'রাণু'কে। রাণু হইতেছে কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রী ফণীন্দ্রনাথ অধিকারীর তৃতীয় কন্যা। সার্ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যাযের পুত্রবধূ। বালিকার বযস যখন বছর দশ তখন সে কবির সঙ্গে মিতালী করিয়া পত্র দেয় ও তাঁহাকে 'ভানু'দাদা আখ্যা দেয ; সেইজন্য এই পত্রধারার নাম হয 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'। কবি যখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন সেই পর্বেই বেশির ভাগ পত্র লেখা— ৫ই শ্রাবণ হইতে ১৯শে পৌষ ১৩২৫এর মধ্যে (পত্র ৬-৩১ পর্যন্ত)। অবশিষ্ট ২৭খানি লেখেন ১৩২৬ হইতে ১৩৩০এর, অর্থাৎ পাঁচ বৎসরের, মধ্যে। প্রথম দিকের ২৬খানি পত্র (৬-৩১) লিখিত হয সাড়ে পাঁচ মাসের মধ্যে। সুতরাং ইহাকে বলা যাইতে পারে পত্রধারা, কেবল পত্রাবলী বা পত্রগুচ্ছ নহে। এই পত্রধারা হইতে কবিজীবনের যে একটি চিত্র পাই, তাহার সহিত একমাত্র 'ছিন্নপত্রে'র তুলনা হইতে পারে।

৭ই পৌষের উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইল ; কবি তাহার একটি সুন্দর বর্ণনা দিযা যে পত্রখানি রাণুকে লেখেন তাহা সাহিত্যের দিক হইতে উপভোগ্য। মন্দিরে কবি যে ভাষণ দান করেন তাহা লিখিত হয নাই বলিযাই মনে হয।[১] গত শ্রাবণ মাস হইতে কবি নিযমিতভাবে বুধবারের মন্দিরে যেসব উপদেশ দেন তাহাও লিখিতাকারে পাই না। তবে কযেকটির চুম্বক পাই ভানুসিংহের পত্রাবলীর মধ্যে। কবি বালিকা রাণুকে সেইসব উপদেশের সারমর্ম লিখিযা পাঠাইতেন।

৭ই পৌষের উৎসবের পরদিন (৮ই) মহাসমারোহে বিশ্বভারতীর পত্তন হইল।[২] বর্তমানে যেখানে পাঠভবনের ছাত্রদের ব্যারাকগুলি নির্মিত হইয়াছে সেইখানে নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিযা ভিত্তিপ্রস্তর প্রোথিত করা হইল ; নানাজাতি ও ধর্মের লোক ইহাতে যোগদান করেন। এই উপলক্ষে বহু গুজরাটি বিশ্বভারতীর জন্য কয়েক সহস্র টাকা দেন ; কিন্তু পরে ঐ স্থানে গৃহ নির্মাণ না করিযা সেই অর্থ দিয়া বর্তমান শিশুবিভাগের বাড়িটি তৈয়ারি

১ পত্র ১১, পত্র ১৭— ২৯ ভাদ্র ১৩২৫। পত্র ২১, ১৬ই আশ্বিন ১৩২৫।

২ উৎসবের পূর্ব দিন (৬ই পৌষ) প্রমথ চৌধুরীকে লিখিতেছেন— "অনেক দিন পরে সবুজ পত্র পড়ে খুব ভাল লাগ্‌ল।…আগামী বারে আমি একটা কিছু লেখা দেব মনে করচি— কিন্তু সেই আগামী বারটা কোন্ বার ?" চিঠিপত্র ৫, পত্র ৭২।

হয়, তাহা এখন, 'সন্তোষালয়' নামে পরিচিত। বিশ্বভারতীর অধ্যয়ন-অধ্যাপনার কার্য আরম্ভ হয় ১৩২৬ সালে গ্রীষ্মাবকাশের পর, যথাস্থানে তাহার আলোচনা হইবে।

এ দিকে উৎসবের পর পৃথিবীব্যাপী ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার মহামারি শান্তিনিকেতনেও দেখা দিল; দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্রবধূ (কৃতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী) সুকেশী দেবীর মৃত্যু হইল। তিনি আশ্রম-বালকদের জননীর ন্যায় সেবা করিতেন। এর কয়দিন পূর্বে (৯ই পৌষ) পৌষ-উৎসবের অঙ্গরূপে মেয়েদের একটি আনন্দ-মেলা হয়, তাহাতে তিনি যে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন তাহার কথা কবির পত্রে পাই। প্রতিমা দেবী মৃত্যুর কবল হইতে ফিরিয়া আসিলেন। কলিকাতা হইতে অজিতকুমার চক্রবর্তীর মৃত্যুসংবাদ আসিল ৩০ ডিসেম্বর ১৯১৮। এইরূপ দুঃসংবাদাদির মধ্যে কবির মন যে কোথায় তাহার ঠিক সংবাদ দেওয়া কঠিন। তিনি ১৯ পৌষ ১৩২৫ (৩ জানুয়ারি ১৯১৯) রাণুকে যে পত্র লিখিতেছেন তাহার মধ্যে এ সবের কোনো আভাস নাই— খুব হালকা ভাবে পত্রখানি লেখা। তাহাতে জানাইতেছেন, "পরশু চললুম মৈসুরে, মাদ্রাজে, মাদুরায় এবং মদনাপল্লীতে। ফিরতে বোধ হয় জানুয়ারি কাবার হয়ে ফেব্রুয়ারি শুরু হবে···"।

এই তো ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়।
শালের বনে খ্যাপা হাওয়া, এই তো আমার মনকে মাতায়।
রাঙা মাটির রাস্তা বেয়ে
হাটের পথিক চলে ধেয়ে,
ছোটো মেয়ে ধুলায় বসে খেলার ডালি একলা সাজায়—
সামনে চেয়ে এই যা দেখি চোখে আমার বীণা বাজায়॥
আমার এ যে বাঁশের বাঁশি মাঠের সুরে আমার সাধন,
আমার মনকে বেঁধেছে রে এই ধরণীর মাটির বাঁধন।
নীল আকাশের আলোর ধারা
পান করেছে নতুন যারা
সেই ছেলেদের চোখের চাওয়া নিয়েছি মোর দু-চোখ পুরে,
আমার বীণায় সুর বেঁধেছি ওদের কচি গলার সুরে॥

দূরে যাবার খেয়াল হলে সবাই মোরে ঘিরে থামায়,
গাঁয়ের আকাশ সজনে ফুলের হাতছানিতে ডাকে আমায়।
ফুরায়নি ভাই, কাছের সুধা,
নাই যে রে তাই দূরের ক্ষুধা ;
এই-যে এ-সব ছোটোখাটো পাইনি এদের কূল-কিনারা,
তুচ্ছ দিনের গানের পালা আজও আমার হয়নি সারা॥

লাগল ভালো মন ভোলালো এই কথাটাই গেয়ে বেড়াই ;
দিনে রাতে সময় কোথা, কাজের কথা তাই তো এড়াই।
মজেছে মন মজল আঁখি,
মিথ্যে আমায় ডাকাডাকি ;
ওদের আছে অনেক আশা ওরা করুক অনেক জড়ো,
আমি কেবল গেয়ে বেড়াই চাই নে হতে আরো বড়ো॥

পরিশিষ্ট

স্বদেশী সমাজ

[পাঠক দয়া করিয়া নিজের অভিপ্রায়মত এই নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জন করিয়া জোড়াসাঁকোয় ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিতে শ্রীযুক্ত বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। ইহা সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ্য নহে। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যাঁহারা এই কার্য্যে যোগ দিতে ইচ্ছুক আছেন তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা এই সঙ্গে পাঠাইলে বাধিত হইব।]

আমরা স্থির করিয়াছি আমরা কয়েকজনে মিলিয়া একটি সমাজ স্থাপন করিব।

আমাদের নিজের সম্মিলিত চেষ্টায় যথাসাধ্য আমাদের অভাবমোচন ও কর্ত্তব্যসাধন আমরা নিজে করিব, আমাদের শাসনভার নিজে গ্রহণ করিব, যে সকল কর্ম্ম আমাদের স্বদেশীয়ের দ্বারা সাধ্য তাহার জন্য অন্যের সাহায্য লইব না। এই অভিপ্রায়ে আমাদের সমাজের বিধি আমাদের প্রত্যেককে একান্ত বাধ্যভাবে পালন করিতে হইবে অন্যথা করিলে সমাজবিহিত দণ্ড স্বীকার করিব।

সমাজের অধিনায়ক ও তাঁহার সহায়কারী সচিবগণকে তাঁহাদের সমাজনির্দ্দিষ্ট অধিকার অনুসারে নির্ব্বিচারে যথাযোগ্য সম্মান করিব।

বাঙালিমাত্রেই এ সমাজে যোগ দিতে পারিবেন।

সাধারণত ২১ বৎসর বয়সের নীচে কাহাকেও গ্রহণ করা হইবে না।

এ সভার সভ্যগণের নিম্নলিখিত বিষয়ে সম্মতি থাকা আবশ্যক।

১। আমাদের সমাজের ও সাধারণত ভারতবর্ষীয় সমাজের কোনো প্রকার সামাজিক বিধিব্যবস্থার জন্য আমরা গবর্মেণ্টের শরণাপন্ন হইব না।

২। ইচ্ছাপূর্বক আমরা বিলাতি পরিচ্ছদ ও বিলাতি দ্রব্যাদি ব্যবহার করিব না।

৩। কর্ম্মের অনুরোধ ব্যতীত বাঙালিকে ইংরেজিতে পত্র লিখিব না।

৪। ক্রিয়াকর্ম্মে ইংরেজি খানা, ইংরেজি সাজ, ইংরেজি বাদ্য, মদ্যসেবন, এবং আড়ম্বরের উদ্দেশে ইংরেজ নিমন্ত্রণ বন্ধ করিব। যদি বন্ধুত্ব বা অন্য বিশেষ কারণে ইংরেজ নিমন্ত্রণ করি তবে তাহাকে বাংলা রীতিতে খাওয়াইব।

৫। যতদিন না আমরা নিজে স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপন করি ততদিন যথাসাধ্য স্বদেশীচালিত বিদ্যালয়ে সন্তানদিগকে পড়াইব।

৬। সমাজস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি কোনো প্রকার বিরোধ উপস্থিত হয় তবে আদালতে না গিয়া সর্ব্বাগ্রে সমাজ-নির্দ্দিষ্ট বিচারব্যবস্থা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিব।

৭। স্বদেশী দোকান হইতে আমাদের ব্যবহার্য্য দ্রব্য ক্রয় করিব।

৮। পরস্পরের মধ্যে মতান্তর ঘটিলেও বাহিরের লোকের নিকট সমাজের বা সামাজিকের নিন্দাজনক কোনো কথা বলিব না।

নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে সমাজের কর্ত্তব্য আবদ্ধ থাকিবে :—

সামাজিক ব্যবহার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কল্যবিদ্যা, ব্যবসাবাণিজ্য, বিচার ও সাহিত্য।

সামাজিক ব্যবহার অর্থাৎ বেশভূষা গৃহোপকরণ আহার বিহার—এক কথায়, চালচলন সম্বন্ধে, সমাজ যে আদর্শ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন তাহা সকলকে পালন করিতে হইবে। সমাজের বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে যাহাতে আমাদের জীবনযাত্রার আদর্শ আড়ম্বরশূন্য ও অল্পব্যয়সাধ্য হইতে পারে, যাহাতে আমাদের অধীনস্থ আত্মীয় বালকগণ কঠিন সংযমে দীক্ষিত হইয়া পৌরুষ ও চরিত্রবল লাভ করে।

সমাজবর্ত্তিগণের জন্য একটি বালক এ বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে। দেশে একটি স্বদেশীবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা সমাজের বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে।

সমাজের অধীনে সাধারণ পাঠাগার, ব্যায়ামশালা, ক্রীডাস্থল, ব্যাঙ্ক ও মিলন গৃহস্থাপনের চেষ্টা করা হইবে।

দেশের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যবসাবাণিজ্য, কলাবিদ্যা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে যে সকল উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য সমাজ তৎপ্রতি আপনার যথাসাধ্য শক্তি প্রয়োগ করিবেন।

সমাজের একজন অধিনায়ক থাকিবেন।

সমাজে যে কোনো প্রস্তাব উপস্থিত হইবে, আলোচনান্তে অধিনায়ক তৎসম্বন্ধে, যেরূপ অভিপ্রায় স্থির করিবেন অবিসম্বাদে তাহাই গ্রাহ্য হইবে।

তাঁহার স্বাক্ষরিত আদেশ সমাজের আদেশ বলিয়া গণ্য হইবে।

অধিনায়ক যে কোনো সামাজিককে কারণ নির্দ্দেশ ব্যতিরেকেও সমাজ হইতে অপসারিত করিতে পারিবেন।

অধিনায়কের সহায়তার জন্য একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে। মন্ত্রিগণ অধিনায়কের অনুমতি অনুসারে উপযুক্ত লোককে যথাযোগ্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন; তাঁহাদের কর্ম্ম পরিদর্শন করিবেন; তাঁহাদের নিকট হইতে কর্ম্মবিবরণী গ্রহণ করিবেন ও তাহা অধিনায়কের নিকট উপস্থিত করিয়া আলোচনা করিবেন।

মন্ত্রিগণ বয়োজ্যেষ্ঠতা অনুসারে অধিনায়কের অনুপস্থিতিতে তাঁহার কর্ম্মভার গ্রহণ করিবেন। পরন্তু অধিনায়কের পূর্ব্বকৃত কোনো অভিপ্রায়ের পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না।

মন্ত্রিসভার সঙ্গে একটি কর্ম্মিসভা থাকিবে। কর্ম্মিগণ সমন্ত্রিক অধিনায়কের আদেশে বিশেষ বিশেষ কর্ম্মভার গ্রহণ করিবেন।

কর্ম্মিসভায় ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের এক একজন সভ্য মন্ত্রিসভায় স্থান পাইবেন।

সাধারণ সামাজিকগণ সমাজকে কর দিয়া ইহার বিধান মানিয়া চলিবেন ও তাঁহাদের কাহারো প্রতি কোনো বিশেষ আদেশ বা ভার পড়িলে তাহা পালন করিবেন।

অভিভাবকদের সম্মতিক্রমে একুশের অপেক্ষা অল্পবয়স্ক ছাত্রদের জন্য এই সমাজে স্বতন্ত্র একটি বিভাগ থাকিবে।

যে সকল ব্যক্তি বিশেষ কারণে সমাজের সম্পূর্ণ বাধ্যতা স্বীকার করিবেন না অথচ সমাজের প্রতি যাঁহাদের অনুরাগ থাকিবে, যাঁহারা সমাজকে অর্থদান ও অন্য উপায়ে সাহায্য করিবেন, যাঁহারা সমাজকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কোনো বিশেষ কর্ম্মে বিশেষভাবে যোগদান করিতে ইচ্ছা করিবেন, যাঁহারা কেবলমাত্র সমাজের একটি বা দুইটি বিভাগেরই সহিত যোগ রক্ষা করিবেন, তাঁহারা সমাজের বন্ধুমণ্ডলীরূপে গণ্য হইবেন।

যাঁহারা সমাজভুক্ত নহেন আবশ্যকবোধে বা সম্মানার্থ অধিনায়ক তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ ও তাঁহাদের পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

দুই বৎসর অন্তর অধিনায়ক, মন্ত্রিসভা ও কর্ম্মিসভার পরিবর্তন হইবে।

তখন সামাজিকগণের মধ্যে যাঁহারা সম্মান স্বরূপ বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশের সম্মতিক্রমে মন্ত্রিসভা ও কর্ম্মিসভা নির্ব্বাচিত হইবে এবং সেই মন্ত্রি ও কর্ম্মিগণ অধিনায়ক নির্ব্বাচন করিবেন।

নির্ব্বাচনের মতদান পরস্পরের অগোচরে সমাধা হইবে।

নির্ব্বাচনের অধিকার ছাত্র সামাজিকগণ প্রাপ্ত হইবেন না।

সমাজের মধ্যে পঞ্চবিংশতির অধিক ব্যক্তি এই নির্ব্বাচনের অধিকার প্রাপ্ত হইবেন না।

সমাজের অধিকাংশের সম্মতিক্রমে এই পঞ্চবিংশতিজন নির্ব্বাচনের অধিকার লাভ করিবেন।

যে কোনো সামাজিককে অধিনায়ক এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন।

পাঁচজনের অধিক মন্ত্রী ও দশের অধিক কর্ম্মী থাকিবে না। মাসে অন্তত একবার [কর্ম্মিসভার] ও দুইমাস অন্তর সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে।

কর্ম্মিসভার বিশেষ বিশেষ সমিতি কর্ম্মানুসারে আবশ্যকমত তাঁহাদের সভা আহ্বান করিবেন।

সামাজিকগণ অথবা অন্য কেহ নিজের বা সমাজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন বা প্রস্তাব উত্থাপিত করিলে অধিনায়ক মন্ত্রিগণসহ বিচার করিয়া তাহার মীমাংসা করিয়া দিবেন। আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে তাঁহারা বিশেষ ব্যক্তিগণ বা সামাজিকসাধারণকে আহ্বান করিতে পারিবেন।

এই সকল কার্য্যব্যতীত সামাজিকগণ পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে উৎসবসভায় মিলিত হইবেন।

সমাজবর্ত্তী প্রত্যেককেই নিজের আয়ের নির্দ্দিষ্ট অংশ করস্বরূপ সমাজকে দিতে হইবে।

ত্রিশ টাকা পর্য্যন্ত দুই আনা, পঞ্চাশ টাকায় চার আনা, একশ টাকা হইতে হাজার টাকা পর্যন্ত শতকরা একটাকা ও তদূর্দ্ধে শতকরা দেড় টাকা কর দিতে হইবে।

ছাত্র সামাজিকগণকে বৎসরে আট আনা কর দিতে হইবে।

সমাজে প্রবেশকালে প্রত্যেককে প্রবেশিকা এক টাকা দিতে হইবে।

কাহারো আয়ের পরিমাণ সম্বন্ধে কোনোরূপ আলোচনা বা অনুসন্ধান করা হইবে না।

বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম্মে সামাজিকগণ যে ব্যয় করিবেন তাহার অন্তত শতকরা আট আনা সমাজে দান করিতে হইবে।

প্রত্যেক সামাজিকের বাড়ি একটি করিয়া বাক্স থাকিবে। এই বাক্সে পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের স্বেচ্ছাদত্ত খুচরা দান জমা হইবে। মাসের শেষে এই দান সমাজের বাক্সে গৃহীত হইবে। কোন্ বাক্স হইতে কত গৃহীত হইল তাহা যাহাতে অগোচর থাকে সেইরূপ উপায় অবলম্বিত হইবে।

কর আদায় সম্বন্ধে কোনো সামাজিককে কোনো অনুরোধ করা হইবে না। তাঁহাদের নিজের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করা হইবে।

কর আদায় না হইলেও তাঁহাদিগকে সমাজ হইতে অপসারিত করা হইবে না।

যাঁহারা অধিনায়কের আদেশ মানিবেন না, সমাজের বিধান লঙ্ঘন করিবেন, সমাজের মান্য ব্যক্তিগণকে অপমান করিবেন, সামাজিকগণকে বিদ্রোহী করিবার চেষ্টা করিবেন, বিশেষ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে বারম্বার অনুপস্থিত থাকিবেন তাঁহাদিগকে তৎসম্বন্ধে অধিনায়ক সতর্ক করিলে পর যদি তাঁহারা সমাজনির্দ্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্তবিধি অনুসারে দণ্ডস্বীকার পূর্ব্বক আচরণ সংশোধন না করেন তবে অধিনায়কের আদেশ অনুসারে তাঁহাদিগকে সমাজ হইতে অপসারিত করা হইবে।

সমাজের বিচারে কোনো সামাজিক সমাজ বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ করিলে সমাজের বারো আনা লোকের সম্মতিক্রমে সামাজিকগণ তাঁহার সহিত সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার রহিত করিবেন।

প্রথম এক বৎসর সমাজগঠনকালরূপে গণ্য হইবে।

এই বৎসর অধিনায়ক কেহ থাকিবেন না।

একটি প্রতিষ্ঠাসমিতি মন্ত্রিসভা ও কর্ম্মিসভা নির্ব্বাচন করিবেন।

মন্ত্রিগণ বিস্তারিতরূপে নিয়ম রচনা ও সমাজের কার্য্য চালনা করিতে থাকিবেন।

বযোজ্যেষ্ঠতা অনুসারে পর্য্যায়ক্রমে এক একজন মন্ত্রী নায়কের পদ গ্রহণ করিবেন ও তৎকালে তাঁহার অভিপ্রায়ই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

তিনি পূর্ব্বমীমাংসিত কোনো বিষয়ের পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না।

মন্ত্রিসভার চারিজন একমত হইলে তবে পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

সমাজের বিধিগুলি যেমন যেমন স্থির হইবে অমনি তাহা সমাজে প্রচলিত হইতে থাকিবে।

এক বৎসরের শেষে এই মন্ত্রী ও কর্ম্মিসভা অবসর লইবেন ও তখন সমাজের নিয়ম অনুসারে নূতন নির্বাচন হইবে।

'সৎপাত্র' গল্প কাহার রচনা

এতদ্ সম্বন্ধে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখিতেছেন, "ইণ্ডিয়ান প্রেসের হাত থেকে কবির বই প্রকাশ করার ব্যবস্থা যখন আমরা বিশ্বভারতী থেকে কিনে নিলাম তার কিছুদিন পরে গল্পগুচ্ছের একটি বিশ্বভারতী-সংস্করণ ছাপানো স্থির হল। গল্পের তালিকা তৈরি করতে গিয়ে দেখি যে কতকগুলি গল্প বাদ পড়েছে। সেইগুলি কবির কাছে নিয়ে গেলাম— তার মধ্যে 'পুত্রযজ্ঞ' আর 'সৎপাত্র' এই দুটি গল্পও ছিল। গল্প পড়ে আমার মনে হয়েছিল যে, সম্ভবত: কবির লেখা।

" 'পুত্রযজ্ঞ' ভারতীতে প্রথম ছাপা হয় শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে। কিন্তু আসলে এইটি কবির লেখা, তাই কবি এই গল্পটিকে গল্পগুচ্ছের মধ্যে দিতে বললেন। এ সম্বন্ধে সমরবাবুর নিজের উক্তি ছাপা হয়েছে— দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-রচনাবলী ২১, পৃ ৪৩৮। শুধু একটা কথা মনে পড়েছ যে কবির কাছে শুনেছিলাম, ঐ গল্পের আখ্যানভাগটিও কবি নিজে প্রথমে সমরবাবুকে মুখে মুখে বলে দিয়েছিলেন।

"তার পরে কথা হল 'সৎপাত্র' সম্বন্ধে। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কবি বললেন, 'সৎপাত্রে' গল্পটা ঠিক আমার বলা চলে না। আমি ওটাতে কিছু কলম চালিযেছি বটে, কিন্তু ওটা আসলে বেলা[১] নিজেই লিখেছিল। ওর আখ্যানভাগ কাঠামো সব ওর নিজের। ওর ক্ষমতা ছিল, কিন্তু লিখত না। আমার কাছে খাতাটা দিল, বলল, একটু দেখে দাও। আমি লেখাটা কিছু বদলিয়ে দিয়েছিলুম— কিন্তু আসলে গল্পটা ওরই লেখা। ওটা আমার লেখা বলে নেওয়া চলবে না। ওটা বাদ দাও।'

"কবির স্পষ্ট নির্দেশ অনুযায়ী 'সৎপাত্র' গল্পটি কবির রচনাবলীর অন্তর্গত করা হয় নি।"

১ কবির জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা দেবী। ইঁহার রচিত আরও অনেকগুলি গল্প 'ভারতী' 'সবুজ পত্র' প্রভৃতি মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়।

কবি-সম্বর্দ্ধনা

আগামী ২৫শে বৈশাখ রবিবার কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ৫০ বৎসর সম্পূর্ণ করিয়া ৫১ বৎসরে পদার্পণ করিবেন। রবীন্দ্রবাবু আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসেবী; তিনি বহুবর্ষ ধরিয়া নানাভাবে বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশের কল্যাণ সাধন করিযাছেন। তাঁহার একপঞ্চাশৎতম জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহাকে যথোচিত অভিনন্দন দেওয়া ও সংবর্দ্ধনা করা দেশবাসীর কর্তব্য বলিয়া মনে হওয়াতে, নিম্নলিখিত মহোদযগণকে লইযা একটি সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। সমিতি ইচ্ছা করিলে সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসেবীগণকে যথোচিত সম্মান দেখাই নাই; তাহাতে আমাদের জাতীয় ক্রটী হইয়াছে। রবীন্দ্রবাবুর আগামী জন্মতিথি উপলক্ষে যেন আমরা ঐ ক্রটীর সংশোধন আরম্ভ করিতে পারি।

রবীন্দ্রবাবুর প্রতি সম্মান দান যাহাতে দেশব্যাপী হয, তজ্জন্য সমিতি দেশের প্রতিভূস্বরূপ বঙ্গীয সাহিত্য পরিষদ্‌কে এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ কবিবেন। এবং পবিষদের সহিত পরামর্শ কবিযা উৎসবের দিন ও প্রণালী ধার্য্য করিবেন।

সমিতি স্থির করিযাছেন যে, উৎসব দিবসে সাধারণ উৎসবের সঙ্গে কবিবরকে অভিনন্দন ও শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ উপহার দেওয়া হইবে এবং কবিবরের নাম স্মরণীয কবিবার উদ্দেশ্যে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে কোনো স্থায়ী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইবে।

সমিতির উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সমিতি সাধারণের সহানুভূতি ও অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। এ বিষযে সকলেরই যোগদান প্রার্থনীয়। যিনি যাহা দিবেন সাদরে গৃহীত হইবে এবং সংবাদপত্রে স্বীকৃত হইবে। সমিতির ধনরক্ষক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রাযচৌধুরী মহাশযের নামে ৫৩ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ঠিকানায় চাঁদা পাঠাইতে হইবে।

সমিতির সদস্যগণ

মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
" জগদীশচন্দ্র বসু
" ব্রজেন্দ্রনাথ শীল
" সারদাচরণ মিত্র
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
রায " যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
" রামানন্দ চট্টোপাধ্যায
" প্রফুল্লচন্দ্র রায
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
(সমিতির সম্পাদক)
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
(সমিতির ধনরক্ষক)
ইত্যাদি ইত্যাদি

অভিনন্দন

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়

করকমলেষু

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের নবাভ্যুদয়ে নূতন প্রভাতের অরুণ-কিরণ-পাতে যখন নব শতদল বিকশিত হইল, ভারতের সনাতনী বাগ্দেবতা তদুপরি চরণ অর্পণ করিয়া দিগন্তে দৃষ্টিপাত করিলেন। অমনি দিগ্বধূগণ প্রসন্ন হইলেন, মরুদ্গণ সুখে প্রবাহিত হইলেন, বিশ্বদেবগণ অন্তরিক্ষে প্রসাদপুষ্প বর্ষণ করিলেন, ঊর্ধ্বব্যোমে রুদ্রদেবের অভয়ধ্বনি ঘোষিত হইল, নবপ্রবুদ্ধ সপ্তকোটি নরনারীর হৃদয় মধ্যে ভাবধারা চঞ্চল হইল। বঙ্গের কবিগণ অপূর্ব্ব স্বরলহরীর যোজনা করিয়া দেবীর বন্দনাগানে প্রবৃত্ত হইলেন; মনীষিগণ স্বহস্তাবচিত কুসুমোপহার তাঁহার শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

কবিবর, পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ব্বে এক শুভদিনে তুমি যখন বঙ্গজননীর অঙ্কশোভা বর্দ্ধন করিয়া বাঙ্গালার মাটি ও বাঙ্গালার জলের সহিত নূতন পরিচয় স্থাপন করিলে, বঙ্গের নবজীবনের হিল্লোল আসিয়া তখন তোমার অর্দ্ধস্ফুট চেতনাকে তরঙ্গায়িত করিয়াছিল; সেই তরঙ্গাভিঘাতে তোমার তরুণ জীবন স্পন্দিত হইল; সেই স্পন্দন-প্রেরণায় তোমার কিশোর হস্ত নব নব কুসুমসম্ভার চয়ন করিয়া বাণীর অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইল। তোমার পূর্ব্বগামিগণের স্নিগ্ধনেত্র তোমাকে বর্দ্ধিত করিল; অনুগামিগণের মুগ্ধনেত্র তোমাকে পুরস্কৃত করিল; বাগ্দেবতার স্মেরাননের শুভ্র জ্যোতি তোমার ললাটদেশে প্রতিফলিত হইল। তদবধি বাণীমন্দিরের মণিমণ্ডিত নানা প্রকোষ্ঠে তুমি বিচরণ করিয়াছ; রত্নবেদির পুরোভাগ হইতে নৈবেদ্যকণা আহরণ করিয়া তোমার দেশবাসী ভ্রাতাভগিনীকে মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়াছ; তোমার ভ্রাতাভগিনী দেবপ্রসাদের আনন্দসুধা পান করিয়া ধন্য হইয়াছে। বীণাপাণির অঙ্গুলি প্রেরণে বিশ্বযন্ত্রের তন্ত্রীসমূহে অনুক্ষণ যে ঝঙ্কার উঠিতেছে, ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে তোমার অগ্রজাত কবিগণের পশ্চাতে আসিয়াও তুমি তাহা কর্ণগত করিয়াছ; সুপর্ণরূপিণী গায়ত্রীকর্ত্তৃক গন্ধর্ব্বরক্ষিত অমৃতরসের দেবলোকে নয়নকালে মর্ত্ত্যোপরি যে ধারাবর্ষণ হইয়াছিল, পৃথিবীর ধূলিরাশি হইতে নিষ্কাশিত করিয়া নরলোকে সেই অমৃত-কণিকার বিতরণে তোমার সহকারিতা গ্রহণদ্বারা তাঁহারা তোমায় কৃতার্থ করিয়াছেন। পঞ্চাশৎ সংবৎসর তোমাকে অঙ্কে রাখিয়া তোমার শ্যামাজন্মদা তোমাকে স্নেহপীযূষে বর্দ্ধন করিয়াছেন; সেই ভুবনমনোমোহিনীর উপাসনাপরায়ণ সন্তানগণের মুখস্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশ্বপিতার নিকট তোমার শতায়ুঃ কামনা করিতেছেন।

কবিবর, শঙ্কর তোমায় জয়যুক্ত করুন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক

বঙ্গাব্দ ১৩১৮
১৪ মাঘ

INDIA'S PRAYER

1

Thou hast given us to live
Let us uphold this honour with all our strength and will ;
For Thy glory rests upon the glory that we are.
Therefore in Thy name we oppose the power that would plant its banner upon our soul.
Let us know that Thy light grows dim in the heart bears its insult of bondage,
That the life, when it becomes feeble, timidly yields Thy throne to untruth.
For weakness is the traitor who betrays our soul.
Let this be our prayer to Thee—
Give us power to resist pleasure where it enslaves us,
To lift our sorrow up to Thee as the summer holds its mid-day sun,
Make us strong that our worship may flower in love, and bear fruit in work.
Make us strong that we may not insult the weak and the fallen,
That we may hold our love high where all things around us are wooing the dust.
They fight and kill for self-love giving it Thy name,
They fight for hunger that thrives on brother's flesh,
They fight against Thine anger and die.
But let us stand firm and suffer with strength
For the True, for the Good, for the Eternal in man,
For Thy Kingdom which is in the union of hearts.
For the Freedom which is of the soul.

2

Our voyage is begun, Captain, we bow to Thee.
The storm howls and the waves are wicked and wild, but we sail on.
The menace of danger waits in the way to yield to Thee its offerings of pain,
And a voice in the heart of the tempest cries : 'Come to conquer fear !'
Let us not linger to look back for the haggards, or benumb
The quickening hours with dread and doubt.
For Thy time is our time and Thy burden is our own
And life and death are but Thy breath playing upon the eternal sea of Life.
Let us not wear our hearts away picking small help and taking slow count of friends,
Let us know more than all else that Thou art with us and we are Thine for ever.

—Rabindranath Tagore

জনগণমন-অধিনায়ক

১

রবীন্দ্রনাথের জনগণমন-অধিনায়ক গানটি আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় সংগীতরূপে ভারতবর্ষের সর্বপ্রান্তে, এমনকি বহির্জগতেও, অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। বর্তমানে এটিকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রসংগীত বলে গ্রহণ করা উপলক্ষে এটির প্রতি ব্যাপকভাবে দেশের মনোযোগ নিবিষ্ট হয়েছে। এই সময় গানটির ইতিহাস আলোচনার বিশেষ সার্থকতা আছে।

এই গানটি রচনার উপলক্ষ্য সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে (ইং ২০।১১।৩৭, শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে লিখিত) বলেছেন—

> রাজসরকারে প্রতিষ্ঠাবান্ আমার কোনো বন্ধু[১] সম্রাটের জয়গান রচনার জন্যে আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম, এই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি জনগণমন-অধিনায়ক গানে সেই ভারতভাগ্যবিধাতার জয় ঘোষণা করেছি, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় যুগযুগধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথি, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথপরিচায়ক। সেই যুগযুগান্তরের মানবভাগ্যরথচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বা কোনো জর্জই কোনো ক্রমেই হতে পারেন না সে কথা রাজভক্ত বন্ধুও অনুভব করেছিলেন। কেননা তাঁর ভক্তি যতই প্রবল থাক, বুদ্ধির অভাব ছিল না।
>
> —বিচিত্রা, ১৩৪৪ পৌষ, পৃ ৭০৯

এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আর একখানি পত্রে (ইং ২৯।৩।৩৯, শ্রীসুধারানী দেবীকে লিখিত) বলেছেন—

> শাশ্বত-মানব-ইতিহাসের যুগযুগধাবিত পথিকদের রথযাত্রায় চিরসারথি বলে আমি চতুর্থ বা পঞ্চম জর্জের স্তব করতে পারি, এরকম অপরিমিত মূঢ়তা আমার সম্বন্ধে যাঁরা সন্দেহ করতে পারেন তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আত্মাবমাননা।
>
> —পূর্বাশা, ১৩৫৪ ফাল্গুন, পৃ ৭৩৮

এ কথা আজ সুবিদিত যে, গানটি প্রথম গাওয়া হয়[২] ১৯১১ সালে কলকাতা কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে[৩] (২৭ ডিসেম্বর, বুধবার)। তৎকালে কংগ্রেস ছিল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রমুখ মডারেট নেতাদের প্রভাবাধীন। তার মাত্র একপক্ষ কাল পূর্বে (১২ ডিসেম্বর) দিল্লির দরবারে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ তৎকালীন বঙ্গবিভাগের অবসান ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় উল্লসিত হয়ে মডারেট নেতারা স্থির করলেন, কংগ্রেসমণ্ডপ থেকেই সম্রাটের প্রতি

১ সম্ভবত শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী (Calcutta Municipal Gazette, Tagore Memorial Special Supplement, p. xviii)। তাঁর সাহিত্যবুদ্ধির উল্লেখ আছে জীবনস্মৃতি গ্রন্থে।

২ কারও কারও ধারণা ছিল, গানটি প্রথম গীত হয় দিল্লিতে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জের অভিষেক-দরবারে (১২ ডিসেম্বর ১৯১১)। কিন্তু এই ধারণার সমর্থক কোনো প্রমাণ নেই। দিল্লির অভিষেক-দরবার ও কলকাতা প্রভৃতি স্থানে রাজসংবর্ধনার যে সুবিস্তৃত সরকারি বিবরণগ্রন্থ তখন প্রকাশিত হয় তাতে কোথাও এই গানটির প্রসঙ্গমাত্র নেই।

৩ ওই সময়ে শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী ছিলেন কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান উদ্‌যোক্তা ডাক্তার নীলরতন সরকারের একজন সহকারী। ডাক্তার নীলরতনের নির্দেশে তিনিই রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে গানটি এনে তাঁকে দেন। কংগ্রেসে গীত হবার পূর্বে ডাক্তার নীলরতনের হ্যারিসন রোডের বাসভবনেই গানটির রিহারস্যাল হয়। —জ্ঞানাঞ্জনবাবুর বিবৃতি, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ১৯৪৭ ডিসেম্বর ১৫

আনুগত্য জানিয়ে রাজদম্পতিকে স্বাগত সম্ভাষণ জানানো হবে। কংগ্রেস-অধিবেশন-সমাপ্তির দু দিন পরেই ৩০ ডিসেম্বর তাঁদের কলকাতায় আগমনের তারিখ। এই স্বাগতসম্ভাষণের জন্য উপযুক্ত প্রশস্তিসংগীতও চাই। সম্ভবত এই সংগীত রচনার জন্যই পূর্বোক্ত রাজভক্ত বন্ধু রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভারতের তদানীন্তন অধিপতির স্তবগান না করে রচনা করলেন ভারতবর্ষের চিরন্তন ভাগ্যবিধাতার জয়গান। রবীন্দ্রনাথের রাজভক্ত বন্ধু বুঝলেন এই গানটিকে রাজপ্রশস্তির কাজে লাগানো চলে না। অথচ রাজভক্তির গান চাই। তাই রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে অন্যত্র সে গানের সন্ধান করতে হয়েছিল এবং মডারেটদের সন্তোষজনক গানও যথাসময়ে পাওয়া গেল। সে কথা পরে বলছি।

১৯১১ সালের কলকাতা-কংগ্রেসে তিন দিনে গীত চারটি গানেরই পরিচয় নেওয়া আবশ্যক। প্রথম দিনের উদ্‌বোধন হয় বন্দেমাতরম্ গান দিয়ে। দ্বিতীয় দিনের উদ্‌বোধন হয় জনগণমন-অধিনায়ক গানটি দিয়ে।[১] তার পরে কংগ্রেসহিতৈষীদের শুভেচ্ছাজ্ঞাপক টেলিগ্রাম ও চিঠিপত্র পঠিত হয়। অতঃপর রাজদম্পতিকে আনুগত্য ও স্বাগত জানিয়ে একটি প্রস্তাবগ্রহণান্তে তাঁদের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে রচিত একটি হিন্দি প্রশস্তিগান গাওয়া হয়।[২] রবীন্দ্রনাথের কাছে নিরাশ হবার পর যে গানটি তাঁর রাজভক্ত বন্ধু-প্রমুখ মডারেট নেতাদের নৈরাশ্য মোচন করেছিল, এই হিন্দি প্রশস্তিটিই হচ্ছে সে গান। তৃতীয় দিনের উদ্‌বোধন হয় 'অতীতগৌরববাহিনি মম বাণি' গানটি দিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ এবং সরলা দেবীর 'অতীতগৌরববাহিনি' যে দেশভক্তির গান তাতে সন্দেহ নেই। বাকি দুটি গান, অর্থাৎ জনগণমন-অধিনায়ক এবং হিন্দি প্রশস্তিটি সম্বন্ধে তৎকালীন সংবাদপত্রাদি থেকে কি জানা যায় দেখা যাক।

১। কংগ্রেসের ষড়্‌বিংশ অধিবেশনের সরকারি রিপোর্টে আছে যে, ২৭এ ডিসেম্বর তারিখে—

> The proceedings commenced with *a patriotic song* composed by Babu Rabindranath Tagore.

তার পরে র‍্যাম্‌জে ম্যাকডোনাল্ড-প্রমুখ কংগ্রেস বন্ধুদের পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠ এবং সভাপতিকর্তৃক উত্থাপিত রাজানুগত্যের প্রস্তাব গ্রহণের বর্ণনা আছে। অতঃপর আছে—

> After that *a song of welcome* to Their Imperial Majesties composed for the occasion was sung by the choir.

দেখা যাচ্ছে একটিকে দেশভক্তির গান এবং অপরটিকে সম্রাট্‌দম্পতির স্বাগতসংগীত বলে বর্ণনা করে দুটির মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে।

১ গায়কদের অন্যতম ছিলেন শ্রীযুক্ত অমল হোম (অমলবাবুর বিবৃতি, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ১৯৪৭ ডিসেম্বর)। গায়িকাদের মধ্যে ছিলেন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র সিদ্ধান্তের পত্নী শ্রীমতী চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত (পরবর্তী পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

২ "আমিও একজন living witness ১৯১১ সালের কংগ্রেসের। গানের দলে আমি ছিলাম। একটি রাজবন্দনাও গেয়েছিলাম কিন্তু। সে গানটি রচনা করেছিলেন ৺সরলা দেবীর স্বামী ৺রামভুজ দত্ত চৌধুরী। তার প্রথম লাইন 'যুগ জীব্‌ মেরা পাদশা, চহুঁ দিশ রাজ সবায়া'। সব কথা মনে নেই, কিন্তু সুরটি কানে রয়েছে।" —রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত শ্রীযুক্তা চিত্রলেখা সিদ্ধান্তের একখানি পত্র।

২ জানুআরি ১৯১২ তারিখের বেঙ্গলী পত্রিকায় কংগ্রেস-প্রতিনিধিদের একটি স্টীমারপার্টির বর্ণনা আছে। ওই উপলক্ষ্যে বন্দেমাতরম্, মিলে সব ভারতসন্তান প্রভৃতি দেশভক্তির গানের সঙ্গে উক্ত রাজভক্তির গানটিও গাওয়া হয়েছিল।—"First there was *Bande Mataram*, then *Miley sob varat santan* ;...the chorus under the able leadership of Mrs. Dutt Choudhury sang the *loyal* song *jug jibey mere padsa* ;...Mrs. Dutt Choudhury gave another song. The words were new— at least they seemed to be so, but they were redolent of deep pathos and *patriotism*."—*Bengalee*, 1912 Jan, 2

২। অমৃতবাজার পত্রিকায় (২৮ ডিসেম্বর ১৯১১) আছে—

The proceedings began with the singing of a Bengali *song of benediction*···
This [রাজানুগত্যের প্রস্তাব গ্রহণ] was followed by another *song in honour of* Their Imperial Majesties' visit to India.

এখানেও দুটি গানের প্রকৃতিগত পার্থক্য স্বীকৃত হয়েছে। Benediction কথার তাৎপর্য পরে স্পষ্ট হবে।

৩। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ১৯১১ সালের কংগ্রেসের প্রধান উদ্‌যোক্তা। তাঁর 'বেঙ্গলী' কাগজে স্বভাবতই বিস্তৃততর বিবরণ পাওয়া যায়। ওই কাগজ (২৮ ডিসেম্বর ১৯১১) থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্‌ধৃত করছি।—

The proceedings cammenced with a *patriotic song* composed by Babu Rabindranath Tagore. The leading poet of Bengal ('*Janaganamana-adhinayaka*'), of which we give an English translation—

King of the heart of nations, Lord of our country's fate ইত্যাদি।

অতঃপর সভাপতি কর্তৃক উত্থাপিত রাজানুগত্যের প্রস্তাব গ্রহণান্তে—

A Hindi song paying heart-felt homage to Their Imperial Majesties was sung by the Bengali boys and girls in chorus,

এই বিবরণও কংগ্রেসরিপোর্টের সমর্থক। অর্থাৎ এখানেও দেশভক্তি এবং রাজভক্তির গানের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, হিন্দীরাজভক্তির গানটির ইংরেজি অনুবাদ দেওয়া দূরে থাকুক বেঙ্গলী পত্রিকায় (কংগ্রেসরিপোর্টেও) গানটির আরম্ভাংশ এবং তার রচয়িতার নাম পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য বলে বিবেচিত হয় নি।

এবার ইঙ্গ-ভারতীয় কাগজের বিবরণ উদ্‌ধৃত করছি।

৪। প্রথমেই তৎকালীন ইংলিশম্যানের (২৮ ডিসেম্বর ১৯১১) বিবৃতি দেওয়া যাক।—

The proceedings opened with *a song of welcomo* to the King Emperor, specially composed for the occasion by Babu Rabindranath Tagore...

This [রাজানুগত্যের প্রস্তাব গ্রহণ] was followed by another *song in Hindi welcoming* Their Imperial Majesties. The choir in both songs was led by Mrs. Rambhuj Dutt Chaudhury.

এই বিবরণ অনুসারে রবীন্দ্রনাথের বাংলা গানটিও রাজোদ্দেশ্যে রচিত স্বাগতসংগীত। এই বর্ণনা কংগ্রেস-রিপোর্ট তথা অমৃতবাজার ও বেঙ্গলী পত্রিকার বিরোধী। জনগণমন-অধিনায়ক গানটি সম্বন্ধে কারও কারও মনে যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল এটাই তার উৎসস্থল।

৫। অতঃপর স্টেট্‌স্‌ম্যান (২৮ ডিসেম্বর ১৯১১)—

The proceedings commenced shortly before 12 O'clock with *a Bengali song*...

The choir of girls led by Sarala Devi (Mrs. Rambhuj Dutt Chaudhuri) *then* [রাজানুগত্যপ্রস্তাব গ্রহণের পর] sang *a hymn of welcome* to the King specially composed for the occasion by Babu Rabindranath Tagore, the Bengali poet.

এই বর্ণনায় বাংলায় উদ্‌বোধনগীতটি কার রচিত তার উল্লেখ নেই। তবে এটি যে রাজভক্তির গান নয় তা পরোক্ষে

স্বীকৃত হয়েছে; কেননা এটি রাজভক্তির গান হলে তার বিশেষ উল্লেখ না থাকার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। দ্বিতীয় গানটি বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথের রচিত এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, এই গানটিও বাংলা বলেই স্টেট্‌স্‌ম্যানের ধারণা। যা হোক, এই বিবরণ অংশত কংগ্রেস-রিপোর্ট প্রভৃতি দেশী বর্ণনার বিরোধী এবং অংশত ইংলিশম্যানেরও বিরোধী। ওই দিনের বাংলা উদ্‌বোধনগানটিই যে রবীন্দ্রনাথের রচনা এ কথা ধরতে না পারাতেই যে স্টেট্‌স্‌ম্যানের অনভিজ্ঞ রিপোর্টারের ভ্রান্তি ঘটেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

৬। এবার রয়টার। বিলাতে ইণ্ডিয়া নামে সাপ্তাহিক কাগজে (২৯ ডিসেম্বর ১৯১১) রয়টার-প্রেরিত সংক্ষিপ্ত সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল এভাবে—

> When the Indian National Congress resumed its session on Wednesdey, Dec 27 *a Bengali song, specially composed in honour of* the Royal visit was sung and a resolution welcoming the King Emperor and Queen Empress was adopted unanimously

কংগ্রেসরিপোর্ট প্রভৃতি দেশী বিবরণের সঙ্গে এই বর্ণনার সামঞ্জস্য নেই, স্টেট্‌স্‌ম্যানের সঙ্গেও নেই, কিছু আছে শুধু ইংলিশম্যানের সঙ্গে।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, পূর্বোদ্ধৃত তিনটি ভারতীয় বিবরণের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান, কিন্তু এই শেষোক্ত তিনটি বিবরণের পারস্পরিক অসামঞ্জস্য ও ভারতীয় বর্ণনাগুলির সঙ্গে বিরুদ্ধতা এত স্পষ্ট যে, দেখিয়ে দেবার অপেক্ষাও রাখে না। বস্তুত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ও দুটি কাগজ এবং রয়টারের সংবাদপরিবেশকরা রাজভক্তির সংবাদ প্রচারে যত আগ্রহান্বিত ছিলেন সংবাদের যাথার্থ্য সম্বন্ধে ততটা সতর্ক ছিলেন না। ফলে তাঁরা হিন্দিরাজপ্রশস্তিটির সঙ্গে জনগণমন গানটিকে গুলিয়ে ফেলেছিলেন।[১]

রবীন্দ্রনাথ এসব ভ্রান্ত বিবরণের প্রতিবাদ করেছিলেন এমন কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নি। সম্ভবত তৎকালেও তিনি ইংলিশম্যান প্রভৃতির মূঢ়তার প্রতিবাদ করাকে আত্মাবমাননা বলেই মনে করতেন। তা ছাড়া, ইঙ্গ-ভারতীয় কাগজগুলির বিবরণ তাঁর লক্ষ্যগোচর নাও হয়ে থাকতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত যে, কোনো মিথ্যা রটনার প্রতিবাদ না হলেই তা সত্য হয় না। গানটির পরবর্তী ইতিহাস অনুসরণ করলেই এ বিষয়ের সত্যাসত্য স্বতই প্রমাণিত হবে। অতঃপর সেই ইতিহাসই যথাযথক্রমিকভাবে বিবৃত করছি।

১ ভাষাজ্ঞানের অভাবে বিলাতি রিপোর্টারদের পক্ষে ভারতীয় সংবাদপ্রচারে কতখানি ভুল হওয়া সম্ভব ইদানীং কালেও তার একটি নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। সান্‌ডে টাইম্‌স্‌ পত্রিকার সংবাদদাতা মিঃ আলুইন টেবিট সম্প্রতি দিল্লি থেকে উক্ত পত্রিকা মারফত এই সংবাদ প্রচার করেছেন।—

The National Anthem issue is a battle between two songs *Bande Mataram*, Mother, I come to thee', *written by Rabindranath* the Bengali poet and *Jana gana mana, a modern Hindi song* favoured by Pandit Nehru because it is most easily transcribed into Western music and can be played by a Western military band

Jana-gana-mana is now claimed to mean "Mother India thou giver of all wealth, culture and goodness" But it was actually written at George V s Coronation and is a paean of praise for the King as the giver of all wealth culture and goodness Although Bande Mataram has the better words the tune to which it is sung sounds to western ears like a Jam session band leader s nightmare Jana gana-mana will most likely win the day —*Sunday Times* 1949 May 15

লক্ষ্য করবার বিষয় এখানেও জনগণমন গানটিকে পূর্বোক্ত হিন্দি রাজপ্রশস্তিটির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। ১৯১১ সালে কি ভাবে ভ্রান্তি ঘটেছিল, ১৯৪৯ সালের এই রিপোর্ট থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। দ্রষ্টব্য *National Anthem Muddle*—অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৯৪৯ জুন ২০, এবং 'বিদেশী সাংবাদিকের অজ্ঞতা'—যুগান্তর, ১৯৪৯ জুন ১৯।

২

জনগণমন-অধিনায়ক গানটি কংগ্রেসে গীত হয় পৌষ মাসের ১১ তারিখে (২৭ ডিসেম্বর)। তার পরের মাঘ মাসেই এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে যার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেই গানটির স্বরূপ আপনিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একে একে ওই ঘটনাগুলির পরিচয় দেওয়া যাক।—

১। ওই মাঘ মাসের (বাং ১৩১৮ সাল) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (সম্পাদক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ) জনগণমন-অধিনায়ক গানটি প্রথম প্রকাশিত হয়।[১] তাতে গানের নাম দেওয়া হয়, 'ভারতবিধাতা' এবং তার নীচেই এটির পরিচয় হিসাবে লেখা ছিল 'ব্রহ্মসংগীত'। তাতে বোঝা যাচ্ছে, স্বয়ং পরব্রহ্মই ভারতবিধাতা এ কথা প্রকাশ করাই ছিল রচয়িতার অভিপ্রায়। এই বর্ণনাকেই ইংলিশম্যান প্রভৃতির পরোক্ষ প্রতিবাদ বলে গ্রহণ করা চলে।

২। এই মাঘ মাসেই ভারতী পত্রিকায় কংগ্রেসের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বন্দেমাতরম্ প্রভৃতি গানের একটি অতি চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়। কংগ্রেস-অধিবেশনের অত্যল্পকাল পরেই বর্ণনাটি প্রকাশিত হয়। সুতরাং সমকালীনতার বিচারে এটির মূল্য খুব বেশি। ভারতীয় বর্ণনা পড়লেই বোঝা যায়, তার রচয়িতা অধিবেশনের তিন দিনই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। তাতেও লেখাটির গুরুত্ব বৃদ্ধি হয়েছে। যা হোক, আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু এখানে উদ্‌ধৃত করছি।—

> গত ২৬, ২৭, ২৮এ ডিসেম্বর তারিখে জাতীয় সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। সভার কার্য আরম্ভ হইবার পূর্বে প্রতিদিনই জননী জন্মভূমির গৌরবগাথা গীত হইত। প্রথম দিন ভারতবর্ষের সুজলা শ্যামলা মাতৃমূর্তির, দ্বিতীয় দিন মানবজাতির অদৃষ্টবিধাতা যিনি
>
> পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্,
> ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়
>
> যুগে যুগে আত্মপ্রকাশ করেন সেই ত্রিলোকনাথের, এবং তৃতীয় দিন অতীতগৌরবস্মৃতি-ঐশ্বর্যের খনি হিন্দুস্থানের বন্দনাগান হইয়াছিল। সুমধুর বালিকাকণ্ঠের সহিত যুবকদের সুগম্ভীর কণ্ঠে যখন এই স্তবগানসকল ধ্বনিত হইত তখন হৃদয় ভক্তিপরিপূর্ণ এবং নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিত। ধূপসুগন্ধ যেমন মনকে পূজার অনুকূল অবস্থা দান করে, এসকলই বন্দনাগান তরুণ যুবক ও বালিকাদের কণ্ঠে গীত হইয়া অন্তরে সেই প্রকার ভক্তি সঞ্চার করিত।
>
> —ভারতী, ১৩১৮ মাঘ, পৃ ৯৯৬-৯৭

এই বর্ণনা অনুসারে জনগণমন-অধিনায়ক গানটি হচ্ছে যুগপৎ 'জননী জন্মভূমির গৌরবগাথা' এবং 'মানবজাতির অদৃষ্টবিধাতা ত্রিলোকনাথের বন্দনাগান'।[২] লক্ষ্য করবার বিষয়, এই বর্ণনায় হিন্দি রাজপ্রশস্তিটি উল্লেখযোগ্য বলেও বিবেচিত হয় নি। কেননা এটিকে কোনো ক্রমেই 'জননী জন্মভূমির গৌরবগাথা'গুলির সমান মর্যাদা দেওয়া যায় না।

৩। অতঃপর সেই মাঘ মাসেরই এগারো তারিখে (২৫ জানুয়ারি, অর্থাৎ কংগ্রেসে গীত হবার প্রায় এক মাস

১ এস্থলে বলা প্রয়োজন, কংগ্রেসে গীত হবার পরের দিনই বেঙ্গলী পত্রিকায় গানটির যে মূলানুসারী ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় তার সঙ্গে তত্ত্ববোধিনীর পাঠ মিলিয়ে দেখলেই নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে, উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য নেই। অর্থাৎ কংগ্রেসে-গীত পাঠ সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রূপেই তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়েছিল।

২ এই মাঘ মাসের ভারতীতে (পৃ ১০২৮) দেখা যায় সরলা দেবীও স্পষ্ট ভাষায় 'ঈশ্বর'কে 'ভারতের ভাগ্যবিধাতা' বলে সম্বোধন করেছেন। সুতরাং সন্দেহ নেই যে, জনগণমন-অধিনায়ক গানের গায়িকার মতেও ঈশ্বরই ওই গানটির উদ্দিষ্ট পাত্র।

পরে) কলকাতায় মহর্ষিভবনে মাঘোৎসবসভায় এই গানটি গাওয়া হয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পরিচালনায়। সুতরাং গানটির লক্ষ্য যে স্বয়ং পরব্রহ্ম, তাতে সন্দেহ থাকে না।

শুধু তাই নয়, সেই মাঘোৎসবসভাতেই রবীন্দ্রনাথ 'ধর্মের নবযুগ' নামে যে ভাষণ দেন তার শেষাংশ[১] এই—

> আমাদের যাহা কিছু আছে সমস্তই পণ করিয়া ভুমার॰ পথে নিখিল মানবের বিজয়যাত্রায় যেন সম্পূর্ণ নির্ভয়ে যোগ দিতে পারি।
>
> জয় জয় জয় হে, জয় বিশ্বেশ্বর, মানবভাগ্যবিধাতা।

—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৩১৮ ফাল্গুন, পৃ ২৭২

এবং ভারতী, ১৩১৮ ফাল্গুন, পৃ ১০৮৯

এর থেকে অতি সংগতরূপেই অনুমান করা যায় যে, বৃহৎ ভূমিকায় যিনি বিশ্বেশ্বর বা মানবভাগ্যবিধাতা, দেশ-প্রীতির পটভূমিকায় তিনি ভারতভাগ্যবিধাতা বলে অভিহিত হয়েছেন।[২]

ব্রহ্মসংগীত বা ধর্মসংগীতের পর্যায়ভুক্ত হলেও গানটির ভাবদ্যোতনা যে দেশভক্তি সে বিষয়েও সন্দেহ নেই।[৩] রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রীতি যে ধর্মনিরপেক্ষ নয়, এ কথা সুবিদিত। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের অনেক স্বদেশী গানের মূলেই আছে ভক্তিমিশ্র দেশাত্মবোধের প্রেরণা। জনগণমন-অধিনায়ক গানটি যে কংগ্রেস এবং মাঘোৎসব উভয়ত্রই গাওয়া হয়েছিল তার কারণ এই যে, দুই জায়গায় গাওয়ার উপযোগিতাই এটির আছে। অর্থাৎ এটি যুগপৎ জাতীয় সংগীত এবং ভগবৎ সংগীত।[৪] এইজন্যই এটি প্রথমে 'ধর্মসংগীত' গ্রন্থের (১৯১৪) অন্তর্ভুক্ত হলেও পরে রবীন্দ্রনাথ নিজেই এটিকে 'গীতবিতান' গ্রন্থে 'স্বদেশ'-পর্যায়ভুক্ত করেন এবং 'হে মোর চিত্ত' ও 'দেশ দেশ নন্দিত করি' এই দুটি গানেরও পুরোভাগেই স্থাপন করেন।

৪। মাঘোৎসবের পরের দিনই অর্থাৎ ওই মাঘ মাসের বারো তারিখেই (২৬ জানুয়ারি ১৯১২) বেঙ্গলী পত্রিকায় তৎকালীন পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরের নিম্নলিখিত গোপন সারকুলারটি প্রকাশিত হয়—

১ এই অংশটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ।

২ তুলনীয়:

(১) হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি দেখা দিলে আজ কী বেশে!
দেখিনু তোমারে পূর্বগগনে দেখিনু তোমারে স্বদেশে।...
হৃদয় খুলিয়া চাহিনু বাহিরে, হেরিনু আজিকে নিমেষে—
মিলে গেছ ওগো বিশ্বদেবতা, মোর সনাতন স্বদেশে।

—উৎসর্গ (১৯০৩-০৪), ৪০ নং

(২) ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা॥

—বঙ্গদর্শন, ১৩১২ আশ্বিন

৩ মানবভাগ্যবিধাতা বিশ্বেশ্বর বা ব্রহ্মকে লক্ষ্য করে লিখিত হলেও এই গানের মূলপ্রেরণা যে 'দেশাত্মবোধ' সে কথা স্পষ্টভাবেই জানা যায় কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীকে লিখিত (৩১ অগস্ট ১৯২৭) রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র থেকে (যাত্রী, জাভাযাত্রীর পত্র, দশম পত্র। আর কংগ্রেসনেতাপ্রমুখ দেশের জনসাধারণ যে প্রথম থেকেই এটিকে দেশভক্তির গান বলে স্বীকার করে নিয়েছেন, তার পরিচয় এই প্রবন্ধের (পূর্ববর্তী ও পরবর্তী) বহু স্থানেই দেওয়া হয়েছে।

৪ মহাত্মা গান্ধীও এটিকে একাধারে 'national song' এবং 'devotional hymn' বলে বর্ণনা করেছেন (*Harijan*, 1946 May 19)।

It has come to my knowledge that an institution known as the '*Santiniketan*' or Brahmacharyasrama at Bolpur in the Birbhum district of Bengal is a place *altogether unsuitable for the education of the sons of Government servants* As I have information that some Government servants in this province have sent their children there, I think it necessary to ask you to warn any well disposed Government servant whom you may know or believe to have sons at this institution or to be about to send sons to it, to withdraw them or refrain from sending them, as the case may be; *any connection with the institution in question is likely to prejudice the future of the boys who remain pupils of it after the issue of the present warning.*

—*Bengalee*, 1912 Jan. 26, p. 4

মনে রাখা প্রয়োজন, কংগ্রেসে জনগণমন-অধিনায়ক গানটি গাওয়া হয় ডিসেম্বর মাসে এবং পরের জানুয়ারি মাসেই (তখনই বিদ্যালয়ে ছাত্র ভরতি হবার সময়) এই সারকুলারটি প্রচারিত হয়। আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ যদি সত্যই রাজার স্তাবকের ভূমিকায় নেমে যেতেন তা হলে এরকম সরকারি সারকুলারের প্রয়োজনই হত না।

৩

এবার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন মনোভাবের বিশ্লেষণ করা যাক।

গোরা উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালের প্রারম্ভে। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটিকে যে তত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা উপন্যাসটির একেবারে শেষ অধ্যায়ে অতি সুস্পষ্ট ভাষায় ও সংহত আকারে প্রকাশ পেয়েছে গোরার দু-একটি উক্তিতে।—

আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত।··· আমাকে আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন যিনি হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই,··· যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষেরই দেবতা।

—গোরা, অধ্যায় ৭৬

এই ভারতবর্ষের দেবতাই আলোচ্যমান গানটিতে 'ভারতভাগ্যবিধাতা' নামে অভিহিত হয়েছেন। এই গানেও 'ভারতভাগ্যবিধাতা'কে হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খ্রীস্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই দেবতা বলে গণ্য করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ'-নামক বিখ্যাত কবিতাটি রচনার তারিখ হচ্ছে ১৮ আষাঢ় ১৩১৭ (ইংরেজি ২ জুলাই ১৯১০)। অর্থাৎ গোরা প্রকাশিত হবার অল্পকাল পরেই এটি রচিত হয়। তাতেও দেখি ভারতবিধাতা গানের মতই প্রথমে আছে ভারতবর্ষের ভূমূর্তির ধ্যান এবং তার পরে আছে হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান প্রভৃতি সর্বসম্প্রদায়ের জনগণের ঐক্যবিধানেরই বাণী। 'তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি' দেবার এবং 'সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থনীরে'

মার অভিষেকের কথাই এই রচনাটির মর্মকথা। এই কবিতায় 'উদার ছন্দে পরমানন্দে' যে দেবতাকে বন্দনা করা হয়েছে, বস্তুত তিনিই হচ্ছেন জনগণঐক্যবিধায়ক ভারতভাগ্যবিধাতা।

গোরা উপন্যাসে (১৯১০ জানুআরি) এবং ভারততীর্থ কবিতায় (১৯১০ জুলাই) যে বাণী প্রকাশ পেয়েছে, জনগণমন-অধিনায়ক রচনায় সেই বাণীই উৎসারিত হয়েছে সংগীতের রূপ ধরে। এর পরেও এই ভাবটি দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথের হৃদয়কে অধিকার করে ছিল।

১৯১৭ সালে কলকাতায় কংগ্রেস-অধিবেশনের কয়েক মাস আগে বিখ্যাত 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটি প্রকাশিত হয় (প্রবাসী, ১৩২৪ ভাদ্র, পৃ ৫২২)। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে 'জনগণমন-অধিনায়ক' এবং 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানের আসল ভাব নিগূঢ়ভাবে এক। দুটি গানকে একত্র পড়লে কোনো সংশয় থাকে না যে, 'দেশ দেশ' গানে যাঁকে বলা হয়েছে জাগ্রত ভগবান্, 'জনগণমন' গানে তাঁকেই বলা হয়েছে ভারতভাগ্যবিধাতা।

৪

এবার ১৯১৭ সালের কলকাতা-কংগ্রেসের কথা স্মরণ করা যাক। বলা বাহুল্য, কংগ্রেস তখন আর মডারেট নেতাদের আয়ত্ত নয়। জাতীয়তাবাদী নেতারাই তখন কংগ্রেসে প্রাধান্য লাভ করেছেন। এবার স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। এই কংগ্রেসের তিন দিনের চারটি গান এবং India's Prayer কবিতাটির পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

প্রথম দিনের (২৬ ডিসেম্বর) উদ্‌বোধন হয় যথারীতি বন্দেমাতরম্‌ গান দিয়ে। তা ছাড়া সেদিন আরও কয়েকটি গান হয়, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটি। এ সম্বন্ধে বেঙ্গলী পত্রিকায় (২৭।১২।১৭) আছে—

> A number of other songs were also in the musical programme including Sir Rabindranath's *latest patriotic song*, '*Desa desa nandita kari*'.

প্রথম দিনের কার্যারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর India's Prayer কবিতাটি পাঠ করেন। এ বিষয়ে ওই দিনের বেঙ্গলীতেই (২৭।১২।১৭) আছে—

> Then Sir Rabindranath rose to *offer his benediction* in a melodious and inspiring verse specially composed for the occasion.

এ সম্বন্ধে কংগ্রেসের সরকারি রিপোর্টে (পৃ ১) বলা হয়েছে—

> The Chairman of the Reception Committee then called upon Sir Rabindranath Tagore to read out his *opening invocation*.[১]

দ্বিতীয় দিনে গাওয়া হয় সরলা দেবীর 'অতীতগৌরববাহিনি মম বাণি'।

তৃতীয় দিন গাওয়া হয় 'জনগণমন-অধিনায়ক'। এই গানটি সম্বন্ধে তৎকালীন সংবাদপত্রাদিতে কি বলা হয়েছিল তার বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন।—

১ জনগণমন-অধিনায়ক এবং India's Prayer-এর মধ্যে ঘনিষ্ঠ ভাবগত ঐক্য বিদ্যমান। ১৯১১ সালে প্রথমটিকে বলা হয়েছিল a song of benediction, আর ১৯১৭ সালে দ্বিতীয়টিকে benediction বা invocation বলেই বর্ণনা করা হল। বস্তুত দুটিই এক পর্যায়ভুক্ত। দুটিই ভগবৎসমীপে ভারতবর্ষের অন্তরের প্রার্থনা।

১। বেঙ্গলী পত্রিকায় (৩০।১২।১৭) আছে—

> The Congress chorus then chanted the *magnificent song* of Sir Rabindranath Tagore, *Jana-gana-mana*, Maharaja Bahadur of Natore himself joining in aid of the instrumental music.

২। অমৃতবাজার পত্রিকায় (৩।১২।১৭) আছে—

> The Indian National Congress sat today at 11-30 A. M., the proceedings commencing with an *inspiring patriotic song* of Rabindranath sung as usual in chorus, the Maharaja of Natore joining in the instrumental music.

৩। অতঃপর স্টেটস্‌ম্যান (৩।১২।১৭)—

> *A national song* composed by Sir Rabindranath Tagore having been sung the following resolution was moved.

১৯১১ সালে ইংলিশম্যান ও স্টেট্‌স্‌ম্যানের মতে যা ছিল রাজভক্তির গান, ১৯১৭ সালে তাই দেশভক্তির গান বলে বর্ণিত হল!

ওই দিনের অধিবেশনে কংগ্রেসমঞ্চ থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এই গানটির সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেন তারও উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯১৭ সালের সরকারি রিপোর্টে তৃতীয় দিনের বিবরণ প্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জনের যে বক্তৃতা দেওয়া আছে (পৃ ১০৮), তারই একটি অংশ উদ্ধৃত করছি—

> Brother delegates at the very outset I desire to refer to the song to which you have just listened. *It is a song of the glory and victory of India.* We stand here today on this platfom for the glory and victory of India (cheers).

এই প্রসঙ্গে বেঙ্গলী পত্রিকায় (৩০।১২।১৭) বলা হয়েছে—

> Mr. C. R. Das ··desired to refer to the song which they had just listened to. It was the *song of the victory of India* (hear, hear). They stood there that day on that platform for the glory and victory of India (hear, hear).

অমৃতবাজার পত্রিকাতেও (৩১।১২।১৭) অবিকল এই কথাগুলিই আছে।

১৯১১ সালে গানটি যদি রাজবন্দনারূপে রচিত ও গীত হত তা হলে ১৯১৭ সালে ওটি কংগ্রেসে গীত ও সর্বসম্মতিক্রমে দেশভক্তির গান বলে স্বীকৃত ও বর্ণিত হতে পারত না।

৫

এই সময় থেকেই গানটির জাতীয় চিত্তজয়ের যাত্রা শুরু হয় এবং সেই যাত্রাপথ কিছু পরিমাণে সুগম হয় ইংরেজি অনুবাদের দ্বারা। উক্ত কংগ্রেস-অধিবেশনের অত্যল্পকাল পরেই গানটির কবিকৃত প্রথম ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় মডার্‌ন্‌ রিভিউ পত্রিকায় (১৯১৮ ফেব্রুআরি)। অতঃপর ১৯১৯ সালের ফেব্রুআরি মাসে দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ গানটির আর-একটি ইংরেজি অনুবাদ করেন। অনুবাদের নাম দেন The Morning Song of India।[১]

[১] এই অনুবাদটি কিছু পরিবর্তিত আকারে 'বিশ্বভারতী নিউজ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১৯৩৪ অক্টোবর, পৃ ৩০-৩১) এবং কবির মৃত্যুর পরে Poems নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৩৭ সালে ভারতবর্ষে জাতীয় সংগীত নির্বাচন উপলক্ষ্যে দেশে যখন প্রবল বিতর্ক দেখা দেয় তখন ডক্টর জেম্‌স্ কাজিন্‌স্ সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন (৩ নবেম্বর)। সেই বিবৃতি থেকে কিছু অংশ উদ্‌ধৃত করলে এই গানটি তৎকালে কতখানি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল তা উপলব্ধির সহায়তা হবে।—

> My suggestion is that Dr. Rabindranath's own *intensely patriotic*, ideally stimulating, and at the same time world-embracing *Morning Song of India* (*Jana-gana-mana*) should be confirmed officially as *what it has for almost twenty years been unofficially, namely, the true National Anthem of India.*

পরবর্তী কালে সুভাষচন্দ্র জর্মনিতে যে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করেন, 'জনগণমন'ই তার জাতীয় সংগীত বলে স্বীকৃত হয়। অতঃপর পূর্ব এশিয়ার আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠাকালেও এই গানটিই জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পায়। সে সময়ে সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে গানটি হিন্দুস্থানীতে রূপান্তরিত হয়।[১] রূপান্তর করার সময়ে গানটি ঈষৎ পরিবর্তিত হলেও এটিতে মূল গানের ভাবাদর্শ বজায় আছে এবং মূলের সুরও অব্যাহত আছে। বস্তুত আজাদ হিন্দ সরকার এই হিন্দুস্থানী রূপটি বাংলা জনগণমন থেকে অভিন্নই মনে করতেন। তাই আরজি হুকুমত-ই-আজাদ হিন্দের নির্দেশনামায়ত বলা হয়েছিল,

> *Tagore's song Jaya-ho* has become our National Anthem.[২]
>
> —*The Diary of a Rebel Daughter of India*

আজাদ হিন্দ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হবার পর থেকে ভারতবর্ষের বাইরে ও ভিতরে গানটির জনপ্রিয়তা বিশেষ ভাবে বেড়ে যায়। তাই ১৫ অগস্ট ১৯৪৭ তারিখের অব্যবহিত পরেই যখন স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রসংগীত নির্বাচনের প্রয়োজন উপস্থিত হয় তখনও এই গানটিই সর্বাগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হয়। ১৯৪৭ সালে নিউ ইঅর্ক শহরে বিশ্বরাষ্ট্র-সম্মেলনের সময়ে ভারতীয় প্রতিনিধিগণ 'জনগণমন'কেই ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত রূপে উপস্থাপিত করেন। তারই ফলে এটি আপন বিশিষ্টতাগুণে বিশ্বজগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়[৩] এবং তখন থেকে ভারতবর্ষেও

১ নেতাজির নির্দেশে আজাদ হিন্দ সরকারের সচিব-মর্যাদাসম্পন্ন সেক্রেটারি আনন্দমোহন সহায় লয়ালপুরের তরুণ কবি হুসেনের সহায়তায় জনগণমন গানটিকে হিন্দুস্থানীতে রূপান্তরিত করেন।— আনন্দমোহনের প্রবন্ধ, নেশন, ১৯৪৯ মার্চ ১০।

২ যে-সব বিশেষ দিনে এই গানটি গাওয়া হয়েছিল তার মধ্যে তিনটি দিন অবিস্মরণীয় হয়ে আছে :—যেদিন আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের কথা জগতের কাছে প্রকাশ্যে ঘোষিত হয় (সিঙ্গাপুর, ১৯৪৩ জুলাই ৫); যেদিন হুকুমত-ই-আজাদ হিন্দ আনুষ্ঠানিক ভাবে গঠিত হয় (সিঙ্গাপুর, ১৯৪৩ অক্টোবর ২১); এবং যেদিন আজাদ হিন্দ বাহিনী মৌডক রণক্ষেত্রে জয়ী হয়ে ভারতভূমিতে প্রথম ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন (মৌডক, ১৯৪৪ মার্চ প্রথমাংশ—ঠিক তারিখটি জানা যায়নি)।—*The Diary of Rebel Daughter of India* (1945), p. 41, 66; *I. N. A. & Its Netaji* by Maj.-Gen, Shahnawaz Khan (1946), p. 116.

৩ গণপরিষদে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলালের উক্তি (১৯৪৮ অগস্ট ২৫) :—

> When played before a large gathering it was very greatly appreciated, and representatives of many nations asked for a musical score of this new tune which struck them as *distinctive and dignified*.. From various countries we received messages of appreciation and congratulation of this tune, which was considered by experts and others as *superior to most of the National Anthems* which they had heard.
>
> —*Hindusthan Standard*, 1948 August 26

আজাদ হিন্দ সরকারের সম্পাদক আনন্দমোহন সহায়ও অনুরূপ উক্তি করেছেন—

> Many highly educated Japanese admitted that our anthem beat theirs in inspiring people and on many occasions they said so publicly. Netaji told me that Germans in Germany told him frankly that although they considered their anthem the best in the world, they found our anthem as inspiring as theirs, if not more.
>
> —*Nation*, 1949 March 10

এটির রাষ্ট্রসংগীতের মর্যাদালাভের সম্ভাবনা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ৩ মার্চ ১৯৪৮ তারিখে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল ভারতীয় পার্লামেণ্ট সভায় বলেন—

> Before finally deciding on a National Anthem it was considered desirable to give trials to orchestral renderings. With this object in view such orchestral renderings have been prepared by experts of Tagore's *Jana-gana-mana*, and a number of military bands have been asked to practise them...The most important part of a National Anthem was the music of it. Therefore it was decided that orchestral renderings of Tagore's song should be examined.
>
> —*Hindusthan Standard*, 1948 March 4

এই পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হয়েছিল বলেই মনে হয়। কেননা, ঐ উক্তির মাস তিনেক পরেই সংবাদপত্রে (৮ জুন) এই আভাস প্রকাশ পায় যে, গণপরিষদের অনুমোদনসাপেক্ষে জনগণমন গানটিকেই ভারতসরকার রাষ্ট্রসংগীত বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। এর কয়েকদিন পরে ১২ জুন তারিখের এক সংবাদে উক্ত আভাস সমর্থিত হয়। সংবাদটি এই—

> In a circular issued on the subject the government of India is understood to have stated that the question of having a formal National Anthem has assumed certain urgency... The Government of India considered this matter. They feel that any final decision should be taken by the Constituent Assembly itself. But some interim arrangements have to be made for the playing of anthem even before the final decision is taken. For this purpose they approved of the growing practice to play *Jana-gana-mana* on all occasions when the National Anthem is required. The provincial Governments, Embassies and Legations, and the Defence services are therefore requested to note this provisional direction and to give effect to it.
>
> —*Hindusthan Standard*, 1948 June 13

তখন থেকে এখন পর্যন্ত বৎসরাধিক কাল যাবৎ জনগণমন-অধিনায়ক গানটিই শেষ সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে সাময়িকভাবে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রসংগীত রূপে প্রযুক্ত হচ্ছে।[১] ১৫ জুলাই ১৯৪৯

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

১ 'জনগণমন' গানটির বিস্তৃততর ইতিহাস পাওয়া যাবে বর্তমান লেখকের নিম্নোক্ত প্রবন্ধ ও পুস্তিকায়—

ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়), পূর্বাশা ১৩৫৪ ফাল্গুন এবং ১৩৫৫ ফাল্গুন; 'জনগণমন' গান, যুগান্তর ১৩৫৫ পৌষ ১০; 'জনগণমন-অধিনায়ক কে?', বঙ্গশ্রী ১৩৫৫ ফাল্গুন; ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত (পুস্তিকা), ১৩৫৬ বৈশাখ ২৫; এবং **India's National Anthem** (পুস্তিকা), ১৯৪৯।

এই পর্বে প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জী

১. ব্রহ্মমন্ত্র। ৮ মাঘ ১৩০৭ [১৯০১]।

২. গল্প। ১৩০৭ [১৯০১]। ইহা গল্পগুচ্ছের (মজুমদার এজেন্সি-কর্তৃক প্রকাশিত) দ্বিতীয় খণ্ড।

৩. নৈবেদ্য। কবিতা। আষাঢ় ১৩০৮ [১৯০১]। 'পরমপূজ্যপাদ পিতৃদেবের শ্রীচরণকমলে'।

৪. ঔপনিষদ ব্রহ্ম। প্রবন্ধ। শ্রাবণ ১৩০৮ [১৯০১]।

৫. বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকা। ১৩০৮।

৬. চোখের বালি। উপন্যাস। ১৩০৯ [১৯০৩]।

৭. কাব্যগ্রন্থ। ১-৯ ভাগ। ১৩১০ [১৯০৩-১৯০৪]। ইহা রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কাব্যসংগ্রহ। ইহাতে নূতন প্রণালীতে, বিষয়ানুক্রমে, কবিতাগুলি শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে। অভিনবত্বের জন্য বিভিন্ন খণ্ড-নিবিষ্ট শ্রেণীগুলির উল্লেখ করা গেল— যাত্রা, হৃদয়-অরণ্য, নিষ্ক্রমণ, বিশ্ব, সোনার তরী, লোকালয়। নারী, কল্পনা, লীলা, কৌতুক, যৌবনস্বপ্ন, প্রেম। কবিকথা, প্রকৃতিগাথা, হতভাগ্য। সংকল্প, স্বদেশ। রূপক, কাহিনী, কথা, কণিকা। মরণ, নৈবেদ্য, জীবনদেবতা, স্মরণ। শিশু। গান। নাট্য॥ চতুর্থ ভাগে মুদ্রিত 'সংকল্প' 'স্বদেশ', ষষ্ঠ ভাগে মুদ্রিত 'স্মরণ' এবং সপ্তম ভাগে মুদ্রিত 'শিশু' ইতিপূর্বে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

৮. কর্মফল। গল্প। ১৩১০ [১৯০৩]। নাট্যীকৃত রূপ 'শোধ-বোধ' [১৯২৬]।

৯. রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী। হিতবাদীর উপহার। ১৩১১ [১৯০৪]। প্রধানতঃ উপন্যাস নাটক ও ছোটোগল্পের সংকলন। ছোটোগল্প বিভাগে ('রঙ্গচিত্র') 'চিরকুমার সভা' এবং উপন্যাস বিভাগে 'নষ্টনীড়' সর্বপ্রথম এই গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। 'নষ্টনীড়' বিশ্বভারতী-সংস্করণ গল্পগুচ্ছ (তিন খণ্ড, ১৯২৬) গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে মুদ্রিত হইয়াছে।

১০. আত্মশক্তি। প্রবন্ধ। ১৩১২ [১৯০৫]।

১১. বাউল। গান। [৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০৫]।

১২. স্বদেশ। কবিতা। ১৩১২ [১৯০৫]। ইহার অধিকাংশ প্রথমে কাব্যগ্রন্থ [১৯০৩-০৪] চতুর্থ ভাগে মুদ্রিত ('সংকল্প', 'স্বদেশ'), পরে পুনরায় 'সংকল্প ও স্বদেশ' নামে মুদ্রিত— এবং সেই নামেই বর্তমানে প্রচলিত।

১৩. ভারতবর্ষ। প্রবন্ধ। ১৩১২ [১৯০৬]।

১৪. খেয়া। কবিতা। 'উৎসর্গ'-শেষে তারিখ, ১৮ আষাঢ় ১৩১৩ [১৯০৬]। 'বিজ্ঞানাচার্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু করকমলেষু'।

১৫. নৌকাডুবি। উপন্যাস। ১৩১৩ [১৯০৬]।

১৬. বিচিত্র প্রবন্ধ। গদ্যগ্রন্থাবলী ১ম ভাগ। বৈশাখ ১৩১৪ [১৯০৭]। এই সময় হইতে মোট ১৬ খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনা 'গদ্য গ্রন্থাবলী' নামে মুদ্রিত হয়। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' এই গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ড।

১৭. চারিত্রপূজা। প্রবন্ধ। [২৮ মে ১৯০৭]।

১৮. প্রাচীন সাহিত্য। গদ্যগ্রন্থাবলী ২য় ভাগ। প্রবন্ধ। [১৩ জুলাই ১৯০৭]।

১৯. লোকসাহিত্য। গদ্যগ্রন্থাবলী ৩য় ভাগ। প্রবন্ধ। [২৬ জুলাই ১৯০৭]।

২০. সাহিত্য। গদ্যগ্রন্থাবলী ৪র্থ ভাগ। প্রবন্ধ। [১১ অক্টোবর ১৯০৭]। পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৬১ শ্রাবণ। 'মূল প্রবন্ধগুলির অতিরিক্ত চৌদ্দটি প্রবন্ধ বর্তমান সংস্করণের সংযোজনে কালক্রমে সংকলিত।'

২১. আধুনিক সাহিত্য। গদ্যগ্রন্থাবলী ৫ম ভাগ। প্রবন্ধ। [১০ অক্টোবর ১৯০৭]।

২২. হাস্যকৌতুক। গদ্যগ্রন্থাবলী ৬ষ্ঠ ভাগ। কৌতুকনাট্য। [১০ ডিসেম্বর ১৯০৭]।

২৩. ব্যঙ্গকৌতুক। গদ্যগ্রন্থাবলী ৭ম ভাগ। কৌতুকনাট্য ও নিবন্ধ। [২৮ ডিসেম্বর ১৯০৭]।

২৪. প্রজাপতির নির্বন্ধ। গদ্যগ্রন্থাবলী ৮ম ভাগ। উপন্যাস। [২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮]। ১৩১১ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী ('হিতবাদীর উপহার') গ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত হয় ('চিরকুমার সভা' নামে)। এই উপন্যাস হইতে নাট্যীকৃত 'চিরকুমার সভা' ১৩৩২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

২৫. সভাপতির অভিভাষণ: পাবনা সম্মিলনী। ১৩১৪ [১৯০৮]। পরে 'সমূহ' [১৯০৮] গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

২৬. প্রহসন। গদ্যগ্রন্থাবলী ৯ম ভাগ। [১৬ এপ্রিল ১৯০৮]। ইহাতে গোড়ায় গলদ [১৮৯২] ও বৈকুণ্ঠের খাতা [১৮৯৭] একত্র মুদ্রিত হয়।

২৭. রাজাপ্রজা। গদ্যগ্রন্থাবলী ১০ম ভাগ। প্রবন্ধ। [৩০ জুন ১৯০৮]।

২৮. সমূহ। গদ্যগ্রন্থাবলী ১১শ ভাগ। প্রবন্ধ। [২৫ জুলাই ১৯০৮]।

২৯. স্বদেশ। গদ্যগ্রন্থাবলী ১২শ ভাগ। প্রবন্ধ। [১২ অগস্ট ১৯০৮]।

৩০. সমাজ। গদ্যগ্রন্থাবলী ১৩শ ভাগ। প্রবন্ধ। [৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৮]।

৩১. কথা ও কাহিনী। কবিতা। [১০ সেপ্টেম্বর ১৯০৮]। মোহিতচন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের [১৯০৩-০৪] পঞ্চম ভাগে মুদ্রিত 'কাহিনী' ও 'কথা' অংশের একত্র পুনর্মুদ্রণ।

৩২. গান। [২০ সেপ্টেম্বর ১৯০৮]। যোগীন্দ্রনাথ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত।

৩৩. শারদোৎসব। নাটক। [২০ সেপ্টেম্বর ১৯০৮]। 'ঋণশোধ' নামে ইহার অভিনয়যোগ্য সংস্করণ ১৯২১ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৩৪. শিক্ষা। গদ্যগ্রন্থাবলী ১৪শ ভাগ। [১৭ নবেম্বর ১৯০৮]। পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, চৈত্র ১৩৫১।

৩৫. মুকুট। নাটিকা। [৩১ ডিসেম্বর ১৯০৮]। 'বালক [১২৯২] পত্রে প্রকাশিত "মুকুট" নামক ক্ষুদ্র উপন্যাস হইতে নাট্যীকৃত'।

৩৬. শব্দতত্ত্ব। গদ্যগ্রন্থাবলী ১৫শ ভাগ। প্রবন্ধ। [২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৯]। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' নামে, অগ্রহায়ণ ১৩৪২ [১৯৩৫]। এই সংস্করণ 'পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীকে' উৎসর্গিত।

৩৭. ধর্ম। গদ্যগ্রন্থাবলী ১৬শ ভাগ। প্রবন্ধ। [২৫ জানুয়ারি ১৯০৯]। ইহা শব্দতত্ত্বের পূর্বে প্রকাশিত হইলেও সংখ্যা অনুযায়ী পরে সন্নিবিষ্ট।

৩৮. শান্তিনিকেতন। ১-৮ ভাগ। অনুলিখিত ভাষণ। [জানুয়ারি-জুন ১৯০৯]।

৩৯. প্রায়শ্চিত্ত। নাটক। গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন'এ তারিখ '৩১শে বৈশাখ...১৩১৬' [১৯০৯]। 'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের [১৮৮৩] নাট্যীকৃত রূপ। ভিন্নতর রূপ— পরিত্রাণ— জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ [১৯২৯]।

৪০. চয়নিকা। কবিতা ১৯০৯। ১৩৩২ ফাল্গুনে যে প্রথম বিশ্বভারতী-সংস্করণ ('তৃতীয় সংস্করণ') মুদ্রিত হয় তাহাতে নূতন করিয়া কবিতা নির্বাচিত। পরবর্তী সংস্করণগুলিতে নূতন নূতন কবিতা-গ্রন্থ হইতে কবিতা সংকলিত।

৪১. গান। ১৯০৯। ইণ্ডিয়ান প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত। ১৯১৪ খৃস্টাব্দে ইহা দুই ভাগে 'গান' এবং 'ধর্মসঙ্গীত' নামে মুদ্রিত হয়। দ্রষ্টব্য তৃতীয় খণ্ড গীতবিতানে (ভাদ্র ১৩৬৪) 'রবীন্দ্রনাথের গানের সংকলন', পৃ ৯৫৬, ছত্র ২-৯।

৪২. বিদ্যাসাগর-চরিত। প্রবন্ধ। [১৯০৯ ?]। পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৩ শ্রাবণ ১৩৬৫।

৪৩. শিশু। কবিতা। ১৯০৯। মোহিতচন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের [১৯০৩-০৪] সপ্তম ভাগরূপে প্রথম মুদ্রিত। ইহার শেষাংশে প্রসঙ্গোপযোগী পূর্ব-প্রকাশিত অনেকগুলি কবিতা সংকলন করা হইয়াছে।

৪৪. শান্তিনিকেতন। ৯-১১ ভাগ। অনুলিখিত ভাষণ। [৯-১০ম ভাগ জানুয়ারি ১৯১০ এবং ১১শ ভাগ অক্টোবর ১৯১০]।

৪৫. গোরা। ১-২ খণ্ড। উপন্যাস। [১ ফেব্রুয়ারি ১৯১০]। 'শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কল্যাণীয়েষু'।

৪৬. গীতাঞ্জলি। কবিতা ও গান। ৩১ শ্রাবণ ১৩১৭ [১৯১০]।

৪৭. রাজা। নাটক। [১৯১০]। 'অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ', অরূপরতন [১৯২০]।

৪৮. শান্তিনিকেতন। ১২-১৩ ভাগ। ভাষণ। [২৪ জানুয়ারি ও ১০ মে ১৯১১]।

৪৯. আটটি গল্প। [২০ নবেম্বর ১৯১১]। বালক-বালিকাদের উপযোগী গল্পের সংকলন।

৫০. ডাকঘর। নাটক। [১৬ জানুয়ারি ১৯১২]।

৫১. ধর্মের অধিকার। প্রবন্ধ। ১৩১৮ মাঘ। [১৯১২]

৫২. গল্প চারিটি। [১৮ মার্চ ১৯১২]।

৫৩. মালিনী। নাটক। [২৩ মার্চ ১৯১২]। 'কাব্য গ্রন্থাবলী'র অঙ্গীভূত প্রথম প্রকাশ ১৩০৩ বঙ্গাব্দে [১৮৯৬]।

৫৪. চৈতালি। কবিতা। [২৩ মার্চ ১৯১২]। 'কাব্য গ্রন্থাবলী'র অঙ্গীভূত প্রথম প্রকাশ ১৩০৩ বঙ্গাব্দে [১৮৯৬]।

৫৫. বিদায়-অভিশাপ। নাট্যকাব্য। [১০ মে ১৯১২]। ১৩০১ বঙ্গাব্দে [১৮৯৪] 'চিত্রাঙ্গদা'র দ্বিতীয় সংস্করণের সহিত প্রথম মুদ্রিত: 'চিত্রাঙ্গদা ও বিদায় অভিশাপ'।

৫৬. জীবনস্মৃতি। আত্মজীবনী। ১৩১৯ [১৯১২]। বিস্তৃত গ্রন্থপরিচয় -সংবলিত নূতন সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৩৫০ [১৯৪৩]। রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি বিশেষ সংস্করণ শ্রাবণ-পৌষ ১৩৬৭ [১৯৬০]।

৫৭. ছিন্নপত্র। ১৩১৯ [১৯১২]। প্রথম আটটি পত্র শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে এবং অন্যান্য পত্র ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীকে লিখিত। এই গ্রন্থে মুদ্রিত 'ছিন্ন' পত্র সমূহের পূর্ণতর পাঠ এবং আরও ১০৭টি নূতন পত্র একত্রে 'ছিন্নপত্রাবলী' নামে রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত, আশ্বিন ১৩৬৭ [১৯৬০]। এই সংকলনে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত পত্রগুলি বর্জিত।

৫৮. অচলায়তন। নাটক। [২ অগস্ট ১৯১২]। 'অভিনয়যোগ্য' সংস্করণ, গুরু [১৯১৮]।

৫৯. স্মরণ। কবিতা। [২৫ মে ১৯১৪]। মোহিতচন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের (১৯০৩-০৪) ষষ্ঠ ভাগে প্রথম মুদ্রিত।

৬০. উৎসর্গ। কবিতা। উৎসর্গপত্রের তারিখ— ১ বৈশাখ ১৩২১ [১৯১৪]। 'রেভারেণ্ড সি. এফ. এণ্ডরুজ প্রিয়বন্ধুবরেষু'। মোহিতচন্দ্র সেন -কর্তৃক সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থে (১৯০৩-১৯০৪) বিষয়ানুযায়ী যে যে শ্রেণী-বিভাগ করা হয় সে-সকল শ্রেণীর প্রবেশক কবিতা ও বিভিন্ন বিভাগের অন্তর্গত অন্য কবিতার সংকলন।

৬১. গীতি-মাল্য। কবিতা ও গান। [২ জুলাই ১৯১৪]।

৬২. গান। [২৩ সেপ্টেম্বর ১৯১৪]। গান (১৯০৯) দ্রষ্টব্য।

৬৩. গীতালি। কবিতা ও গান। ১৯১৪।

৬৪. ধর্মসঙ্গীত। [২৭ ডিসেম্বর ১৯১৪]। গান (১৯০৯) দ্রষ্টব্য।

৬৫. শান্তিনিকেতন। ১৪শ ভাগ। ভাষণ ১৯১৫।

৬৬. কাব্যগ্রন্থ। ১৯১৫-১৬। ইণ্ডিয়ান প্রেস -কর্তৃক দশ খণ্ডে প্রকাশিত। ১-৬ খণ্ড ১৯১৫ খৃস্টাব্দে এবং ৭-১০ খণ্ড ১৯১৬ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। নবম খণ্ডে মুদ্রিত 'ফাল্গুনী' এবং 'বলাকা' ১৯১৬ খৃস্টাব্দেই স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

৬৭. শান্তিনিকেতন। ১৫-১৭ ভাগ। ভাষণ। ১৯১৬।

৬৮. ফাল্গুনী। নাটক। ১৯১৬। 'আমার সকল গানের ভাণ্ডারী শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথের হস্তে'। প্রায় একই সময়ে কাব্যগ্রন্থের (১৯১৫-১৬) নবম খণ্ডে মুদ্রিত।

৬৯. ঘরে-বাইরে। উপন্যাস। ১৯১৬। ‘শ্রীমান প্রমথনাথ চৌধুরী কল্যাণীয়েষু’।

৭০. সঞ্চয়। প্রবন্ধ। ১৯১৬। ‘শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের নামে’।

৭১. পরিচয়। প্রবন্ধ। ১৯১৬।

৭২. বলাকা। কবিতা। ১৯১৬। ‘উইলি পিয়রসন বন্ধুবরেষু’। প্রায় একই সময়ে কাব্যগ্রন্থের (১৯১৫-১৬) নবম খণ্ডে মুদ্রিত।

৭৩. চতুরঙ্গ। উপন্যাস। ১৯১৬।

৭৪. গল্পসপ্তক। [১৯১৬]।

৭৫. কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। প্রবন্ধ। [২২ অগস্ট ১৯১৭]। পরে কালান্তর [১৯৩৭] গ্রন্থের অন্তর্গত হয়।

৭৬. গুরু। নাটক। ১ ফাল্গুন ১৩২৪ [১৯১৮]। অচলায়তন [১৯১২] নাটকের ‘অভিনযযোগ্য’ সংস্করণ।

৭৭. পলাতকা। কবিতা। অক্টোবর ১৯১৮।

৭৮. জাপান-যাত্রী। ভ্রমণকথা। শ্রাবণ ১৩২৬ [১৯১৯]। ‘শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শ্রদ্ধাস্পদেষু’।

প্রত্যেক গ্রন্থের উল্লেখের সঙ্গে উহার প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে বা অন্যত্র মুদ্রিত তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে। ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন প্রথায়, কখনো শকাব্দে কখনো বঙ্গাব্দে, তারিখ মুদ্রিত থাকায় কালক্রম বুঝিবার সুবিধার জন্য সমসাময়িক খৃস্টাব্দ তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে।

কতকগুলি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ তারিখ— দিন, মাস, বর্ষ— খৃস্টাব্দ অনুযায়ী তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত হইল। সেগুলি বস্তুতঃ বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-ভুক্তির তারিখ— গ্রন্থমধ্যে কোনো তারিখ মুদ্রিত না থাকায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয় গ্রন্থ হইতে ঐ তারিখগুলি গৃহীত।

বর্তমান লেখকের রবীন্দ্রজীবনকথা (১৯৫৯) গ্রন্থে প্রকাশিত শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক -কৃত রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী হইতে পুনর্মুদ্রিত।

নির্দেশিকা

ছ

জ

ঝ

প

ফ

ব

ভ

ল

স

সংশোধন ও সংযোজন

পৃ. ১৭। পা-টী ১। The South African (Boer) war 12 Oct. 1899-31 May 1902…

পৃ. ২৩। পা-টী ১। ৩য় পংক্তি। "যৌবনে আমরা…" চিহ্ন থাকিবে না। আমরা অর্থে লেখক ও অন্যেরা— কবি নহেন।

পৃ. ৩৩। পা-টী ১-২। রবীন্দ্র-জীবনী ৪র্থ খণ্ডের পত্রাঙ্ক নূতন সংস্করণে পরিবর্তিত হইবে।

পৃ. ৪৩। ১২ পংক্তি। 'গৃহী ও সন্ন্যাসী' স্থলে 'গৃহী ও সংসারী' হইবে।

পৃ ৪৪। এলাহাবাদ যাওয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে নূতন তথ্যাদির আলোকে লিখিত হইতেছে।

পৃ. ৪২-৪৪ শেষ প্যারাগ্রাফ—

মৃণালিনী দেবী শিলাইদহে শিশুদের লইয়া প্রায়ই একা পড়েন। ইতিমধ্যে বলেন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী সাহানাকে (বা সুসি) শিলাইদহে আনাইবার কারণ হইল।

বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর (২২ অগস্ট ১৮৯৯) পর বিধবা পত্নী সাহানা তাঁহার পিতার নিকট এলাহাবাদে চলিয়া যান। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় শুনিতে পান যে "বলেন্দ্রের বিধবা পত্নীর বিবাহ দিবার জন্য বলেন্দ্রের শ্বশুরপক্ষ আয়োজন"[১] করিতেছেন। মহর্ষি সমাজসংস্কারাদি ব্যাপারে প্রাচীনপন্থী ছিলেন; তিনি অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠেন। ইতিমধ্যে বলেন্দ্রের শ্বশুর ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু ঘটিল; তখন দেবেন্দ্রনাথ পৌত্রবধূকে নিজেদের সংসারে আনাইয়া রাখিবেন স্থির করিলেন। মহর্ষির নির্দেশে রবীন্দ্রনাথ এলাহাবাদ রওনা হইয়া যান। এলাহাবাদ হইতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্ত্রীকে লিখিতেছেন (? ৩১ জানুয়ারি ১৯০১) "আজ এলাহাবাদে এসে পৌঁচেছি। সুসি [সাহানা] এবং তার মার সঙ্গে দেখা হয়েছে। সুসি যেতে রাজি হয়েচে, তার মা-ও সম্মতি দিয়েছেন। কলকাতা হয়ে শিলাইদহে যাওয়াই স্থির হল। যেরকম বাধা পাব মনে করেছিলুম তার কিছুই নয়। ভাল করে বুঝিয়ে বলতেই উভয়েই রাজি হল।" —চিঠিপত্র ১, পত্র ২১।

কবি সাহানাকে লইয়া ৩ ফেব্রুয়ারি ফিরিয়া আসেন।[২] এইবার এলাহাবাদে যাইবার পথে কবির সহিত হঠাৎ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত মোগলসরাই স্টেশনে দেখা। কবি পূর্বপত্রে লিখিতেছেন, "ভাগ্যি সুরেন আমার সঙ্গ নিলে নইলে একা একা এই হোটেলে পড়ে পড়ে কটা দিন কাটান আমার পক্ষে ভারি কষ্টকর হত।"

কবি ও সুরেন্দ্রনাথ এলাহাবাদস্থ কায়স্থ কলেজের অধ্যক্ষ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত দেখা করিতে যান; ইঁহার সহিত কবির পূর্বে পরিচয় ছিল—'প্রদীপ' মাসিকের মাধ্যমে। রামানন্দবাবু তখন এলাহাবাদে ২।১ সাউথ রোডে বাস করিতেন।

কবি ও সুরেন্দ্রনাথ যে রামানন্দবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তাহার ক্ষীণস্মৃতি সীতাদেবীর ছিল;

১ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রকথা, পৃ ৩৮৬

২ এলাহাবাদ যাওয়া সঠিক তারিখ আমরা পাই নাই। তারিখগুলি 'গঠন' করা হইয়াছে। কবি কলিকাতা হইতে বুধবার রাত্রে বোধ হয় পাঞ্জাব মেলে রওনা হন; জ্যোৎস্না ছিল। তারিখ ৩০ জানুয়ারি ১৯০১ (১৭ মাঘ ১৩০৭) শনিবার ফিরিবার জন্য রওনা হন ২ ফেব্রুয়ারি ১৯০১ (২০ মাঘ ১৩০৭)।

পুণ্যস্মৃতি গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। বোধহয় রামানন্দবাবুর অনুরোধে 'প্রবাসী' নামে যে মাসিকপত্র প্রকাশের আয়োজন হইয়াছে, তাহার জন্য কবিতা লিখিয়া (৩ ফাল্গুন ১৩০৭। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯০১) পাঠাইয়া দেন।[৩]

সীতাদেবী, পুণ্যস্মৃতি, পৃ. ৪-৫। "রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চাক্ষুষ প্রথম পরিচয় আমার যখন হয়, তখন আমার বয়স চার-পাঁচ বৎসরের বেশী হইবে না। আমরা তখন এলাহাবাদে বাস করিতাম। তখনকার সিভিল লাইনসে সাউথ রোড বলিয়া এক রাস্তার উপর একটি বাংলো বাড়ীতে আমরা ছিলাম। বিকাল বেলা বাড়ীর ভিতরের উঠানে খেলা করিতেছি, বাবা সবেমাত্র কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় আমাদের 'মহারাজ' (পাচক ব্রাহ্মণ) ছুটিয়া আসিয়া··খবর দিল যে বাহিরে দুইজন রাজা আসিয়াছেন।···বাবা ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেলেন। আমিও পিছন পিছন রাজা দেখিবার আগ্রহে ছুটিয়া গেলাম।...অভ্যাগত দুই জনের চেহারা দেখিয়া অবাক হইয়া ভাবিলাম, রাজারা যে এত সুন্দর হয় তাহা জানা ছিল না।·· দড়ি-ছাওয়া খাটিয়ার উপরেই তাঁহারা বসিয়াছিলেন। একজনের পরিচ্ছদ কালো এবং অন্যজনের ধূসর। দুইজনই মাথায় ইরাণী পাগড়ী পরিয়া আসিয়াছিলেন। অল্পক্ষণই তাঁরা ছিলেন। তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর বাবা বলিয়া দিলেন যে, কালো পোষাকপরা যিনি তিনিই রবীন্দ্রনাথ ও ধূসর পোষাকপরা ভদ্রলোক তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ।"

পৃ ৮০। পূজার সাজ: (কোথায় প্রকাশিত হয় জানা নাই)। কাগজের নৌকা। মুকুল ১ম খণ্ড ১৩০২ আশ্বিন সংখ্যায় বাহির হয়।

পৃ. ২২৭।

মীরাকে লইয়া কালকা যাইবার পথে রবীন্দ্রনাথের শরীর খারাপ হয়; এলাহাবাদে নামিয়া নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বাসায় উঠেন। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় তখন তথাকার ইন্‌ডিয়া প্রেসে চাকরী করেন; তিনি কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। অ্যাংলো-বেঙ্গলি স্কুলের হেড্ মাস্টার নেপালচন্দ্র রায় রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার বিদ্যালয়ে আহ্বান করিয়া লইয়া যান; কবি সেখানে ছাত্রদের সম্মুখে বক্তৃতাও দেন বলিয়া শুনিয়াছি। নেপালচন্দ্র রায় রাজনীতি চর্চা করিতেন, পত্রিকাদিতে লিখিতেন। লাট সাহেব Hewett সবই জানিতেন। কয়েকদিন পূর্বে গবর্মেণ্ট স্কুলের জন্য খেলার মাঠ দেন সেই উপলক্ষ্যে লাটসাহেবকে ধন্যবাদ দিবার জন্য এক সভা হয়; সে সভার তুলনায় রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা সভা খুবই জাকাইয়া অনুষ্ঠিত হয়। এইসব হয় ১৯০৯-এর মে মাসে। অতঃপর ১৯০৯ জুলাই মাসে চব্বিশঘণ্টার নোটিসে নেপালচন্দ্রকে এলাহাবাদ ত্যাগ করিতে হয়। ১৯১০ সালে নেপালচন্দ্র ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষকরূপে আসেন।

পৃ· ২৫৭ পা-টী. *Men and Memois* স্থলে *Men and memories* হইবে।

পৃ. ৩৫৭।

আষাঢ় (১৩২১) মাসের শেষে শান্তিনিকেতনে সিরীয়া (Syria) হইতে 'বুস্তানী' নামে এক আরব-কবি আসেন। তিনি গীতাঞ্জলি, গার্ডনার, ক্রেসেণ্ট মুন ও চিত্রা ইংরাজি হইতে আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই বইগুলি গ্রন্থাগারে উপহার দেন। বোধ হয় গীতাঞ্জলিতে এই কয় ছত্র লিখিয়াছেন—

৩ প্রবাসী "সব ঠাই মোর ঘর আছে"। ৩ ফাল্গুন ১৩০৭। প্রবাসী ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৩০৮ বৈশাখ পৃ. ২২-২৪। এই বৎসর বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়। প্রবাসীর ২য় বর্ষ ১৩০৯ বৈশাখ পৃ. ৩৩-৩৪ 'প্রবাসের প্রেম' শীর্ষক ২ কবিতা বাহির হয়। দ্র. উৎসর্গ ৪৬ নং। এই সময়ে প্রবাসী সম্পাদক এডমণ্ডস্টোন রোডে বাস করিতেন। রবীন্দ্রজীবনী ২য় পৃ. ৪৫-৪৬ এই ভাবে দেখিতে হইবে। (রামানন্দ ও অর্দ্ধশতাব্দীর বাংলা পৃ. ৮৯) এডমণ্ডস্টোন রোডে কোনো হোটেলে কবি ছিলেন না।

'Gitanjali' is the greatest boon.
'The Gardener' is my name
And in my heart is the 'Crescent Moon'
A 'Chitra' with love I frame.

বুস্তাদী শব্দের অর্থ 'গার্ডনার' বা মালী।

দ্র. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৬ শক পৃ ১০৩।

পৃ. ৩৬৫ পা-টী. '১৯৪১ যুদ্ধের জন্য' স্থলে '১৯১৪ সালে যুদ্ধের জন্য' হইবে।

পৃ. ৩৭১ পা-টী. ২। 1941 স্থলে 1914 হইবে।

" পা-টী. ৪…প্রবাসী ১৩১০ স্থলে প্রবাসী ১৩২০ হইবে।

পৃ. ৩৭২ ৪র্থ পংক্তি। 'তোতা বাবু' স্থলে 'তাতা বাবু'।

২য় প্যারা 'ডাঃ মেনডি' স্থলে ডাঃ মেনার্ড।

পৃ, ৪৪১, ৪৪৩ পরিচ্ছেদের নাম 'বলাকার শেষ পর্ব' ভুলক্রমে মুদ্রিত।

পৃ. ৪৬৫ ১ম প্যারা। ১৯১৫ স্থলে ১৯১৬ হইবে।